নিবেদন

বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইল। প্রথম খণ্ডটি যেরূপ বিপুলভাবে পাঠকদের কাছে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও বিদ্বজ্জন সমাজে যেরূপ অবিমিশ্র প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে তাহাতে আমরা বিস্মিত না হইলেও যারপরনাই উৎসাহিত বোধ করিয়াছি। "বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন"—ইহার সাহিত্যিক ঔৎকর্ষ ও মূল্য সম্বন্ধে দ্বিমত হইতে পারে না, আমাদের আনন্দ এই যে, আমাদের দ্বারা প্রকাশিত সংস্করণের সাজ-সজ্জা ও মুদ্রন-পারিপাট্য সুধীজনের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডে, বানান-পদ্ধতি ও বচন-বিন্যাসের মধ্যে অপ্রচলিত রীতি ও বিচিত্রতা দেখিয়া কেহ কেহ আমাদের প্রশ্ন করিয়াছেন। এই সূত্রে জানাইতেছি যে, বঙ্গদর্শনের পুনর্মুদ্রন কার্য্যে মূল গ্রন্থকে আমরা হুবহু অনুসরণ করিতেছি, বস্তুতপক্ষে, তাহা করা ভিন্ন আমাদের অন্য কোনরূপ অধিকার নাই, তাই পাঠকবর্গ যে সকল বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিতেছেন, তাহা মূল গ্রন্থের মধ্যে বর্ত্তমান আছে, আমাদের কৃতকর্ম্ম নহে। ৬৭ বৎসর পূর্ব্বে সদ্যোজাত বাংলা ভাষা ও বাংলা লিখন প্রণালীর মধ্যে বহু প্রকারের বহু বিচিত্রতা ছিল যাহা আধুনিক কালে অচল। তখনকার দিনে প্রায়শ 'মাথা'-র পরিবর্ত্তে 'মাতা,' 'চোখ্'-এর পরিবর্ত্তে 'চোক্', 'পাখী'-র পরিবর্ত্তে 'পাকি', 'ক'রে'-র পরিবর্ত্তে 'কর্য়ে' লেখা হইত, এবং বানান ও শব্দবিন্যাস সম্বন্ধে আরও এমন বহু প্রকারের রীতি অবলম্বন করা হইত যাহা আজিকার দিনে দৃষ্ট হয় না।

অবশ্য, এরূপ বিরাট গ্রন্থের মধ্যে ছাপার ভুল যে একেবারে নাই, তাহা জোর করিয়া বলা সম্ভব নহে, তবে আশা করি, সেজন্য সহৃদয় পাঠকবর্গের ক্ষমা লাভে বঞ্চিত হইব না। ইতি, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬।

৫৩, ষ্টিফেন হাউস
৫, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী

সূচীপত্র

বঙ্গদর্শন

মাসিক পত্র ও সমালোচন

২য় খণ্ড   ১লা বৈশাখ ১২৮০   ১ সংখ্যা

কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে বুঝাইবার জন্য যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও যত্ন সফল হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে দুই ব্যক্তি কখন এক প্রকার অর্থ করেন নাই। কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণ সম্বন্ধে, মতভেদ থাকিলেও কাব্য একই পদার্থ সন্দেহ নাই। সেই পদার্থ কি, তাহা কেহ বুঝাইতে পারুন, বা না পারুন, কাব্যপ্রিয়ব্যক্তি মাত্রেই এক প্রকার অনুভব করিতে পারেন।

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলিন গ্রন্থ, যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য নাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য। মহাভারত রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া খ্যাত হইলেও, তাহা কাব্য; শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বলিয়া খ্যাত হইলেও, তাহা কাব্য; স্কটের উপন্যাসগুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার করি; নাটককে আমরা কাব্য মধ্যে গণ্য করি তাহা বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলিন বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের কথিত তিনটি শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়, যথা, ১ম, দৃশ্য কাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি; ২য়, আখ্যান কাব্য অথবা মহাকাব্য; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের চরিত, শিশুপাল বধের ন্যায় ঘটনা বিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্য কাব্য ইহার অন্তর্গত, এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত। ৩য়, খণ্ড-কাব্য। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা খণ্ডকাব্য বলিলাম।

দেখা যাইতেছে যে এই ত্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে, কিন্তু রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে। দৃশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনে রচিত হয়, এবং রঙ্গাঙ্গনে অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনে গ্রন্থিত, এবং অভিনয়োপযোগী তাহাই যে নাটক বা তচ্ছ্রেণীস্থ এমত নহে। এ দেশের লোকের সাধারণতঃ উপরোক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে। এই জন্য নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রন্থিত অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত, এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক তাহার মধ্যে একখানিও নাটক নহে। বাঙ্গালা ভাষায় একখানিও নাটক নাই। পাশ্চাত্য ভাষায় অনেকগুলিন উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা নাটকের ন্যায় কথোপকথনে গ্রন্থিত, কিন্তু বস্তুতঃ নাটক নহে। "Comus," "Manfred," "Faust," ইহার উদাহরণ। অনেকে শকুন্তলা ও উত্তর রামচরিতকেও নাটক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইংরাজি ও গ্রীক ভাষা ভিন্ন কোন ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই। এ কথা কতক দূর সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। পক্ষান্তরে গেটে বলিয়াছেন যে প্রকৃত নাটকের পক্ষে, কথোপকথনে গ্রন্থন, বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। আমাদিগের বিবেচনায় "Bride of Lammermoor"কে নাটক বলিলে নিতান্ত অন্যায় হয় না।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে আখ্যান কাব্যও নাটকাকারে প্রণীত হইতে পারে, অথবা গীতপরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়া গীতি কাব্যের রূপ ধারণ করিতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় শেষোক্ত বিষয়ের উদাহরণের অভাব নাই। পক্ষান্তরে, দেখা গিয়াছে অনেক খণ্ড কাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছে। যদি কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের সূত্র গ্রন্থিত কাব্যমালাকে আখ্যান কাব্য বা মহাকাব্য নাম দেওয়া বিধেয় হয়, তবে "Excursion" এবং "Childe Harold"কেও ঐ নাম দিতে হয়। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ঐ দুই কাব্য খণ্ড কাব্যের সংগ্রহ মাত্র।

খণ্ড কাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তন্মধ্যে এক প্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গীতি কাব্য (Lyric) নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্য সেই শ্রেণীর কাব্যের কথায় আমাদিগের প্রয়োজন।

ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক্ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, আমাদিগের দেশেও যে একটি পৃথক্ নাম দিতে হইবে এমত নহে। যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক। কিন্তু যেখানে বস্তুগুলি পৃথক্, সেখানে নামও পৃথক্ হওয়া আবশ্যক। যদি এমত কোন বস্তু থাকে যে তাহার জন্য গীতিকাব্য নামটি গ্রহণ করা আবশ্যক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে ঋণী হইতে হইবে।

গীত মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। "আঃ" এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখ বোধক হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে, এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে। "তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিলাম !" ইহা শুধু বলিলে, দুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সহিত বলিলে দুঃখ শত গুণ অধিক বুঝাইবে। এই স্বর বৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত। সুতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রযুক্ত, মনুষ্য সঙ্গীতপ্রিয়, এবং তৎসাধনে স্বভাবতঃ যত্নশীল।

কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না, অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়।

গীতের জন্য বাক্যবিন্যাস করিলে দেখা যায়, যে কোন নিয়মাধীন বাক্য-বিন্যাস করিলেই গীতের পারিপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানেই ছন্দের সৃষ্টি।

গীতের পারিপাট্য জন্য আবশ্যক দুইটি, স্বরচাতুর্য্য এবং শব্দচাতুর্য্য। এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ দুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।

কাজে কাজেই একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এই রূপে গীত হইতে গীতি কাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতি-কাব্যের আদিম উদ্দেশ্য ; কিন্তু যখন দেখা গেল যে গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল ; অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেম বাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর এক খানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।

"অবকাশরঞ্জিনী" কতকগুলি খণ্ডকাব্যের সংগ্রহ। ইহার প্রণেতা কে তাহা গ্রন্থে প্রকাশ নাই। তিনি যেই হউন, তিনি সুকবি এবং বিশুদ্ধ রুচি; তিনি যশস্বী হইবার যোগ্য। ভরসা করি পুনর্মুদ্রাঙ্কন কালে আপনার পরিচয় দিবেন।

এই কবির বিশেষ গুণ এই যে চিত্তের যে সকল ভাব কোমল এবং স্নেহময়, তৎসমুদায় অপূর্ব্বশক্তিসহকারে উদ্ভূত করিতে পারেন। সেই অপূর্ব্ব শক্তিটি কি, তাহা আমরা সবিস্তারে বুঝাইব।

যখন হৃদয়, কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়,—স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদয়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয় তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেই টুকু গীতিকাব্য প্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। অনেক নাটক কর্ত্তা তাহা বুঝেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের নায়ক নায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ম্বর বিশিষ্ট হইয়া উঠে। সত্য বটে, যে গীতিকাব্য লেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য তাহাতে গীতি কাব্যকারের অধিকার।

উদাহরণ ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এ বিষয়ের একটি উত্তম উদাহরণ এই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উত্তরচরিত সমালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সীতা বিসর্জ্জন কালে ও তৎপরে রামের ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভূতির নাটকে এবং বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায়, তাহার আলোচনা করিলে এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামের চিত্তে যখন যে ভাব উদয় হইতেছে, ভবভূতি তৎক্ষণাৎ তাহা লেখনীমুখে ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটক মধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কার্য্য না করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্মীকি তাহা না করিয়া কেবল

রামের কার্য্যগুলিই বর্ণিত করিয়াছেন, এবং তত্তৎ কার্য্য সম্পাদনার্থ যতখানি ভাব-ব্যক্তি আবশ্যক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভূতিকৃত ঐ রাম বিলাপের সঙ্গে ডেসডিমোনা বধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ করিয়া তুলনা করিলেও একথা বুঝা যাইবে। সেক্ষপীয়র এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করেন নাই; যাহা তৎকালীন কার্য্যার্থ, বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না। ব্যক্তব্যের অতিরেকে তিনি এক রেখাও যান নাই। তিনি ভবভূতির ন্যায় নায়কের হৃদয়ানুসন্ধান করিয়া, ভিতর হইতে এক একটি ভাব টানিয়া আনিয়া, একে একে গণনা করিয়া, সারি দিয়া সাজান নাই। অথচ কে না বলিবে যে রামের মুখে যে দুঃখ ভবভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহস্র গুণ দুঃখ সেক্ষপীয়র ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন?

সহজেই অনুমেয় যে, যাহা ব্যক্তব্য তাহা পরসম্বন্ধীয়, বা কোন কার্য্যোদ্দিষ্ট, যাহা অব্যক্তব্য তাহা আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়; উক্তি মাত্র তাহার উদ্দেশ্য। এরূপ কথা যে নাটকে একবারে সন্নিবেশিত হইতে পারে না এমত নহে, বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক কিন্তু ইহা কখন নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। নাটকের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার আনুষঙ্গিকতা বশতঃ প্রয়োজন মত কদাচিৎ সন্নিবেশিত হয়।

আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়, উক্তিমাত্রোদ্দিষ্ট, অব্যক্তব্য কথা, যাহা গীতিকাব্যের আত্মা, তাহার উদাহরণ স্বরূপ, অবকাশরঞ্জিনী মধ্যগত "পিতৃহীন যুবক" ইত্যভিধেয় কাব্য হইতে কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"যামিনীর সুমধুর নুপুরনিক্কণ
ঝিল্লিরবে ভাসিতেছে দিগ্ দিগন্তর,
পাখার প্রহারশব্দ করিছে কখন
ভগ্ন-নিদ্র পক্ষিগণ বৃক্ষের উপর।
কলকল রবে গঙ্গা সাগরসদন
যাইতেছে, অন্ধকারে ঢাকিয়া বদন।

* * * *

জীবন, পবন, এবে উভয়ে অচল,
নিদ্রিত ধরায় আর নাহি বহে শ্বাস,
একটি পল্লব নাহি করে টল মল,
একটি ফুলের নাহি সুরভি নিশ্বাস।
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে করিয়া শয়ন
দিবসের শ্রম নর জুড়ায় এখন।

* * * *

কণ্টকশয্যায় যদি রাখি কলেবর,
চিন্তানলে জ্বলি, ভাসি নয়নের নীরে ;
ঝরিয়াছে এক বিন্দু, ঝরিবে অপর,
এই অবসরে নিদ্রা নয়ন মন্দিরে
প্রবেশেন যদি, তবে আইসে সঙ্গিনী
যাতনিতে অভাগায় স্বপ্ন কুহকিনী।

* * * *

মায়াবলে পাপীয়সী ফিরায়ে কখন
মানস তরণী মম, জীবনের স্রোতে,
লয়ে যায় যথা, আহা! শৈশবে যখন
কেলিনু মনের সুখে ; সাগর কপোতে
খেলে যেই মতে শান্ত সুনীল সাগরে,
প্রসারিয়া পক্ষপুট জলধি উপরে।
সৌভাগ্যের পূর্ণ জ্যোতিঃ শৈশবে আমার
খেলাইত যেই মতে ঊর্ম্মিমালাসনে,
নব জীবনের জলে, চুম্বি অনিবার
আশার মুকুল শত সোণার কিরণে ;
দেখাইয়া গত সুখ চিত্র মনোহর,
হাসায় এ চিন্তাক্রান্ত বিষণ্ণ অন্তর।

* * *

কিন্তু কি সুখের তরে, চিত্ত দ্রব করি
গৃহরূপ রঙ্গভূমে ফিরিব আবার ?
দশমীতে ব্যোমকেশ, ত্রিদশ ঈশ্বরী
সহ গেলে স্বর্গপুরে ; করিয়া আঁধার
ভকত হৃদয়াকাশ, শূন্যগৃহে পড়ি,
শুটি কত ভগ্ন ঘট যায় গড়াগড়ি।"

উপরোদ্ধৃত কয়েক চরণের কবিত্ব অতি মনোহর। বিশেষ সাগর কপোতের এবং ভগ্ন ঘটের উপমা দুইটি অতি মনোহর।

যে সকল মোহিনী সৃষ্টির গুণে কবিগণ চিরস্মরণীয় হয়েন, অবকাশরঞ্জিনীতে তাহার কিছু নাই। এবং থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। অপিতু কোন রসের অত্যুৎকৃষ্ট অবতারণা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সে সকল সৃষ্টি বা অবতারণায় সক্ষম যে সকল মহাত্মা, তাঁহারা এ জগতে অতি দুর্লভ। সে সকল গুণ না থাকিলেও অবকাশরঞ্জিনীর কবিকে সুকবি বলা যায়। তাঁহার একটি ক্ষমতা যে তিনি

শব্দচতুর। কতকগুলা শব্দ প্রয়োগের দ্বারা যিনি বাগাড়ম্বর করিতে পারেন, তাঁহাকে শব্দ চতুর বলি না ; অথবা যিনি শ্রুতিমধুর শব্দ প্রয়োগে দক্ষ, তাঁহাকেও বলি না। কাব্যোপযোগী শব্দের মাহাত্ম্য এই যে একটি বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করিলে তদভিপ্রেত পদার্থ ভিন্ন অন্যান্য আনন্দদায়ক পদার্থ স্মরণ পথে আইসে। এই কবির সেই শব্দ প্রয়োগে পটুতা আছে। কাব্যোপযোগী সামগ্রী গুলিন আহরণ করিয়া সাজাইতে ইনি বিশেষ ক্ষমতাশালী। যাহা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন, তাহাই উজ্জ্বলতা বিশিষ্ট করেন। অবকাশরঞ্জিনীর যে কোন স্থান হইতে উদ্ধৃত করিলে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। আমরা ছন্দের পারিপাট্য হেতু নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"সখিরে! কি কব করম কথা!
প্রণয় ভাবিয়া　　পাষাণ হৃদয়ে
চাপিয়া, পাইনু ব্যথা।
কুসুম কলিকা,　　জিনিয়া বালিকা,
ছিলাম যখন সই,
প্রণয় কেমন,　　জানি নাই আমি,
শৈশব আমোদ বই।
মধুকর ভ্রমে,　　বিকাশিনু দল,
ভাসিয়া যৌবন জলে,
নিদারুণ কীট,　　পশিয়া মরমে,
শুকাল বিকচ দলে।
সখি! যায় প্রাণ যায়,　দংশন জ্বালায়,
বাঁচিনে পরাণে আর,
জীবন মৃণাল,　　এই ছুরিকায়,
কাটিব করেছি সার॥"

অল্পবয়স্ক কবিগণ, বিনানুকরণে রচনা করিতে সক্ষম হইলেও একটু একটু অনুকরণপ্রিয় হয়েন। অবকাশরঞ্জিনী হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পাঠে শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়কে স্মরণ হইবে।

"ছিলে তুমি অয়ি গঙ্গে! হিমাচল শিরে,
তরল রজতাসনে রাজরাণী প্রায়
ভূতলে পতিত এবে তাই ধীরে ধীরে,
কাঁদিতেছ মনোদুঃখে একাকিনী হায়!
আমি ভাবি শুনি মম দুঃখের কাহিনী,
কাতরে কাঁদিছে আহা! নগেন্দ্র নন্দিনী।"

নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তির ন্যায় রচনা পাঠ করিয়া হেম বাবুকে স্মরণ হয়, এবং উভয়ের আদর্শ বাইরণকেও মনে পড়ে ;

নাচরে ময়না নাচরে আবার,
দুই (দিই ?) করতালি নাচ আর বার,
চন্দ্রানন হতে ঢাল একবার,
ঢালরে সঙ্গীত অমৃতের ধার,
কি কটাক্ষ! হলো জেনেছি এবার,
কাশী নরেশের হৃদয় বিদার।

আমরা এমত বলিতেছি না যে এই কবি অন্য লেখকের নিকট ঋণী। পশ্চাদ্বর্ত্তী লেখকগণকে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের নিকট কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঋণী হইতেই হয়। সেই পরিমাণের অতিরেকে ইনি কাহারও নিকট ঋণী নহেন। ইনি নিজমানস প্রসূত কবিত্বরত্ন যেরূপ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গ্রন্থমধ্যে বিকীর্ণ করিয়াছেন, তাহাতে ইহাকে পরের নিকট ঋণী বলিলে অন্যায় নিন্দা করা হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিরীশ্বরতা

সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর বলিয়া খ্যাত, কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে সাংখ্য নিরীশ্বর নহে। ডাক্তার হল একজন এই মতাবলম্বী। মক্ষমূলর, এই মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার মত পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা গিয়াছে। কুসুমাঞ্জলিকর্ত্তা উদয়নাচার্য্য বলেন যে সাংখ্য মতাবলম্বীরা আদি বিদ্বানের উপাসক। অতএব তাঁহার মতেও সাংখ্য নিরীশ্বর নহে। সাংখ্য প্রবচনের ভাষ্যকার বিজ্ঞান ভিক্ষুও বলেন যে ঈশ্বর নাই, একথা বলা কাপিল সূত্রের উদ্দেশ্য নহে। অতএব সাংখ্যদর্শনকে কেন নিরীশ্বর বলা যায়, তাহার কিছু বিস্তারিত লেখা যাউক।

সাংখ্য প্রবচনের প্রথমাধ্যায়ের বিখ্যাত ৯২ সূত্র এই কথার মূল। সে সূত্র এই; "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" প্রথম এই সূত্রটি বুঝাইব।

সূত্রকার প্রমাণের কথা বলিতেছিলেন। তিনি বলেন প্রমাণ ত্রিবিধ; প্রত্যক্ষ, অনুমান, এবং শব্দ। ৮৯ সূত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলেন, "যৎ সম্বন্ধং সত্তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্।" অতএব যাহা সম্বদ্ধ নহে, তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এই লক্ষণ প্রতি দুইটি দোষ পড়ে। যোগীগণ যোগবলে অসম্বদ্ধও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ৯০।৯১ সূত্রকার সে দোষ অপনীত করিলেন। দ্বিতীয় দোষ, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিত্য, তৎ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ কথাটি ব্যবহার হইতে পারে না। সূত্রকার তাহার এই উত্তর দেন, যে ঈশ্বরই সিদ্ধ নহেন—ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই—অতএব তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে না বর্ত্তিলে এই লক্ষণ দুষ্ট হইল না। তাহাতে ভাষ্যকার বলেন যে দেখ, ঈশ্বর অসিদ্ধ ইহা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর নাই, এমত কথা বলা হইল না।

না হউক, তথাপি এই দর্শনকে নিরীশ্বর বলিতে হইবে। এমত নাস্তিক বিরল, যে বলে যে ঈশ্বর নাই। যে বলে যে ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই, তাহাকেও নাস্তিক বলা যায়।

যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এবং যাহার অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে, এ দুইটি পৃথক্ বিষয়। রক্তবর্ণ কাকের অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু তাহার অনস্তিত্বেরও কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু গোলাকার চতুষ্কোণের অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে। গোলাকার চতুষ্কোণ মানিব না, ইহা নিশ্চিত; কিন্তু রক্তবর্ণ কাক মানিব কি না? তাহার অনস্তিত্বেরও প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু তাহার অস্তিত্বেরও প্রমাণ নাই। যেখানে অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, সেখানে মানিব না। অনস্তিত্বের প্রমাণ নাই থাক, যতক্ষণ অস্তিত্বের প্রমাণ না পাইব ততক্ষণ মানিব না। অস্তিত্বের প্রমাণ পাইলে তখন মানিব। ইহাই প্রত্যয়ের প্রকৃত নিয়ম। ইহার ব্যত্যয়ে যে বিশ্বাস তাহা ভ্রান্তি। "কোন পদার্থ আছে এমত প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু থাকিলে থাকিতে পারে," ইহা ভাবিয়া যে সেই পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করে সে ভ্রান্ত।

অতএব নাস্তিকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। যাঁহারা কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব বাদী,—তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর থাকিলে থাকিতে পারেন,—কিন্তু আছেন এমত কোন প্রমাণ নাই। কোম্তের মতাবলম্বীরা এই শ্রেণীর নাস্তিক।

অপর শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলেন যে ঈশ্বর আছেন, শুধু ইহারই প্রমাণাভাব, এমত নহে, ঈশ্বর যে নাই, তাহারও প্রমাণ আছে। আধুনিক ইউরোপীয়েরা কেহ কেহ এই মতাবলম্বী। একজন ফরাসিস লেখক বলিয়াছেন, তোমরা বল ঈশ্বর নিরাকার, অথচ চেতনাদি মানসিক বৃত্তি বিশিষ্ট। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছ যে চেতনাদি মানসিক বৃত্তি সকল শরীর হইতে বিযুক্ত? যদি তাহা কোথাও দেখ নাই, তবে হয় ঈশ্বর সাকার, নয় তিনি নাই। সাকার ঈশ্বর, এ কথা তোমরা মানিবে না, অতএব ঈশ্বর নাই, ইহা মানিতে হইবে। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিক।

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" শুধু এই কথার উপর নির্ভর করিলে, সাংখ্যকারকে প্রথম শ্রেণীর নাস্তিক বলা যাইত। কিন্তু তিনি অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন, যে ঈশ্বর নাই।

সে প্রমাণ কোথাও দুই একটি সূত্রের মধ্যে নাই। অনেক গুলিন সূত্র একত্র করিয়া, সাংখ্যপ্রবচনে ঈশ্বরের অনস্তিত্বসম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহার মর্ম্ম সবিস্তারে বুঝাইতেছি।

তিনি বলেন যে ঈশ্বর অসিদ্ধ (১,৯২) প্রমাণ নাই বলিয়াই অসিদ্ধ (প্রমাণাভাবাৎ ন তৎ সিদ্ধিঃ) (৫,১০) সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার, প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ। প্রত্যক্ষের ত কথাই নাই। কোন বস্তুর সঙ্গে যদি অন্য বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ

থাকে, তবে একটি দেখিলে আর একটিকে অনুমান করা যায়। কিন্তু কোন বস্তুর সঙ্গে ঈশ্বরের কোন নিত্য সম্বন্ধ দেখা যায় নাই; অতএব অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না। (সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্ ৫,১১)

যদি এই সূত্র পাঠক না বুঝিয়া থাকেন, তবে আর একটু বুঝাই। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া তুমি সিদ্ধ কর, যে তথায় অগ্নি আছে। কেন এ সিদ্ধান্ত কর? তুমি যেখানে যেখানে ধূম দেখিয়াছ, সেই খানে সেই খানে অগ্নি দেখিয়াছ বলিয়া। অর্থাৎ অগ্নির সহিত ধূমের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া।

যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তোমার প্রপিতামহের কয়টি হাত ছিল, তুমি বলিবে দুইটি। তুমি তাঁহাকে কখন দেখ নাই—তবে কি প্রকারে জানিলে তাঁহার দুইটি হাত ছিল? তুমি বলিবে মানুষ মাত্রেরই দুই হাত এই জন্য। অর্থাৎ মানুষত্বের সহিত দ্বিভুজতার নিত্য সম্বন্ধ আছে, এই জন্য।

এই নিত্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিই অনুমানের একমাত্র কারণ। যেখানে এ সম্বন্ধ নাই, সেখানে পদার্থান্তর অনুমিত হইতে পারে না। এক্ষণে, জগতে কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ আছে, যে তাহা হইতে ঈশ্বরানুমান করা যাইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন কিছুরই সঙ্গে না।

তৃতীয় প্রমাণ, শব্দ। আপ্ত বাক্য শব্দ। বেদই আপ্তোপদেশ। সাংখ্যকার বলেন, বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই, বরং বেদে ইহাই আছে যে সৃষ্টি প্রকৃতিরই ক্রিয়া, ঈশ্বর কৃত নহে (শ্রুতিরপি প্রধান কার্য্যত্বস্য) (৫,১২) কিন্তু যিনি বেদ পাঠ করিবেন তিনি দেখিবেন, এ অতি অসঙ্গত কথা। এই আশঙ্কায় সাংখ্যকার বলেন যে বেদে ঈশ্বরের যে উল্লেখ আছে, তাহা হয় মুক্তাত্মার প্রশংসা, নয় প্রামাণ্য দেবতার (সিদ্ধস্য) উপাসনা। (মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাস। সিদ্ধস্য বা, ১,৯৫)

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এইরূপে দেখাইয়াছেন। ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রমাণ দেখাইয়াছেন, নিম্নে তাহার সম্প্রসারণ করা গেল।

ঈশ্বর কাহাকে বল? যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পাপ পুণ্যের ফল বিধাতা। যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি মুক্ত না বদ্ধ? যদি মুক্ত হয়েন, তবে তাঁহার সৃজনের প্রবৃত্তি হইবে কেন? আর যিনি মুক্ত নহেন, বদ্ধ, তাঁহার পক্ষে অনন্তজ্ঞান ও শক্তি সম্ভবে না। অতএব একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন ইহা অসম্ভব। মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ (১,৯৩) উভয়থাপ্যসৎকরত্বম (১,৯৪)

সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে এই। পাপ পুণ্যের দণ্ডবিধাতৃত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা করেন, যে যদি ঈশ্বর কর্ম্মফলের বিধাতা হয়েন, তবে তিনি অবশ্য কর্ম্মানুযায়ী ফলনিষ্পত্তি করিবেন। পুণ্যের শুভ ফল, পাপের অশুভ ফল অবশ্য প্রদান করিবেন। যদি তিনি তাহা না করেন, স্বেচ্ছামতে ফল নিষ্পত্তি করেন, তবে কি প্রকারে ফল বিধান

করিতে পারেন ? যদি সুবিচার করিয়া ফল বিধান না করেন, তবে আত্মোপকারের জন্য করাই সম্ভব। তাহা হইলে তিনি সামান্য লৌকিক রাজার ন্যায় আত্মোপকারী, এবং সুখ দুঃখের অধীন। যদি তাহা না হইয়া কর্ম্মানুযায়ীই ফল নিষ্পত্তি করেন, তবে কেন কর্ম্মকেই ফলবিধাতা বল না ? ফলনিষ্পত্তির জন্য আবার কর্ম্মের উপর ঈশ্বরানুমানের প্রয়োজন কি ?

অতএব সাংখ্যকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোরতর নাস্তিক। অথচ তিনি বেদ মানেন।

ঈশ্বর না মানিয়াও কেন বেদ মানেন, তাহা আমরা পর পরিচ্ছেদে দেখাইব। প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ সাধারণ পাঠকের প্রীতিকর হইবে না বলিয়াই; আমরা এই প্রবন্ধের পরিচ্ছেদ গুলিকে সংক্ষিপ্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। সাংখ্যের এই নিরীশ্বরতা বৌদ্ধ ধর্ম্মের পূর্ব্বসূচনা বলিয়া বোধ হয়।

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের একটি কথা বাকি রহিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনেকে বলেন কাপিল দর্শন নিরীশ্বর নহে। এ কথা বলিবার কিছু একটু কারণ আছে। তৃ, অ, ৫৭, সূত্রে সূত্রকার বলেন, "ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃ সিদ্ধা।" সে কি প্রকার ঈশ্বর ? "সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্ব কর্ত্তা," ৩,৫৬। তবে সাংখ্য নিরীশ্বর হইল কই ?

বাস্তবিক, এ কথা ঈশ্বর সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই। সাংখ্যকার বলেন জ্ঞানেই মুক্তি, আর কিছুতেই মুক্তি নাই। পুণ্যে, অথবা সত্ত্ববিশাল ঊর্দ্ধ লোকেও মুক্তি নাই, কেন না তথা হইতে পুনর্জ্জন্ম আছে, এবং জরামরণাদি দুঃখ আছে। শেষ এমনও বলেন, যে জগৎ কারণে লয় প্রাপ্ত হইলেও মুক্তি নাই, কেননা তাহা হইতে জলমগ্নের পুনরুত্থানের ন্যায় পুনরুত্থান আছে। [৫৫৪] সেই লয় প্রাপ্ত আত্মা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, যে তিনি "সর্ব্ববিৎ এবং সর্ব্ব কর্ত্তা।" ইহাকে যদি ঈশ্বর বলিতে চাও, তবে ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধ। কিন্তু ইনি জগৎ স্রষ্টা বা বিধাতা নহেন। "সর্ব্ব কর্ত্তা" অর্থে সর্ব্ব শক্তিমান্, সর্ব্ব সৃষ্টিকারক নহে।
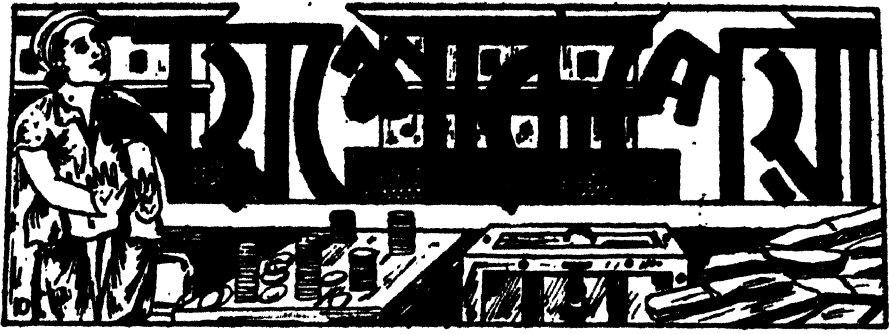
বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃত নাটক একখানিও নাই। যে যে গুণ থাকাতে হাম্লেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো প্রভৃতি জগতের মধ্যে মনুষ্যের অসামান্য কার্য্যরূপে পরিগণিত হইতেছে, সে গুণ বাঙ্গালা কোন নাটকেই নাই। একটি গুণের কথা বলি। মানসিক পরিবর্ত্তন। একজন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি অপর এক বা বহু ব্যক্তি দ্বারা ভাল পথে বা মন্দ পথে কিরূপে যায় তাহা ভাল নাটকে সুন্দর রূপে চিত্রিত থাকে। ওথেলো—সদাশয় ওথেলো—যে অতি অল্পকাল মধ্যে স্ত্রী-ঘাতক হইবেন; অনন্ত চিন্তাশীল হাম্লেট যে স্বীয় জীবনের জীবন ওফিলিয়াকে বিসর্জ্জন করিবেন; সেই প্রণয়িনীর পিতাকে স্বহস্তে বধ করিবেন; কার্য্য-কুশল রাজসম্মানধারী ম্যাকবেথ যে নিদ্রিত, গৃহাগত, অন্নদাতা রাজাকে স্বগৃহে হত্যা করিবেন, তাহা পূর্ব্বে জানা যায় না; কি কৌশলে, কিরূপে, মানব চিত্তের এরূপ পরিবর্ত্তন হয়, নাটকে তাহাই চিত্রিত থাকে। বাঙ্গালা কোন নাটকেই তাহা নাই।

* নয়শো রূপেয়াতেও তাহা নাই। কিন্তু ইহাতে অন্য কতকগুলি গুণ আছে।

১। গ্রন্থকার অতি সহজ ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু এরূপ চেষ্টারও সম্যক প্রশংসা করা উচিত। সংস্কৃতের গৌরব এত অধিক হইয়াছে যে এখন আর প্রায় সহ্য হয় না। নাটকের কামিনী, মোহিনী, কমলা, বিমলা, সকলেই স্বামীকে "জীবিতেশ্বর" বলিয়া সম্বোধন করেন, "সুশীতলসমীরসঞ্চারিতসুখদসায়ংকালে প্রাসাদোপরি পদচারণা" করেন; "শাক সূপ পূপ পায়স পিষ্টকাদি" ভোজন করেন; "দুগ্ধফেণনিভ" শয্যায় শয়ন করেন। তাঁহারা যাহাই করুন না কেন,—আমরা তাঁহাদের কথোপকথনে জ্বালাতন হইয়াছি। তাহাতেই এই নয়শো রূপেয়া গ্রন্থকারের প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

---

* নয়শো রূপেয়া। কলিকাতা, স্মিথ কোম্পানী।

কিন্তু গ্রন্থকার সংস্কৃত বাহুল্য এড়াইতে গিয়া গ্রাম্যতা দোষে পতিত হইয়াছেন ; একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে ;—

শশীর মা। "বাছা তুই ছেলে মানুষ, তাই লোকে বলে আর তাই শুনিস্ যে সতীনকে বুনের মত ভালবাসে। সর্ব্বস্ব যাক্, * * মরে যাক্ তাও প্রাণে সয়, হাসতে হাসতে * * ভাগ দেয় না জানি সে কেমন মেয়ে। সরলা মা তুই, আমার সন্তানের বয়সী, আমার শশী থাক্‌লে এই তোর মত হত, তবু আমার মনের কথা দুটি একটি তোকেই বলি, তোকে বলে যেন আমার তৃপ্তি হয়। বাছা সকল তার ভাগ দেওয়া যায় * * * ভাগ দেওয়া যায় না। আহাহা! আমার * * আমার বড় সাধের * *!"

ভর্ত্তা শব্দের অপভ্রংশে যে শব্দ, তাহাই আমরা লুপ্ত রাখিয়াছি। তাহা গ্রাম্যতা ভিন্ন অন্য দোষে দুষ্ট নহে। উহা পাঁচবার ব্যবহার না করিয়া ঐ শব্দের পরিবর্ত্তে "সোয়ামী" পদ ব্যবহার করিলে কোন ক্ষতি হইত না অথচ এত গ্রাম্য দেখাইত না।

এই উপলক্ষে আর একটি কথা বলিতে হইতেছে। গ্রন্থের এক এক স্থানে অশ্লীল পদ ব্যবহার করা হইয়াছে ; যাঁহাদের মুখ হইতে সেই সকল কথা নির্গত হইয়াছে তাঁহাদের তদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করাই সম্ভব কিন্তু তাহাতেই গ্রন্থকারের মার্জ্জনা হয় না। অশ্লীলতা দোষের উচ্ছেদ করণ জন্য অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক বিদ্রূপ করিলে, কেহই কখন কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না ; তাহাতে অশ্লীলতার বৃদ্ধি ভিন্ন আর হ্রাস হইবে না।

২। গ্রন্থকার যেমন শব্দাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়াছেন সেইরূপ অলঙ্কারাড়ম্বরও পরিত্যাগ করিয়াছেন। নায়িকাগণের কর্ণের অলঙ্কার, সীমন্তের অলঙ্কার, ভাল বলি বলিয়া তাঁহাদের মুখের রাশি রাশি অলঙ্কার আমরা সহ্য করিতে পারি না। 'নলিনীলোচনে' 'বিধুবদনে' 'শিথিনিশ্রবণে' আমরা জর জর হইয়াছি; 'বচন রচন' আর সহ্য হয় না।

কিন্তু এ কথাও বলিতে হয় যে গ্রন্থকার অলঙ্কারাধিক্য দোষ এড়াইতে গিয়া অতি দূরে পলায়ন করিয়াছিলেন। নয়শো রূপেয়া গ্রন্থে বোধ হয় দুই তিনটি উপমা বা রূপক নাই। এদিকে আবার পাছে শব্দ-প্রাণ রস-চাতুর্য্য ব্যবহার করিতে হয় এই ভয়ে গ্রন্থকার নাটকে একটি গান দেন নাই, এক ছত্র ছন্দোবদ্ধ কথা দেন নাই। চপলা বিমলাকে বলিতেছেন।—

"টাকায় সব হয়। দিদী ও শ্লোকটি জানিস্ কি? টাকা দিলে বাঘের দুধ মিলে। মাইরি আমি ভুলে গিয়েছি।" শ্লোকময়ী বাঙ্গালীর মেয়ে গ্রন্থকারের হাতে

পড়িয়া বিদ্যাসুন্দরের শ্লোক ভুলিয়া গেল। ইহাতেও আহ্লাদ হয়। শাদা কথায় মনের রসভাব প্রকাশ করিতে দেখিলে আমরা আহ্লাদিত হই।

৩। গ্রন্থের প্রধান গুণ নিঃস্বার্থ বিশুদ্ধ প্রণয় ভাব ব্যক্তি। এমন সব গুণেই আমরা গ্রন্থকারগণের শত দোষ মার্জনা করিতে পারি। আমরা গ্রন্থ হইতে একটি দৃশ্য তুলিতে ইচ্ছা করি।

সরলা ও রঞ্জনে ছেলে বেলা হইতে প্রণয় হইয়াছিল। সরলা যে বাড়ীর মেয়ে রঞ্জন সেই বাড়ীর দৌহিত্র। রঞ্জন সরলার পিতা রামধন মজুমদারের জ্ঞাতি ভাগিনেয়। সরলা রঞ্জন দাদার কাছে পড়িত; তাহাতেই ক্রমে উভয়ে অনুরাগ হয়। রামধন মজুমদার শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ—অর্থপিশাচ—সরলাকে ব্যবসায়ের ভাল দ্রব্য বলিয়া বোধ করিত; যে অধিক মূল্য দিবে তাহাকেই বিক্রয় করিবে স্থির করিয়াছিল; রঞ্জন এই সকল জানিয়া আপনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পণ প্রদানে স্বীকৃত হইল। রামধন টাকা পাইতেছে, সম্পর্কবিরোধে কোন প্রতিবন্ধকতা বোধ করিতে পারিল না বরং গ্রামের বিদ্যাভূষণের মত কোন প্রকারে গ্রহণ করিল; বিবাহের সকলই স্থির। সরলা এই বিবাহ ঠিক ধর্ম্মসঙ্গত হইতেছে না বোধে মনে বড়ই কুন্ঠিত হইল, প্রাণে ব্যথিত হইল; ব্যথার ব্যথী রঞ্জনকে এ ব্যথার কথা জানাইবার জন্য তাঁহাকে কোন নির্জ্জন স্থানে আহ্বান করিল। সরলা আপনার কোমল হৃদয় যতদূর পারিল দৃঢ়বদ্ধ করিয়া আসিয়াছিল, "যাকে ভালবাসি সে যাহা বলিবে তাহাই বুঝিয়া যাইব; আজ ভং হতে দিব না।" সরলা এইরূপ ভাবিয়া আসিয়া ছিল। পাঠক দেখুন সরলা কি বলে। তাহার নিঃস্বার্থ প্রণয়ের,—বিশুদ্ধ প্রণয়ের—প্রগাঢ়তা উপলব্ধি করুন্ আর তাঁর সরল হৃদয়ের সেই ব্যথায় একটু ব্যথী হউন।

"রঞ্জন। * * এই যে কে আস্‌ছে, সরলাই বটে।

(সরলার প্রবেশ)

সরলা, তুমি এখনও কাহিল আছ, আমার হাত ধোরে দাঁড়াও।

সরলা। না, তুমি একটু তফাত দাঁড়াও, আমার খুব নিকটে এস না।

রঞ্জন। বিষয়টা কি বল দেখি? আমার ত ভয় কোর্‌ছে। তুমি ভয়ে রাত্রে একা বেরতে পার না, পূর্ব্বে লজ্জায় আমার সঙ্গে দিনের বেলায় কথা বৌল্‌তে পার নাই, আজ এই রাত্রে—

সরলা। শোন, আমার অপরাধ নাই। বিপদে পড়্‌লে লোকের ভয়ও থাকে না লজ্জাও থাকে না।

রঞ্জন। সে কি! বিপদ আবার কি! আমার শুনে যে ভয়ে গা কাঁপ্‌ছে। সরলা চল একটু তফাত্‌ যাই। কাল্‌ বাড়ীতে ক্রিয়া বোলে এখনও কেউ কেউ ঘুমায় নাই, কে দেখ্‌বে।

সরলা। দেখে আর কি কর্‌বে? একটু ঠাট্টা কোর্‌বে। তা আমি সহ্য কর্‌তে পারি। যার সঙ্গে কাল্‌কে এমনি সময় থাক্‌লে দোষ না হয়, তার সঙ্গে নয় আজ্‌কে দুটা কথাই বোল্লেম।

রঞ্জন। বিপদটা কি?

সরলা। কাল্‌কে তোমায় আমায় একটা কাণ্ড হবে।

রঞ্জন। বে হবে তাই বোল্‌ছ?

সরলা। তাই বল্‌ছি। তা নাকি সম্পর্কে বাধে?

রঞ্জন। এই কথা, তবু ভাল। তুমি ক্ষেপেছ নাকি?

সরলা। আমার তোমার কাছে একটি মিনতি, শুন্‌বে ত?

রঞ্জন। অবশ্য শুন্‌ব।

সরলা। আমার কথাগুলি মন দিয়ে শুন্‌তে হবে, আর হেসে উড়িয়ে দিতে পার্‌বে না।

রঞ্জন। আচ্ছা বল শুন্‌ছি।

সরলা। সম্পর্কে নাকি বাধে?

রঞ্জন। আমি স্বরূপ বোল্‌ছি আমি ঠিক জানি না। কেউ বলে বাধে, কেউ বলে বাধে না। আমাদের এ প্রদেশের মধ্যে বিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ ঠাকুর ব্যবস্থা দিয়েছেন যে হতে পারে।

সরলা। তুমি না তাঁরে কিছু টাকা দিয়েছ?

রঞ্জন। তা কি তুমি জান না, পণ্ডিতের কাছে ব্যবস্থা নিতে গেলেই টাকা দিতে হয়।

সরলা। তাঁকে যখন টাকা দিতে চাও, তার আগেও কি তাঁর এ মত ছিল?

রঞ্জন। কথাটা হচ্ছে এই, আমাদের শাস্ত্রে—

সরলা। তোমার পায়ে পোড়্‌ছি আমার কথার উত্তর দাও।

রঞ্জন। না, তখন আর এক রকম মত ছিল। তাই কি?

সরলা। তা এই যে তোমার কাছ্‌থেকে টাকা খেয়ে তোমার মনোমত ব্যবস্থা দিয়েছেন।

রঞ্জন। তা নয়। আমার কাছ থেকে টাকা খেয়ে আমার মনোমত ব্যবস্থা অভ্যাস কোরে দিয়েছেন।

সরলা। তুমি আমাকে বঞ্চনা কোর্‌বে না আমার মাথা খাও।

রঞ্জন। না।

সরলা। তোমার নিজের মনের বিশ্বাস কি বল দেখি ?

রঞ্জন। একটু মনোযোগ দিয়ে শোন। আমার নিজের মনের বিশ্বাস যে, ঠিক শাস্ত্রসম্মত নয়, কিন্তু তাই বোলে যে বেতে কিছু দোষ হবে তা আমার বিশ্বাস হয় না। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের কতকগুলি লোক ছাড়া আর তাবৎ দেশের লোক আপন খুড়তুত, পিস্‌তুত, মামাত বুনকে বে করে। তাদের সুন্দর সরল সন্তান হয়। তাদের মধ্যে আমাদের মত কত শত বিদ্বান, ধার্ম্মিক লোক হোয়ে থাকে। যদি এ সমুদয় বিবাহ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত না হোত, তবে এরূপ কখনই হোত না। তুমি আমার দূর সম্পর্কের মামাত বুন, তোমার সঙ্গে বে হোলে দোষ হবে ?

সরলা। যদি তোমার মত আমার বিদ্যা থাক্‌তো তবে হয়ত আমার ও সন্দ হোতো না।

রঞ্জন। বিশেষতঃ তোমার মা বাপ, গুরু পুরোহিতে, কুটুম্ব গ্রামস্থ লোকে তোমায় আমায় বে দিচ্ছেন, দোষ হয় তাদের হবে, তোমার আমার কি ?

সরলা। মা বাপে টাকা নিয়েছেন, গুরু পুরোহিতে টাকা নিয়েছেন, গ্রামস্থ লোকে ফলার খাবে। যাদের বে, ভোগ কেবল তাদের।

রঞ্জন। তবে তুমি এখন বল কি ? বে বন্ধ কোর্‌বো ?

সরলা। সম্পর্কে যদি বাধে তবে তুমি আমায় নিয়ে কর্‌বে কি ?

রঞ্জন। তবে তোমার কি ইচ্ছা আমি বেতে ক্ষান্ত দেব।

সরলা। তা হোলে তোমার পক্ষে ভাল হয়।

রঞ্জন। তোমার পক্ষে ?

সরলা। তা শুনে তোমার দরকার কি ?

রঞ্জন। তা বটে। কিন্তু তা না শুন্‌লে আমি তোমার কথায় উত্তর দিব কিরূপে ?

সরলা। আমার তা হলে জ্বালা যন্ত্রণা সব ঘুচে যায়।

রঞ্জন। তা হয় ত এখনি বন্ধ কর। আমি ত বোলেছি সরলা, তুমি আমার দিকে তাকাইও না। তবে আমি জন্মের মত বিদায় হই ? কিন্তু বিদায় হবার আগে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার আজ এরূপ ভাব দেখ্‌ছি কেন ?

সরলা। কিরূপ ভাব ?

রঞ্জন। তুমি আমার উপর রাগ কোর্‌লে কেন ?

সরলা। আমি তোমার উপর রাগ করিনি।

রঞ্জন। রাগ না কর, আমার উপর যদি কিছু স্নেহ মমতা ছিল তা গেল কেন ?

সরলা। কিসে বুঝ্‌লে ?

রঞ্জন। এই যে বোল্লে আমার সঙ্গে তোমার বে না হলে তোমার জ্বালা যন্ত্রণা সব ঘুচে যাবে।

সরলা। হাঁ তা যায়।

রঞ্জন। সরলা তুমি আমাকে নিয়ে খেলা কোরো না। আমার ধন, প্রাণ, মান, মন, যথাসর্ব্বস্ব তোমায় সঁপেছি। তুমি প্রকারান্তরে বোল্‌ছ আমার উপর স্নেহ মমতা কিছু কমে নাই, আজ যদি আমি বে তে ক্ষান্ত দেই, কাল তোমাকে একজন বে করে নে যাবে। তখন বল দেখি আত্মহত্যা ব্যতীত আমার আর কি উপায় থাক্‌বে।

সরলা। তোমার খুব কষ্ট হবে। তা না হলে আর গোল কি ?

রঞ্জন। তোমার কষ্ট হবে না।

সরলা। হবার আগে ঔষধ খাব।

রঞ্জন। তবে আমায় কেন সে ঔষধ একটু দেও না ?

সরলা। তুমি অমন কথা মুখের আগায় এন না। তুমি আমার চেয়ে সহস্র গুণে ভাল, আর একটি বে কোরে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। আমার পৃথিবীতে থেকে ফল কি ?

রঞ্জন। তবে তুমি প্রাণত্যাগ কোর্‌বে ?

সরলা। আর আমার পথ কি আছে ? তুমি ক্ষান্ত দিলে, কাল্ বাবা আমারে আর একজনের গলায় গেঁথে দেবেন।

রঞ্জন। তবু আমাকে বে কোর্‌বে না ?

সরলা। আমি কোর্‌তে চাইলে কি হয়, তুমি আমাকে নিয়ে কি কোর্‌বে ?

রঞ্জন। কেন বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

সরলা। আত্মহত্যা না কি বড় পাপ।

রঞ্জন। সর্ব্বনাশ অমন কথা মুখে আন্‌তে নাই, অমন পাপ পৃথিবীতে আর নেই।

সরলা। তাইত। তুমি যদি এক কায কর তবে এ পাপের দায় হোতে এড়াই। তুমি যদি আমারে—।

রঞ্জন। কি বোল্‌ছিলে বল।

সরলা। তুমি যদি আমারে বে কর।

রঞ্জন। তুমি আবল তাবল বক্‌ছো কেন ?

সরলা। শোন কিন্তু দুই জনে—।

রঞ্জন। আবার চুপ কোর্‌লে কেন?

সরলা। দুই জনে—।

রঞ্জন। আবার চুপ কোর্‌লে কেন?

সরলা। (অধোবদন) দুই জনে ভাই বোনের মত থাক্‌বো। তুমি আর একটা .বে কোরো। আমি তোমার কাছে থাক্‌ব। আমি তার চেয়ে আর সুখ চাইনে।"

এই দৃশ্যে কিঞ্চিৎ গুণ আছে বলিয়াই আমরা উদ্ধৃত করিলাম, গুণের পরিমাণ পাঠকের রুচি ও বিবেচনার অধীন।

৪। নাটকখানিতে অল্প সৃষ্টি চাতুর্য্যও আছে। সাতুলাল একটি অপূর্ব্ব জীব; অপূর্ব্ব বটে কিন্তু অভাবনীয় নহে। সাতুলালের চরিত্রে এমন কিছু গৌরব নাই যে গ্রন্থকার স্পর্দ্ধা করিতে পারেন; সাতুলাল গাঁজার নিমচাঁদ, সুতরাং নিমচাঁদের ছোট ভাই; এ কথাও বলা যায় যে এখনকার নাটককারগণের পক্ষে এটি বড় অল্প কথাও নহে। যে দেশে রাম লক্ষ্মণ সীতা শকুন্তলার সৃষ্টি হইয়াছে সেই দেশে নিমচাঁদ এখন আধিপত্য করিতেছে; সাতুলাল সেই সাহসে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়াছেন; সাতুলালেরও শরীরের পূর্ণতা আছে; মুখের চেহারা দেখিলেই চেনা যায়; দূর হতে স্বর শুনিলে বুঝিতে পারা যায়; নিকটে বসিয়া থাকিলে তাহার কথা শুনিয়া হাসিতে হয়, তাহার সেই আহ্লাদের প্রকৃতিতে আবার যখন ক্রন্দন দেখি তখন তাহার প্রতি একটী অপূর্ব্ব প্রীতি হয়, সাতুলালের এত গুণ আছে যে, সে নিমচাঁদের কাঁধে হাত দিয়া দাঁড়াইবে বড় আশ্চর্য্য নয়। আমরা সমালোচন শেষ করিলাম। গুপ্ত গ্রন্থকারের এই খানি যদি প্রথম ফল হয় আমাদের ভরসা হইতেছে, তিনি ভাষা ও রস পরিচালনে আরো একটু শিক্ষিত হইলে তাঁহার গ্রন্থ আদরণীয় হইবে।

রামী। সখি, ঋতুরাজ বসন্ত আসিয়া ধরাতলে উদয় হইয়াছেন; আইস আমরা বসন্ত বর্ণনা করি। বিশেষ আমরা উভয়েই বিরহিণী; পূর্ব্বগামিনী বিরহিণীগণ চিরকাল বসন্ত বর্ণন করিয়া আসিয়াছেন, আইস আমরাও তাই করি।

বামী। সই, ভাল বলিয়াছ। আমরা বালিকা বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিয়া কেবল কুট্‌নো কুটিয়া মরিলাম, আইস অদ্য কাব্যালোচনা করি।

রামী। সই! তবে আরম্ভ করি। সখি! ঋতুরাজ বসন্তের সমাগম হইয়াছে। দেখ, পৃথিবী কেমন অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছেন। দেখ, চূতলতা কেমন নব মুকুলিত—

বামী। বৃক্ষে বৃক্ষে শজিনা খাড়া বিলম্বিত—

রামী। মলয় মারুত মৃদু মৃদু প্রধাবিত—

বামী। তদ্বাহিত ধূলায় দন্ত কিচ্‌কিচিত।

রামী। দূর ছুঁড়ী—ওকি! শোন্‌। ভ্রমরগণ পুষ্পের উপর গুণ গুণ করিতেছে—

বামী। মাছিগণ ভাতের উপর ভন ভন করিতেছে—

রামী। বৃক্ষোপরে কোকিলগণ পঞ্চম স্বরে কুহু কুহু করিতেছে—

বামী। গাজন্‌ তলায় ঢাকিগণ অষ্টমস্বরে চড় চড় করিতেছে।

রামী। না ভাই, তোকে নিয়ে বসন্ত বর্ণন হয় না। আমি শ্যামীকে ডাকি। আয় সই শ্যামি, আমরা বসন্ত বর্ণনা করি।

(শ্যামী আসিল)

শ্যামী। আমি ত সখি তোমাদের মত ভাল লেখা পড়া জানি না; একটু একটু জানি মাত্র; আমি সকল বুঝিতে পারিব না—আমাকে মধ্যে মধ্যে বুঝাইয়া দিতে হবে।

রামী। আচ্ছা। দেখ সখি, বসন্ত কি অপূর্ব্ব সময়! কেমন চূত লতা সকল নব মুকুলিত—

শ্যামী। সই, আঁবের গাছই দেখিয়াছি। আঁবের লতা কোন গুলা?

রামী। তা সই আমি জানি না। কিন্তু চূত লতা ভিন্ন চূত বৃক্ষ কোথায় পড়িয়াছ? তবে চূত লতাই বলিতে হইবে—চূত বৃক্ষ বলা হইবে না।

শ্যামী। তবে বল।

রামী। চূত লতিকা নব মুকুলিত হইয়া—

শ্যামী। সই! এই বলিলে চূত লতা—আবার লতিকা হইল কেন?

রামী। আরও কিছু মিষ্ট হইল। চূত লতিকা নব মুকুলিত হইয়া চারিদিকে সৌগন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে—

রামী। ভাই, আঁবের বোল যে বসন্ত কালে চুঁইয়ে গিয়া কড়েয়া ধরে।

শ্যামী। বলিলে কি হয়, কেমন মিষ্ট হইল দেখ দেখি।

রামী। তাহাতে ভ্রমরগণ মধু লোভে উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে, শুনিয়া আমাদিগের প্রাণ বাহির হইতেছে।

শ্যামী। আহা! সখি, সত্যই বলিয়াছ। সই, ভ্রমর কাকে বলে?

রামী। মর্ নেকি, তাও জানিস্‌নে? ভ্রমর বলে ভোমরাকে।

শ্যামী। ভোম্‌রা কোন গুলো ভাই?

রামী। ভোম্‌রা বলে ভিম্‌রুল্‌কে?

শ্যামী। তা ভাই ভিম্‌রুল্ আঁবের বোল দেখে পাগল হয় কেন? ভিম্‌রুলের পাগলামি কেমন তর? ওরা কি আবোল তাবোল বকে?

রামী। কে বলেছে পাগল হয়?

শ্যামী। ঐ যে তুমি বলিলে "উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে,"

রামী। কোন্ শালী আর তোদের কাছে বসন্ত বর্ণনা করিবে।

শ্যামী। ভাই রাগ কর কেন? তুমি বেশী লেখা পড়া শিখেছ, আমি কম শিখেছি—আমায় বুঝাইয়া দিলেই ত হয়। সকলেই কি তোমার মত রসিকে?

রামী। (সাহঙ্কারে) আচ্ছা, তবে শোন্। ভ্রমরগণ মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে। তাহাদিগের গুণ গুণ রবে আমাদের প্রাণ বাহির হইতেছে।

শ্যামী। সই, ভোম্‌রার ডাক্ "গুণ্ গুণ্" না "ভোঁ ভোঁ?"

রামী। কবিরা বলেন, "গুণ্ গুণ্।"

শ্যামী। তবে গুণ গুণই বটে। তা, উহাতে আমাদের প্রাণ বাহির হয় কেন? ভিম্‌রুল কামড়াইলে প্রাণ বাহির হয় জানি, কিন্তু ভিম্‌রুল ডাকিলেও কি মরিতে হইবে?

রামী। এ পর্য্যন্ত সকল বিরহিণীগণ গুণ্ গুণ্ রবে মরিয়া আসিতেছে; তুই কি পীর যে মরবি না?

শ্যামী। আচ্ছা ভাই শাস্ত্রে যদি লেখে ত না হয় মরিব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,

কেবল কি ভিম্‌রুলের ডাকে মরিতে হইবে, না বোলতা মৌমাছি গুব্‌রে পোকার ডাক শুনিলেও অন্তর্জলে শুইব ?

রামী। কবিরা শুধু ভ্রমরের রবেই মরিতে বলেন।

বামী। কবিদের বড় অবিচার। কেন গুব্‌রে পোকা কি অপরাধ করেছে ?

রামী। তোর মর্‌তে হয় মরিস্ এখন শোন্।

বামী। বল।

রামী। কোকিলগণ বৃক্ষে বসিয়া পঞ্চমস্বরে গান করিতেছে।

শ্যামী। পঞ্চমস্বর কি ভাই ?

রামী। কোকিলের স্বরের মত।

শ্যামী। আর কোকিলের স্বর কেমন ?

রামী। পঞ্চমস্বরের মত।

শ্যামী। বুঝিয়াছি। তার পর বল।

রামী। কোকিলগণ বৃক্ষে বসিয়া পঞ্চমস্বরে গান করিতেছে; তাহাতে বিরহিণীর অঙ্গ জ্বর জ্বর হইতেছে।

বামী। আর কুঁক্‌ড়োর পঞ্চমস্বরে অঙ্গ কেমন করে ?

রামী। মরণ আর কি, কুঁক্‌ড়োর আবার পঞ্চমস্বর কি লো ?

বামী। আমার তাতেই অঙ্গ জ্বর জ্বর হয়। কুঁক্‌ড়া ডাকিলেই মনে হয় যে তিনি বাড়ী এলেই আমায় ঐ সর্ব্বনেশে পাখি রাঁধিয়া দিতে হবে।

রামী। তার পর মলয় সমীরণ। মৃদু মৃদু মলয় সমীরণে বিরহিণী শিহরিয়া উঠিতেছে।

শ্যামী। শীতে ?

রামী। না—বিরহে। মলয় সমীরণ অন্যের পক্ষে শীতল, কিন্তু আমাদের পক্ষে অগ্নিতুল্য।

বামী। সই, তা সকলের পক্ষেই। এই চৈত্র মাসের দুপুরে রৌদ্রের বাতাস্ আগুনের হল্কা বলিয়া কাহার বোধ হয় না ?

রামী। ওলো আমি সে বাতাসের কথা বলিতেছি না।

শ্যামী। বোধ হয় তুমি উত্তুরে বাতাসের কথা বলিতেছ। উত্তুরে বাতাস যেমন ঠাণ্ডা, মলয় বাতাস তেমন নয়।

রামী। বসন্তানিল স্পর্শে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

বামী। গায়ে কাপড় না থাকিলে উত্তুরে বাতাসেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

রামী। মর ছুঁড়ি, বসন্তকালে কি উত্তুরে বাতাস বয়, যে আমি বসন্ত বর্ণনায় উত্তুরে বাতাসের কথা বলিব ?

বামী। উত্তুরে বাতাসই এখন বয়। দেখ এখনকার যত ঝড় সব উত্তুরে। আমার বোধ হয়, বসন্ত বর্ণনে উত্তুরে বাতাসের প্রসঙ্গ করাই উচিত। আইস আমরা বঙ্গদর্শনে লিখিয়া পাঠাই যে, ভবিষ্যতে কবিগণ বসন্ত বর্ণনে মলয় বাতাস ত্যাগ করিয়া উত্তুরে ঝড়ের বর্ণনা করেন।

রামী। তাহা হইলে বিরহীদের কি উপায় হইবে? তাহারা কি লইয়া কাঁদিবে?

শ্যামী। সখি, তবে থাক। এক্ষণে তোমার বসন্ত বর্ণনা—উহুঃ উহুঃ সখি মোলেম, মোলেম, গেলেম রে! গেলেম রে!

(ভূমে পতন চক্ষু মুদিত)

রামী। কেন, কেন, সই কি হয়েছে? হঠাৎ অমন হলে কেন?

শ্যামী। (চক্ষু বুজিয়া) ঐ শুনিলে না? ঐ সেওড়া গাছে কোকিল ডাকিয়াছে।

রামী। সখি! আশ্বস্তা হও, আশ্বস্তা হও,—তোমার প্রাণকান্ত শীঘ্রই আসিবেন। সই, আমারও ঐরূপ যন্ত্রণা হইতেছে। নাথের সন্দর্শন ভিন্ন আমার বাঁচা ভার হইয়া উঠিয়াছে। (চক্ষু মুছিয়া) পাড়ার সকল পুকুরের যদি জল না শুকাইত, তবে এতদিন ডুবিয়া মরিতাম। হে হৃদয়বল্লভ! অয়ি জীবিত-নাথ, জীবিত-বল্লভ, জীবিতেশ্বর! হে রমণীজন-মনোমোহন! হে নিশা-শেযোন্মেষোন্মুখ-কমলকোরকোপমোত্তেজিতহৃদয়-সূর্য্য! হে অতলজলদলতলন্যস্তরত্নরাজীবন্মহামূল্য-পুরুষরত্ন! হে কামিনীকণ্ঠবিলম্বিত-রত্নহারাধিক-প্রাণাধিক! আর প্রাণ বাঁচে না। আমি অবলা, সরলা, চঞ্চলা, বিকলা, দীনা, হীনা, ক্ষীণা, পীনা, নবীনা, শ্রীহীনা,—আর প্রাণ বাঁচে না। আর কত দিন তোমার আশাপথ চাহিয়া থাকিব? যেমন সরোবরে সরোজিনী ভানুর আশা করে, যেমন কুমুদিনী কুমুদবান্ধবের আশা করিয়া থাকে, যেমন চাতক মেঘের জলের আশা করিয়া থাকে—আমি তেমনি তোমার আশা করিতেছি।

শ্যামী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) যেমন রাখাল, হারাণ গোরুর আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন বালকে ময়রার দোকান হইতে লোক ফিরিবার আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন অশ্ব তৃণাহরক গ্রাস কটের আশা করিয়া থাকে, হে প্রাণ-বন্ধো! আমি তেমনি তোমার আশা করিয়া আছি। যেমন মাছ ধুইতে গেলে পরিচারিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মার্জ্জার গমন করে, তেমনি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমার মন গিয়াছে। যেমন উচ্ছিষ্টাবশেষ ফেলিতে গেলে, বুভুক্ষু কুক্কুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, আমার অবশ চিত্ত তেমনি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছে। যেমন কলুর ঘানিগাছে প্রকাণ্ডাকার বলদ ঘুরিতে থাকে, তেমনি আশা নামে আমার

প্রকাণ্ড বলদ, তোমার প্রণয়রূপ ঘানি গাছে ঘুরিতেছে। যেমন লোহার চাটুতে তপ্ত তৈলে কই মাছ ভাজে, তেমনি এই বিরহ-চাটুতে বসন্তরূপ তপ্ত তৈলে আমার হৃদয়রূপ কই মাছকে অহরহ ভাজিতেছে। যেমন এই বসন্ত কালের তাপে সজিনা খাড়া ফাটিতেছে, তোমার বিরহ সন্তাপে তেমনি আমার হৃদয়-খাড়া ফাটিতেছে। যেমন এক লাঙ্গলে যোড়া গোরু যুড়িয়া ক্ষেত্রকে চাসা ক্ষতবিক্ষত করে, তেমনি এক প্রেম লাঙ্গলে বিরহ এবং বারস্ত্রীভক্তিরূপ যোড়া গোরু যুড়িয়া আমার স্বামী চাসা আমার হৃদয় ক্ষেত্রকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছেন। কথায় আর কি বলিব। বিরহের জ্বালায় আমার ডালে মুণ হয় না, পানে চূণ হয় না। ঝোলে ঝাল হয় না, ক্ষীরে মিষ্ট হয় না। সখি বিরহের দুঃখ যেদিন মনে হয়, সেদিন আমি তিন বেলা বই খাইতে পারি না; আমার দুধের বাটী অমনি পড়িয়া থাকে। (চক্ষু মুছিয়া) সখি, তোমার বসন্ত বর্ণনা সমাপ্ত কর, দুঃখের কথায় আর কাজ নাই।

রামী। আমার বসন্ত বর্ণনা শেষ হইয়াছে। ভ্রমর কোকিল, এবং মলয় মারুত এবং বিরহ এই চারিটির কথাই বলিয়াছি আর বাকি কি?

বামী। দড়ি আর কলসী।

উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুই জনে উদ্যানমধ্যে লতামণ্ডপতলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তখন প্রাচীন নগরী তাম্রলিপ্তির* চরণ ধৌত করিয়া, অনন্ত নীল সমুদ্র মৃদু মৃদু নিনাদ করিতেছিল।

তাম্রলিপ্তি নগরীর প্রান্তভাগে, সমুদ্রতীরে এক বিচিত্র অট্টালিকা ছিল। তাহার নিকট একটি সুনির্ম্মিত বৃক্ষবাটিকা। বৃক্ষবাটিকার অধিকারী ধনদাস নামক একজন শ্রেষ্ঠী। শ্রেষ্ঠীর কন্যা হিরণ্ময়ী লতামণ্ডপে দাঁড়াইয়া এক যুবা পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন।

হিরণ্ময়ী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি ইপ্সিত স্বামীর কামনায় একাদশ বৎসরে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত পঞ্চবৎসর, এই সমুদ্রতীরবাসিনী সাগরেশ্বরী নাম্নী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোরথ সফল হয় নাই। প্রাপ্তযৌবনা কুমারী কেন যে এই যুবার সঙ্গে একাকিনী কথা কহেন, তাহা সকলেই জানিত। হিরণ্ময়ী যখন চারি বৎসরের বালিকা, তখন এই যুবার বয়ঃক্রম আট বৎসর। ইহার পিতা শচীসুত শ্রেষ্ঠী ধনদাসের প্রতিবাসী, এজন্য উভয়ে একত্র বাল্যক্রীড়া করিতেন। হয় শচীসুতের গৃহে, নয় ধনদাসের গৃহে, সর্ব্বদা একত্রে সহবাস করিতেন। এক্ষণে যুবতীর বয়স ষোড়শ, যুবার বয়স বিংশতি বৎসর, তথাপি উভয়ের সেই বালসখিত্ব সম্বন্ধই ছিল। একটু মাত্র বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। যথাকালে উভয়ের পিতা এই যুবক যুবতীর পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। বিবাহের দিন স্থির পর্য্যন্ত হইয়াছিল। অকস্মাৎ হিরণ্ময়ীর পিতা বলিলেন, "আমি বিবাহ দিব না।" সেই অবধি হিরণ্ময়ী আর পুরন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন না। অদ্য পুরন্দর অনেক বিনয় করিয়া, বিশেষ কথা আছে বলিয়া, তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। লতামণ্ডপতলে আসিয়া হিরণ্ময়ী কহিল, "আমাকে কেন ডাকিয়া আনিলে? আমি এক্ষণে আর বালিকা নহি, এখন আর

---

* আধুনিক তামলুক। পুরাবৃত্তে পাওয়া যায় যে পূর্ব্বকালে এই নগরী সমুদ্র তীরবর্ত্তিনী ছিল।

তোমার সঙ্গে এমত স্থানে একাকিনী সাক্ষাৎ করা ভাল দেখায় না। আর ডাকিলে আমি আসিব না।"

ষোল বৎসরের বালিকা বলিতেছে, "আমি আর বালিকা নহি" ইহা বড় মিষ্ট কথা। কিন্তু সে রস অনুভব করিবার লোক সেখানে কেহ ছিল না। পুরন্দরের বয়স বা মনের ভাব সেরূপ নহে।

পুরন্দর মণ্ডপবিলম্বিত লতা হইতে একটি পুষ্প ভাঙ্গিয়া লইয়া তাহা ছিন্ন করিতে করিতে বলিলেন, "আমি আর ডাকিব না। আমি দূর দেশে চলিলাম। তাই তোমাকে বলিয়া যাইতে আসিয়াছি।"

হি। দূর দেশে? কোথায়?

পু। সিংহলে।

হি। সিংহলে! সে কি? কেন সিংহলে যাইবে?

পু। "কেন যাইব? আমরা শ্রেষ্ঠী—বাণিজ্যার্থ যাইব।" বলিতে পুরন্দরের চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল।

হিরণ্ময়ী বিমনা হইলেন। কোন কথা কহিলেন না, অনিমেষ লোচনে সম্মুখবর্ত্তী সাগর তরঙ্গে সূর্য্য কিরণের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল, মৃদু পবন বহিতেছে,—মৃদু পবনোত্থিত অতুঙ্গ তরঙ্গে বালারুণরশ্মি আরোহণ করিয়া কাঁপিতেছে—সাগর জলে তাহার অনন্ত উজ্জ্বল রেখা প্রসারিত হইয়াছে—শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেণ নিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর পক্ষিকুল শ্বেত রেখা সাজাইয়া বেড়াইতেছে। হিরণ্ময়ী সব দেখিলেন,—নীল জল দেখিলেন, তরঙ্গ শিরে ফেনমালা দেখিলেন, সূর্য্যরশ্মির ক্রীড়া দেখিলেন—দূরবর্ত্তী অর্ণবপোত দেখিলেন, নীলাম্বরে কৃষ্ণবিন্দুবৎ একটি পক্ষী উড়িতেছে তাহাও দেখিলেন। শেষে ভূতলশায়ী একটি শুষ্ক কুসুমের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে কহিলেন, "তুমি কেন যাবে—অন্যান্য বার তোমার পিতা যাইয়া থাকেন।"

পুরন্দর বলিল, "আমার পিতা বৃদ্ধ হইতেছেন। আমার এখন অর্থোপার্জ্জনের সময় হইয়াছে। আমি পিতার অনুমতি পাইয়াছি।"

হিরণ্ময়ী লতামণ্ডপের কাষ্ঠে ললাট রক্ষা করিলেন। পুরন্দর দেখিলেন তাঁহার ললাট কুঞ্চিত হইতেছে, অধর স্ফুরিত হইতেছে, নাসিকার রন্ধ্র স্ফীত হইতেছে। দেখিলেন যে হিরণ্ময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পুরন্দর মুখ ফিরাইলেন। তিনিও একবার আকাশ, পৃথিবী, নগর, সমুদ্র সকল দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই রহিল না—চক্ষের জল গণ্ড বহিয়া পড়িল। পুরন্দর চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "এই কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি। যে দিন তোমার পিতা বলিলেন কিছুতেই আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবেন না, সেই

দিন হইতেই আমি সিংহলে যাইবার কল্পনা স্থির করিয়াছিলাম। ইচ্ছা আছে যে সিংহল হইতে ফিরিব না। যদি কখন তোমায় ভুলিতে পারি তবেই ফিরিব। আমি অধিক কথা বলিতে জানি না, তুমিও অধিক কথা বুঝিতে পারিবে না। ইহা বুঝিতে পারিবে, যে আমার পক্ষে জগৎ সংসার এক দিকে, তুমি একদিকে হইলে, জগৎ তোমার তুল্য নহে।" এই বলিয়া পুরন্দর হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া পাদচারণ করিয়া অন্য একটা বৃক্ষের পাতা ছিঁড়িলেন। অশ্রুবেগ কিঞ্চিৎ শমিত হইলে, ফিরিয়া আসিয়া আবার কহিলেন, "তুমি আমায় ভালবাস তাহা জানি। কিন্তু যবে হউক তুমি অন্যের পত্নী হইবে। অতএব তুমি আর আমায় মনে রাখিও না। তোমার সঙ্গে যেন এ জন্মে আমার আর সাক্ষাৎ না হয়।"

এই বলিয়া পুরন্দর বেগে প্রস্থান করিলেন। হিরণ্ময়ী বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রোদন সম্বরণ করিয়া একবার ভাবিলেন, "আমি যদি আজি মরি, তবে কি পুরন্দর সিংহলে যাইতে পারে? আমি কেন গলায় লতা বাঁধিয়া মরি না,—কিম্বা সমুদ্রে ঝাঁপ দিই না?" আবার ভাবিলেন, "আমি যদি মরিলাম, তবে পুরন্দর সিংহলে যাক না যাক তাতে আমার কি?" এই ভাবিয়া হিরণ্ময়ী আবার কাঁদিতে বসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কেন যে ধনদাস বলিয়াছিলেন যে "আমি পুরন্দরের সঙ্গে হিরণের বিবাহ দিব না" তাহা কেহ জানিত না। তিনি তাহা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "বিশেষ কারণ আছে।" হিরণ্ময়ীর অন্যান্য অনেক সম্বন্ধ আসিল—কিন্তু ধনদাস কোন সম্বন্ধেই সম্মত হইলেন না। বিবাহের কথা মাত্রে কর্ণপাত করিতেন না। "কন্যা বড় হইল" বলিয়া গৃহিণী তিরস্কার করিতেন; ধনদাস শুনিতেন না। কেবল বলিতেন, "গুরুদেব আসুন—তিনি আসিলে এ কথা হইবে।"

পুরন্দর সিংহলে গেলেন। তাঁহার সিংহল যাত্রার পর দুই বৎসর এইরূপে গেল। পুরন্দর ফিরিলেন না। হিরণ্ময়ীর কোন সম্বন্ধ হইল না। হিরণ্ অষ্টাদশ-বর্ষীয়া হইয়া উদ্যানমধ্যস্থ নবপল্লবিত চূতবৃক্ষের ন্যায় ধনদাসের গৃহে শোভা করিতে লাগিল।

হিরণ্ময়ী ইহাতে দুঃখিতা হয়েন নাই। বিবাহের কথা হইলে পুরন্দরকে মনে পড়িত; তাঁহার সেই ফুল্ল কুসুমমালামণ্ডিত, কুঞ্চিত কৃষ্ণ কুন্তলাবলী বেষ্টিত,

সহাস্য মুখমণ্ডল মনে পড়িত ; তাঁহার সেই দ্বিরদশুভ্র স্কন্ধদেশে স্বর্ণপুষ্পশোভিত নীল উত্তরীয় মনে পড়িত ; পদ্মহস্তে হীরকাঙ্গুরীয়গুলি মনে পড়িত ; হিরণ্ময়ী কাঁদিতেন। পিতার আজ্ঞা হইলে যাহাকে তাহাকে বিবাহ করিতে হইত। কিন্তু সে জীবন্মৃত্যুবৎ হইত। তবে তাঁহার বিবাহোদ্যোগে পিতাকে অপ্রবৃত্ত দেখিয়া, আহ্লাদিত হউন বা না হউন, বিস্মিতা হইতেন। লোকে এত বয়স অবধি কন্যা অবিবাহিত রাখে না—রাখিলেও তাহার সম্বন্ধ করে। তাঁহার পিতা সে কথায় কাণ পর্য্যন্ত দেন না কেন ? একদিন অকস্মাৎ এবিষয়ের কিছু সন্ধান পাইলেন।

ধনদাস বাণিজ্যক্রমে চীনদেশে নির্ম্মিত একটি বিচিত্র কৌটা পাইয়াছিলেন। কৌটা অতি বৃহৎ—ধনদাসের পত্নী তাহাতে অলঙ্কার রাখিতেন। ধনদাস কতকগুলিন নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া পত্নীকে উপহার দিলেন। শ্রেষ্ঠীপত্নী পুরাতন অলঙ্কারগুলিন কৌটাসমেত কন্যাকে দিলেন। অলঙ্কারগুলিন রাখা ঢাকা করিতে হিরণ্ময়ী দেখিলেন, যে তাহাতে একখানি ছিন্ন লিপির অর্দ্ধাবশেষ রহিয়াছে।

হিরণ্ময়ী পড়িতে জানিতেন। তাহাতে প্রথমেই নিজের নাম দেখিতে পাইয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। পড়িয়া দেখিলেন, যে অর্দ্ধাংশ আছে তাহাতে কোন অর্থবোধ হয় না। কে কাহাকে লিখিয়াছিল, তাহাও কিছুই বুঝা গেল না। কিন্তু তথাপি তাহা পড়িয়া হিরণ্ময়ীর মহাভীতি সঞ্চার হইল। ছিন্নপত্র খণ্ড এইরূপ।

জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলা
হিরণ্ময়ী তুল্য সোনার পুত্তলি
বাহ হইলে ভয়ানক বিপদ।
সর মুখ পরস্পরে
হইতে পারে

হিরণ্ময়ী কোন অজ্ঞাত বিপদ আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীতা হইলেন। কাহাকে কিছু না বলিয়া পত্রখণ্ড তুলিয়া রাখিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুই বৎসরের পর আরও এক বৎসর গেল। তথাপি পুরন্দরের সিংহল হইতে আসার কোন সম্বাদ পাওয়া গেল না। কিন্তু হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে তাঁহার মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎই উজ্জ্বল ছিল। তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে পুরন্দরও তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই—নচেৎ এতদিন ফিরিতেন।

এইরূপে দুই আর একে তিন বৎসর গেলে, অকস্মাৎ একদিন ধনদাস

বলিলেন, যে "চল, সপরিবারে কাশী যাইব। গুরুদেবের নিকট হইতে তাঁহার শিষ্য আসিয়াছেন। গুরুদেব সেইখানে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন। তথায় হিরণ্ময়ীর বিবাহ হইবে। সেইখানে তিনি পাত্র স্থির করিয়াছেন।"

ধনদাস, পত্নী ও কন্যাকে লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন। যথাকালে কাশীতে উপনীত হইলে পর, ধনদাসের গুরু আনন্দস্বামী আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। এবং বিবাহের দিন স্থির করিয়া যথাশাস্ত্র উদ্যোগ করিতে বলিয়া গেলেন।

বিবাহের যথাশাস্ত্র উদ্যোগ হইল, কিন্তু ঘটা কিছুই হইল না। ধনদাসের পরিবারস্থ ব্যক্তিরা ভিন্ন কেহই জানিতে পারিল না যে বিবাহ উপস্থিত। কেবল শাস্ত্রীয় আচার সকল রক্ষা করা হইল মাত্র।

বিবাহের দিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল—এক প্রহর রাত্রে লগ্ন, তথাপি গৃহে যাহারা সচরাচর থাকে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ নাই। প্রতিবাসীরাও কেহ উপস্থিত নাই। এ পর্য্যন্ত ধনদাস ভিন্ন গৃহস্থ কেহও জানে না যে কে পাত্র—কোথাকার পাত্র। তবে সকলেই জানিত যে যেখানে, আনন্দস্বামী বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন, সেখানে কখন অপাত্র স্থির করেন নাই। তিনি যে কেন পাত্রের পরিচয় ব্যক্ত করিলেন না, তাহা তিনিই জানেন—তাঁহার মনের কথা বুঝিবে কে?

একটি গৃহে পুরোহিত সম্প্রদানের উদ্যোগাদি করিয়া একাকী বসিয়া আছেন। বাহিরে ধনদাস একা বরের প্রতীক্ষা করিতেছেন। অন্তঃপুরে কন্যাসজ্জা করিয়া হিরণ্ময়ী বসিয়া আছেন—আর কোথাও কেহ নাই। হিরণ্ময়ী মনে মনে ভাবিতেছেন —"একি রহস্য! কিন্তু পুরন্দরের সঙ্গে যদি বিবাহ না হইল—তবে যে হয় তাহার সঙ্গে বিবাহ হউক—সে আমার স্বামী হইবে না।"

এমন সময়ে ধনদাস কন্যাকে ডাকিতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সম্প্রদানের স্থানে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে, বস্ত্রের দ্বারা তাঁহার যুগল চক্ষুঃ দৃঢ়তর বাঁধিলেন। হিরণ্ময়ী কহিলেন, "এ কি পিতঃ?" ধনদাস কহিলেন, "গুরুদেবের আজ্ঞা। তুমিও আমার আজ্ঞামত কার্য্য কর। মন্ত্রগুলি মনে মনে বলিও।" শুনিয়া হিরণ্ময়ী কোন কথা কহিলেন না। ধনদাস দৃষ্টিহীনা কন্যাকে হস্ত ধরিয়া সম্প্রদানের স্থানে লইয়া গেলেন।

হিরণ্ময়ী তথায় উপনীত হইয়া যদি কিছু দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে দেখিতেন, যে পাত্রও তাঁহার ন্যায় আবৃতনয়ন। এইরূপে বিবাহ হইল। সেস্থানে গুরু পুরোহিত এবং কন্যাকর্ত্তা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। বরকন্যা কেহ কাহাকে দেখিলেন না। শুভদৃষ্টি হইল না।

সম্প্রদানান্তে আনন্দস্বামী বরকন্যাকে কহিলেন, যে "তোমাদিগের বিবাহ হইল, কিন্তু তোমরা পরস্পরকে দেখিলে না। কন্যার কুমারী নাম ঘুচানই এই

বিবাহের উদ্দেশ্য ; ইহজন্মে কখন তোমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইবে কি না বলিতে পারি না। যদি হয়, তবে কেহ কাহাকে চিনিতে পারিবে না। চিনিবার আমি একটি উপায় করিয়া দিতেছি। আমার হাতে দুই অঙ্গুরীয় আছে। দুইটি ঠিক একপ্রকার। অঙ্গুরীয় যে প্রস্তরে নির্ম্মিত তাহা প্রায় পাওয়া যায় না। এবং অঙ্গুরীয়ের ভিতরের পৃষ্ঠে একটি ময়ুর অঙ্কিত আছে। ইহার একটি বরকে একটি কন্যাকে দিলাম। এরূপ অঙ্গুরীয় অন্য কেহ পাইবে না—বিশেষ এই ময়ুরের চিত্র অননুকরণীয়। ইহা আমার স্বহস্ত খোদিত। যদি কন্যা কোন পুরুষের হস্তে এইরূপ অঙ্গুরীয় দেখেন, তবে জানিবেন যে সেই পুরুষ তাঁহার স্বামী। যদি বর কখন কোন স্ত্রীলোকের হস্তে এইরূপ অঙ্গুরীয় দেখেন, তবে জানিবেন যে তিনিই তাঁহার পত্নী। তোমরা কেহ এ অঙ্গুরীয় হারাইও না, বা কাহাকে দিও না, অন্নাভাব হইলেও বিক্রয় করিও না। কিন্তু ইহাও আজ্ঞা করিতেছি, যে অদ্য হইতে পঞ্চ-বৎসর মধ্যে কদাচ এই অঙ্গুরীয় পরিও না। অদ্য আষাঢ় মাসের শুক্লা পঞ্চমী, রাত্রি একাদশ দণ্ড হইয়াছে, ইহার পর পঞ্চম আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমীর একাদশ দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত অঙ্গুরীয় ব্যবহার নিষেধ করিলাম। আমার নিষেধে অবহেলা করিলে গুরুতর অমঙ্গল ঘটিবে।"

এই বলিয়া আনন্দস্বামী বিদায় হইলেন। ধনদাস কন্যার চক্ষুর বন্ধন মোচন করিলেন। হিরণ্ময়ী চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন যে গৃহমধ্যে কেবল তাঁহার পিতা ও পুরোহিত আছেন—তাঁহার স্বামী নাই। বিবাহরাত্রি একাই যাপন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহান্তে ধনদাস স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। আরও চারি বৎসর অতিবাহিত হইল। পুরন্দর ফিরিয়া আসিলেন না—হিরণ্ময়ীর পক্ষে এখন ফিরিলেই কি না ফিরিলেই কি ?

পুরন্দর যে এই সাত বৎসরে ফিরিল না, ইহা ভাবিয়া হিরণ্ময়ী দুঃখিতা হইলেন। মনে ভাবিলেন, "তিনি যে আজিও আমায় ভুলিতে পারেন নাই বলিয়া আসিলেন না এমত কদাচ সম্ভবে না। তিনি জীবিত আছেন কি না সংশয়। তাঁহার দেখার আমি কামনা করি না, এখন আমি অন্যের স্ত্রী। কিন্তু আমার বাল্যকালের সুহৃৎ বাঁচিয়া থাকুন, এ কামনা কেন না করিব ?"

ধনদাসেরও কোন কারণে না কোন কারণে চিন্তিত ভাব প্রকাশ হইতে লাগিল, ক্রমে চিন্তা গুরুতর হইয়া শেষে দারুণ রোগে পরিণত হইল। তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। ধনদাসের পত্নী অনুমৃতা হইলেন। হিরণ্ময়ীর আর কেহ

ছিল না, এজন্য হিরণ্ময়ী মাতার চরণ ধারণ করিয়া অনেক রোদন করিয়া কহিলেন, যে তুমি মরিও না। কিন্তু শ্রেষ্ঠীপত্নী শুনিলেন না। তখন হিরণ্ময়ী পৃথিবীতে একাকিনী হইলেন।

মৃত্যুকালে হিরণ্ময়ীর মাতা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন, যে "বাছা তোমার কিসের ভাবনা? তোমার এক জন স্বামী অবশ্য আছেন। নিয়মিত কাল অতীত হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে। না হয় তুমিও নিতান্ত বালিকা নহ। বিশেষ পৃথিবীতে যে সহায় প্রধান—ধন—তাহা তোমার অতুল পরিমাণে রহিল।"

কিন্তু সে আশা বিফল হইল—ধনদাসের মৃত্যুর পর দেখা গেল যে তিনি কিছুই রাখিয়া যান নাই। অলঙ্কার, অট্টালিকা, এবং গার্হস্থ্য সামগ্রী ভিন্ন আর কিছুই নাই। অনুসন্ধানে হিরণ্ময়ী জানিলেন যে ধনদাস কয়েক বৎসর হইতে বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছিলেন। তিনি তাহা কাহাকেও না বলিয়া শোধনের চেষ্টায় ছিলেন। ইহাই তাঁহার চিন্তার কারণ। শেষে শোধনও অসাধ্য হইল। ধনদাস মনের ক্লেশে পীড়িত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই সকল সম্বাদ শুনিয়া অপরাপর শ্রেষ্ঠীরা আসিয়া হিরণ্ময়ীকে কহিল যে, তোমার পিতা আমাদের ঋণগ্রস্ত হইয়া মরিয়াছেন। আমাদিগের ঋণ পরিশোধ কর। শ্রেষ্ঠীকন্যা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে তাহাদের কথা যথার্থ। তখন হিরণ্ময়ী সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিলেন। বাসগৃহ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিলেন।

তখন হিরণ্ময়ী অন্নবস্ত্রের দুঃখে দুঃখিনী হইয়া নগর প্রান্তে এক কুটীর মধ্যে একা বাস করিতে লাগিলেন। কেবল মাত্র এক সহায় পরম হিতৈষী আনন্দস্বামী, কিন্তু তিনি তখন দূরদেশে ছিলেন। হিরণ্ময়ীর এমন একটি লোক ছিল না যে আনন্দস্বামীর নিকট প্রেরণ করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী যুবতী এবং সুন্দরী—একাকিনী এক গৃহে শয়ন করা ভাল নহে। আপদও আছে—কলঙ্কও আছে। অমলা নামে এক গোপকন্যা হিরণ্ময়ীর প্রতিবাসিনী ছিল। সে বিধবা—তাহার একটি কিশোরবয়স্ক পুত্র এবং কয়েকটি কন্যা। তাহার যৌবন কাল অতীত হইয়াছিল। সচ্চরিত্রা বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। হিরণ্ময়ী রাত্রে আসিয়া তাহার গৃহে শয়ন করিতেন।

একদিন হিরণ্ময়ী অমলার গৃহে শয়ন করিতে আসিলে পর, অমলা তাহাকে কহিল, "সম্বাদ শুনিয়াছ, পুরন্দর শ্রেষ্ঠী না কি আট বৎসরের পর নগরে ফিরিয়া আসিয়াছে।" শুনিয়া হিরণ্ময়ী মুখ ফিরাইলেন—চক্ষের জল অমলা না দেখিতে পায়। পৃথিবীর সঙ্গে হিরণ্ময়ীর শেষ সম্বন্ধ, ঘুচিল। পুরন্দর তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে। নচেৎ ফিরিত না। পুরন্দর এক্ষণে মনে রাখুক বা ভুলুক, তাহাতে তাঁহার লাভ বা ক্ষতি কি? তথাপি যাহার স্নেহের কথা ভাবিয়া যাবজ্জীবন কাটাইয়াছেন, সে ভুলিয়াছে ভাবিতে হিরণ্ময়ীর মনে কষ্ট হইল। হিরণ্ময়ী একবার ভাবিলেন—"ভুলেন নাই—কতকাল আমার জন্য বিদেশে থাকিবেন? বিশেষ তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে—আর দেশে না আসিলে চলিবে কেন?" আবার ভাবিলেন "আমি কুলটা সন্দেহ নাই—নহিলে পুরন্দরের কথা মনে করি কেন?"

অমলা কহিল, "পুরন্দরকে কি তোমার মনে পড়িতেছে না? পুরন্দর শচীসুত শেঠির ছেলে।"

হি। "চিনি।"

অ। "তা সে ফিরে এয়েছে—কত নৌকা যে ধন এনেছে তাহা গুণে সংখ্যা করা যায় না। এত ধন নাকি এ তাম্রলিপে কেহ কখন দেখে নাই।"

হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে রক্ত একটু খর বহিল। তাঁহার দারিদ্র্য দশা মনে পড়িল, পূর্ব্ব সম্বন্ধও মনে পড়িল। দারিদ্র্যের জ্বালা বড় জ্বালা। তাহার পরিবর্ত্তে এই অতুল ধনরাশি হিরণ্ময়ীর হইতে পারিত। ইহা ভাবিয়া যাহার রক্ত খর না বহে এমন স্ত্রীলোক অতি অল্প আছে। হিরণ্ময়ী ক্ষণেক কাল অন্যমনে থাকিয়া, পরে অন্য প্রসঙ্গ তুলিল। শেষ শয়ন কালে জিজ্ঞাসা করিল, "অমলে, সেই শ্রেষ্ঠীপুত্রের বিবাহ হইয়াছে?"

অমলা কহিল, "না বিবাহ হয় নাই।"

হিরণ্ময়ীর ইন্দ্রিয়সকল অবশ হইল। সে রাত্রে আর কোন কথা হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরে এক দিন অমলা হাসিমুখে হিরণ্ময়ীর নিকটে আসিয়া মধুর ভৎ'সনা করিয়া কহিল, "হাঁগা বাছা, তোমার কি এমনই ধর্ম্ম?"

হিরণ্ময়ী কহিল, "কি করিয়াছি?"

অম। "আমার কাছে এত দিন তা বলিতে নাই?"

হি। "কি বলি নাই।"

অম। "পুরন্দর শেঠীর সঙ্গে তোমার এত আত্মীয়তা।"

হিরণ্ময়ী ঈষল্লজ্জিতা হইলেন, বলিলেন, "তিনি বাল্যকালে আমার প্রতিবাসী ছিলেন—তার বলিব কি ?"

অম। "শুধু প্রতিবাসী ? দেখ দেখি কি এনেছি !"

এই বলিয়া অমলা একটি কৌটা বাহির করিল। কৌটা খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে অপূর্ব্বদর্শন, মহা প্রভাযুক্ত, মহামূল্য হীরার হার বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীকে দেখাইল। শ্রেষ্ঠী কন্যা হীরা চিনিত—বিস্মিতা হইয়া কহিল, "এ যে মহামূল্য—এ কোথায় পাইলে ?"

অম। "ইহা তোমাকে পুরন্দর পাঠাইয়া দিয়াছে। তুমি আমার গৃহে থাক শুনিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইহা তোমাকে দিতে বলিয়াছে।"

হিরণ্ময়ী ভাবিয়া দেখিল, এই হার গ্রহণ করিলে, চিরকাল জন্য দারিদ্র্য মোচন হয়। ধনদাসের আদরের কন্যা আর অন্নবস্ত্রের কষ্ট সহিতে পারিতেছিল না; অতএব হিরণ্ময়ী ক্ষণেক বিমনা হইলেন। পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "অমলে তুমি বণিক্‌কে কহিও যে আমি ইহা গ্রহণ করিব না।"

অমলা বিস্মিতা হইল। বলিল "সে কি ? তুমি কি পাগল, না আমার কথায় বিশ্বাস করিতেছ না।"

হি। "আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতেছি—আর পাগলও নই। আমি উহা গ্রহণ করিব না।"

অমলা অনেক তিরস্কার করিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না। তখন অমলা হার লইয়া রাজা মদন দেবের নিকটে গেল। রাজা হার লইয়া অমলাকে যথেষ্ট অর্থ দিলেন। হিরণ্ময়ী ইহার কিছুই জানিল না।

ইহার কিছু দিন পরে, পুরন্দরের একজন পরিচারিকা হিরণ্ময়ীর নিকটে আসিল। সে কহিল, "আমার প্রভু বলিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি যে পর্ণ কুটীরে বাস করেন ইহা তাঁহার সহ্য হয় না। আপনি তাঁহার বাল্যকালের সখী; আপনার গৃহ তাঁহার গৃহ একই। তিনি এমন বলেন না যে আপনি তাঁহার গৃহে গিয়া বাস করুন। আপনার পিতৃগৃহ তিনি ধনদাসের মহাজনের নিকট ক্রয় করিয়াছেন। তাহা আপনাকে দান করিতেছেন। আপনি গিয়া সেইখানে বাস করুন, ইহাই তাঁহার ভিক্ষা।"

হিরণ্ময়ী দারিদ্র্য জন্য যত দুঃখ ভোগ করিতেছিলেন, তন্মধ্যে পিতৃভবন হইতে নির্ব্বাসনই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বোধ হইত। যেখানে বাল্যক্রীড়া করিয়াছিলেন, যেখানে পিতামাতার সহ বাস করিতেন, যেখানে তাঁহাদিগের মৃত্যু দেখিয়াছেন, সেখানে যে আর বাস করিতে পান না, এ কষ্টই গুরুতর বোধ হইত।

সেই ভবনের কথায় তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি পরিচারিকাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "এ দান আমার গ্রহণ করা উচিত নহে—কিন্তু আমি এ লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তোমার প্রভুর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হউক!"

পরিচারিকা প্রণাম হইয়া বিদায় হইল। অমলা উপস্থিতা ছিল। হিরণ্ময়ী তাহাকে বলিলেন, "অমলে, তথায় আমার একা বাস করা হইতে পারে না। তুমিও তথায় বাস করিবে চল।"

অমলা স্বীকৃতা হইল। উভয়ে গিয়া ধনদাসের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

তথাপি অমলাকে সর্ব্বদা পুরন্দরের গৃহে যাইতে হিরণ্ময়ী একদিন নিষেধ করিলেন। অমলা আর যাইত না।

পিতৃগৃহে গমনাবধি হিরণ্ময়ী একটা বিষয়ে বড় বিস্মিতা হইলেন। একদিন অমলা কহিল, "তুমি সংসার নির্ব্বাহের জন্য ব্যস্ত হইও না, বা শারীরিক পরিশ্রম করিও না। রাজবাড়ী আমার কার্য্য হইয়াছে—আর এখন অর্থের অভাব নাই। অতএব আমি সংসার চালাইব—তুমি সংসারের কর্ত্রী হইয়া থাক।" হিরণ্ময়ী দেখিলেন অমলার অর্থের বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য। মনে মনে নানা প্রকারে সন্দিহান হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর পঞ্চমাষাঢ়ের শুক্লাপঞ্চমী আসিয়া উপস্থিত হইল। হিরণ্ময়ী এ কথা স্মরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে বিমনা হইয়া বসিয়াছিলেন। ভাবিতেছিলেন "গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে আমি কালি হইতে অঙ্গুরীয়টি পরিতে পারি। কিন্তু পরিব কি? পরিয়া আমার কি লাভ? হয়ত স্বামী পাইব, কিন্তু স্বামী পাইবার আমার বাসনা নাই। অথবা চিরকালের জন্য কেনই বা পরের মূর্ত্তি মনে আঁকিয়া রাখি। এ দুরন্ত হৃদয়কে শাসিত করাই উচিত। নহিলে ধর্ম্মে পতিত হইতেছি।"

এমত সময়ে অমলা বিস্ময়বিহ্বলা হইয়া আসিয়া কহিল, "কি সর্ব্বনাশ! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। না জানি কি হইবে?"

হি। "কি হইয়াছে?"

অ। "রাজপুরী হইতে তোমার জন্য শিবিকা লইয়া দাস দাসী আসিয়াছে। তোমাকে লইয়া যাইবে।"

হি। "তুমি পাগল হইয়াছ। আমাকে রাজবাড়ী হইতে লইতে আসিবে কেন?"

এমত সময়ে রাজদূতী আসিয়া প্রণাম করিল এবং কহিল যে "রাজাধিরাজ পরম ভট্টারক শ্রীমদনদেবের আজ্ঞা যে হিরণ্ময়ী এই মুহূর্ত্তেই শিবিকারোহণে রাজাবরোধে যাইবেন।"

হিরণ্ময়ী বিস্মিতা হইলেন। কিন্তু অস্বীকার করিতে পারিলেন না। রাজাজ্ঞা অলংঘ্য। বিশেষ রাজা মদনদেবের অবরোধে যাইতে কোন শঙ্কা নাই। রাজা পরম ধার্ম্মিক এবং জিতেন্দ্রিয় বলিয়া খ্যাত। তাঁহার প্রতাপে কোন রাজ পুরুষও কোন স্ত্রীলোকের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারে না।

হিরণ্ময়ী অমলাকে বলিলেন, "অমলে, আমি রাজ দর্শনে যাইতে সম্মতা। তুমি সঙ্গে চল।"

অমলা স্বীকৃতা হইল।

তৎ সমভিব্যাহারে শিবিকারোহণে হিরণ্ময়ী—রাজাবরোধ মধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন।

প্রতিহারী রাজাকে নিবেদন করিল যে শ্রেষ্ঠীকন্যা আসিয়াছে। রাজাজ্ঞা পাইয়া প্রতিহারী একা হিরণ্ময়ীকে রাজসমক্ষে লইয়া আসিল। অমলা বাহিরে রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী রাজাকে দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন। রাজা দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, কবাট বক্ষ; দীর্ঘহস্ত; অতি সুগঠিতাকৃতি; প্রশস্ত ললাট; বিস্ফারিত, আয়ত চক্ষু; শান্তমূর্ত্তি—এরূপ সুন্দর পুরুষ কদাচিৎ স্ত্রীলোকের নয়নপথে পড়ে। রাজাও শ্রেষ্ঠী কন্যাকে দেখিয়া জানিলেন যে রাজাবরোধেও এরূপ সুন্দরী দুর্লভ।

রাজা কহিলেন, "তুমি হিরণ্ময়ী?" হিরণ্ময়ী কহিলেন, "আমি আপনার দাসী।"

রাজা কহিলেন, "কেন তোমাকে ডাকাইয়াছি তাহা শুন। তোমার বিবাহের কথা মনে পড়ে?"

হি। "পড়ে।"

রাজা। "সেই রাত্রে আনন্দস্বামী তোমাকে যে অঙ্গুরীয় দিয়াছিলেন, তাহা তোমার কাছে আছে?"

হি। "মহারাজ! সে অঙ্গুরীয় আছে। কিন্তু সে সকল অতি গুহ্য বৃত্তান্ত, কি প্রকারে আপনি তাহা অবগত হইলেন?"

রাজা তাহার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন, “সে অঙ্গুরীয় কোথায় আছে? আমাকে দেখাও।”

হিরণ্ময়ী কহিলেন, “উহা আমি গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি। পঞ্চ বৎসর পরিপূর্ণ হইতে আরও কয়েক দণ্ড বিলম্ব আছে—অতএব তাহা পরিতে আনন্দ-স্বামীর যে নিষেধ ছিল—তাহা এখনও আছে।”

রাজা। “ভালই—কিন্তু সেই অঙ্গুরীয়ের অনুরূপ দ্বিতীয় যে অঙ্গুরীয় তোমার স্বামীকে আনন্দস্বামী দিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে চিনিতে পারিবে?”

হি। “উভয় অঙ্গুরীয় একইরূপ সুতরাং দেখিলে চিনিতে পারিব।”

তখন প্রতিহারী রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া এক সুবর্ণের কৌটা আনিল। রাজা তাহার মধ্য হইতে একটি অঙ্গুরীয় লইয়া বলিলেন, “দেখ এই অঙ্গুরীয় কাহার?”

হিরণ্ময়ী অঙ্গুরীয় প্রদীপালোকে বিলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, “দেব এই আমার স্বামীর অঙ্গুরীয় বটে, কিন্তু আপনি ইহা কোথায় পাইলেন?” পরে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, “দেব! ইহাতে জানিলাম যে আমি বিধবা হইয়াছি। স্বজনহীন মৃতের ধন আপনার হস্তগত হইয়াছে। নহিলে তিনি জীবিতাবস্থায় ইহা ত্যাগ করিবার সম্ভাবনা ছিল না।”

রাজা হাসিয়া কহিলেন, “আমার কথায় বিশ্বাস কর, তুমি বিধবা নহ।”

হি। “তবে আমার স্বামী আমার অপেক্ষাও দরিদ্র। ধনলোভে ইহা বিক্রয় করিয়াছেন।”

রা। “তোমার স্বামী ধনী ব্যক্তি।”

হি। “তবে আপনি বলে ছলে কৌশলে তাঁহার নিকট ইহা অপহরণ করিয়াছেন।”

রাজা এই দুঃসাহসিক কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, “তোমার বড় সাহস! রাজা মদনদেব চোর, ইহা আর কেহ বলে না।”

হি। “নচেৎ আপনি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন?”

রা। “আনন্দস্বামী তোমার বিবাহের রাত্রে ইহা আমার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়াছেন।”

হিরণ্ময়ী তখন লজ্জায় অধোমুখী হইয়া কহিলেন, “আর্য্যপুত্র! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন—আমি চপলা, না জানিয়া কটু কথা বলিয়াছি।”

নবম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী রাজমহিষী, ইহা শুনিয়া হিরণ্ময়ী অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন। কিন্তু কিছুমাত্র আহ্লাদিত হইলেন না। বরং বিষণ্ণ হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, যে "আমি এতদিন পুরন্দরকে পাই নাই বটে, কিন্তু পরপত্নীত্বের যন্ত্রণা ভোগ করি নাই। এক্ষণ হইতে আমার সে যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। আর আমি হৃদয়মধ্যে পুরন্দরের পত্নী—কি প্রকারে অন্যানুরাগিণী হইয়া এই মহাত্মার গৃহ কলঙ্কিত করিব?" হিরণ্ময়ী এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে রাজা বলিলেন, "হিরণ্ময়ি! তুমি আমার মহিষী বটে, কিন্তু তোমাকে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমার কয়েকটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। তুমি বিনামূল্যে পুরন্দরের গৃহে বাস কর কেন?"

হিরণ্ময়ী অধোবদন হইলেন। রাজা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দাসী অমলা সর্ব্বদা পুরন্দরের গৃহে যাতায়াত করে কেন?"

হিরণ্ময়ী আরও লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিলেন। ভাবিতেছিলেন "রাজা মদন দেব কি সর্ব্বজ্ঞ?"

তখন রাজা কহিলেন, "আর একটা গুরুতর কথা আছে। তুমি পরনারী হইয়া পুরন্দরপ্রদত্ত হীরকহার গ্রহণ করিয়াছিলে কেন?"

এবার হিরণ্ময়ী কথা কহিলেন। বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, জানিলাম আপনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন। হীরকহার আমি ফিরিয়া দিয়াছি।"

রাজা। "তুমি সেই হার আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছ। এই দেখ সেই হার।" এই বলিয়া রাজা কৌটার মধ্য হইতে হার বাহির করিয়া দেখাইলেন।

হিরণ্ময়ী হীরকহার চিনিতে পারিয়া বিস্মিত হইলেন। কহিলেন, "আর্য্যপুত্র, এ হার কি আমি স্বয়ং আসিয়া আপনার কাছে বিক্রয় করিয়াছি?"

রা। "না। তোমার দাসী বা দূতী অমলা আসিয়া বিক্রয় করিয়াছে। তাহাকে ডাকাইব?"

হিরণ্ময়ীর অমর্ষান্বিত বদনমণ্ডলে একটু হাসি দেখা দিল। বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! অপরাধ ক্ষমা করুন। অমলাকে ডাকাইতে হইবে না—আমি এ বিক্রয় স্বীকার করিতেছি।"

এবার রাজা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "স্ত্রীলোকের চরিত্র অভাবনীয়। তুমি পরের পত্নী হইয়া পুরন্দরের নিকট কেন এ হার গ্রহণ করিলে?"

হি। "প্রণয়োপহার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।"

রাজা আরও বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি? কি প্রকার প্রণয়োপহার?"

হি। "আমি কুলটা। মহারাজ! আমি আপনার গ্রহণের যোগ্যা নহি। আমি প্রণাম হইতেছি। আমাকে বিদায় দিন। আমার সঙ্গে বিবাহ বিস্মৃত হউন।"

হিরণ্ময়ী রাজাকে প্রণাম করিয়া গমনোদ্যতা হইয়াছেন, এমত সময়ে রাজার বিস্ময়বিকাশক মুখকান্তি অকস্মাৎ প্রফুল্ল হইল। তিনি উচ্চৈর্হাস্য করিয়া উঠিলেন। হিরণ্ময়ী ফিরিল।

রাজা কহিলেন, "হিরণ্ময়ি! তুমিই জিনিলে,—আমি হারিলাম। তুমিও কুলটা নহ, আমিও তোমার স্বামী নহি। যাইও না।"

হি। "মহারাজ! তবে এ কাণ্ডটা কি, আমাকে বুঝাইয়া বলুন। আমি অতি সামান্যা স্ত্রী—আমার সঙ্গে আপনার তুল্য গম্ভীর প্রকৃতি রাজাধিরাজের রহস্য সম্ভবে না।"

রাজা হাস্যত্যাগ না করিয়া বলিলেন, "আমার ন্যায় রাজারই এরূপ রহস্য সম্ভবে। ছয় বৎসর হইল তুমি একখানি পত্রার্দ্ধ অলঙ্কার মধ্যে পাইয়াছিলে? তাহা কি আছে?"

হি। "মহারাজ! আপনি সর্ব্বজ্ঞই বটে। পত্রার্দ্ধ আমার গৃহে আছে।"

রা। "তুমি শিবিকারোহণে পুনশ্চ গৃহে গিয়া সেই পত্রার্দ্ধ লইয়া আইস। তুমি আসিলে আমি সকল কথা বলিব।"

দশম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী রাজার আজ্ঞায় শিবিকারোহণে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং তথা হইতে সেই পূর্ব্ববর্ণিত পত্রার্দ্ধ লইয়া পুনশ্চ রাজসন্নিধানে আসিলেন। রাজা সেই পত্রার্দ্ধ দেখিয়া, আর একখানি পত্রার্দ্ধ কৌটা হইতে বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীকে দিলেন। বলিলেন "উভয় অর্দ্ধকে মিলিত কর।" হিরণ্ময়ী উভয়ার্দ্ধ মিলিত করিয়া দেখিলেন, মিলিল। রাজা কহিলেন "উভয়ার্দ্ধ একত্রিত করিয়া পাঠ কর।" তখন হিরণ্ময়ী নিম্নলিখিত মত পাঠ করিলেন।

"(জ্যোতির্ষী গণনা করিয়া দেখিলাম) যে তুমি যে কল্পনা করিয়াছ তাহা কর্ত্তব্য নহে। (হিরণ্ময়ী তুল্য সোণার পুত্তলিকে) কখন চিরবৈধব্যে নিক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে না। তাহার (বিবাহ হইলে ভয়ানক বিপদ।) তাহার চিরবৈধব্য ঘটিবে গণনা দ্বারা জানিয়াছি। তবে পঞ্চবৎসর (পর্য্যন্ত পরস্পরে) যদি দম্পতী মুখ দর্শন না করে, তবে এই গ্রহ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি (হইতে পারে) তাহার বিধান আমি করিতে পারি।"

পাঠ সমাপন হইলে, রাজা কহিলেন, "এই লিপি আনন্দস্বামী তোমার পিতাকে লিখিয়াছিলেন।"

হি। "তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি। কেন বা আমাদিগের বিবাহ কালে নয়নাবৃত হইয়াছিল—কেনই বা গোপনে সেই অদ্ভুত বিবাহ হইয়াছিল—কেনই বা পঞ্চবৎসর অঙ্গুরীয় ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আর ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

রাজা। "আর ত অবশ্য বুঝিয়াছ যে এই পত্র পাইয়াই তোমার পিতা পুরন্দরের সহিত সম্বন্ধ রহিত করিলেন। পুরন্দর সেই দুঃখে সিংহলে গেল।

এদিকে আনন্দস্বামী পাত্রানুসন্ধান করিয়া একটি পাত্র স্থির করিলেন। পাত্রের কোষ্ঠী গণনা করিয়া জানিলেন, যে পাত্রটীর অশীতি বৎসর পরমায়ুঃ। তবে অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়স অতীত হইবার পূর্ব্বে, মৃত্যুর এক সম্ভাবনা ছিল। গণিয়া দেখিলেন যে ঐ বয়স অতীত হইবার পূর্ব্বে এবং বিবাহের পঞ্চবৎসর মধ্যে পত্নী-শয্যায় শয়ন করিয়া তাহার প্রাণত্যাগ করিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি কোন রূপে পঞ্চবৎসর জীবিত থাকেন তবে দীর্ঘজীবী হইবেন।

অতএব পাত্রের ত্রয়োবিংশ বৎসর অতীত হইবার সময়ে বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। কিন্তু এতদিন অবিবাহিত থাকিলে পাছে তুমি কোন প্রকার চঞ্চলা হও, বা গোপনে কাহাকে বিবাহ কর, এই জন্য তোমাকে ভয় দেখাইবার কারণে এই পত্রার্দ্ধ তোমার অলঙ্কার মধ্যে রাখিয়াছিলেন।

তৎপরে বিবাহ দিয়া পঞ্চ বৎসর সাক্ষাৎ না হয়, তাহার জন্য যে যে কৌশল করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত আছ। সেই জন্যই পরস্পরের পরিচয় মাত্র পাও নাই।

কিন্তু সম্প্রতি কয়েক মাস হইল বড় গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছিল। কয়েক মাস হইল স্বামী এ নগরে আসিয়া, তোমার দারিদ্র্য শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি তোমাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ করেন নাই। তিনি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আনুপূর্ব্বিক তোমার বিবাহ বৃত্তান্ত কহিলেন। পরে কহিলেন,

'আমি যদি জানিতে পারিতাম যে হিরণ্ময়ী এরূপ দারিদ্র্যাবস্থায় আছে, তাহা হইলে আমি উহা মোচন করিতাম। এক্ষণে আপনি উহার প্রতীকার করিবেন। এ বিষয়ে আমাকেই আপনার ঋণী জানিবেন। আপনার ঋণ আমি পরিশোধ করিব। সম্প্রতি আমার আর একটি অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। হিরণ্ময়ীর স্বামী এই নগরে বাস করিতেছেন। উহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ না হয়, ইহা আপনি দেখিবেন।' এই বলিয়া তোমার স্বামীর পরিচয়ও আমার নিকটে দিলেন। সেই অবধি অমলা যে অর্থ ব্যয়ের দ্বারা তোমার দারিদ্র্যদুঃখ মোচন

করিয়া আসিতেছে তাহা আমা হইতে প্রাপ্ত। আমিই তোমার পিতৃগৃহ ক্রয় করিয়া তোমাকে বাস করিতে দিয়াছিলাম। হার আমিই পাঠাইয়াছিলাম—সেও তোমার পরীক্ষার্থ।"

হি। "তবে আপনি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন? কেনই বা আমার নিকট স্বামীরূপে পরিচয় দিয়া, আমাকে প্রতারিত করিয়াছিলেন? পুরন্দরের গৃহে বাস করিতেছি বলিয়া কেনই বা অনুযোগ করিতেছিলেন?"

রাজা। "যে দণ্ডে আমি আনন্দস্বামীর অনুজ্ঞা পাইলাম, সেই দণ্ডেই আমি তোমার প্রহরায় লোক নিযুক্ত করিলাম। সেই দিনই অমলা দ্বারা তোমার নিকট হার পাঠাই। তারপর অদ্য পঞ্চম বৎসর পূর্ণ হইবে জানিয়া, তোমার স্বামীকে ডাকাইয়া কহিলাম, 'তোমার বিবাহ বৃত্তান্ত আমি সমুদায় জানি। তোমার সেই অঙ্গুরীয়টি লইয়া একাদশ দণ্ড রাত্রের সময়ে আসিও। তোমার স্ত্রীর সহিত মিলন হইবে।' তিনি কহিলেন যে 'মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য কিন্তু বনিতার সহিত মিলনের আমার স্পৃহা নাই। না হইলেই ভাল হয়।' আমি কহিলাম, আমার আজ্ঞা। তাহাতে তোমার স্বামী স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু কহিলেন যে 'আমার সেই বনিতা সুচরিত্রা কি দুশ্চরিত্রা তাহা আপনি জানেন। যদি দুশ্চরিত্রা স্ত্রী গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করেন তবে আপনাকে অধর্ম্ম স্পর্শিবে।' আমি উত্তর করিলাম 'সেই অঙ্গুরীয়টি দিয়া যাও। আমি তোমার স্ত্রীর চরিত্র পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে বলিব।' তিনি কহিলেন, 'এ অঙ্গুরীয় অন্যকে বিশ্বাস করিয়া দিতাম না, কিন্তু আপনাকে অবিশ্বাস নাই।' আমি অঙ্গুরীয় লইয়া তোমায় যে পরীক্ষা করিয়াছি, তাহাতে তুমি জয়ী হইয়াছ।"

হি। "পরীক্ষা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

এমত সময়ে রাজপুরে মঙ্গলসূচক ঘোরতর বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন, "রাত্রি একাদশ দণ্ড অতীত হইল—পরীক্ষার কথা পশ্চাৎ বলিব। এক্ষণে তোমার স্বামী আসিয়াছেন; শুভলগ্নে তাঁহার সহিত শুভদৃষ্টি কর।"

তখন পশ্চাৎ হইতে সেই কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। একজন মহাকায় পুরুষ সেই দ্বার পথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা কহিলেন, "হিরণ্ময়ী, ইনিই তোমার স্বামী।"

হিরণ্ময়ী চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল—জাগ্রত স্বপ্নের ভেদজ্ঞান শূন্যা হইলেন। দেখিলেন, পুরন্দর!

উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত, উন্মত্ত প্রায় হইলেন। কেহই যেন কথা বিশ্বাস করিলেন না।

রাজা পুরন্দরকে কহিলেন, "সুহৃৎ, হিরণ্ময়ী তোমার যোগ্যা পত্নী। আদরে গৃহে লইয়া যাও। ইনি অদ্যাপি তোমার প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহময়ী। আমি দিবারাত্রি ইহাকে প্রহরাতে রাখিয়াছিলাম তাহাতে বিশেষ জানি যে ইনি অনন্যানুরাগিণী। তোমার ইচ্ছাক্রমে উঁহার পরীক্ষা করিয়াছি, আমি উঁহার স্বামী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম, কিন্তু রাজ্যলোভেও হিরণ্ময়ী লুব্ধ হইয়া তোমাকে ভুলেন নাই। আপনাকে হিরণ্ময়ীর স্বামী বলিয়া পরিচিত করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলাম যে হিরণ্ময়ীকে তোমার প্রতি অসৎপ্রণয়াসক্ত বলিয়া সন্দেহ করি। যদি হিরণ্ময়ী তাহাতে দুঃখিতা হইত, 'আমি নির্দ্দোষী; আমাকে গ্রহণ করুন' বলিয়া কাতর হইত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে হিরণ্ময়ী তোমাকে ভুলিয়াছে। কিন্তু হিরণ্ময়ী তাহা না করিয়া বলিল, 'মহারাজ, আমি কুলটা আমাকে ত্যাগ করুন।' হিরণ্ময়ি! তখনকার তোমার মনের ভাব আমি সকলই বুঝিয়াছিলাম। তুমি অন্য স্বামীর সংসর্গ করিবে না বলিয়াই আপনাকে কুলটা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলে। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সুখী হও।"

হি। "মহারাজ! আমাকে আর একটি কথা বুঝাইয়া দিন। ইনি সিংহলে ছিলেন, কাশীতে আমার সঙ্গে পরিণয় হইল কি প্রকারে? যদি ইনি সিংহল হইতে সে সময় আসিয়াছিলেন, তবে আমরা কেহ জানিলাম না কেন?"

রাজা। "আনন্দস্বামী এবং পুরন্দরের পিতায় পরামর্শ করিয়া সিংহলে লোক পাঠাইয়া উহাকে সিংহল হইতে একেবারে কাশী লইয়া গিয়াছিলেন, পরে সেইখান হইতে পুনশ্চ সিংহল গিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্তিতে আসেন নাই। এই জন্য তোমরা কেহ জানিতে পার নাই।"

পুরন্দর কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যেমন আমার চিরকালের মনোরথ পূর্ণ করিলেন, জগদীশ্বর এমনই আপনার সকল মনোরথ পূর্ণ করুন। অদ্য আমি যেমন সুখী হইলাম, এমন সুখী কেহ আপনার রাজ্যে কখন বাস করে নাই।"

সমাপ্ত।

১

ভারত চন্দ্র রায়
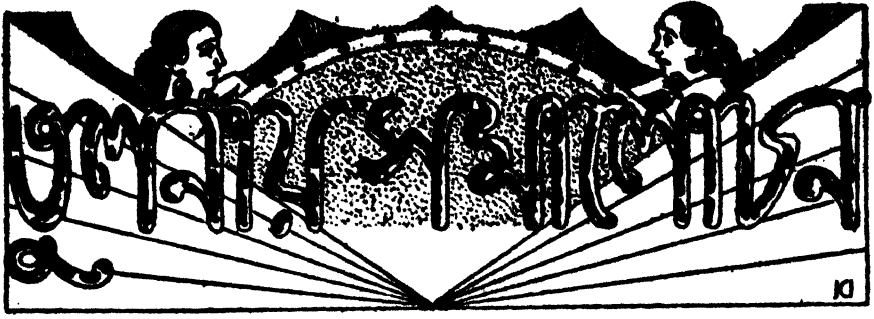
অনেকে বলেন যে তুলনায় সমালোচনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহিণী হয়, অথচ এক্ষণকার কোন সমালোচকই সেরূপ সমালোচন করেন না। আমরা মধ্যে মধ্যে সমালোচক বলিয়া সমাজে মুখ দেখাই, সেই জন্যই অদ্য ঐ আক্ষেপোক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তুলনায় সমালোচনের চেষ্টা করিব। সুতরাং "বঙ্গীয় সমালোচকদিগের কথায় যে আমাদিগের অচলা ভক্তি," এই প্রস্তাব তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ।

আমাদের উপদেষ্টৃগণ ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ীর ন্যায় শুষ্ক উপদেশ প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা সকলেই সাধ্যমত তুলনা করিয়া কোন কোন কবির বা কাব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমালোচন করিয়া আমাদের শুনাইয়াছেন। তাহার মধ্যে যতদূর স্মরণ আছে দুই একটি আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। একজন বিদ্যাপতি ও কবিকঙ্কণের তুলনা করিয়া আমাদের দেখাইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে বিদ্যাপতির পদগুলি সরল প্রোষ্ঠী মৎস্যের দলের ন্যায়। সকলগুলিই প্রায় একরূপ, দেখিলেই চেনা যায়, এক একটির আয়তন অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু সমস্ত দলটি সুবৃহৎ; সকলগুলি অতি চিক্কণ, উজ্জ্বল, পরিষ্কৃত, সরল, মোলায়েম ও আপনাদের বাস্তুভূতে সর্ব্বদাই ফরফরায়তে। বিদ্যাপতির পদগুলিও ঠিক এইরূপ; একটির সহিত আর একটির কোন সম্বন্ধই নাই; সকলগুলিই পদ ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক; প্রোষ্ঠীদল সম্বন্ধেও তদ্রূপ, সকল গুলিই মৎস্য, ও তৈল, লবণ, জিহ্বার সহিত সমান ভাবে সম্বন্ধ। পদগুলিও অতি সরস, কোমল, মিষ্ট, ক্ষুদ্র, ও আপনাদের বাস্তুভূতে অর্থাৎ কীর্ত্তন গায়কদিগের কণ্ঠে সর্ব্বদাই ফরফরায়তে। অপিচ মৎস্যগুলি সুন্দর শল্কাবৃত কিন্তু সেই শল্কগুলি অব্যবহার্য্য; পদগুলিও সুন্দর ব্রজভাষাময় কিন্তু ব্রজভাষা অব্যবহার্য্য; বিদ্যাপতির কবিতার সকল-গুলিই আদিরসময়ী, আদিরসোদ্দীপিকা; আর এই সফরীযূথের যেটিকে দেখিবে, দেখিলেই তোমার সেই নিজ সফরীনয়নাকে মনে পড়িবে, সুতরাং এস্থলেও সকলগুলি আদিরসোদ্দীপিকা।

কিন্তু মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল বৃহৎ রোহিত মৎস্য সদৃশ; সুবৃহৎ, একটিতেই যথেষ্ট, সুন্দর সুচ্ছন্দোধারী, অগাধসঞ্চারী, স্বচ্ছন্দবিহারী জালভেদকারী। যেমন মৎস্য কুলে রোহিত, তদ্রূপ কাব্যকুলে চণ্ডীমঙ্গল, রাজা বলিলেই হয়; অতি সুন্দর, একটিতেই যথেষ্ট, নানা ছন্দে রচিত, অগাধ পাণ্ডিত্য-ব্যঞ্জক, স্বচ্ছন্দবিহারী অর্থাৎ কষ্টে রচিত হয় নাই, ও জালভেদকারী, অর্থাৎ স্থানে স্থানে এমন কূট যে তাহার অর্থ শব্দবুদ্ধিজাল ভেদ করিয়া পলায়ন করে।

চণ্ডীকাব্যে যেমন নানা রস আছে, তেমনি বৃহৎ পক্ক রোহিত মৎস্যেও নানা রস আছে। কিন্তু কোথায় কোন্ রস আছে সে বিষয়ে নানা মত আছে; কেহ কেহ বলেন যে ইহার মস্তকে বীর, রৌদ্র, ভয়ানক; মধ্য দেশে শান্ত, করুণ, আদি; ও পশ্চাদ্ভাগে অদ্ভুত, হাস্য, ও বীভৎস রস দেখিতে পাওয়া যায়। অপরে বলেন যে ইহার ঘ্রাণে আদি, দর্শনে করুণা, স্পর্শনে অদ্ভুত ও ভক্ষণেই শান্ত রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যাহা হউক ইহা যে চণ্ডীকাব্যসদৃশ নানা রসাত্মক তাহাতে মতভেদ নাই। আমাদের প্রথম উপদেষ্টা এইরূপে আমাদিগকে তুলনায় সমালোচনের শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁহার তুলনা অতুল্য। বলিতে হইবে।

পরে এক জ্ঞানী সমালোচক আমাদিগকে আর একটি তুলনা শুনান। তাহাও দেওয়া যাইতেছে; তিনি বলেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় টাঁকশাল, ও তাঁহার গ্রন্থগুলি দুআনি সিকি আধুলি ও টাকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাগরী টাঁকশালে রূপা ব্যতীত সোণার সম্পর্ক নাই, টঙ্কযন্ত্রাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর অন্য স্থানে রূপা ক্রয় করিয়া নিজে খাদ মিশাইয়া ব্যবসা করিতেছেন। খণ্ড রূপা যেমন একটু পরিষ্কার করিয়া, চারিদিকে গোলাকার করিয়া কিরণ দিয়া, উপরে **QUEEN VICTORIA** ছাপিয়া দিলেই মুদ্রা হয়, সেইরূপ অন্যের রূপা একটু বাঙ্গালা বুসান চড়াইয়া, চতুষ্কোণ করিয়া চারিদিক ছাঁটিয়া উপরে "শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত" ছাপিয়া দিলেই সাগরিক গ্রন্থ হয়। বর্ণপরিচয় দুআনি, ; ক্ষুদ্র, বালকের জন্য প্রয়োজনীয়, শীঘ্র নষ্ট হয় বা হারাইয়া যায়। এইরূপ তাঁহার কোন গ্রন্থ সিকি, কোন গ্রন্থ আধুলি ও কোন গ্রন্থ টাকা। তিনি প্রথমে এক খোট্টা মহাজনের নিকট রূপা লইয়া মুদ্রাযন্ত্র বসান, সেই খোট্টার রূপায় টাকা প্রস্তুত করান; সে টাকার নাম "বেতাল পঁচিশ;" সেবার চেম্বরস্ বলে একজন বিলাতি মহাজনের নিকট রূপা লইয়া "জীবন চরিত" নাম দিয়া একটু কম খাদ মিশাইয়া ক হাজার আধুলি প্রস্তুত করাইয়া অনেক লাভ করিলেন। একজন বৃদ্ধ পশ্চিমে পণ্ডিত অধিক পরিমাণে বেশ খাটি রূপা রাখিয়া যান; তাহাই লইয়া আসিয়া আপনার নিজের খাদ কতক-গুলা দিয়া তাহাই "সীতার বনবাস" নামে টাকা করিয়া বিক্রয় করিয়াছেন। এখন ও ব্যবসা ছাড়েন নাই, আজি চারি বৎসর হইল সেক্ষপিয়রের "ধোঁকার মজা" বলে

খানিক রূপা ছিল তাহাতেই আপনার সেই মোহর দিয়া, "ভ্রান্তিবিলাস" টাকা নাম দিয়া বিক্রয় করিলেন। এইরূপে উপদেষ্টা প্রতিপন্ন করিলেন যে বিদ্যাসাগর টঙ্কযন্ত্র মাত্র। আর একজন উপদেষ্টা বলেন যে দিনবন্ধুবাবু কাঁচামিঠা আম গাছ। নীলদর্পণ তাহার মুকুল, তখন একবার দক্ষিণ মলয় বায়ুতে তাহার সৌরভ দিগ্বিস্তার করিয়াছিল; তাঁহার নিমচাঁদ, মল্লিকা, শ্রীনাথ, ক্ষীরোদবাসিনী, প্রভৃতি তাঁহার সেই কাঁচামিঠার কাঁচা অবস্থা; আর তাঁহার "দ্বাদশ কবিতা" "সুরধুনীতে" সেই ফল যে পাকিয়া উঠিতেছে তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

আর একজন বলেন বঙ্কিম বাবু মিষ্ট লঙ্কার আচার; আর বঙ্গদর্শন সেই আচারের হাঁড়ি। খানিক মিষ্ট লাগিবে; খানিক অম্লরসময়; অম্ল শুধু খেতে ভাল লাগে না কিন্তু ভাল খাইবার সময় অম্ল না হলে চলে না। কিন্তু ঝালের ভাগটা যাহার অদৃষ্টে পড়িবে তাহার হাড়ে হাড়ে ঋ ঋ করিবে।

আমরা তুলনায় সমালোচন সম্বন্ধে আমাদিগের উপদেষ্টৃগণের স্থানে এইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হই। এক্ষণে সেই শিক্ষার পরীক্ষা দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছি।

আমরা রায় গুণাকর ভারত চন্দ্রকে তাঁহার সৃষ্টা মালিনীর সহিত এক বলিয়া বিবেচনা করি। কবি ভারত ও হীরা মালিনী এক; বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়ন কর্ত্তা ও বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কর্ত্রী এক।

প্রথমে মালিনীর চিত্র।

"সূর্য্য যায় অস্ত গিরি আইসে যামিনী,
হেন কালে তথা এক আইল মালিনী,
কথায় হীরার ধার, হীরা তার নাম,
দাঁত ছোলা, মাজা দোলা, হাস্য অবিরাম,
গাল ভরা গুয়া পান, পাকি মালা গলে,
কাণে কড়ি কড়ে রাঁড়ি কথা কয় ছলে;
চূড়া বান্ধা চুল, পরিধান শাদা সাড়ী,
ফুলের চুপড়ি কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী।
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে,
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।
ছিটা ফোঁটা মন্ত্র তন্ত্র জানে কতগুলি,
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি,
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়,
পড়সী না থাকে কাছে কন্দলের দায়,
মন্দ মন্দ গতি, ঘন ঘন হাত নাড়া,
তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সেই পাড়া,"

এই চিত্রের সহিত কবি ভারতের তুলনা করুন।

প্রথমতঃ "কথায় হীরার ধার।" কবি ভারত কথার রাজা। নানা ভাবের কথা নানা রসের কথা তাঁহার গ্রন্থ কলাপ মধ্যে আছে। তিনি আপনি বলিয়াছেন;

"অন্নদা কহিল বাছা না করিহ ভয়,
আমার কৃপায় বলে বোবা কথা কয়,
গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা সাক্ষী পাবে,
যে কবে সে হবে গীত আনন্দে মাতাবে;
এত বলি অমৃতায় মুখে তুলি দিলা,
সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা।"

ইহাতে তাঁহার বলা হইল যে তাঁহার দৈবশক্তি ছিল। আবার বলিয়াছেন,

"মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী,
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী;
পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি,
কিন্তু সে সকল লোক বুঝিবারে ভারি,
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল,
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।"

সুতরাং দৈবশক্তি থাকুক বা না থাকুক তাঁহার পড়া শুনা বিস্তর ছিল বলিয়া বর্ণনা করিতে পারিতেন। ইহাতেই যথেষ্ট। আর অন্নদাদেবী যে বলিয়াছেন তাঁহার কৃপার সাক্ষী আছে, সে কথাও যথার্থ, তাঁহার অমৃতান্নের বলে অন্নদামঙ্গলে কথায় কথায় খই ফুটিতেছে। যে সংস্কৃত ছন্দগুলি বাঙ্গালায় আনা যাইতে পারে বাক্যরসরাজ সেগুলি তাঁহার গ্রন্থে দিয়াছেন। ভারত, পুরাণ, তন্ত্র হইতে সৃষ্টি বিবরণ দেখাইতেছেন, কাশীখণ্ড হইতে অন্নপূর্ণার অন্নদানের চিত্র প্রদর্শন করিতেছেন, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত শুনাইতেছেন, পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতা, মৎস্য মক্ষী দংশ, অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতির সুদীর্ঘ তালিকা দিতেছেন। অযোধ্যা বর্ণন করিতেছেন, দিল্লি বৰ্দ্ধমান যশোহর বর্ণনা করিতেছেন, গঙ্গার মাহাত্ম্য, জগন্নাথের মাহাত্ম্য বলিতেছেন। বারমাস, বায়ান্নপীঠ, অষ্ট নায়িকা, প্রভৃতি বর্ণন করিতেছেন। এত বৈচিত্র্য কিসের? কথার, ভারত কথায় হীরার ধার। তিনি বাগ্‌বিশারদ। শব্দ সমুদ্রের মন্থনদণ্ড তাঁহার নিজ হস্তে। বাগ্‌যুদ্ধে বঙ্গীয় সকল কবিকেই তাঁহার নিকট পরাস্ত হইতে হয়। কখনই তাঁহার মুখের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বী টেঁকিতে পারে না; পড়ুসী কাছে থাকিতে পারে না।

হীরার দাঁত ছোলা ইত্যাদি অঙ্গ পরিস্কৃতির লক্ষণ মাত্র। ভারতচন্দ্র রায়ের কাব্য সকলের পরিস্কৃতি প্রসিদ্ধ। ভাষা পরিস্কৃত ও মার্জ্জিত ; ছন্দঃ পরিস্কৃত ও মার্জ্জিত ; রচনা পরিস্কৃত ও মার্জ্জিত।

এক্ষণে মালিনী স্বভাবের সহিত এই কাব্যের ভাবের তুলনা করুন। মনে করুন, মালিনী, সেই হীরা মালিনী, মাজা মচকান, মাজা দোলান, ফিন্ ফিনে শাদা ধুতিখানি পরা, চুলটি ব্রজের গোষ্ঠের ভাবে বাঁধা, কোমরের কাছে ছোট ফুলের চুপড়িটি, পান মুখে একটু হাসি, সুন্দরের সম্মুখে বকুল তলে গিয়া দেখা দিল। সুন্দরের সহিত পরিচয় হইল। সুন্দর মাসী বলিয়া হীরাকে সম্বোধন করিলেন। সম্বোধন করিয়া একবার উর্দ্ধে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া আপাদ মস্তক পরীক্ষার চেষ্টা করিলেন। সুন্দর মাসী বলিয়া, ভক্তির ভাষায়, গৌরব বাক্যে হীরাকে সম্বোধন করিয়াছেন। হীরাকে দেখিতে পারিলেন না। মাসী বলিলে হীরার দিকে আর পূরা নজরে চাওয়া যায় না। আমাদের কবি ভারতও তাই। প্রথমতঃ কাব্য ভাব দেখুন। হীরার সেই গালভরা পান, আর কাব্যের সেই আদিরস পূর্ণতা। হীরার সেই মাজা দোলা ; আর ভারতের নাচনিচ্ছন্দ। হীরার সেই সুচিকণ পরিস্কৃত দন্ত ; আর কাব্যের সেই মার্জ্জিত স্বভাব। হীরার সেই মুচ্কে মধুর হাসি ; আর ভারতের সেই সহজপ্রসাদ গুণ। হীরাও হাসে ভারতের কবিতাও হাসে।

কিন্তু আমরা আর এক কথা বলিতেছিলাম যে মাসী বলিলে আর হীরার দিকে পূরা নজরে চাওয়া যায় না। অন্নদামঙ্গল ভক্তি রসাত্মক গ্রন্থ বলিলে ইহাও অপাঠ্য হইয়া উঠে। অন্নপূর্ণা বলিতেছেন "আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ" তাহাতেই ভারতচন্দ্র তাঁহার মহিমা প্রকাশ জন্য, তাঁহার পূজা জগতে প্রচার করিবার জন্য, অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। এই আজ্ঞা অন্নপূর্ণা না দিয়া যদি অন্য কোন দেবতা আপনার আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন, তাহা হইলেই উচিত হইত। আমাদের সকল ভাবেরই দেবতা আছে। কিন্তু তাহা হয় নাই ; অন্নদামঙ্গল কাশীশ্বরী অন্নদাত্রী দেবী অন্নপূর্ণার পূজা যাহাতে প্রচার হয় এই উদ্দেশ্যে রচিত হয় ; ইহা মনে পড়িলে তাহার বিদ্যাসুন্দর লীলা অপাঠ্য হইয়া পড়ে। কেবল তন্ত্রোপাসকেরাই এইরূপ রসভেদ একত্রে সংস্থাপন করিতে পারে, আর কেবল হীরা মালিনীই বনপোর দৌত্যে ভক্তিনিযুক্তা হইতে পারে।

মালিনী যখন প্রথমে সুন্দরকে আপন পরিচয় প্রদান করিল তখনি তাহার রীতি নীতি বেশ বোঝা গেল। মালিনী বলিতেছে।

"এস যাদু আমার বাড়ী
আমি দিব ভাল বাসা।
যে আশায় এসেছ ও ধন
পূর্ণ হবে মন আশা॥
আমার নাম হীরা মালিনী,
কড়ে রাঁড়ি নাইক স্বামী,
ভালবাসেন রাজনন্দিনী,
(করি) রাজ বাড়িতে যাওয়া আসা।"

ইহাতেই সকল কথা বলা হইল। সে নিজে পতিহীনা অল্পবয়স্কা, তাহাতে বড় ঘরে যাতায়াত আছে, আর সে বাড়ীর মেয়েরাও যথেষ্ট অনুগ্রহ করে, সুতরাং বুঝে লউন। আবার ভারতেরও ভাব ভক্তি এক আঁচড়ে বোঝা গিয়াছে। ভারত গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে যে দেবীর পূজা প্রচার জন্য গ্রন্থ রচনা করিবেন তাঁহার রূপ বর্ণন করিতেছেন ; বলিতেছেন—

"কিবা সুললিত উরু, কদলী কাণ্ডের গুরু,
নিরুপম নিতম্বে কিঙ্কিণী।
শোভে নিরুপম বাস, দশ দিশ পরকাশ,
ত্রিভুবন মোহন কারিণী॥
কটি অতি ক্ষীণতর, নাভি সুধা সরোবর,
উচ্চকুচ সুধার কলস।
কণ্ঠ কম্বুরাজ রাজে, নানা অলঙ্কার সাজে,
প্রকাশে ভুবন চতুর্দ্দশ॥"

দেখুন এ মালিনী স্বভাবাপন্ন গ্রন্থকারের কি আশ্চর্য্য রুচি ও প্রবৃত্তি। জগতের পালনকর্ত্রী, জগজ্জনের অন্নদাত্রী কারণ অমৃত বিতরণ করিয়া, দেবাদিদেব মহেশ্বরকে অমৃতপানে উন্মত্ত করিয়া, যক্ষ, রক্ষ, সিদ্ধ, সাধ্য সকলের অন্নদানে পরিপোষণ ও পরিতোষণ করিয়া কিছু করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার নিরুপম নিতম্বে কিঙ্কিণী আর তাহাতেই যে নিরুপম বাস শোভা করিতেছে তাহাতেই ত্রিভুবন মোহন কারিণী !!!

কি বিচিত্র রুচি! আবার ইহার উপর যদি তাঁহার "দশদিশ পরকাশ" বাক্যে কিছু শ্লেষ থাকে তবে তাঁহাকে আর তাঁহার মালিনীকে একত্রে "উভে উভ দিক খুলে" না বলিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না।

এমন কদর্য্য স্বভাবান্বিত কবিও বঙ্গদেশে সমূহ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। কেন? মালিনীর যে সকল গুণ থাকাতে চেঙ্গড়া মহলে তাহার পসার ছিল, ভারত

সেই সকল গুণেই বঙ্গীয় চেঙ্গড়া মহলে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। অনেকগুলি উল্লেখ করিয়া ভারতে ও মালিনীতে তুলনা করিয়াছি; আরো গুটিকত দেখাইতেছি। ভারতচন্দ্রের মালিনী "কথা কয় ছলে;" স্বয়ং ভারতচন্দ্রও কথা কন ছলে। এটি কিছু কবির বিশেষ গুণের মধ্যে নহে, কিন্তু বঙ্গদেশে এই ছল কথা কবিতার জীবনী শক্তি। মুন্সীআনা দেখিল ত বাঙ্গালি অমনি গলিয়া গেল; ভারতচন্দ্র এই মুন্সীগিরির খোষনবীশ। ভারতের মুন্সীগিরির সবিস্তার পরিচয় প্রদানের আবশ্যক নাই। তাঁহার দক্ষ মুখে শিব নিন্দা, অন্নদা মুখে ভবানীর পাটুনীকে পরিচয় দান, মালিনী মুখে বিদ্যার রূপ বর্ণন, আর নিজ মুখে চোর পঞ্চাশতী টীকা প্রভৃতিতে তাঁহার ছল কথার পরিচয় দিতেছে; ও তাঁহার পঞ্চাশাক্ষরী স্তবে, বেসাতির হিসাবে, তোটক তূণক ভুজঙ্গ প্রয়াত প্রভৃতিতে তাঁহার শব্দ চাতুর্য্যের পরিচয় দিতেছে।

ভারতকাব্য প্রবলতার আর একটি কারণ আছে। ভারত তাঁহার মালিনীর ন্যায় "ফুলের চুপড়ি কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী।" মনে করুন দেখি "চাই বেলফুল" বলিলে কত লোক সেইদিকে যায়; দুপয়সায় কি চারি পয়সায় একছড়া গড়ে; কেমন শুভ্র, সুগন্ধ, কোমল, ও রমণীয়! কাল সে মালার কি দশা হবে কোন কাজে লাগিবে কি না তাহা কি কেহ কখন ভাবে না। আর যদি কেহ "ভাল কেতাব চাই" "ভাল কেতাব চাই" বলিয়া চীৎকার করিয়া মরে, তবে বলুন দেখি কয়জন তাহার দিকে যায়; বড় জোর আজ কাল বৎসরের প্রথম দিন না হয় একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করা গেল, "কেমন হে হকার, বলি হাপ পাঁজি আছে?" যদি সে বলিল, না, তবেই তাহার সহিত সম্পর্ক ফুরাইল। কিন্তু ভারত ফুল ব্যবসায়ী, তাহার খরিদদারও অনেক ও নানা রঙ্গী। ভারতকে ফুল ব্যবসায়ী কেন বলি? তিনি ক্ষণস্থায়ী রসব্যবসায়ী। তিনি এই ফুলের চুপড়ি লইয়া এই বঙ্গরাজ্যে কাহার বাড়ী না গিয়াছেন? প্রথমে রাজবাড়ী ফুল যোগাইতেন বটে, কিন্তু এক্ষণে ক্রমে ক্রমে সকল গৃহস্থ ভবন পর্য্যটন করিয়া সোনা গাজি, মেছো বাজার প্রভৃতি স্থলে পসার বিস্তার করিতেছেন। যেখানে দেখিবেন "চাই বেলফুলের" ডাক অধিক সেইখানেই দেখিবেন যে এখন ভারতচন্দ্র রায়ের সমাদর অধিক। তবে কি ভদ্রলোক ভারতের গ্রন্থকলাপ কখনই পাঠ করিবে না? উত্তর, কেন ভদ্রলোকে কি ফুলের আদর জানে না? না ফুল ব্যবসায়ী ভদ্র পল্লীতে থাকে না? তবে কিনা ভদ্রলোকে যদি মালিনী গোয়ালিনীর বিশেষ গৌরব করেন, বা কবি ভারতকে পরম পূজনীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত কবিবর জ্ঞান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের রুচির প্রশংসা করিতে পারি না। বরং কখন কখনও তাহাতেই তাঁহাদের স্বভাব দোষ অনুমেয় হইয়া উঠে।

এতদ্ব্যতীত ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার মালিনীর ন্যায় কতকগুলি ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র জানেন, সেগুলিও তাঁহার সুখ্যাতি বিস্তারের কারণ বলিতে হইবে। সুদীর্ঘ বর্ণনে ভারতচন্দ্র কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু ছিটে ফোঁটা মত তাঁহার দুএকটি গান অতি মনোহর। ভাল সামগ্রীর সমাদর থাকাই শ্রেয়ঃ; আমরা ভাল বস্তুর বিশেষ সমাদর করি, তাহাতেই তাঁহার দুইটি গান এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান

রাগ বসন্ত

কাল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে।
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল,
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে;
বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিণী রাণী,
করিল রাজধানী অশোক মূলে;
কুসুমে পুন পুন, ভ্রমর গুণ গুণ,
মদন দিল গুণ ধনুক হূলে,
যতেক উপবন, কুসুমে সুশোভন,
মধু মুদিত মন ভারত ভুলে॥

সুন্দরের পুর প্রবেশ

ওহে বিনোদরায় ধীরি ধীরি যাও হে,
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে;
নব জলধর তনু, শিখিপুচ্ছ শক্র ধনু,
পীতধড়া বিজলিতে ময়ূরে নাচাও হে;
নয়ন চকোর মোর, দেখিয়া হয়েছে ভোর,
মুখ সুধাকরে হাসি সুধায় বাঁচাও হে,
নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি, সে খেলা খেলাও হে,
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও,
ভারত যেমন চাহে সেই মত চাও হে॥

এরূপ মধু মন্ত্র গানে সকলেই মোহিত হয়; ভারত একস্থানে বলিয়াছেন,

"সুশোভিত তরুলতা নবদল পাতে,
তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে,
অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনী কোলে,
সুখে দোলে মন্দ বায়ে জলের হিল্লোলে।"

এ সকল যাদু মন্ত্র বিশেষ বলিলেই হয়। একটি আড়াই অক্ষরের মন্ত্র দেখুন;

নির্ম্মল চন্দ্রিকা, প্রফুল্ল মল্লিকা,

শীতল মন্দ পবন।

স্বভাবের কি অপরূপ চিত্র! এমন সব ছিটে ফোঁটায় বাঙ্গালি বশ হইবে তাহার আর বিচিত্রতা কি?

আর একটি—,

তনু মোর হৈল যন্ত্র, যত শির তত তন্ত্র,

আলাপে মাতিল মন মাতালে নাচায়োনা,

ওহে পরাণ বঁধু যাই গীত গায়ো না।

কোন ভাব প্রসঙ্গে শরীর মধ্যে যে শিরায় শিরায় তাড়িত প্রবাহ চালিত হইতে থাকে তাহা যিনি অনুভব করিয়াছেন তিনিই এ মন্ত্র মহৌষধের বল বুঝিতে পারিবেন।

এই পর্য্যন্ত দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইতে হইলাম।

মালিনী ও ভারত উভয় পক্ষেই বলা যায় যে

আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে,

এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে,

ছিটা ফোঁটা মন্ত্র তন্ত্র জানে কত গুলি,

চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি।

এখনও ভারত সমাদরের কিঞ্চিৎ থাকুক, তাহাতেও আপত্তি নাই এবং ভারত ও তাঁহার মালিনী এখনও চেঙ্গড়া ভুলায়ে খাইতে থাকুন তাহাতেও আপত্তি নাই। কিন্তু যে যুবক মালিনীর বাড়ী বাসা লইয়া থাকে তাহার দিকে একটু সকলের দৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়, আর যে সকল বঙ্গীয় মহাজন ভারতকে মালিনী স্বভাবাপন্ন কবিযোগ্য আদর অপেক্ষা অধিক গৌরব প্রদান করিতে চান, তাঁহাদের দিকেও সকলের একটু দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

শ্রীঅঃ

এক শ্রেণীর নিন্দকেরা আমাদের ভিক্ষুক বলিয়া উপহাস করেন। তাঁহারা বলেন যে বাঙ্গালিরা ভিক্ষা করেন, কিন্তু তাহা অভাব হেতু নহে স্বভাব হেতু।

তাঁহারা বলেন যে আমরা নাম ফের করিয়া ভিক্ষা করি। ভিক্ষাও করি অথচ ভিক্ষাকে ভিক্ষা বলি না। আমাদের পদ ও প্রয়োজন অনুসারে ভিক্ষার নানা প্রকার নাম দিই। যথা, রাজারাজড়ার ভিক্ষার নাম নজর। জমীদারের ভিক্ষার নাম মাগন। 'কুটুম্বের ভিক্ষার নাম বিদায়। সমতুল্যের ভিক্ষার নাম মর্য্যাদা। পূজ্যের ভিক্ষার নাম প্রণামী। স্নেহপাত্রের ভিক্ষার নাম আশীর্ব্বাদী। বিবাহ উপলক্ষে বরের ভিক্ষার নাম পণ। বরযাত্রীর ভিক্ষার নাম গণ। কন্যাযাত্রীর ভিক্ষার নাম ডেলা ভাঙ্গানী। যুবতীর ভিক্ষার নাম শয্যা তোলানী। কেবল পোড়া দরিদ্র ব্যক্তির ভিক্ষার নাম ভিক্ষাই রহিয়াছে।

নিন্দকেরা আরও বলেন যে এখানে সকলই বিপরীত। ধনবান্ জমীদারগণ দরিদ্র প্রজার নিকট ভিক্ষা করেন। দাম্ভিক কুলীন উপায়হীনা পত্নীর নিকট ভিক্ষা করেন।

এই নিন্দকেরা বিবেচনা করেন যে আমাদিগের যৎকিঞ্চিৎ কেহ দান করিলেই আমরা সম্মানিত বোধ করি। এই জন্য আত্মীয়ের বাটীতে বিদায় লই, বরযাত্রে গণ লই, সামান্য লোকের বাটীতে আহার করিয়া কখন মর্য্যাদা বলিয়া, কখন বা দক্ষিণা বলিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লই।

নিন্দকেরা আরও বলেন যে আমরা আজন্ম মরণ কেবল ভিক্ষাই করি। এক বার ভূমিষ্ট হইবামাত্রেই যৌতুক লই, আবার অন্নপ্রাশনে লই। পুনরায় উপনয়নে ভিক্ষা করি। সেই সময় মাতা মাতুলানী প্রভৃতি সকলের নিকট ভিক্ষা করি। তখন প্রকৃত প্রস্তাবে ঝুলি স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষা করি। লক্ষপতি হইলেও সেই সময় আমাদের ভিক্ষা করিতেই হইবে। ভিক্ষা যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য চির-কালের আশা ভরসা তাহা এই সময়ে শিখিতে হইবে। অন্নপ্রাশনে যাহাই হউক, উপনয়ন অবধি আমাদের ভিক্ষা আরম্ভ হয়, পরে রাজাই হই আর প্রজাই হই

ভিক্ষা আমাদের অত্যজ্য। তখন জমীদার হইয়া ভিক্ষা করি, সরকারি কার্য্য করিয়া ভিক্ষা করি, বেদিতে বসিয়া ভিক্ষা করি। ঢোল বাঁধিয়া ভিক্ষা করি। দেবতা পুষিয়া ভিক্ষা করি। কন্যার বয়স বাড়াইয়া ভিক্ষা করি। লোকের বিবাহে ভিক্ষা করি। লোকের শ্রাদ্ধে ভিক্ষা করি। আবার আপনার শ্রাদ্ধেও ভিক্ষা করি। কিন্তু এই শেষ ভিক্ষাটি—মারফতে শ্রাদ্ধাধিকারী।

বাঙ্গালির ব্রাহ্মণীও বড় মন্দ নন। তিনি গৃহে পদার্পণ মাত্রই মুখ দেখাইয়া কিছু কিছু ভিক্ষা করিয়া দেন।

এইরূপে, নিন্দকেরা বলেন, যে আবাল বৃদ্ধ বনিতা আমরা সকলেই ভিক্ষা করি। আমাদের ধর্ম্মে ভিক্ষা, কর্ম্মে ভিক্ষা, শোকে ভিক্ষা, তাপে ভিক্ষা, হর্ষে ভিক্ষা, সকল উপলক্ষেই ভিক্ষা। ভিক্ষা আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। অধিক কি, আমরা যে দেবাদিদেব মহাদেব কল্পনা করিয়াছি তাঁহাকেও ভিক্ষুক সাজাইয়া তাঁহার স্কন্ধে ঝুলি ঝুলাইয়া দিয়াছি। তাঁহারে ভিক্ষুক ভাবিয়া পূজা করি। আমাদের উপযুক্ত দেবতা বটে।

নিন্দকেরা অল্পে ছাড়েন না। তাঁহারা বলেন যে গুরু শব্দে বাটীর বাঁধা ভিক্ষুক বুঝায়। গুরু, পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভিক্ষা করিবেন। আমরা কিংবা আমাদের ওয়ারীসান কেহ কস্মিন কালে কোন ওজর আপত্তি করিতে পারিবে না। যদি করি কি করে তবে সে বাতিলও না মঞ্জুর।

এদেশের ভিক্ষুকগণ দয়া উদ্দীপন করিয়া ভিক্ষা করে না, বল দ্বারা করে, অতএব না পাইলে সহজে ফেরে না। কেহ দণ্ড করেন, কেহ ভ্রূভঙ্গী করেন, আবার কোন ভিখারী (কেন দিবিনে) বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়ান। জমীদারকে ভিক্ষা না দিলে তিনি জরিমানা করেন; ঘর দরওয়াজা ভাঙ্গিয়া দেন। ব্রাহ্মণকে না দিলে তিনি অভিসম্পাত করেন, নির্ব্বংশ করিবেন ইচ্ছায় পৈতা ছেঁড়েন। শ্রাদ্ধের ভিখারীরা মনের মত না পাইলে স্বর্গীয় ব্যক্তির নরক দেখান। পশ্চিমে ভিখারীরা মনস্তুষ্টি না হইলে ধরনা দেন। এইরূপ অনেক প্রকার শাসন দ্বারা এদেশের ভিখারীরা ভিক্ষা করেন। অপর কি, তীর্থস্থানে লোক কাঁটা মারিয়া ভিক্ষা করে।

ভিক্ষার আবার আসবাব আছে। কাহারো আসবাব ভস্ম, কাহারো আসবাব মালা চন্দন। কাহারো আসবাব কাঁথা ঝুলি, কাহারো আসবাব হাতি ঘোড়া। কাহারো আসবাব জটা শ্মশ্রু, কাহারো আসবাব মস্তক মুণ্ডন। কাহারো আসবাব দন্তে তৃণ, কাহারো আসবাব গলায় কুড়ালি। কাহারো কেবল ভরসা সরু তিলক, কাহারো ভরসা দীর্ঘ ফোঁটা। কেহ উলঙ্গ, কেহ পট্টবস্ত্র পরিধান। কাহারো আসবাব কেবল যজ্ঞোপবীত, কাহারো আসবাব গলায় দড়ি। কাহারো দাবী

কুলীন সন্তান বলিয়া, কাহারো দাবি গৃহে কুমারী কন্যা বলিয়া। কাহারো দাবি বাহু ঊর্দ্ধ রাখিয়াছেন এই বলিয়া, কাহারো দাবি কোন অঙ্গ ইচ্ছা পূর্ব্বক নষ্ট করিয়াছেন, এই বলিয়া। এইরূপ নানা প্রকার আছে।

এই সকল আসবাব অনুসারে আবার সম্মান ও স্বভাবেরও বিভিন্নতা হইয়া থাকে। সরু তিলক অপেক্ষা মোটা ফোঁটার মান বেশি। যিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন অঙ্গ নষ্ট করিয়াছেন তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা দাবি বেশি। যিনি মাথায় কাল্পনিক জটা জড়াইয়াছেন তাঁহার সকল অপেক্ষা রাগ বেশি।

১

মরুভূম মাঝে যেন, একই কুসুম,
পূর্ণিত সুবাসে।
বরষার রাতে যেন, একই নক্ষত্র,
আঁধার আকাশে॥
নিদাঘ সন্তাপে যেন, একই সরসী,
বিশাল প্রান্তরে।
রতন শোভিত যেন, একই তরণী,
অনন্ত সাগরে।
তেমনি আমার তুমি, প্রিয়ে,
সংসার ভিতরে॥

২

চির দরিদ্রের যেন, একই রতন,
অমূল্য, অতুল।
চির বিরহীর যেন, দিনেক মিলন,
বিধি অনুকূল॥
চির বিদেশীর যেন, একই বান্ধব,
স্বদেশ হইতে।
চির বিধবার যেন, একই স্বপন,
পতির পীরিতে।
তেমনি আমার তুমি, প্রাণাধিকে,
এ মহীতে॥

৩

সুশীতল ছায়া তুমি, নিদাঘ সন্তাপে,
রম্য বৃক্ষতলে।
শীতের আগুন তুমি, তুমি মোর ছত্র,
বরষার জলে॥
বসন্তের ফুল তুমি, তিরপিত আঁখি,
রূপের প্রকাশে।
শরতের চাঁদ তুমি চাঁদ বদনি লো,
আমার আকাশে
কৌমুদী মধুর হাসি, দুখের
তিমির নাশে॥

৪

অঙ্গের চন্দন তুমি, পাখার ব্যজন,
কুসুমের বাস।
নয়নের তারা তুমি, শ্রবণেতে শ্রুতি,
দেহের নিশ্বাস॥
মনের আনন্দ তুমি, নিদ্রার স্বপন,
জাগ্রতে বাসনা।
সংসারে সহায় তুমি, সংসার বন্ধন,
বিপদে সান্ত্বনা।
তোমারি লাগিয়ে সই, ঘোর সংসার
যাতনা॥

মানসরঞ্জন। শ্রীকৈলাস চন্দ্র দে প্রণীত। কলিকাতা বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্ট যন্ত্র।

এখানি কতকগুলিন কবিতার সংগ্রহ। তাহার এক ছত্রও পাঠ্য নহে। এক এক স্থানে বড় আমোদজনক, যথা—

> ঈশ্বর-প্রেরিতা সেই স্বাধীনতা সুধা।
> পানে পরিপুষ্ট কায় নাশে দাস্য-ক্ষুধা॥

পুনশ্চ!

> সরলতা যে প্রদেশে করে অধিবাস।
> থাকে না থাকে না তথা কপটতাভাস॥

দাস্য-ক্ষুধা এক প্রকার নূতন জাতীয় ক্ষুধা বটে, কিন্তু কপটতাভাস কি? এই জন্য কি গ্রন্থের নাম "মানসরঞ্জন?"

কাব্য কদম্ব। শ্রীগঙ্গানারায়ণ প্রধান প্রণীত। কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটা সাহিত্য যন্ত্র। বিদ্যালয়ে পাঠের জন্য এই কবিতাগুলি রচিত হইয়াছে। তাহার অনুপযোগী বলিয়া বোধ হইল না। বিস্তারিত সমালোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়।

Annals and Antiquities of Rajasthan, by Lieut. Colonel James Tod. Published by Hari Mohan Mookerjee, Calcutta, 14, Goa Bagan Street.

ভারতবাসীর পক্ষে এখানি অমূল্য গ্রন্থ। এক্ষণে ইহা একেবারে অপ্রাপ্য হইয়াছে। হরিমোহন বাবু ইহা পুনঃ মুদ্রিত করিতেছেন। তাঁহার এই উদ্যম ও যত্ন যে কি পর্য্যন্ত প্রশংসনীয় তাহা বলা যায় না। কি হিন্দু, কি ইউরোপীয় যে কেহ ভারতবর্ষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তিনিই হরিমোহন বাবুর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেন। বিশেষ এই বৃহৎ গ্রন্থ পুনর্মুদ্রাঙ্কন অতিশয় ব্যয়সাধ্য এবং কঠিন ব্যাপার। হরিমোহন বাবু প্রথম দুই সংখ্যা যেরূপ ছাপিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। এরূপ সুচারু মুদ্রাকার্য্য আমরা ভারতবর্ষে প্রায় দেখি নাই। চিত্রগুলি সমেত ইহা মুদ্রিত হইতেছে। কাগজ অতি পরিপাটি, অক্ষর

অতি সুন্দর, ছাপার ভুল দেখিতে পাইলাম না। মূল্যও অতি অল্প। ইহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইতেছে, ৩২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৸৹ আনা; সমুদায়ের অগ্রিম মূল্য ১৬৲ টাকা, ডাক মাসুল সমেত ২০৲ টাকা। ভরসা করি যে কোন হিন্দু ইংরাজি জানেন, তিনিই ইহার এক এক খণ্ড সংগ্রহ করিবেন।

কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা। কলিকাতা আদি ব্রহ্মসমাজ যন্ত্র।

কাশীশ্বর বাবুর মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র বাবু শ্রীনাথ মিত্র এই বক্তৃতা গুলিন মুদ্রিত করাইয়াছেন। উহা চুঁচুড়া ব্রাহ্মসমাজে উক্ত হইয়াছে। যিনি অনতি দীর্ঘকাল পরলোক গত হইয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইলাম না।

উৎকল দর্পন। মাসিক পত্রিকা। বালেশ্বর। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেব দ্বারা প্রকাশিত।

এখানি উড়িয়া ভাষায় প্রচারিত। কতিপয় কৃতবিদ্য যুবকের দ্বারা লিখিত হইয়া উক্ত ধনাঢ্য দেশের উপকারার্থে ইহা প্রকাশিত হইতেছে। সহজেই আমরা সাদরে ইহাকে অভ্যর্থনা করিতেছি। দেশীয় এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক উৎকলদেশে তাহা প্রচারিত করা পত্রিকার সঙ্কল্প প্রার্থনা করি, সঙ্কল্প ফলবান হউক। বালেশ্বরে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকাও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। এ জেলার বিদ্যোন্নতি পক্ষে এবং সদালোচনার উৎসাহ দানে শ্রীযুত বিম্স সাহেব সম্যক্‌রূপে ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

হিন্দু আচার ব্যবহার, প্রথম ভাগ। শ্রীমনোমোহন বসু প্রণীত। কলিকাতা মধ্যস্থ যন্ত্র।

পূর্ব্বকালের হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার বর্ণনা ইহার উদ্দেশ্য। এক্ষণে আফ্রিকা, আমেরিকা, বা সাগর মধ্যস্থ বহুদূরস্থিত দ্বীপনিবাসী অশ্রুতনাম অসভ্য জাতিদিগের আচার ও ব্যবহার জানিতে পারিতেছি, কিন্তু আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের আচার ব্যবহারের বিষয় কিছুই জানি না। সপ্ততিবৎসর বয়স্ক সন্ধ্যাআহ্নিক পরায়ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইলেই মনে করি, পাণিনি, পতঞ্জল, কপিল গৌতম, কালিদাস, ভবভূতির সমকালিক লোকেরা এই চরিত্রেরই ছিলেন। অথচ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে পূর্ব্বকালিক হিন্দুদিগের সহিত বরং আধুনিক ইউরোপীয় জাতিদিগের সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে, তথাপি এক্ষণকার হিন্দুদিগের সহিত সাদৃশ্য দেখা যাইবে না। সে দিন বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমাণ করিয়াছেন, যে আমাদের পূর্ব্বগামী হিন্দুগণ গোমাংস ভোজন করিতেন। পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র বাবু আবার সেদিন যেরূপ শ্রীকৃষ্ণাদির উপভুক্ত পিকনিকের বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহাতে যদুবীরগণকে সাহেব বলিতেই ইচ্ছা করে। বাস্তবিক, আধুনিক অবনতির পথারূঢ়

নিস্তেজ হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার এবং প্রাচীন তেজস্বী, জাতিশ্রেষ্ঠ আর্য্যদিগের আচার ব্যবহার অবশ্য বিশেষ প্রভেদ বিশিষ্ট হইবে তাহার সন্দেহ নাই, আমরা তাহার আলোচনায় পরাঙ্মুখ বলিয়াই সে প্রভেদ অনুভূত করিতে পারি না। সেই সন্ধানে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক, মনোমোহন বাবুর এই গ্রন্থ তাঁহাদিগের সৎসহায়। সেজন্য আমরা মনোমোহন বাবুর নিকট সংক্ষেপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ এবং দুর্গা এই বঙ্গদেশের প্রধান আরাধ্য দেবতা। ইহাদিগের পূজা না করে এমত হিন্দু প্রায় বঙ্গদেশে নাই। কেবল পূজা নহে, কৃষ্ণভক্তি ও দুর্গাভক্তি এ দেশের লোকের সর্ব্বকর্ম্মব্যাপী হইয়াছে। প্রভাতে উঠিয়া শিশুরাও "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া গাত্রোত্থান করে। যে কিছু লেখা পড়া আরম্ভ করিতে হইলে, আগে দুর্গা নাম লিখিতে হয়। "দুর্গে," "দুর্গে দুর্গতিনাশিনি" ইত্যাদি শব্দ অনেকের প্রতিনিশ্বাসেই নির্গত হয়। আমাদিগের প্রধান পর্ব্বাহ দুর্গোৎসব। সেই উৎসব অনেকের জীবনমধ্যে প্রধান কর্ম্ম বা প্রধান আনন্দ। সম্বৎসর তাহারই উদ্যোগে যায়। পথে পথে কালীর মঠ। অমাবস্যায় অমাবস্যায় কালীপূজা। কোন গ্রামে পীড়া আরম্ভ হইলে রক্ষাকালী পূজা। কাহারও কিছু অশুভ সম্ভাবনা হইলেই চণ্ডী পাঠ—অর্থাৎ কালীর মহিমা কীর্ত্তন। ইহার প্রীত্যর্থ পূর্ব্ববঙ্গে অনেক প্রাচীন বিজ্ঞব্যক্তিও মদ্যপান ও অন্যান্য কুৎসিত কর্ম্মে রত। ফলে এই দেবী বঙ্গদেশ শাসন করিতেছেন। ডাকাইতেরা ইহার পূজা না দিয়া ডাকাইতি করে না।

এই দেবী কোথা হইতে আসিলেন ? ইনি কে ? আমাদিগের হিন্দুধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম বলিবার কারণ এই যে, এই ধর্ম্ম বেদমূলক। যাহা বেদে নাই, তাহা হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত কি না সন্দেহ। যদি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন গুরুতর কথা বেদে না থাকে, তবে হয় বেদ অসম্পূর্ণ, না হয় সেই কথা হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত নহে। বেদ অসম্পূর্ণ ইহা আমরা বলিতে পারি না, কেননা তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিতে হয়। তবে দ্বিতীয় পক্ষই এমন স্থলে অবলম্বনীয় কি না, তাহা হিন্দুদিগের বিচার্য্য।

দুর্গার কথা বেদে আছে কি ? সকল হিন্দুরই কর্ত্তব্য যে এ কথার অনুসন্ধান করেন। আমরা অদ্য তাঁহাদের এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করিব।

অনেকেই জানেন যে বেদ একখানি গ্রন্থ নয়। অথবা চারি বেদ চারিখানি গ্রন্থ মাত্র নহে। কতকগুলিন মন্ত্র, কতকগুলিন "ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থ, এবং কতক-

গুলিন উপনিষদ্ লইয়া এক একটি বেদ সম্পূর্ণ। তন্মধ্যে মন্ত্রই বেদের শ্রেষ্ঠাংশ বলা যাইতে পারে।

ইহা একপ্রকার নিশ্চিত যে কোন বৈদিক সংহিতায় এই দেবীর বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, বায়ু, সোম, অগ্নি, বিষ্ণু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতার ভূরি ভূরি উল্লেখ ও স্তুতিবাদ আছে, পূষণ, অর্য্যমন প্রভৃতি এক্ষণে অপরিচিত অনেক দেবতার উল্লেখ আছে, কিন্তু দুর্গা বা কালী বা তাঁহার অন্য কোন নামের বিশেষ উল্লেখ নাই।

ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের অষ্টমাষ্টকে "রাত্রি পরিশিষ্টে" একটি দুর্গা-স্তব আছে মাত্র। কিন্তু তাহাতে যদিও দুর্গা নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি তাঁহাকে আমাদের পূজিতা দুর্গা বলা যাইতে পারে না। উহা রাত্রি স্তোত্র মাত্র। সন্দিহান পাঠকের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ, আমরা উহা উদ্ধৃত করিলাম।

আরাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতুরপ্রায়ি ধামভিঃ।
দিবঃ সদাংসি বৃহতী বিতিষ্ঠসে ত্বেষাং বর্ত্ততে তমঃ ॥১॥
যে তে রাত্রি নৃচাক্ষসো যুক্তাসো নবতির্নব।
অশীতিঃ সন্ত্বষ্টা উতোতে সপ্ত সপ্ততীঃ ॥২॥
রাত্রিং প্রপদ্যে জননীং সর্ব্বভূতনিবেশনীং।
ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতো নিশাং ॥৩॥
সম্বেশনীং সম্যমনীং গ্রহনক্ষত্রমালিনীম্ প্রপন্নোহং শিবাং রাত্রিং
ভদ্রে পারং অশীমহি ভদ্রে পারং অশীমহি ওঁ নমঃ ॥৪॥
স্তোষ্যামি প্রযতো দেবীং শরণ্যাং বহ্বৃচপ্রিয়াং
সহস্র সংমিতাং দুর্গাং জাতবেদসে সুনবাম সোমম্ ॥৫॥
শান্ত্যর্থং তদ্দ্বিজাতীনামৃষিভিঃ সোমপাশ্রিতাঃ। (সমুপাশ্রিতাঃ ?)
ঋগ্বেদে ত্বং সমুৎপন্নারাতীয়তোনিদহাতি বেদঃ ॥৬॥
যে ত্বাং দেবি প্রপদ্যন্তে ব্রাহ্মণাঃ হব্যবাহিনীং।
অবিদ্যা বহুবিদ্যা বা স নঃ পর্ষদতি দুর্গানিবিশ্বাঃ ॥৭॥
অগ্নিবর্ণাং শুভাং সৌম্যাং কীর্ত্তয়িষ্যন্তি যে দ্বিজাঃ।
তান্ তারয়তি দুর্গানি নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥৮॥
দুর্গেষু বিষমে ঘোরে সংগ্রামে রিপুসঙ্কটে।
অগ্নিচৌরনিপাতেষু দুষ্ট গ্রহ নিবারণে ॥৯॥
দুর্গেষু বিষমেষু ত্বাং সংগ্রামেষু বনেষু চ।
মোহয়িত্বা প্রপদ্যন্তে তেষাং মে অভয়ং কুরু
তেষাং মে অভয়ং কুরু ওঁ নমঃ ॥১০॥

কেশিনীং সর্ব্বভূতানাং পঞ্চমীতি চ নাম চ।
সা মাং সমা নিশা দেবী সর্ব্বতঃ পরিরক্ষতু
সর্ব্বতঃ পরিরক্ষতু ওঁ নমঃ ॥১১॥
তামগ্নিবর্ণাস্তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ ॥১২॥
দুর্গা দুর্গেষু স্থানেষু সন্নোদেবীরভীষ্টয়ে।
য ইমং দুর্গাস্তবং পুণ্যং রাত্রৌ রাত্রৌ সদা পঠেৎ।
রাত্রিঃ কুশিকঃ সৌভরো রাত্রিস্তবো গায়ত্রী রাত্রিসূক্তং
জপেন্নিত্যং তৎকালমুপপদ্যতে ॥১৩॥

এই সংস্কৃত এক এক স্থানে অত্যন্ত দুরূহ, এজন্য আমরা ইহার অনুবাদে সাহসী হইলাম না। ডাক্তর জনমিয়োর কৃত ইংরাজি অনুবাদের অনুবাদ নিম্নে লিখিলাম। তাঁহার অনুবাদও সন্তোষজনক নহে।

"হে রাত্রি! পার্থিব রজঃ তোমার পিতার কিরণে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। হে বৃহতি! তুমি দিব্যালয়ে থাক, অতএব তমঃ বর্ত্তে। যে নরদর্শকেরা তোমাতে যুক্ত তাহারা নব নবতি বা অষ্টাশীতি বা সপ্তসপ্ততি হউক (অর্থ কি ?) সর্ব্বভূত নিবেশনী, জননী, ভদ্রা, ভগবতী, কৃষ্ণা, এবং বিশ্বজগতের নিশাস্বরূপ রাত্রিকে প্রাপ্ত হই। সকলের প্রবেশকারিণী শাসনকর্ত্রী (?) গ্রহ নক্ষত্র মালিনী, মঙ্গলযুক্তা রাত্রিকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি; হে ভদ্রে! আমরা যেন পারে যাই, আমরা যেন পারে যাই, ওঁ নমঃ। দেবী, শরণ্যা, বহ্বৃচপ্রিয়া, সহস্রতুল্যা দুর্গাকে আমি যত্নে তুষ্ট করি। আমরা জাত বেদাকে (অগ্নি) সোমদান করি। দ্বিজাতিগণের শান্ত্যর্থ তুমি ঋষিদিগের আশ্রয় (?) ঋগ্বেদে তুমি সমুৎপন্না, অগ্নি অরাতিদিগের দহন করেন (?) দেবি! যে ব্রাহ্মণেরা, অবিদ্যা হউন বা বহুবিদ্যা হউন, তোমার কাছে আসেন, তিনি (?) আমাদের সকল বিপদে ত্রাণ করিবেন। যে ব্রাহ্মণেরা অগ্নিবর্ণা শুভা, সৌম্যাকে কীর্ত্তিত করিবে সমুদ্রে নৌকার ন্যায় অগ্নি তাহাদিগকে বিপদ হইতে পার করিবেন। বিপদে ঘোর বিষম সংগ্রামে, সঙ্কটে বিষম বিপদে সংগ্রামে, বনে অগ্নিনিপাতে, চোরনিপাতে, দুষ্টগ্রহ নিবারণে, তোমার কাছে আসে, এ সকল হইতে আমাকে অভয় কর! এ সকল হইতে আমাকে অভয় কর! ওঁ নমঃ! যিনি সর্ব্বভূতের কেশিনী, পঞ্চমী নাম যাঁর, সেই দেবী প্রতিরাত্রে সকল হইতে পরিরক্ষণ করুন্! সকল হইতে পরিরক্ষণ করুন্! ওঁ নমঃ। অগ্নিবর্ণা তপের দ্বারা জ্বালা বিশিষ্টা, বৈরোচনী, কর্ম্মফলে জুষ্টা, দুর্গাদেবীর শরণাগত হই, হে সুবেগবতি! তোমার বেগকে নমস্কার। দুর্গাদেবী বিপদস্থলে আমাদের মঙ্গলার্থ হউন। এই পবিত্র দুর্গা স্তব যে রাত্রে

রাত্রে সদা পাঠ করিবে—রাত্রি, কুশিক, সৌভর, রাত্রিস্তব, গায়ত্রী, যে রাত্রিসূক্ত নিত্য জপ করে সে তৎকাল প্রাপ্ত হয়।”

ইহার সকল স্থলে অনুবাদ হইয়া উঠে নাই, এবং যাহা অনুবাদ হইয়াছে তাহার সকল স্থলের কেহ অর্থ করিতে পারে না। কিন্তু এত দূর বুঝা যাইতেছে, যে যদি এই দেবী আমাদের পূজিতা দুর্গা হয়েন,তবে দুর্গা রাত্রির অন্যতর নাম মাত্র।

ইহা ভিন্ন যজুর্ব্বেদের (বাজসনেয়) সংহিতায় একস্থানে অম্বিকার উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে অম্বিকা শিবের ভগিনী—যথা :—

“এষতে রুদ্র ভাগঃ স্বস্রা অম্বিকয়া স্বং জুষস্ব স্বাহা।”

আর কোন সংহিতায় কোথাও দুর্গার কোন নামের কোন উল্লেখ নাই।

তৎপরে ব্রাহ্মণ। কোন ব্রাহ্মণে কোন নামে ইহার কোন উল্লেখ নাই। তার পর উপনিষদ্। উপনিষদে দুর্গার নাম কোথাও নাই; একস্থানে উমা হৈমবতী, আর একস্থানে কালী করালী নামের উল্লেখ আছে। ঐ দুইটি স্থানই আমরা ক্রমশঃ উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম, কেনোপনিষদে আছে—

“অথ ইন্দ্রং অব্রুবন্, মঘবন্নেতদ্বিজা নীহি কিমেতদযক্ষমিতি। তথেতি তদভ্যদ্রবত্তস্মাত্তিরোদধে।

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্।

তাং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষ মিতি।

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি। ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।”

“তাঁহারা তখন ইন্দ্রকে বলিলেন, ‘মঘবন্ এ যক্ষ কি জানুন।’ ইন্দ্র “তাই” বলিয়া তাহার কাছে গেলেন, সে অন্তর্দ্ধান হইল।

সেই আকাশে বহু শোভমানা উমা হৈমবতী নামক স্ত্রীলোকের নিকট আসিলেন। তাঁহাকে বলিলেন, “কি এ যক্ষ?” তিনি কহিলেন, “এ ব্রহ্ম, ব্রহ্মার এই বিজয়ে আপনারা মহৎ হউন।” তাহাতে জানিলেন, যে ইতি ব্রহ্ম।”

ইহার অর্থ কি, আমরা বুঝিতে পারিবনা, কিন্তু সায়নাচার্য্য বুঝিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। সায়নাচার্য্য এই উমা হৈমবতীকে ব্রহ্মজ্ঞান বলেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকান্তর্গত একস্থানে সোম শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, “হিমবৎ পুত্র্যা গৌর্য্যা ব্রহ্মবিদ্যাভিমানী রূপত্বাৎ গৌরীবাচকো উমাশব্দো ব্রহ্মবিদ্যাং উপলক্ষয়তি। অতএব তলবকারোপনিষদি (ইহারই নামান্তর কেনোপনিষদ্) ব্রহ্মবিদ্যামূর্ত্তি প্রস্তাবে ব্রহ্মবিদ্যামূর্ত্তিঃপঠ্যতে। বহু শোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ ইতি। তদ্বিষয়তয়া তয়া উময়া সহিত বর্ত্তমানত্বাৎ সোমঃ।”

তবে কেনোপনিষদের উমা হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যামাত্র। মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বে অর্জ্জুনকৃত একটী দুর্গাস্তব আছে, তাহাতে দুর্গাকে "ব্রহ্মবিদ্যা" বলা হইয়াছে। যথা—

ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রাচদেহিনাং।

দ্বিতীয়, মুণ্ডকোপনিষদে একস্থানে কালী ও করালী নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু সে কোন দেবীর নাম বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই—অগ্নির সপ্তজিহ্বার নামের মধ্যে কালী ও করালী দুইটি নাম, ইহাই কথিত আছে যথা—

কালী করালী চ মনোজবা সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।

ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপী চ দেবী লোলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বা॥

কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা সুধূম্রবর্ণা, ফুলিঙ্গিনী, এবং বিশ্বরূপী এই সাতটি অগ্নির জিহ্বা।

ইহা ভিন্ন বেদে আর কোথাও দুর্গা, কালী, উমা, অম্বিকা প্রভৃতি কোন নামে এই দেবীর কোন উল্লেখ নাই।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গাগায়ত্রী আছে। তাহা এই—

"কাত্যয়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারী ধীমহি। তন্নো দুর্গীঃ প্রচোদয়াৎ।"

পাঠক দেখিবেন, স্ত্রীলিঙ্গান্ত দুর্গা শব্দের পরিবর্ত্তে পুংলিঙ্গান্ত দুর্গী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার জন্য সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন, "লিঙ্গাদি ব্যত্যয়ঃ সর্ব্বত্র ছান্দসো দ্রষ্টব্যঃ।" তিনি কাত্যায়ন শব্দের এই ব্যাখ্যা করেন, "কৃত্তিং বস্ত্রে ইতি কত্যো রুদ্রঃ। স এবায়নম্ যস্য সা কাত্যায়নী। অথবা কতস্য ঋষিবিশেষস্য অপত্যং কাত্যঃ।" কন্যাকুমারীর এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, "কুৎসিতং অনিষ্টং মারয়তি ইতি কুমারী, কন্যা দীপ্যমানা চাসৌ কুমারী চ কন্যা কুমারী।"

এতদ্ভিন্ন ঋগ্বেদান্তর্গত রাত্রিপরিশিষ্ট হইতে যে দুর্গাস্তব উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার ১২ সংখ্যক শ্লোক ঐ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দ্বিতীয় অনুবাকে অগ্নিস্তবে আছে। তাহাতে দুর্গার উল্লেখ আছে, দেখা গিয়াছে।

কৈবল্যোপনিষদে "উমা সহায়ম্" বলিয়া মহাদেবের উল্লেখ আছে। কৈবল্যোপনিষদ্ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ঐস্থলে আশ্বলায়ন বক্তা।

ওয়েবর বলেন তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অষ্টাদশ অনুবাকে "উমাপতয়ে" শব্দ আছে—কিন্তু ঐ বচন আমরা দেখি নাই।

উপনিষদে বা আরণ্যকে আর কোথাও দুর্গার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, আমাদিগের পূজিতা দুর্গা কি রাত্রি, না মহাদেবের ভগিনী, না ব্রহ্মবিদ্যা, না অগ্নি জিহ্বা?*

---

* এই প্রবন্ধে যাহা কিছু বেদ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা ডাক্তার জন মিয়রের সংগ্রহ (Sanskrit Texts) হইতে নীত। সেই সংগ্রহই এই প্রবন্ধের অবলম্বন।

"রাস মালা" নামক গুজরাটের পুরাবৃত্ত মধ্যে লিখিত আছে, হেমচন্দ্র বা হেমাচার্য্য মহারাজ কুমার পালের রাজ্য কালে বর্ত্তমান ছিলেন। ওদায়নের জৈনাচার্য্যগণ তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধীয় যে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই "রাসমালায়" সঙ্কলিত হইয়াছে, এবং আমারাও তাহাই এস্থলে গ্রহণ করিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করিলাম। হেমচন্দ্রের পিতার নাম চাচিঙ্গ এবং মাতার নাম পাহিনী। ইঁহারা উভয়ে গুজরাটে বাস করিতেন। হেমচন্দ্রের প্রকৃত নাম চংদেব। তাঁহার পিতার হিন্দুধর্ম্মে অটল ভক্তি ছিল, কিন্তু পাহিনী দেবী গোপনে জৈন ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন। হেমচন্দ্রের অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে একদা দেবচন্দ্র আচার্য্য, তাঁহার অনুপম মুখশ্রী, এবং দেবতুল্য কান্তি সন্দর্শনে তাঁহার পিতার অবর্ত্তমানে পাহিনী দেবীর সম্মতিক্রমে তাঁহাকে করুণাবতী মন্দিরে জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য লইয়া গেলেন। চাচিঙ্গ বাটী প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া যারপরনাই পরিতাপিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে করুণাবতী মন্দিরে চঙ্গ দেবের উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় দেবচন্দ্র আচার্য্যের নিকট জ্ঞাত হইলেন, যে তাঁহার তনয় হেমচন্দ্র নাম গ্রহণ করিয়া উদয়ন মন্ত্রীর আবাসে জৈন ধর্ম্মের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিতেছেন। হেমচন্দ্রের মন জৈনাচার্য্য বর্গের উপদেশে এত আকৃষ্ট হইয়াছিল, যে তিনি পিত্রালয়ে কোন ক্রমেই প্রত্যাগত হইলেন না। কিয়ৎকাল মধ্যেই তিনি সূরি বা আচার্য্য পদ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে সুবিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। সংসেন্থে কুমারপাল মালব দেশে প্রবেশ করিলে উদয়ন মন্ত্রীর দ্বারা তিনি রাজসমীপে নীত হইলেন, এবং তাঁহার বাক্যালাপে নৃপতির হৃদয় অতীব প্রফুল্ল হইল। রাজা হেমাচার্য্যের উপদেশানুসারে সাগরের তরঙ্গমালায়—ভগ্নপ্রায়—দেবপত্তনে সোমেশ্বরের মন্দির বহুব্যয়ে সংস্কার করেন, এবিষয় উক্ত মন্দিরের প্রস্তর ফলকে (৮৫০) বল্লভী সম্বৎ মধ্যে সম্পন্ন হয় খোদিত ছিল। এই কীর্ত্তি জন্য প্রস্তর ফলকের লিপিতে কুমার পালের ভূরি ভূরি প্রশংসা করা হইয়াছে। রাজা কুমার পাল আচার্য্য হেমচন্দ্রের উপদেশ মতে মন্দিরের সংস্কারকার্য্য শেষ পর্য্যন্ত দুই বৎসর আমিষ ভোজন, ও স্ত্রী সংসর্গ, ত্যাগ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন তাঁহাদের রাজ সভায় দিন দিন মান্য খর্ব্ব হইতে লাগিল সুতরাং তাঁহারা হেমচন্দ্রের

যাহাতে হতমান হয় তাহার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের উপর জৈনাচার্য্যের প্রভুত্ব অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা রাজাকে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিবস হেমচন্দ্রের সঙ্গে একত্রে উপাসনা করিতে কহিলেন। হেমচন্দ্র জৈন, তিনি সোম পূজক ছিলেন না, কিন্তু রাজার প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইতে হইল। তিনি গির্ণার এবং শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের জৈন তীর্থ বিলোকনান্তর দেব পত্তনে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তথা হইতে রাজা ও পারিষদবর্গের সহিত সোমেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের প্রধান পূজক ব্রাহ্মণ শ্রী বৃহস্পতি সমভিব্যাহারে রাজা ও হেমচন্দ্র দেবতাকে বন্দনা এবং প্রদক্ষিণাদি করিলেন। রাজা ও পারিষদবর্গ হেমচন্দ্রকে এতদিন জৈন জানিতেন, এক্ষণে তাঁহাকে পৌতুলিকের ন্যায় উপাসনা করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের ভ্রম দূর হইল। হেমচন্দ্র অতি চতুর, তাঁহার হিন্দু ধর্ম্মে কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। কেবল রাজপ্রসাদ লাভের জন্য তাঁহাকে নানা কৌশল করিতে হইল; এবিষয়ে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কলঙ্ক স্পর্শ করিল বলিতে হইবেক। সোমেশ্বর হইতে তিনি রাজাকে লইয়া অনিহীল পুরে গমন করিলেন। তথায় তাঁহাকে জৈন ধর্ম্মের অনেক রহস্য কহিলেন, এবং ক্রমে কুমার পালের হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস হ্রাস হইয়া আসিল। গুজরাটের মধ্যে তিনি পশুহিংসা নিবারণ করিলেন, এবং তাঁহার অনুজ্ঞায় ব্রাহ্মণগণ চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত দেব দেবীর নিকট পশ্বাদি বলিদানের পরিবর্ত্তে শস্যাদি উপহার দিত। কুমার পালের জৈন ধর্ম্মে বিশ্বাস, ক্রমেই অটল হইয়া উঠিল। তিনি অনিহীল পুরে "কুমার বিহার" নামক পার্শ্বনাথের মন্দির স্থাপন করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক দেবপত্তনে একটি সুদৃশ্য জৈন মন্দির নির্ম্মিত হইল। কুমারপাল জৈন ধর্ম্মের চতুর্দ্দশ আজ্ঞানুসারে দীক্ষিত হইয়া, প্রজাবর্গের মধ্যে স্বীয় অকৃত্রিম দয়া ও ধর্ম্মের প্রোজ্জ্বলদীধিতি বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন, এবং সকলেই তাঁহাকে রঘু, নহুষ, ও ভরতের, সমকক্ষ বলিতে লাগিল। "প্রবন্ধ চিন্তামণি" মধ্যে কুমার পালের অনেক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে কিন্তু সে সকল হেমচন্দ্রের বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক বোধে গ্রহণে বিরত হইলাম। কুমার পালের ত্রিংশৎ বর্ষ রাজ্য কালে হেমাচার্য্য আপনাকে অত্যন্ত প্রাচীন বোধ করিয়া নির্ব্বাণ কামনায় আহারাদি এক কালে পরিত্যাগ করিলেন। এবং কিয়দ্দিবসের মধ্যেই ৮৪ বর্ষ বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হইল। হেমচন্দ্র সম্বন্ধে অলৌকিক নানাবিধ গল্প প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা সমুদায় অকিঞ্চিৎকর বিবেচনায় গ্রহণ করিলাম না। "রাসমালার" মতানুসারে তিনি ১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। প্রসিদ্ধ জৈন বৈয়াকরণ পূজ্যপাদ এবং জৈন জ্যোতিষ শাস্ত্র-বেত্তা অমিত যতির পরে হেমচন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন এবং ইহাও স্থির হইয়াছে যে তাঁহার সময়ে "জৈন কল্পসূত্র" রচিত হয়।

হেমচন্দ্র শ্বেতাম্বর জৈন। তিনিই এই সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য এবং তদ্দ্বারা জৈন ধর্ম্মের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। "সময় ভূষণ" গ্রন্থে লিখিত আছে, তিনি পাটলীপুত্র নিবাসী এবং তথা হইতে গুজরাটে গমন করেন। এই গ্রন্থে তাঁহার জীবন চরিত সংক্রান্ত অন্য কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

হেমচন্দ্র "অভিধান চিন্তামণি," প্রাকৃত ব্যাকরণ এবং "ত্রিষষ্ঠী শলকাপুরুষ * চরিত" রচনা করেন। "অভিধান চিন্তামণি" অতি প্রসিদ্ধ জৈনকোষ। "শব্দ কল্পদ্রুমে" ইহার অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন অভিধান চিন্তামণির নানার্থভাগ, "বিশ্বকোষ" হইতে সঙ্কলিত কিন্তু আমরা এ কথায় অনুমোদন করি না, কেননা, কোলাচল মল্লীনাথ সূরি এই নানার্থ ভাগের অনেক প্রমাণ তাঁহার টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং "বিশ্বকোষ" তাহার পরে রচিত হয়। এবিষয় অনুশীলন করিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক।

অভিধান চিন্তামণি সংস্কৃত জৈন অভিধান। ইহাতে জৈন ধর্ম্মের সমুদায় শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে॥

সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ ডাক্তার বুলর সাহেব হেমচন্দ্র কৃত দেশী শব্দ সংগ্রহ নামক প্রাকৃত বোধ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই গ্রন্থ ১৫৮৭ সম্বৎ মধ্যে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে চারিসহস্র প্রাকৃত শব্দ আছে এবং ৩৩২৫ শ্লোকে সম্পূর্ণ। পাঠকবর্গকে ইহার রচনা প্রণালী দেখাইবার জন্য নিম্নে প্রথম ৪টী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে দেশী কোষের উদ্দেশ্য অবগত হইতে পারিবেন।

গম্ণয় পমান গহিরা সহিয় যহিয় যহি যংগম রহরসা।
জয়ই জিনিং দান অশেষ ভাস বরিনামিনী বাণী। ১।
ণীসেসদে সিপরমল পল্লবি অকুজহ লাউল ত্তেন।
বিরইজ্জই দেশী সদ্দসংগহো বন্নক্ক মস্তুহও। ২।
জে লক্ষণে ন সিদ্ধানয় সিদ্ধা সক্কয়াভিহানেসু।
ণয় গত্তন লক্ষণা সত্তিসম্ভবা তে ইহ নিবদ্ধা। ৩।
দেশ বিশেষ ভূসিদ্ধিহ পন্নমানা অনংতয়া হুণ্ডি।
তম্হা অনাই পাইয় পয়ট্ট ভাষা বিশেসত্ত দেসী। ৪।

বোধ হয় ভানুদীক্ষিত অমরকোষের টীকায় এই দেশী কোষের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। একখানি জৈন গ্রন্থে দৃষ্ট হইল হেমচন্দ্র বৈশ্য ছিলেন।

শ্রীরামদাস সেন।

---

*এই জৈন মহাকাব্য একখানি মাত্র বিলাতের "রএল এসিয়াটিক সোসাইটির" পুস্তকালয়ে আছে॥

এই সংসারে একটি শব্দ সর্ব্বদা শুনিতে পাই—"অমুক বড় লোক—অমুক ছোট লোক।" এটি কেবল শব্দ নহে। লোকের পরস্পর বৈষম্য জ্ঞান মনুষ্য মণ্ডলীর কার্য্যের একটী প্রধান প্রবৃত্তির মূল। অমুক বড় লোক, পৃথিবীর যত ক্ষীর সর নবনীত, সকলই তাঁহাকে উপহার দাও। ভাষার সাগর হইতে শব্দরত্নগুলি বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া হার গাঁথিয়া তাঁহাকে পরাও, কেননা তিনি বড় লোক। ঐ যে ক্ষুদ্র অদৃশ্য-প্রায় কণ্টকটি পথে পড়িয়া আছে, উহা যত্নসহকারে উঠাইয়া সরাইয়া রাখ—ঐ বড় লোক আসিতেছেন, কি জানি যদি তাঁহার পায়ে ফুটে। এই জীবন পথের ছায়া স্নিগ্ধ পার্শ্ব ছাড়িয়া রৌদ্রে দাঁড়াও, বড়লোক যাইতেছেন। সংসারের আনন্দকুসুম সকল, সকলে মিলিয়া চয়ন করিয়া শয্যা রচনা করিয়া রাখ, বড় লোক উহাতে শয়ন করুন। আর তুমি? তুমি বড় লোক নহ—তুমি সরিয়া দাঁড়াও, এ পৃথিবীর ভাল সামগ্রী কিছুই তোমার জন্য নয়। কেবল এই তীব্রঘাতী লোলায়মান বেত্র তোমার জন্য—বড় লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ তোমার পৃষ্ঠের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ইহার আলাপ হইবে।

বড় লোকে ছোট লোকে এ প্রভেদ কিসে? রাম বড় লোক, যদু ছোট লোক কিসে? তাহা মোটামোটি বুঝিলে এক প্রকার বুঝা যায়। যদু চুরি করিতে জানে না, বঞ্চনা করিতে জানে না, পরের সর্ব্বস্ব শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং যদু ছোট লোক; রাম চুরি করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, শঠতা করিয়া, ধনসঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং রাম বড় লোক। অথবা রাম নিজে নিরীহ ভালমানুষ, কিন্তু তাহার প্রপিতামহ চৌর্য্য বঞ্চনাদিতে সুদক্ষ ছিলেন; মুনিবের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া বিষয় করিয়া গিয়াছেন, রাম জুয়াচোরের প্রপৌত্র, সুতরাং সে বড় লোক। যদুর পিতামহ আপনি আনিয়া আপনার খাইয়াছে—সুতরাং সে ছোট লোক। অথবা রাম কোন বঞ্চকের কন্যা বিবাহ করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে বড় লোক। রামের মাহাত্ম্যের উপর পুষ্পবৃষ্টি কর।

অথবা রাম, সেলাম করিয়া, গালি খাইয়া, কদাচিৎ পদাঘাত সহ্য করিয়া, অথবা ততোধিক কোন মহৎ কার্য্য করিয়া, কোন রাজপুরুষের নিকট প্রসাদ প্রাপ্ত

হইয়াছে। রাম চাপরাশ গলায় বাঁধিয়াছে—চাপরাশের বলে বড় লোক হইয়াছে। আমরা কেবল বাঙ্গালির কথা বলিতেছি না—পৃথিবীর সকল দেশেই চাপরাশ-বাহকের একই চরিত্র—প্রভুর নিকট কীটানুকীট, কিন্তু অন্যের কাছে?—ধর্ম্মাবতার!! তুমি যে হও, দুইহাতে সেলাম কর, ইনি ধর্ম্মাবতার। ইঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, অধর্ম্মেই আসক্তি,—তাহাতে ক্ষতি কি? রাজকটাক্ষে ইনি ধর্ম্মাবতার। ইনি গণ্ডমূর্খ, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ—সে কথা এখন মনে করিও না, ইনি বড় লোক, ইঁহাকে প্রণাম কর।

আর এক প্রকারের বড় লোক আছে। ঐ যে গোপাল ঠাকুর, "কন্যাভার-গ্রস্ত—কন্যাভারগ্রস্ত" বলিয়া দুই পয়সা চারি পয়সা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে—এও বড় লোক। কেন না গোপাল ব্রাহ্মণ জাতি! তুমি শূদ্র—যত বড় লোক হও না কেন, তোমাকে উহার পায়ের ধূলা লইতে হইবে। দুইপ্রহর বেলা ঠাকুর রাগ করিয়া না যান—ভাল করিয়া আহার করাও, যাহা চাহেন, দিয়া বিদায় কর। গোপাল দরিদ্র, মূর্খ, নরাধম, পাপিষ্ঠ, কিন্তু সেও বড় লোক।

আর ঐ যে Jack Lightfinger ভগ্নাবশেষ মাত্র ষ্ট্রহ্যাট মাথায় দিয়া, অনাবৃত পদে যাইতেছে, এ আরও বড় লোক; তোমার জন্য এক আইন, উহার জন্য আর এক আইন।

অতএব সংসার বৈষম্যপরিপূর্ণ।—যে কিছুতেই বৈষম্য জন্মে। রাম এ দেশে না জন্মিয়া, ওদেশে জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল, রাম পাঁচির গর্ভে না জন্মিয়া, জাদির গর্ভে জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল। তোমার অপেক্ষা আমি কথায় পটু, বা আমার শক্তি অধিক, বা আমি বঞ্চনায় দক্ষ,—এ সকলই সামাজিক বৈষম্যের কারণ। সংসার বৈষম্যপূর্ণ।

সংসারে বৈষম্য থাকাই উচিত। প্রকৃতিই অনেক বৈষম্যের নিয়ম করিয়া আমাদিগকে এই সংসার রঙ্গে পাঠাইয়াছেন। তোমার অপেক্ষা আমার হাড়গুলি মোটা মোটা, বড় কঠিন—তোমার অপেক্ষা আমার বাহুতে অধিক বল আছে—আমি তোমাকে এক ঘুষিতে ভূতলশায়ী করিয়া তোমার অপেক্ষা বড় লোক হইতেছি। কুমুদিনীর অপেক্ষা সৌদামিনী সুন্দরী সুতরাং সৌদামিনী জমীদারের স্ত্রী, কুমুদিনী পাট কাটে। রামের মস্তিষ্কের অপেক্ষা যদুর মস্তিষ্ক দশ আউন্স্ ওজনে ভারি, সুতরাং যদু সংসারে মান্য, রাম ঘৃণিত।

অতএব বৈষম্য সাংসারিক নিয়ম। জগতের সকল পদার্থেই বৈষম্য। মনুষ্যে মনুষ্যে প্রকৃত বৈষম্য আছে। কিন্তু যেমন প্রকৃত বৈষম্য আছে—প্রকৃত বৈষম্য অর্থাৎ যে বৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়মানুরুদ্ধ,—তেমনি অপ্রাকৃত বৈষম্য আছে। ব্রাহ্মণ শূদ্রে অপ্রাকৃত বৈষম্য। ব্রাহ্মণ বধে গুরু পাপ,—শূদ্র বধে লঘু পাপ;

ইহা প্রাকৃতিক নিয়মানুকৃত নহে। ব্রাহ্মণ অবধ্য—শূদ্র বধ্য কেন? শূদ্রই দাতা, ব্রাহ্মণই কেবল গৃহীতা কেন? তৎপরিবর্ত্তে যাহার দিবার শক্তি আছে সেই দাতা যাহার প্রয়োজন সেই গৃহীতা, এ বিধি হয় নাই কেন?

দেশী বিলাতির মধ্যে সেইরূপ আর একটি অপ্রাকৃত বৈষম্য। মফঃস্বলের আদালতে কেবল দেশী লোকের সেখানে বিচার হয়, বিলাতী অপরাধীর জন্য পৃথক বিচারালয়। দেশী লোকে দেশী লোকের বিচার করুক, বিলাতী লোকে দেশী লোকের বিচার করুক, কিন্তু দেশী লোকে বিলাতী লোকের বিচার করিতে পারিবে না।

সর্ব্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর। তাহার ফলে কোথাও কোথাও দুই এক জন লোক টাকার খরচ খুঁজিয়া পায়েন না—কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে উৎকট রোগগ্রস্ত হইতেছে!

সমাজের উন্নতিরোধ বা অবনতির যে সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান। ভারতবর্ষের যে এতদিন হইতে এত দুর্দ্দশা, সামাজিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কারণ।

ভারতবর্ষেই যে বৈষম্যের আধিক্য ঘটিয়াছে, এমত নহে। এই সংসার বৈষম্যময়, সকল দেশই বৈষম্যজালে আচ্ছন্ন। উন্নতিশীল সমাজে, সামাজিকেরা পরস্পরে সংঘৃষ্ট হইয়া সেই বৈষম্যকে অপনীত করিয়াছেন। সেই সকল রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। রোম ইহার প্রধান উদাহরণ। রোমরাজ্যের প্রথম কালিক বৈষম্য—প্রেত্রিশীয় ও প্লিবীয়দিগের সম্প্রদায় ভেদ—তাহা এক প্রকার সামাজিক সামঞ্জস্যে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদ্রাজ্যের যে পশ্চাৎকালিক বৈষম্য—নাগরিকত্ব এবং অনাগরিকত্ব; তাহাও শাসনকর্ত্তৃপক্ষের অলৌকিক রাজনীতিদক্ষতার গুণে অপনীত হইয়াছিল। সুতরাং রোম পৃথিবীশ্বরী হইয়াছিল।

অন্যত্র এরূপ ঘটে নাই। আমেরিকার চিরদাসত্বের উচ্ছেদ জন্য সেদিন ঘোরতর আভ্যন্তরিক সমর হইয়া গেল—অস্ত্রাঘাতে ক্ষতচিকিৎসার ন্যায় সামাজিক অনিষ্টের দ্বারা সামাজিক ইষ্টসাধন করিতে হইল। এই চিকিৎসার বড় ডাক্তার দাঁতো এবং রোবস্পীর। বৈষম্যের পরিবর্ত্তে সাম্য সংস্থাপনই প্রথম ও দ্বিতীয় ফরাসিস বিপ্লবের উদ্দেশ্য।

কিন্তু সর্ব্বত্র এই কঠোর চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নাই। অধিকাংশ দেশেই উপদেষ্টার উপদেশেই সাম্য আদৃত এবং সংস্থাপিত হইয়াছে। অস্ত্রবল অপেক্ষা বাক্যবল গুরুতর—সমরাপেক্ষা শিক্ষা অধিকতর ফলোপধায়িনী। খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম বাক্যে প্রচারিত হয়—ইসলামের ধর্ম্ম শস্ত্রসাহায্যে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীতে মুসলমান অল্পসংখ্যক—বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টিয়ানই অধিক।

পৃথিবীতে তিনবার আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। বহুকালান্তর, তিনদেশে তিনজন মহাশুদ্ধাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে মঙ্গলময় এক মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। সেই মহামন্ত্রের স্থূলমর্ম্ম, "মনুষ্য সকলেই সমান।" এই স্বর্গীয় মহাপবিত্র বাক্য ভূমণ্ডলে প্রচার করিয়া, তাঁহারা জগতে সভ্যতা এবং উন্নতির বীজ বপন করিয়াছিলেন। যখনই মনুষ্য জাতি, দুর্দ্দশাপন্ন, অবনতির পথারূঢ় হইয়াছে ; তখনই এক মহাত্মা মহাশব্দে কহিয়াছেন, "তোমরা সকলেই সমান—পরস্পর সমান ব্যবহার কর!" তখনই দুর্দ্দশা ঘুচিয়া সুদশা হইয়াছে, অবনতি ঘুচিয়া উন্নতি হইয়াছে।

প্রথম, শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব। যখন বৈদিকধর্ম্মসম্ভূত বৈষম্যে ভারতবর্ষ পীড়িত, তখন ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের উদ্ধার করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালিক বর্ণ বৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। অন্য বর্ণ অবস্থানুসারে বধ্য—কিন্তু ব্রাহ্মণ শত অপরাধেও অবধ্য। ব্রাহ্মণে তোমার সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট করুক। তুমি ব্রাহ্মণের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তোমরা ব্রাহ্মণের চরণে লুটাইয়া তাঁহার চরণরেণু শিরোদেশে গ্রহণ কর—কিন্তু শূদ্র অস্পৃশ্য। শূদ্রস্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত অব্যবহার্য্য। এ পৃথিবীর কোন সুখে শূদ্র অধিকারী নহে, কেবল নীচবৃত্তি তাহার অবলম্বনীয়। জীবনের জীবন যে বিদ্যা, তাহাতে তাহার অধিকার নাই। সে শাস্ত্রে বদ্ধ, অথচ শাস্ত্র যে কি, তাহা তাহার স্বচক্ষে দেখিবার অধিকার নাই, তাহার নিজপরকালও ব্রাহ্মণের হাতে। ব্রাহ্মণ যাহা বলিবেন তাহা করিলেই পরকালে গতি, নহিলে গতি নাই। ব্রাহ্মণ যাহা করাইবেন তাহা করিলেই পরকালে গতি, নহিলে গতি নাই। ব্রাহ্মণকে দান করিলেই পরকালে গতি কিন্তু শূদ্রের সেই দান গ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণ পতিত। ব্রাহ্মণের সেবা করিলেই শূদ্রের পরকালে গতি। অথচ শূদ্রও মনুষ্য, ব্রাহ্মণও মনুষ্য। প্রাচীন ইউরোপের, বন্দী এবং প্রভু মধ্যে যে বৈষম্য, তাহাও এমন ভয়ানক নহে। অদ্যাপি ভারতবর্ষবাসীরা কোন গুরুতর বৈষম্যের কথার উদাহরণ স্বরূপ "বামন শূদ্র তফাৎ।"

এই গুরুতর বর্ণ বৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনতির পথে দাঁড়াইল। সকল উন্নতির মূল জ্ঞানোন্নতি। পশ্বাদিবৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিভিন্ন পৃথিবীর এমন কোন একটি সুখ তুমি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারিবে না, যাহার মূল জ্ঞানোন্নতি নহে। বর্ণ-বৈষম্যে জ্ঞানোন্নতির পথরোধ হইল। শূদ্র জ্ঞানালোচনার অধিকারী নহে এক মাত্র ব্রাহ্মণ তাহার অধিকারী। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক ব্রাহ্মণেতরবর্ণ। অতএব অধিকাংশ লোক মূর্খ হইল। মনে কর যদি ইংলণ্ডে এরূপ নিয়ম থাকিত

যে Russel, Cavendish, Stanley প্রভৃতি কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট বংশের লোক ভিন্ন আর কেহ বিদ্যার আলোচনা করিতে পারিবে না, তাহা হইলে ইংলণ্ডের এ সভ্যতা কোথায় থাকিত ? কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানবিৎ দূরে থাকুক, Watt Stephenson, Arkwright কোথায় থাকিত ? ভারতবর্ষে প্রায় তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। অনন্যসহায় ব্রাহ্মণেরা যে বিদ্যার আলোচনা একাধিকার করিলেন, তাহাও বর্ণ-বৈষম্য দোষে কুফলপ্রদা হইয়া উঠিল। সকল বর্ণের প্রভু হইয়া, তাঁহারা বিদ্যাকে প্রভুত্বরক্ষণীরূপে নিযুক্ত করিলেন। বিদ্যার যেরূপ আলোচনায় সেই প্রভুত্ব বজায় থাকে, যাহাতে তাহার আরও বৃদ্ধি হয়, যাহাতে অন্য বর্ণ আরও প্রণত হইয়া ব্রাহ্মণ পদরজঃ ইহজন্মের সারভূত করে, সেইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। আরও যাগ যজ্ঞের সৃষ্টিকর, আরও মন্ত্র, দান দক্ষিণা, প্রায়শ্চিত্ত বাড়াও, আরও দেবতার মহিমাপূর্ণ মিথ্যা ইতিহাস কল্পনা করিয়া এই অপ্সরানূপুরনিক্কণনিন্দিত মধুর আর্য্যভাষায় গ্রন্থিত কর, ভারতবাসীদিগের মূর্খতাবন্ধন আরও আঁটিয়া বাঁধ। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সে সবে কাজ কি ? সেদিকে মন দিও না। অমুক ব্রাহ্মণখানির কলেবর বাড়াও—নূতন উপনিষদ্‌খানি প্রচার কর—ব্রাহ্মণের উপর ব্রাহ্মণ, উপনিষদের উপর উপনিষদ্‌, আরণ্যকের উপর আরণ্যক, সূত্রের উপর সূত্র, তার উপর ভাষ্য, তার টীকা, তার টীকা, তার ভাষ্য অনন্তশ্রেণী—বৈদিক ধর্ম্মের গ্রন্থে ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন কর। বিদ্যা ?—তাহার নাম ভারতবর্ষে লুপ্ত হউক !

লোক বিষণ্ণ, ব্যস্ত, শঙ্কিত হইল। ব্রাহ্মণেরা লেখেন সকল কাজেই পাপ—সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত কঠিন। তবে কি বিপ্রেতরবর্ণের পাপ হইতে মুক্তি নাই—পারত্রিক সুখ কি এতই দুর্লভ ? লোক কোথায় যাইবে ? কি করিবে ? এ ধর্ম্মশাস্ত্র পীড়া হইতে কে উদ্ধার করিবে ? সর্ব্বসুখনিরোধকারী ব্রাহ্মণের হাত হইতে কে রক্ষা করিবে ? ভারতবাসীকে কে জীবন দান করিবে ?

তখন বিশুদ্ধাত্মা শাক্যসিংহ অনন্তকাল স্থায়ী মহিমা বিস্তারপূর্ব্বক, ভারতাকাশে উদিত হইয়া, দিগন্তপ্রধাবিত রবে বলিলেন, "আমি এ উদ্ধার করিব। আমি তোমাদিগের উদ্ধারের বীজ মন্ত্র বলিয়া দিতেছি, তোমরা সেই মন্ত্র সাধন কর। তোমরা সবেই সমান। ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান। মনুষ্যে মনুষ্যে সকলেই সমান। সকলেই পাপী, সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। বর্ণ বৈষম্য মিথ্যা। যাগ যজ্ঞ মিথ্যা। বেদ মিথ্যা, সূত্র মিথ্যা, ঐহিক সুখ মিথ্যা। কে রাজা, কে প্রজা সব মিথ্যা। ধর্ম্মই সত্য। মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সকলেই সত্যধর্ম্ম পালন কর।"

বৈষম্য পীড়িত ভারত এ মহামন্ত্র শুনিয়া হিমগিরি হইতে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত বিচলিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত হইল—বর্ণ বৈষম্য কতক-

দূর বিলুপ্ত হইল। প্রায় সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত রহিল। পুরাবৃত্তজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন, যে সেই সহস্র বৎসরই ভারতবর্ষের প্রকৃত সৌষ্ঠবের সময়। যে সকল সম্রাট্ হিমালয় হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত যথার্থই একচ্ছত্রে শাসিত করিয়াছেন—অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, শিলাদিত্য প্রভৃতি—এই কালমধ্যেই তাঁহাদিগের অভ্যুদয়। এই সময়েই তক্ষশীলা হইতে তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত, বহুজনসমাকীর্ণ মহাসমৃদ্ধিশালিনী সহস্র সহস্র নগরীতে ভারতবর্ষ পরিপূরিত হইয়াছিল। এই সময়েই ভারতবর্ষের গৌরব পশ্চিমে রোমকে, পূর্ব্বে চীনে, গীত হইয়াছিল—তদ্দেশীয় রাজারা ভারতবর্ষীয় সম্রাট্দিগের সহিত রাজনৈতিক সখ্যে বদ্ধ হইয়াছিলেন—এই সময়ে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম প্রচারকেরা ধর্ম্ম প্রচারে যাত্রা করিয়া অর্দ্ধেক আসিয়া ভারতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শিল্পবিদ্যার যে এই সময়ে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন বৌদ্ধোদয়ের আনুষঙ্গিক বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞান সাহিত্যের বিশেষ অনুশীলনের কালনিরূপণ করা কঠিন, কিন্তু শাক্যসিংহের সম্পাদিত ধর্ম্মবিপ্লবের সহিত যে সে সকলের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় সাম্যাবতার যীশুখ্রীষ্ট। যে সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচারারম্ভ হয়, তখন ইউরোপ ও পশ্চিম আসিয়া রোমক রাজ্যভুক্ত। রোমের সৌষ্ঠবদিবসের অপরাহ্ণ উপস্থিত। তখন রোম আর যুদ্ধবিশারদ বীরপ্রসবিনী নহে, অমিত ধনশালী ভোগাসক্ত ইন্দ্রিয়পরবশ "বাবু" দিগের আবাস। যাহাদিগের আমোদ কেবল রণক্ষেত্রেই ছিল, তাঁহারা এক্ষণে কেবল আহারে, দাসীসংসর্গে, এবং রঙ্গভূমের কৃত্রিম যুদ্ধে আমোদ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। যে দেশবাৎসল্য গুণে রোম নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়াছিল। যে সমসামাজিকতার জন্য আমরা রোমের প্রশংসা করিয়াছি, যে সমসামাজিকতার গুণে রোম পৃথিবীশ্বরী হইয়াছিল, তাহা লুপ্ত হইতে লাগিল। আমরা পূর্ব্বে রোমনগরীর কথা বলিয়াছি—এক্ষণে রোমকসাম্রাজ্যের কথা বলিতেছি। রোমকসাম্রাজ্যে চিরদাসত্বজনিত বৈষম্য সাংঘাতিক রোগস্বরূপ প্রবেশ করিয়াছিল। এক এক ব্যক্তির সহস্র সহস্র চিরদাস থাকিত। প্রভুর অকরণীয় সমুদায় কার্য্য সেই সকল দাসের দ্বারা হইত। ভূমিকর্ষণ, গার্হস্থ্য ভৃত্যের কার্য্য, শিল্পকার্য্যাদি চিরদাসগণের দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। তাহারা গোরু বাছুরের ন্যায় ক্রীত বিক্রীত হইত। গোরু বাছুরের উপর প্রভুর যেরূপ অধিকার, দাসেরও উপরও সেইরূপ অধিকার ছিল। প্রভু মারিলে মারিতে পারিতেন, কাটিলে কাটিতে পারিতেন, বধ করিলেও দণ্ডনীয় হইতেন না। প্রভুর আজ্ঞায় দাস রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইত—প্রভু তামাসা দেখিতেন। রোমকসাম্রাজ্যের লোক দুই

ভাগে বিভক্ত—প্রভু এবং দাস। একভাগ অনন্তভোগাসক্ত—আর একভাগ অনন্তদুর্দ্দশাপন্ন।

কেবল এই বৈষম্য নহে। সম্রাট্ স্বেচ্ছাচারী। তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতাপের সীমা ছিল না। নীরো নগরে অগ্নি লাগাইয়া বীণাবাদনপূর্ব্বক রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। কালিগুলা আপন অশ্বকে কনসলের পদে বরণ করিলেন। ইলিয়গেবলসের স্বেচ্ছাচারিতা বর্ণনা করিতে লজ্জা করে। যে হউক না কেন, যত বড় লোক হউন না কেন, সম্রাটের ইচ্ছামাত্রে তিনি বধ্য,—বিনা কারণে, বিনা প্রয়োজনে, বিনা বিচারে, তিনি বধ্য। আবার সেই সম্রাটের উপর সম্রাট্ প্রেটরীয় সৈনিক। তাহারা আজ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সম্রাট্ করে—কাল সে সম্রাট্‌কে বধ করিয়া অন্যকে রাজা করে। রোমক সাম্রাজ্য তাহারা আলু পটলের মত ক্রয় বিক্রয় করে। রোমকে তাহারা যাহা মনে করে তাহাই করে। সুবায় সুবায় সুবাদারেরা স্বেচ্ছাচারী। যাহার শক্তি আছে সেই স্বেচ্ছাচারী। যেখানে স্বেচ্ছাচার প্রবল, সেখানে বৈষম্যও প্রবল।

এই সময়ে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম রোমক সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। খ্রীষ্টের উচ্চারিত মহতী বাণী লোকের মর্ম্মভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি বলিয়াছিলেন, মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃ সম্বন্ধ। সকল মনুষ্যই ঈশ্বরসমক্ষে তুল্য। বরং যে পীড়িত, দুঃখী, কাতর, সেই ঈশ্বরের অধিক প্রিয়। এই মহাবাক্যে বড় মানুষের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল—প্রভুর গর্ব্ব খর্ব্ব হইল—অঙ্গহীন ভিক্ষুকও সম্রাটের অপেক্ষা বড় হইল। তিনি বলিয়াছিলেন, ইহলোকে আমার রাজত্ব নহে—ঐহিক সুখ সুখ নহে—ঐহিক প্রাধান্য প্রাধান্য নহে। পৃথিবীতে দুইবার দুইটি বাক্য উক্ত হইয়াছে,—তাহাই নীতিশাস্ত্রের সার—তদতিরিক্ত নীতি আর কিছুই নাই। একবার আর্য্যবংশীয় ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে বলিয়াছিলেন, "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ", দ্বিতীয়বার জেরুসলেমের পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াইয়া যীহুদা বংশীয় যীশু বলিলেন, "অন্যের নিকট তুমি যে ব্যবহারের কামনা কর, অন্যের প্রতি তুমি সেই ব্যবহার করিও।" এই দুইটি বাক্যের ন্যায় মহৎ বাক্য ভূমণ্ডলে আর কখন উক্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই বাক্য সাম্যতত্ত্বের মূল।

এই সকল তত্ত্ব ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তি বলিয়া পরিগৃহীত হইতে লাগিলে, দাসের বন্ধন শৃঙ্খল মোচন হইতে লাগিল। ভোগাভিলাষী ভোগাভিলাষ ত্যাগ করিতে লাগিল। তৎপ্রসাদে রোমকে বর্ব্বরে মিলিত হইয়া, মহাতেজস্বী, উন্নতিশীল, যুদ্ধদুর্ম্মদ জাতি সকল সম্ভূত হইল। তাহারাই আধুনিক ইউরোপীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ন্যায় লৌকিক উন্নতি পৃথিবীতে কখন হয় নাই, বা হইবে এমত ভরসা পূর্ব্বগামী মনুষ্যেরা কখন করেন নাই। ইহা যে

কেবল খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ফল এমত নহে, ইহার অনেক কারণ আছে—কিন্তু প্রধান কারণ খ্রীষ্টীয় নীতি এবং যুনানী সাহিত্য এবং দর্শন। এক খ্রীষ্ট ধর্ম্মে যে কেবল সুফলই ফলিয়াছে, এমত নহে। ইষ্ট এবং অনিষ্ট উভয়বিধ ফলই ফলিয়াছিল। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সাম্যাত্মক হইলেও পরিনামে তৎফলে একটি গুরুতর বৈষম্য জন্মিয়াছিল। ধর্ম্মযাজকদিগের অত্যন্ত প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল। স্পেন, ফ্রান্স, প্রভৃতি কয়েকটি ইউরোপীয় রাজ্যে এই বৈষম্য বড় গুরুতর হইয়াছিল। বিশেষ ফ্রান্সে তৎসহিত উচ্চশ্রেণী এবং অধঃশ্রেণীর মধ্যে ঈদৃশ গুরুতর বৈষম্য জন্মিয়াছিল, যে সেই বৈষম্যের ফলে ফরাসী মহাবিপ্লব ঘটিয়াছিল। সেই মথিত সাগরের একজন মন্থন কর্ত্তা ছিলেন—তিনিই তৃতীয়বারের সাম্য তত্ত্ব প্রচার কর্ত্তা। তৃতীয় সাম্যাবতার রূসো। (ক্রমশঃ)

উপন্যাস

কয় বৎসর পূর্ব্বে তটপন্থায় ঢাকা হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করিতে, মহম্মদপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রামের নীচে, মধুমতী নাম্নী তরঙ্গময়ী নদী পার হইতে হইত। তাহার নামান্তর "এলেন খালি।"

একদা নিদাঘের প্রচণ্ড ঝটিকাবসানে রাত্রিশেষে মধুমতীর উপকূলে সেই গ্রামে একখানি শিবিকা থামিল। ডাকের বেহারারা প্রথামত, শিবিকা রাখিয়া, বখ্‌শিষ লইয়া, প্রস্থান করিল। ভিতর হইতে অতি সুন্দর পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় এক যুবা পুরুষ নির্গত হইয়া, ইতস্ততঃ অন্য বাহকদিগের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া কিঞ্চিৎ দূরে গেলেন, এবং নিকটস্থ একখানি ভগ্ন কুটীরের দ্বারে আঘাত করিলেন। কুটীর বাসী জিজ্ঞাসা করিল, "কে দ্বার ঠেলে?" যুবক উত্তর করিলেন, "আমি পথিক, এই গ্রামে একদল ডাকের বেহারা থাকিবার কথা ছিল, তাহারা কোথায় বলিতে পার?" কুটীর বাসী কহিল, "তাহারা রাত দশটা পর্য্যন্ত এইখানে ছিল, কিন্তু ঝড় আসাতে চলিয়া গিয়াছে।" যুবক নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রজনী দ্বিতীয় প্রহর, অনন্ত নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে; এবং বিশাল তরঙ্গিনী মধুমতী হৃদয়ে ঝিকমিক করিয়া তৎপ্রতিবিম্ব নাচিতেছে। সুশীতল নৈদাঘ বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছিল। পৃথিবী স্থির, সুশীতল; পশু, পক্ষী, গ্রামবাসী, সকলেই নীরব; কেবল কোথাও মনুষ্য পদশব্দে উত্তেজিত কুক্কুরের রব, আর কখন কখন অতিদূর-নিঃসৃত গ্রাম্য প্রহরীদিগের চীৎকারধ্বনি শুনা যাইতেছিল। যুবক স্বভাবের সৌন্দর্য্য অবলোকনে অন্যমনা হইয়া, মধুমতীর তটে পদ চারণ করিতে ছিলেন—হঠাৎ চমৎকৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে জলের অনতিদূরে একটি শ্বেত পদার্থ। পদার্থটি মৃত মনুষ্য দেহ। তাহার অনতিদূরে দুই একখানি ভগ্ন কাষ্ঠ ও একখানি নৌকার হাল। বুঝিলেন, যে নিশারম্ভে যে প্রবল ঝটিকা

হইয়াছিল, তৎ কর্ত্তৃক কোন নৌকা জলমগ্ন হইয়াছিল এবং এই হতভাগ্য ব্যক্তি তাহার একজন আরোহী।

যুবক রাজধানী সন্নিকটবর্ত্তী—লা গ্রামের একজন সৌষ্ঠবান্বিত ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী কায়স্থের পুত্র; তাঁহার নাম করালী প্রসন্ন। তিনি বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইংরাজি বিদ্যাভ্যাস করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হওনান্তর, মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। এবং তথায় যথারীতি অধ্যয়ন করিয়া গৌরবের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এক প্রধান চিকিৎসকের পদে অভিষিক্ত হন। অদ্য ডাক যোগে কর্ম্মস্থানে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এই আড্ডায় বাহক না পাওয়াতে, এই অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন।

করালীপ্রসন্ন ভাবিলেন, যদি এই ব্যক্তি এই রাত্রের ঝড়ে জলমগ্ন হইয়া থাকে তবে এখনও চেষ্টা করিলে, ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করা যাইতে পারে।

করালীপ্রসন্ন মৃতদেহের নিকট যাইয়া, বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং দেখিলেন যে দ্বাবিংশতি বৎসর বয়স্কা পরমা সুন্দরীর দেহ। দেহ যেন পৃথিবীর রিপুবর্জ্জিত হইয়া, স্বর্গীয় কান্তি ধারণ করিয়াছে। এবং চন্দ্রালোকে বোধ হইল, যেন মৃত রমণীর ওষ্ঠে অপূর্ব্ব হাসি শোভা পাইতেছে। করালীপ্রসন্ন অনেকক্ষণ অবধি অনন্যমনে শব নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। করালী অনেক সুন্দরী দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বোধ হইল, যেন, এমত সুন্দরী কখন তাঁহার নয়ন গোচর হয় নাই। করালী নিঃসঙ্কোচে মৃত রমণীর দেহস্পর্শ করিলেন; এবং তাঁহার হস্ত পদাদি চালনা ও অন্যান্য কৌশলের দ্বারা দেহ হইতে জল নির্গত করাইলেন, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত একফোঁটা জল পড়িল, ততক্ষণ চেষ্টায় ত্রুটী করিলেন না। তৎপরে মৃতদেহ ভূমিতে রাখিয়া শিবিকা হইতে কোন দ্রব পদার্থ ও একখানি ফ্লানেল বস্ত্র লইয়া গেলেন। এবং ঐ বস্ত্রদ্বারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মৃত রমণীর হস্তপদাদি ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে দ্রব পদার্থ তাহার ওষ্ঠ ভেদ করিয়া ঢালিলেন, কিন্তু পদার্থ তৎক্ষণাৎ দুই কশ দিয়া পড়িয়া গেল, গলাধঃকরণ হইল না। ইত্যবসরে, করালী মৃতদেহ কর্দ্দম হইতে পরিষ্কার করিয়া ঘাসের উপর রাখিলেন।

করালী দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন মতেই কামিনীকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিলেন না। শেষে হতাশ্বাস হইয়া, শিবিকায় প্রত্যাগমন করিলেন, এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না।

সেই নদী সৈকতশায়ী অপূর্ব্ব মহিমাবিশিষ্ট মৃত রমণীর মুখমণ্ডল মনে

পড়িতে লাগিল। করালী অন্যদিকে মন ফিরাইতে যত্ন করিলেন, কিন্তু সফল হইলেন না।

তিনি শিবিকার দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলেন এবং সহসা তাঁহার বোধ হইল, যেন নিদাঘের গ্রীষ্ম যন্ত্রণায় নৈশ সমীরণ সেবনার্থ, কোন ব্যক্তি চন্দ্রালোকে মধুমতী-তীরে শয়ন করিয়া আছে। সেই হতভাগিনী সুন্দরী! যাহাকে প্রাসাদোপরি সুকুমার পুষ্পশয্যায় আদরে শয়ন করাইয়া, যত্নে ব্যজন করিয়া, মধুর সঙ্গীতে নিদ্রিত করিয়া, সৌন্দর্য্যমুগ্ধ স্বামীর আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইত না, এখন সে নদী সৈকতে, কর্দ্দমশয্যায় পড়িয়া আছে। করালী অল্প বয়স্ক, মৃত সুন্দরীর জন্য তাঁহার চক্ষে এক ফোঁটা জল পড়িল। করালী অন্যমনস্ক হইবার জন্য শিবিকার ভিতরে আলো জ্বালিয়া, একখান পুস্তক পড়িতে চেষ্টা করিলেন, অবশেষে নিদ্রার আবির্ভাব হইল। আলো নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু, নিদ্রা কষ্টজনক হইল। করালী নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন সেই মৃত কামিনী শ্মশানশয্যা ত্যাগ করিয়া, শিবিকার দ্বারোদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রেমপরিপূরিত লোচনে তাঁহার প্রতি চাহিয়া কি বলিতেছে। করালী চমকিয়া উঠিলেন, এবং শিবিকার দ্বার খোলা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। মধুমতীর তটে যেস্থলে মৃতদেহ রাখিয়াছিলেন, সেইদিকে দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! সেস্থলে শব নাই। চকিতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করিলেন, কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। যামিনী প্রায় অবসন্না হইয়াছে। চন্দ্র অস্তগত প্রায়। পূর্ব্বদিক ঈষৎ পরিষ্কার হইয়াছে। বিহঙ্গমকুল কল কল রব করিয়া দিগ্দিগন্তে যাইতেছে। আর নদী মধুমতী উষার খরতর সমীরণে চঞ্চলা হইয়া কল কল রব করিতেছে। করালী ইতস্ততঃ দেখিতে দেখিতে মধুমতীর কূলের দিকে চলিলেন; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। করালী একবার মনে ভাবিলেন, শৃগাল কুক্কুরে আহার নিমিত্ত কোন বনে শব লইয়া গিয়াছে। এই স্থির করিয়া শিবিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শিবিকার নিকট আসিয়া তাঁহার আর পা উঠিল না, শরীর রোমাঞ্চ হইল, বুদ্ধি লোপ হইল। মৃত রমণীদেহ নদীকূলশয্যা ত্যাগ করিয়া, করালীর শিবিকাপার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে।

করালীপ্রসন্ন অনেকক্ষণ প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। একি কেহ শব তুলিয়া এখানে ফেলিয়া গেল? না পৈশাচ ধর্ম্ম প্রমাণীকৃত করিয়া শব এখানে আপনি আসিয়াছে?

স্থির বুদ্ধির নিকট কোন ভ্রম থাকে না। করালী শবের প্রকোষ্ঠে অঙ্গুলি অর্পণ করিয়া দেখিলেন জীবনস্রোতঃ বহিতেছে। নিঃশ্বাসাদি পরীক্ষা করিলেন,

দেখিলেন, এ শব নহে, সুন্দরী জীবিতা। কিন্তু নিদ্রিতা অথবা মূর্চ্ছিতা? করালী এখন বুঝিলেন, যে, যুবতী তাঁহার চিকিৎসা প্রভাবে পুনর্জ্জীবিতা হইয়া শিবিকা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। এবং তাঁহারই দ্বারা শিবিকার দ্বারোদ্‌ঘাটন হইয়াছিল। পরে তিনি ক্লান্তা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া থাকিবেন।

করালী ধীরে ধীরে যুবতীকে শিবিকার ভিতর শোয়াইলেন। গ্রামবাসী জনৈক ব্যক্তিকে পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়া, অতি ত্বরায় একখানি সৈয়দপুরে পান্‌সী ভাড়া করিলেন, বাহক আনাইয়া, পালকী সহিত যুবতীকে নৌকায় তুলিলেন, এবং একটি কামরায় আপনি স্বয়ং শয্যা রচনা করিয়া অতিযত্নে রমণীকে উহাতে স্থাপিত করিয়া, অনেক কৌশলে মূর্চ্ছাভঙ্গ করিলেন। দিনমণির উদয় হইল, পৃথিবী জ্যোতির্ম্ময়ী হইল, সঙ্গে সঙ্গে করালীপ্রসন্নের হৃদয় জ্যোতির্ম্ময় হইল। যে রমণীর মৃতদেহ দেখিয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন এক্ষণে সেই রমণী তাঁহারই যত্নে পুনর্জ্জীবিতা হইয়া, চক্ষুরুন্মীলন করিল। করালীর বোধ ছিল যে যুবতী অপরিচিত স্থানে অপরিচিত ব্যক্তি দেখিয়া ভয় পাইবেন, কিন্তু তাহার কিছু চিহ্ন দেখিলেন না। যুবতী চৈতন্য পাইয়া কিছু খাইতে চাহিলেন। করালী তাঁহার পাথেয় খাদ্যদ্রব্য হইতে খাইতে দিলেন। রমণী আহার করিয়া নিদ্রাভিভূতা হইলেন, ইত্যবসরে করালী ইতি কর্ত্তব্যতা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। যুবতী যে সধবা নহে, তাহা তিনি তাহার অলঙ্কারবিহীন হস্ত দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন। যুবতী কে, কাহার কন্যা, কোথায় নিবাস, কেমন করিয়াই বা তাঁহাকে বাটী পাঠাইবেন, আর কি প্রকারে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন এই সকল ভাবিতে-ছিলেন। এমত সময়ে রমণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। করালী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছ?" যুবতী কোন উত্তর না দিয়া উঠিয়া বসিল এবং আপনার অঞ্চল লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। ক্রমে অস্ফুট স্বরে গীতোদ্যম করিতে লাগিল। অব্যক্তনাদী কলবিহঙ্গমবৎ কণ্ঠ ধ্বনিত হইল, কিন্তু অর্থযুক্ত কোন বাক্য নির্গত হইল না—যেন গীত মনে পড়িল না। করালী দেখিলেন, মুখের ভাব অজ্ঞান বালিকার ন্যায়। দৃষ্টির স্থিরতা নাই। অঙ্গস্খলিত বসন সাবধান করিবার ইচ্ছা নাই। সর্ব্বনাশ! একি পাগল! করালী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কাহার কন্যা?" রমণী বিনা বাক্যে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। "তোমার নাম কি?" তথাপি কোন উত্তর পাইলেন না। তৎপরে কিছু খাদ্য সামগ্রী লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "খাবে?" রমণী বালিকার ন্যায় হাস্য করিয়া খাদ্য লইয়া আহার করিল। করালী মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, একটী উন্মাদিনী তাঁহার স্কন্ধে পড়িল।

রমণীর পূর্ব্বস্মৃতি লোপ হইয়াছে সুতরাং তাঁহার আত্মীয় স্বজনের অনুসন্ধানের

সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তিনি কি প্রকারে অপরিচিতা, বুদ্ধিহীনা স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে লইয়া বেড়ান। এই সকল চিন্তায় তিনিও ক্ষিপ্তের ন্যায় হইলেন। করালী বুদ্ধিমান্, চিন্তাশীল, এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ। সহসা কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে ক্ষমবান্ ছিলেন। তিনি এক্ষণে স্থির করিলেন, যে যুবতী বুদ্ধিহীনা হউক বা বুদ্ধিমতী হউক, যখন তাহার আত্মীয় স্বজনের অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, তখন তাহাকে আশ্রয় দেওয়ায় কোন দোষ নাই, বরং কর্ত্তব্য কার্য্য। অতএব যুবতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার মানসে, নিকটস্থ গ্রাম হইতে একটি দাসী আনাইয়া তাহার পরিচর্য্যার্থ নিযুক্ত করিলেন। করালী পুনর্জ্জীবিতা রমণীর নামকরণ করিলেন। মধুমতী নদীতীরে তাহাকে কুড়াইয়া পাইয়াছেন, অতএব তাহার নাম দিলেন "মধুমতী।"

করালীপ্রসন্ন মধুমতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া, কর্ম্মস্থানে গেলেন, এবং অতি যত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। মধুমতীও যেমন বালিকা মাতার অনুরক্তা হয়, সেইরূপ করালীর অনুরক্তা হইলেন। যতক্ষণ তিনি বাসায় থাকিতেন ততক্ষণ মধুমতী তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতেন না। হয় তাঁহার কেতাব পত্র লইয়া নতুবা অন্য কোন দ্রব্য লইয়া, তাঁহার সম্মুখে বসিয়া ক্রীড়া করিতেন।

এই প্রকার তিন মাস গেল। ক্রমে মধুমতীর মুখের ভাবান্তর হইতে লাগিল। যখন করালীকে দেখিতে পাইতেন, তখন বালিকামূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া মুখমণ্ডলে যৌবনোপযোগী ভাব সঞ্চার হইতে থাকিত।

এইরূপে তাহার বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। যেমন বালিকাদিগের দিনে দিনে, মাসে মাসে, বর্ষে বর্ষে, স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে সে প্রকারে নহে। যেমন শুষ্ক পল্লবরাশি মধ্যে অগ্নি রাখিয়া ফুৎকার দিলে অগ্নি একবারে প্রজ্বলিত হয়, এ সেই প্রকার। অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধির ন্যায় বুদ্ধি মধুমতী পুনঃপ্রাপ্তা হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইলেন না। তিনি জলমগ্ন হইবার পূর্ব্বে কে ছিলেন তাহা আর মনে পড়িল না।

করালী একদিন পাঠাভ্যাস করাইতে করাইতে তাঁহাকে জলমগ্নবৃত্তান্ত সমুদয় অবগত করাইলেন এবং অনুরোধ করিলেন, জলমগ্নের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিতে, কিন্তু মধুমতীর কিছুই স্মরণ হইল না, বরং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যেন কিছুই স্মরণ না হয়। যেন কিছুই স্মরণ না হয়! আর কেহ কি উন্মাদিনীর মত জগদীশ্বরের নিকট পূর্ব্বস্মৃতি লোপের প্রার্থনা করে? শত সহস্র লোক। যাহাদের পূর্ব্বকৃতাপরাধ ব্যাঙ্কোর বংশাবলীর ন্যায় শোণিতাক্ত কুণ্ডলদাম দোলাইয়া সর্ব্বদাই স্মৃতিপথে বিচরণ করে, তাহারাই স্মৃতিলোপের কামনা করে। কিন্তু মধুমতী লুপ্তস্মৃতির চিরলোপের কামনা করে কেন? করালী অনুসন্ধান করিলেন। দেখিলেন

মধুমতী এখন সুখী—পাছে পূর্ব্বস্মৃতি আসিয়া এ আনন্দের বিঘ্ন করে, এই আশঙ্কা। যেমন দর্পণে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া লোকে আপন মুখ দেখে, তেমনি করালী মধুমতীর হৃদয়ে আপন হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিলেন। দেখিলেন, উভয়েই প্রেমবিমুগ্ধ।

পুত্তলের প্রতি বালিকার প্রেমের ন্যায়, মধুমতীর প্রেম।—

এক দণ্ডের জন্য করালীকে না দেখিতে পাইলে, মধুমতী পাগলের ন্যায় হইত। করালীপ্রসন্ন চিকিৎসা অনুরোধে দুই এক ঘণ্টা অনুপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু মধুমতী এ সময়টুকু অসীম যন্ত্রণায় অতিবাহিত করিতেন। মধুমতী পা ছড়াইয়া বসিয়া, অবোধ বালিকার ন্যায় রোদন করিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠিতেন, যেন করালীপ্রসন্নের জুতার শব্দ, অথবা দরওয়াজায় গাড়ী থামার শব্দ পাইতেন। অমনি চীৎকার করিয়া পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "বামা, বাবু এলেন বুঝি?" কিন্তু যখন বামার উত্তরে বুঝিতেন, যে তাঁহার ভ্রম মাত্র, তখন আবার পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিতেন।

করালীপ্রসন্ন পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবাপুরুষ, মধুমতীর ন্যায় ভুবনমোহিনী রূপসীর সহবাসে যে মন হারাইবেন, তাহার বিচিত্র কি? অষ্টেপৃষ্ঠে মধুমতীর প্রণয়পাশে জড়িত হইয়া অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলেন। মধুমতী স্ত্রীরত্ন, কেমন করে অধিকার করিবেন, অনুদিন তাহাই চিন্তা করিতেন। মধুমতী বিবাহিতা কি অবিবাহিতা সে বিষয় সর্ব্বদাই আন্দোলন করিতেন। মধুমতী বিধবা হইলে তাঁহার বিবাহের কোন আপত্তি ছিল না, কেননা তিনি ব্রাহ্ম; কিন্তু মধুমতী যে সধবা নন, সে বিষয়ে তাঁহার এক প্রকার সংশয় দূর হইয়াছিল; কেননা যখন মধুমতীকে মৃতাবস্থায় দেখিতে পান, তখন হস্তে একখানিও গহনা ছিল না। হইতে পারে দস্যু কর্ত্তৃক তাহা অপহৃত হইয়া থাকিবে। কিন্তু মধুমতীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় তাহার মন এতই চঞ্চল হইয়াছিল, যে সে সংশয় মনে আসিল না। করালীপ্রসন্ন মধুমতীকে বিবাহ করাই স্থির করিলেন।

একদিন করালীপ্রসন্ন মধুমতীকে পাঠাভ্যাস করাইতে করাইতে কহিলেন, "মধুমতী—" মধুমতী তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। মুখে কথা ফুটিল না। কোন কোন সময়ে করালীর সম্মুখে মধুমতীর কথা ফুটিত। যখন করালীপ্রসন্ন প্রদীপ অথবা দ্বারের দিকে পশ্চাৎ করিয়া মধুমতীর সম্মুখে বসিতেন। তখন কথা ফুটিত। মধুমতী অমনি ব্যস্ত হইয়া বলিতেন "এই দিকে বস" কেননা করালীর মুখ অন্ধকার হওয়াতে তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেন না। এই দিকে বসিলে মুখ অন্ধকার ঘুচিয়া আলোকময় হইবে এবং মধুমতী তৃপ্তি পূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিতে

পাইবে। একদিন করালীপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মধুমতী, তুমি সধবা না বিধবা তাহা কিছু তোমার মনে পড়ে?"

এবার মধুমতী কথা কহিল। বলিল, "বিয়ের কথা কিছু মনে পড়ে না। বোধ হয় বিধবা।"

ক। "আমার তাই বোধ হয়, কেননা, তোমায় যখন নদীর তীরে পাইয়াছিলাম, তখন তোমার অঙ্গে কোন অলঙ্কার ছিল না।"

ম। "তবে আমি বিধবা।" করালীর মুখ প্রফুল্ল হইল। পুনরপি বলিলেন, "বিধবার বিবাহ হয় জান?"

ম। "তোমারই মুখে শুনিয়াছি।"

ক। "তুমি আবার বিবাহ করিবে?"

ম। "করিব না কেন!"

ক। "কাকে বিয়ে কর্‌বে?"

ম। "তুমি যাকে বল।"

ক। "আমাকে?"

মধুমতী তখন লজ্জায় মুখ নত করিয়া, মৃদু মৃদু স্বরে কহিল, "করিব।" করালী আর কখন মধুমতীকে লজ্জিত দেখেন নাই। করালী উঠিয়া গেলেন। মধুমতী ক্ষিপ্তার ন্যায় হাসিতে ও কাঁদিতে আরম্ভ করিল সে কেবল আনন্দে।

বিবাহের দিন স্থির হইল। শুভক্ষণে, অশুভক্ষণে, তাঁহাদের বিবাহ হইল। করালী বিদায় লইয়া, মধুমতীর সহিত স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

"আর কত দিনে আমরা সেই স্থানে পৌঁছিব" মধুমতী একদিন নৌকাতে করালীপ্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন। করালী কহিলেন "কোন স্থানে? যে স্থানে তোমায় কুড়াইয়া পাইয়াছি? সে ঐ স্থান।" মধুমতী একবার সেই স্থান নিকটস্থ হইয়া দেখিতে চাহিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় মাঝিরা নৌকা অমনি কূলের দিকে ফিরাইল। মধুমতী খড়খড়ি খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং ইচ্ছা করিলেন সে রাত্রে সেখানে থাকেন। সুতরাং নৌকাও তীরলগ্ন হইল। রজনী দ্বিতীয় প্রহর। মধুমতী সুখে করালীপ্রসন্নের ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছিলেন, আর করালীপ্রসন্নের হাস্যময় মুখ নিদ্রার স্বপ্নে দেখিতেছিলেন। কিন্তু সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিল। মধুমতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। করালীও জাগিলেন। দেখিলেন যে ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতে নৌকা দুলিতেছে। করালী খড়খড়ি খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু শিহরিয়া উঠিয়া অতি ব্যস্ত হইয়া মধুমতীকে হৃদয়ে টানিয়া লইলেন। মধুমতী করালীর ভয়ের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি যে স্বামীর হৃদয়ে মাথা রাখিতে পাইলেন, সেই অসীম সুখেতে কাঁদিতে

লাগিলেন। করালী বাহিরে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে অতি ভীষণ অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছে; প্রলয় কালের ন্যায় বৃষ্টি, মুহুর্মুহুঃ অশনি-নিপাত এবং অতি প্রচণ্ড ঝড় সকলে একত্রিত হইয়া পৃথিবী রসাতলে দিতেছে। কিন্তু করালীপ্রসন্ন বিদ্যুতালোকে দেখিলেন, যে এই ভীষণ সময়ে উন্মথিতা নদীর বিজন উপকূলে ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া এক দীর্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়াছিল। করালী কৌতূহলী হইয়া জনৈক সুচতুর মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও কে দাঁড়াইয়া—জান?" মাঝি কিছুই দেখিতে পাইল না। পুনরায় বিদ্যুৎ হানিলে দেখিতে পাইল এবং চমকিয়া উঠিল।

করালী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওকে চেন?"

মাঝি। ওকে আবার চিনি না—এ অঞ্চলে মাঝি মাল্লা যে এখানে ঝড় বৃষ্টিতে নৌকা লাগাইয়াছে, সেই চিনিয়াছে।"

ক। "ও কে?"

মাঝি। কে তা কেউ জানে না, ও ভূত কি চোর তা কেউ জানে না, কিন্তু আজ মাস দুই তিন হইল রাত্রে ঝড় বৃষ্টির সময়ে এই নদীতীরে সকলেই দেখিতে পায়—

ক। তুমি কখনও দেখিয়াছিলে?

মা। মাঝি মাল্লার মধ্যে কে না দেখেছে? আমরা কলিকাতা হইতে আসিবার সময় একদিন ঝড় বৃষ্টির রাত্রে এইখানে নৌকা রাখিয়াছিলাম। আর ওকে ঐ স্থানে দেখিয়াছিলাম।

করালী অতিশয় কৌতূহলী হইয়া কূলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না বিদ্যুৎ হানিলে দেখিলেন যে দীর্ঘাকার পুরুষ অদৃশ্য হইয়াছে, পরে মাঝিকে বিদায় দিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

করালীপ্রসন্ন মধুমতীর সহিত স্বদেশে পৌছিলেন। পিতা মাতা মঙ্গলাচরণ করিয়া পুত্র পুত্রবধূ ঘরে লইলেন এবং মধুমতীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। মধুমতী এবং করালীপ্রসন্নের সুখের সীমা রহিল না। এক দণ্ডের জন্য বিচ্ছেদ নাই; করালী দিবারাত্র ঘরে থাকিতেন, এবং মধুমতী অনিমেষ লোচনে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিতেন। কখন যদি এক দণ্ডের জন্য বিচ্ছেদ হইত তবে মধুমতী বালিকার ন্যায় কাঁদিতেন। মধুমতীর এই প্রকার ব্যবহারে পুরবাসী ও প্রতিবাসিগণ সকলেই বিরক্ত হইতেন।

অকস্মাৎ এই অনন্ত সুখের সাগর শুষ্ক হইল। যে দিনে বিধাতার লিখনানুসারে এক অশনিতে দুই জনের হৃদয় ভগ্ন হইবে সেই দিন প্রভাত হইতে

চলিল। সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা আমরা কি প্রকারে বর্ণন করিব? তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণন সম্ভব নহে।

করালীপ্রসন্ন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দুই চারি দিবসের জন্য কলিকাতায় গেলেন। নির্ব্বোধ মধুমতী অশান্তের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহার সমবয়স্কা ননদিনী শ্যামাসুন্দরী অনেক বুঝাইলেন। মধুমতী শ্যামার কিছু অনুরক্তা ছিলেন। করালীর গমনের পর রাত্রে শ্যামাসুন্দরী তাহার সান্ত্বনার নিমিত্ত একত্রে শয়ন করিলেন। মধুমতী ও শ্যামাসুন্দরী উভয়ের নিদ্রা আসিল না। শ্যামাসুন্দরীর গ্রীষ্ম যন্ত্রণায়, মধুমতীর বিচ্ছেদ যন্ত্রণায়। শ্যামাসুন্দরীর প্রস্তাবানুসারে উভয়ে শয়নগৃহ ত্যাগ করিয়া পশ্চিমের এক বারেণ্ডায় বসিলেন। বারেণ্ডা অতি নিম্ন এমন কি বালকেরাও ভূমি হইতে সহজে তদুপরি উঠিতে পারে।

সম্মুখে ভাগীরথী, পশ্চাতে অতি বিস্তীর্ণ এক প্রান্তর। রজনী দ্বিতীয় প্রহর। পূর্ণিমার রাত্রি; চন্দ্রমা নিঃশব্দে আকাশে ভাসিতেছে, নৈশ সমীরণ অতি মন্দ মন্দ হিল্লোলে জাহ্নবীহৃদয় চঞ্চল করিতেছে। মধুমতী ও তাহার ননদিনী দুরন্ত গ্রীষ্ম যন্ত্রণায় বারেণ্ডায় বসিলেন। শ্যামাসুন্দরী মধুমতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "বউ তোর কি আগেকার কথা কিছু মনে পড়ে না?" মধুমতী উত্তর করিলেন "কিছুই না।" পরে উভয়ে নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। অকস্মাৎ মধুমতী সশঙ্কচিত্তে উঠিয়া বসিলেন। চন্দ্রিকা বিধৌত জাহ্নবীর উপকূল হইতে সুকণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি হইল। সঙ্গীত নৈশ সমীরণে আরোহণ করিয়া জাহ্নবীর হৃদয়ে বিচরণ করিতে লাগিল। শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ অমন করিয়া বসিলি যে?" মধুমতী উত্তর করিল, "ঠাকুরঝি! পূর্ব্বকার কথা আমার কিছু মনে পড়ে না, কিন্তু এই গান শুনিয়া আমার একটি কথা মনে পড়িতেছে। আমি যেন একটি গান জানিতাম।"

শ্যামা। গান ত সকলেই জানে—সে আর মনে পড়িবার কথা কি?

গায়ক অতি পরিস্ফুট স্বরে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া, গায়িতে লাগিল। মধুমতী বড় চঞ্চলা হইল—বলিল, "শুধু একটি গান জানিতাম তাহা নহে—একটি গান বড় ভাল বাসিতাম, সর্ব্বদাই শুনিতাম মনে হইতেছে। বুঝি সে এই সুর। এ সুরে আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে। দেখ দেখি কথা বুঝা যায় কি না?" উভয়ে মনোভিনিবেশপূর্ব্বক শুনিতে লাগিলেন। গীতের একটি পদ স্পষ্ট বুঝা গেল—

"আদর তরঙ্গ বহে, রূপের সাগরে—" বিদ্যুদগ্নিবৎ এই কথা মধুমতীর হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই পূর্ব্বশ্রুত গীত বটে। যেমন সভামণ্ডপে পরিচারক একটি প্রদীপ লইয়া সহস্র দীপ জ্বালিত করে, এই গীতে মধুমতীর সেই

রূপ হইবার উপক্রম হইল। "আদর তরঙ্গ"—আদর—আদরিণী নামটি মনে পড়িল। কাহার নাম আদরিণী? তাহাও মনে পড়িল। মধুমতী মনশ্চক্ষে দেখিতে লাগিলেন—এক ক্ষুদ্র স্বচ্ছ পুষ্করিণী—চারি পাশে কদলী, দাড়িম্ব, আম্রাদি বৃক্ষ, তন্মধ্যে অনতিবৃহৎ বাসগৃহ। তন্মধ্যে আদরিণী—আদরিণী আর একজন—এক দাড়িম্ব তলায় উভয়ে পরস্পর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া—মধুমতী তখন দুই হস্তে মুখাবরণ করিয়া চীৎকার করিল না। শ্যামা দেখিলেন, তাঁহার কলেবর স্বেদাক্ত কম্পবিশিষ্ট, এবং মূর্চ্ছার পূর্ব্বলক্ষণবিশিষ্ট। মধুমতী চক্ষু বুজিয়া তাঁহার ননদিনী শ্যামাসুন্দরীর হস্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিলেন। শ্যামাসুন্দরী মধুমতীকে পীড়িত বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে বউ?" কিন্তু উত্তর নাই, মধুমতী মূর্চ্ছা যান নাই, অজ্ঞান হন নাই, চীৎকার করেন নাই, অথবা কাঁদেন নাই, কেবল মাত্র স্তম্ভিত হইয়া চক্ষু বুজিয়া শ্যামাসুন্দরীর হস্তধারণ করিয়া রহিলেন। কিন্তু মূর্চ্ছার লক্ষণ বুঝিয়া তাঁহার ননন্দা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া শয়নগৃহে যাইয়া তাঁহাকে পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইলেন। মধুমতী কলের পুত্তলির ন্যায় শুইলেন। শ্যামাসুন্দরী ও মধুমতী এক শয্যায় শয়ন করিলেন। যামিনী প্রভাতা হইল। গবাক্ষ নিকটস্থ বৃক্ষস্থিত একটি পাপিয়ার ধ্বনিতে শ্যামার নিদ্রা ভাঙ্গিল, নিদ্রাভঙ্গমাত্র মধুমতীর প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন, কিন্তু শিহরিয়া উঠিলেন। গত রাত্রে শ্যামা মধুমতীকে স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আজ প্রাতে মধুমতীকে অঙ্গার খণ্ডের ন্যায় দেখিলেন। ছয় ঘণ্টার মধ্যে কি ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে! এ পরিবর্ত্তন কি শারীরিক পীড়ায় অথবা কোন মানসিক পীড়ায়? সরলা শ্যামাসুন্দরী শারীরিক পীড়া অনুভব করিলেন। এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া মধুমতীকে আরো পীড়িত করিতে লাগিলেন।

করালীপ্রসন্নের বৃহৎ পুরী নিঃশব্দ, জন মানব দেখা যায় না। কেবল মাত্র বড় দালানে চড়ই পক্ষীর শব্দ শুনা যাইতেছে আর অন্তঃপুরমধ্যে এক কক্ষে শয্যাশায়ী একটি শীর্ণদেহ স্ত্রীলোকের ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনা যাইতেছে। মধুমতী শয্যাশায়ী; কি পীড়ায় শয্যাশায়ী তাহা কোন চিকিৎসক নির্ণয় করিতে পারে নাই। করালীপ্রসন্ন অদ্যাপি বাটী প্রত্যাগমন করেন নাই, তজ্জন্য মধুমতীর পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাকুলতা নাই। মধুমতী বাহ্যিক ও মানসিক ক্ষমতারহিত হইয়া মৃতবৎ শয্যায় মিশিয়া আছেন।

সন্ধ্যা হইল, পশ্চিমগগনে ঘোর মেঘাড়ম্বর হইল, রাত্র এক প্রহর, অতি নিবিড় অন্ধকারে পৃথিবী আবৃতা হইল। ক্রমে বৃষ্টির সহিত প্রচণ্ড ঝড় উঠিল। মধুমতী সেই জনহীন বৃহৎ অট্টালিকার এক কক্ষে শয়ন করিয়া আছেন। শয্যা-

পার্শ্বে একটি আলোক জ্বলিতেছিল। নিঃশব্দ, কেবল বাহিরে ঝড় বৃষ্টির হু হু শব্দ, ও তৎ কর্তৃক কপাট জানেলার ঝন ঝনা শব্দ হইতেছিল। আলো কিছু মিট মিট করিতেছিল। এমত সময়ে অকস্মাৎ, চিত্রপটে চিত্রমূর্ত্তিবৎ, মধুমতী মুক্ত দ্বারপথে এক মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া, সেই বহুকালবিস্মৃত মূর্ত্তি চিনিয়া, মধুমতী উঠিয়া বসিলেন। মনুষ্য আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিল।

উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পুরুষের চক্ষে অশ্রু বহিল। তিনি বলিলেন, "তুমি এখানে কেন, আদরিণি ?"

মধুমতী, অথবা আদরিণী কহিল, "নহিলে কোথায় যাইব ? মধুমতীর তীরে যখন মরিয়া পড়িয়াছিলাম, তখন আমাকে কে বাঁচাইয়াছিল ? যিনি বাঁচাইয়াছিলেন, তিনিই আশ্রয় দিয়াছেন।"

লুপ্ত স্মৃতির পুনঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মধুমতী বুদ্ধিও পুনঃপ্রাপ্তা হইয়াছিলেন। আগত ব্যক্তি কহিলেন, "ভালই করিয়াছেন—আমি তাঁহার ঋণী হইয়াছি। কিন্তু তুমি এতদিন দেশে আসিয়াছ একবার আমার সন্ধান কর নাই কেন ? তুমি কি প্রকারে আমাকে ভুলিয়াছিলে ?"

মধুমতী কহিল, "কি প্রকারে ভুলিয়াছিলাম, তাহা শুনিলে তুমি বিশ্বাস করিবে না—তবে বলিয়া কি হইবে ?"

উত্তরে তিনি কহিলেন, "তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই বিশ্বাস করিব—অথবা তাহা শুনিতেও চাহি না। আমি যে তোমাকে আবার দেখিতে পাইয়াছি, ইহাতেই আমি সুখী। এখন আমার সঙ্গে গৃহে চল।" যিনি বলিতেছিলেন, আহ্লাদে তাঁহার শরীর তর তর করিতেছিল—কণ্ঠ গদগদ।

তখন মধুমতী, মুখ নত করিয়া, কম্পিত কলেবরে, অস্ফুটস্বরে, কহিল, "গৃহে যাইব ? আমার আর গৃহ নাই। তোমার সঙ্গে আর আমার সম্বন্ধ নাই। এ জীবন আর আমার নহে। যিনি ইহা রক্ষা করিয়াছেন, এক্ষণে ইহা তাঁহারই। তোমার আমার ইহাতে কোন অধিকার নাই।" শুনিয়া, আগন্তুকের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। প্রথমে তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—পরে মধুমতীর বিস্ময়জনক কথার মর্ম্মানুধাবন করিয়া, স্বেদাক্ত কলেবরে, মস্তকধারণ করিয়া বসিলেন। বলিলেন, "আদরিণি, আমি যে তোমার স্বামী ?"

আদরিণী কহিল "ছিলে, কিন্তু তোমার স্ত্রী মধুমতীর জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।"

তখন মধুমতীর পূর্ব্বস্বামী, কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে, মধুমতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন,—বলিলেন, "আমি কখনই এ কথা

বিশ্বাস করি না—আমার আদরিণী যে আমাকে এরূপ কথা বলিবে, ইহা বিশ্বাস করি না—তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছ। আমার এত যত্নের কি এই ফল? যে দিন তুমি জলমগ্না হইয়াছিলে, সেই দিন হইতে আমি শ্মশানবাসী। সেই দিন হইতে, নদীর তীরে তীরে, শ্মশানে শ্মশানে, কাদায় কাদায়, উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বেড়াইয়াছি। উন্মত্তের ন্যায় কি? আমি ত পাগলই হইয়াছিলাম—ঘাটে ঘাটে মাঝি মাল্লারা "গোপাল-পাগল" বলিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া আমাকে দেখাইত। আমার শরীর দেখ, আদরিণি,—তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছ, ইহাই আশ্চর্য্য, এমন দীন দরিদ্র কে আছে, কার শরীর অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট, শুষ্ক; মলিন—কার বস্ত্র এমন শতধা ছিন্ন—কার কেশ এমন রুক্ষ—"

তিনি আর বলিতে পারিলেন না—রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ আসিতেছে, পায়ের শব্দ হইল। গোপাল বলিলেন, "কে আসিতেছে—এ বাড়ীতে আমি চোর—সুতরাং আমি এখন চলিলাম—কালি আসিব।"

মধুমতী কহিল, "আসিও—কিন্তু কালি না। এ গৃহের স্বামী গৃহে আসিলে আসিও। আর এখানে আসিও না। সন্ধ্যার পর, ঐ গঙ্গাতীরে আসিও। সেই খানে আমার সাক্ষাৎ পাইবে।"

গোপাল চলিয়া গেল। যেটি ভয়ঙ্কর কথা আদরিণী যে তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিয়া অন্যকে বিবাহ করিয়াছে—সে কথা গোপাল এখনও শুনে নাই। যাহা শুনিয়াছিল তাহাতেই তাহার হৃদয় ভগ্ন হইয়াছিল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় করালীপ্রসন্ন কলিকাতা হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। মধুমতী তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় হাস্যমুখে নিকটে ছুটিয়া গেলেন না। কেবল মাত্র ঈষৎ চঞ্চল হইলেন, যেমন চন্দ্রোদয়ে সাগর চঞ্চল হয়, সেইরূপ চঞ্চল হইলেন।

করালীপ্রসন্ন মধুমতীকে শীর্ণ দেখিয়া অতি ব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে? কেন এত শীর্ণ হইয়াছ?" মধুমতী উত্তর করিলেন না। করালী পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে কহিলেন "কিছু হয় নাই," করালী তথাচ কহিলেন, "কেন অমন হইয়াছ, আমাকে বলিবে না?" মধুমতী নীরব হইয়া রহিলেন, করালী অতি কাতর স্বরে কহিলেন, "যাহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য না দেখিলে কাঁদিতে তাহার নিকট পীড়া গোপন করিতেছ।" মধুমতী কোন উত্তর দিলেন না। করালী ব্যথিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। মধুমতী করালীর মুখ প্রতি চাহিলেন, এবং দেখিলেন যে, তাহার মুখমণ্ডল রক্তিমাবর্ণ হইয়াছে, এবং চক্ষু ছল ছল করিতেছে। মধুমতী তথাপি কিছু বলিলেন না। করালী অনেকক্ষণ অবধি সেইখানে বসিয়া মধুমতীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন এবং অনেক অনুনয় বিনয় দ্বারা তাঁহার প্রতি ভাবান্তরের কারণ জানিতে

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মধুমতী ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। করালী ব্যথিত ও দুঃখিত হইয়া আপন শয্যাগৃহে যাইয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া রহিলেন। বোধ হয় কাঁদিতে লাগিলেন।

রাত্র প্রায় দুই প্রহর একটা হইয়াছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে অতি গাঢ় অন্ধকার হইয়াছিল। পৃথিবী নিঃশব্দ, করালীপ্রসন্নের বৃহৎ অট্টালিকাও নিঃশব্দ, কিন্তু এত গভীর রাত্রে করালীপ্রসন্ন দূরনিঃসৃত মনুষ্য পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। করালী কিছু বিস্মিত হইলেন, পদশব্দ ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল। করালী একবার ভাবিলেন চোর আসিয়াছে; আবার ভাবিলেন যে তাঁহার ভ্রম মাত্র। কিন্তু পদশব্দ এত স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল যে, করালী তাঁহার ভ্রম মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না—ত্বরায় দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক বাহিরে চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু কিছু দেখিতে পাইলেন না। নিশ্চেষ্ট হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু দ্বার রুদ্ধ করিবামাত্র আবার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। স্থির হইয়া গৃহের মধ্যদেশে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন, হঠাৎ শব্দ থামিল, এবং তৎপরক্ষণেই গবাক্ষ পথে শ্মশ্রুবিশিষ্ট এক বৃহৎ মনুষ্য মস্তক দেখিতে পাইলেন। অতি দ্রুত দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক বাহিরে গেলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। করালীপ্রসন্নের দুই মহল অন্তঃপুর, উভয় মহল আলো লইয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, পথি মধ্যে, অন্ধকারে, বোধ হইল, একজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ও?" স্ত্রীলোক কহিল "আমি।" করালী স্বরে চিনিলেন, মধুমতী। পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কেন?" মধুমতী কহিলেন "কাহাকে খুঁজিতেছ?" করালী কহিলেন, "জানালায় এক বিকৃতাকার মনুষ্য দেখিয়াছি—তাহাকেই।" মধুমতী কহিলেন, "আমি তাহাকে চিনি—ঘরে চল, বলিতেছি।"

মধুমতী, করালীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার শয্যাগৃহে আসিলেন। তথায়, করালী পালঙ্কের উপর, চরণ লম্বিত করিয়া বসিলেন। মধুমতী তাঁহার চরণ-তলে বসিয়া তাঁহার চরণ গ্রহণ করিয়া, নীরব হইয়া রহিলেন। করালী বিস্মিত হইলেন—বলিলেন "কে সে?" দেখিলেন, মধুমতী কাঁদিতেছে।

মধুমতী বলিলেন, "তুমি আমার জীবন দান করিয়াছ—আমি তোমার নিকট যে ঋণে ঋণী মনুষ্যে তাহা শোধ করিতে পারে না। তাহার শোধ দূরে থাক, আমি তাহার পরিবর্ত্তে গুরুতর অপরাধ করিয়াছি—তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা—যে জীবন তুমি রক্ষা করিয়াছিলে—তাহা আবার নষ্ট কর—চিকিৎসা শাস্ত্রে কি তাহার উপায় নাই?"

করালী অবাক্ হইলেন,—বলিলেন, "এসকল কথা কেন? কে সে ব্যক্তি।"

মধুমতী শুষ্ক কণ্ঠে, রোদনোন্মুখবৎ নিঃশ্বাসে পূর্ব্ব স্মৃতি পুনরুদয়ের কথা বলিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে পটু করালী সে বৃত্তান্ত বুঝিলেন এবং বিশ্বাস করিলেন। তার পর মধুমতী বলিতে লাগিলেন, "তখন আমার সকল স্মরণ হইল। তখন মনে পড়িল, যে আমি যে তোমার নিকট বলিয়াছিলাম, আমি বিধবা, সে মিথ্যা কথা। আমি সধবা। আমি লালগোপাল দত্তের স্ত্রী। তিনি আজিও জীবিত আছেন। এখন যাঁহাকে দেখিয়াছিলে, তিনিই আমার সেই পূর্ব্ব স্বামী।"

এই বলিয়া মধুমতী কিয়ৎকাল স্তম্ভিতা হইয়া রহিলেন। করালীও নীরব হইয়া রহিলেন। মধুমতী পুনরপি বলিতে লাগিলেন, "যে গীত শুনিয়া আমার সব মনে পড়িল, তাহা তিনি অহরহঃ গাইতেন। আমি তাহা অহরহঃ শুনিতে ভাল বাসিতাম—সে গীত আমার হাড়ে হাড়ে অঙ্কিত ছিল। পরদিন তিনি আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।"

এই বলিয়া মধুমতী নিরস্ত হইলেন। করালী কিছু বলিলেন না। অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া বসিয়া উঠিয়া গেলেন। পৃথক্ শয়নগৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। করালীও দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন।

পর দিন উভয়ে উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। ইচ্ছাপূর্ব্বকই সাক্ষাৎ করিলেন না। বিশেষ করালী অত্যন্ত ধর্ম্মভীত ; তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে অন্য স্বামী বর্ত্তমানে তাঁহার সহিত আদরিণীর বিবাহ ধর্ম্মতঃ বিবাহ নহে। এবং আদরিণী তাঁহার ধর্ম্মপত্নী নহে। সে স্থানে তাঁহার সহিত সহবাস ঘোর পাপাচার। এদিকে মধুমতীর সহবাস পরিত্যাগ অপেক্ষা প্রাণ পরিত্যাগ সহজ। তিনি কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সমস্ত দিন দ্বাররুদ্ধ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে সন্ধ্যা অতীত হইয়া চারি পাঁচ দণ্ড রাত্রি হইল। প্রথম রাত্রে জ্যোৎস্না। গোপাল অবধারিত সময়ে গঙ্গাতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। কূলে কাহাকে দেখিতে পাইল না—কিন্তু দেখিল যে,বক্ষঃপরিমিত জলে দাঁড়াইয়া একজন স্ত্রীলোক গাত্রধৌত করিতেছে। গোপাল চিনিল যে সেই আদরিণী। বলিল, "আমি আসিয়াছি।"

আদরিণী বলিল, "আর একটু দাঁড়াও—আমার এখনও বিলম্ব আছে। দাঁড়াইয়াই বা কি করিবে, আমার নিকটে এই জলে আইস, একবার আমরা অগাধ জলেও ডুবি নাই, এই বুক জলে ভয় কি? আমার যাহা বলিবার তাহা এই গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া তোমাকে বলিব।

গোপাল জলে নামিয়া আদরিণীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। আদরিণী বলিল, "আমি যাহা বলিব , বোধ হয় তুমি তাহা বিশ্বাস করিবে না। তুমি বিশ্বাস কর বা না কর আমি সত্য কথা বলিব।"

এই বলিয়া মধুমতী পূর্ব্ব ঘটনা সকল সেই জ্যোৎস্নাপ্রফুল্লিত গঙ্গাতরঙ্গ-

মধ্যে দাঁড়াইয়া, সেই বিজন স্তব্ধ মধ্যে মৃদু গম্ভীরস্বরে আদ্যোপান্ত বিবরিত করিল। করালীর সহিত বিবাহের কথা বলিল। গোপাল মুমূর্ষুবৎ সকল শুনিল। আদরিণীর কথা সমাপ্ত হইলে গোপাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল।

"আমার যাহা কপালে ছিল তাহা ঘটিয়াছে। কিন্তু তুমি এক শত বিবাহ করিলেও আমার অত্যজ্য। তুমি আমার গৃহে চল। আমরা এদেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গিয়া এ কলঙ্ক লুকাইব। কেহ জানিবে না—আমরা আবার সুখে দিন যাপন করিব।"

গোপালের অবিচলিত স্নেহ দেখিয়া, এবং আপনার পূর্ব্ব প্রণয় স্মরণ করিয়া আদরিণীর গঙ্গাস্রোতের উপর দরবিগলিত অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন, আর দুই পদ অগ্রসর হইয়া, গলদেশ পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া, মধুমতী অতি কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি এখন তোমাকে প্রতারণা করিব না—আমি তোমার গৃহে যাইব কি প্রকারে? আমি পরের। আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পরের। আমি মহা পাপিষ্ঠা। আমি তোমার স্নেহ ভুলিয়া গিয়াছি। আমার সকল ভালবাসা নূতন স্বামীর প্রতি। আমি তোমার গৃহে যাইব না।"

এই বলিয়া আদরিণী আর একপদ জলে অগ্রসর হইলেন। জল চিবুক পর্য্যন্ত হইল। তখন মূর্খ গোপাল, আদরিণীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করিয়া নদীর তট প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল; ডাকিল, "আদরিণি—প্রাণাধিকে! ওকি—রক্ষা কর এ সর্ব্বনাশ করিও না।" এই বলিয়া আদরিণীর উভয় হস্ত ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল।

আদরিণী, অতি ধীরে, অতি মৃদুস্বরে, অধরপ্রান্তে বিশ্বমোহিনী হাসি হাসিয়া, বলিল, "আমি ফিরিব না। কিন্তু তোমার কাছে এক ভিক্ষা। একবার আমায় আলিঙ্গন কর বুঝিব যে আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলে। যদি আমায় একদিনও ভালবাসিয়া থাক, তবে এইখানে আমায় একবার জন্মের শোধ আলিঙ্গন কর।" করালী তখন আদরিণীর মন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

তখন গোপাল গদগদ কণ্ঠে, অতি কষ্টে, বলিতে লাগিল। "তোমায় আলিঙ্গন করিব আদরিণি! আমারই আদরিণী—আমার কত আদরের আদরিণী? তোমার সাধ মিটাইয়া, জন্মের শোধ আলিঙ্গন করিব। তুমি একা যাইও না। তুমি যদি ফিরিলে না, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

এই বলিয়া গোপাল চিবুকপরিমিত জলে দাঁড়াইয়া, চিরপ্রেমভাগিনী আদরিণীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল।

তাহার পর উভয়কে, পৃথিবীতে আর কেহ কখন দেখিল না।

শ্রীপূঃ

গীত

১

দেও করতালি জয় জয় বলি
পূরিয়া অঞ্জলি কুসুম লহ ;
হাসিতে হাসিতে অই যে প্রাচীতে
উদিল অরুণ উষার সহ ;
সবে বল জয় ত্রিভুবন ময়
পূজিতে অন্নদা আসিছে হরে ;
মর্ত্ত্যে শিবধাম মোক্ষতীর্থ নাম
কাশী, বারাণসী অবনী পরে।

২

নামে সখী জয়া আকাশ হইতে
হাতে হেম থালা ভৃঙ্গার জল ;
মকরন্দ মাখা কুসুমের থর
আনন্দে বরিষে দেবের দল ;
প্রসূন নিশ্বাসে পূরিল আকাশ,
সুবাদ্য নিক্কণ বিমান পথে ;
ত্যাজিয়া কৈলাস কৈলাস কামিনী
উরিলা সুন্দর পুষ্পক রথে।

৩

দেও করতালি জয় জয় বলি
পূরিয়া অঞ্জলি কুসুম লহ
হাসিতে হাসিতে অই যে প্রাচীতে
উদিল অরুণ উষার সহ।

১

প্রবেশে মন্দিরে মৃদুল গম্ভীরে
আনন্দে ভাসিয়া আনন্দময়ই,
কোথা কাশী বাসি শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসী
খঞ্জনী ঝাঁঝরী বাঁশরী কই ?
বাজায়ে উল্লাসে নিক্কণ উচ্ছ্বাসে
ত্রৈলোক্য ভুবন মোহিত কর,
হরঃ হরঃ হর বল নিরন্তর
বব বম্ বম্ মধুর স্বর ;
বাজায়ে উল্লাসে ভকতি উচ্ছ্বাসে
মন্দিরে প্রবেশে আনন্দময়ই
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসী কোথা কাশী বাসি
খঞ্জনী ঝাঁঝরী বাঁশরী কই।

২

প্রবেশে মন্দিরে জগত জননী
গললগ্নবাসা জুড়িয়া কর,
প্রণত হইয়া মুদ্রিত নয়নে
চরণে অর্পিলা প্রসূন থর ;
আনন্দ শরীরে স্বয়ম্ভু বলিয়া
ডাকিলা আনন্দে জগত মাতা,
দেব সিদ্ধ নর ত্রিলোক পুরীতে
উঠিল উচ্ছ্বাসে আনন্দ গাথা।

৩

জয় জয় জয় অনাদি ঈশ্বর
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্ম পরাৎপর

জয় মৃত্যুঞ্জয় ব্রহ্মাণ্ডধারী
জয় সর্ব্বরূপ জয় গুণময়
জয় দীননাথ জয় দয়াময়
জয় জয় দেব পাতকহারী ;
শঙ্কর হরঃ জয় ব্যোমকেশ
পিনাক নিনাদী অনাদি মহেশ
যোগীন্দ্র চিন্ময় নিস্তার কারী।

১

নাচিয়া নাচিয়া স্বয়ম্ভূ বলিয়া
দেবদল দলে গগন তল ;
জয় শম্ভু ধ্বনি গায় সিন্ধুমণি
উথলে গভীর অতল জল ;
স্বয়ম্ভূ সঙ্গীতে আনন্দ ধ্বনিতে
জীমূত মন্দ্রয়ে গগন পরে,
উচ্ছ্বাসে পবন পর্ব্বত কানন
স্বয়ম্ভূ কীর্ত্তন আনন্দ স্বরে
জয় জয় জয় ত্রিভুবন ময়
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্মাণ্ড ধারী
শঙ্কর হর জয় ব্যোমকেশ
যোগীন্দ্র চিন্ময় নিস্তারকারী
বলিয়া নাচিয়া স্বয়ম্ভূ ডাকিয়া
দেবদল দলে গগন তল
জয় শম্ভু ধ্বনি গায় সিন্ধুমণি
উথলে গভীর অতল জল।

২

অহে বিশ্বনাথ পূরাও বাসনা,
বলিলা অন্নদা অঞ্জলি করে ;
সৃজিলা যে দিন জগত ব্রহ্মাণ্ড
দেখিতে সে দিন বাসনা করে ;
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সকলি সুন্দর,
দেব যক্ষঃ নর আনন্দে ভরা ;
পীড়া ব্যাধি শোক যাতনা কেমন ;
জানিত না কেহ মরণ জরা ;
অপূর্ব্ব মাধুরী জীবন প্রকাশ
জীবের বদনে অপার সুখ ;
নব চারু মৃদু লাবণ্য মার্জ্জিত
মধুর সুন্দর প্রকৃতি মুখ।

৩

দেখাও আবার বাসনা আমার
তেমতি তরুণ অরুণ কায়।
সেই মনোহর চারু সুধাকর
ফুটিছে নবীন গগনগায়,
ছুটিছে পবন, ফুটিছে কানন
তেমতি নবীন হিল্লোল বাসে,
তেমতি করিয়া উল্লাসে ভরিয়া
প্রাণিবৃন্দ সহ জগত হাসে,
তেমতি করিয়া ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া
পশুপক্ষী সুখে ছুটিয়া ধায়,
তেমতি করিয়া প্রমোদে মাতিয়া
সকলে তোমার মহিমা গায়।

১

জয় জয় জয় অনাদি ব্রহ্মন্,
জয় বিশ্বনাথ সত্য সনাতন,
জয় বিশ্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডধারী ;
শঙ্কর হর জয় ব্যোমকেশ,
পিনাকনিনাদী অনাদি মহেশ,
যোগীন্দ্র চিন্ময় নিস্তার কারী।

২

অহে বিশ্বনাথ তব বিশ্বধামে
আর কতদিন শমনের নামে
শমনের দূত দেখাবে ভয় ;
কত দিন ভবে হবে হাহা রব
নরকুল আদি পশু পক্ষী সব
কাঁদিয়ে জীবন করিবে ক্ষয়,
অন্ধ খঞ্জ প্রাণী আর কতদিন
জগতের শোভা করিবে মলিন—

জীবনে থাকিতে জীবিত নয় ;
দরিদ্র কাঙ্গাল কতদিন আর
জঠর অনলে করো, হাহাকার
করিবে জগত কলঙ্কময় ;
কবে বিশ্বনাথ ভবে সর্ব্বজন
আবার তোমার মহিমা কীর্ত্তন
করিবে আনন্দে, বলিবে জয়।

৩

জয় জয় জয় ত্রিপুরঈশ্বর
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্ম পরাৎপর,
জয় বিশ্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডধারী ;
জয় মৃত্যুঞ্জয় জয় গুণময়
জয় দীননাথ জয় দয়াময়
জয় জয় জয় পাতকহারী।

১

বিমল তরঙ্গে আয় মা গঙ্গে
কাশীধামে আসি উদয় হও ;
কল কল নাদে এ শুভ সম্বাদে
জগত সংসারে আনন্দে কও—
জগত জননী আজি গো আপনি
জগতের দুঃখ বলিছে শিবে,
পূরিবে বাসনা আর কি ভাবনা
রোগ শোক তাপ ঘুচিবে জীবে ;
গিয়া ঘাটে ঘাটে বল নাটে নাটে
কাশী মাঝে আজি এ শুভ বাণী ;
আবার শুন না "পূরাও বাসনা"
গাইছে অই যে ভবের রাণী।

২

পূরাও বাসনা অহে বিশ্বনাথ
জীবের যাতনা ঘুচাও দূরে,
তেমতি করিয়া সৃজিলা যেদিন
দেখাও আবার জগত পুরে ;
তেমতি পবনে ফুটিছে কানন
তেমতি নবীন হিল্লোল বাসে,
তেমতি করিয়া উল্লাসে ভরিয়া
প্রাণিবৃন্দ সহ জগত হাসে।

৩

আনন্দ ধ্বনিতে অন্নদা বাণীতে
গায়িতে গায়িতে জাহ্নবী ধায়
আর কি ভাবনা পূরিবে বাসনা
জগৎ জননী আপনি গায়
জয় শম্ভু বলি দেও করতালি
লওরে অঞ্জলি পূরিয়া পাণি
ত্রিভুবন ময় সবে বল জয়
শঙ্কর হরঃ মধুর বাণী।

জ্ঞানের প্রথমাবস্থায় যাবতীয় নৈসর্গিক কার্য্য সচেতন কর্ত্তার ইচ্ছা সাপেক্ষ বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং কিছুই অসম্ভব বা অপ্রত্যয়যোগ্য বিবেচনা হয় না। যাঁহার ইচ্ছায় এই বিশ্ব সংসারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে তিনি মনে করিলে কি না হইতে পারে? মৃত ব্যক্তির জীবন লাভ, অধ্যয়ন বিনা বিদ্যা লাভ, চেষ্টা বিনা অভীষ্ট লাভ, সকলই দৈব কৃপায় সম্ভব বোধ হয়।

কিন্তু যখন বিজ্ঞানের উন্নতিসহকারে জানিতে পারা যায় যে প্রত্যেক নৈসর্গিক ব্যাপারই কতকগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার কার্য্য এবং দৈব অনুকূলই হউক বা প্রতিকূলই হউক কোনরূপেই সেই সকল ঘটনা পরম্পরা পূর্ব্বাপরত্বের নিয়মের অন্যথা হয় না, তখন ক্রমে উপাসনা বিফল বিবেচনা হয়। যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে দৈব আরাধনা ব্যতিরেকেও উদ্দেশ্য অন্য উপায়ে সাধন হয়, এবং দেবতা প্রসন্ন হইলেও কোন ফলদায়ক হয় না। তখন "নচ দৈবাৎ পরং বলং" এই বিশ্বাসটি ক্রমে ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু সকল বিষয়ে জ্ঞানের উন্নতি সমভাবে হয় না। জ্যোতিষাদি কতিপয় শাস্ত্রের তত্ত্ব সমূহ সম্যক্‌রূপে নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু সমাজতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি দুরূহ বিষয় সমূহ অদ্যাপি ঔপধর্ম্মিক অবস্থায় রহিয়াছে। সুতরাং ঈশ্বর উপাসনা এক কালে বিফল বোধ হয় না। যাঁহারা অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করা নিতান্ত অন্যায় মনে করেন, তাঁহারাই আবার অসত্য হইতে সত্যে যাইবার নিমিত্ত এবং অন্ধকার হইতে আলোকে যাইবার নিমিত্ত স্তুতি বাক্য দ্বারা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করেন। এবং প্রার্থনার ফলদায়কতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিলে ক্রোধান্বিত হন। কিন্তু কার্য্যকারণত্বের নিয়মটি যদি বিশ্বব্যাপী হয়, তাহা হইলে বজ্রাঘাত নিবারণের নিমিত্ত জৈমিন্যাদি মুনিগণের স্তব গৃহোদরে লিখিত রাখা যতদূর কার্য্যকর, আধ্যাত্মিক ও পারিবারিক উন্নতির নিমিত্ত ব্রহ্ম আরাধনা করাও তদনুরূপ। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি একস্থলে নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হওয়া অসম্ভব হয় তাহা হইলে অপর স্থলে যে সম্ভব হইবে ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। সুতরাং কেবল

সাধারণতঃ এইমাত্র বিবেচনা করা উচিত যে ঈশ্বরেচ্ছায় নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হইতে পারে কি না। এই বিষয় মীমাংসা করিতে হইলে নৈসর্গিক নিয়ম কাহাকে বলে ও সেই সমুদায় ব্যতিরেক শূন্য বোধ হওয়ার কারণ কি তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।

ভূয়ো দর্শনের দ্বারা নৈসর্গিক ঐক্যভাবতার ব্যতিরেকাভাবত্ব জানিতে পারা যায়। ক্রমেই এই সংস্কার দৃঢ় হয় যে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনায় সদৃশ হইলেই পশ্চাতের ঘটনাও সদৃশ হয়। কখন কখন এই নিয়মের অন্যথা হইতেছে এরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানের দ্বারা জানিতে পারা যায়, যে সেগুলি বাস্তবিক ব্যতিরেকস্থল নহে। অনল ও সলিলের মধ্যে চিরকাল বৈরভাব দেখিয়া আসিতেছি। সুতরাং বারিমধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে দেখিলে প্রাকৃতিক একভাবতার অন্যথা হইতেছে, এরূপ বোধ হয় কিন্তু অগ্নি প্রজ্বলনের রাসায়নিক তত্ত্ব অবগত হইলে আর সেরূপ বোধ হয় না। পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বিসদৃশ হইলে, পরবর্ত্তী ঘটনা কিরূপে সদৃশ হইবে ? এই প্রকার যে যে স্থলে, কার্য্যকারণত্বের নিয়মের বিশ্বব্যাপিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়, বিশেষ অনুসন্ধানের দ্বারা, সেই সন্দেহ দূরীকৃত হয় এবং নৈসর্গিক কার্য্য পরম্পরার পূর্ব্বাপরত্বের নিয়ম সমূহ অন্যথা শূন্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, এই নিয়মের ব্যতিরেক স্থল কখন দেখি নাই বলিয়া যে, কখন দেখিব না, ইহা বলা যাইতে পারে না। শ্বেত বর্ণ কোকিল কখন দেখি নাই বলিয়া, যে কখন দেখিব না ইহা কিরূপে বলিতে পারা যায় ?

যদি শ্বেত বর্ণ কোকিল কখন দেখিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে, নৈসর্গিক একভাবতার অন্যথাস্থল দৃষ্টিগোচর হওয়া কিরূপে অসম্ভব বলা যাইতে পারে ? কিন্তু এক্ষণে এই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, এই দুইটি স্থল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সমুদায় কোকিল কৃষ্ণ বর্ণ এই নিয়মটি অতি সংকীর্ণ, সুতরাং ইহার ব্যতিরেক স্থল দর্শন সম্ভাবনা অতি অল্প। কিন্তু নৈসর্গিক ঘটনা পরম্পরার পূর্ব্বপরত্বের সম্বন্ধ অপরিবর্ত্তনীয়, এই সূত্রটি অতি বিস্তীর্ণ। সুতরাং যদি ইহার ব্যতিরেক স্থল থাকিত, তাহা হইলে, অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যাইত। যখন পদে পদে এই নিয়মের অন্যথা দর্শন সম্ভাবনা সত্বেও ইহার কার্য্য সর্ব্বত্র বলবৎ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইহার ব্যতিরেকাভাবত্ব সম্বন্ধে, কিরূপে অবিশ্বাস হইবে।

এই প্রকারে কার্য্যকারণত্বের নিয়মটির অন্যথা শূন্যত্ব সপ্রমাণ হয়। এবং এই নিয়ম বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রয়োগ করিয়া, কতকগুলি সংকীর্ণতর সূত্র পাওয়া যায়। আমরা যত মনুষ্য দেখিয়াছি, সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এবং নৈসর্গিক ঘটনা পরম্পরার পূর্ব্বাপরত্বের নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া, সকল মনুষ্য

মরণধর্ম্মশীল, এইরূপ স্থির করি এবং এই নিয়মের অন্যথা হওয়া অসম্ভব মনে করি। কিন্তু এইরূপ সংকীর্ণতর সূত্র সমূহের অনেক সময়ে ব্যতিরেক স্থল দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানের আদিমাবস্থায় সেই সকল দৈবশক্তির কার্য্য বলিয়া অনুমিত হয়। যাঁহারা বিজ্ঞানের তত্ত্ব অবগত নহেন, তাঁহারা যদি Leaden frosts phenomenon দেখেন, তাহা হইলে, দৈব শক্তির কার্য্য অনুমান না করিয়া, কিরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারেন? কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত মাত্রেই অবগত আছেন যে, দৈব শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকেও উত্তাপদ্রবীভূত লৌহ মধ্যে হস্ত নিমজ্জিত করিতে পারা যায়। অতএব স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে যে, সংকীর্ণতর নৈসর্গিক নিয়ম সমূহের অন্যথা দর্শনে, দৈব শক্তির কার্য্য অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। একটি কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন কারণের দ্বারা হইতে পারে; সুতরাং কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুমান করিতে হইলে, যে কারণ নির্দ্দেশ করা যায়, তদ্ভিন্ন অন্য কারণে সেই কার্য্য হইতে পারে না ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক। যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, দৈব ইচ্ছা ব্যতিরেকে অন্য ঘটনা দ্বারা সংকীর্ণতর নৈসর্গিক নিয়ম সমূহের অন্যথা হইতে পারে, তখন তাদৃশ স্থলের দৈব শক্তিই কারণ কিরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আরও বিবেচনা করিতে হইবে, যে, কোন কার্য্যের কারণ অনুমান করিতে হইলে, কল্পিত কারণটি সেই কার্য্য করিতে সক্ষম কি না, তাহা দেখা উচিত। এবিষয়ে পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারা যায়, যে ঈশ্বর উপাসনা করিয়াও অনেকে অভীপ্সিত ফল লাভ করিতে সক্ষম হইল না। চিরকাল যাহারা অন্ধকার হইতে আলোকে যাইবার নিমিত্ত ক্রন্দন করেন, তাঁহাদের মানসাকাশ যে সর্ব্বদা জ্ঞানালোকে আলোকিত থাকে ইহা অত্যন্ত সন্দেহ স্থল। আর যাহারা কখন স্তুতি বাক্য দ্বারা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিতে না পারেন, তাঁহারা যে একেবারে অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া থাকেন ইহাও বলা যায় কি না সন্দেহ। অতএব পরীক্ষা দ্বারা যে ঈশ্বর উপাসনার ফলদায়কতার সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কল্পিত কারণের সক্ষমতা সম্বন্ধে, সম্ভাবনা কিরূপ, তাহা যদি বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই স্পষ্ট দৃষ্টি হইবে, যে নৈসর্গিক কার্য্য পরম্পরার পূর্ব্বাপরত্বের নিয়মের অন্যথা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা, বিসদৃশ না হইলে পশ্চাতের ঘটনা বিসদৃশ হইতে পারে না। যে যুক্তি দ্বারা একটি নিঃসংশয়িতরূপে সপ্রমাণ হয়, সেই যুক্তি অখণ্ডনীয় দেখিয়া, কেহ কেহ বলেন যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি যদি নৈসর্গিক কার্য্য পরম্পরার পূর্ব্বাপরত্বের নিয়ম অন্যথা করা অভিপ্রেত মনে করেন, তাহা হইলে কোন উপায় বিশেষ অবলম্বন করিয়া, সেই উদ্দেশ্য সাধন করেন অর্থাৎ একটি

ঘটনার দ্বারা আর একটি ঘটনার কার্য্যের অন্যথা করেন। যেমন অগ্নি সংযোগে কোন দাহ্যমান বস্তু দগ্ধ হইতে থাকিলে জলসেচন করিয়া, আমরা সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করি, তেমনি ঈশ্বর তাঁহার ভক্তদিগের প্রার্থিত ফল প্রদানের নিমিত্ত উপায় বিশেষ অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ হইলে ঈশ্বর উপাসনা করার প্রয়োজন কি? যদি কোন উপায় বিশেষ অবলম্বন করিতে পারিলেই আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলে, ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকেও সেই উপায় অবলম্বন করিতে পারা যায় না কেন? এই আপত্তি সম্বন্ধে তাঁহারা উত্তর করেন যে, ঈশ্বর যে উপায়ে আমাদিগের প্রার্থিত ফল প্রদান করেন, সেই সকল উপায় আমাদিগের জ্ঞাতব্য নহে এবং জ্ঞাতব্য হইলেও সাধ্য নহে। সুতরাং তাঁহার নিকট প্রার্থনা ব্যতিরেকে আমাদের সেই সকল অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু এরূপ অনুমানের বিন্দুমাত্রও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ ঈশ্বরেচ্ছায় কার্য্য কারণত্বের নিয়মের অন্যথা হইতে পারে কি না, ইঁহাদের কথায় তাহার কিছুই মীমাংসা হয় না। যদি কোন সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ থাকেন, এবং তাঁহার যদি স্তুতিবাক্যাদি কোন কারণে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে, স্বীকার্য্য কথা অনুসারে—সকলই সম্ভব বলিতে হইবে। কিন্তু অন্য প্রমাণের দ্বারা তাদৃশ পুরুষের অস্তিত্ব সপ্রমাণ ও তাঁহার ইচ্ছা হওয়ার যথেষ্ট কারণ প্রদর্শিত না হইলে দৈব আরাধনা বলে নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হইতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া, কার্য্য করা সঙ্গত হয় না।

কাব্য রসের সামগ্রী মনুষ্যের হৃদয়। যাহা মনুষ্যহৃদয়ের অংশ, অথবা যাহা তাহার সঞ্চালক তদ্ব্যতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে। কিন্তু কখনও কখনও মহাকবিরা, যাহা অতিমানুষ, তাহারও বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই মনুষ্যচরিত্রচিত্রের আনুষঙ্গিক মাত্র। মহাভারত, ইলিয়দ, প্রভৃতি প্রাচীন কাব্য সকল, এই প্রকার পার্থিব নায়ক নায়িকার চিত্রানুষঙ্গিক দেবচরিত্র বর্ণনায় পরিপূর্ণ। দেবচরিত্র বর্ণনায় রসহানির বিশেষ কারণ এই যে যাহা মনুষ্য চরিত্রানুকারী নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক বা মনুষ্য পাঠকের সহৃদয়তা জন্মিতে পারে না। যদি আমরা কোথাও পড়ি যে কোন মনুষ্য যমুনার এক বহুজলবিশিষ্ট হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অজগর সর্প কর্ত্তৃক জলমধ্যে আক্রান্ত হইয়াছে, তবে আমাদিগের মনে ভয়সঞ্চার হয়; আমাদিগের জানা আছে যে এমন বিপদাপন্ন মনুষ্যের মৃত্যুরই সম্ভাবনা; অতএব তাহার মৃত্যুর আশঙ্কায় আমরা ভীত ও দুঃখিত হই; কবির অভিপ্রেত রস অবতারিত হয়, তাঁহার যত্নের সফলতা হয়। কিন্তু যদি আমরা পূর্ব্ব হইতে জানিয়া থাকি, যে নিমগ্ন মনুষ্য বস্তুতঃ মনুষ্য নহে, দেব প্রকৃত জল বা সর্পের শক্তির অধীন নহে, ইচ্ছাময় এবং সর্ব্বশক্তিমান্, তখন আর আমাদের ভয়, বা কুতূহল থাকে না; কেন না আমরা আগেই জানি যে এই অজেয়, অবিনশ্বর পুরুষ এখনই কালিয় দমন করিয়া জল হইতে পুনরুত্থান করিবেন।

এমত অবস্থাতেও যে পূর্ব্ব কবিগণ দৈব বা অতিমানুষ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া লোকরঞ্জনে সক্ষম হইয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। তাঁহারা দেব চরিত্রকে মনুষ্য চরিত্রানুকৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; সুতরাং সে সকলের সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতার সহৃদয়তার অভাব হয় না। মনুষ্যগণ যে সকল রাগদ্বেষাদির বশীভূত; মনুষ্য যে সকল সুখের অভিলাষী, দুঃখের অপ্রিয়; মনুষ্য যে সকল আশায় লুব্ধ, সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, অনুতাপে তপ্ত, এই মনুষ্যপ্রকৃত দেবতারাও তাই।

দানবদলন কাব্য। শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ভবানীপুর; শ্রীব্রজ মাধব বসু।

শ্রীকৃষ্ণ, জগদীশ্বরের আংশিক বা সম্পূর্ণ অবতার স্বরূপ কল্পিত হইলেও মনুষ্যের ন্যায় ইন্দ্রিয়পর, মনুষ্যের ন্যায় প্রণয়শালী, ঐশ্বর্য্য লুব্ধ, বীরমদমত্ত, এবং চাতুর্য্যপ্রিয়। মানবচরিত্রগত এমন একটি মনোবৃত্তি নাই, যে তাহা ভাগবতকারকৃত শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে অঙ্কিত হয় নাই। এই মানুষিক চরিত্রের উপর অতিমানুষ বল এবং বুদ্ধির সংযোগে চিত্রের কেবল মনোহারিত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে; কেননা কবি মানুষিক বল বুদ্ধি সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজন করিয়াছেন। কাব্যে অতিপ্রকৃতের সংস্থানের উদ্দেশ্য এবং উপকার এই; এবং তাহার নিয়ম এই যাহা প্রকৃত তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।

সংস্কৃতে একখানি এবং ইংরাজিতে একখানি মহাকাব্য আছে যে দৈব এবং অতিপ্রকৃত চরিত্র তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় নহে। মূল বিষয়। আমরা কুমার সম্ভব এবং Paradise Lost নামক কাব্যের কথা বলিতেছি। মিল্‌টনের নায়ক দেবপ্রকৃত ঈশ্বরবিদ্রোহী সয়তান! এবং তাঁহার অনুচরবর্গ। জগদীশ্বরের সহিত তাহাদিগের বিবাদ, জগদীশ্বর এবং তাঁহার অনুচরের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ। মিল্‌টন কোন পক্ষকেই সম্যক্‌ প্রকারে মানব প্রকৃতি বিশিষ্ট করেন নাই। সুতরাং তিনি কাব্যরসের অত্যুৎকৃষ্ট অবতারণায় কৃতকার্য্য হইয়াও, লোক মনোরঞ্জনে তাদৃশ কৃতকার্য্য হয়েন নাই। Paradise Lost অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য হইলেও, প্রায় কেহ তাহা আনুপূর্ব্বিক পাঠ করেন না। আনুপূর্ব্বিক পাঠ কষ্টকর হইয়া উঠে। মিল্‌টনের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা না হইয়া যদি, ইহা মধ্যম শ্রেণীর কোন কবির রচনা হইত, তবে বোধ হয়, কেহই পড়িত না। ইহার কারণ মনুষ্য চরিত্রের অননুকারী দৈবচরিত্রে মনুষ্যের সহৃদয়তা হয় না। এই কাব্যে যেখানে আদম ও ইবের কথা আছে, সেই খানেই অধিকতর সুখদায়ক। কিন্তু ইহারা এ কাব্যের প্রকৃত নায়ক নায়িকা নহে—তাহাদের উল্লেখ প্রসঙ্গ আনুষঙ্গিক মাত্র। আদম ও ইব প্রকৃত মনুষ্যপ্রকৃত; তাহারা প্রথম মনুষ্য, পার্থিব সুখ দুঃখের অনধীন, নিষ্পাপ, যে সকল শিক্ষার গুণে মনুষ্য মনুষ্য, সে সকল শিক্ষা পায় নাই। অতএব এই কাব্যে প্রকৃত মনুষ্য চরিত্র বর্ণিত হয় নাই।

কুমার সম্ভবে একটিও মনুষ্য নাই। যিনি প্রধান নায়ক, তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর। নায়িকা পরমেশ্বরী। তদ্ভিন্ন পর্ব্বত, পর্ব্বতমহিষী, ঋষি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কাম, রতি ইত্যাদি দেব, দেবী। বাস্তবিক এই কাব্যের তাৎপর্য্য অতি গূঢ়। সংসারে দুই সম্প্রদায়ের লোক সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত বিবাদ করে দেখা যায়। এক, ইন্দ্রিয় পরবশ, ঐহিক সুখমাত্রাভিলাষী, পারত্রিক চিন্তাবিরত; দ্বিতীয় বিষয়বিরত সাংসারিক সুখমাত্রের বিদ্বেষী, ঈশ্বর চিন্তামগ্ন। এক সম্প্রদায়, কেবল

শারীরিক সুখ সার করেন ; আর এক সম্প্রদায় শারীরিক সুখের অনুচিত বিদ্বেষ করেন। বস্তুতঃ উভয় সম্প্রদায়ই ভ্রান্ত। যাঁহারা ঈশ্বরবাদী, ঈশ্বরপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় অমঙ্গলকর, বা অশ্রদ্ধেয় মনে করা তাঁহাদের অকর্ত্তব্য। শারীরিক ভোগাতিশয্যই দূষ্য ; নচেৎ পরিমিত শারীরিক সুখ সংসারের নিয়ম, সংসার রক্ষার কারণ ঈশ্বরাদিষ্ট, এবং ধর্ম্মের পূর্ণতাজনক। এই শারীরিক এবং পারত্রিকের পরিণয় গীত করাই, কুমারসম্ভব কাব্যের উদ্দেশ্য। পার্থিব পর্ব্বতোৎপন্না উমা, শরীর রূপিণী, তপশ্চারী মহাদেব পারত্রিক শান্তির প্রতিমা। শান্তির প্রাপণাকাঙ্ক্ষায় উমা প্রথমে মদনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিষ্ফল হইলেন। ইন্দ্রিয় সেবার দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরিশেষে আপন চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়াশক্তি সমলতা চিত্ত হইতে দূর করিয়া, যখন শান্তির প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেন, তখনই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। সাংসারিক সুখের জন্য আবশ্যক চিত্ত-শুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি থাকিলে ঐহিক ও পারত্রিক পরস্পর বিরোধী নহে ; পরস্পরে পরস্পরের সহায়।

এইরূপে কবি, মনোবৃত্তি প্রভৃতি লইয়া নায়ক নায়িকা গঠন করিয়া, লোক প্রীত্যর্থ লৌকিক দেবতাদিগের নামে তাহা পরিচিত করিয়াছেন। কিন্তু দেবচিত্র প্রণয়নে তিনি মিল্‌টন্ অপেক্ষা অধিক কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। কবিত্ব ধরিতে গেলে, Paradise Lost হইতে কুমারসম্ভবকে বিশেষ ন্যূন বলিতে আমরা ইচ্ছুক নহি। আমাদিগের বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব, কোন ভাষার কোন মহাকাব্যে আছে, কি না সন্দেহ। কিন্তু কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল কৌশলের কথা ধরিতে গেলে মিল্‌টন্ অপেক্ষা কালিদাসকে অধিক প্রশংসা করিতে হয়। Paradise Lost পাঠে শ্রম বোধ হয় ; কুমারসম্ভব আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্তি জন্মে না। ইহার কারণ এই যে কালিদাস কয়েকটি দেবচরিত্র মনুষ্যচরিত্রানুকৃত করিয়া অশেষ মাধুর্য্য বিশিষ্ট করিয়াছেন। উমা স্বয়ং আদ্যোপান্ত মানুষী, কোথাও তাঁহার দেবত্ব লক্ষিত হয় না। তাঁহার মাতা মেনা, মানুষী মাতার ন্যায়। "পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং" ইত্যাদি কবিতার্দ্ধের সঙ্গে মণ্টাগুর উচ্চারিত "Like the bud bit by an envious worm" &. ইতি উপমার তুলনা করুন। দেখিবেন, উমার মাতা এবং রোমিওর পিতা একই প্রকৃতি—হাড়ে হাড়ে মানব। মেনা পাষাণরাণী, কিন্তু কুলবতী মানবীদিগের ন্যায়, তাঁহার হৃদয় কুসুম সুকুমার।

বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নবীন কবি। নবীন কবি হইয়া শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ কাব্যে বর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া অসংসাহসের কাজ বটে। শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধে তাবৎ পক্ষ অতি মানুষ প্রকৃতি বিশিষ্ট। এক পক্ষ ইন্দ্রাদি দেবগণের শাস্তা অসুর কুল,

পক্ষান্তরে সর্ব্বনাশিনী মূর্ত্তি বিশিষ্টা সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী। কাব্য প্রণয়নে বিশেষ কৌশল বিশিষ্ট কবি ভিন্ন ইহাতে সফলতা লাভ করা অসম্ভব। আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, যে নবীন কবি রামচন্দ্র বাবু ইহাতে অনেক দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যে কৌশলে প্রাচীন কবিরা, দৈব চরিত্র মনুষ্যের সহৃদয়তাস্পদ করিয়াছেন, ইনিও তাঁহাদিগের প্রদর্শিত প্রথানুসারে সেই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। অসুরগণকে মানব প্রকৃত করিয়া উপাখ্যানের মনোহারিতা সম্পাদন করা যে কৌশল, অনেক কাল হইল পৌরাণিকেরা তাহার উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই কবি প্রথমে চণ্ডির উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিকে মানবমূর্ত্তি সদৃশী করিয়াছেন। চণ্ডীকে কেবল মাত্র অতি প্রকৃত বলবীর্য্যের আধার কল্পনা করিয়া অন্যান্য বিষয়ে, তাঁহাকে মানব প্রকৃতিশালিনী করিয়াছেন।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু এরূপ খণ্ড উদাহরণে প্রকৃত কৌশল কিছুই বুঝা যায় না। তবে রামচন্দ্র বাবুর বর্ণনাশক্তি এবং শব্দ চাতুর্য্যও মনোহর, তাহা পাঠকের নিকট পরিচিত করিবার মানসে আমরা এই সকল অংশ উদ্ধৃত করিতে সঙ্কোচ করিলাম না।

হেথা মনোরমা বেশে ভবেশ ভাবিনী
অধিত্যকা দেশে ভ্রমে, প্রমোদ কাননে
শুম্ভের;—পশিছে কভু, মঞ্জু কুঞ্জ মাঝে,
শোভার পিঞ্জরে যেন সুখে শুক পাখী
কখন তুলিয়া ফুল, আঘ্রাণ লইছে।
কভু দাঁড়াইছে গিয়া আলবালোপরি
প্রস্রবণ পাশে; মরি জলের ফোয়ারা
পাশে, রূপের ফোয়ারা যেন! কখন বা
শিলা পট্টে বসি ধনী ঈষৎ হাসিছে,
কৌতুক আবেগ মনে সম্বরিতে নারি;
আবার উঠিয়া পুনঃ হেট মুখে দেখে,
কুসুম কলিকাকুল কেমনে ফুটিছে।
বৃক্ষশাখা ধরি কভু, এক দৃষ্টে চাহে,
দূরগত কোকিলের কুহুরব পানে।—
রঙ্গে একাকিনী ভ্রমে উল্লাসে বরাঙ্গী,
আপনার ভাবে হয়ে আপনিই ভোর!

হেন কালে আসি দূত, রসিক সুগ্রীব,
অধরে মধুর হাসি, ভাবে ঢুলু ঢুলু,
দেখা দিলা সে উদ্যানে মন্দ মন্দ গতি।
দেখিয়া তাহারে গৌরী, হাসিলা অন্তরে।
ভাবিলা, মায়ার জালে পড়েছে শীকার।
ধীরে ধীরে আসি দূত কহিতে লাগিল,—
"কি গো ধনি, কি করিছ, কি ভাবে ভ্রমিছ?
আবার এলাম আমি তোমায় দেখিতে।
হেট মুখে কি দেখিছ কুসুমের দলে?—
রূপের কি প্রতিবিম্ব পড়েছে উহাতে?
ঈষৎ হাসিছ কেন, আমায় দেখিয়া;
প্রদীপ্ত রবির বিভা মন্দীভূত করি?
রূপের সাগর তুমি; কি রূপ আবার,
এক দৃষ্টে চাহি দেখ এদিক ওদিক?"

পুনশ্চ,

শুনিয়া চণ্ডের খেদ, লাজে অনুতাপে,
মনে মনে তবে সতী, কহিতে লাগিলা,
"কি কুকর্ম্ম করিলাম? হায় কেন আমি
দেবগণ লাগি অস্ত্র ধরি অকারণে
বধিলাম দৈত্যবরে; বীরত্ব রতনে
ফেলিলাম কাল অন্ধকূপে; কাটিলাম
শক্তি রথচক্র; মরি, ভাজিলাম পুনঃ

সে সাহস ধ্বজ, ঘোরতর যুদ্ধঝড়ে!
হায়, নিবাতে উন্মত্ত আমি দীপাবলী
সংসারের!—দৈত্যকুল সৃষ্টির আলোক।
কি করি এখন; যাই রণস্থল ছাড়ি
কৈলাসেতে; দেবভাগ্যে যা থাকে তা হোক

পুনশ্চ

ভয়ঙ্করা বেশে কালী তবে দিলা হানা,
লট্ট পট্ট কেশ জাল ঘূর্ণিত নয়ন,
চঞ্চল স্থুলাঙ্গ মরি ক্রোধের উত্তেজে!
হানিল সুতীক্ষ্ণ বাণ টঙ্কারিয়া ধনু
শুম্ভের স্কন্ধেতে; অঙ্গে বিন্ধিয়া ফলক,
কাঁপিতে লাগিল শর; মরি (ভয়ে যেন)
ছুঁয়েছে এহেন বীর তেজস্বী শরীর।
রোষে ভুমে পদাঘাতি, দর্পে নাড়ি ঘাড়
রুদ্র দৃষ্টে চাহি ক্ষণে, হেরিলা ভীমায়,
অমরারি; টান দিয়া ফেলি দিলা বাণ;
ঝরিল ঝর্ঝরে রক্ত ভিতাইয়া তনু।
ভীষণ কেশরী যথা গভীর গর্জ্জনে
পড়ে করিণীর শিরে, হুহুঙ্কারে বীর
আক্রমিলা কালিকায় অনিবার্য্য তেজে।
করিলা ভৈরবীহৃদে ঘোর মুষ্ট্যাঘাত।
কম্পিত শারীর যন্ত্র, স্তম্ভিত শোণিত,
অমনি পড়িল দেবী মূর্চ্ছিতা ধরায়।
আলু থালু কেশ জাল লুটাইল ভূমে।
ধরিয়া কেশের মুষ্টি, প্রচণ্ড বেগেতে
ঘুরাতে লাগিলা শুম্ভ আকাশে ভীমায়;
মরি, মহামেঘ যেন ঘুরিতে লাগিল
ঘোর ঘূর্ণাবায়ুভরে। ঘূর্ণিত সংসার
হেরিলা নয়নে সতী; গণিলা প্রমাদ;
শুকাইল মুখচন্দ্র, উড়ে গেল প্রাণ;
আকুল পরাণে তবে স্মরিলা রুদ্রেরে;—
নাথ, কোথা ওহে চিন্তামণি, মহাযোগী,
যোগ ভঙ্গ করি ক্ষণ নিরখ দাসীরে!
বিষম সমরে প্রভো হয়েছি কাতর,
দুর্ম্মদ দৈত্যের করে বুঝি প্রাণ যায়।
তব বলে বলী দৈত্য অনিবার্য্য তেজ,
(শক্তি আমি), মোর শক্তি লাঘবে হেলায়
অবশ হয়েছে অঙ্গ তব প্রেমাধার,
শুকায়েছে কণ্ঠ নাথ, তব প্রেমপায়ী,
শূন্যময় দেখি দিক, আঁধার সংসার,
মহাকাল, মহাশূলী, তুমি হৃদয়েশ
থাকিতে আমার। দেহ মোরে বল শম্ভু,
পতির বলেতে বলী ভার্য্যা চিরকাল।
এহেন লাঞ্ছনা আর সহিতে না পারি,
কেশে ধরে দৈত্যরাজ ঘুরায় আমায়।"
দীর্ঘশ্বাসে মনানল তেয়াগিলা সতী।
তাড়িত বার্ত্তাবহ তার যন্ত্র যথা,
নড়িলে এখানে, নড়ে দূরগত যন্ত্র,
ব্যাকুল সতীর মন আকুলিল মরি,
দূরগত যোগেশের তপঃমগ্ন মন।
কেন বা না আকুলিবে? মন তার যোগে,
প্রেমের তড়িত যাহে ঝুলে অবিরত।
মেলিলা অমনি আঁখি তাজি যোগ যোগী,
আকুল নয়নে ক্ষণ হেরিলা সংসার
শূন্যময়; শূন্যময় হৃদয় আগার।
লট্ট পট্ট জটাজুট, অমনি উঠিয়া
লইলা ত্রিশূল করে, ত্রিফল ফলিত
শত সূর্য্য তেজে, ধন্বে জ্যোতি পরস্পর
উছলি কালাগ্নি মরি প্রত্যেক ভঙ্গিতে!

আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আর অধিক উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছুক নহি। কেবল শুম্ভবধের বৃত্তান্ত পাঠককে উপহার দিব, কেননা উহাতে কবির বিশেষ কবিত্বের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

দূরে, সে রমণী শ্রেণী দেখালা পবনে ;—
"দেখ ওহে প্রভঞ্জন, আসিছে বাসুকী
কেন আজি রণস্থলে ? ত্রিদিব রাজ্যের
চাপে ধরণীর ভার বহিতে না পারি,
কাতরতা জানাইতে আসিতেছে বুঝি।"
কহিলা পবন স্বনে, বিস্মিত অন্তরে,
দেখায়ে ; উজ্জ্বল রথে কমলা শুভ্রায় ;—
"ঐ বুঝি উজ্জ্বল ফণা ; ঐ বুঝি জ্বলে
তাহে দীপ্ত মণিযুগ, এই বুঝি দীর্ঘ-
দেহ পশ্চাতে নিরখি ক্রমাগত, যাহে
জড়িত মন্দর নিজে ক্ষীরদ মন্থনে ?"
বিস্ময়ে চমকি পুনঃ কহিলা বাসব ;—
"একি দেখি, আইসেন পদ্মালয়া, সঙ্গে
লয়ে দৈত্য নারী কুলে ; ওই দেখ বামে
বসি, শুভ্রা সীমন্তিনী, দীপ্ত রথোপরে ;
কি জানি ফিরিল বুঝি মতি কমলার।"
অবাক্ হইয়া সবে দাঁড়াইলা রণে।
ক্ষণ মাত্রে আসি রথ উপস্থিত সেথা।
মহা সমরের গোল অভ্যন্তর দিয়া,
হেরিলা শুম্ভেরে ; শুভ্রা, নিরাশ্রয় বীর,
নাহি নিজ বল কেহ, ঘেরেছে শক্রতে।
মেঘেতে বিদ্যুৎ যথা খেলিতে খেলিতে,
পড়ে শৃঙ্গধরে ছুটে, আসিছেন ছুটি
কালী, ত্যজি সৈন্য নাশ, আস্ফালিয়া শূল
বধিতে শুম্ভেরে। আস্তেব্যস্তে, হাহাকারে
অমনি ধাইলা শুভ্রা, ঠেলি সেনাকুলে,
কালিকার দিকে, নাহি করি প্রাণে ভয়।
পড়িলা আসিয়া পদে ; বাহুলতা দ্বারা
বাঁধিলা চরণযুগ ; আকুল পরাণে
কহিতে লাগিলা ;—"রক্ষ, রক্ষ, রক্ষাকালি,
জীবিত ঈশ্বরে মোর ; ক্ষম ক্ষেমঙ্করি ;
বধো না আমার, মাতঃ প্রাণের ঈশ্বরে!
বধিবে তাঁহারে যদি, বধ আগে মোরে
ঘুচায়ে জঞ্জাল ; লতা পাতা কাটি আগে,
কাটে কাঠুরিয়া তরুবরে। গলায় পা,
দেহ গো আগেতে মোর, পরে করো যাহা
হয়, অভিরুচি তব।" কাঁদিতে লাগিলা,
রাণী লুটাইয়া মাথা, মহা আর্ত্তনাদে।
ধীরে ধীরে আসি লক্ষ্মী, ভাসিলেন তবে,
"মাগো, ক্ষান্ত হও মহামায়া, বধো নাক
আর শুম্ভে ; না চাহি গো, মুক্তি আর।
থাকিব গো চিরবদ্ধ, সেও মোর ভাল,
দৈত্য নারীকুল দুখ সহিতে না পারি।"
বিস্ময়ে তুলিয়া মুখ, হেরিলেন চণ্ডী
সম্মুখে কেশব প্রিয়া, বিনীত, ভাবেতে
মাগিছেন কৃপা সতী শুম্ভের লাগিয়া।
অসুর অঙ্গনাকুল এ দিকে সকলে
যুটিলা আসিয়া ক্রমে রণক্ষেত্র মাঝে।
হাহাকার রবে দিক পূরিলা সকলে।—
পড়িলা আছাড়ি কেহ বিবশা হইয়া
ছিন্নমূল তরু সম মৃত পতি দেহে।
কেহ প্রাণপুত্র মুণ্ড কুড়াইয়া লয়ে
চুম্বি পুনঃ পুনঃ উহা, কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
কেহ প্রিয় সহোদর ধরি গলদেশ
ভাসায় শরীর মরি, নয়নের নীরে!
উচ্চৈঃস্বরে ঝোরে কেহ স্বজনের গুণ।—
ঘোর আর্ত্তনাদে দিক্ ভাসিয়া উঠিল!
স্তম্ভিতা হইয়া কালী দেখেন সে ভাব।
টলিল দারুণ মন বামাদল দুখে ;
ছাড়িয়া নিশ্বাস সতী নামাইলা মুখ।
গভীর চিন্তায় মরি হইলা অচল!
মাথা তুলি পুনঃ শুভ্রা, কহিলা বিনয়ে ;
—"মাতঃ, শুভদে গো তুমি, জগদম্বা তাহে ;
এই কি তোমার কাজ ? বিনা অপরাধে,
আপন সন্তানগণে করিলে বিনাশ।
তব কি উচিত মাতঃ, একেরে তুষিতে
অপর সন্তানে বধা ? কি দোষে গো দোষী,
বল এ অসুর কুল, এ কমলপদে ?
কি দোষ পাইয়া, বল গো জননি, তুমি
ধরিলে সংহার মূর্ত্তি দৈত্যকুল প্রতি ?

কি জানি তোমার ধর্ম্ম ; যা হোক তা হোক
বরদে গো, আর কিছু নাহি চাহি আমি,
দেহ মোরে ভিক্ষা মোর জীবিতের প্রাণ।
ত্রিলোকের আধিপত্য না চাহি গো মোরা ;
দেহ উহা ইন্দ্রে ; মোরা রব চিরকাল,
অনুগত হয়ে তাঁর। এই ভিক্ষা মোর।"
ধীরে ধীরে আসি শুম্ভ কহিলা শুভ্রায় ;—
"হেন নীচ অভিলাষ কেন দৈত্য রাণী,
বীরত্ব রতন খনি ! থাকিবারে চাহ
চিরকাল হীন ভাবে ইন্দ্রের অধীনে ?—
মরিতে ত হবে, কিবা স্থির সংসারেতে ?
না ভাঙ্গি পর্ব্বতচূড়া, কভু অবনত
নহে ধরাতলে ; তবে কেন অধীনতা
স্বীকারিব বাসবে, জীবন থাকিতে।
দৈত্য কুল চূড়া আমি, ত্রিলোকের প্রভু।"
আসি কালিকার পাশে কহিতে লাগিলা ;
—"মাতঃ, কেন গো ভাবিছ আর ? বধ
মোরে, না চাহি ধরিতে আমি এ জীবন
আর। দেখ পুড়ে খাক মোর হয়েছে হৃদয়,
স্বজন বিয়োগ শোকে। কি সুখে গো আর
রব এ সংসার মাঝে। মরিতে ত হবে ;
মরি তবে এই বেলা তোমার হাতেতে।
গুরুপত্নী তুমি মাতঃ, মোর ; তব হাতে
মরিলে যাইব চলি বৈকুণ্ঠ লোকেতে।
শুনেছি প্রতিজ্ঞা তুমি করেছ জননী,
বিনাশিবে দৈত্য কুল ; পাল সে প্রতিজ্ঞা।
না পালিলে প্রতিজ্ঞা গো ঘোষিবে কলুষ
তোমার জগৎ ; ধর অস্ত্র আমি তব
ছেলে, রাখি তব পণ, নিজ প্রাণ দিয়ে।
সাধি গো সন্তান কাজ সংসার মাঝারে।"

সখেদে নিশ্বাস ছাড়ি তুলি তবে খাড়
চাহিলা শুম্ভের পানে কাতরে ভবানী।
সম্মতি হইল ভাবি যেন দৈত্যরাজ,
প্রচণ্ড বেগেতে আসি পড়িলা লাফায়ে
কালিকার শূলে, হৃদে পশিল ফলক ;
ঝর ঝর রক্ত ধারা বহিল প্রবেগে ;
অচৈতন্ত বীরবর পড়িলা ধরায়,
মুদিয়া তেজস্বী আঁখি ; নিবিল সহসা
মরি যেন কাল ঝড়ে দৈত্য কুল বাতী !

শুভ্রার বৃত্তান্ত সুকবিসুলভ কৌশলের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এই কবির বর্ণনাশক্তি মধ্যে মধ্যে প্রশংসনীয় কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা আর উদ্ধৃত করিতে পারি না। তাঁহার প্রযুক্ত উপমাগুলিন অনেক সময়ে অতি মনোহর।

তিনি শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রদর্শিত প্রথানুসারে অমিত্রাক্ষর ছন্দে আত্মকাব্য রচনা করিয়াছেন। এই ছন্দঃ বীররসপ্রধান রচনার উপযোগী। এই ছন্দঃ রামচন্দ্র বাবুর সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয় নাই, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ বলিয়া যে সকল পদ্য প্রত্যহ সাধারণ সমীপে প্রেরিত হয়, তদপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট।

এই কবির ভাষা কোন কোন সময়ে কর্কশ বোধ হয়, কিন্তু সেটি আমাদের সংস্কারের দোষে হইলেও হইতে পারে। এই কাব্যে মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষাটি আর একটু পরিষ্কার করিলে ভাল হয়।

সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে বলিতে হইবে, যে দানবদলন কাব্য ইদানীন্তনের বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। ইহার সকল স্থান সমান নহে—অনেক দোষও আছে—বিশেষ দেখা যায় যে, কবির কবিত্ব শক্তি অদ্যাপিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। তথাপি ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে প্রকৃতি ইহাকে বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি দিয়াছেন; কাল সহকারে এবং শিক্ষা এবং অভ্যাসের সাহায্যে ইনি বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে বিশেষ উচ্চাসন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বিদেশীয়দিগের নিকট আমাদের কলঙ্ক আছে যে, আমরা অদৃষ্টবাদী। তাঁহারা বলেন যে, "অদৃষ্টবাদী বলিয়া আমরা সকল বিষয়ে নিরুদ্যোগী। যাহা ঘটিবার ঘটিবে, এই বলিয়া আমরা কোন উদ্যোগ করি না; অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকি।"

উদ্যোগিতা মনুষ্যের প্রধান পুরুষার্থ সন্দেহ নাই। আমরা যে অদৃষ্টবাদী তাহাতেও সন্দেহ নাই। এবং অদৃষ্টবাদী বলিয়াই যে আমরা নিরুদ্যোগী তাহাও কতক সত্য। কিন্তু বোধ হয়, ঈশ্বর মানিলে অদৃষ্ট মানিতে হয়। যে দেশে বা যে ধর্ম্মে, অদৃষ্টবাদিত্ব নাই; বোধ হয় সে দেশে বা সে ধর্ম্মে, ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসও নাই।

ঈশ্বর যদি সর্ব্বজ্ঞ হন, তবে তিনি অবশ্য ভবিষ্যৎ জ্ঞাত আছেন, তিনি সকল ভবিষ্যৎই জানেন। তোমার আমার ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহাও তিনি জানেন। পৃথিবীর সৃষ্টির সময়েই, তিনি জানিয়াছিলেন যে, এক সময়ে তুমি আমি জন্মাইব। আমি বঙ্গদর্শনে এই কথা লিখিব, আর তুমি পড়িবে। যদি ঈশ্বরকে ততদূর সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া না মান, তথাপি তোমার আমার জন্ম মাত্রেই যে তিনি আমাদের ভবিষ্যৎ জানিয়াছিলেন, সে বিষয়ে ঈশ্বরবাদীদিগের সন্দেহ করা অনুচিত। যদি সন্দেহ কর, তবে তোমার ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন, কোন কর্ম্মেরও নহেন। আর যদি ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব সম্বন্ধে তোমার কোন সন্দেহ না থাকে, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে, তোমার আমার ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহা তিনি তোমার আমার জন্মের পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন। যদি তিনি তাহা জানিয়া থাকেন, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছে। যদি তাহা স্থির হইয়া থাকে, তবে আমরা যে উদ্যোগ করি না কেন, যাহা হইবার তাহা হইবে, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে; কেহ তাহা খণ্ডন করিতে পারিবে না। উদ্যোগে তাহার অন্যথা হয় না। যাহা স্থির আছে, আমাদের উদ্যোগে কেবল তাহাই ঘটিবে। তাহাই ঘটিবে বলিয়াই, হয়ত উদ্যোগ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মায়। যখন উদ্যোগ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না, বা তাহা যে কোন কারণে

হউক আমরা করি না, তখন বুঝিতে হইবে যে নিরুদ্যোগে যাহা ঘটিবে তাহাই আমাদের নিমিত্ত স্থির হইয়াছে এবং সেই হেতু উদ্যোগে আমাদের প্রবৃত্তি হইল না। অতএব উদ্যোগ আর নিরুদ্যোগ, উভয়েরই তুল্য ফল। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে, উদ্যোগে তাহার অন্যথা হয় না। এখানে অন্যথা শব্দ প্রয়োগই হইতে পারে না। তুমি বলিবে, যে, "আমার সম্বন্ধে এই ঘটনা ঘটিত কিন্তু আমার উদ্যোগে সে ঘটনা হইতে পারিল না, তাহার অন্যথা হইল।" বাস্তবিক তুমি কিরূপে জানিয়াছিলে, যে তোমার সম্বন্ধে এই ঘটনা ঘটিত। তুমি কতকগুলিন আনুষঙ্গিক ঘটনা, বা আর কিছু দেখিয়া তোমার সম্বন্ধে একটী ঘটনার আশঙ্কা করিয়াছিলে মাত্র ; নিশ্চয় জান নাই। তোমার সম্বন্ধে যে ঘটনা তোমার জন্মের পূর্ব্বে স্থির হইয়া গিয়াছে, এবং যে ঘটনা ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই জানেন না ; এক্ষণে সেই ঘটনা ঘটিল, কি তোমার উদ্যোগে তাহার অন্যথা ঘটিল, ইহা তুমি কিরূপে বিচার করিবে ? কি স্থির ছিল, তাহা না জানিলে, তাহার অন্যথা হইল কিনা, কিরূপে জানিবে ? এক্ষণে তোমার উদ্যোগেই হউক, আর নিরুদ্যোগেই হউক, যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই পূর্ব্বে স্থির ছিল, এই বিবেচনা করিতে হইবে। মনুষ্যাধীন ঘটনা নহে, ঘটনাধীন মনুষ্য। কোন ঘটনাই আমরা ঘটাই না। সকল ঘটনাই সেই বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মানুসারেই ঘটিতেছে। আমরাও সেই নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছি। সাগরতরঙ্গান্দোলিত শূন্য পাত্র যদি বলে যে, "এই দেখ আমি তরঙ্গ চূড়ায় উঠিলাম, এই দেখ আমি নামিলাম, এই দেখ আমি দুলিলাম, এই দেখ আমি সাগর সলিলকে কত ছোট ছোট চক্রে ঘুরাইলাম।" এ কথা যতদূর অগ্রাহ্য, আমরা যদি বলি "এই ঘটনা ঘটাইলাম" সে কথাও ততদূর অগ্রাহ্য। আমরা ঘটনার অধীন। আমাদের ইচ্ছাধীন কিছুই নহে। যাহা পূর্ব্বে স্থির আছে, তাহাই হইতেছে। আমরা মধ্যে মধ্যে বলিতেছি, "ইহা আমরা করিলাম।"

এ জগতে ঘটনা একটি মাত্র। অদ্যাপি সে ঘটনার শেষ হয় নাই। এই জগৎই সেই ঘটনা। এই একমাত্র ঘটনা ব্যতীত আর দ্বিতীয় নাই। তবে যাহাকে আমরা ঘটনা বলি, তাহা এই মূল ঘটনার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ মাত্র। সকল অংশ আমরা একত্রে দেখিতে পাই না। দেখিতে পাইলে আমাদের ভ্রম যাইত। অদ্য ঝড় হইল, মনে করিলাম, এই একটি প্রথম ঘটনা, কল্য জলপ্লাবন হইল, ভাবিলাম ইহা দ্বিতীয় ঘটনা, পরদিবস ব্যোমযান আবিষ্কৃত হইল, বিবেচনা করিলাম ইহা তৃতীয় ঘটনা। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, এ সকল সেই মূল ঘটনার অন্তর্গত, সেই মূল স্রোতের অংশ মাত্র।

ক্রমশঃ

ঋতু বিহার। প্রথম ভাগ শ্রীঈশান চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কলিকাতা, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

এখানি কাব্য গ্রন্থ। সচরাচর বাঙ্গালা কবিতা যেরূপ অপ্রশংসনীয়, ইহাও সেইরূপ।

ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি। ইতিহাস মূলক অভিনব আখ্যায়িকা। শ্রীঅম্বিকা চরণ গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়। ইহারও কোন প্রশংসা করিতে পারি না।

হিন্দুধর্ম্মনীতি। কলিকাতা গুপ্ত যন্ত্র। ইহাতে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মনীতি সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সঙ্কলন কর্ত্তা কে, তাঁহার নাম গ্রন্থারম্ভে প্রথমতঃ প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু একস্থানে বাবু ঈশানচন্দ্র বসুর নাম দেখিলাম। যাঁহারই সঙ্কলিত হউক, তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এইখানি দৃষ্ট করিয়া আমরা যে পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি, প্রার্থনা করি গ্রন্থপ্রণেতা সর্ব্বদা সেই পরিমাণে সুখী হউন। যিনি ইহা আদ্যোপান্ত মনোযোগে পাঠ করিবেন, তিনি বুঝিবেন যে নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্যজাতির গৌরব পৃথিবীর কোন জাতির গৌরবের অপেক্ষা ন্যূন নহে। এমন কোন নৈতিকতত্ত্ব কোন দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বা নীতিশাস্ত্রে নাই, যাহা প্রাচীন হিন্দুগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত, উক্ত এবং প্রচারিত হয় নাই। যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় ধর্ম্মনীতির প্রশংসা করিয়া দেশীয় ধর্ম্মনীতিকে অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ এবং অধর্ম্মকলুষিত বিবেচনা করেন, তাঁহারা কেবল হিন্দুশাস্ত্রে অজ্ঞতা বশতই এরূপ করেন। যে দেশে এইরূপ পৃথিবীঅতুল ধর্ম্মনীতি আবিষ্কৃত এবং প্রচারিত হইয়াছে সে দেশের লোক যে এক্ষণে পাশ্চাত্যদিগের নিকট অধার্ম্মিক বলিয়া ঘৃণিত, ইহার অপেক্ষা শোচনীয় কথা আর নাই। যাঁহার সঙ্কলন বলে আমরা এই সকল কথা বলিতে সক্ষম হইতেছি, তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ। এই সঙ্কলন যে বহু পরিশ্রমের ফল, এবং নানা শাস্ত্র দর্শনোৎপন্ন, তাহা দেখিলেই বুঝা যায়।

বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কনের ইতিবৃত্ত ও সমালোচন। জাতীয় সভার বক্তৃতা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।

এই বক্তৃতায় অনেক সংগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়। বক্তা মুদ্রাযন্ত্রের ইতিবৃত্ত বিশিষ্টরূপে অধ্যয়ন করিয়া, তাহা যথাসাধ্য বিবৃত করিয়াছেন। কতকগুলি কথা, তিনি অতি সহজে বিশ্বাস করিয়াছেন,—যথা প্রাচীন হিন্দুমুদ্রাযন্ত্রের অস্তিত্ব। আর অনেকগুলিন কথা বলিয়াছেন, যাহা কেবল মুদ্রাকারকদিগেরই শুনা আবশ্যক—সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা বড় প্রয়োজনীয় বা আদরণীয় নহে। কিছু কিছু বাদ দিয়া লইলে এই গ্রন্থ সুপাঠ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

. **হিন্দু জাতি।** তাহার বর্ত্তমান অভাব ও তাহার কর্ত্তব্য। ১৭৯৩ শকের হিন্দু মেলায় পরিব্যক্ত। কলিকাতা জি, পি, রায়, এণ্ড কোম্পানি।

ইহাতে বক্তব্য বা শ্রোতব্য নূতন কিছুই নাই। বাগাড়ম্বর অধিক।

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু প্রণীত। এ প্রবন্ধটি ভাল।

কবিতাহার। জনৈক হিন্দু মহিলা প্রণীত। কলিকাতা মিনার্বা প্রেস।

শ্রুত আছি এখানি পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকার প্রণীত। ইহা পূর্ণবয়স্কা কোন স্ত্রীর প্রণীত হইলেও, প্রশংসনীয় হইত। প্রৌঢ়বয়ঃ কোন পুরুষের লিখিত হইলেও প্রশংসনীয় হইত। ইহার অনেক স্থান এমন, যে তাহা কোন প্রকারেই অল্পবয়স্কা বালিকার রচনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। আশীর্ব্বাদ করি, নবীনা গ্রন্থকর্ত্রী সর্ব্বসুখভাগিনী হউন।

সর্ব্বার্থসংগ্রহ। অর্থাৎ বেদাদি বিবিধ শাস্ত্রীয় সম্বাদ ঘটিত মাসিক পুস্তক। শ্রীঅতুলনাথ তর্কবাগীশ শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। শ্রীরামপুর, যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আলফ্রেড প্রেস ;

ইহার প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ আছে "পুস্তকের উদ্দেশ্য।" "আর্য্যধর্ম্ম রহস্য।" "কুসুমাঞ্জলি।" "ঋগ্বেদ সংহিতা।" "অর্থশাস্ত্র।" "রাজ তরঙ্গিণী।" আমরা ইহা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি।

দ্বিতীয় বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

প্রায় দুই বৎসর হইল, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। তদুত্তরে শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, এবং অন্যান্য কয়জন পণ্ডিত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিতীয় পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। ইহার বিচার্য্য বিষয় এই যে, যদৃচ্ছাক্রমে বহু বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রসম্মত কি না? আমরা প্রথমেই বলিতে বাধ্য হইলাম যে আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; সুতরাং এ বিচারে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিবাদীদিগের মত খণ্ডন করিয়া জয়ী হইয়াছেন কিনা, তাহা আমরা জানি না। এবং সে বিষয়ে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষম। তবে এবিষয়ে অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে। আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা অতি সংক্ষেপে বলিব।

বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জ্জনীয়, এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ, তাহা বোধ হয় এদেশের জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, এদেশে এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে, যে বলিবে, "বহু বিবাহ অতি সুপ্রথা, ইহা ত্যজ্য নহে।" যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের প্রতিবাদ করিয়াছেন বোধ হয়, তাঁহাদেরও এই মাত্র উদ্দেশ্য, যে তাঁহারা আপন আপন জ্ঞানমত বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করেন। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ আমরা সবিশেষ পড়ি নাই, কিন্তু বোধ হয় তাঁহারা কেহই বলেন না, যে বহুবিবাহ সুপ্রথা, ইহা তোমরা ত্যাগ করিও না। যদি কেহ এমত কথা বলিয়া থাকেন তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার মত কুসংস্কারবিশিষ্ট লোক এক্ষণে অতি অল্প। যাঁহারা স্বয়ং বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরই মুখে বহুবিবাহ প্রথার ভূয়সী নিন্দা এবং কৌলীন্যের উপর ধিক্‌কার আমরা শতবার শুনিয়াছি। তবে যে তাঁহারা কেন এত বিবাহ করেন, সে স্বতন্ত্র কথা। এমত চোর কেহই নাই যে

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। কলিকাতা শ্রীপীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

জিজ্ঞাসা করিলে চুরিকে অসৎকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবে না—কিন্তু অসৎকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াও সে আবার চুরি করে। কুলীনেরাও বহু বিবাহ নিন্দনীয় বলিয়া, স্বীকার করিয়াও বহুবিবাহ করেন। কিন্তু সে যাহাই হউক, বহু বিবাহ যে কুপ্রথা তদ্‌বিষয়ে বাঙ্গালির মতৈক্য সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় নাই।

এই ঐকমত্য যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রচারের পর হইয়াছে, এমত নহে। অনেক দিন হইতেই ইহা সংস্থাপিত হইয়া আসিতেছে। ইহা দেশের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচার, বা ইউরোপীয় নীতির প্রচার, বা সাধারণ উন্নতির ফল। তথাপি তাঁহার প্রথম পুস্তকের জন্য আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। যাহা কিছু সদভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত তাহা সার্থক হউক বা নিরর্থক হউক, প্রয়োজন বিশিষ্ট হউক বা নিষ্প্রয়োজনীয় হউক, তাহাই প্রশংসনীয় এবং কৃতজ্ঞতার স্থল। বিশেষ, বহুবিবাহ সম্বন্ধে লোকের মত যাহাই হউক, বহুবিবাহ প্রথা দেশ হইতে একেবারে উচ্ছিন্ন হয় নাই। তবে বহুবিবাহ এদেশে যত দূর প্রবল বলিয়া, বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাস্তবিক ততটা প্রবল নহে। আমাদিগের স্মরণ হয়, হুগলী জেলায় যতগুলিন বহুবিবাহ পরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন, বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তকে তাহাদিগের তালিকা দিয়াছেন। অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে তালিকাটি প্রমাদশূন্য নহে। কেহ কেহ বলেন যে মৃতব্যক্তির নাম সন্নিবেশের দ্বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে। আমরা স্বয়ং যে দুই একটির কথা সবিশেষ জানি, তাহা তালিকার সঙ্গে মিলে নাই। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের খ্যাতির অনুরোধে আমরা সেই তালিকাটি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তাহা করিলেও, হুগলী জেলার সমুদায় লোকের মধ্যে কয় জন বহুবিবাহ পরায়ণ পাওয়া যায়? এই বাঙ্গালায় এক কোটি আশী লক্ষ হিন্দু বাস করে; ইহার মধ্যে আঠারশত জন ব্যক্তিও যে অধিবেদন পরায়ণ নহে, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ দশ সহস্র হিন্দুর মধ্যে একজনও অধিবেদন পরায়ণ কিনা সন্দেহ। এই অল্পসংখ্যকদিগের সংখ্যাও যে দিন দিন কমিতেছে, স্বতঃই কমিতেছে, তাহাও সকলে জানেন। কাহারও কোন উদ্যোগ করিতে হইতেছে না—কোন রাজব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না—কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না, আপনা হইতেই কমিতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন, যে এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে। এমত অবস্থায়, বহুবিবাহরূপ রাক্ষস বধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া, অনেকেরই ডন্‌কুইক্সোটকে মনে পড়িবে।

কিন্তু সে রাক্ষস বধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্ষু হইলেও বধ্য। আমরা

দেখিয়াছি এক এক জন বীরপুরুষ, মৃত সর্প বা মৃত কুক্কুর দেখিলেই, তাহার উপর দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যান, কি জানি যদি ভাল করিয়া না মরিয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় ইহারা বড় সাবধান এবং পরোপকারী। যিনি এই মুমূর্ষু রাক্ষসের মৃত্যুকালে দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি ইহলোকে পূজ্য এবং পরলোকে সদগতি প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

কিন্তু একটা কথায় একটু গোলযোগ বোধ হয়। আমরা স্বীকার করিলাম বহুবিবাহ এদেশে বড় চলিত—আপামর সাধারণ সকলেই বহুপত্নীক। জিজ্ঞাস্য এই, এ প্রথা কি প্রকারে নিবারিত হওয়া সম্ভব? বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক, বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা তাহার একটি প্রধান। বাস্তবিক এই প্রথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না, কেননা, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা ঘোরতর মূর্খ। দেখা যাইতেছে যে এবিষয়ে মতভেদ আছে। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যম, পুস্তকের আকার, এবং স্মৃতিশাস্ত্রোদ্ধৃত বচনের আড়ম্বর দেখিয়া, আমরা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি। মনে করুন দেশশুদ্ধ লোক সকলেই স্বীকার করিল যে বহুবিবাহ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ। তাহাতে কি বহুবিবাহ প্রথা নিবারিত হইবে? আমরা সে বিষয়ে বিশেষ সংশয়াবিষ্ট। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে যে সকল সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা সকলই শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রচলিত এমত নহে। সে সমাজমধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষা লোকাচার প্রবল। যাহা লোকাচার সম্মত তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও প্রচলিত; যাহা লোকাচার বিরুদ্ধ তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলে প্রচলিত হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্বে একবার বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন; প্রমাণসম্বন্ধে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন; অনেকেই তাঁহার মতাবলম্বী; কিন্তু কয়জন, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বা অনুষ্ঠেয়তা অনুভূত করিয়া আপন পরিবারস্থা বিধবা-দিগের পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়াছেন? কোন একজন বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ লইয়া বসুন। এবং তৎসঙ্গে মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ লইয়া এক একটি বচন ধরিয়া তাঁহার আচার ব্যবহারের সহিত মিলাইয়া লউন। কয়টি বচনের সঙ্গে তাঁহার কৃতানুষ্ঠান মিলিবে? শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই বলিবেন, অতি অল্প। যদি শাস্ত্রজ্ঞ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণদিগের এই দশা, তবে আপামর সাধারণের কথার আর কাজ কি? বাস্তবিক, মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধি সকলের সম্পূর্ণ চলন, কোন সমাজমধ্যে সম্ভব নহে। কস্মিন্ কালে, কোন সমাজে, ঐ সকল বিধি সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল কি না সন্দেহ। সকল বিধিগুলি চলিবার নহে। অনেকগুলি অসাধ্য। অনেকগুলি, সাধ্য হইলেও মানুষের এতদূর ক্লেশকর,

যে তাহা স্বতই পরিত্যক্ত হয়। অনেকগুলি পরস্পর বিরোধী। এই বিধিগুলি সম্যক্ প্রচলিত রাখা, যদি কোন সমাজের অদৃষ্টে কখন ঘটিয়া থাকে, বা কখন ঘটে, তবে সে সমাজের অদৃষ্ট বড় মন্দ সন্দেহ নাই। অনেকেরই বিশ্বাস আছে, প্রাচীন ভারতে এই ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল, কেবল এখনই কাল মাহাত্ম্যে লুপ্ত হইতেছে। যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন তাঁহাদের সহিত আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু ইহা স্বীকার করি যে পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে এই সকল বিধি কতকদূর প্রচলিত ছিল, এখনও কতকদূর প্রচলিত আছে। প্রচলিত ছিল, এবং প্রচলিত আছে, বলিয়াই ভারতবর্ষের এ অধোগতি। যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী, তাঁহাদিগকে এ কথা বলা বৃথা। কিন্তু অনেক হিন্দু আমাদিগের কথার অনুমোদন করিবেন ভরসা আছে। আমরা হিন্দুধর্ম্মবিরোধী নহি; হিন্দুধর্ম্ম, পরিশুদ্ধ হইয়া, প্রচলিত থাকে, ইহাই আমাদিগের কামনা। তাই বলিয়া, যাহা কিছু ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিচিত, তাহাই যে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত অংশ, এবং সমাজের মঙ্গলকারক, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছি কি না বলিতে পারি না। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, সেই কারণেই বহুবিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলে একটি দোষ ঘটে। বহুবিবাহপরায়ণপক্ষেরা বলিতে পারেন, "যদি আপনি আমাদের শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিতে বলেন, তবে আমরা সম্মত আছি। কিন্তু যদি শাস্ত্র মানিতে হয়, তবে আপনার ইচ্ছামত, তাহার একটি বিধি গ্রহণ করা, অপরগুলি ত্যাগ করা যাইতে পারে না। আপনি কতকগুলিন বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, এই এই বচনানুসারে তোমরা যদৃচ্ছাক্রমে বহু বিবাহ করিতে পারিবে না। ভাল, আমরা তাহা করিব না। কিন্তু সেই সেই বিধিতে যে যে অবস্থায় অধিবেদনের অনুমতি আছে, আমরা এই দুই কোটি হিন্দু সকলেই সেই সেই বিধানানুসারে প্রয়োজনমত অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইব—কেননা সকলেরই শাস্ত্রানুমত আচরণ করা কর্ত্তব্য। আমরা যত ব্রাহ্মণ আছি—রাঢ়ীয়, বৈদিক, বারেন্দ্র, কান্যকুব্জ প্রভৃতি—সকলেই অগ্রে সবর্ণা বিবাহ করিয়া কামতঃ ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা এবং শূদ্রকন্যা বিবাহ করিব। আমাদিগের মধ্যে যখনই কাহারও স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বচসা করিয়া বাপের বাড়ী যাইবে, আমরা তখনই বিবাহের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ বলিয়া, ছোট জাতির মেয়ে খুঁজিব। গৃহিণী যখন ঝগড়া করিয়াছেন, তখন রাগের মাথায় সম্মতি দিবেন সন্দেহ নাই। এই দুই কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারই স্ত্রী বন্ধ্যা,* সেই আর একটি বিবাহ করুক, যাহারই স্ত্রী

---

* বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমেতুমৃতপ্রজা। একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী।—বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ১০৩

মৃতপ্রজা, সেই আর একটি বিবাহ করুক—যে হতভাগিনীকে বিধাতা বর্ষে বর্ষে মনঃপীড়া দিয়া থাকেন; স্বামীও তাহার মর্ম্মান্তিক পীড়ার বিধান করুন, কেননা ইহা শাস্ত্র সম্মত। তদ্ভিন্ন যাহার কন্যা ভিন্ন পুত্র জন্মে নাই, এই দুই কোটি হিন্দুর মধ্যে এমত যত লোক আছে, সকলেই আর এক এক দারপরিগ্রহ করুন। আমাদিগের এমন ভরসা আছে, যে এই সকল কারণে, হিন্দুগণ শাস্ত্রানুসারে অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইলে, এখন যেখানে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বহুবিবাহ পরায়ণ, সেখানে সহস্র সহস্র কুলীন, অকুলীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বহু পত্নী লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে শাস্ত্রানুসারে সংসারধর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

কিন্তু এখনও শাস্ত্রের মহিমা শেষ হয় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান বিধির উল্লেখ করিতে বাঁকি আছে।—"সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী!" ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী হইলে সদ্যই অধিবেদন করিবে! আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যে যাঁহার যাঁহার ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী, তাঁহারা, হিন্দুশাস্ত্রের গৌরব বর্দ্ধনার্থ, সদ্যই পুনর্ব্বার বিবাহ করুন। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ মুখরা, দ্বিতীয়া ভার্য্যাও অপ্রিয়বাদিনী হইলে হইতে পারে,—তাহা হইলে আবার তৃতীয় বিবাহ করিবেন, তৃতীয়াও যদি অপ্রিয়বাদিনী হয় (বাঙ্গালীর মেয়ের মুখ ভাল নহে) তবে আবার বিবাহ করিবেন—এরূপ "লোক-হিতৈষী নিরীহ শাস্ত্রকারদিগের"* অনুকম্পায় আপনারা অনন্ত গৃহিণীশ্রেণীতে পুরী শোভিতা করিতে পারিবেন। এমন বাঙ্গালিই নাই যাহাকে একদিন না একদিন স্ত্রীর কাছে "মুখঝামটা" খাইতে না হয়। অতএব আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের অনন্ত মহিমার গুণে সকলেই অনন্তসংখ্যক গৃহিণীগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। যাঁহারই স্ত্রী, ননন্দার সহিত বচসা করিয়া আসিয়া, স্বামীর উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিবেন, তিনিই তৎক্ষণাৎ অন্য বিবাহ করিতে পারিবেন। যাঁহারই স্ত্রী, যাতার অঙ্গে নূতন অলঙ্কার দেখিয়া আসিয়া, স্বামীকে বলিবেন, "তোমার হাতে পড়িয়া আমার কোন সুখ হইল না," তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রে ঘটক ডাকাইয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া, সদ্যই অন্য দারগ্রহণ করিবেন। যাহার স্ত্রী, স্বামীর মুখে স্বকৃত পাকের নিন্দা শুনিয়া বলিবেন, "কিছুতেই তোমার মন যোগাইতে পারিলাম না—আমার মরণ হয় ত বাঁচি"—তিনি তখনই চেলির কাপড় পরিয়া, সোলার টোপর মাথায় দিয়া, প্রতিবাসীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিবেন, "মহাশয় কন্যা দান করুন।" এতদিনে বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করা সার্থক হইল,—অমূল্যধন স্ত্রীরত্ন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করা যাইতে পারিবে। বঙ্গ-সুন্দরীগণ বোধ হয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারের এই নবোদ্যম দেখিয়া তত সন্তুষ্ট হইবেন না।

---

* বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ২৫২ পৃ

কিন্তু তাঁহাদিগের শাসনের যে একটা সদুপায় হইতে পারিবে, ইহাতে আমরা বড় সুখী। আমাদের এমত ভরসা হইয়াছে যে অনেক ভদ্রলোক নিখুঁত মুক্তা খুঁজিয়া বেড়াইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন—কেননা নথ নাড়া দিবার দিন কাল গেল। বিধুমুখী ঘোষ, সৌদামিনী মিত্র, কামিনী গাঙ্গুলী প্রভৃতি দেশের শ্রীবৃদ্ধির পতাকাবাহিনীগণ, বোধ হয় পতাকা ফেলিয়া দিয়া, ফিরে বাঙ্গালীর মেয়ে সাজিয়া, স্বামীর শ্রীচরণ মাত্র ভরসা মনে করিয়া, বিবিয়ানা চাল খাট করিয়া আনিবেন। কালভুজঙ্গিনী কুলকামিনীগণ এখন হইতে মুখের বিষ হৃদয়ে লুকাইয়া, কেবল কটাক্ষ বিষকে সংসার জয়ের একমাত্র সম্বল করিবেন। তাঁহাদিগের মনে থাকে যেন "সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী!"—বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে এ ব্যবস্থা খুঁজিয়া পাইয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ জন্য এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালির অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন!—আমাদিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য অনন্ত! সেই পুস্তকোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের বলে, বাঙ্গালি মাত্রেই অসংখ্য বিবাহ করিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে শাস্ত্রকারদিগকে "লোকহিতৈষী" বলিয়াছেন, তাহা সার্থক বটে।

এরূপ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কি ফল! এ শাস্ত্রানুসারে লোককে কার্য্য করিতে বলিলে বহুবিবাহ নিবারণ হয়, না বৃদ্ধি হয়?

কিন্তু বোধ হয়, শাস্ত্রাবলম্বনপূর্ব্বক বহুবিবাহ পরিত্যাগ করিতে বলা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার সহিত যাঁহারা এক মতাবলম্বী তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে বহুবিবাহ নিবারণ জন্য রাজব্যবস্থা প্রচার হউক। দ্বিতীয় পুস্তকে সে কথা কিছুই নাই, কিন্তু প্রথম পুস্তকে আছে। সেই উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তিদায়ক স্বরূপ বহু বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। নচেৎ শাস্ত্রের নামে ভয় পাইয়া হিন্দু বহুবিবাহ বা কোন চিরপ্রচলিত প্রথা হইতে নিবৃত্ত হইবেক, এমত ভরসা বিদ্যাসাগর মহাশয় করিবেন বোধ হয় না। কিন্তু রাজ ব্যবস্থার পক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক বলিয়াও এ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করা আমাদিগের উপযুক্ত বোধ হয় না। এবিষয়ে রাজবিধি প্রণীত করিতে গেলে, তাহা কি শাস্ত্রানুমত হওয়া আবশ্যক? না শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও ক্ষতি নাই? যদি তাহা শাস্ত্রানুমত হওয়া আবশ্যক হয়, তবে "সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী" ক্ষত্র বিট্ শূদ্রকন্যাস্তু* * * বিবাহ্যাঃকচিদেবতু" প্রভৃতি কথাগুলিও বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। আর যদি তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও চলে, তবে বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাওয়া নিষ্প্রয়োজনে পরিশ্রম করা মাত্র।

আর একটি কথা এই, যে এদেশে অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক মুসলমান। যদি বহু বিবাহ নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয় তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল এমত নহে। কিন্তু বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া, মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধির দ্বারা নিষিদ্ধ হইবে? রাজব্যবস্থাবিধাতৃগণ কি প্রকারে বলিবেন, যে "বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ, অতএব যে মুসলমান বহুবিবাহ করিবে, তাহাকে সাতবৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইতে হইবে।" যদি তাহা না বলেন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, যে "আমরা বড় প্রজাহিতৈষী ব্যবস্থাপক বটে; প্রজার হিতার্থ আমরা বহুবিবাহ কুপ্রথা উঠাইব; কিন্তু আমরা অর্দ্ধেক প্রজাদিগের মাত্র হিত করিব। হিন্দুদিগের শাস্ত্র ভাল, তাঁহাদিগের ব্যাকরণের গুণে একস্থানে "ক্রমশোবরা" ও "ক্রমশোহবরা" উভয় পাঠ চলিতে পারে, সুতরাং তাহাদিগেরই হিত করিব। আমাদিগের অবশিষ্ট প্রজা তাহাদিগের ভাগ্যদোষে মুসলমান, তাহাদিগের শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ সুচতুর নহে; আরবী কায়দা হেলে দোলে না; বিশেষ মুসলমানদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় কেহ পণ্ডিত নাই, অতএব বাঁকি অর্দ্ধেক প্রজাগণের হিত করিবার আবশ্যক নাই।" আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয়, যে ব্যবস্থাপক সমাজ এই দ্বিবিধ উক্তির মধ্যে কোন উক্তিই ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিবেন না।

অতএব, আমাদিগের সামান্য বিবেচনায়, ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন দিকে কোন ফল নাই। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে যদি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, এবং যদি বহুবিবাহ সেই শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস থাকে, তবে তিনি আত্মপক্ষসমর্থনে অধিকারী বটে, এবং তাঁহার পুস্তক, একজন সদনুষ্ঠাতার সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তির প্রমাণ স্বরূপ সকলের নিকট আদরণীয়। আর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রে বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকে, তবে সেই শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া কপটতা মাত্র। যিনি বলিবেন যে, সদনুষ্ঠানের অনুরোধে এইরূপ কপটতা প্রশংসনীয়, আমরা তাঁহাকে বলিব, যে সদনুষ্ঠানের উদ্দেশেই হউক বা অসদনুষ্ঠানের উদ্দেশেই হউক, যিনি কপটাচার করেন, তাঁহাকে কপটচারী ভিন্ন আর কিছুই বলিব না। আপনার ক্ষুধা নিবারণার্থে যে চুরি করে সেও যেমন চোর, পরকে বিতরণার্থে যে চুরি করে সেও তেমনি চোর। বরং দাতা চোরের অপেক্ষা ক্ষুধাতুর চোর মার্জ্জনীয়, কেননা সে কাতরতা বশতঃ, এবং অলঙ্ঘ্য প্রয়োজনের বশীভূত হইয়া চুরি করিয়াছে। তেমনি যে ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থ কপটতা করে, তাহার অপেক্ষা যে নিষ্প্রয়োজনে কপটতা করে, সেই অধিকতর নিন্দনীয়। যিনি এই পাপপূর্ণ, মিথ্যাপরায়ণ, মনুষ্যজাতিকে এমত শিক্ষা দেন, যে সদনুষ্ঠানের

জন্য প্রতারণা এবং কপটাচারও অবলম্বনীয়, তাঁহাকে আমরা মনুষ্যজাতির পরম শত্রু বিবেচনা করি। তিনি কুশিক্ষার পরম গুরু।

আমরা একথা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলিতেছি না। আমরা এমত বলিতেছি না যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বয়ং বিশ্বাস বিহীন বা ভক্তিশূন্য। তিনি ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতি গদগদচিত্ত হইয়া তৎপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা ইহাও বলিতেছি যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় উদার চরিত্রে কপটাচরণ কখনই স্পর্শ করিতে পারে না—তিনি স্বয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রে অবিচলিত ভক্তিবিশিষ্ট সন্দেহ নাই। কেবল আমাদিগের কপালদোষে বহুবিবাহ নিবারণের সদুপায় কি, তৎসম্বন্ধে তিনি কিছু ভ্রান্ত। ইহার অধিক আর কিছুই আমাদিগের বলিবার নাই।

এতদিনের পর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন বিষয়ে ভ্রান্তি দেখি, তবে কথা কহিতে পারি না। চিরকাল অভ্রান্ত কেহ নহে। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে ভ্রান্তির একটু আধিক্য হইয়াছে, বিবেচনা করিতে হয়। এমত হইতে পারে, যে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীমধ্যে যে কয়েকজন পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশারদ। কিন্তু সে কথা পরের মুখেই ভাল শুনায়।
বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশারদ। কিন্তু সেকথা পরের মুখেই ভাল শুনায়।
বিদ্যাসাগর মহাশয় ততক্ষণ বিলম্ব করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি, শ্রীযুক্ত রাজকুমার ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরাজ কবিরত্ন তাঁহার প্রতিবাদী। বিদ্যাসাগর মহাশয় একে একে পাঁচজনকেই বলিয়াছেন যে তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই।* গ্রন্থমধ্যে এই কথা স্থানে স্থানে, নানাবিধ অলঙ্কার বিশিষ্ট হইয়া পুনরুক্ত হইয়াছে। প্রতিবাদী পণ্ডিতেরা এ কথার এই অর্থ করিবেন, যে বিদ্যা-সাগর বলিয়াছেন, "তোমরা কেহ কিছু জান না, ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা কিছু জানি তা আমিই।" আমরা ইহাতে দুঃখিত হইলাম। কেননা আমাদের নিতান্ত বাসনা ছিল, যে আমরা ঐ পণ্ডিতদিগকে বলিব, যে "মহাশয়েরা কোন্ সাহসে বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রে অভ্রান্ত, আপনারা কিছু জানেন না।" আমাদিগের আপেক্ষ এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে সে কথা বলিতে অবকাশ দিলেন না, আপনি সকল কথা বলিয়াছেন।

ইহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর দোষের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রাচীন বাঙ্গালীদিগের নিয়ম ছিল, এবং এখনও শ্রেণী বিশেষের লোক ভিন্ন সকল বাঙ্গালীদিগের নিয়ম আছে, যে কোন বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, বিচারকেরা পরস্পর পূর্ব্বপুরুষের উল্লেখ করিয়া গালি না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না বা

* ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্নকে একটু কথা কহিয়া স্পষ্ট বলেন নাই।

পারেন না। রাম যদি বলিল, যে এটা ঘট, শ্যাম যদি বলিল, না এটা পট, তবে রাম বলিবে, "শ্যালা তুই কি জানিস্ "—অমনি শ্যাম তদনুরূপ মধুবৃষ্টি করিবে। বাঙ্গালি লেখক ও বাঙ্গালি অধ্যাপকেরা এক্ষণেও সেই রীতির অনুবর্ত্তী। অধ্যাপকেরা বিদায়ের আশায় সভাস্থ হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, দুই চারি কথার পর পরস্পরকে "পাষণ্ড" "ব্যলীক" "নরাধম" বলিয়া সম্বোধন করেন। বাঙ্গালীর নিম্নশ্রেণীর লেখকেরাও পরস্পর মতভেদ দেখিলে অমনি, ভিন্ন মতাবলম্বীকে "মূখ" "ধৃষ্ট" "অসৎ" "মিথ্যাবাদী" এবং অন্যান্য উচ্চার্য্য এবং অনুচ্চার্য্য কথায় অভিহিত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা ও সংসর্গ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট অন্য ভাষার প্রত্যাশা করা যায় না; ইতরে ইতরের ব্যবহার্য্য ভাষাই ব্যবহার করিবে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আমরা বিচারকালে ভদ্রের ব্যবহার্য্য ভাষারই প্রত্যাশা করি। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও দূষণীয় ভাষা ব্যবহার করেন নাই—এ সম্বন্ধে তাঁহার রচনা পূর্ব্বাবধি কলঙ্কশূন্যা। কিন্তু এই পুস্তকে দেখিলাম যে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। সভারূঢ় বিচারমত্ত তৈলোজ্জ্বলললাট বিশিষ্ট নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় তিনি প্রতিবাদিগণকে গালি দিয়াছেন। কিন্তু যদি এইরূপ ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীতির এই একটি মাত্র চিহ্ন দেখিতাম, তাহা হইলে মনে করিতাম, দৈবনিগ্রহে এরূপ একবার ঘটিয়াছে। কিন্তু ইদানীন্তন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপাসকদিগের মধ্যে এইরূপ ভাষায় অতিশয় আধিক্য দেখিতেছি। ইদানীং এইরূপ ভাষাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্তব লিখিত ও পঠিত হইয়া থাকে। উপাসকদিগের নিয়ম এই যে যাহাতে উপাস্য দেবতার প্রীতি জন্মে তাহাই তাঁহাকে উপহার দিয়া থাকে—নারায়ণকে তুলসীচন্দন, ঘেঁটুকে ঘেঁটফুল, চেঁড়াচুল, এবং গোময়। অতএব যাহা উপাসক নিবেদন করিতেছেন, উপাস্য তাহাই উৎসৃষ্ট করিতেছেন, দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন যে উপাস্যের তাহাতেই আন্তরিক প্রীতি, তবে তিনি মার্জ্জনীয় সন্দেহ নাই। উপাসক সম্প্রদায় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, আমরা তাঁহাদিগের নিন্দা করিতেছি না। অন্নের দায় ভদ্রলোকেও দাস হয় উপাসক জাতি কোন ছার! কেন তাঁহারা এরূপ আচরণে প্রবৃত্ত, তাহা বুঝিয়া কেহই তাঁহাদের অপরাধ লইবে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ রুচির পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলেই দুঃখিত হইবে সন্দেহ নাই। গালি দিলেই যে বিচারে জয়ী হওয়া যায় না, গালিতে বাক্যের সারবত্তা বাড়ে না, সত্য নির্ণয় পক্ষে কটু কথার প্রয়োজন মাত্র নাই—তাহাতে যে লেখকের প্রতি পাঠকের অভক্তি জন্মে মাত্র, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বুঝাইতে হইবে না। যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ পুস্তক পড়েন নাই, তাঁহাদিগের কৌতূহল নিবারণার্থ দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি;—

৩ পৃষ্ঠায় পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;

"অনেকে বলিয়া থাকেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই ; নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে কিন্তু কোন শাস্ত্রে প্রবেশ নাই ; বিতণ্ডা করিবার বিলক্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার তাদৃশী ক্ষমতা নাই। বলিতে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, তিনি বহুবিবাহবাদ পুস্তক প্রচার দ্বারা এই কয়টি কথা অনেক অংশে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।"

পুনশ্চ ৬ পৃষ্ঠায়, —

"ফলতঃ, এই অলৌকিক আচরণ দ্বারা তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে রাগদ্বেষের নিতান্ত বশীভূত ও নিতান্ত অবিমৃশ্যকারী মনুষ্য, ইহারই সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।"

তর্কবাচস্পতি যেমন ইচ্ছা তেমন মনুষ্য হউন, সাধারণের তাহাতে ইষ্ট বা অনিষ্ট নাই। তিনি কুলোক হইলেও, বিচার্য্য বিষয় কেবল এই যে তাঁহার উক্ত কথাগুলি যথার্থ, না অযথার্থ ? যদি সেগুলি অযথার্থ হয়, তবে তাঁহার চরিত্রের কথা উল্লেখ না করিয়াও তাঁহার মত খণ্ডন করা যাইতে পারে। আর যদি সে কথাগুলি যথার্থ হয়, তবে প্রতিপক্ষ যেমন চরিত্র হউন না কেন, তাহা যথার্থই থাকিবে। রাগ, দ্বেষ এবং অবিমৃশ্যকারিতা বোধ হয় পৃথিবীতে এত সুলভ, যে আমরা অন্যের প্রতি তাহার আরোপণ না করিলেই ভাল করিব। এই নৈতিক উক্তির প্রমাণস্বরূপ, গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠক মহাশয়কে উপহার দিব।

"যদি এরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত থাকিত, পূর্ব্বে বঙ্গদেশবাসী অধুনা মুরশিদাবাদ নিবাসী, সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, চিকিৎসা ব্যবসায়ী, শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর রায় কবিরাজ কবিরত্ন মহোদয় যে স্মৃতি বচনের যে অর্থ যথার্থ বা অযথার্থ বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, অদ্যাবধি দ্বিরুক্তি না করিয়া ঐ অর্থ যথার্থ বা অযথার্থ বলিয়া ভারতবর্ষবাসী লোকদিগকে শিরোধার্য্য করিতে হইবেক ; তাহা হইলে আমি যে সকল ব্যাখ্যা লিখিয়াছি, সে সমস্ত যথার্থ নহে, তদীয় এই সিদ্ধান্ত নির্ব্বিবাদে অঙ্গীকৃত হইতে পারিত। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে, সেরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত নাই ; সুতরাং অকুতোভয়ে নির্দ্দেশ করিতেছি, আমি, শাস্ত্রের অযথার্থ ব্যাখ্যা লিখিয়া, লোককে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাই নাই। পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং এক্ষণেও নির্দ্দেশ করিতেছি, কবিরাজ মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, চিকিৎসা বিষয়ে কিরূপ বলিতে পারি না, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র নাড়ীজ্ঞান নাই ; এজন্যই নিতান্ত নির্ব্বিবেক হইয়া এরূপ গর্ব্বিত বাক্যে, এরূপ উদ্ধত, এরূপ অসঙ্গত নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

পুনশ্চ, ২৩৯ পৃষ্ঠায়,

"ফলকথা এই, কবিরত্ন মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ; * * *, এজন্যই এরূপ অসঙ্গত ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন। যাহার যে শাস্ত্রে বোধ ও অধিকার না থাকে, নিতান্ত অর্ব্বাচীন না হইলে সে ব্যক্তি সাহস করিয়া সে শাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করে না। কবিরত্ন মহাশয়, প্রাচীন ও বহুদর্শী হইয়া কি বিবেচনায় অনধীত অননুশীলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিলেন, বুঝিতে পারা যায় না।"

এই বলিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় উদাহরণ স্বরূপ, প্রবোধচন্দ্রিকা নামক অশ্লীলতার ভাণ্ডার হইতে একটি অশ্লীল উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া * স্বীয় গ্রন্থকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। সে উপাখ্যানটি এরূপ অশ্লীল, যে বোধ হয় সামান্য ইতর লেখকও তাহা উদ্ধৃত করিতে সাহস করিতেন না, কেননা তাঁহাদের লজ্জা না থাকুক, রাজদণ্ডের ভয় আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও, তাহার একটি শব্দ পরিবর্ত্তিত করিয়া লজ্জানুরোধের প্রমাণ দিয়াছেন—আর একটি শব্দ মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের লজ্জাহীনা লেখনী হইতে যেমন বাহির হইয়াছিল, বোধ হয় তেমনই আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপ অশ্লীল উপাখ্যান স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ইহা অনেকে বিশ্বাস করিবেন না। যাঁহারা বিশ্বাস না করিবেন, তাঁহাদের প্রবৃত্তি থাকিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের ২৪০ পৃষ্ঠায় সন্ধান করিবেন, আমরা সে উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া ভদ্রলোকের পাঠ্য বঙ্গদর্শন কলুষিত করিতে পারি না।

বিদ্যাসাগর এই পুস্তকে উপাখ্যান-প্রিয়তার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। নেত্ররোগীর উপাখ্যান ভিন্ন, গ্রন্থমধ্যে আরও একটি উপাখ্যান ২২৭ পৃষ্ঠায় আছে। যে সকল উপাখ্যান নীতিবিরুদ্ধ, বা অশ্লীল, বা অন্য কারণে ভদ্রের অনাদরণীয়, তাহা কদাচিৎ রসবাহুল্যের অনুরোধে সহ্য যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার মধ্যে যদি উপন্যাস ন্যস্ত হইল, তবে তাহা একটু সরস হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এক শাশুড়ী কুন্তীর দৃষ্টান্তানুবর্ত্তিনী, তাঁহার বধূ দ্রৌপদীর দৃষ্টান্তানুকারিণী, এরূপ উপাখ্যান বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিপি কৌশলেও সরস হয় নাই, অথবা তাঁহার নামের বা বয়সের গুণেও নীতিগর্ভ বা ভদ্রলোকের পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইবে না।

একজন সামান্য ব্যক্তি এরূপ লিখিলে, আমরা তাহাকে ভৎর্সনা করিবার জন্য বঙ্গদর্শনের এতটা স্থান নষ্ট করিতাম না। কটুবাক্যে আনুরক্তি, অশ্লীলতাকে রসিকতা জ্ঞান, ইহা বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে সর্ব্বদা দেখা যায়। আমরা

---

* বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ২৩৯—২৪০ পৃষ্ঠা।

তাহার শাসনের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়া থাকি না, কেননা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে সাধারণ পাঠকের রুচির দৈনন্দিন উৎকর্ষ সিদ্ধি হইতেছে, কদর্য্যভাষী লেখকদিগের ব্যবসায় শীঘ্র লোপ পাইবে। কিন্তু যেখানে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় বিজ্ঞ, মান্য, এবং সুপণ্ডিত লেখকের এরূপ প্রবৃত্তি তখন বঙ্গীয় সাধারণ লেখক ও পাঠকের মঙ্গল কামনায়, বাঙ্গালা সাহিত্যে কোন ভবিষ্যৎকালে ভদ্রতা ও সভ্যতা স্থান পাইতে পারে এই বাসনায় ভিন্নজাতীয়গণের নিকট চিরকাল আমরা ইতরজাতি বলিয়া পরিচিত না থাকি, এই ইচ্ছায়, আমরা এই কুপ্রথার নিন্দা করিলাম। আমাদিগের এই বিশেষ আশঙ্কা যে বিদ্যাসাগর মহাশয় কতকগুলি লেখকের আদর্শস্বরূপ, তাঁহারা এ নজির দেখিয়া অপরিমিত রসিকতা উদ্গীর্ণ করিতে আরম্ভ করিবেন। সেই আশঙ্কাতেই আমরা এত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। নচেৎ যে বাক্য উপদেশ বাক্যের ন্যায় শুনায়, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি প্রয়োগ করিতে আমাদের লজ্জা করে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সদনুষ্ঠান প্রিয়তা গুণে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। যাঁহাদিগকে তিনি কটু কথা বলিয়াছেন—তারানাথ তর্কবাচস্পতি বা গঙ্গাধর রায় কবিরাজ, ইহাদিগকে আমরা চিনি না; তাঁহাদিগের পক্ষতাবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগরের প্রতি দোষারোপ করিব এমত কোন কারণই নাই। তাঁহার প্রথম পুস্তকের উত্তরে ইঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহাদিগের লিপিপ্রণালীরও প্রশংসা করিতে পারি না। তাঁহারাও বিদ্যাসাগরকে কটু বলিতে ত্রুটি করেন নাই। গালি খাইয়া বিদ্যাসাগর গালি দিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা লিপিকার্য্যের সুসভ্য প্রণালী তাদৃশ অবগত নহেন, বিদ্যাসাগর যে তাঁহাদিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহারই জন্য এত কথা বলিলাম। কেবল বঙ্গীয় সাহিত্য হইতে অসভ্যতা কলঙ্ক দূর করিবার প্রয়োজনানুরোধেই, এসকল কথা বলিতে হইল। বহুবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে ভদ্রসমাজে বিচার চলিতে পারে না। ভদ্র লেখকে বিদ্যাসাগরকে বলিতে পারেন, "আপনার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। যিনি ভদ্রলোকের ব্যবহার্য্যভাষা ব্যবহার না করিয়া কটূক্তি করেন, তাহার সহিত বিচার করিতে ঘৃণা করি।"

যে কয়টি কথা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি।

১। বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা; যিনি তাহার বিরোধী তিনিই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন।

২। বহুবিবাহ এ দেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে; অল্পদিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।

৩। এ কথা যদিও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তথাপি ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া কোন ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে না।

৪। আমাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থ, আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা স্থির হয়, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই।

৫। যে শাস্ত্রীয় বিচারে ভদ্রলোকের বর্জ্জনীয় ভাষার অনুশীলন হয়, তাহা পরিহার্য্য।

উপসংহার কালে, আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, দেশহিতৈষী, এবং সুলেখক, ইহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট অনেক ঋণে বদ্ধ। এ কথা যদি আমরা বিস্মৃত হই তবে আমরা কৃতঘ্ন। আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহা কর্ত্তব্যানুরোধেই লিখিয়াছি। তিনি যদি কর্ত্তব্যানুরোধে বহুবিবাহের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে আমাদের এ কথা সহজে বুঝিবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বেদ

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাংখ্য প্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না বেদ মানেন। বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোন দর্শন বা অন্য শাস্ত্র নাই, যাহাতে ধর্ম্মপুস্তকের প্রামাণ্যতা স্বীকার করে অথচ ধর্ম্মপুস্তকের বিষয়ীভূত এবং প্রণেতা জগদীশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই বেদভক্তি ভারতবর্ষে অতিশয় বিস্ময়কর পদার্থ। আমরা এ বিষয়টি কিঞ্চিৎ সবিস্তারে লিখিতে ইচ্ছা করি।

মনু বলেন, বেদশব্দ হইতে সকলের নাম, কর্ম্ম, এবং অবস্থা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বেদ, পিতৃ, দেবতা এবং মনুষ্যের চক্ষু ; অশক্য, অপ্রমেয় ; যাহা বেদ হইতে ভিন্ন তাহা পরকালে নিষ্ফল, বেদ ভিন্ন গ্রন্থ মিথ্যা। ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, চতুর্ব্বর্ণ, তিনলোক, চতুরাশ্রম, সকলই বেদ হইতে প্রকাশ ; বেদ মনুষ্যের পরম সাধন ; যে বেদজ্ঞ সেই, সৈনাপত্য, রাজ্য, দণ্ডনেতৃত্ব, এবং সর্ব্বলোকাধিপত্যের যোগ্য। যে বেদজ্ঞ সে যে আশ্রমেই থাকুক না কেন, সেই ব্রহ্মে লীন হওয়ার যোগ্য। যাহারা ধর্ম্মজিজ্ঞাসু, বেদই তাহাদের পক্ষে পরম প্রমাণ। বেদ অজ্ঞের শরণ, জ্ঞানীদিগেরও শরণ। যাহারা স্বর্গ বা আনন্ত্য কামনা করে, ইহাই তাহাদিগের শরণ। যে ব্রাহ্মণ তিন লোক হত্যা করে, যেখানে সেখানে খায়, তাহার যদি ঋগ্বেদ মনে থাকে, তবে তাহার কোন পাপ হয় না।

শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, তিন বেদান্তর্গত সর্ব্বভূত। বেদ, সকল ছন্দঃ, স্তোম, প্রাণ, এবং দেবতাগণের আত্মা। বেদই আছে। বেদ অমৃত। যাহা সত্য তাহাও বেদ।

বিষ্ণুপুরাণে আছে, দেবাদির রূপ, নাম, কর্ম্ম, প্রবর্ত্তন, বেদশব্দ হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল। অন্যত্র ঐ পুরাণে বিষ্ণুকে বেদময়, ও ঋগ্‌ যজুঃ সামাত্মক বলা হইয়াছে।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও আছে, যে বেদশব্দ হইতে সর্ব্বভূতের রূপ নাম কর্ম্মাদির উৎপত্তি।

ঋক্‌সংহিতার ও তৈত্তিরীয় সংহিতার মঙ্গলাচরণে সায়নাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন, "বেদ হইতে অখিল জগতের নির্ম্মাণ হইয়াছে।"

এইরূপ সর্ব্বত্র বেদের মাহাত্ম্য। কোন দেশে কোন ধর্ম্মগ্রন্থের, বাইবল, কোরাণ প্রভৃতি কিছুরই, ঈদৃশ মহিমা কীর্ত্তিত হয় নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে যে বেদ এইরূপ সকলের পূর্ব্বগামী বা উৎপত্তির স্থল, তাহা কোথা হইতে আসিল। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, বেদের কর্ত্তা কেহ নাই।—এ গ্রন্থ কাহারও প্রণীত নহে, ইহা নিত্য এবং অপৌরুষেয়। অন্যে বলেন যে ইহা ঈশ্বরপ্রণীত সুতরাং সৃষ্ট এবং পৌরুষেয়। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের কি আশ্চর্য্য বৈচিত্র! সকলেই বেদ মানেন কিন্তু বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন দুইখানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ঐক্য নাই। যথা—

(১) ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে আছে বেদ পুরুষ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন।

(২) অথর্ব্ব বেদে আছে স্কম্ভ হইতে ঋগ্‌ যজুষ্‌ সাম অপাক্ষিত হইয়াছিল।

(৩) অথর্ব্ব বেদে অন্যত্র আছে যে ইন্দ্র হইতে বেদের জন্ম।

(৪) ঐ বেদের অন্যত্র আছে, ঋগ্বেদ কাল হইতে উৎপন্ন।

(৫) ঐ বেদের অন্যত্র আছে, বেদ গায়ত্রীমধ্যে নিহিত।

(৬) শতপথ ব্রাহ্মণে আছে যে অগ্নি হইতে ঋচ্‌, বায়ু হইতে যজুষ্‌, এবং সূর্য্য হইতে সাম বেদের উৎপত্তি। ছান্দোগ্য উপনিষদেও ঐরূপ আছে। এবং মনুতেও তদ্রূপ আছে।

(৭) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে যে বেদ প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল।

(৮) শতপথ ব্রাহ্মণের সেই স্থানেই আছে যে প্রজাপতি বেদ সহিত জল-মধ্যে প্রবেশ করেন। জল হইতে অণ্ডের উৎপত্তি হয়। অণ্ড হইতে প্রথমে তিন বেদের উৎপত্তি।

(৯) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে যে বেদ মহাভূতের (ব্রহ্মের) নিঃশ্বাস।

(১০) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে প্রজাপতি সোমকে সৃষ্টি করিয়া তিন বেদের সৃষ্টি করিয়াছেন।

(১১) বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, প্রজাপতি বাক্‌ সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা বেদাদি সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন।

(১২) শতপথ ব্রাহ্মণে পুনশ্চ আছে, যে মনঃসমুদ্র হইতে বাক্‌রূপ সাবলের দ্বারা দেবতারা বেদ খুঁড়িয়া উঠাইয়াছিলেন।

(১৩) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে, যে বেদ প্রজাপতির শ্মশ্রু!!

(১৪) উক্ত ব্রাহ্মণে পুনশ্চ আছে, বাগ্‌দেবী বেদমাতা।

(১৫) বিষ্ণুপুরাণে আছে, বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন। ভাগবত পুরাণে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণেও ঐরূপ।

(১৬) হরিবংশে আছে, গায়ত্রীসম্ভূত ব্রহ্মতেজোময় পুরুষের নেত্র হইতে ঋচ্‌ ও যজুষ, জিহ্বাগ্র হইতে সাম, এবং মূর্দ্ধা হইতে অথর্ব্বের সৃজন হইয়াছিল।

(১৭) মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে আছে যে সরস্বতী এবং বেদ, বিষ্ণু মন হইতে সৃজন করিয়াছিলেন। শান্তিপর্ব্বে সরস্বতীকে বেদমাতা বলা হইয়াছে।

(১৮) অথর্ব্ব বেদান্তর্গত আয়ুর্ব্বেদে আছে, যে আয়ুর্ব্বেদ ব্রহ্মা মনে মনে জানিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদান্তর্গত বলিয়া অথর্ব্ববেদের ঐরূপ উৎপত্তি বুঝিতে হইবে। বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্‌ এবং আরণ্যকে, এবং স্মৃতি, পুরাণ, ও ইতিহাসে বেদোৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ আছে। দেখা যাইতেছে যে এ সকলে বেদের সৃষ্টত্ব এবং পৌরুষেয়ত্ব প্রায় সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে—কদাচিৎ অপৌরুষেয়ত্বও কথিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী টীকাকার ও দার্শনিকেরা প্রায় অপৌরুষেয়ত্ব বাদী। তাঁহাদিগের মত নিম্নে লিখিত হইতেছে।

(১৯) সায়নাচার্য্য বেদার্থ প্রকাশ নামে ঋগ্বেদের টীকা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন যে বেদ অপৌরুষেয়। কিন্তু বেদ মনুষ্যকৃত নহে বলিয়াই অপৌরুষেয় বলেন।

(২০) সায়নাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্যও বেদার্থ প্রকাশ নামে তৈত্তিরীয় যজুর্ব্বেদের টীকা করিয়াছেন। তিনি বলেন বেদ নিত্য। তবে তিনি এই অর্থে নিত্য বলেন, যে কাল আকাশাদি যেমন নিত্য সেইরূপ বেদ। ব্যবহার কালে কালিদাসাদিবাক্যবৎ পুরুষবিরচিত নহে বলিয়া নিত্য। এবং তিনি ব্রহ্মাকে বেদবক্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

(২১) মীমাংসকেরা বলেন বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। শব্দ নিত্য বলিয়া বেদ নিত্য। শঙ্করাচার্য্য এই মতাবলম্বী।

(২২) নৈয়ায়িকেরা তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বেদ পৌরুষেয়।—মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের ন্যায়, জ্ঞানী ব্যক্তির কথা প্রামাণ্য বলিয়াই বেদও প্রামাণ্য বোধ হয়। গৌতমসূত্রের ভাবে বেদকে মনুষ্য প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করা তাঁহার ইচ্ছা কিনা, নিশ্চিত বুঝা যায় না।

(২৩) বৈশেষিকেরা বলেন, বেদ ঈশ্বরপ্রণীত। কুসুমাঞ্জলিকর্ত্তা উদয়নাচার্য্যের এই মত।

এই সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, কেহ বলেন বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়; কেহ বলেন বেদ সৃষ্ট এবং ঈশ্বরপ্রণীত। ইহা ভিন্ন তৃতীয় সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কিন্তু সাংখ্য প্রবচনকারের মত সৃষ্টি ছাড়া। তিনি প্রথমতঃ বলেন, যে বেদ কদাপি নিত্য হইতে পারে না, কেননা বেদেই তাহার কার্য্যত্বের প্রমাণ আছে—যথা "স তপোঽতপ্যত তস্মাৎ তপস্তেপানা ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত।" যেখানে বেদেই বলে যে এই এই রূপে বেদের জন্ম হইয়াছিল, তখন বেদ কদাপি নিত্য এবং অপৌরুষেয়, হইতে পারে না। কিন্তু যাহা অপৌরুষেয় নহে, তাহা অবশ্য পৌরুষেয় হইবে। কিন্তু সাংখ্যকারের মতে বেদ অপৌরুষেয় নহে, পৌরুষেয়ও নহে। পুরুষ, অর্থাৎ ঈশ্বর নাই, বলিয়া তাহা পৌরুষেয় নহে। সাংখ্যকার আরও বলেন, যে বেদ করিতে যোগ্য যে পুরুষ তিনি হয় মুক্ত নয় বদ্ধ। যিনি মুক্ত তিনি প্রবৃত্তির অভাবে বেদসৃজন করিবেন না; যিনি বদ্ধ তিনি অসর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তৎপক্ষে অক্ষম।

তবে বেদ পৌরুষেয় নহে। অপৌরুষেয়ও নহে। তাহা কি কখন হইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন হইতে পারে যথা অঙ্কুরাদি (৫,৪৮) যাঁহারা হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের নাম শুনিলেই মনে করেন, তাহাতে সর্ব্বত্রই আশ্চর্য্য বুদ্ধির কৌশল, তাঁহাদিগের ভ্রম নিবারণার্থ এই কথার বিশেষ উল্লেখ করিলাম। সাংখ্যকারের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাও বিচিত্রা, ভ্রান্তিও বিচিত্রা। সাংখ্যকার যে এমন রহস্যজনক ভ্রান্তিতে অনবধানতাপ্রযুক্ত পতিত হইয়াছিলেন, আমরা এমত বিবেচনা করি না। আমাদিগের বিবেচনায় সাংখ্যকার আন্তরিক বেদ মানিতেন না। কিন্তু তাৎকালিক সমাজে ব্রাহ্মণে এবং দার্শনিকে কেহ সাহস করিয়া বেদের অবজ্ঞা করিতে পারিতেন না। এজন্য তিনি মৌখিক বেদভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং যদি বেদ মানিতে হইল তবে আবশ্যকমত প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য স্থানে স্থানে বেদের দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু তিনি আন্তরিক বেদ মানিতেন বোধ হয় না। বেদ পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, একথা কেবল ব্যঙ্গ মাত্র। সূত্রকারের এই কথা বলিবার অভিপ্রায় বুঝা যায়, যে "দেখ, তোমরা যদি বেদকে সর্ব্বজ্ঞানযুক্ত বলিতে চাহ, তবে বেদ না পৌরুষেয়, না অপৌরুষেয় হইয়া উঠে। বেদ অপৌরুষেয় নহে, ইহার প্রমাণ বেদে আছে। তবে ইহা যদি পৌরুষেয় হয়, তবে ইহাও বলিতে হইবে, যে ইহা মনুষ্য কৃত, কেননা সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ কেহ নাই, তাহা প্রতিপন্ন করা গিয়াছে।" যদি এসকল সূত্রের এরূপ অর্থ না করা যায়, তবে অদ্বিতীয়

দূরদর্শী দার্শনিক সাংখ্যকারকে বাতুল বলিতে হয়। এবিষয়ে আরও কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

বেদ যদি পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, তবে বেদ মানিব কেন? সাংখ্যকার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। আজি কালিকার কথা ধরিতে গেলে বোধ হয় এত বড় গুরুতর প্রশ্ন ভারতবর্ষে আর কিছুই নাই। একদল বলিতেছেন, সনাতন ধর্ম্ম বেদমূলক; তোমরা এ সনাতন ধর্ম্মে ভক্তিহীন কেন? তোমরা বেদ মান না কেন? আর এক দল বলিতেছেন আমরা বেদ মানিব কেন? সমুদায় ভারতবর্ষ এই দুই দলে বিভক্ত। এই দুই প্রশ্নের উত্তর লইয়া বিবাদ হইতেছে। ভারতবর্ষের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর নির্ভর করে। হিন্দুগণ সকলেরই কি স্বধর্ম্মে থাকা উচিত? না সকলেরই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত? অর্থাৎ আমরা বেদ মানিব? না মানিব না? যদি মানি তবে কেন মানিব?

আর এক বার এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। যখন ধর্ম্মশাস্ত্রের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ভারতবর্ষ ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিতেছিল, তখন শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, "তোমরা বেদ মানিবে কেন? বেদ মানিও না।" এই কথা শুনিয়া বেদবিৎ, বেদ ভক্ত, দার্শনিক মণ্ডলী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। জৈমিনি, বাদরায়ণ, গৌতম, কণাদ, কপিল যাঁহার যেমন ধারণা তিনি তেমনি উত্তর দিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্বে বেদে, কল্পসূত্রে, স্মৃতি গ্রন্থে বা কোথাও এ প্রশ্ন উত্থাপিত বা নিবারিত হয় নাই। তাহার কারণ তৎপূর্ব্বে কেহ কখন বেদের প্রতি সংশয় করে নাই। প্রশ্ন না হইলে কেহ উত্তর দেয় না। সংশয় না হইলে কেহ প্রশ্ন করে না। আমি যদি নিশ্চিন্ত জানি যে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল, লর্ড নর্থব্রুক, তবে তোমাকে কখন জিজ্ঞাসা করিব না যে কে এখন গবর্ণর জেনেরেল? অথবা তুমিও উত্তর দিবে না। অতএব প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর থাকাতে দুইটি কথা জানা যাইতেছে। প্রথম আজি কালি ইংরেজি শিক্ষার দোষেই লোকে বেদের অলঙ্ঘনীয়তার প্রতি নূতন সন্দেহ করিতেছে, এমত নহে। এ সন্দেহ অনেক দিন হইতে। প্রাচীন দার্শনিকদিগের পরে শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, সায়নাচার্য্য, প্রভৃতি নব্যেরাও ঐ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, দেখা যায় যে এ প্রশ্ন বৌদ্ধেরা প্রথম উত্থাপিত করেন, এবং প্রাচীন দার্শনিকেরা প্রথম তাহার উত্তর দান করেন। অতএব বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি সমকালিক বলা যাইতে পারে।

বেদ মানিব কেন? এই প্রশ্নে বিচার সম্বন্ধে মহারথী মীমাংসক জৈমিনি। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নৈয়ায়িক গৌতম। নৈয়ায়িকেরা বেদ মানেন না, এমত নহে।

কিন্তু যে সকল কারণে মীমাংসকেরা বেদ মানেন, নৈয়ায়িকেরা তাহা অগ্রাহ্য করেন। মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন বেদ আপ্তবাক্য মাত্র। নৈয়ায়িকেরা, মীমাংসকের মত খণ্ডন জন্য যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, মাধবাচার্য্য প্রণীত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ হইতে তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে সংক্ষেপে লেখা গেল।

মীমাংসকেরা বলেন, যে সম্প্রদায়াবিচ্ছেদে বেদকর্ত্তা অস্মর্য্যমান। সকল কথা লোক পরম্পরা স্মৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কাহারও স্মরণ নাই যে কেহ বেদ করিয়াছেন। ইহাতে নৈয়ায়িকেরা আপত্তি করেন যে, প্রলয়কালে সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে যে বেদ প্রণয়ন স্মরণে নাই ইহাতে এমত প্রমাণ হইতেছে না যে প্রলয় পূর্ব্বে বেদ প্রণীত হয় নাই। আর ইহাও তোমরা প্রমাণ করিতে পারিবে না, যে বেদকর্ত্তা কাহাকর্ত্তৃক কখন স্মৃত ছিলেন না। নৈয়ায়িকেরা আরও বলেন যে বেদবাক্য সকল যেমন কালিদাসাদি বাক্য, তেমনি বাক্য, অতএব বেদবাক্যও পৌরুষেয় বাক্য। বাকাত্ব হেতু, মন্বাদির বাক্যের ন্যায়, বেদবাক্যকেও পৌরুষেয় বলিতে হইবে। আর মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন, যে যেই বেদাধ্যয়ন করে, তাহার পূর্ব্বে তাহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে তাহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে তাহার গুরু; এইরূপ যেখানে অনন্ত পারম্পর্য্য আছে, সেখানে বেদ অনাদি। নৈয়ায়িক বলেন, যে মহাভারতাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। যদি বল, যে মহাভারতের কর্ত্তা যে ব্যাস ইহা স্মর্য্যমান, তবে বেদ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে, যে "ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে। ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত।" ইতি পুরুষসূক্তে বেদকর্ত্তাও নির্দ্দিষ্ট আছেন। আর মীমাংসকেরা বলেন, যে শব্দ নিত্য, এজন্য বেদ নিত্য। কিন্তু শব্দ নিত্য নহে, কেননা শব্দ সামান্যত্ব বশতঃ ঘটবৎ অস্মদাদির বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। মীমাংসকেরা উত্তর করেন, যে গকারাদির শব্দ শুনিতে পাইলেই আমাদিগের প্রত্যভিজ্ঞান জন্মে যে ইহা গ-কার, অতএব শব্দ নিত্য। নৈয়ায়িক বলেন যে সে প্রত্যভিজ্ঞা সামান্য বিষয়ত্ব বশতঃ, যেমন ছিন্ন, তৎপরে পুনর্জ্জাত কেশ, এবং দলিত কুন্দ। মীমাংসকেরা আরও বলিয়া থাকেন যে বেদ অপৌরুষেয়, তাহার এক কারণ যে পরমেশ্বর অশরীরী, তাঁহার তত্বাদি বর্ণোচ্চারণ স্থান নাই। নৈয়ায়িকেরা উত্তর করেন যে পরমেশ্বর স্বভাবতঃ অশরীরী হইলেও ভক্তানুগ্রহার্থ তাঁহার শরীর গ্রহণ অসম্ভব নহে।

মীমাংসকেরা এসকল কথার উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু তাহার বিবরণ লিখিতে গেলে প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ এবং কটমট হইয়া উঠে। ফলে বেদ মানিব কেন? এই তর্কের তিনটি মাত্র উত্তর, প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়—

প্রথম। বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহা মান্য। কিন্তু বেদেই আছে, যে ইহা অপৌরুষেয় নহে। যথা "ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে" ইত্যাদি।

দ্বিতীয়। বেদ ঈশ্বরপ্রণীত এইজন্য মান্য। প্রতিবাদীরা বলিবেন, যে বেদ যে ঈশ্বরপ্রণীত তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। বেদে আছে, বেদ ঈশ্বরসম্ভূত, কিন্তু যেখানে তাঁহারা বেদ মানিতেছেন না, তখন তাঁহারা বেদের কোন কথা মানিবেন না। এবিষয়ে যে বাদানুবাদ হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়, এবং তাহা সবিস্তারে লিখিবার আবশ্যক নাই। যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না, তাঁহারা বেদ ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিবেন না, তাহা বলা বাহুল্য।

তৃতীয়। বেদের নিজ শক্তির অভিব্যক্তির দ্বারাই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হই-তেছে। সাংখ্যকার এই উত্তর দিয়াছেন। সায়নাচার্য্য বেদার্থ প্রকাশে, এবং শঙ্করা-চার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ঐরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কেবল ইহাই বক্তব্য, যে যদি বেদের এরূপ শক্তি থাকে, তবে বেদ অবশ্য মান্য। কিন্তু সে শক্তি আছে কি না, এই এক স্বতন্ত্র বিচার আবশ্যক হইতেছে। অনেকে বলিবেন যে আমরা এরূপ শক্তি দেখিতেছি না। বেদের অগৌরব হিন্দুশাস্ত্রেও আছে। বেদ মানিতে হইবে কি না, তাহা সকলেই আপনাপন বিবেচনামত মীমাংসা করিবেন, কিন্তু আমরা পক্ষপাতশূন্য হইয়া যেখানে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং যখন বেদের গৌরব নির্ব্বাচনাত্মক তত্ত্ব লিখিয়াছি, তখন হিন্দুশাস্ত্রে কোথায় কোথায় বেদের অগৌরব আছে তাহাও আমাদিগকে নির্দ্দেশ করিতে হয়। পাছে অনর্থক পাণ্ডিত্য প্রকাশের অপরাধে অপরাধী হই, এই আশঙ্কায়, আমরা উপরে কোথাও সংস্কৃত প্রমাণ উদ্ধৃত করি নাই; বিশেষ, পাণ্ডিত্য প্রকাশে আমাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে যে বেদের অগৌরব কীর্ত্তিত আছে, এরূপ উক্তি আমাদিগের কথায় অনেকে বিশ্বাস করিবেন না, এজন্য আমরা এস্থলে মূলই উদ্ধৃত করিলাম।

১। মুণ্ডকোপনিষদের আরম্ভে "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ্ ব্রহ্ম বিদো বদন্তি পরা চৈবাপরাচ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা-কল্প ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথপরা যয়া তদক্ষয়মধিগম্যতে।"

অর্থাৎ বেদাদি শ্রেষ্ঠেতর বিদ্যা।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, ২।৪২, বেদপরায়ণদিগের নিন্দা আছে, যথা

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচম্প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মনঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্ম ফলপ্রদম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি।

ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।
ত্রৈগুণ্য বিষয়াঃ বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।

৩। ভাগবত পুরাণে নারদ বলিতেছেন যে পরমেশ্বর যাহাকে অনুগ্রহ করেন সে বেদ ত্যাগ করে। ৪।২৯,৪২

শব্দব্রহ্মণি দুষ্পারে চরন্ত উরুবিস্তরে
মন্ত্রলিঙ্গ ব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো ন বিদুঃ পরম্।
যদা যস্যানুগৃহ্নাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ
স জহাতি মতিং লোকে বেদেচ পরিনিষ্ঠিতম্।

৪। কঠোপনিষদে আছে যে বেদের দ্বারা আত্মা লভ্য হয় না,—যথা
"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

শাস্ত্রানুসন্ধান করিলে এরূপ কথা আরও পাওয়া যায়। পাঠক দেখিবেন, বেদ মানিব কেন? এ প্রশ্নের আমরা কোন উত্তর দিই নাই। দিবারও আমাদিগের ইচ্ছা নাই। যাঁহারা সক্ষম তাঁহারা সে মীমাংসা করিবেন। আমরা পূর্ব্বগামী পণ্ডিতদিগের প্রদর্শিত পথে পরিভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহাই পাঠকের নিকট নিবেদিত হইল।
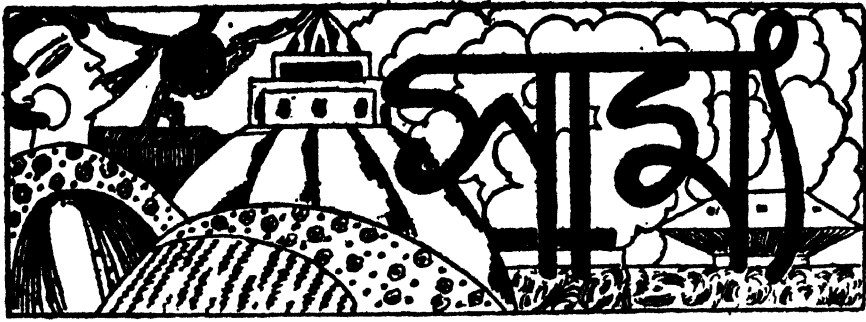
দ্বিতীয় সংখ্যা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স রাজ্যের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনীয় নহে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে তাহার বর্ণনার স্থান নাই। প্রয়োজনও নাই। Carlyle, Alison, Thiers, Mignet, Louis Blanc Michelet, La Martine, প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত, বাক্যবিশারদ, পুরাবৃত্তজ্ঞ, সূক্ষ্মদর্শী বহুসংখ্যক লেখক তাহার পুঙ্খ পুঙ্খ বর্ণনা করিয়াছেন; সেই সকল বর্ণনা সকলেরই অনায়াসপাঠ্য। দুই একটা কথা বলিলেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধন হইবে।

কার্লাইল ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন, যে "যে আইন অনুসারে একজন ভূম্যধিকারী মৃগয়া হইতে আসিয়া দুই জন দাস বধ করিয়া তাহাদিগের রক্তে পদ প্রক্ষালন করিতে পারিতেন, সে আইন ইদানীং আর প্রচলিত ছিল না।" ইদানীং প্রচলিত ছিল না! তবে পূর্ব্বে ছিল! "পঞ্চাশৎবৎসর মধ্যে শারলোয়ার ন্যায় কোন ব্যক্তি স্থপতিদিগকে গুলি করিয়া তাহারা কি প্রকারে ছাদের উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে, দেখিয়া আনন্দ লাভ করে নাই।" সেরাজউদ্দৌলা দেশের অধিপতি ছিলেন; করাশায়োলোয়াগণ উচ্চ শ্রেণীর প্রজামাত্র।

এই ব্যঙ্গোক্তিতেই তাৎকালিক ফরাশীদিগের মধ্যে কি অচিন্তনীয় বৈষম্য জন্মিয়াছিল, তাহা বুঝা যাইবে। পঞ্চদশ লুই প্রমদানুরক্ত, বৃথাভোগাশক্ত, ব্যয়-শৌণ্ড, স্বার্থপর রাজা ছিলেন। তাঁহার উপপত্নীগণের পরিতুষ্টির জন্য অত্যন্ত ধন-রাশির আবশ্যক। মাদাম পোম্পাদুর ও মাদাম দুবারি যে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া-ছিলেন, তাহা পরিণীতা রাজমহিষীর নিষ্কলঙ্ক কপালেও ঘটে না। মাদাম দুবারির একটি বানরবৎ কাফ্রি খানসামা ছিল; সে এক স্থানের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হইয়াছিল—মাদামের আজ্ঞা! লুইর বিলাসভবনের বর্ণনা শুনিলে ইন্দ্রপ্রস্থের দৈবশক্তি নির্ম্মিতা পণ্ডবীয়া পুরীর সঙ্গে তুলনা করা যায়—সেই সকল প্রমোদ মন্দিরে যে উৎসব হইত, কিসের সঙ্গে তাহার তুলনা করিব? জলবৎ

অর্থব্যয়,—এ দিকে রাজ-কোষ শূন্য! রাজকোষ শূন্য, এবং প্রজাবর্গ মধ্যে অন্নাভাবে হাহাকার রব আকাশমধ্যে উঠিতেছিল। রাজকোষ শূন্য—প্রজামধ্যে অন্নাভাবে হাহাকার রব—তবে এ সভাপর্ব্বের রাজসূয়, এ নন্দন-কাননের ঐন্দ্রবিলাস—এ সকল অর্থসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন হয় কোথা হইতে? সেই অন্নাভাবপীড়িত প্রজার জীবনোপায় অপহরণ করিয়া। পিষ্টকে পেষণ করিয়া—শুষ্ককে শোষণ করিয়া, দগ্ধকে দাহন করিয়া ছ্‌বারি কুলকলঙ্কিনীর অলকদাম রত্ন রাজিতে শোভিত হয়। আর বড়মানুষেরা? তাহারা এক কপর্দ্দক রাজকোষে অর্পণ করে না—কেবল রাজপ্রসাদ ভোগ করে। রাজপ্রসাদ, অজস্র, অনন্ত অপরিমিত—যে যত পায়, গ্রহণ করে, কেননা তাহা পিষ্টপেষণলব্ধ। কিন্তু রাজপ্রসাদ-ভাগীরা কপর্দ্দক মাত্র রাজকোষে দেয় না। বড়মানুষে কর দেয় না, ধর্ম্মযাজকেরা দেয় না, রাজপুরুষেরা কর দেয় না—কেবল দীন দুঃখী কৃষকেরা কর দেয়। তাহার উপর কর-সংগ্রাহকদিগের অত্যাচার। মিশালা বলেন, "কর আদায় একপ্রকার প্রণালীবদ্ধ যুদ্ধের ন্যায় ছিল। তাহার দ্বারা দুইলক্ষ নিষ্কর্ম্মা ভূমিকে প্রপীড়িত করিত। এই পঙ্গপালের রাশি, সর্ব্বগ্রাস, সর্ব্বনাশ করিত। এই প্রকারে পরি-শোষিত প্রজাদিগের নিকট আরও আদায় করিতে হইলে, সুতরাং নিষ্ঠুর রাজব্যবস্থা, ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধি, নাবিক দাসত্ব, ফাঁসিকাঠ, পীড়ন যন্ত্র প্রভৃতির আবশ্যক হইল।" রাজকর ইজারা বন্দবস্ত ছিল; ইজারাদারের এমত অধিকার ছিল যে শস্ত্রাঘাতাদির দ্বারা রাজস্ব আদায় করে। তাহারা তজ্জন্য প্রজাবধ পর্য্যন্ত করিত। একদিকে রম্যোদ্যান, বনবিহার, নৃত্যগীত, পরস্ত্রীর সহিত প্রণয়, হাস্য পরিহাস, অনন্ত প্রমোদ চিন্তাশূন্যতা;—আর একদিকে, দারিদ্র্য, অনাহার, পীড়া, নিরপরাধে নাবিক দাসত্ব, ফাঁসিকাঠ, প্রাণ বধ! পঞ্চদশ লুইর রাজ্যকালে ফ্রান্সদেশে এইরূপ গুরুতর বৈষম্য। এই বৈষম্য কদর্য্য অপরিশুদ্ধ রাজশাসনপ্রণালীজনিত। রূসোর গুরুতর প্রহারে সেই রাজ্য ও রাজশাসনপ্রণালী ভগ্নমূল হইল। তাঁহার মানস শিষ্যেরা তাহা চূর্ণীকৃত করিল।

শাক্য সিংহ এবং যীশুখ্রীষ্ট পবিত্র সত্য কথা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। এজন্য মনুষ্যলোকে তাঁহারা যে দেবতা বলিয়া পূজিত, ইহা যথাযোগ্য। রূসো তাঁহাদের সমকক্ষ ব্যক্তি নহেন। অবিমিশ্র বিমল সত্যই যে তাঁহাকর্ত্তৃক ভূমণ্ডলে প্রচারিত হইয়াছিল এমত নহে। তিনি মহিমাময় লোকহিতকর নৈতিক সত্যের সহিত অনিষ্টকারক মিথ্যা মিশাইয়া, সেই মিশ্র পদার্থকে আপনার অদ্ভুত বাগিন্দ্র-জালের গুণে লোকবিমোহিনী শক্তি দিয়া, ফরাশীদিগের হৃদয়াধিকারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। একে কথাগুলি কালোপযোগিনী তাহাতে রূসো বাক্‌শক্তিতে যথার্থ ঐন্দ্রজালিক, তাঁহার প্রেরিত সৎকথানুসারিণী ভ্রান্তিও ফরাশিদিগের

জীবনযাত্রার এক মাত্র বীজমন্ত্র বলিয়া গৃহীত হইল। সকল ফরাশী তাঁহার মানসশিষ্য হইল। তাহারা সেই শিক্ষার গুণে ফরাশীবিপ্লব উপস্থিত করিল।

রূসোরও মূল কথা, সাম্যপ্রাকৃতিক নিয়ম। স্বাভাবিক অবস্থায় সকল মনুষ্য সমান। সভ্যতার ফলে বৈষম্য জন্মে, কিন্তু বৈষম্য জন্মে বলিয়া, রূসো সভ্যতাকে মনুষ্যজাতির গুরুতর অমঙ্গল বিবেচনা করেন। তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে মনুষ্যে মনুষ্যে নৈসর্গিক বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেও সভ্যতার দোষে—সভ্যতাজনিত ভোগাশক্তি পাপানুরক্তি, এবং সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম বিচারের ফল। অসভ্যাবস্থায় সকল মনুষ্যের সমভাবে শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যক হয়; এজন্য সকলেরই সমভাবে শরীর পুষ্টি হয়; নীরোগ শরীরের ফল নীরোগ মন। যখন মনুষ্যগণ বন্যাবস্থায়, কাননে কাননে মৃগয়া করিয়া বেড়াইত, বৃক্ষতলে বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইত—অল্পমাত্র ভাষাশক্তিসম্পন্ন, এজন্য বাগ্বৈদগ্ধ জানিত না, যে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই, যে লোভের তৃপ্তি নাই, যে বাসনার পূরণ নাই, তাহার কিছুই জানিত না; ইহাকে ভাল বাসিব, উহাকে বাসিব না; এ আপন ও পর, এ স্ত্রী ও পরস্ত্রী, এ সকল বুঝিত না—সেই অবস্থাকে স্বর্গীয় সুখ মনে করিয়া, মনুষ্যজাতিকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, "এই অপূর্ব্ব চিত্র দেখ! ইহার সহিত এখনকার দুঃখপূর্ণ, পাপপূর্ণ, সভ্যাবস্থার তুলনা কর!"

যেই মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে সেই মনুষ্য মাত্রের সমান—নৈসর্গিক প্রকৃতিতে সমান, এবং সম্পত্তির অধিকারিত্বেও সমান। এই পৃথিবীর ভূমিতে রাজার যে প্রাকৃতিক অধিকার, ভিক্ষুকেরও সেই অধিকার। ভূমি সকলেরই—কাহারও নিজস্ব নহে। যখন বলবানে দুর্ব্বলকে অধিকারচ্যুত করিতে লাগিল, তখনই সমাজ সংস্থাপনের আরম্ভ হইল। সেই অপহরণের স্থায়িত্ববিধানের নাম আইন।

• যে ব্যক্তি সর্ব্বাদৌ, কোন ভূমিখণ্ড চিহ্নিত করিয়া বলিয়াছিল, যে "ইহা আমার," সেই সমাজ কর্ত্তা। যদি কেহ, তাহাকে উঠাইয়া দিয়া বলিত, "এ ব্যক্তি বঞ্চক, তোমরা উহার কথা শুনিও না, বসুন্ধরা কাহারও নহেন; তৎপ্রসূত শস্য সকলেরই" সে মানব জাতির অশেষ উপকার করিত।

রূসোর এই সকল কথা অতি ভয়ানক। বল্‌টের শুনিয়া বলিয়াছিলেন, এ সকল বদমায়েষের দর্শন শাস্ত্র। এই সকল কথার অনুবর্ত্তী হইয়া রূসোর মানস শিষ্য প্রুধোঁ বলিয়াছেন, যে অপহরণেরই নাম সম্পত্তি।

জগদ্বিখ্যাত Le Contrat Social নামক গ্রন্থে রূসো এই সকল মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সভ্যাবস্থার তাদৃশ দোষকীর্ত্তনে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে অসভ্যাবস্থায় যেখানে সহজ জ্ঞানে ধর্ম্ম নির্ণীত হয়, সভ্যাবস্থায় তৎপরিবর্ত্তে ন্যায়ানুভাবকতা সন্নিবেশিত হয়। সম্পত্তি সম্বন্ধে,

তিনি প্রথমাধিকারীকে অধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু অবস্থাবিশেষে মাত্র—প্রথম, যদি ভূমি পূর্ব্বে অধিকৃত না হইয়া থাকে; দ্বিতীয় অধিকারী যদি আত্মভরণপোষণের উপযোগী মাত্র ভূমি অধিকার করে, তাহার অধিক না লয়; তৃতীয় যদি নাম মাত্র দখল না লইয়া, কর্ষণাদির দ্বারা দখল লওয়া হয়, তবে অধিকৃত ভূমি অধিকারীর সম্পত্তি।

Le Contrat Social গ্রন্থের স্থূলোদ্দেশ্য এই, যে সমাজ সমাজভুক্তদিগের সম্মতিসৃষ্ট। যেমন পাঁচজন ব্যবসাদার মিলিয়া, পরস্পরে কতকগুলি নিয়মের দ্বারা বদ্ধ হইয়া, একটি জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানি সৃষ্ট করেন, রূসোর মতে সমাজ, রাজ্য, শাসন, এ সকল সেইরূপে লোকের মঙ্গলার্থ লোকের দ্বারা সৃষ্ট। এ কথার ফল অতি গুরুতর। তোমায় আমায় চুক্তি হইয়াছে, যে তুমি আমার জমী চষিয়া দিবে, আমি তোমাকে খাইতে পরিতে দিব, এবং গৃহে স্থান দিব। তুমি যে দিন আমার ভূমিকর্ষণ বন্ধ করিলে, সেই দিন আমি তোমার গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলাম এবং গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ করিলাম। এই কার্য্য ন্যায়সঙ্গত হইল। তেমনি যদি রাজা প্রজার সম্বন্ধ কেবল চুক্তি মাত্র হয়, তবে প্রজা অত্যাচারী রাজাকে বলিতে পারে যে "তুমি চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছ। প্রজার মঙ্গল করিবে এই অঙ্গীকারে তুমি রাজা; তোমার কার্য্য আমাদের মঙ্গল করা, আমাদের কার্য্য তোমাকে করদান ও তোমার আজ্ঞাপালন। তুমি এখন আর আমাদের মঙ্গল কর না, অতএব আমরাও তোমাকে কর দিব না, বা তোমার আজ্ঞাপালন করিব না। তুমি রত্ন সিংহাসন হইতে অবতরণ কর।"

অতএব যে দিন Le Contrat Social প্রচারিত হইল, সেই দিন ফরাসী রাজার হস্তে রাজদণ্ড ভগ্ন হইল। Le Contrat Social গ্রন্থের চরমফল ষোড়শ লুইর সিংহাসনচ্যুতি, এবং প্রাণদণ্ড। ফরাসী বিপ্লবে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহার মূল এই গ্রন্থে। সেই যজ্ঞে, বেদমন্ত্র, এই গ্রন্থোক্ত বাণী।

সেই ফরাসীবিপ্লবে, রাজা গেল, রাজকুল গেল; রাজপদ গেল, রাজনাম লুপ্ত হইল; সম্ভ্রান্ত লোকের সম্প্রদায় লুপ্ত হইল; পুরাতন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় গেল; মাস, বার, প্রভৃতির নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইল—অনন্ত প্রবাহিত শোণিতস্রোতে সকল ধুইয়া গেল। কালে আবার সকলই হইল, কিন্তু যাহা ছিল, তাহা আর হইল না। ফ্রান্স নূতন কলেবর প্রাপ্ত হইল। ইউরোপে নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হইল—মনুষ্য জাতির স্থায়ী মঙ্গল সিদ্ধ হইল। রূসোর ভ্রান্ত বাক্যে অনন্তকালস্থায়িনী কীর্ত্তি সংস্থাপিতা হইল। কেননা সেই ভ্রান্ত বাক্য সাম্যাত্মক—সেই ভ্রান্তির কায়া অর্দ্ধেক সত্যে নির্ম্মিত।

ফরাসীবিপ্লব শমিত হইল, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু "তুমি

সাধারণের” এই কথা বলিয়া রুসো যে মহা বৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্য নূতন ফল ফলিতে লাগিল। অদ্যাপিও তাহার ফলে ইউরোপ পরিপূর্ণ। “Communism” সেই বৃক্ষের ফল। “International”, সেই বৃক্ষের ফল। এ সকলের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

এ দেশে এবং অন্য দেশে সচরাচর সম্পত্তি ব্যক্তি বিশেষের। আমার বাড়ী, তোমার ভূমি, তাহার বৃক্ষ। কিন্তু ইহা ভিন্ন আর কোন প্রকার সম্পত্তি হইতে পারে না, এমত নহে। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি না হইয়া, সর্ব্বলোকসাধারণের সম্পত্তি হইতে পারে। এই সর্ব্বলোকপালিকা বসুন্ধরা কাহারও একার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, বা দশ পনের জন ভূম্যধিকারীর জন্য সৃষ্ট হয় নাই। অতএব ভূমির উপর সকলেরই সমান অধিকার থাকা কর্ত্তব্য। সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী বাক্‌শক্তির বলে, এই কথা রুসো পৃথিবীর মধ্যে আদৃতা করাইয়াছিলেন। ক্রমে বিজ্ঞ, বিবেচক পণ্ডিতেরা সেই ভিত্তির উপর সম্পত্তি মাত্রেরই সাধারণতা স্থাপন করিবার মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন।

প্রথম মত এই যে ভূমি এবং মূলধন, যাহার দ্বারা অন্য ধনের উৎপত্তি হইবে, তাহা সামাজিক সর্ব্বলোকের সাধারণ সম্পত্তি হউক। যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা সর্ব্বলোকে সমভাগে বণ্টন করিয়া লউক। ইহাতে বড়লোক ছোটলোক কোন প্রভেদ রহিল না; সকলেই সমান ভাবে পরিশ্রম করিবে। সকলেই সমান ভাগে ধনের অধিকারী। ইহাই প্রকৃত, Communism. ইহার প্রচার কর্ত্তা Owen, Louis Blano, এবং Cabet. কিন্তু সাধারণ communist, বহুশ্রমী, এবং অল্পশ্রমী, কর্ম্মিষ্ঠ এবং অকর্ম্মিষ্ঠ সকলকেই যেরূপ ধনের সমানভাগী করিতে চাহেন, Louis Blanc সে মতাবলম্বী নহেন। তিনি বলেন, শ্রমানুসারে ধনের ভাগ হওয়া কর্ত্তব্য। যে মত St. Simonism বলিয়া বিখ্যাত, তাহারও অভিপ্রায় এই যে সকলেই যে সমভাবে ধনভাগী হইবে, বা সকলেই এক প্রকার পরিশ্রম করিবে বা সকলেই সমান পরিশ্রম করিবে এমত নহে। যে যেমন পরিশ্রমের উপযুক্ত ও, যে যে কার্য্যের উপযুক্ত সে তেমনি পরিশ্রম করিবে, ও সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। কার্য্যের গুরুত্ব, এবং কর্ম্মকারকের গুণানুসারে বেতন প্রদত্ত হইবে। যে যাহার যোগ্য, তাহাতে তাহাকে নিযুক্ত করিবার জন্য, যে প্রকারে পুরস্কৃত হইবে তাহা নিরূপণ জন্য, এবং সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বাবধারণ জন্য কতকগুলিন কর্ত্তৃপক্ষ থাকিবেন। ভূমি ও ধনোৎপাদক সামগ্রী সকল সাধারণের, ইত্যাদি।

Fourierism আর এক প্রকার সাধারণসম্পত্তির পক্ষতা। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের এমন মত নহে যে ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি থাকিতে পারিবে না।

সম্পত্তির বৈশেষিকতা, এবং উত্তরাধিকারিতাও ইঁহাদের অনুমত। ইঁহারা বলেন যে দুই সহস্র বা তদ্রূপ সংখ্যক লোক একতন্ত্র হইয়া, ধনোৎপাদন করিবে। এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের দ্বারা ধনোৎপত্তি হইতে থাকিবে। তাহারা আপনাদিগের কর্ত্তৃপক্ষ আপনারা মনোনীত করিবে। মূলধনের পার্থক্য থাকিবে। উৎপন্নধনের মধ্য হইতে প্রথমে কিয়দংশ সমভাবে সকলকে বিতরিত হইবে। যে শ্রমে অপারগ সেও তাহা পাইবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, শ্রমকারী, মূলধনাধিকারী, এবং কর্ম্মনিপুণদিগের মধ্যে কোন নিয়মিত পরিমাণে তাহা বিভক্ত হইবে। যে যেমন গুণবান্ সে তদুপযুক্ত পাইবে। ইত্যাদি।

ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে মৃত মহাত্মা জন ষ্টুয়ার্ট মিল, যাহা বলিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক, কেননা তাহাও সাম্যতত্ত্বের অন্তর্গত। যিনি উপার্জ্জন কর্ত্তা, উপার্জ্জিত সম্পত্তিতে তাঁহার যে সম্পূর্ণ অধিকার, ইহা মিল স্বীকার করেন। যে যাহা আপন পরিশ্রমে বা গুণে উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহা অপর্য্যাপ্ত হইলেও তাহার যাবজ্জীবন ভোগ্য এবং তাহার জীবনান্তেও যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিয়া যাইবার তাহার অধিকার আছে। কিন্তু যদি আপন জীবনান্তে সে কাহাকেও না দিয়া যায়, তবে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি একা ভোগ করিবার অধিকার কাহারও নাই। রাম যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহাতে দশ সহস্র লোক প্রতিপালিত হইতে পারে; কিন্তু রাম উপার্জ্জন করিয়াছে বলিয়া সে নয়সহস্র নয়শত নিরানব্বই জনকে বঞ্চিত করিয়া, একা ভোগের অধিকারী বটে। জীবনান্তে স্বেচ্ছাক্রমে আপনার পুত্রকে বা অপরকে তাহাতে স্বত্ববান করিবারও তাহার অধিকার আছে। কিন্তু সে যদি কাহাকেও দিয়া না গেল, তবে কেবল ব্যবস্থার বলে, তাহার পুত্রও কেন একা অধিকারী হয়? অধিকার উপার্জ্জনকর্ত্তার, তাহার পুত্রের নহে। যেখানে অধিকারী বলিয়া যায় নাই, যে আমার পুত্র সকল ভোগ করিবে, সেখানে পুত্র অধিকারী নহে, সামাজিক লোক সকলেই সমান ভাবে অধিকারী। তবে পিতা পুত্রকে এই দুঃখময় সংসারে আনিয়াছেন, এজন্য যাহাতে সে কষ্ট না পায়, সুশিক্ষিত হইয়া, অভাবাপন্ন না হইয়া, যাহাতে সে সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, পিতার এরূপ উপায় করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। পিতৃসম্পত্তির যে অংশ রাখিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, পুত্রের তাহা বিনাদানেও প্রাপ্য। কিন্তু তদধিক এক কড়াও তাহার প্রাপ্য নহে। মিল বলেন, জারজপুত্রের অপেক্ষা অন্য পুত্রের কিছুমাত্র অধিকার নাই—উভয়েই কেবল আত্মরক্ষার উপায়ের অধিকারী। কিন্তু এরূপ যাহা কিছু অধিকার, তাহা সন্তানের। পুত্রের অবর্ত্তমানে জ্ঞাতি প্রভৃতি মৃতের সর্ব্বসম্পত্তিতে একাধিকারী হওয়ার কিছুমাত্র ন্যায়সঙ্গত কারণ

নাই। যাহার সন্তান আছে, তাহার ত্যক্তসম্পত্তি হইতে সন্তানের আবশ্যকীয় ধন রাখিয়া, অবশিষ্টে জনসাধারণের অধিকার হওয়া কর্ত্তব্য। যাহার সন্তান নাই, তাহার সমুদায় সম্পত্তিতেই জনসাধারণের অধিকার হওয়া কর্ত্তব্য। বাস্তবিক উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে ন্যায়ানুযায়ী ব্যবস্থা পৃথিবীর কোন রাজ্যে এপর্য্যন্ত হয় নাই। বিলাতী ব্যবস্থার অপেক্ষা, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র কিছু ভাল; হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা সরা আরও ভাল। কিন্তু সকলই অন্যায়পূর্ণ। এক্ষণে এ সকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য, এবং মূর্খের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ বিধি পৃথিবীর সর্ব্বত্র চলিবে।

সাম্যতত্ত্বের শেষাংশও এই চিরস্মরণীয় মহাত্মার প্রচারিত। স্ত্রী পুরুষে সমান। এক্ষণে সুশিক্ষায়, বিজ্ঞানে, রাজকার্য্যে, বিবিধ ব্যবসায় একা পুরুষেই অধিকারী—স্ত্রীলোক অনধিকারিণী থাকিবে কেন? মিল বলেন, নারীজাতিও এ সকলের অধিকারী। তাহারা যে পারিবে না, উপযুক্ত নহে, এ সকল চিরপ্রচলিত লৌকিক ভ্রান্তিমাত্র। মিলের এ মত ইউরোপে গ্রাহ্য হইয়া, ফলে পরিণত হইতেছে। আমাদিগের দেশে এ সকল কথা প্রচারিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

সাম্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সার কথা পুনর্ব্বার উক্ত করিতে হইল। মনুষ্যে মনুষ্যে সমান। কিন্তু একথার এমত উদ্দেশ্য নহে যে সকল অবস্থায় সকল মনুষ্যই, সকল অবস্থার সকল মনুষ্যের সঙ্গে সমান। নৈসর্গিক তারতম্য আছে; কেহ দুর্ব্বল কেহ বলিষ্ঠ; কেহ বুদ্ধিমান্ কেহ বুদ্ধিহীন। নৈসর্গিক তারতম্যে সামাজিক তারতম্য অবশ্য ঘটিবে; যে বুদ্ধিমান্ এবং বলিষ্ঠ সে আজ্ঞাদাতা, যে বুদ্ধিহীন, এবং দুর্ব্বল সে আজ্ঞাকারী অবশ্য হইবে। রুসোও একথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সাম্যতত্ত্বের তাৎপর্য্য এই যে সামাজিক বৈষম্য, নৈসর্গিক বৈষম্যের ফল, তাহার অতিরিক্ত বৈষম্য ন্যায়বিরুদ্ধ, এবং মনুষ্যজাতির অনিষ্টকর। যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা অনেকগুলি এইরূপ অপ্রাকৃত বৈষম্যের কারণ। সেই ব্যবস্থাগুলি সংশোধন না হইলে, মনুষ্যজাতির প্রকৃত উন্নতি নাই। মিল একস্থানে বলিয়াছেন, এক্ষণকার যত সুব্যবস্থা, তাহা পূর্ব্বতন কুব্যবহার সংশোধক মাত্র। ইহা সত্য কথা। কিন্তু সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ। তাই বলিয়া কেহ না মনে করেন, যে আমি জন্মগুণে বড়লোক হইয়াছি, অন্যে জন্মগুণে ছোটলোক হইয়াছে। তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার কোন গুণে নহে; অন্য যে নীচকুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষে নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না; মনে থাকে যেন যে সেও

তোমার ভাই—তোমার সমকক্ষ যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে, যে বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ, এবং তাঁহার ভ্রাতা। জন্ম, দোষগুণের অধীন নহে। তাহার অন্য কোন দোষ নাই। যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেন, পরাণ মণ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী।

আমরা স্ত্রীজাতি নিরীহ ভালমানুষ বলিয়া আজি কালি আমাদিগের উপর বড় অত্যাচার হইতেছে। পুরুষের এক্ষণে বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে, ভর্ত্তৃগণ স্ত্রীকে আর মানে না, স্ত্রীলোকদিগের পুরাতন স্বত্ব সকল লুপ্ত হইতেছে, কেহই আর স্ত্রীর আজ্ঞার বশবর্ত্তী নহে। এই সকল বিষয়ের সুনিয়ম করিবার জন্য আমরা স্ত্রীস্বত্ব-রক্ষণী সভা সংস্থাপিতা করিয়াছি। সে সভার পরিচয় যদি সাধারণে সবিশেষ অবগত না থাকেন, তবে তাহার বিজ্ঞাপনী পশ্চাৎ প্রকাশ করিব। এক্ষণে বক্তব্য এই যে আমাদিগের স্বত্বরক্ষার্থ সভা হইতে একটী বিশেষ সদুপায় হইয়াছে। আমরা এবিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছি। এবং তৎসমভিব্যাহারে ভর্ত্তৃশাসনার্থ একটী দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করিয়াছি।

সকলের স্বত্ব রক্ষার্থ যেখানে প্রত্যহ আইনের সৃষ্টি হইতেছে, সেখানে আমাদিগের চিরন্তন স্বত্ব রক্ষার্থ কোন আইন হয়না কেন? অতএব এই আইন সত্বরে পাস হইবে, এই কামনায় স্বামিগণকে অবগত করিবার জন্য আমি তাহা বঙ্গদর্শনে প্রচার করিলাম। অনেক বাবুলোক বাঙ্গালাতে আইন ভাল বুঝিতে পারেন না, বিশেষতঃ আইনের বাঙ্গালা অনুবাদ সচরাচর ভাল হয় না, এবং আইন আদৌ ইংরাজিতেই প্রণীত হইয়াছিল, এবং ইহার বাঙ্গালা অনুবাদটি ভাল হয় নাই, স্থানে স্থানে ইংরাজির সঙ্গে ইহার প্রভেদ আছে, অতএব আমরা ইংরাজি বাঙ্গালা দুই পাঠাইলাম। ভরসা করি বঙ্গদর্শন কারক একবার আমাদিগের অনুরোধে ইংরাজির প্রতি বিরাগ ত্যাগ করিয়া ইংরাজিসমেত এই আইন প্রচার করিবেন। সকলেই দেখিবেন যে এই আইনটিতে নূতন কিছু নাই; সাবেক Lex Non Scripta কেবল লিপিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র।

শ্রীমতী অনন্তসুন্দরী দাসী
স্ত্রীস্বত্ব রক্ষণী সভার সম্পাদিকা।

THE MATRIMONIAL PENAL CODE.

CHAPTER I.

Introduction.

Whereas it is expedient to provide a Special Penal Code for the coercion of refractory husbands and others who dispute the supreme authority of Woman ; it is hereby enacted as follows ;

1. This Act shall be entitled the "Matrimonial Penal Code" and shall take effect on all natives of India in the married state.

CHAPTER II.

Definitions.

2. A husband is a piece of moving and moveable property at the absolute disposal of a woman.

Illustrations.

(a) A trunk or a workbox is not a husband, as it is not a moving though a moveable piece of property.

(b) Cattle are not husbands, for though capable of locomotion, they cannot be at the absolute disposal of any woman, as they often display a will of their own.

দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন।

প্রথম অধ্যায়।

স্ত্রীদিগের অবাধ্য স্বামী প্রভৃতির সুশাসনের জন্য এক বিশেষ আইন করা উচিত, এই কারণ নিম্নের লিখিত মত আইন করা গেল।

১ধারা। এই আইন "দাম্পত্য দণ্ড বিধির আইন" নামে খ্যাত হইবে। ভারতবর্ষীয় যে কোন দেশী বিবাহিত পুরুষের উপর ইহার বিধান খাটিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাধারণ ব্যাখ্যা।

২ধারা। কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন যে সচল অস্থাবর সম্পত্তি তাহাকে স্বামী বলা যায়।

উদাহরণ।

(ক) বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতিকে স্বামী বলা যায় না, কেননা যদিও সে সকল অস্থাবর সম্পত্তি বটে, তথাপি সচল নহে।

(খ) গোরু বাছুরও স্বামী নহে, কেননা যদিও গোরু বাছুর সচল বটে, কিন্তু তাহাদের একটু স্বেচ্ছামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং তাহারা কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন নহে।

(c) Men in the married state, having no will of their own, are husbands.

3. A wife is a woman having the right of property in a husband.

Explanation.

The right of property includes the right of flagellation.

4. "The married state" is a state of penance into which men voluntarily enter for sins committed in a previous life.

CHAPTER III.

Of Punishments.

5. The punishments to which offenders are liable under the provisions of this Code are ;

FIRST, Imprisonment,

Which may be either within the four walls of a bed-room, or within the four walls of a house.

Imprisonment is of two descriptions, namely,

(1) Rigorous, that is, accompanied by hard words.

(2) Simple.

SECONDLY, Transportation, that is to another bed-room.

(গ) বিবাহিত পুরুষেরাই স্বেচ্ছাধীন কোন কার্য্য করিতে পারেন না, এজন্য গোরু বাছুরকে স্বামী না বলিয়া তাঁহাদিগকেই স্বামী বলা যাইতে পারে।

৩ধারা। যে স্বামীর উপর যে স্ত্রীলোকের সম্পত্তি বলিয়া স্বত্ব আছে, সেই স্ত্রীলোক সেই স্বামীর পত্নী বা স্ত্রী।

অর্থের কথা।

সম্পত্তি বলিয়া যাহার উপর স্বত্বাধিকার থাকে, তাহাকে মারপিট করিবারও স্বত্বাধিকার থাকিবে।

৪ধারা। পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের জন্য পুরুষের প্রায়শ্চিত্ত বিশেষকে বিবাহ বলে।

তৃতীয় অধ্যায়।

দণ্ডের কথা।

৫ধারা। এই আইনের বিধান মতে অপরাধীদিগের নিম্নলিখিত দণ্ড হইতে পারে।

প্রথম। কয়েদ।

অর্থাৎ শয্যাগৃহের চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ অথবা বাটীর চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ।

কয়েদ দুই প্রকার।

(১) কঠিন তিরস্কারের সহিত।

(২) বিনা তিরস্কার।

দ্বিতীয়। শয্যান্তর প্রেরণ বা শয্যাগৃহান্তর প্রেরণ।

THIRDLY, Matrimonial servitude.

তৃতীয়। পত্নীর দাসত্ব।

FOURTHLY, Forfeiture of pocket-money.

চতুর্থ। সম্পত্তিদণ্ড, অর্থাৎ নিজ খরচের টাকা বন্ধ।

6. "Capital punishment" under this Code, means that the wife shall run away to her paternal roof, or to some other friendly house, with the intention of not returning in a hurry.

৬ধারা। এই আইনে "প্রাণদণ্ড" অর্থে বুঝাইবে, যে স্ত্রী বাপের বাড়ী কি ভাইয়ের বাড়ী চলিয়া যাইবেন, শীঘ্র আসিতে চাহিবেন না।

7. The following punishments are also provided for minor offences.

৭ধারা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য নিম্ন লিখিত দণ্ড হইতে পারে।

FIRST, Contemptuous silence on the part of the wife.

প্রথম। মান।

SECONDLY, Frowns.

দ্বিতীয়। ভ্রূকুটী।

THIRDLY, Tears and lamentations.

তৃতীয়। অশ্রুবর্ষণ বা উচ্চৈঃস্বরে রোদন।

FOURTHLY, Scolding and abuse.

চতুর্থ। গালি তিরস্কার।

CHAPTER IV.

General Exceptions.

চতুর্থ অধ্যায়।

সাধারণ বর্জ্জিত কথা।

8. Nothing is an offence which is done by a wife.

৮ধারা। স্ত্রী কৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

9. Nothing is an offence which is done by a husband in obedience to the commands of a wife.

৯ ধারা। স্ত্রীর আজ্ঞানুসারে স্বামিকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

10. No person in the married state shall be entitled to plead any other circumstances as grounds of exemption from the provisions of the Matrimonial Penal Code.

১০ধারা। ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ওজর করিয়া কোন বিবাহিত পুরুষ বলিতে পারিবেন না যে আমি দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনানুসারে দণ্ডনীয় নই।

CHAPTER V.

Of Abetment.

পঞ্চম অধ্যায়।

অপরাধের সহায়তার বিধি।

11. A person abets the doing of a matrimonial offence who

১১ধারা। যে কোন ব্যক্তি—

FIRST, Instigates, pursuades, induces, or encourages a husband to commit that offence.

প্রথম। অন্য ব্যক্তিকে কোন দাম্পত্য অপরাধ করিতে প্রবৃত্তি দেয়, বা উৎসাহিত বা উত্যুক্ত করে।

SECONDLY, Joins him in the commission of that offence, or keeps him company during its commission.

দ্বিতীয়। বা তৎসঙ্গে সেই অপরাধে লিপ্ত হয় বা সেই অপরাধ করার সময়ে তাহার সঙ্গে থাকে।

তবে বলা যায় যে ঐ ব্যক্তি ঐ অপরাধের সহায়তা করিয়াছে।

Explanation.

অর্থের কথা।

A man not in the married state or even a woman, may be an abettor.

অবিবাহিত পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোকও দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা করিতে পারে।

Illustrations.

উদাহরণ।

(a) A the husband of B, and C, an unmarried man, drink together. Drinking is a matrimonial offence, C has abetted A.

(ক) রাম, কামিনীর স্বামী। যদু অবিবাহিত পুরুষ। উভয়ে একত্রে মদ্যপান করিল। মদ্যপান একটি দাম্পত্য অপরাধ। যদু, রামের সহায়তা করিয়াছে।

(b) A the mother of B, the husband of C, persuades B to spend money in other ways than those which C approves.

A's spending money in such ways is a matrimonial offence, A has abetted B.

(খ) হরমণি, রামের মা। রাম কামিনীর স্বামী। কামিনী যেরূপে টাকা খরচ করিতে বলে সেরূপে খরচ না করিয়া রাম হরমণির পরামর্শে অন্য প্রকার খরচ করিল। স্ত্রীর অনভিমত খরচ করা একটি দাম্পত্য অপরাধ। হরমণি তাহার সহায়তা করিয়াছে।

12. When a man in the married state abets another man in the married state in a matrimonial offence, the abettor is liable to the same punishment as the principal. Provided that he can be so punished only by a competent court.

১২ধারা। যদি কোন বিবাহিত পুরুষ কোন দাম্পত্য অপরাধে অন্য বিবাহিত পুরুষের সহায়তা করে, তবে সে আসল অপরাধীর সঙ্গে সমান দণ্ডনীয়। কিন্তু তাহার দণ্ড উপযুক্ত আদালত নহিলে হইবে না।

Explanation.

A competent court means the wife having right of property in the offending husband.

অর্থের কথা।

ঐ ব্যক্তি যে স্ত্রীর সম্পত্তি, সেই স্ত্রীকেই উপযুক্ত আদালত বলা যায়।

13. Abettors who are females or male offenders not in the married state are liable to be punished only with scolding, abuse, frowns, tears and lamentations.

১৩ধারা। স্ত্রীলোক বা অবিবাহিত পুরুষ দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা করিলে তিরস্কার, ভ্রুকুটী, এবং অশ্রুবর্ষণ ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় মাত্র।

CHAPTER VI.

Of Offences against the State.

ষষ্ঠ অধ্যায়।

স্ত্রীবিদ্রোহিতার অপরাধ।

14. "The State" shall in this Code mean the married state only.

১৪ধারা। (অনুবাদক অক্ষম)

15. Whoever wages war against his wife or attempts to wage such war or abets the waging of such war shall be punished capitally, that is by separation, or by transportation to another bed-room and shall forfeit all his pocket money.

১৫ধারা। যে কেহ স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করে, কি বিবাদ করিতে উদ্যোগ করে, কি বিবাদ করার সহায়তা করে, তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে (অর্থাৎ স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করিবেন) বা শয্যা-গৃহ পৃথক্ হইবে এবং তাঁহার খরচের টাকা জব্দ হইবে।

16. Whoever induces friends or gains over children to side with him or otherwise prepares to wage war with the intention of waging war against the wife shall be punished by transportation to another bed-room and shall also be liable to be punished with scolding and with tears and lamentations.

১৬ধারা। যে কেহ বন্ধুবর্গকে মুরুব্বি ধরিয়া বা সন্তানদিগকে বশীভূত করিয়া বা অন্য প্রকারে স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিবার অভিপ্রায়ে বিবাদের উদ্যোগ করে, সে শয্যাগৃহান্তরে প্রেরিত হইবে, এবং তিরস্কার, অশ্রুবর্ষণ এবং রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে।

17. Whoever shall render allegiance to any woman other than his wife shall be guilty of incontinence.

১৭ধারা। যে কেহ আপন স্ত্রী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত, তাহার অপরাধের নাম লাম্পট্য।

Explanation.

অর্থের কথা।

1. To show the slightest kindness to a young woman who is not the wife is to render such young woman allegiance.

প্রথম। স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি কিছুমাত্র দয়া বা আনুকূল্য করিলেই লাম্পট্য গণ্য হইবে।

Illustration.

উদাহরণ।

A is the husband of B, and C is a young woman. A likes C's baby because he is a nice child and gives him buns to eat. A has rendered allegiance to C.

রাম কামিনীর স্বামী। বামা অন্য এক যুবতী। বামার শিশু সন্তানটি দেখিতে সুন্দর বলিয়া, রাম তাহাকে আদর করে বা তাহার হাতে মিঠাই দেয়। রাম বামার প্রতি আসক্ত।

Explanation.

অর্থের কথা।

2. Wives shall be entitled to imagine offences under this section, and no husband shall be entitled to be acquitted on the ground that he has not committed the offence.

দ্বিতীয়। স্বামীদিগকে নিষ্কারণে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করা, স্ত্রীলোকদিগের অধিকার রহিল। আমি এ অপরাধ করি নাই বলিয়া কোন স্বামী খালাস পাইতে পারিবে না।

The simple accusation shall always be held to be conclusive proof of the offence.

"অপরাধ করিয়াছ" বলিলেই এ অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে।

Explanation.

3. The right of imagining offences under this section shall be held to belong in general to old wives, and to women with old and ugly husbands ; and a young wife shall not be entitled to asume the right unless she can prove that she has a particularly cross temper, or was brought up a spoilt child or is herself supremely ugly.

অর্থের কথা।

তৃতীয়। নিষ্কারণে স্বামিগণকে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করিবার অধিকার, প্রাচীনা স্ত্রীদিগের পক্ষে বিশেষ রূপে বর্ত্তিবে, অথবা যাহাদিগের স্বামী কুৎসিত বা প্রাচীন, তাহাদিগের পক্ষে বর্ত্তিবে। যদি কোন যুবতী স্ত্রী এ অধিকার চাহেন, তবে তাঁহাকে অগ্রে প্রমাণ করিতে হইবে, যে তিনি নিজে বদমেজাজি, বা আদুরে মেয়ে, বা তিনি নিজে কদাকারা।

18. Whoever is guilty of incontenence shall be liable to all the punishments mentioned in this Code and to other punishments not mentioned in the Code.

১৮ধারা। যে কেহ লম্পট হইবে সে এই আইনের লিখিত সকল প্রকার দণ্ডের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে এবং তাহার অন্য দণ্ডও হইতে পারিবে।

CHAPTER VII.

Of offences relating to the Army and Navy.

সপ্তম অধ্যায়।

পল্‌টন্ এবং নাবিকসেনা সম্বন্ধীয় অপরাধ।

19. The army and navy shall in this Code mean the sons and the daughters and daughters-in-law.

১৯ধারা। এ আইনে পল্‌টন্ অর্থে ছেলের দল ; নাবিক সেনা ঝি বউ।

20. Whoever abets the committing of mutiny by a son or a daughter or a daughter-in-law shall be liable to be punished by scolding and tears and lamentations.

২০ধারা। যে স্বামী, পুত্র বা কন্যা বা বধূকর্ত্তৃক গৃহিণীর প্রতি বিদ্রোহিতার সহায়তা করিবে, সে তিরস্কার ও অশ্রুপাত ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে।

CHAPTER VIII.

Of offences against the Domestic Tranquillity.

অষ্টম অধ্যায়।

গৃহমধ্যে শান্তিভঙ্গনের অপরাধ।

21. An assembly of two or more husbands is designated an unlawful assembly if the common object of such husbands is,

২১ধারা। দুই কি তাহার অধিক বিবাহিত ব্যক্তির জনতা হইলে যদি জনতাকারীদের নিম্নের লিখিত কোন অভিপ্রায় থাকে তবে "বে-আইন মতের জনতা" বলা যায়।

FIRST, To drink as defined below or to gamble or to commit any other matrimonial offence.

প্রথম। যদি মদ্যপান করা কি অন্য প্রকার দাম্পত্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায় থাকে,

SECONDLY, To overawe by show of authority their wives from the exercise of the lawful authority of such wives.

দ্বিতীয়। যদি আস্ফালন দ্বারা পত্নীদিগকে আইন মত ক্ষমতা প্রকাশ করণে নিবৃত্ত করার জন্য ভয় প্রদর্শন করার অভিপ্রায় থাকে,

THIRDLY, To resist the execution of a wife's order.

তৃতীয়। যদি কোন স্ত্রীর আজ্ঞামত কর্ম্মের প্রতিবন্ধক হইবার অভিপ্রায় থাকে।

•

22. Whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished by imprisonment with hard words and shall also be liable to contemptuous silence or to scolding.

২২ধারা। যে কেহ "বেআইন মতের জনতার ব্যক্তি" হয়, সে কঠিন তিরস্কারের সহিত কয়েদ হইবে, অথবা মান অথবা তিরস্কারের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে।

OF DRINKING WINE AND SPIRITS.

মদ্যপানের কথা।

23. Any liquid kept in a bottle and taken in a glass vessel is wine and spirits.

২৩ধারা। যে কোন জলবৎ দ্রব্য বোতলে থাকে, এবং কাচের পাত্রে পীত হয় তাহা মদ্য।

24. Whoever has in his possession wine and spirits as above defined is said to drink.

২৪ধারা। উক্তরূপ মদ্য যে ঘরে রাখে সেই মদ্যপায়ী।

Explanation.

He is said to drink even though he never touch the liquid himself.

অর্থের কথা।

সে ঐ দ্রব্য স্বহস্তে স্পর্শ না করিলেও মদ্যপায়ী।

25. Whoever is guilty of drinking shall be punished with imprisonment of either description within the four walls of a bed-room during the evening hours and shall also be liable to scolding.

২৫ধারা। যে মদ্যপায়ী সে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শয্যাগৃহের চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ থাকিবে, এবং তিরস্কার প্রাপ্ত হইবে।

Of Rioting.

26. Whoever shall speak in an ungentle voice to his wife shall be guilty of domestic rioting.

27. Whoever is guilty of domestic rioting shall be punished by contemptuous silence or by scolding or by tears and lamentations.

(To be continued.)

হাঙ্গামার কথা।

২৬ধারা। যে কেহ স্ত্রীর প্রতি কর্কশ স্বরে কথা কহে, সে হাঙ্গামা করে।

২৭ধারা। যে কেহ গৃহমধ্যে হাঙ্গামা করিবে, তাহার সাজা মান বা তিরস্কার বা অশ্রুবর্ষণ ও রোদন।

ক্রমশঃ

"নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিঃ প্রতিভেত্যুচ্যতে।"

ভূমণ্ডলে যে সকল লোকে প্রাধান্য লাভ করেন, তাঁহাদিগকে দুইদলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল পুরাতন জ্ঞান ও কার্য্যপ্রণালীতে পরিণত, অপর দল নূতন পথদর্শী। একদল অন্য নির্দ্দিষ্ট বর্ত্মে বিলক্ষণ দক্ষতা দেখাইতে পারেন, অপর দল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন গড়িতে বা অভিনব প্রকার সৃষ্টি বা আবিষ্কার করিতে পারেন। প্রথমোক্তদিগকে দক্ষ বা পারদর্শী, এবং শেষোক্ত-দিগকে প্রতিভাশালী বলা যায়।

কেহ কেহ অন্যনির্ম্মিত কল দেখিয়া তদনুরূপ গড়িতে পারেন; অন্যাবিষ্কৃত তত্ত্ব স্মরণ রাখিতে পারেন; অন্যোদ্ভাবিত ভাবে অলঙ্কৃত হইতে পারেন, কিন্তু নূতন কল নির্ম্মাণ, নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার, বা নূতন ভাবের উদ্ভাবন, তাঁহাদিগের শক্তি-সাধ্য নহে। এরূপ লোকে কার্য্যক্ষম, বিজ্ঞানবিৎ, বা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তাঁহাদিগকে দক্ষ বা পারদর্শী বলা যাইবে, কিন্তু প্রতিভাশালী বলা যাইবে না। তাঁহারা ভগবানের পালনশক্তি পাইয়াছেন, কিন্তু বিধাতার সৃষ্টি-শক্তিতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। আদ্যন্ত রামায়ণ যাঁহার কণ্ঠস্থ, এবং কথাবার্ত্তায় ও লিখনপঠনে যিনি রামায়ণের শ্লোক উদ্ধৃত করিতে পারেন, তিনি যত কেন ক্ষমতাপন্ন হউন না তাঁহার ঈদৃশ দক্ষতা আদিকবি বাল্মীকির নূতন ব্রহ্মাণ্ড সৃজনকারিণী প্রতিভা হইতে কত বিভিন্ন!

পূর্ব্বকালে প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেবানুগৃহীত বলিয়া গণ্য হইতেন। তখন লোকের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে প্রতিভা শিক্ষানিরপেক্ষ দেবদত্তশক্তি। এই প্রত্যয়ের সাহায্যে অন্ধকারময় অতীতকাল ভেদ করিতে গিয়া রঙ্গময়ী কল্পনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে দুরাচার জ্ঞানহীন দস্যু রত্নাকর ব্রহ্মার বরে ভাবরত্নাকর বাল্মীকি, এই বিশ্বাসের বলেই জনশ্রুতি প্রচার করিয়াছেন, যে, শকুন্তলা প্রণেতা কালিদাস প্রথমে মহামূর্খ ছিলেন, পরে বিদ্যাবতী রমণীর পদাঘাতে অভিমানে

কানন প্রবেশ করিয়া সরস্বতীর প্রসাদে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতচূড়ামণি হইয়া গৃহ প্রত্যাগমন করেন। কেবল ভারতবর্ষে নহে, অন্যান্য দেশেও ঈদৃশ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডীয় পুরাতন পুরাবিৎ বিডি সাহেব বলেন যে প্রসিদ্ধ সাক্সন্ কবি সিড্‌মন্ প্রথমে এমন সঙ্গীত রসাস্বাদবিহীন ছিলেন যে গান শুনিলেই বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাইতেন, পরে স্বপ্নাদেশ বশতঃ তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য গীতিশক্তি জন্মে। যদিও ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে এপ্রকার আকস্মিক দৈবশক্তির আবির্ভাব অপ্রামাণ্য ও অনৈসর্গিক, তথাপি প্রতিভা যে দেবদত্তশক্তি, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। সৃষ্টিকর্ত্তা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দিয়াছেন। একজন হয়ত গণিত বুঝিতে পারিবে না, সাহিত্য রসপান করিতে পারিবে। অপর কেহ বা সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনিয়া অম্লানমুখে বলিবে "ইহাতে ত কিছুরই উপপত্তি হইল না।" কেহ হয়ত একখানি চিত্র দেখিয়া মোহিত হইবে, সঙ্গীতের মনোহর তান বিরক্তিকর ভাবিবে। কেহ বা সুরম্য চিত্রপট অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া গীতিসাগরে নিমগ্ন হইবে। কেহ প্রফুল্ল কুসুমোদ্যান পরিত্যাগ করিয়া বিজন বন্য শৈলময় প্রদেশ ভাল বাসিবে; কেহ বা তরু লতাশূন্য বন্ধুর গিরি কষ্টকর বোধ করিয়া প্রসূন পরিপূরিত বল্লরীপল্লববিভূষিত নিকুঞ্জে মনস্তুষ্টি সাধনার্থে আশ্রয় লইবে। কেহ চিন্তাশীল, কার্য্যে অপটু। কেহ বা কার্য্যদক্ষ, চিন্তায় অপটু। এইরূপ স্বাভাবিক শক্তিভেদ যে প্রতিভার মূল, তাহার সন্দেহ নাই। নতুবা আমি, তুমি, সকলেই কালিদাস বা আর্য্যভট্ট, সেক্সপিয়র বা নিউটন, হইতে পারিতাম।

প্রতিভা যদিও আমাদিগের মতে স্বাভাবিকীশক্তি, তথাপি আমরা এরূপ বলিনা যে ইহা শিক্ষানিরপেক্ষ। যদি কেহ আপনাকে প্রতিভাশালী মনে করেন, তিনি যেন স্বপ্নেও ভাবেন না, "আমি শিক্ষাব্যতিরেকেই বড়লোক হইব।" সকল প্রকার উন্নতিই পরিশ্রমসাপেক্ষ। যত্নশীলই রত্নলাভে অধিকারী। যে সেক্সপিয়র "কল্পনার পুত্র" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, যাঁহাকে লোকে অনেক দিন ধরিয়া অশিক্ষিত ভাবিয়া আসিয়াছে, তাঁহার নাটকনিচয় পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে তিনি তাৎকালিক অনেক ইংরাজি গ্রন্থ পাঠ ও বহুবিধ নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন এবং আইন ও লাটিন ভাষায় তাঁহার অনেকদূর ব্যুৎপত্তি ছিল। যে কালিদাস "সরস্বতীর বরপুত্র," তিনিও অধ্যয়নশূন্য ছিলেন না। তিনি মেঘদূতে ভঙ্গীক্রমে যে নিচুলের উল্লেখ করিয়াছেন, মল্লিনাথ তাহাকে কালিদাসের সহাধ্যায়ী বলেন। পূর্ব্বমেঘের ১৪ শ্লোকে লিখিত আছে,

"স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্‌মুখঃ খং
দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্‌স্থূলহস্তাব লেপান্

ইহার সামান্য অর্থ এই যে "পথে দিগ্‌হস্তীদিগের শুণ্ডাঘাত পরিহার করিয়া এই সরস বেত্রশোভিত স্থান হইতে উত্তর মুখে আকাশে উঠ।"

মল্লিনাথ বলেন "অত্র ইদমপি অর্থান্তরং ধ্বনয়তি। রসিকোনিচুলো নাম মহাকবিঃ কালিদাসস্য সহাধ্যায়ঃ পরাপাদিতানাং কালিদাসপ্রবন্ধদূষণানাং পরিহর্ত্তা যস্মিন্ স্থানে তস্মাৎ স্থানাৎ উদঙ্‌মুখো নির্দ্দোষত্বাৎ উন্নতমুখঃ সন্ পথি সারস্বত মার্গে দিঙ্‌নাগানাং পূজায়াং বহুবচনং দিঙ্‌নাগা চার্য্যস্য কালিদাসপ্রতিপক্ষস্য হস্তাবলেপান্ হস্তবিন্যাসপূর্ব্বকানি দূষণানি পরিহরন্ খং উৎপত উচ্চৈর্ভব। ইতি স্বপ্রবন্ধং আত্মানং বা প্রতি কবেরুক্তিরিতি।"

"এখানে এই অর্থান্তর ধ্বনি আছে। রসিক নিচুল নাম মহাকবি কালিদাসের সহাধ্যায়ী এবং কালিদাসের লেখায় বিপক্ষারোপিত দোষের পরিহর্ত্তা। রসিক নিচুল যে স্থানে আছেন, সে স্থান হইতে নির্দ্দোষত্ব হেতু উন্নত মুখ হইয়া, সারস্বত ব্যাকরণ নির্দ্দিষ্ট মার্গে প্রতিপক্ষ দিঙ্‌নাগাচার্য্যের হস্তবিন্যাস পূর্ব্বক দূষণ পরিহার করিয়া, উচ্চ (অর্থাৎ প্রধান) হও। ইহা কবি স্বপ্রবন্ধকে বা আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।"

রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, প্রভৃতির রচয়িতা যে রামায়ণ মহাভারত, ও পুরাণাদি পড়িয়াছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য। তিনি যে অন্যান্য লেখকের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, রঘুবংশের প্রারম্ভে ইহার আভাসও দিয়াছেন ; যথা,

অথবা কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেহস্মিন্ পূর্ব্ব সূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥ ৪। ১ম সর্গঃ।

অথবা সূত্র যেমন হীরকাদিকৃত ছিদ্রপথে মণিমধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি পূর্ব্ব পণ্ডিতগণকৃত বাক্যদ্বার দিয়া এই বংশে প্রবেশ করিব।

জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামে একখানি জ্যোতিষগ্রন্থও কালিদাসের নামে চলিয়া আসিতেছে। তিনি যে চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির কারণ জানিতেন, রঘুবংশে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে ; যথা,

পিতুঃ প্রযত্নাৎ স সমগ্র সম্পদঃ
শুভৈঃ শরীরাবয়বৈর্দিনে দিনে।
পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্ব দীধিতে
রনুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমা॥

সূর্য্যকিরণ প্রবেশে বাল চন্দ্রের ন্যায় সমগ্রসম্পদসম্পন্ন পিতার প্রযত্নে তাঁহার শরীরাবয়ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে কবির সাংখ্যদর্শনে বুৎপত্তি ছিল। অতএব কালিদাস যে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। যদি কালিদাস ও সেক্ষপিয়র অশিক্ষিত না হইলেন, তবে আমরা এক প্রকার ধরিয়া লইতে পারি যে শিক্ষা ব্যতিরেকে কেহই বড় লোক হইতে পারেন না। শিক্ষার স্থল অনেক বিদ্যালয়, গ্রন্থ, মনুষ্যসমাজ, বাহ্য জগৎ। ইহার মধ্যে কেহ একটী, কেহ অপরটী হইতে বিশেষ সাহায্য পান। কিন্তু যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন না করিলে কোনটী হইতে পর্য্যাপ্ত উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

অপর পক্ষে, কেহ কেহ বা শিক্ষার অমৃতময় ফল সন্দর্শন করিয়া এমন মোহিত হন, যে তাঁহারা প্রতিভাকে স্বাভাবিকী শক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদিগের মতে, প্রতিভা অভ্যাস বা মনোযোগ মাত্র। তাঁহারা বলেন যে, "যে কার্য্য কোন ব্যক্তি বারম্বার করে, বা যে বিষয়ে অধিক মনোযোগ দেয়, তাহাতেই তাহার এক প্রকার বিশেষ ক্ষমতা জন্মে—উহাকে প্রতিভা কহে; বাস্তবিক, সৃষ্টিকর্ত্তা যে কাহার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া তাহাকে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন, ইহা সম্ভব নহে।"

এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, বৈষম্যই সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। যদি বল কৃত্রিম সমাজবন্ধনের দোষেই ধন, মান, বিদ্যার ইতর বিশেষ লোক-সমাজে ঘটিয়া থাকে, সৌন্দর্য্য, বল ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে সে কথা খাটিবে না, কেহ সবল, কেহ দুর্ব্বল ; কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত ; কেহ সুস্থ, কেহ পীড়িত ; এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেহ লইয়া জন্মপরিগ্রহ করেন। কেহ অঙ্গহীন, বিকলেন্দ্রিয়, বা ইন্দ্রিয়বিশেষশূন্য। কেহ অন্ধ, কেহ খঞ্জ, কেহ বধির বা রসনাহীন। কেহ চক্ষে কম দেখে, কেহ বা বর্ণ বিশেষের উপলব্ধি করিতে পারে না। ঈদৃশ শারীরিক অবস্থাভেদ যখন মনুষ্যসমাজে দৃষ্ট হইতেছে, তখন মানসিক শক্তিভেদও যে লক্ষিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাস্তবিক একটি মানুষও আর একটী মানুষের মত নহে ; লক্ষ লোকের মধ্য হইতেও আমরা পরিচিত ব্যক্তিকে চিনিয়া লইতে পারি। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই বাহ্যাকৃতিগত বৈলক্ষণ্য আছে। যদি বাহ্যিক প্রভেদ থাকিল, আন্তরিক কেন না থাকিবে? যদি এক স্থলে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্বের উল্লেখ না করি, অপর স্থলেই বা কেন করিব? সামান্য কথায় ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করা অন্যায়। আমরা সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায়, কিছু মাত্র বুঝি না। কোন কালে বুঝিতে পারিব, তাহারও সম্ভাবনা দেখি না। যতদূর আমরা যাহা জানিতে পারি, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। অপরিজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞেয় বিশ্ব-কারণের নিগূঢ় অভিসন্ধি ভেদ করিতে যাওয়া আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীবের

পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। নৈসর্গিক নিয়মাতিরিক্ত কল্পনাপ্রদর্শিত কুটিল পথে ভ্রমণ করিতে গেলে যে পদে পদে পদস্খলন হইবে, ইহা বিচিত্র নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক, প্রতিভা অভ্যাসমাত্র, এই মতটি কতদূর সুসঙ্গত। যদি আমি তুমি কবিতা লিখিতে অভ্যাস করি, তাহা হইলে কি কালিদাস হইতে পারিব? অনেক পদ্যলেখক আছেন, যাঁহারা ছন্দোগ্রন্থনে পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কজন কবি? ভট্টিকারও বৈয়াকরণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারেন, কিন্তু কে তাঁহাকে রঘুবংশরচয়িতার সহিত তুলনা করিবে? তিনি বিলক্ষণ পদ্য লিখিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্ব কতদূর প্রকাশ পাইয়াছে?

অভ্যাসের প্রকৃতি বিবেচনা করিলে, এ বিষয়ের মীমাংসা সহজ হইবে। অভ্যাস কার্য্যসমষ্টিজাত। একটী কার্য্য বারম্বার সম্পাদন করিলে তৎসম্পাদন পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পায়াসসাধ্য হয়, এবং তৎপক্ষে প্রবল প্রবৃত্তি ও দক্ষতা জন্মে। যে বারম্বার অনুষ্টুপ লিখে, সে সহজে অনুষ্টুপ লিখিতে পারিবে, কিন্তু বাল্মীকি হইতে পারিবে না। যে বারম্বার দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করে সে সহজে দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে, কিন্তু গালিলিও হইতে পারিবে না। অভ্যস্তবিদ্যা পুরাতনাতিরিক্ত হইতে পারে না। লোকে যাহা করিয়াছে, অভ্যাস দ্বারা তাহাতেই পারদর্শী হওয়া যায়। কিন্তু যে নূতন সৃষ্টি প্রতিভার অন্তরাত্মাস্বরূপ, তাহা অভ্যাস কোথা পাইবে? আমি ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি বা নিউটনের প্রিন্সিপিয়া (Princepia) অভ্যাস করিতে পারি। কিন্তু তাদৃশ অভ্যাস দ্বারা তাঁহাদিগের নিরূপিত তত্ত্বগুলিই জানিতে পারিব, অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে পারিব না।

যাঁহারা বিবেচনা করেন, প্রতিভা মনোযোগ মাত্র, তাঁহাদিগেরও বিষম ভ্রম। যে বিষয়ে যে পরিমাণে মনোনিবেশ করা যায়, সে বিষয়ের সেই পরিমাণে স্মরণ থাকে। কিন্তু স্মরণ দ্বারা পূর্ব্বপরিচিত তত্ত্বের পুনরুদ্ধার হয়, নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হয় না। সুতরাং প্রতিভার যেটী প্রধান লক্ষণ, মনোযোগে সেটী নাই। কাজেকাজেই প্রতিভাকে মনোযোগমাত্র বলা যাইতে পারে না।

যদিও মনোযোগ বা অভ্যাস প্রতিভার অঙ্গস্বরূপ নহে, তথাপি তাহারা প্রয়োজনীয় সহকারী। যিনি কোন বিষয়ের নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিতে চাহেন, তাঁহার তদ্বিষয়ক পুরাতন তত্ত্বগুলি জানা আবশ্যক। পুরাতন তত্ত্ব সংগ্রহ জন্য মনোযোগ ও অভ্যাসের প্রয়োজন। এইরূপ পুরাতন তত্ত্ব সংগ্রহই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এ জন্যই আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে প্রতিভা শিক্ষানিরপেক্ষ নহে। কিন্তু যাঁহারা ঈদৃশ শিক্ষাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহারা প্রাচীন বিদ্যায় পারদর্শী; প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের অভিনব তত্ত্বমন্দিরে প্রবেশের অধিকার নাই।

পূর্ব্বে এক প্রকার প্রতিপাদিত হইয়াছে, যে প্রতিভা স্বাভাবিকশক্তি এবং তাহার বিশেষ কার্য্য নূতন সৃষ্টি বা আবিষ্ক্রিয়া। এক্ষণে দেখা যাউক, মনোবিজ্ঞান দ্বারা এতৎসম্বন্ধে কোন মীমাংসা করা যায় কি না।

ভাবুকের মনে নূতন ভাবের উদয়ই নূতন সৃষ্টি বা আবিষ্ক্রিয়ার মূল। প্রজাদিগের সন্তোষসাধনার্থে চিরদিনের জন্য আত্মসুখবিসর্জ্জনও রাজার কর্ত্তব্য, কবির চিত্তে এই মহদ্ভাবের সঞ্চার হইতেই সীতার বনবাসের সৃষ্টি। পতনশীল ফল ও গগনচর জ্যোতিষ্কগণের গতি একই প্রকার, নিউটনের মনে এই নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতেই মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কার।

ভাবের উদয় উদ্বোধনের নিয়মাধীন। উদ্বোধন দুই প্রকার সন্নিকর্ষজাত ও সাদৃশ্যজাত; একটি পদার্থ মনে পড়িলে, তৎসমীপস্থ বা তৎসদৃশ পদার্থ মনে পড়ে। যদি কলিকাতার "ইডেন পার্ক" মনে কর, তবে সন্নিকর্ষ বশতঃ গড়ের মাঠ, গড়, গঙ্গা, হাইকোর্টের বাটী, বা টাউনহল মনে পড়িতে পারে; অথবা সাদৃশ্য বশতঃ ইন্দ্রের নন্দন কানন হৃদয়াকাশে প্রতিভাসিত হইতে পারে। হিমালয় পর্ব্বত শব্দটী শুনিয়া কাহার মনে তত্রস্থ তুষার রাশি উদিত হইবে, কাহার মনে বা উন্নত প্রাচীর কিম্বা বায়ুসাগরস্থ হিমাদ্রিবৎ নীলাম্বুরাশি মধ্যস্থ দীপমালা। একটি ফুলের কথা বলিলে, কেহ তাহার গন্ধ বর্ণ বা আকার, কেহ বালকের মুখ, যুবতীর যৌবন বা আকাশের নক্ষত্র, ভাবিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে এইরূপ সন্নিকর্ষ বা সাদৃশ্যবশতঃ অনুক্ষণ আমাদিগের অন্তঃকরণে একভাব হইতে ভাবান্তর উপস্থিত হইতেছে। চিন্তাস্রোত অবিরাম বহিতেছে; সহসা দেখিলে বোধ হয় যেন গতির স্থিরতা নাই, কখন এদিকে কখন ওদিকে কখন সেদিকে যাইতেছে। মনোনিবেশ কর, দেখিবে দুইপাশে দুইটি অনতিক্রম্য তীর সন্নিকর্ষ ও সাদৃশ্য; উভয়ের মধ্য দিয়াই স্রোতের গতি, উভয়ের আঘাতেই স্রোতের বিচিত্রতা।

যদিও মনুষ্যমন উপরিনির্দ্দিষ্ট উভয়বিধ উদ্বোধনেরই রঙ্গভূমি, তথাপি সাধারণ লোকের অন্তঃকরণে সন্নিকর্ষজাত উদ্বোধনই প্রবল। কোন একটী ঘটনা মনে পড়িলে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী পার্শ্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী সমীপস্থ ঘটনার প্রতি তাহাদিগের যেমন দৃষ্টি পড়ে, তৎসদৃশ ঘটনার প্রতি তেমন পড়ে না। অগ্নি বলিলে দাহন, জল বলিলে অগ্নিনির্ব্বাণ, গো বলিলে দুগ্ধ, তাহাদিগের মনে পড়িবে; কেননা অগ্নিসন্নিকর্ষে দাহন, জলসন্নিকর্ষে অগ্নিনির্ব্বাণ, গোসন্নিকর্ষে দুগ্ধ, তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কিন্তু সাদৃশ্য জন্য সূর্য্য, পারদ, ও মহিষ তাহাদিগের স্মরণে আসিবে না। তথাপি অগ্নিতে দাহন ঘটে, জলে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, গো দুগ্ধদাত্রী, ইত্যাদি লৌকিক জ্ঞান জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থে এত প্রয়োজনীয়, যে জনসমাজে

সন্নিকর্ষজাত উদ্বোধনের প্রবলতাকে আমরা দোষ বিবেচনা করি না; বরঞ্চ সাংসারিক কার্য্যসম্বন্ধে ইহার মহোপকারিতা স্বীকার করি।

কাহার কাহার মনে সাদৃশ্যজাত উদ্বোধনই প্রবল। কোন একটি পদার্থ জ্ঞানগোচর হইলে, তৎসদৃশ বস্তুর প্রতি তাঁহাদিগের চিত্ত সবেগে ধাবিত হয়। তাঁহারাই প্রতিভাশালী। তাঁহারাই অনন্যদৃষ্ট সাদৃশ্য নির্ণয় করিতে সক্ষম বলিয়া আবিষ্কার বা সৃষ্টিকার্য্যে অধিকারী। কি বিজ্ঞানবিৎ, কি কবি, কি শিল্পী, সকলের প্রতিভার মূলেই এই সাদৃশ্যোদ্ভেদশক্তি লক্ষিত হয়। ভূপৃষ্ঠে পতনশীল পদার্থের গতি গগনচর জ্যোতিষ্কমণ্ডলগণের গতি তুল্য, ইহাই দেখিতে পাইয়া নিউটনের এত গৌরব। উপমাবলেই কালিদাস জগদ্বিখ্যাত। সদৃশভাব ব্যঞ্জক শব্দ বা বস্তুবিন্যাস দ্বারা কবি বা শিল্পিকুল রস বিশেষের অবতারণা করিয়াই তাঁহাদিগের অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান করেন।

সাদৃশ্য নির্ণয়শক্তি সকলেরই কিয়ৎপরিমাণে আছে। কিন্তু সাধারণ লোকে স্থূল সাদৃশ্যই দেখিতে পায়। একটী গোলাপ দেখিয়া তাহাকে পুষ্পশ্রেণীতে ফেলিতে পারে, একটী ঘোড়া দেখিয়া তাহাকে চতুষ্পদ শ্রেণীতে ফেলিতে পারে, ইত্যাদি। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ অন্যের নিকট বিসদৃশ প্রতীয়মান পদার্থ নিচয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিতে পান। যে সকল গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু বা নক্ষত্র জ্যোতির্ম্ময় রূপ দ্বারা নীলাকাশ অলঙ্কৃত করিয়া অজস্র বেগে ধাবিত হইতেছে, তাহাদিগের গতি যে বৃক্ষচ্যুত ফল বা হস্তচ্যুত প্রস্তরের ন্যায় একই নিয়মের অধীন, ইহা বুঝিতে পারা সামান্য শক্তির কর্ম্ম নয়।

সাদৃশ্য নির্ণয়শক্তি প্রতিভার মূল হইলেও সকলের প্রতিভা সকলদিকে সঞ্চালিত হইতে পারে না। কেহ সাধারণতত্ত্বের পক্ষপাতী; তিনি বিজ্ঞানবিৎ বা দর্শনবিৎ হইতে পারেন। কেহ বা বিশেষ বিশেষ পদার্থের মূর্ত্তি স্মৃতিপথে জাজ্বল্যমান রাখিতে সক্ষম; তিনি চিত্রকর হইতে পারেন। কেহ চিন্তাবেগোদ্ভূত ভাবের অধীন; তিনি রসোদ্দীপক কবি বা শিল্পী হইতে পারেন। কেহ বা বিবিধ রাগসম্ভূত স্বরভঙ্গী নির্ব্বাচনে নিপুণ; তিনি গায়ক হইতে পারেন। কেহ এইরূপ একাধিক শক্তিবিশিষ্ট হইতে পারেন।

প্রতিভার উল্লিখিত প্রকার প্রভেদ কিরূপে উৎপন্ন হয়, নির্ণয় করা কঠিন। উহা বংশানুগত হইতে পারে। বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গির, সাহজেহান, আরঙ্গজেব, সকলেই যোদ্ধা ছিলেন; সেইরূপ ফিলিপ ও আলেকজণ্ডর, হ্যামিল্কার ও হ্যানিবল; সেইরূপ আমাদিগের দেশীয় রাজপুতগণ। সেইরূপ বিদ্যাবিষয়ে জেম্‌স্ মিল ও জনষ্টুয়ার্ট মিল, স্যর উইলিয়ম হর্শেল, ও সর জন হর্শেল, ইত্যাদি। এইরূপ কারণেই বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক কল্পনাপ্রিয় বা তত্ত্বানুসন্ধায়ী,

চিন্তাশীল বা কার্য্যক্ষম, দার্শনিক বা শিল্পী, ইত্যাদি। প্রতিভা যে বংশানুগত গ্যাল্‌ট সাহেব* ইহার অনেক প্রমাণ দিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এ প্রবন্ধে সে সকল উদ্ধৃত হইল না।

যিনি যে প্রকার শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করুন না কেন, উপযোগী অবস্থায় পতিত না হইলেই তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইতে পারে না। একটী সতেজ বৃক্ষও ছায়ায় প্রোথিত করিলে, তাহা সূর্য্যকিরণাভাবে হতশ্রী ও নিস্তেজ হইয়া যায়। প্রকৃতি বিরুদ্ধ ঘটনাসমূহে সমাবৃত হইলে, স্বাভাবিক তেজস্বিতা অন্তর্হিত হয়। প্রতিকূল সংসর্গে বিপদেরই সম্ভাবনা। এজন্যই আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রতিভার বিকাশ নিমিত্ত অনুকূল শিক্ষার প্রয়োজন।

---

* See Galton on Hereditary Genius.

চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে "জুমিয়া" নামক এক প্রকার অসভ্য মগ জাতি আছে। ইহারা "কুকি" বা "লুসাই" দিগের ন্যায় ততদূর হিংস্র জন্তুর মধ্যে পরিগণিত নহে, অথচ বাঙ্গালিদের ন্যায় ততদূর সভ্য নহে। ইহারা বৎসর বৎসর বাসস্থান পরিবর্ত্তন করে; যে বৎসর যেখানে অবস্থিতি করিবে, স্ত্রী পুত্র একত্র হইয়া সেইখানের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, তাহাকে আগুন দিয়া একপ্রকার খাণ্ডব-দাহন করিয়া ফেলে। পরে ধামার (একপ্রকারের কাটারি বিশেষ) দ্বারায় ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া এক গর্ত্তে, আলু, কচু, তরমুজ প্রভৃতি নানাবিধ বীজ রোপণ করে। পর্ব্বতের এমনই উর্ব্বরা শক্তি যে, ইহাতেই প্রচুর পরিমাণে ফসল হইয়া থাকে। কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি ইহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম আছে, এমন কি, একদিনের তরেও তাহাদের কখন মুখ ম্লান হয় না। একত্রে শয়ন, একত্রে ভ্রমণ, একত্রে আহার, এমন কি যেন দুই কলেবরে এক জীবন বলিয়া বোধ হয়। ইহারা স্বাধীন, সম্প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহাদের উপর রাজ্যস্থাপন করিয়া তাহাদিগকে সভ্য করিতেছেন।

১

নিবিড় কানন; নেত্র যে দিকে ফিরাই,
অনন্ত পাদপ শ্রেণী, লতা গুল্ম বন;
অভ্রভেদী গিরি শিরে,
কিবা নীল নদীতীরে,
জলে, স্থলে, কি গহ্বরে—নিবিড় কানন।

২

ব্যাপিয়া নয়ন পথ পর্ব্বত লহরী,
উত্থিত আকাশে, এই পাতালে পতিত,
এইরূপে উঠে পড়ে,
নর ভাগ্য চিত্র করে,
দূরে নীল মেঘে নেত্র করে প্রতারিত।

৩

গম্ভীর প্রকৃতি মূর্ত্তি; মহীরুহ চয়,
বিজন গম্ভীর ভাবে আছে দাঁড়াইয়া,
দীর্ঘ শাখা প্রসারিয়া,
গিরি শৃঙ্গ আবরিয়া,
শ্যামল পল্লবে মরি! নয়ন রঞ্জিয়া।

৪

শ্যামল পল্লবময় চন্দ্রাতপ তলে,
নিদাঘ মধ্যাহ্নতাপে, কুরঙ্গিণী গণ,
স্বনাথ কুরঙ্গ সঙ্গে,
অলস অবশ অঙ্গে;
ময়ূর ময়ূরী ভালে মুদ্রিত নয়ন।

৫

যেই দৃঢ় আলিঙ্গনে কানন বল্লরী,
বেষ্টিয়াছে প্রেমভরে দীর্ঘ তরুবর,
বিচ্ছিন্ন করিতে তারে,
প্রভঞ্জন নাহি পারে,
আরণ্য প্রণয় মরি অতি ! মনোহর।

৬

ততোধিক মনোহর—ওই তরুতলে,
ভূতলে "ভুমিয়া" ওই করিয়া শয়ন,
পাশে বসে প্রণয়িণী,
শৈল সুতা গৌরাঙ্গিণী,—
ততোধিক মনোহর তাদের জীবন।

৭

মূর্ত্তিমতী সরলতা ভুমিয়া রমণী,
সরল বচন আহা ! সরল দর্শন,
সরল মধুর হাসি,
সরল সৌন্দর্য্য রাশি,
অকৃত্রিম সরলতাপূর্ণিত জীবন।

৮

সুবর্ণ দর্পণসম, অতি সমুজ্জল,
শোভে অর্দ্ধ অনাবৃত চারু বক্ষঃস্থল,
সুগোল নিটোল ভুজ,
চারুনেত্র নীলাম্বুজ,
চন্দ্রের কলঙ্ক, নত-নাসিকা কেবল।

৯

সরল কবরীভুক্ত দীর্ঘ কেশ রাশি ;
বিকৃত কর্ণের রন্ধ্রে, সুন্দর খোপায়,
শোভে বনপুষ্পগণ,
বিনা এই আভরণ,
রত্ন হৈম অলঙ্কার চিনে না বামায়।

১০

এইরূপে বনদেবী, বসে পতি পাশে,
কার্পাসে কর্কশ বস্ত্র বুনে বিনোদিনী,
সুবর্ণ অঙ্গুলিচয়,
কিন্তু কোমলতাময়,
নাচে তন্ত্র যন্ত্রে, গায় নীচে কল্লোলিনী।

১১

কাছে শুয়ে প্রাণেশ্বর, দেখে প্রেম ভরে,
মন্দ সমীরণে যথা চম্পক কুসুম,
তেমতি প্রিয়ার কর,
নাচিতেছে নিরন্তর,
হাসিতেছে পতিপ্রেমে পর্ব্বতপ্রসূন।

১২

কভু কার্য্য অন্তরালে পতিমুখপানে,
নিরখিতে বিনোদিনী সতৃষ্ণনয়নে,
ভুলিয়াছে নত করে
দেখি বামা লাজ ভরে
চাহে প্রাণেশের পানে, সস্মিত নয়নে।

১৩

কুটিল কটাক্ষপূর্ণ নহে সে দর্শন ;
নহে সে সরল হাসি কুটিলতা ময় ;
মোহিল ভুমিয়া মন,
হাসিয়া সে সেইক্ষণ,
চুম্বিল প্রিয়ার মুখ—অমৃত আলয়।

১৪

সভ্যতার অসভ্যতা সহিতে না পারি,
পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম—অপার্থিব ধন,
ছাড়াতে সভ্যতা দায়,
পশেছে অরণ্যে হায় !
প্রেমের আবহ ওই ভুমিয়া জীবন।

১৫

পতি পত্নী এক চিত্ত, একই জীবন ;
উভয় জীবন স্রোতঃ বিবাহ অবধি,
গঙ্গা যমুনার মত,
এক অঙ্গে পরিণত,
একই বিমল স্রোতে বহে নিরবধি।

১৬

দিবস যামিনী, বন-কপোত যেমন,
একত্রে আহার, বনে একত্রে ভ্রমণ,
একত্রে প্রবেশি বন,
কাটে "জোম," দুই জন,
একত্রে ফিরিয়া মঞ্চে, একত্রে শয়ন।

১৭

নাহি ভবিষ্যত চিন্তা, অভাবের ভয় ;
অনন্ত পর্ব্বতরাজ্য স্বর্ণ প্রসবিনী,
অতি অল্প পরিশ্রমে,
যোগায় জুমিয়া গণে,
আহার্য্য সামগ্রীচয় ভার্য্যা গৌরাঙ্গিণী।

১৮

পর্ব্বতবিহারী ওই সমীরণ মত,
স্বাধীন জুমিয়াগণ ; যথা ইচ্ছা হায় !
প্রাণের প্রেয়সী সনে,
বেড়ায় নিবিড় বনে,
সুখের সাগরে আহা ! ভাসিয়া বেড়ায়।

১৯

বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ তাদের নয়নে,
দুরাকাঙ্ক্ষা মরীচিকা করেনি সৃজন,
সুখের তৃষ্ণায় হায় !
কভু নাহি ছুটি যায়,
আশা কুহকিনী মন্ত্রে হইয়া মগন।

২০

নাহি ভূত ভবিষ্যত তাদের নয়নে,
সুখ নির্ঝরিণী স্রোতঃ—সদা বর্ত্তমান ;
না বুঝে সময় গতি,
সদা সুপ্রসন্ন মতি,
থাকে সুখে, প্রকৃতির প্রকৃত সন্তান।

২১

প্রিয়াকরবিনিঃসৃত সুরা করি পান,
ওই ক্ষুদ্র মঞ্চে সুখে করিয়া শয়ন,
কাটে কাল মন সুখে,
প্রেয়সী লইয়া বুকে,
অকৃত্রিম ভালবাসা জুমিয়া জীবন।

২২

পশ্চিম সভ্যতা স্রোতঃ ! থাক দাঁড়াইয়া,
ক্ষমা কর, হইও না আর অগ্রসর,
বাঙ্গালির সুখালয়,
ভাসাইয়া, হে নির্দ্দয় !
পূরিল না তথাপি কি তোমার উদর ?

২৩

নাহি কাজ প্রবেশিয়া অরণ্য ভিতরে,
কলুষিত করি এই গহন কানন,
নাহি কাজ সভ্যতায়,
কে বল সভ্যতা চায়,
অসভ্যতা যদি আহা ! সুখের এমন।

২৪

ইচ্ছা হয়, হায় ! ওই জুমিয়ার সনে,
বিনিময় করি এই বাঙ্গালি জীবন,
শুয়ে ওই ধরাতলে,
লয়ে প্রিয়া বক্ষঃস্থলে,
লভি স্বর্গসুখ,—ওই জুমিয়া জীবন।

শ্রীনঃ

সেতার শিক্ষা। অর্থাৎ প্রথম শিক্ষার্থ সঙ্গীতের যাবতীয় মূল সূত্র সম্বলিত এবং অভ্যাসার্থ সাধারণ প্রচলিত গত ও গীতাদি সঙ্কলিত, সেতার শিক্ষার সহজ উপায়। শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, আই, সি, বসু, এণ্ড কোং। ১৮৭৩।

এই গ্রন্থখানি আমাদিগের বিশেষ সন্তোষের কারণ হইয়াছে। যাঁহাদিগের সেতার শিখিবার ইচ্ছা আছে, অবকাশও আছে, কেবল শিক্ষাক্লেশের জন্য শিখিতে পারেন না, তাঁহারা কৃষ্ণধন বাবুর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ হইবেন। ইহাতে যে কেবল সেতার শিক্ষার্থীর উপকার হয় এমত নহে, সঙ্গীতে সাধারণতঃ কিছু জ্ঞানও জন্মিতে পারে।

গ্রন্থ দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে সুরের বিষয়, স্বরলিপির সঙ্কেত, স্বরগ্রাম, মাত্রা, ছন্দ, তাল প্রভৃতি বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা আছে। দ্বিতীয় ভাগে, গত, গান, আলাপ, ঠেকার বোল, ও অন্যান্য আভ্যাসিক বিষয়।

এই গ্রন্থের মুদ্রাকার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। নূতন প্রচলিত দেশী সঙ্গীতের স্বরলিপির উপযোগী অক্ষর দুষ্প্রাপ্য। অতএব ইহা ছাপাইতে বিশেষ যত্ন, পরিশ্রম, ও ব্যয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাহাতেও যেরূপ পরিপাটি মুদ্রাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা সচরাচর দেখা যায় না। মুদ্রাকরদিগের বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়।

গ্রন্থকারের সঙ্গীতনৈপুণ্য, উৎসাহ, এবং অধ্যবসায়ও প্রশংসনীয়।

বক্তৃতামালা। অথবা হিন্দু মেলা প্রভৃতি বহুস্থলে বিবৃত শ্রীমনোমোহন বসুর বক্তৃতা সমূহ একত্র সঙ্কলিত। কলিকাতা মধ্যস্থ যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

"মেলা কি? মেলার উদ্দেশ্য কি?" "বারুইপুরের মেলায় বক্তৃতা।" "ছাত্রের কর্ত্তব্য।" ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ এই গ্রন্থে আছে। এতৎ সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বক্তব্য নাই।

বিরহ বিলাপ। কলিকাতা শোভাবাজার বিদ্যারত্ন যন্ত্র। ১১৭২।

গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে নাম প্রকাশ করেন নাই। ভালই করিয়াছেন। এখানি যে কাব্য, তাহা নাম শুনিয়াই বুঝা যায়। গ্রন্থখানি অপাঠ্য।

বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা। এবং বাঙ্গালা ডাইরেক্টরি। সন ১২৮০ সাল। শ্রীবিহারিলাল নন্দী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র। কলিকাতা সম্বৎ ১৯৩০।

পঞ্জিকাতেও ইউরোপীয় সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতার আশ্রয়ে, পঞ্জিকা বিহারী বাবুর হস্তে যেরূপ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, অন্যান্য বিষয়ে যদি ইউরোপীয় সভ্যতার ফল সেইরূপ উৎকর্ষে পরিণত হয়, তবে এ দেশের মঙ্গল বটে। এরূপ উৎকৃষ্ট পঞ্জিকা কখন দেখা যায় নাই। ইহাতে উৎকৃষ্ট দেশী পঞ্জিকাতে যাহা থাকে, তাহা আছে; এবং উৎকৃষ্ট দেশী পঞ্জিকাতে যাহা থাকা কর্ত্তব্য, অথচ থাকে না, তাহাও আছে। সে সকল এরূপ আছে, যে সাধারণ বিদ্যা, বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকে, এই পঞ্জিকার সাহায্যে, অধ্যাপকের পরামর্শ ব্যতীত সচরাচর শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে পারে। তদ্ভিন্ন একটি বিস্তারিত ডাইরেক্টরি আছে। ইংরাজি ডাইরেক্টরিতে যাহা থাকে, তাহার স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয় প্রায় সকলই আছে। একটি ডায়েরি আছে। তদ্ভিন্ন, ষ্ট্যাম্প আইন, রেজিষ্টরি আইন, মনিঅর্ডরের নিয়ম, পেপর করেন্সির নিয়ম, ডাক মাসুলের নিয়ম, ডাকঘরের তালিকা, টেলিগ্রাফের নিয়ম, ইত্যাদি, বিষয়ী লোকের জ্ঞাতব্য বহুবিষয়ক রাজ-নিয়ম সবিস্তারে লিখিত আছে। পঞ্জিকার নিয়মানুসারে কয়েকখানি চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের স্কুল অব আর্ট নামক শিল্পবিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র প্রণীত। এরূপ সুদৃশ্য চিত্র বাঙ্গালা গ্রন্থে কখন দেখা যায় না। বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়, আকারেও বৃহৎ, অথচ মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র। বাঙ্গালিরা বিহারী বাবুর নিকট বিশেষ বাধিত।

কবিতাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীরাধানাথ রায় প্রণীত ও শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং ১২৮০।

এই কবিতাগুলি উত্তম। বৈকুণ্ঠ বাবু বিজ্ঞাপনে প্রসঙ্গতঃ জানাইয়াছেন, যে ইহা একজন উৎকলবাসীর প্রণীত। অথচ সে কথা স্পষ্ট লেখেন নাই। কবি, বস্তুতঃ উড়িয়া কি না, আমরা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। ফলে ইনি যেই হউন, আমরা ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যে তাঁহার লিখিত বাঙ্গালাভাষা সাধারণ বাঙ্গালি লেখকের ভাষার অপেক্ষা ভাল। কবিত্বও সাধারণ বাঙ্গালি কবির কবিত্ব অপেক্ষা ভাল। তাঁহার প্রণীত চতুর্দ্দশপদী কবিতার মধ্যে দুই একটি শ্রীযুক্ত দত্তজ মহাশয়ের প্রণীত চতুর্দ্দশপদীর তুল্য বলিয়া বোধ হয়। এই কবি, দত্তজ মহাশয়ের অনুকারী।

বিশ্বদর্শন। পাক্ষিক পত্র। শ্রীশিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা দ্বৈপায়ন যন্ত্র।

প্রবন্ধ গুলিন সাধারণ স্কুলের ছাত্রের লিখিত বলিয়া বোধ হইল।

সাহিত্য সংগ্রহ। হরিবংশ, ১৩শ সংখ্যা। কলিকাতা, হোগল কুড়িয়া সাহিত্যসংগ্রহ ভবন হইতে প্রকাশিত। প্রাকৃত যন্ত্র।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যা যেরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহাও তদ্রূপ।

স্বীয় মনের প্রতি উপদেশ। কোন বঙ্গমহিলা প্রণীত। কলিকাতা ৫২ নং বেন্টিঙ্ক প্রেস, শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ।

এই গ্রন্থ সমালোচনে আমরা অধিকারী কি না, তদ্বিষয়ে আমরা সন্দিহান। ইহার উপরে লিখিত আছে "বন্ধুদিগের বিতরণার্থ।" যদি গ্রন্থমুদ্রাঙ্কনের সেই উদ্দেশ্য হয়, তবে আমরা ইহার সমালোচনে অধিকারী নহি। অথচ যেখানে অপরিচিতা গ্রন্থকর্ত্রীর নিকট হইতে বঙ্গদর্শন সম্পাদক একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেখানে আমরা সমালোচনে অধিকারী নহি কেন? এইরূপ সংশয়ারূঢ় হইয়া আমরা এই গ্রন্থের উল্লেখ মাত্র করিয়া সমালোচনায় বিরত রহিলাম।

বঙ্গ মিহির। মাসিক পত্র। শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ভবানীপুর, সাপ্তাহিক সম্বাদযন্ত্র, শ্রীব্রজমাধব বসু।

দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায়দিগের প্রয়োজন সম্পন্ন করা এই পত্রের উদ্দেশ্য। কয়েক জন অতি সুপণ্ডিত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালি লেখকশ্রেণীভুক্ত বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায়ের প্রয়োজন সম্পাদন করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু ইহা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও পড়িয়া সুখী হইতে পারেন। একটী উপন্যাস ইহাতে প্রকাশারম্ভ হইয়াছে, এবং অন্যান্য বিষয়ও সাধারণ পাঠকের প্রীতিকর হইতে পারে। সম্পাদকের নিকট আমাদিগের অনুরোধ, যে যাহাতে বঙ্গমিহির সকল শ্রেণীর পাঠকের গ্রাহ্য হয় তাহার প্রতি একটু যত্ন করেন। নচেৎ দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায় বঙ্গদেশে অতি অল্পসংখ্যক; কেবল তাঁহাদিগের দ্বারাই একখানি মাসিক পত্র রক্ষিত হইতে পারিবে, এমত বোধ হয় না। হিন্দুই হউন, খ্রীষ্টানই হউন, যিনি এদেশে জ্ঞানপ্রচারে যত্নবান্ হইবেন, তিনিই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। এজন্য আমরা বঙ্গমিহিরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

আমরা কয়েক খান অভিনব সম্বাদপত্র উপহার প্রাপ্ত হইয়া তাহার সমালোচনায় অনুরুদ্ধ হইয়াছি। সম্বাদপত্রের সমালোচনা আমাদের রীতি নহে, এবং আমরা সে নিয়ম ভঙ্গ করিতে ইচ্ছুক নহি। যাঁহারা পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহারা মার্জ্জনা করিবেন।

মিলের মৃত্যু হইয়াছে! আমরা কখন তাঁহাকে চক্ষে দেখি নাই; তিনিও কখন বঙ্গদর্শনের পরিচয় গ্রহণ করেন নাই। তথাপি আমাদিগের মনে হইতেছে যেন আমাদিগের কোন পরম আত্মীয়ের সহিত চির বিচ্ছেদ হইয়াছে!

২৭ বৈশাখ তারিখের টেলিগ্রাম ২৮ তারিখে প্রকাশ হয় যে মিল শঙ্কটাপন্ন রূপে পীড়িত। পরদিন প্রাতে মিলের কুশল জানিবার জন্য সাতিশয় আগ্রহচিত্তে সম্বাদ পত্র খুলিলাম, দেখিলাম যে চিকিৎসকেরা মিলের জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই দিবস অপরাহ্নে সম্বাদ আইসে যে মিল নাই!

ছয় হাজার মাইল দূরে থাকিয়া আমরা এই শোক পাইয়াছি, না জানি ইংলণ্ডবাসীরা কতই দুঃখ করিতেছেন! কিন্তু কেনই দুঃখ করি তাহা বলা যায় না! যে মহোদয় আপন বুদ্ধিবলে প্রায় সমস্ত মানব জাতিকে ঋণী করিয়াছেন, যিনি যাবজ্জীবন এই ঋণ প্রদানে নিযুক্ত ছিলেন এবং যিনি এতাদৃশ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন যে, যে কেহ হউক যত্নসহকারে আবেদন করিলেই তাঁহার বদান্যতার ফলভোগী হইতে পারিবে, এরূপ মহাপুরুষ এতকাল পরে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন বলিয়া কেনই এত কাতর হই? তথাচ মৃত্যুশোক দূর হইবার নহে, "মিল নাই" এই কথা মনে করিলে চিত্ত স্বভাবতঃই ব্যথিত হয়।

মিল অতি সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার কৃত ইংরাজি ন্যায়শাস্ত্র এবং অর্থব্যবহারশাস্ত্র তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। ইহাতে তিনি যে কোন নূতন কথার উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু এতৎসংক্রান্ত সমুদায় কথা এমন সুশৃঙ্খল করিয়া লিখিয়াছেন এবং প্রত্যেক বিষয় এত পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন যে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ না করিলে কাহারই উক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হইবেক না।

তিনি রাজ্যশাসন প্রণালী বিষয়ে যে সমস্ত কথা বলিয়া গিয়াছেন, বোধ হয় যে, কিছুকাল পরে ইংলণ্ডে তাহা ফল ধারণ করিবে তাঁহার পরামর্শ

ইংলণ্ডীয়দিগের প্রকৃতির উপযোগী বটে তথাপি অপর সাধারণে এখনও তাহার সম্পূর্ণ মর্ম্মগ্রহণ করিয়া উঠিতে পারে নাই।

বিদ্যানুশীলন বিষয়ে তিনি যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এখন সর্ব্বত্র সকলেই সেই পথানুসারী হইতেছে। মিল বলিয়াছেন যে, যেমন চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধ নিবারণের উপায় রাজা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ তাবৎ লোককে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়াও রাজার কর্ত্তব্য। তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা ছিল যে উত্তম অধম, ধনী দরিদ্র, ভদ্র অভদ্র সকলেই বিদ্যাভ্যাস করিবে ; সর্ব্বত্র বিজ্ঞান-শাস্ত্রের চর্চ্চা বর্দ্ধিত হইবে এবং ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ে রাজার হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। কাযে না হউক মনে মনে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ প্রায় সকলেই এই সকল কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছেন।

মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রে মিল অনেকের যথেচ্ছাচারিতা দমন করিয়াছেন। এখন Absolutist বলিয়া কাহারও পরিচয় দিলে তাঁহার এক প্রকার নিন্দা করা হয়। এতাদৃশ সংস্কার বিস্তার করণ পক্ষে মিলের আয়াস যথেষ্ট ফললাভ করিয়াছে।

মিল শেষাবস্থায় সামাজিক ব্যবস্থা বিষয়ে দুটী নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার মতে স্ত্রীজাতি সর্ব্বতোভাবে পুরুষের তুল্য, অতএব যাহাতে উভয় জাতির শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সম্বন্ধ দূরীকৃত হয় মিল তাহার জন্য অতিশয় চেষ্টিত ছিলেন। পরিণামে ইহার কি হয় বলা যায় না কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে বোধ হয় না যে, যে উদ্যম আরম্ভ হইয়াছে তাহা সহসা ভঙ্গ হইবেক। এই বিষয়ক চিন্তাকালে আমাদিগের মনে হয় যেন মিল আপন স্ত্রীবিয়োগের পর তাঁহার গাঢ় পত্নীভক্তি, কার্য্যে পর্য্যবসিত করণার্থ ব্রত স্বরূপ এই চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হয়েন।

এস্থলে একথা বলিলে তাঁহার মনের ভাব কতক প্রকাশ হইবেক যে, ফরাসিদেশে আভিনে নামক নগরের এক গির্জ্জার সমাধিক্ষেত্রে মিলের স্ত্রী সমাধিস্থ হয়েন এবং ঐ সমাধি সর্ব্বদা দেখিতে পাইবেন বলিয়া মিল তাহার নিকটবর্ত্তী একটী বাটী ক্রয় করেন। সেই বাটীতে এরিসি-পেলাস রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

দ্বিতীয় ; মিলের কল্পনা এই যে পৃথিবীর ভূমিসম্পত্তির উপস্বত্ব ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে ; ইহার কিয়দংশ কেবল মাত্র সভ্যতার উন্নতিজনিত ; তাহাতে কাহারও আয়াস বা অর্থব্যয় হয় না, কিন্তু কেবল কতিপয় ভূম্যধিকারীই তাহার ফলভোগী হয়েন। যদ্যপি উপস্বত্বের এই বর্দ্ধিত অংশ রাজহস্তে সমর্পিত হয়, তবে ক্রমশঃ রাজকরের লাঘব হইয়া রাজ্যস্থ তাবৎ লোকেই ইহার কিছু কিছু অংশ পাইতে পারেন। অতএব ইহার সদুপায় করা কর্ত্তব্য। মিল এই কার্য্যে অতি

অল্পদিন হইল হস্তক্ষেপণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে যে হঠাৎ আর কেহ ইহাতে প্রবৃত্ত হইবেন, বোধ করি তাহার সম্ভাবনা অল্প।

মিল প্রথমাবস্থায় অনেক বিষয়ে কোম্‌তের সহিত একমত ছিলেন কিন্তু পরিণামে নানা মতভেদ উপস্থিত হয়। আমরা মনে করি যে পরস্পরের বিবাদের স্থূল কথা এই যে,—

ব্যক্তি বিশেষ ও জনসমাজ এতদুভয় মধ্যে, মিলের মতে ব্যক্তির প্রাধান্য রক্ষা করিয়া সমাজের উন্নতিসাধন করিতে হইবেক নতুবা পৃথিবী ক্রমশঃ নিস্তেজঃ হইয়া যাইবেক।

আর কোম্‌ৎ বলেন যে সহস্র চেষ্টা করিলেও মনুষ্যের স্বার্থানুরাগ পর-হিতৈষিতা অপেক্ষা ক্ষুন্ন হইবেক না; ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য রক্ষার্থ যত্ন প্রয়োগ হইলে, সেই যত্নের দ্বারা সমাজের যে উন্নতি হইতে পারিত তাহার ব্যাঘাত হইবেক। অতএব স্বার্থানুরাগ কেবল দমন করিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

মিল ও কোম্‌তের ন্যায় মহোপাধ্যায়গণ যে সকল বিষয়ের ঐকমত্য সংস্থাপন করিতে পারেন নাই, তাহার কোন পক্ষের মত সমর্থন করা সামান্য লোকের পক্ষে অবশ্যই অসাধ্য। সুতরাং মতদ্বয় মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ এবং কোন্‌টী নিকৃষ্ট তদ্বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে ইচ্ছা করি যে মিল, কোমৎ দর্শন বিচার করিবার জন্য Auguste Comte and Positivism নামক যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহাতে জনসমাজের কথঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু তাহা মিলের অভিপ্রেত নহে বলিয়া তজ্জন্য মিলকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। অনেকে কোম্‌তের গ্রন্থ পাঠ করা দুরূহ বলিয়া মিলের গ্রন্থ হইতে তাঁহার মতের সার সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহার পরিণাম কেবল এই মাত্র হয় যে যেমন কিছুদিন পূর্ব্বে খৃষ্টান মহাশয়েরা সকল কথা না বুঝিয়া কেবল হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ব্যঙ্গ করিতেই পটু হইতেন, মিলকৃত কোমৎ ভাষ্যের পাঠক মহাশয়েরাও তদ্রূপ কেবল ব্যঙ্গ করিবার ক্ষমতা লাভ করেন।

মিলের ধর্ম্ম বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না, কারণ তিনি নিজে তাহা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করেন নাই। ইহাতে তিনি নিন্দাভাজন হইয়াছেন কিনা তদ্বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে। কিন্তু যদি তিনি স্বয়ং আপন প্রকৃত বিশ্বাস গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তবে অন্যের পক্ষে তাহার আন্দোলন করা বন্ধুর কার্য্য হইতে পারে না।

আমরা এতক্ষণ যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলাম, তাহাতে আমরা সমগ্র মানবজাতির সহিত ভ্রাতৃসম্পর্কে আবদ্ধ। কিন্তু ভারতবাসী বলিয়া মিলের সহিত আমাদের আরো কিছু সম্পর্ক আছে। যৎকালে ভারতবর্ষ ইষ্টইণ্ডিয়া

কোম্পানির কর্তৃত্বাধীন ছিল তখন মিল প্রথমতঃ ইষ্টইণ্ডিয়া হাউসের একজন কেরাণি এবং পরিশেষে চিঠিপত্র পরীক্ষকের কার্য্য করিতেন। কোর্ট অফ ডাইরেক্টর হইতে ভারতবর্ষে যে সকল আজ্ঞালিপি আসিত তাহা মিলের পরীক্ষা ভিন্ন প্রেরিত হইত না। কিম্বদন্তী আছে যে ভারতবর্ষের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ক সন ১৮৫৪ সালের প্রসিদ্ধ লিপিরচনাকার্য্যে মিলের বিশিষ্ট সাহায্য ছিল। ফলতঃ উহাতে যেরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সহিত মিলের Liberty নামক পুস্তকোক্ত মতের সম্পূর্ণ ঐক্য লক্ষিত হইবেক।

ভারতবর্ষের রাজকার্য্য মহারাণীর কর্ম্মচারিগণের হস্তে অর্পিত হইবার সময় মিলকে ইণ্ডিয়া কৌন্সলের মেম্বর হইতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ঐ নূতন বন্দোবস্ত মিলের মতে অযৌক্তিক বলিয়া তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করেন নাই। তৎকালে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ হইতে, মহারাণীকে এই কার্য্য হইতে ক্ষান্ত করিবার জন্য এক আবেদন করা হয়। কথিত আছে যে, মিল তাহার রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত আবেদনে লিখিত ছিল যে, ভারতবর্ষের ন্যায় রাজ্য পার্লিয়ামেণ্টের অধীন না হইয়া কোম্পানির অধীন থাকিলে ভারতবাসীদিগের মঙ্গল হইবেক, নতুবা তাহারা ইংলণ্ডের দলাদলির আক্রোশে পড়িয়া নিতান্ত উৎপীড়িত হইবেক। তৎকালে এই কথার প্রতি কেহই তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই; কিন্তু এখন ইহাকে তুচ্ছ করিতে পারে এমন লোক কে আছে?

জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার প্রথানুসারে মিলের বিষয়ে, নিম্নলিখিত তারিখগুলি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া গেল।

মিলের জন্ম, ... ১৮০৬

তৎকৃত System of Logic নামক ন্যায়শাস্ত্র প্রকাশ, ১৮৪৩

Essay on unsettled questions of Political Economy প্রকাশ ১৮৪৪

মিল ইষ্ট ইণ্ডিয়াহৌসের Examiner of Indian Correspondence পদে নিযুক্ত, ... ১৮৫৬

মিল, উক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করেন, ... ১৮৫৮

মিলকৃত Essay on Liberty প্রকাশ ... ১৮৫৯

Dissertations and Discussions, Political &c., প্রকাশ ১৮৫৯

Thoughts on Parliamentary Reforms, প্রকাশ ১৮৫৯

Principles of Political Economy (অর্থব্যবহার শাস্ত্র) প্রকাশ ১৮৬১

মনুষ্য স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয়। দৈনন্দিন কার্য্য সমাপনান্তে একজন বিষয়ী ব্যক্তিরও কোন প্রকার আমোদে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিতে বাসনা হয়, কালক্রমে সমাজের সংস্কার ও অবস্থার পরিবর্ত্ত সহকারে আমোদ প্রমোদের পরিবর্ত্ত হইতেছে। সর্ব্ব প্রকার আমোদ প্রমোদের মধ্যে তৌর্য্যত্রিক সর্ব্বপ্রধান, এবং কি সভ্য বা অসভ্য সকল জাতির আদরণীয়। সুসভ্য ইউরোপীয়েরা যন্ত্র সহযোগে বীটোবন বা বেলীনির সঙ্গীতে, হিন্দুগণ বিশুদ্ধ তানলয়স্বর সংযোগে সুমধুর "গীত গোবিন্দ গানে" এবং অসভ্য আদিমবাসিগণ ঢক্কা বা দামামা বাদন দ্বারা স্ব স্ব অবকাশ কাল অতিবাহিত করেন। ইহার মধ্যে বীণাবাদনকারী এবং ঢক্কাবাদ্যকার উভয়েই সমান আমোদে প্রবৃত্ত, কেবল সমাজের সংস্কারে রুচিভেদ দৃষ্ট হয়। আদিম বাসীর কর্ণকঠোর কণ্ঠস্বর, এবং অস্মতনীয় সুসভ্য ব্যক্তির বাক্যালাপ যেরূপ প্রভেদ সঙ্গীতেও তাদৃশ প্রভেদ প্রতীয়মান হইবেক। ভাষার ও মনুষ্যের অবস্থার পরিবর্ত্ত সহকারে সঙ্গীতের উন্নতি হইয়াছে।

সঙ্গীত মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। দুগ্ধপোষ্য বালক কিঞ্চিৎ আহ্লাদিত হইলেই মস্তকে হস্তোত্তোলন করিয়া নৃত্য ও গান করিবে এবং দুর্ব্বলমনা বঙ্গীয় কামিনী প্রিয়জন বিয়োগে নানা মত খেদগানে প্রতিবাসিগণের মন, করুণরসে আদ্র করে। সভ্যতার প্রোজ্জ্বল দীধিতি বিকীর্ণ হইবার পূর্ব্বে মনুষ্য পদ্যে মনের ভাব ব্যক্ত করিত। এক্ষণে নাট্যাভিনয়ে যেরূপ কবিতায় বাক্যালাপ হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাচীন কালে অসভ্যগণ তারস্বরে কথা বলিয়া তাহা "হো" "বা" "ও" শব্দে শেষ করিত। মনুষ্য প্রণীত প্রথমগ্রন্থ পদ্যে রচিত। আর্য্যজাতির বেদ, মনুষ্যের প্রথম রচনাকুসুম। উহার মন্ত্রভাগ আদ্যোপান্ত কবিতায় রচিত এবং পরে ব্রাহ্মণ ভাগ গদ্যে রচিত হয়। যজুর্ব্বেদের মন্ত্রভাগ যদিও গদ্যের ন্যায়, তথাপি তাহা স্বর দ্বারা গেয়। সঙ্গীতে মনোমধ্যে কোন বিষয় শীঘ্র ধারণা হয় এজন্য ঈশ্বরের প্রেমে সহজে লোকের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য প্রাচীন কালে ঈশ্বর বিষয়ক বিবরণ গীত-স্বরে পাঠ হইত। পরে সঙ্গীত পৃথক-শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইল। এবং কাল

ক্রমে এই গীত বা কবিতাশাস্ত্রের উন্নতি হইতে লাগিল। সঙ্গীতে মনকে শীঘ্র আর্দ্র করিতে পারে; এজন্য-ঈশ্বরপ্রেমিক ও নাস্তিক সকলেই সঙ্গীত প্রিয়। ইউরোপে ফরাশীশ বিজ্ঞানবিৎ কোমৎ মতাবলম্বিগণ, প্রত্যক্ষ দর্শন বাদী সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে "হার্মোনিয়ম" যন্ত্র সহকারে নানারসসমাকীর্ণ কবিতা-কলাপ গান করিয়া উপস্থিত সভ্যনিকরের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। সঙ্গীত সর্ব্ব-মনোরঞ্জক বিদ্যা এবং এজন্যই শাস্ত্রকারেরা কহেন "গানাৎ পরতরং নহি।" আমরা অদ্য এই প্রস্তাবে কেবল হিন্দুদিগের প্রাচীন নাট্যাভিনয়ের বিষয় লিখিব। পরে কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের বিষয় লিখিতে ইচ্ছা আছে।

সঙ্গীত দ্বিবিধ, দৃশ্য এবং শ্রাব্য যথা "সঙ্গীতং দ্বিবিধং প্রোক্তং দৃশ্যং শ্রাব্যঞ্চ সূরিভিঃ" ইহার মধ্যে গীত এবং বাদ্য শ্রাব্য, ও নৃত্য দৃশ্য সঙ্গীতমধ্যে পরিগণিত। এইরূপ কাব্যও দ্বিবিধ যথা সাহিত্য দর্পণে "দৃশ্যশ্রাব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতং। দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ং তত্।" নাটকের অভিনয় ক্রীড়া হইয়া থাকে এজন্য তাহার অপর নাম দৃশ্য-কাব্য। অভিনয়ের সঙ্গীত ও নৃত্য প্রধান অঙ্গ এবং তাহার সহিত কুশীলবগণের অঙ্গ ভঙ্গী ও বাক্য চাতুরী বিশেষ আবশ্যক। মহামুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। কথিত আছে, তিনি উহা ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রের সভায় গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকে শিক্ষা দিতেন। মহাদেব স্বয়ং তাণ্ডব ও পার্ব্বতী লাস্য নৃত্য করিতেন যথা "দশরূপম্।"

উদ্ধৃত্যোদ্ধৃত্য সারং যমখিল নিগমান্ নাট্যবেদং বিরিঞ্চিশ্চক্রে যস্য প্রয়োগং মুনিরপি ভরতস্তাণ্ডবং নীলকণ্ঠঃ। সর্ব্বাণী লাস্যমস্য প্রতিপদমপরং লক্ষকঃ। কর্ত্তু-মিষ্টে নাট্যানাং কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রগুণরচনয়া লক্ষণং সঙ্ক্ষিপামি।

লাস্য ও তাণ্ডব চারি অংশে বিভক্ত। যথা পেবলি, বহুরূপ, যৌবত এবং ছুরিত। অভিনয় কালে পুরুষেরা বহুরূপ ও রূপলাবণ্যবতী নটীগণ, যৌবত এবং ছুরিত নৃত্য করিয়া থাকে; এই সকল নৃত্য মাত্রই তালের অধীন। যথা দশরূপম্ "নৃত্যং তাললয়াশ্রয়ম্।" পূর্ব্বকালে দেবতারাও নৃত্যে পরাঙ্মুখ ছিলেন না, এবং মহাভারত ও সংস্কৃত নাটকে দৃষ্ট হয় রাজা ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণীগণ নৃত্য শিক্ষা করিতেন। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে নৃত্য একবারে লোপ হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা নৃত্যে অত্যন্ত নিপুণ। "বলে" যদি কোন ব্যক্তি বা কামিনী নৃত্য করিতে না পারেন, তবে তাঁহার সমাজ মধ্যে বাস করা ভার হইয়া উঠে। রাজা, রাজ্ঞী, মন্ত্রী, সকলেই নৃত্য করিয়া থাকেন। অশীতিবর্ষ বয়স্ক পুরুষকেও নৃত্যে নিপুণতা দেখাইতে হয়। এবং এই নৃত্যেই যুবক যুবতী পরস্পরের মনোহরণ করিয়া পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রথম সূচনা করেন। শুক্ল কেশ-ধারী প্রশান্তমূর্ত্তি প্রাড্‌বিবাকের লম্ফ দিয়া দ্রুতবেগে নৃত্য এক প্রকার বিড়ম্বনা

মাত্র, কিন্তু ইংরাজ সভ্যতায় সকলই শোভা পায়। কাহার সাধ্য ইহার প্রতিবাদ করে? সূর্য্যবংশীয় মহাতেজা জয়পুরাধিপতিকেও ইংরেজের অনুকরণ করিয়া নৃত্য করিতে হইল! বোধ হয় কালে স্ত্রী স্বাধীনতার একজন প্রধান উত্তর সাধক রামকৃষ্ণ বসু, স্বীয় প্রণয়িনী নৃত্যকালী বসুর হাত ধরিয়া প্রকাশ্য "বলে" নৃত্য করত ইংরাজগণের প্রীতিভাজন হইবেন। কালে সকলই ঘটিতে পারে?

নাটক অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নান্দী, বিদূষক, সূত্রধর, পারিপার্শ্বিক ও নট নটীর উল্লেখ থাকিবে। পুরুষগণের ভাষা সংস্কৃত এবং স্ত্রীলোকের প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন হওয়া আবশ্যক যথা লক্ষণমালা (৮ পৃষ্ঠা)

পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাং।
শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাং॥
আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রয়োজয়েৎ।
অত্রোক্তা মাগধীভাষা রাজান্তঃ পুরচারিণাং॥
চেটানাং রাজপুত্রাণাং শ্রেষ্ঠিনাং চার্দ্ধমাগধী।
প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং ধূর্ত্তানাং স্যাদবন্তিকা॥
যোধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিণাত্যাহি দিব্যতাং।
শকারাণাং শকাদীনাং শাকারীং সম্প্রযোজয়েৎ॥
বাহ্লীকভাষা দীব্যানাং দ্রাবিড়ী দ্রবিড়াদিষু।
অভীরেষু তথাভীরী চাণ্ডালী পুক্কসাদিষু॥
আভীরী শাবরী চাপি কাষ্ঠপত্রোপজীবিষু।
তথৈবাঙ্গারকারাদৌ পৈশাচী স্যাৎ পিশাচবাক্॥
চেটীনামপ্যনীচানা মপিস্যাৎ শৌরসেনিকা।
বালানাং ষণ্ডকানাঞ্চ নীচ গ্রহ বিচারিণাং॥
উন্মত্তানা মাতুরাণাং সৈব স্যাৎ সংস্কৃতং ক্বচিৎ॥
ঐশ্বর্য্যেণ প্রমত্তস্য দারিদ্র্যোপ ক্রতস্যচ।
ভিক্ষুবন্ধধরাদীনাং প্রাকৃতং সম্প্রযোজয়েৎ॥
সংস্কৃতং সম্প্রযোক্তব্যং লিঙ্গিনীষূত্তমাসুচ।
দেবীমন্ত্রিসুতাবেশ্যাস্বপি কৈশ্চিত্তথোদিতং॥
যদ্দেশং নীচপাত্রন্তু তদ্দেশং তস্য ভাষিতং।
কার্য্যতশ্চোত্তমাদীনাং কার্য্যো ভাষা বিপর্য্যয়ঃ॥
যোষিৎসখীবালবেশ্যা কিতবাপ্সরসাং তথা।
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতং চান্তরান্তরা॥

উচ্চপদবীস্থ ভদ্র পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের বক্তব্য ভাষা সংস্কৃত। তাদৃশা স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে "শৌর সেনী" এবং তাদৃশ ভদ্র স্ত্রীজাতীয় গাথা সম্পর্কে "মহারাষ্ট্রী" ভাষা প্রযুক্ত হইবে।

রাজান্তঃপুরচারী জনগণের "মাগধী।" রাজপুত্র ও রাজপরিচারক এবং শ্রেষ্ঠীদিগের সম্বন্ধে "অর্দ্ধমাগধী।" বিদূষকের "প্রাচ্য" ধূর্ত্তের "অবন্তিকা" যোদ্ধা ও নাগর প্রভৃতির পক্ষে "দাক্ষিণাত্য" ভাষা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

শকার এবং শক প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির প্রতি "শাকারী" এবং বাহ্লিকের "বাহ্লিকী" দ্রাবিড়ের "দ্রাবিড়ী" আভীর দেশীয়ের "আভীরী" পহ্লবের ও তৎসদৃশ জাতিতে "চাণ্ডালী" রীতির ভাষা ব্যবহার্য্য।

কাষ্ঠ বা পত্র পর্ণাদি জীবী ব্যক্তির সম্বন্ধে "আভীরী" বা "চাণ্ডালী" অঙ্গার-কারক প্রভৃতি নীচব্যবসায়িগণেরও "আভীরী বা চাণ্ডালী" ভাষা গ্রাহ্য। কুৎসিত-বাক্ মূর্খদিগের পক্ষে "পৈশাচী" এবং উচ্চপদাভিষিক্ত চেটচেটীদিগের "শৌর সেনী," বালক, উন্মত্ত, ষণ্ড, নীচ গ্রহগণকের ও আর্ত্তব্যক্তিদিগের "শৌর সেনী" স্থলবিশেষে "সংস্কৃতও" ব্যবহার্য্য। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত এবং দারিদ্র্যব্যাকুল, ভিক্ষু, বল্কধারী জনগণের "প্রাকৃত" প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। উত্তমাশয় ব্যক্তি লিঙ্গধারী (চিহ্নধারী যথা—কপট সন্ন্যাসী প্রভৃতি) ব্যক্তি, দেবী, মন্ত্রিকন্যা ও বেশ্যা—এই সকল ব্যক্তির পক্ষে "সংস্কৃত" ভাষাই শোভনীয়। অন্যপ্রকার হইলেও হানি নাই।

পরন্তু, যে দেশ নীচপ্রধান সে দেশ বা দেশীয় সম্বন্ধে তত্তৎ ভাষা (অর্থাৎ নীচ হইলে নীচ শ্রেণীগত ভাষা ইত্যাদি) প্রযুক্ত হইবে। উত্তমাধম মধ্যম জাতীয় ব্যবহার্য্য ভাষার বিভাগ তত্তৎকার্য্যানুসারে ভাষার বিপর্য্যয় বা পর্য্যয় হইয়া থাকে। স্ত্রী সখী, বালক, বেশ্যা, ধূর্ত্ত, অপ্সরাদিগের সম্বন্ধে ভাষা ব্যবহার কালে চাতুর্য্যাতিশয় প্রদর্শনের জন্য মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আলঙ্কারিকেরা নাটক দুই অংশে বিভাগ করিয়াছেন, যথা রূপক ও উপরূপক। রূপক দশ ও উপরূপক অষ্টাদশ অংশে বিভক্ত। যথা সাহিত্য দর্পণ—

নাটকমথ প্রকরণং ভাণ ব্যায়োগ সমবকার ডিমাঃ।
ঈহামৃগাঙ্কবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ ॥
নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠী সট্টকং নাট্যরাসকং।
প্রস্থানোল্লাপ্য কাব্যানি প্রেক্ষণং রাসকং তথা ॥
সংলাপকং শ্রীগদিতং শিল্পকঞ্চ বিলাসিকা।
দুর্ম্মল্লিকা প্রকরণী হল্লীশোভাণিকে তিচ ॥
অষ্টাদশ প্রাহুরূপরূপকাণি মনীষিণঃ।
বিনা বিশেষং সর্ব্বেষাং লক্ষ্ম নাটক বন্মতং ॥

১। দৃশ্যকাব্য মধ্যে নাটক সর্ব্ব প্রধান। উহার গল্প পৌরাণিক বিবরণ হইতে গৃহীত বা কিয়দংশ কবির মনঃ কল্পিত হইবেক। ইহার নায়ক দুষ্মন্তের ন্যায় নৃপতি, রামচন্দ্রের ন্যায় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন রাজা, বা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় দেবতা। শৃঙ্গার বা বীররস নাটকের বর্ণিত বিষয়। "অভিজ্ঞান শকুন্তলা," "মুদ্রারাক্ষস" "বেণীসংহার" "অনর্ঘরাঘব" প্রভৃতি নাটক শ্রেণীভুক্ত।

২। প্রকরণ লক্ষণ নাটকের ন্যায়, কিন্তু ইহার গল্পে সমাজের প্রতিকৃতি এবং প্রেমবিষয়ক বর্ণন থাকিবে। প্রকরণ দুই অংশে বিভক্ত। শুদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণ। শুদ্ধ প্রকরণের নায়িকা বেশ্যা এবং সঙ্কীর্ণের নায়িকা কোন ভদ্রবংশের প্রতি-পালিতা কামিনী বা সহচরী। প্রকরণের নায়ক নাটকের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি নহেন। ইহার নায়ক মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ বা সম্ভ্রান্ত বণিক। "মৃচ্ছকটিক" "মালতী মাধব" প্রভৃতি প্রকরণ।

৩। ভাণ এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ এবং প্রারম্ভে ও শেষে সঙ্গীত থাকিবে। নাট্যের নায়ক মাত্র অভিনয় ক্রীড়া করিবেন। তিনি রঙ্গভূমিতে আসিয়া নানা স্বরে ও ভাবভঙ্গী দ্বারা বিবিধ ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া সভ্যগণের মনোরঞ্জন করিবেন। "লীলা মধুকর" এবং "সারদা তিলক" ভাণ শ্রেণীভুক্ত।

৪। ব্যায়োগ এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। যুদ্ধ বর্ণন ইহার উদ্দেশ্য, প্রেম বা রহস্য বর্ণনা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহার নায়ক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ। "জামদগ্নেয়জয়" "সৌগন্ধিকাহরণ" এবং "ধনঞ্জয় বিজয়" ব্যায়োগ গ্রন্থ।

৫। সমবকার তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ। এবং দেবতা ও অসুর গণের যুদ্ধ বর্ণন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা আদ্যোপান্ত বীররস ব্যঞ্জক এবং উষ্ণী ও গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত। অভিনয় কালে, হয়, হস্তী, রথাদি পরিপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র, তুমুল সংগ্রাম এবং নগরাদি ধ্বংস, অতি উত্তমরূপ দৃষ্টি হইয়া থাকে। "সমুদ্রমন্থন" নামক একখানি সমবকার সংস্কৃত ভাষায় আছে, তাহাও এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে।

৬। ডিমা, বীর ও ভয়ানক রসসংযুক্ত রূপক। ইহা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। অসুর বা দেবতা ইহার নায়ক। "ত্রিপুরদহ" নামক একখানি ডিমা বর্ত্তমান আছে।

৭। ইহমৃগ চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং দেবদেবী ইহার নায়ক নায়িকা। প্রেম ও কৌতুক ইহার বর্ণনোদ্দেশ্য। "কুসুমশেখরবিজয়" একখানি ইহমৃগ।

৮। অঙ্ক এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং করুণ রসপ্রধান রূপক। কোন প্রসিদ্ধ পৌরাণিক বিষয়ে কবি ইহার গল্প রচনা করিবেন। "শর্ম্মিষ্ঠা যযাতি" একখানি অঙ্ক।

৯। বীথ্য, ভাণের ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। কিন্তু "দশ রূপের" মতানুসারে দুই অঙ্ক থাকিবে।

১০। প্রহসন হাস্তরস প্রধান রূপক। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। এবং সমাজের কুরীতি সংশোধন ও রহস্তজনক বিবরণ বর্ণনা করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ রাজা, রাজপারিষদ, ধূর্ত্ত, উদাসীন, ভৃত্য, এবং বেশ্যা। ইহার মধ্যে নীচজাতীয় পুরুষগণ স্ত্রীলোকের গ্যায় প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন করিবে। "হাস্তার্ণব" "কৌতুক সর্ব্বস্ব" এবং "ধূর্ত্ত নাটক" প্রসিদ্ধ প্রহসন।

এই দশ প্রকার রূপক। এক্ষণে অষ্টাদশ প্রকার উপরূপকের বিবরণ সংক্ষেপে বক্তব্য।

১। নাটিকা বা প্রকরণিকা প্রায় এক প্রকার। আদিরস উহার উদ্দেশ্য বিষয়। "রত্নাবলী নাটিকা" অতি প্রসিদ্ধ।

২। ত্রোটক ৫।৭।৮। বা নবম অঙ্কে সম্পূর্ণ। পার্থিব ও স্বর্গীয় বিষয় ইহার বর্ণনোদ্দেশ্য যথা "বিক্রমোর্ব্বশী।"

৩। গোষ্ঠী এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি ৯।১০ জন পুরুষ এবং ৫।৬টী স্ত্রী। "রৈবত মদনিকা" একখানি গোষ্ঠী।

৪। সট্টকে একটী আশ্চর্য্য গল্প আন্তোপান্ত প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইবে। যথা "কর্পূরমঞ্জরী।"

৫। নাট্যরাসক এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং বর্ণিত বিষয় প্রেম ও কৌতুক। ইহার আন্তোপান্ত অভিনয় কালে নৃত্য ও সঙ্গীতে সম্পন্ন হইবেক। "নর্ম্মবতী" ও "বিলাসবতী" এই দুইখানি নাট্যরাসক।

৬। প্রস্থান, নাট্য রাসকের গ্যায় কিন্তু ইহার নায়ক নায়িকা এবং নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দ অতীব নীচজাতীয়। ইহাও তাল লয় স্বর সংযোগে নৃত্য গীত পরিপূর্ণ এবং দুই অঙ্কে সমাপ্ত।

৭। উল্লাপ্য এক অঙ্কে গ্রথিত এবং প্রেম ও হাস্য ইহার জীবন। ইহার বিষয়টী পৌরাণিক এবং নাট্যে কথোপকথন মধ্যে সঙ্গীতগেয়। "দেবী মহাদেবম্" এই শ্রেণীভুক্ত।

৮। কাব্য, প্রেম বিষয়ক বর্ণন এবং এক অঙ্কে সমাপ্ত। ইহার মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত এবং কবিতা থাকিবে। "যাদবোদয়" একখানি কাব্য।

৯। প্রেঙ্খণ, বীররস প্রধান এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নায়ক নীচশ্রেণীর ব্যক্তি। "বালিবধ" প্রেঙ্খণে প্রসিদ্ধ।

১০। রাসক, হাস্তরস উদ্দীপক উপরূপক এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার পঞ্চব্যক্তি মাত্র অভিনেতা। নায়ক নায়িকা উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি এবং নায়ক মূর্খ তথা নায়িকা বুদ্ধিমতী হইবেক। "মেনকাহিত" একখানি রাসক।

১১। সংলাপক, এক, দুই, তিন, বা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নায়ক

প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। ইহার অধিকাংশ যুদ্ধাদি বর্ণন। "মায়া-কাপালিক" এই শ্রেণীভুক্ত।

১২। শ্রীগদিত, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। এবং ইহার নায়িকা লক্ষ্মী। ইহার অধিকাংশ সঙ্গীত। "ক্রীড়ারসাতল" একখানি শ্রীগদিত।

১৩। শিল্পক, চারি অঙ্কভুক্ত। শ্মশান ইহার রঙ্গস্থল এবং নায়ক ব্রাহ্মণ ও প্রতিনায়ক চণ্ডাল। ঐন্দ্রজাল ও আশ্চর্য্য ঘটনা শিল্পকের বর্ণনোদ্দেশ্য। "কণকাবতী-মাধব" এই শ্রেণীভুক্ত।

১৪। বিলাসিকা, এক অঙ্কে গ্রথিত। প্রেম ও কৌতুক ইহার বর্ণনোদ্দেশ্য।

১৫। দুর্ম্মল্লিকা, হাস্যরস প্রধান উপরূপক এবং চারি অঙ্কে সমাপ্ত যথা "বিন্দুমতী।"

১৬। প্রকরণিকা নাটিকার ন্যায়।

১৭। হল্লীশা, ইংরাজী "অপেরা" বা গীতাভিনয় সদৃশ। অভিনয়ে আদ্যোপান্ত সঙ্গীত ও নৃত্য হইয়া থাকে। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং অভিনয় কার্য্য একজন পুরুষ এবং ৮ বা ১০ জন স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া উচিত। "কেলী রৈবতক" এই শ্রেণীভুক্ত।

১৮। ভাণিকা, এক অঙ্গে সম্পূর্ণ এবং হাস্যরসময় যথা "কামদত্তা"।

রূপক ও উপরূপক লক্ষণে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন; সংস্কৃত ভাষায় হিন্দুদিগের ইউরোপীয়গণের ন্যায় সকল প্রকার দৃশ্য কাব্য বর্ত্তমান ছিল। সেক্ষপীয়র, করণীল, মলিএর, ভলটেয়ার প্রভৃতি কবিগণের ন্যায় ভারতবর্ষীয় কবিনিকর যদিও বহুসংখ্যক নাটক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণ যে সকল নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান কবির নাটকের ন্যায় উৎকৃষ্ট, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকর্ত্তব্য। দশরূপ, সাহিত্যদর্পণ, সাহিত্যসার, কুবলয়ানন্দ, প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থে যে সকল নাটকের উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকগণ সংস্কৃত নাটকের তাদৃক্ আদর করিতেন না। এমন কি স্যর উইলিয়ম জোন্‌সকে কেহই নাটকের—প্রকৃত বিবরণ উত্তম রূপ পরিজ্ঞাত করিতে পারেন নাই; তৎপরে অনেক কষ্টে রাধাকান্ত—নামক জনৈক ভূস্যুর তাঁহারে নাটক যে ইংরাজী "প্লের" সদৃশ, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। বঙ্গদেশীয়গণ পূর্ব্বে অন্যান্য নাটকাপেক্ষা "প্রবোধচন্দ্রোদয়" মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করিতেন। তৎপরে বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়, "জগন্নাথ বল্লভ," "ললিত মাধব," "বিদগ্ধমাধব," "দান কেলিকৌমুদী," প্রভৃতি নাটক আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন কিন্তু প্রকৃত কবিত্ব

শক্তিসম্পন্ন মহাকবি কালিদাস ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রধান কবিগণের দৃশ্য কাব্যের অধ্যাপনায় এককালে পরাঙ্মুখ ছিলেন। মাননীয় সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় আমাদিগের একটি প্রস্তাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক কণ্ঠস্থ ছিল,—তাহা থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্বে যে বঙ্গদেশে নাটকের অত্যন্ত আলোচনা ছিল, তাহার কোন প্রমাণ হইতেছে না। এখানে যদি নাটকের বহুল প্রচার থাকিত, তাহা হইলে সহজে এই বঙ্গদেশ হইতেই সংস্কৃত কালেজ ও এসিয়াটীক সোসাইটীর নিমিত্ত প্রসিদ্ধ নাটকগুলি সংগৃহীত হইত এবং তাহা হইলে কিজন্য এখানকার শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও উইলসন সাহেব বহুয়াস স্বীকার করিয়া কাশী কাঞ্চী পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করত "শকুন্তলা," "বিক্রমোর্ব্বশী," "মৃচ্ছকটিক," "উত্তর চরিত" প্রভৃতি সংগ্রহ করিবেন।

ইউরোপে নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে এজন্য তথায় নাটকের বহুল প্রচার। আমাদিগের দেশে অভিনয় প্রথা একাল পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিলে সকল প্রকার দৃশ্য কাব্যের লোপ হইত না। প্রায় প্রসিদ্ধ নাটক সমূহ অভিনয়ের জন্য রচিত। ভবভূতি নটগণের অনুরোধে, কালপ্রিয়নাথ মহাদেবের যাত্রা মহোৎসবে অভিনয়ের নিমিত্ত উত্তরচরিত রচনা করেন, "হয়গ্রীববধ" নাটক মাতৃগুপ্তের সভায় অভিনীত হইবার জন্য লিখিত হইয়াছিল, এতদ্ব্যতীত জগন্নাথের জন্মযাত্রা উপলক্ষে ও মদন মহোৎসবে বিবিধ নাটক রচিত হইত।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে নাট্যাভিনয়ে বিপুল অর্থব্যয় হইয়া থাকে। "এডিলফি" "হেমারকেট" এবং "থিয়েটার ফ্রান্সে" নাট্যগৃহে অসংখ্য অসংখ্য ব্যক্তি প্রতিবার অভিনয় দর্শনে গমন করিয়া থাকেন, ইহাতে নাটক রচকগণেরও খ্যাতি বিস্তার হয় এবং এক এক জন সুবিখ্যাত নট কিয়ৎকালের মধ্যে বিলক্ষণ ধন সঞ্চয় করেন। অতি অল্প দিবস হইল পারিসের থিয়েটরে ভিক্তর হ্যুগোর একখানি নাটকের অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ এত মোহিত হইয়াছিলেন, যে অভিনয় সমাধা হইলে সকলেই কবিকে একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং উচ্চস্বরে সহস্র সহস্র ব্যক্তিরা তাঁহার প্রশংসা ধ্বনি করিল। "ইতালীয় অপেরা" অর্থাৎ গীতাভিনয় ইউরোপীয়গণের অধিক প্রিয়। সঙ্গীতবিদ্যানিপুণা, সুমধুরভাষিণী প্রিয়দর্শনা পাটীর সঙ্গীত শুনিতে এক এক বার বিংশতি সহস্র লোক উপস্থিত হইয়া থাকে। এবারে কলিকাতায় ইতালীয় "অপেরা" আগমন না করায় সাহেব সমাজ যাহারপরনাই দুঃখিত হইয়াছেন, যদি লুইসের থিয়েটর শীত ঋতুতে না আসিত তবে কলিকাতার ন্যায় অমরাবতীতে তাঁহাদিগের বাস করা কঠিন হইয়া উঠিত। নাটকের অভিনয় দর্শন বিশুদ্ধ আমোদ। ইহাতে প্রসিদ্ধ কবিগণের

রচনা মনোমধ্যে উত্তমরূপ অঙ্কিত হয় এবং সমাজের কুরীতি সংশোধন প্রহসন দ্বারা যেমত হইয়া থাকে, এমত কিছুতেই হয় না। নীতিশাস্ত্র বিশারদগণের বক্তৃতা অপেক্ষা কবির ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা সমাজের অনেক উন্নতি হইয়া থাকে। "উভয় সঙ্কট" ও "চক্ষুদান" প্রহসনের অভিনয় দর্শনে অনেক বহুবিবাহপ্রিয় এবং লম্পটের চৈতন্য হইয়াছে।

আমাদিগের বঙ্গীয় সমাজে দিন দিন বিদ্যার বিমল বিভা বিস্তারিত হইতেছে বটে, কিন্তু এপর্য্যন্ত সুসভ্যগণের ন্যায় রুচির পরিবর্ত্ত না হওয়ায় অত্যন্ত পরিতাপিত হইতেছি। যে আর্য্যজাতি উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিত স্বরে সামবেদ গান করিয়া কাননস্থ পশু পক্ষীকেও মোহিত করিতেন, যাহারা সঙ্গীত শাস্ত্রে অতি প্রবীণ, যাহাদের সুধাসম কাব্যরস দিগ্দিগন্তবাসী মানবেরা পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছে, যে আর্য্যজাতির নাট্য প্রথা চিরপ্রসিদ্ধ, অদ্য সেই আর্য্যজাতির অগ্নিস্ফুলিঙ্গসম তেজোরাশি, যবনগণের পদবিমর্দ্দনে এককালে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। আর সে তেজ নাই, সে বুদ্ধি নাই, সে বিদ্যা নাই, কাজেই আমরা দুর্ব্বল, ক্ষীণ "কুখ্যাত জগতে" অথবা

"—সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা——"

কাজেই আমাদিগের রুচির পরিবর্ত্ত হইতেছে। মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলার নাট্যাভিনয়ের পরিবর্ত্তে, যাত্রার কুৎসিত আমোদে অনুরক্ত হইয়াছি। একি সাধারণ পরিতাপের বিষয়! কোথা অভিনয় কালে ভবভূতির উত্তরচরিতে বৈদেহীবিলাপ শ্রবণে হৃদয় বিলোড়িত হইবে, মালতীমাধবে নিঝরমালায় সুশোভিত পর্ব্বতের বিচিত্র চিত্রপট সন্নিকটে চিরযোগিনী সৌদামিনীকে দেখিয়া মনোমধ্যে শান্তরসোদয় হইবে, এবং কোথা মুদ্রারাক্ষসে নীতিশাস্ত্রবেত্তা চানক্যের বুদ্ধি কৌশলের একশেষ উদাহরণ পাইয়া আধুনিক মেকায়ভেলীকেও তুচ্ছবোধ হইবে, তাহা না হইয়া গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় মান ভঞ্জন গানে অনুপ্রাসচ্ছটা এবং অর্থশূন্য মধুকাইনের গীত শ্রবণে, রামযাত্রায় শীর্ণকায় "কাগজের মুখসে" মুখাবৃত রাবণের বীরত্ব প্রকাশ এবং কালুয়া ভুলুয়ার কুৎসিত মুখভঙ্গী দর্শনে, বিরক্ত না হইয়া আনন্দজনক বোধ করিয়া থাকি। বঙ্গ সমাজের হিতচিকীর্ষু ব্যক্তি এ সকল দর্শনে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হয়েন তাহা বর্ণনাতীত। যাত্রার ন্যায় কুৎসিত আমোদে মনের ভাব কলুষিত হইয়া যায়। কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের এ সকল আমোদ সন্দর্শন করা কখনই উচিত নহে। আজি কালি আমাদিগের জাতীয় বিশুদ্ধ আমোদের হীনাবস্থা সন্দর্শনে অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালীগণ ইংরাজী থিয়েটর বা "অপেরায়" গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় সম্প্রতি একটী জাতীয়

নাট্যশালা স্থাপিত হওয়াতে আমাদিগের মনঃকষ্ট অনেক নিবারণ হইয়াছে। এক্ষণে ইহার শৈশবাবস্থা এজন্য কার্য্য প্রণালীর দিন দিন উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে এবং তাহা হইলেই কবির এই খেদগান সফল হইবে—

"অলীক কুনাট্য রঙ্গে,
মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে,
বিষবারি পান করে
তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়।
মধুবলে জাগ মাগো, (ভারত ভূমি)
বিভুস্থানে মাগ,
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয়"।

প্রস্তাবের উপসংহার কালে নাট্যামোদী ও সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রিয় রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর ও তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতাকে আমাদিগের আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহাদিগের প্রযত্নে বোধ হয় সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্র প্রাচীন শ্রী পুনর্ধারণ করিবে।

শ্রীরামদাস সেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ। আদিবৃত্তান্ত।

মনুষ্য স্বভাবতঃ সকল বিষয়ের আদি কথা জানিতে অতি ব্যগ্র। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপন্যাস শ্রবণকালে দেখা যায়। নিতান্ত মিথ্যা বলিয়া জানিলেও উপন্যাসের আদ্যন্ত জানিবার জন্য প্রবল কৌতূহল উপস্থিত হইয়া থাকে। সেইরূপ কোন কার্য্য দেখিলে, তাহার কারণ; অথবা কোন ঘটনার বিষয় জানিলে, তাহার আদি বৃত্তান্তের প্রতি আমাদিগের মন স্বভাবতঃ ধাবিত হয়। ইহার এক মহদ্দোষ এই যে সেই আদিবৃত্তান্ত বা কারণের অস্তিত্ব এবং লক্ষণসংক্রান্ত কোন পরিষ্কার প্রমাণ না থাকিলেও তত্তদ্বিষয়ের নানা প্রকার কল্পনা উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহাদিগের কল্পনা শক্তি প্রচুর পরিমাণে নাই, তাঁহাদিগের মন এক একটী কল্পনাতেই সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন কল্পনাকে স্থান দিতে অক্ষম হয়। সুতরাং ইঁহারা সেই কল্পনাটীকেই অব্যর্থ সত্য জ্ঞান করেন।

এই প্রকার চরিত্রের দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়; এবং বোধ হয় মানব মনের এই প্রকৃতিই ধর্ম্মসংক্রান্ত অনেক বিসম্বাদের মূলীভূত কারণ। কোন ব্যক্তিকে অল্পভাষী দেখিলে, তাঁহার সহিত যাঁহারা প্রথম সাক্ষাৎ করেন, তন্মধ্যে কেহ মনে করেন ইনি আত্মম্ভরি; কেহ বলেন ইনি নির্ব্বোধ; কেহ স্থির করেন ইনি ক্রূর; এইরূপ নানা লোকে নানা কল্পনা করেন। কেহ কাহার নিকট ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তৎক্ষণাৎ ক্ষতিকারকের দুরভিসন্ধিকেই তাহার হেতু কল্পনা করিয়া লন। চিকিৎসকেরা পদে পদে রোগের আদিবিষয়ের কল্পনা করেন এবং সেই হেতু তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ হইয়া বিষম সঙ্কট উপস্থিত হয়। বিচারক বাদী প্রতি-বাদীর কথা শ্রবণ করিলে সহজেই তাঁহার একটী কল্পনা উপস্থিত হইবেক। কোন কোন ব্যক্তির সংস্কার আছে যে ইহা ঈশ্বরপ্রদত্ত দিব্য জ্ঞান; এবং ইহাকে সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করাই "ন্যায়বান্ বিচারকের" কর্ত্তব্য!

ফলতঃ যখন কোন বিষয়ের নিগূঢ় কি আদিবৃত্তান্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন প্রথমতঃ এই স্থির করা আবশ্যক যে মনোগত কথাটী,—কল্পিত কি প্রকৃত। অনন্তর কল্পিত হইলে তদ্বিষয়ে যতগুলি কল্পনা হইতে পারে তাহা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কল্পনা করিবার সময়ে একটীতে সন্তুষ্ট থাকিলে অচিরাৎ তাহাকেই সত্য মনে হয়। কারণ, তাহার সহিত সত্যের প্রভেদ কি তাহা শীঘ্রই স্মৃতিবহির্ভূত হইয়া যায়। মনই আমাদিগের জ্ঞানের ভাণ্ডার, সুতরাং কোন বিষয়ে একটীমাত্র কথা মনে ধারণ করিলে তাহাকেই প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া সংস্কার হয়। কিন্তু এক বিষয়ে বিভিন্ন কল্পনা উদয় হইলে, নির্ব্বাচনক্রিয়া এবং তন্নিবন্ধন কল্পনা সমূহের মধ্যে তারতম্য জ্ঞান স্বভাবতই হইতে পারে।

এতদ্দেশে জাতিভেদ নিয়ম দেখিলেই মনে হয়—"কি প্রকারে এরূপ হইল?" অমনি, পুস্তকে ও লোকমুখে পাওয়া যায় যে জাতি চারি প্রকার; এবং তাহারা ব্রহ্মার মস্তক, বাহু, দেহ এবং পাদ হইতে উৎপন্ন। এই কল্পনা এতই প্রবল যে ইহা সম্ভব কি না তাহার বিচার করা দূরে থাকুক, বাহু এবং দেহ হইতে উৎপন্ন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি কোথায় এবং দ্বিপাদ হইতে এত প্রকার শূদ্র কিরূপে উৎপন্ন হইল এই সকল আপত্তি অনেকের মনে উদয় হয় না। একেবারেই পরিষ্কার সিদ্ধান্ত উপস্থিত, যে পাদোৎপন্ন শূদ্রগণ মস্তকোত্থিত ব্রাহ্মণসমীপে নিতান্ত অপকৃষ্ট। ভাবিতে ভাবিতে শূদ্র নিতান্ত দীনাভাবাপন্ন হয়েন, এবং ব্রাহ্মণের প্রাচীন অগ্নিশর্ম্মা মূর্ত্তি কথঞ্চিৎ উপস্থিত হয়।

এই পর্য্যন্ত পাঠ করিলেই বোধ হয় অনেক পাঠক আমাদিগের প্রতি কটু কাটব্য আরম্ভ করিবেন। তাঁহাদিগের মতে ব্রহ্মার শরীর হইতে জাতির উৎপত্তি বৃত্তান্ত শ্রুতিমূলক, লৌকিক কল্পনা নহে; যাহারা ইহার প্রতি সন্দেহ করে তাহারা বিধর্ম্মী।

কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রেই আবার এই কথা পাওয়া যায় যে বর্ণচতুষ্টয় এক জাতি হইতে উৎপন্ন, কর্ম্মদোষে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে পরিগণিত হইয়াছে। এই দেখ।

"ভৃগু কহিলেন, তপোধন! ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সমুদায় জগৎই ব্রহ্মময়, মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণপ্রভাবে কামভোগ প্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব, যাঁহারা রজঃ ও তমোগুণ প্রভাবে পশুপালন ও কৃষি কার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব এবং যাহারা তমোগুণ প্রভাবে হিংসা পরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্ব কর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপে কার্য্যদ্বারাই পৃথক পৃথক বর্ণলাভ করিয়াছেন।"

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়, ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

বৃত্তান্তদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টী অপেক্ষাকৃত বিশ্বাস্য তাহার বিচার করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে; কিন্তু দুটী যে সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন ইহা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন। একটী সত্য হইলে অপরটীকে মিথ্যা মনে করিতে হইবেক। একটী বৃত্তান্ত গ্রহণ করিলে প্রত্যেক জাতির আদি বিষয়ে এক অদ্ভুত ঘটনা বিশ্বাস করিতে হয়, কিন্তু সকল জাতিই এক ব্রহ্মা হইতে পৃথক রূপে স্বাধীন ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে একথা মানিতে হইবেক। তবে দৈহিক অঙ্গ পরস্পরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সম্বন্ধ স্বীকার করিলে চারি জাতিমধ্যে কি কারণে কেহ হীন কেহ প্রধান তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। দ্বিতীয় বৃত্তান্ত অনুসারে, ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মদোষে জাতিভেদ হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইলেন তাহা প্রকাশ নাই। মনে কর যে তাঁহারা ব্রহ্মারই সৃষ্ট। কোন সময়ে কালে সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ কুক্রিয়াসক্ত হওয়াতে হীনবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। এবং এখনকার শূদ্রগণ সেই কুক্রিয়াসক্ত ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মদোষের ফলভোগ করিতেছেন। অতএব আদি ব্রাহ্মণদিগের গুণ ইহাদের শরীর স্পর্শ করিতে পারে নাই এবং নিজ নিজের গুণ থাকিলেও তাহা কর্ম্মণ্য নহে, এই কথা বিশ্বাস করিলে উল্লিখিত দ্বিতীয় বৃত্তান্ত সম্মত হইতে পারে।

আর এক কল্পনা দেখ।

ব্যতিরিক্তেন্দ্রিয়ো বিষ্ণুর্যোগাত্মা ব্রহ্মসম্ভবঃ।
দক্ষ প্রজাপতি ভূত্বা সৃজতে বিপুলাঃ প্রজাঃ॥
অক্ষরাদ্‌ ব্রাহ্মণাঃ সৌম্যাঃ ক্ষরাৎ ক্ষত্রিয় বান্ধবাঃ।
বৈশ্যা বিকারতশ্চৈব শূদ্রা ধূম বিকারতঃ॥

মুরোদ্ধৃত হরিবংশ বচন।

অর্থ। বিষ্ণু যিনি ইন্দ্রিয় পরিত্যাগ করিয়াছেন; যাঁহার স্বরূপ, যোগ, যাঁহার উৎপত্তি, ব্রহ্ম (বা ব্রহ্মা) হইতে; তিনি দক্ষ প্রজাপতি হইয়া বহুতর প্রজাদিগকে সৃষ্টি করেন। সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণগণ অক্ষর (অনশ্বর) হইতে, ক্ষত্রিয়গণ ক্ষর (নশ্বর) হইতে, বৈশ্যেরা বিকার হইতে, শূদ্রেরা ধূমবিকার হইতে (উৎপন্ন হয়।)

আবার দেখ।

ব্রাহ্মাণং পরমং বক্ত্রাৎ উদগাতারঞ্চ সামগং।
হোতারং অথচাধ্বর্য্যুং বাহুভ্যাং অসৃজৎ প্রভুঃ॥
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণত্বাচ্চ প্রস্তোতারং চ সর্ব্বশঃ।
তং মৈত্রাবরুণংসৃষ্ট্বা প্রতিষ্ঠাতার মেবচ॥

উদরাৎ প্রতিহর্ত্তারং পোতারং চৈব ভারত।
অছাবাকং অথোরুভ্যাং নেষ্টারং চৈব ভারত॥
পানিভ্যাং অথচাগ্নীধ্রম্ ব্রহ্মণ্য চৈবং যজ্ঞিয়ং।
গ্রাবাণমথ বহুভ্যাং উন্নেতরঞ্চ যাজ্ঞিকং॥

ঐ ঐ

অর্থ। হে ভারত (বৈশম্পায়ন!) ভগবান, মুখ হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাকে এবং সামবেদগানকারী উদগাতাকে সৃষ্টি করিলেন; হোতাকে এবং অধ্বর্য্যুকে দুই বাহু হইতে; ব্রহ্ম (অথবা ব্রহ্মা) এবং ব্রাহ্মণত্ব হইতে, যাবতীয় প্রস্তোতাকে সেই মৈত্রাবরুণকে এবং প্রতিষ্ঠাতাকে সৃষ্টি করিয়া, উদর হইতে প্রতিহর্ত্তাকে এবং পোতাকে (সৃষ্টি করিলেন।) পরে অছাবাক এবং নেষ্ঠাকে উরুদ্বয় হইতে; অগ্নীধ্রকে এবং যজ্ঞ সম্বন্ধীয় ব্রহ্মণ্যকে করযুগল হইতে; পরে গ্রাবাকে এবং যজ্ঞ সম্বন্ধীয় উন্নেতাকে বাহুযুগল হইতে (সৃষ্টি করিলেন!)

অতএব ব্রহ্মার শরীর হইতে যে কেবল চতুর্বর্ণই সৃজিত হইয়াছিল এমত নহে। আর এই সকল যাজ্ঞিকেরা বাহু, কর উদর এবং উরু হইতে উৎপন্ন হইলেও কি ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে পরিণিত হয়েন নাই?

পাশ্চাত্যেরাও নানা কল্পনা করেন। তাঁহারা বলেন যে দ্বিজগণ ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহেন। যুনানি মুসলমান এবং ইংরাজদিগের ন্যায় জয়াধিকার করিয়া প্রাচীন ভারতবাসীদিগকে দস্যু এবং রাক্ষস নামে আখ্যায়িত করেন এবং তাহাদিগের মধ্যে যাহারা দ্বিজগণের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা শূদ্র শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া দাস পদবী ধারণ করে। আর দ্বিজগণ অন্যান্য জাতির ন্যায় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ধর্ম্মোপদেশক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, যুদ্ধব্যবসায়ী অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, এবং অপর সাধারণ অর্থাৎ বৈশ্য শ্রেণী। শূদ্র জাতি আর্য্য বংশীয় নহে।

প্রোফেসর কের্ণ বলেন, যে বেদ প্রণয়ন কালেই যে জাতিভেদ সৃজিত হইয়াছিল এ কল্পনা অমূলক। ইহার প্রমাণ বেদেই পাওয়া যায়। বিশেষতঃ পার্সী জাতির গ্রন্থ জেন্দাভেস্তাতে নরগণ চারি বর্ণে বিভক্ত হইবার বৃত্তান্ত আছে। পাশ্চাত্যদিগের মতে আর্য্য ও পার্সী জাতিগণ এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া কেহ ভারতবর্ষে এবং কেহ পারস্যদেশে গমন করেন। পরে পার্সীগণ যে শেষোক্ত দেশ হইতে আসিয়া বোম্বাইতে বসবাস করিতেছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং ভারতবর্ষেই যে চতুর্থ অর্থাৎ শূদ্রবর্ণের আদিবাস একথা অগ্রাহ্য হইতেছে। **(Sherring's Hindoo tribes and castes.)**

হণ্টর বলেন যে আর্য্যজাতি বর্ণভেদ হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ও উড়িষ্যাতে আসিয়া বাস করেন তাহাতেই মনুপ্রোক্ত চারিজাতি এতদ্দেশে দেখা যায় না (Rural Bengal. p 88-140 Orissa p 241)

পাঠক বুঝিবেন যে আমরা কেবল স্বজাতিকেই কল্পনাপ্রিয় বলিয়া নিন্দা করি না।

ফলতঃ জাতিভেদের আদিবৃত্তান্ত সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার প্রমাণ নাই। যে যাহা বলে সমস্তই কল্পনা মূলক। জগতে নৈসর্গিক নিয়মের অতিক্রম হইতে পারে, যাঁহারা এ কথা স্বীকার করেন না তাঁহারা কাজে কাজেই এদেশীয় কল্পনা-সমূহ পরিত্যাগ করেন। এবং পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে উপরোক্ত কল্পনাত্রয়ের প্রথমটী অপেক্ষাকৃত প্রবল থাকাতে অনেকে তাহাই গ্রহণ করেন। আমাদিগের বিবেচনাতে এ কথার মীমাংসা হওয়া দুঃসাধ্য।

পরন্তু ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপত্তি বিষয়ক বর্ণনাটিকে উৎকৃষ্ট কাব্যরসোদ্দীপক এবং নীতিগর্ভ রূপক বিশেষ বলিয়া জ্ঞান হয়। সমস্ত মনুষ্য মণ্ডলীকে একটি অভিন্নদেহধারী ব্যক্তি বলিয়া ভাবনা করিলে জাতিবর্গের মধ্যে অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকা অনুভূত হইবেক। যেমন দেহ মধ্যে হস্ত পদাদির পরিশ্রমে উদর পরিতৃপ্ত হয়, অনন্তর সেই উদরজীর্ণ পদার্থ হইতে আবার হস্তপদাদি পুষ্টিলাভ করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যেও তাহাদিগের পরস্পরের সাহায্য দ্বারা সমগ্র চাতুর্ব্বর্ণ সমাজ উন্নত হয়। যেমন শরীরের অঙ্গ সমূহের মধ্যে ন্যূনাতিরেক মনে করা বৃথা ; কারণ একটির অভাবে সকলেই কষ্ট পায়, সেইরূপ হীনতম বর্ণের সাহায্যও তাবতের পক্ষে নিতান্ত মঙ্গলকারী এবং তাহার হীনতা কেবল কল্পিত মাত্র। ব্রাহ্মণ শূদ্র বিভিন্ন নহে, এক নরমণ্ডলীর দেহমধ্যে পৃথক পৃথক অঙ্গরূপে উভয়েই একত্র বিরাজ করেন।

অন্যান্য দেশেও জাতিভেদ দৃষ্ট হয় একথা বলিয়া আমাদিগের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগকে নিরস্ত করা অসাধ্য। তাঁহারা বলিবেন যে ঐ সকল দেশস্থ জাতি সমূহ এতদ্দেশীয় চতুর্ব্বর্ণ হইতে ভিন্ন নহে ; পবিত্র ভারতভূমি পরিত্যাগ করাতেই তাহারা পতিত হইয়া আছে। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে আমাদিগের ও অন্যান্য দেশের জাতিভেদ ব্যবস্থার মধ্যে এত বৈলক্ষণ্য প্রকাশ হয় যে কোন মতেই উভয়েরই আদি এক বলা যায় না। যাহা হউক আমরা এখন কেবল সাদৃশ্যের বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিব।

জাতিভেদের কয়েকটী প্রধান লক্ষণ এই।

(১) জন সমাজ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

(২) প্রত্যেক শ্রেণিস্থ লোকের জন্য কতিপয় ব্যবসা নির্দ্দিষ্ট আছে,

তদ্দ্বারা তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। এবং এক শ্রেণির লোক অন্য শ্রেণির ব্যবসা গ্রহণ করিতে পারেন না।

(৩) লোকের বংশাবলী পিতৃপৈতামহিক শ্রেণিভুক্ত হইয়া সেই শ্রেণির ব্যবসা অবলম্বন করে।

(৪) শ্রেণি পরস্পরার মধ্যে ক্রমান্বয়ে প্রাধান্যের তারতম্য আছে।

আর দেখিতে পাওয়া যায় যে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বিবাহ এবং আহারোপবেশন বিষয়ে নিষেধসূচক কতিপয় নিয়ম আছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহার দ্বারা কেবল উপরোক্ত লক্ষণগুলি সম্যক প্রকারে রক্ষিত হয় এই জন্য তৎসমুদায় কেবল আনুষঙ্গিক বলিয়া গণ্য।

উল্লিখিত লক্ষণগুলি কিয়ৎপরিমাণে অন্যান্য দেশেও পাওয়া যায়। ইংরাজ দিগের মধ্যে ঠিক চারিটি শ্রেণী না থাকুক, শ্রেণি আছে বটে। তেমন এতদ্দেশেও বর্ত্তমানকালে জাতির সংখ্যা নিশ্চিত নাই। ইংরাজদিগের লার্ড সম্প্রদায় একটী পৃথক জাতি। লার্ডদিগের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা সকলেই লার্ড শ্রেণীভুক্ত হয়েন এবং কনিষ্ঠেরা সকলেই লার্ড না হউন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও শ্রমোপজীবী শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিতে প্রায় দেখা যায় না। আমাদিগের ন্যায় ইংরাজদিগের মধ্যেও নামের পদবী জানিলে ভদ্র কি অভদ্র বংশীয় তাহা স্থির হইতে পারে। ব্যবসার বিষয়েও কতকগুলি শ্রেষ্ঠ এবং কতকগুলি নিকৃষ্ট ব্যবসা বলিয়া গণ্য হয়; ব্যারিষ্টর ও ডাক্তারগণ স্ব স্ব ব্যবসার সম্ভ্রমে গদগদ চিত্ত হয়েন। আমাদিগের ভদ্রসন্তানগণ যেরূপ কোন কোন দোষের জন্য সর্ব্বসাধারণের সমীপে অতিশয় নিন্দনীয় হইয়া থাকেন সেইরূপ অটর্নি এবং ঔষধি বিক্রেতা শ্রেণির মধ্যে যে দোষ কেহ তাদৃশ লক্ষ্য করিবেক না, বারিষ্টর কিম্বা ডাক্তার শ্রেণিতে তাহা প্রকাশ হইলে মহা কোলাহল উপস্থিত হয়। বিবাহ বিষয়ে এতই উৎকট নিয়ম আছে যে, অন্য কি মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর কন্যা একজন সম্ভ্রান্ত অমাত্য পুত্রকে বিবাহ করাতে সহোদর ও সহোদরপত্নী কর্ত্তৃক এক প্রকার বর্জ্জিত হইয়াছেন। তবে আমাদিগের সমাজে এতাদৃশ বিবাহ হইতেই পারিত না, কিন্তু বিবাহ হইলে উভয় দেশে প্রায় তুল্যাবস্থাই ভোগ করিতে হয়।

আমরা মনে করিয়া থাকি যে হিন্দুরাই স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইতে চাহেন না। কিন্তু ইংরাজেরাও দেশাচারের প্রতি আসক্তিতে আমাদিগের অপেক্ষা অধিক হীন নহেন। তবে তাঁহারা বলবান, বিদেশেও বাহুবলদ্বারা জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন। আমাদের তাদৃশ ক্ষমতা নাই সুতরাং স্বদেশেই আবদ্ধ হইয়া থাকি।

ইংরাজদিগের মধ্যে এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে যে স্বদেশে কি বিদেশে,

স্বজাতির আইন ভিন্ন তাঁহাদিগের বিচার হইবেক না। যে দেশের রাজা এই নিয়ম স্বীকার না করেন সেখানে ইংরাজেরা গমনাগমন করেন না, তবে কোন রাজা দুর্ব্বল হইলে এবং তাঁহার রাজ্যে ধনলাভের আশয় থাকিলে ভয় মিত্রতার দ্বারা উক্ত নিয়মানুসারে সন্ধিস্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। একবার সন্ধি হইলে তৎক্ষণাৎ একজন কন্‌সল বা রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইবেন। তিনি স্বদেশীয় লোকদিগের প্রতি যাহাতে কেহ অত্যাচার করিতে না পারে তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন ; সুবিধার জন্য কোন কোন স্থানে তাঁহার আজ্ঞাধীন দুই একখানি রণতরীও থাকে। অতএব যেখানে রাজার এরূপ সাহায্য সেখানে বিদেশ গমনাগমনের ভাবনা কি ? আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা বুঝিয়াছিলেন যে বিদেশে হিন্দুদিগের স্বধর্ম্ম রক্ষা করা দুষ্কর সুতরাং যাতায়াত নিষেধ করাই ভাল। এবিষয়ে য়িহুদিদিগের এক বিশেষ গুণ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা সর্ব্বত্র গমনাগমন পূর্ব্বক সকল দেশের আইন প্রতিপালন করেন এবং বিজাতীয় বলিয়া কোন ব্যবস্থার সহিত বিরোধ করেন না।

আমরা বিজাতীয় লোককে স্বজাতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দিই না। বিদেশীয়েরা এখানে আসিয়া যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি করিলে কেবল ভারতবর্ষ কেন আশিয়ার অধিকাংশ ভাগেই তাহা নিবারণের চেষ্টা হইয়া থাকে। ইহাতে আমরা পাশ্চাত্য দিগের নিকট বর্ব্বর বলিয়া গণ্য হইয়াছি, এবং জাতিভেদ নিয়মই সমস্ত দোষের আধার হইয়াছে। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকাতে অন্য উপায়ের দ্বারা ঠিক এই উদ্দেশ্যই সুসিদ্ধ হইতেছে। তথায় লোক আসিলে এত মাস্থল দিতে হয় যে তাহাতেই আগমন নিষিদ্ধ হয়। এই কারণে অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত বিকটোরিয়া নামক স্থানে চিনিয়া পুরুষদিগের গতিবিধি প্রায় বন্ধ হইয়াছে। আমেরিকার লুইসিয়ানা এবং অন্য কতিপয় স্থানে এই নিষেধ দণ্ডবিধানের দ্বারা বলবৎ করা হয়। এবং কালিফর্ণিয়াতেও এই উদ্দেশ্যে বিস্তর মাস্থল নির্দিষ্ট আছে। (Dilke's Greater Britain) অতএব চিনিয়ারা ইচ্ছা করিলেই যে ঐ সকল সুসভ্য দেশে প্রবেশ করিতে পারে এমত নহে ; তবে কেবল হিন্দুদিগের মধ্যেই ভিন্ন জাতির সমাগম নিষিদ্ধ কি প্রকারে বলা যায় ?

আর প্রাগুক্ত দেশে প্রবেশ করিলেই যে বসবাস করা যায় এমত নহে। তথায় ভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের পৃথক পৃথক সম্প্রদায় আছে ; তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে কোন বৃত্তি অবলম্বন করা যায় না। কিন্তু তাহাদিগের নিয়ম এই যে বিদেশীয় ব্যক্তিগণকে আত্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রহণ করিব না। এই নিয়মের সহিত আমাদিগের সমন্বয় প্রথার কতক সাদৃশ্য দৃষ্ট হইবেক !

আমরা বিদেশীয়দিগকে চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে গণনা করিতে চাহি না। কারণ

আমরা ব্রহ্মার দেহ হইতে উৎপন্ন ; উহাদিগের সংস্পর্শে আমরা পতিত হইব। এখন দেখা যাউক যে আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াবাসী ইংরাজগণ কি হেতু প্রদর্শন করিয়া স্বজাতির মধ্যে চিনীয়দিগকে গ্রহণ করিতে চাহেন না।

তাঁহারা স্পষ্টই বলেন যে "এতদ্দ্বারা আমাদিগের শ্রেণি পরম্পরার লোক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবেক এবং তন্নিবন্ধন আমাদিগের জীবিকার বিঘ্ন ঘটিবেক। যেখানে ৫০ জন কর্ম্মকার কি কুম্ভকার যথাযোগ্য পরিমাণে উপার্জ্জন করিতেছে ; সেখানে ৫১ জন হইলে ৫০ জনের কিঞ্চিৎ ক্ষতি ভিন্ন অতিরিক্ত ১ জনের সংস্থান হইতে পারে না, কিন্তু একজন চিনীয়ার জন্য আমরা এই ক্ষতি কেন স্বীকার করিব।"

ইংলণ্ডের অর্থশাস্ত্রবেত্তারা বলেন "যে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে সমস্ত লোকের গতিবিধি এবং সর্ব্বপ্রকার পণ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানি থাকিলে এক দেশের সুলভ দ্রব্য ও নিষ্কর্ম্মা লোক অন্য দেশে প্রেরিত হইয়া সর্ব্বত্র দ্রব্যের মূল্য ও মজুরের বেতন সমান হইবেক, সুতরাং দেশভেদে আর লোকের আয়ব্যয়ভেদ থাকিবেক না ; সমস্ত পৃথিবী একটি রাজ্যের ন্যায় হইবেক।" কিন্তু তাহাদিগের প্রতিপক্ষেরা বলেন যে, "আমেরিকাতে ও অষ্ট্রেলিয়াতে মজুর ও কারিকরের সংখ্যা অল্প এইজন্য তাহাদিগের বেতন ও দ্রব্যের মূল্য অধিক কিন্তু বিদেশীয় মনুষ্য ও দ্রব্যজাতের আমদানির পথ খুলিয়া আমাদিগের দেশস্থ লোক কর্ম্ম পাইবেক না, এবং দেশীয় দ্রব্যের উঠিবেক না। সুতরাং ক্রমশঃ উভয়ই বিলুপ্ত হইয়া বিদেশীয় লোক ও বিদেশীয় দ্রব্যের প্রতি সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতে হইবেক। কিন্তু যদি ঐ সকল লোকের পূর্ব্ব বসতি এবং ঐ সমস্ত দ্রব্য উৎপন্নকারী রাজ্যের সহিত আমাদিগের কখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন অবশ্যই সেই সমস্ত দেশ হইতে আমাদিগের দেশে দ্রব্যাদির রপ্তানি বন্ধ হইবেক, এবং তদ্দেশস্থ লোক আমাদিগের রাজ্য মধ্যে থাকিয়া আমাদিগেরই শত্রুতা করিবেক। তখন আমরা কি করিব? অতএব আমেরিকার এবং অষ্ট্রেলিয়ার রাজনীতিজ্ঞদিগের মতে যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যুদ্ধ বন্ধ না হয়, তদবধি দ্রব্যের মূল্য ও মজুর কারিকরের বেতন বিষয়ে কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও স্বদেশের এইরূপ স্বাধীনতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

আমরা এই গুরুতর তর্ক, মীমাংসা করিবার জন্য উত্থাপন করি নাই। সকল কথারই দুই পক্ষ আছে। জাতিভেদের বিরুদ্ধ পক্ষই এখন বলবান্, কিন্তু ইহার স্বপক্ষীয় কথা এখনও পৃথিবীর অনেক সভ্য প্রধান দেশে গ্রাহ্য হইতেছে। শাস্ত্র-কারেরা যদি এসকল কথা মনে করিয়া থাকেন তবে তাঁহারা নব্য যুবক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক কেনই উপহসিত হইবেন, তাহা বুঝিতে পারি না। আর একটি কথাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে জাতিভেদের অনুরূপ নিয়ম অন্যদেশেও আছে, কিন্তু

সেখানকার লোকেরা এই সকল নিয়মকে অনাদি অনন্ত বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা সকলেই স্বজাতির উন্নতি চেষ্টাতে ব্যগ্র, কেবল আমরাই জাতিভেদ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া সহস্র হেতু থাকিলেও তাহার ব্যত্যয় করিতে ইচ্ছা করি না।

জাতিভেদের আদি বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনুলোম ও প্রতিলোম নামে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ সংক্রান্ত দুই বিধান ছিল। অধঃস্থ জাতির কন্যা বিবাহের নাম অনুলোম বিবাহ, এবং ঊর্দ্ধস্থ জাতির কন্যা গ্রহণের নাম প্রতিলোম বিবাহ। কলিকালে দুই নিষিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বে অনুলোম অপেক্ষা প্রতিলোম বিবাহ অধিকতর নিন্দনীয় ছিল, এবং শেষোক্ত বিবাহ প্রায় প্রচলিতই ছিল না।

এই বিষয়ে কৌলীন্য প্রথা ও জাতিভেদ নিয়মের মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। তাহা বুঝিবার জন্য উক্ত প্রথার সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। আমরা এই বিবরণ প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক হইতে গ্রহণ করিলাম। আমরা এ বিষয়ের জন্য যে অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাতে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে এ বিষয়ের এরূপ পরিষ্কার বৃত্তান্ত, কি ইংরাজি কি বাঙ্গালা অন্য কোন পুস্তকে অথবা কোন লোকের মুখে কোথাও পাই নাই।

পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণ দুই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। কান্য-কুব্জাগত এবং সপ্তশতী। অর্থাৎ আদিসুর রাজার সময়ে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আইসেন তাঁহাদিগের বংশাবলী এবং তৎ পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণ বংশ। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে আদান প্রদান দুই পূর্ব্বাপর নিষিদ্ধ আছে। পরে যখন কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ বহুসংখ্যক হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহাদিগের মর্য্যাদা রক্ষা অথবা সদাচার বিষয়ে উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ রাজা বল্লালসেন তাঁহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। ১ মুখ্য কুলীন, ২ শ্রোত্রীয়, ৩ গৌণ কুলীন। ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রতিলোম বিবাহ সর্ব্বতোভাবে এবং প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে অনুলোম বিবাহও নিষিদ্ধ হইল। অর্থাৎ শ্রোত্রীয় পাত্রের সহিত মুখ্য কুলীন কন্যার বিবাহ, গৌণ কুলীন পুত্রের সহিত শ্রোত্রীয় কন্যার, এবং গৌণ কুলীন কন্যার সহিত মুখ্য কুলীন পুত্রের বিবাহ, এই তিন প্রকার বিবাহ নিষিদ্ধ হইল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই ঐ নিয়ম লঙ্ঘন হইয়া, মুখ্য কুলীন বংশ হইতে নূতন তিনটি শ্রেণী উৎপন্ন হইল। যথা ১, প্রতিলোমবিবাহঘটিত শ্রোত্রীয় পাত্রে কন্যাদাতা। ২, অনুলোম বিবাহঘটিত গৌণ কুলীন কন্যাগ্রাহী। এবং ৩, এই দুই শ্রেণীস্থ কন্যাগ্রাহী। ইহারা সকলেই বংশজ নামে শ্রোত্রীয়দিগের নিম্ন ভাগে এক শ্রেণীতেই পড়িলেন। আর

শ্রোত্রীয় ও গৌণ কুলীনদিগের মধ্যে যে সকল অনিয়ম বিবাহ অবশ্যই হইয়া থাকিবেক, তাহাতে নূতন শ্রেণী না হইয়া বরং উক্ত শ্রেণীর বিভেদ কতক লুপ্ত হইল এবং এক শ্রোত্রীয় শ্রেণির মধ্যে শুদ্ধশ্রোত্রীয় ও কষ্ট শ্রোত্রীয় নামে এই দুটী বিভাগ থাকিল।

রাজা বল্লালসেনের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল না, কিন্তু লোকের মনে তাঁহার বাসনা বিলক্ষণ জাগরূক থাকিল। ব্রাহ্মণগণ সদাচারী হইলেন না, কিন্তু বন্দোবস্তের দ্বারা তাঁহাদিগের দোষ নিবারণ হইতে পারে এ বিশ্বাসও অপনীত হইল না। কিছুদিন পরে দেবীবর ঘটক নূতন এক কৌলীন্য বিধানের অনুষ্ঠান করিলেন। ইহার নাম মেলবন্ধ নিয়ম। কিন্তু ইহাতে বাস্তবিক কোন নূতনতা ছিল না। দেবীবরের নিয়মের দ্বারা কেবল কতকগুলি কুলীন পরিবারের সমকক্ষতা নির্দ্দিষ্ট হইল। কারণ তাঁহারা শ্রোত্রীয়দিগের সহিত প্রতিলোম এবং বংশজদিগের সহিত অনুলোম বিবাহ করিতে পারিবেন না এবং কেবল সমান ঘরে আদান প্রদান ও শ্রোত্রীয় ঘরে আদান করিতে পারিবেন এই সকল নিয়ম পূর্ব্ববৎই রহিল। এবং ইহার ফলও পূর্ব্বানুরূপ হইল।

বংশজের পরিবর্ত্তে "ভঙ্গ কুলীন" শ্রেণী হইলেন। ইহাঁরাও বংশজদিগের ন্যায় তিন প্রকার। ১ শ্রোত্রীয় পাত্রে কন্যাদাতা। ২ বংশজ কন্যাগ্রাহী (গৌণকুলীন কন্যাগ্রাহীদিগের অনুরূপ) ৩ ভঙ্গকুলীন কন্যাগ্রাহী (বংশজ কন্যা-গ্রাহীর অনুরূপ।)

বংশজ ও ভঙ্গকুলীনদিগের উৎপত্তির মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথম কল্পে গৌণকুলীনেরা শ্রোত্রীয়দিগের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু ভঙ্গকুলীনদিগের সময়ে বংশজেরা শ্রোত্রীয় শ্রেণীতে লীন হয়েন নাই। ইহার হেতু এই যে ভঙ্গ-কুলীনেরা পাল্টি ঘরের নিয়মে পৈত্রিক মেলবন্ধের বিধি কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু এই নিয়ম অতিক্রান্ত হইয়া যে শ্রেণী উৎপন্ন হইতেছে, তাহারা কালসহকারে বংশজের মধ্যেই পরিগণিত হয়। অতএব দেবীবরের নিয়মানুসারে কুলীন বংশ হইতে বংশজ পর্য্যন্ত গমন করিতে কিছুকাল বিলম্ব হয় এই মাত্র নূতন হইল।

যদি বল্লালসেন অথবা দেবীবর ঘটক মুখ্য কুলীন শ্রোত্রীয় এবং গৌণকুলীন ও বংশজের মধ্যে সকলপ্রকার বিবাহ নিষিদ্ধ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বংশজ এবং ভঙ্গ কুলীনের উৎপত্তি হইত না এবং কুলীনদিগের আর কিছু না থাকুক কুলমর্য্যাদা জাজ্বল্যমান থাকিত।

পরন্তু বিশিষ্ট রূপে অনুধাবন করিলে বল্লালসেন ও দেবীবর ঘটকের কীর্ত্তি এবং তাহার ফলের সহিত প্রাচীন জাতিভেদ নিয়ম এবং তাহা হইতে যে সকল ঘটনার উৎপত্তি হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হইবেক।

অনেকে মনে করেন যে সঙ্কর বর্ণ সকল অতিশয় ঘৃণার পাত্র। বোধ হয় তাহাদিগের এইরূপ ধারণা আছে যে উহারা জারজ বংশ। বস্তুতঃ ইহা সত্য নহে। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ মতে অসবর্ণ জাতি হইতে যে সন্তান উৎপত্তি হইত তাহারাই বর্ণসঙ্করের আদি। সুতরাং যেমন ভঙ্গকুলীন কিংবা বংশজ বলিলে জারজত্ব দোষ স্পর্শে না, সেইরূপ সঙ্করবর্ণদিগেরও উক্ত প্রকার কোন গ্লানি নাই। কলিযুগে অসবর্ণ বিবাহ নিবারিত হওয়াতে সঙ্করবর্ণোৎপত্তি ক্ষান্ত হইয়াছে, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই কথা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে পূর্ব্বকালে অনুলোম প্রণালী ব্যতীত বহুবিবাহ হইত না এবং অসবর্ণ বিবাহ রহিত হওয়াতে বহুবিবাহও শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইয়াছে। আমরা কৌলীন্য প্রথার প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই অনুমান করি যে কলিকালের পূর্ব্বে যখন অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই তখন বোধ হয় বহুবিবাহ এবং অন্যান্য কোন কোন অত্যাচার প্রচলিত ছিল। ইহার প্রতিকারার্থ অসবর্ণ বিবাহ নিবারণ, অথবা প্রতিলোম বিবাহ অনুলোম বিবাহের সহিত তুল্য রূপে প্রচলিত করণ, এই দুই উপায় ছিল। কিন্তু শেষোক্ত উপায়ের দ্বারা বহুবিবাহ নিবারিত হইলেও সঙ্কর বর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবেক, তাহা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত হইতে পারে না। অতএব তাঁহাদিগের বিবেচনামতে বহুবিবাহ আদি দোষ অপনয়নের জন্য অসবর্ণ বিবাহ নিষেধই সঙ্গত উপায় হইতেছে। এই যুক্তি গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কল্পনা অসঙ্গত বোধ হইবেক না।

দেখা যাইতেছে যে কৌলীন্য বিধানানুসারে যে যে প্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাতে শ্রোত্রীয় কন্যাগণের বিবাহার্থ তিন শ্রেণিস্থ পাত্র পাওয়া যায়। যথা নৈকুষ্য কুলীন, শ্রোত্রীয় এবং ভঙ্গকুলীন। তদ্রূপ বংশজ কন্যাদিগের বিবাহার্থেও তিন শ্রেণিস্থ পাত্র প্রাপ্য হইয়া থাকে। যথা শ্রোত্রীয়, ভঙ্গ কুলীন ও বংশজ। ইহাদিগের যে কোন পাত্রকে কন্যা দান করিলে কোন পক্ষের কুল নাশ হয় না। কিন্তু নৈকুষ্য ও ভঙ্গ কুলীনকন্যাদিগের বিবাহ দিবার জন্য কেবল এক স্বশ্রেণীস্থ পাত্র ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই কয়েকটি অবস্থা হইতে দুই ঘটনা উপস্থিত হয়; কন্যা বিক্রয় এবং বহুবিবাহ।

অর্থশাস্ত্রের Law of supply and demand নামক বিধান কেবল পণ্যদ্রব্যের প্রতিই বর্ত্তে এমত নহে। যে কোন পদার্থ হউক গ্রাহক সংখ্যার ন্যূনাতিরেক অনুসারে তাহার মর্য্যাদার হ্রাস বৃদ্ধি হইবেক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রোত্রীয় ও বংশজ কন্যার সংখ্যা গ্রাহক অপেক্ষা অল্প। আর মুখ্য ও ভঙ্গ কুলীন কন্যাদিগের সংখ্যা গ্রাহক অপেক্ষা অধিক। এস্থলে শ্রোত্রীয় ও

বংশজ কন্যার বিবাহের সুবিধা এবং কুলীন কন্যার বিবাহের অসুবিধা অবশ্যই হইবেক।

বিবাহাকাঙ্ক্ষী পাত্রের সংখ্যা অধিক হইলে ধনবান ব্যক্তিগণ ইষ্টসিদ্ধির জন্য অর্থদান স্বীকার করিবেন ইহা বিচিত্র নহে। শ্রোত্রীয় ও বংশজ কুলে কন্যাকর্ত্তৃগণ হয় সম্মান নতুবা অর্থলোভের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। নৈকুষ্য এবং ভঙ্গকুলীন পাত্রকে কন্যাদান করিলে ইহাঁদিগের কৌলীন্যমর্য্যাদা বৃদ্ধি হয়, সুতরাং যাঁহাদিগের অর্থ আছে তাঁহারা এই লোভে মুগ্ধ হয়েন। সুতরাং যে সকল কন্যা অবিবাহিত থাকে তাঁহাদিগের সংখ্যা সঙ্কীর্ণ হয়। এবং তাঁহারা দরিদ্র কন্যা। ওদিগে ইহাদিগের স্বশ্রেণিস্থ পাত্রদিগের বিবাহার্থ উপায়ান্তর নাই অতএব গ্রাহক সংখ্যার আধিক্য হেতু দরিদ্র কন্যাকর্ত্তৃগণকে অর্থলোভ প্রদর্শিত হয় এবং পণদান অথবা কন্যা পরিবর্ত্ত না করিলে বংশজ ও শ্রোত্রীয় পাত্রের বিবাহ হয় না। যাহারা দরিদ্র এবং কন্যাধনে বঞ্চিত তাহাদিগের পরিবারস্থ পুরুষের বিবাহ হওয়া দুষ্কর সুতরাং অনেকের বংশ লোপ হইয়া যায়। অতএব শ্রোত্রীয় ও বংশজ কুলে কন্যা বিক্রয় এবং বংশলোপ, বিবাহ সংক্রান্ত নিয়মের স্বভাবসিদ্ধ ফল। বংশলোপ হইলে মাল্‌থসের শিষ্যবর্গ কোন দোষ মনে না করিতে পারেন কিন্তু প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের বিবেচনাতে ইহা অতীব শোচনীয় ঘটনা তাহাতে সন্দেহ নাই।

নৈকুষ্য এবং ভঙ্গকুলীন পাত্র কতক প্রথমতঃ শ্রোত্রীয় এবং বংশজের গৃহ আলোকিত করিয়াছেন! সুতরাং স্বশ্রেণিস্থ কন্যার ভাগ পাত্র অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ শ্বশুর মন্দিরে ঐ সকল বিবাহিত পাত্রের সমাদরের সীমা নাই। এবং যাঁহাদিগের বিবাহ হয় নাই তাঁহাদিগের মন [illegible] সেই আশার বশবর্ত্তী হয়। তখন ইহাঁদিগের স্বশ্রেণিস্থ কন্যাকর্ত্তাদিগের ঘোরতর বিপাক উপস্থিত। প্রতিলোম বিবাহ দিলে চিরসঞ্চিত কৌলীন্য মর্য্যাদা সমূলে বিনষ্ট হয়। আর স্বশ্রেণিস্থ পাত্রও দুষ্প্রাপ্য সুতরাং কৃতদার অকৃতদার বিচার করিবার প্রতীক্ষা করিতে পারেন না। বহুবিবাহে কন্যার কিছু ক্লেশ কিন্তু কুমারীর কন্যাকাল অতীত হইলে ইহকালে কলঙ্ক এবং পরকালে নরক, অতএব যে প্রকারে হউক কন্যাটীকে পাত্রস্থ করিতে পারিলেই রক্ষা। ইহার ফল দ্বিবিধ; কোন কোন কন্যার আজন্ম বিবাহ হয় না এবং কেহ বা বিবাহ ব্যবসায়ীর হস্তে সমর্পিত হইয়া পিতামাতার নরক বিমোচন করেন * ১।

---

*১। ইহার বিরুদ্ধ কল্পনা এইরূপ হইতে পারে, যে শ্রেণী বিশেষে কন্যা বা পুত্রের মধ্যে অন্যতরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেই বহু বিবাহ এবং কন্যাক্রয়ের আবশ্যকতা উপস্থিত হয়, অতএব অনুলোম বিবাহকে তাহার হেতু গণ্য করা অন্যায়। এতাদৃশ যুক্তি অসঙ্গত, কারণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্ত্রী পুরুষ এবং পুত্র কন্যার

অনন্তর জাতিভেদ নিয়মের প্রতি অনুধাবন করিলে দেখা যায়, যে পূর্ব্ব-কালেও হিন্দু সমাজে আসুর বিবাহ নামে কন্যা বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহা উল্লিখিত কন্যা বিক্রয় প্রথার সহিত এক না হউক স্থূল বিষয়ে উহার অনুরূপ বটে * ২।

সংখ্যা প্রায় সমান, বরং সম্প্রতি যে লোক সংখ্যা হইয়াছে তাহাতে বঙ্গদেশে স্ত্রী পুরুষ সংখ্যার ন্যূনাতিরেক অন্য দেশের তুলনাতে যৎসামান্য। কিন্তু উপরোক্ত যুক্তি গ্রহণ করিলে এই মনে করিতে হয় যে, বল্লালসেনের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত নৈকষ্য এবং ভঙ্গকুলীনদিগের মধ্যে কেবল কন্যার সংখ্যা এবং বংশজ ও শ্রোত্রিয় বংশে কেবল পুরুষের সংখ্যাই অধিক হইয়াছে, ইহা অসম্ভব। তদ্ভিন্ন এতদ্দেশে বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত, কিন্তু মৃতদার বিবাহ সেরূপ নহে। সুতরাং বিবাহাকাঙ্ক্ষী পাত্র অপেক্ষা কন্যার সংখ্যা স্বভাবতঃই কিছু অল্প হইতে পারে। এ স্থলে কুলীন কন্যাদিগের চিরকৌমার্য্য অথবা কৃতদার পাত্রে সমর্পণ বিষয়ে কেবল বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বিবাহ প্রথাকেই হেতু বলিয়া গণনা করিতে হয়।

সত্য বটে যে দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের মধ্যে অনুলোম বিবাহ হয় না, তথাপি নিতান্ত শৈশবাবস্থায় বাগ্দান হইয়া থাকে। এবং ইহাকেও বিবাহ সঙ্কট বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও চিরকাল অবিবাহিত থাকিতে দেখা যায় না, এবং বহু বিবাহও প্রচলিত নাই। অতএব এই বিবাহ সঙ্কট, পাত্র কন্যার সংখ্যার তারতম্য ঘটিত বলা যাইতে পারে না। আমরা অনুমান করি যে উঁহারা যদি কতকগুলি লোক ঐক্য হইয়া প্রচলিত প্রথানুযায়ী বাগ্দান পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে পরিণামে বিবাহের কোন বিঘ্ন হয় না। এখন পাত্র পাইব না এই আশঙ্কা প্রযুক্ত কেহই বাগ্দান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সুতরাং সম্বন্ধ বিহীন পাত্রাভাব হয়, এবং দুই একজন বাগ্দান করিতে বিলম্ব করিলে সঙ্কট উপস্থিত হয়। কিন্তু এতদ্দেশে ঐক্য কোথায়!! পশ্চিম প্রদেশে রাজপুত্রদিগের বিবাহ সঙ্কটের মর্ম্ম কি? সচরাচর এই কথাই শুনা যায় যে কন্যাদায় অতীব ব্যয়সাধ্য বলিয়া লোকে কন্যাহত্যা পাপে স্বীকার করে। কিন্তু কি কারণে কন্যাদান এত ব্যয়সাধ্য তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় না। যদি বরযাত্রগণের জন্য বাহুল্য ব্যয় প্রয়োজন হয়, তবে উহাদিগের এতাদৃশ প্রভাবের হেতু কি? বরপক্ষে বিবাহাকাঙ্ক্ষা অপেক্ষাকৃত লঘু না হইলে, তাঁহাদিগের প্রাদুর্ভাব বহুকালস্থায়ী হইতে পারে না। অতএব পুরুষের বিবাহের কোন অতিরিক্ত সুবিধা থাকিবেক। যদি কোন পশ্চিমাঞ্চলবাসী ইহার নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে অবশ্যই কোন কোন গূঢ় কথা প্রকাশ হইবেক। আমরা এ সকল বিষয়ে বিদেশীয় লেখকদিগের প্রতি নির্ভর করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু বেরিংকৃত জাতিবিষয়ক পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে রাজপুতদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় খাত্রী অভাবে রাজকন্ধু নামক এক নিকৃষ্ট জাতির কন্যা ক্রয় বা পণদান পূর্ব্বক বিবাহ করে। ইহাদিগের মধ্যে কন্যাহত্যা দোষ বিরল। অন্য এক সম্প্রদায় উচ্চ শ্রেণি ব্যতীত কন্যাদান করিতে পারে না এবং তাহাদিগের মধ্যেই কন্যাহত্যা প্রবল। অতএব ইহা আমাদিগের কল্পনারই পোষক হইতেছে।

*২। এই বিষয়ে লেখকের কল্পনা প্রচলিত মত হইতে বিভিন্ন বলিয়া, ইহার সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। "অবোধবন্ধু" নামক মাসিক পত্রিকাতে এতদ্বিষয়ে একটি প্রবন্ধ আছে। একণকার প্রচলিত বিবাহের নাম ব্রাহ্ম বিবাহ। তাহাতে সম্প্রদান এবং কুশণ্ডিকা নামক দুটি পৃথক্ প্রক্রিয়া আছে। লেখকের কল্পনা এই যে প্রাচীন আসুর বিবাহে কেবল কুশণ্ডিকা ছিল সম্প্রদান ছিল না, কুশণ্ডিকাতে কন্যাকর্ত্তার কোন সংস্রব নাই। কুল্লুকভট্ট আসুর বিবাহ বিষয়ক মনুবচনের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত বিবাহে সম্প্রদান প্রক্রিয়ার অভাব অনুমিত হয়। মহাভারতের দুই এক স্থলে আসুর বিবাহের যে লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাতেও ঐ অনুমান বলবৎ হয়। আর মনুর ৯ অধ্যায় ১৯৬।১৯৭ বচনানুসারে আসুর বিবাহে লব্ধ যৌতুক ধন, নারীর সন্তানাভাবে, পিতা মাতা অধিকার করেন। ব্রাহ্মাদি চারি প্রকার বিবাহে, তাদৃশ ধন স্বামী প্রাপ্ত

শাস্ত্রকারেরা ইহাকে অতিশয় জঘন্য বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আসুর-বিবাহের যতই হেতু থাকুক না, তন্মধ্যে পাত্র সংখ্যার আধিক্যকে অবশ্যই গণনা করিতে হইবেক। নতুবা একপক্ষে কেন পণ দান স্বীকার করিবে? কিন্তু যদি কোন শ্রেণিতে পাত্র সংখ্যা অধিক হয় তন্নিবন্ধন অন্যত্র উহার সংখ্যা অবশ্য অল্প হইবেক। এবং তাহার নিশ্চিত ফল বহুবিবাহ; ইহাতে সন্দেহ নাই। পাত্র সংখ্যার এতাদৃশ ন্যূনাতিরেক প্রধানতঃ অসবর্ণ বিবাহ হইতেই উৎপন্ন হয়। কন্যা অপেক্ষা পুরুষ অধিক স্বেচ্ছাচারী একথা অন্ততঃ বিবাহ বিষয়ে সকলেই স্বীকার করিবেন, অতএব শাস্ত্রের নিষেধ না থাকিলেও প্রতিলোম অপেক্ষা অনুলোম বিবাহের সম্ভাবনা অধিক। অনুলোম পদ্ধতি প্রচলিত থাকাতে পুরুষের পক্ষে সবর্ণা ও অসবর্ণা দুই শ্রেণিস্থ কন্যা প্রাপ্য। প্রতিলোম বিবাহ অপ্রচলিত বলিয়া কন্যার পক্ষে সে সুবিধা নাই। অতএব উচ্চ শ্রেণিতে কন্যার আধিক্য এবং অধম শ্রেণিতে পুরুষের আধিক্য, শ্রেণিবিভাগ এবং অনুলোম বিবাহের ফল বলিয়া গণ্য হইতেছে। এই কথা স্বীকার করিলে এক ভাগে বহুবিবাহ এবং চিরকৌমার্য্য অন্যদিগে আসুরবিবাহ ও বংশলোপ সহজেই গ্রাহ্য হইবেক।

অসবর্ণ বিবাহের আর এক ফল বর্ণসঙ্কর; তদ্বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তিতে জাতিভেদের নানা ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। উহারা অমিশ্র জাতিগণের ব্যবসা অপহরণ করে এবং পর পর নানা সঙ্করবর্ণ জন্মিয়া এত অধিক জাতি হইয়া উঠে যে পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ রক্ষা করা দুষ্কর হয়। বর্ণচতুষ্টয়ে অনুলোমবিধি মতে ছয় প্রকার সঙ্কর জাতি হয়, অনন্তর সঙ্কর জাতি-গণের পরস্পরের ও অমিশ্রজাতির সংযোগে কত প্রকার বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইতে পারে তাহার সংখ্যা করা অসাধ্য। এই সকল জাতির পৃথক্ ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট করা দুষ্কর। সুতরাং অসবর্ণ বিবাহ নিবারণ করিলেই সকল দিক রক্ষা হয়—তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। শাস্ত্রকারেরা আসুর বিবাহ নিষেধ করণেচ্ছুক ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু আমাদিগের কথা যুক্তি সঙ্গত হইলে বহুবিবাহ নিষেধ করিতেও যে ইচ্ছা করেন নাই এ কথা মনে করা যায় না।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে যেখানে কৌলীন্য নিয়ম প্রবল হয় নাই সেখানে বহুবিবাহ এবং কন্যাবিক্রয় অতিশয় বিরল। অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকিলে

হয়েন। ইদানীন্তন যে সকল বিবাহকে "কন্যাবিক্রয়" নামে আসুর বিবাহ বলিয়া সন্দেহ হইতেছে তাহাতে সম্প্রদান ও কুশণ্ডিকা উভয়ই বর্ত্তমান; এবং লব্ধ যৌতুক ধন বিষয়ে অন্য বিবাহের সহিত কোন প্রভেদ নাই। এই জন্য আমরা মনে করি যে "কন্যা বিক্রয়" স্থলে ব্রাহ্ম মতেই বিবাহ হয় বটে তবে পণ গ্রহণটি শাস্ত্রনিষিদ্ধ ক্রিয়া। আমাদিগের বিবেচনাতে প্রাচীন আসুর বিবাহ এক্ষণে অত্র সমাজে প্রচলিত নাই, কেবল তাহার প্রধান লক্ষণ পণ কন্যা গ্রহণ রূপান্তরে পুনরায় উপস্থিত হইয়াছে।

তাহা কদাচ হইত না। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে অসবর্ণ ও বহুবিবাহ বিষয়ক নিষেধের মধ্যে যে সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত, একথা আনুষঙ্গিক প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে।

জাতিভেদ বিষয়ক প্রস্তাবে এই কথা সুসিদ্ধ করিবার জন্য এত যত্ন করিবার হেতু এই যে এই বিষয়ের আদিবৃত্তান্তের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ নিষেধ অতি প্রধান, এবং বোধ হয় এক মাত্র প্রামাণিক ঘটনা। ইহার হেতু এবং ফল পুরাবৃত্তে প্রকাশ নাই। তাহা নির্ণয়ার্থ কৌলীন্য প্রথার পুরাবৃত্ত এক উৎকৃষ্ট উপায়। তুলনা এবং কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিষয়ক আলোচনা ব্যতীত এতদ্দেশের পুরাবৃত্ত স্থির করণের অন্য উপায় নিতান্ত দুর্লভ। এই জন্য এস্থলে তাহাই অবলম্বন করা গিয়াছে।

ইদানীন্তন নব্য সম্প্রদায়ের মতে বহু বিবাহ প্রথা অতি নিন্দনীয়। কিন্তু ইহার সহিত অসবর্ণ বিবাহ নিষেধ একত্রিত করা তাঁহাদিগের প্রীতিকর না হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদিগের একটী কথা মনে করা উচিত যে উপস্থিত সমালোচনার দ্বারা কেবল এই পর্য্যন্ত স্থির হইতেছে যে শ্রেণিভেদ রক্ষা পূর্ব্বক বহুবিবাহ ও কন্যা-বিক্রয়াদি অত্যাচার নিবারণ করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সকল বিবাহ এক কালেই নিষিদ্ধ করা উচিত। এই কথা, শাস্ত্রকারদিগের বিধান, এবং বল্লালসেন ও দেবীবর ঘটকের কার্য্যের দ্বারা সুসিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু জাতিভেদ ও কৌলীন্য ভেদ দূরীকৃত করা ভাল কি না তাহা এতদ্দ্বারা মীমাংসা হইতেছে না। অন্য কারণে তাহার যৌক্তিকতা স্থির হইলে বহুবিবাহ নিষেধের নিমিত্ত কি উপায় আবশ্যক তাহার পৃথক্ বিচার হইতে পারে। এস্থলে সে বিষয়ে কোন কথাই প্রকাশ করা অভিপ্রেত নহে।

আমরা লিপিবাহুল্য ভয়ে কায়স্থ দিগের কৌলীন্য ও বহুবিবাহ বিষয়ে কোন কথা প্রকাশ করিলাম না। ইঁহাদিগের মধ্যেও উল্লিখিত অনুলোম ও প্রতিলোম পদ্ধতি হইতে কুলীনব্রাহ্মণদিগের ন্যায় কন্যাবিক্রয় বহুবিবাহ এবং বংশজোৎপত্তি হইয়া থাকে। কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখিলেই একথা স্পষ্ট প্রকাশ হইবেক।

ক্ষত্রিয় জাতি এতদ্দেশে নাই। ইহার হেতু কি, তাহা যে কখন নির্ণীত হইবেক, আমরা এমত প্রত্যাশা করি না। বৈশ্য জাতির বিষয়েও আমরা ঐ কথা বলিতাম কিন্তু সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় এই নামের আকাঙ্ক্ষী। যেখানে প্রকৃত কথা স্থির করা কঠিন সেখানে একটি কল্পনা দ্বারা আর একটির খণ্ডন চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। ইতিপূর্ব্বে কায়স্থ জাতিও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিবার জন্য বিস্তর শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলতঃ ইঁহারা যদ্যপি শূদ্র বংশোদ্ভবই হয়েন তবে আদিম অবস্থা হইতে এক্ষণে বিস্তর উন্নতি লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

আমাদিগের বিবেচনাতে ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে অবমাননার কথা না হইয়া বরং গৌরবের স্থল হইতেছে এবং সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও ইহা একটী আহ্লাদের বিষয় বটে।

সঙ্কর বর্ণ সকলের আদি নির্ণয় করাও এইরূপ দুষ্কর। মনুসংহিতাতে যে সমস্ত বর্ণ সঙ্করের নাম দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনেক স্থলে তাঁহাদিগের ব্যবসায়ও বিভিন্ন হইয়াছে; কোন কোন জাতির ব্যবসা নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং স্থল বিশেষে কালের উন্নতিসহকারে নূতন ব্যবসাও উদ্ভাবিত হইয়াছে। সুতরাং এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর সমস্ত জাতিই হয় শূদ্র নচেৎ বর্ণসঙ্কর।

ইংরাজ লেখকেরা জাতি সমূহের বৃত্তান্ত ও আদি অনুসন্ধানে নিতান্ত উৎসুক হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের কোন কোন কল্পনা নিতান্ত উৎকট বলিয়া বোধ হয়। যদি বাঙ্গালি রাজকর্ম্মচারিগণ ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে অবস্থান কালে এই বিষয়ের প্রতি কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করেন তাহা হইলে সাহেবদিগের অনেক কল্পনা প্রথম উদ্যমেই নষ্ট হইয়া যায় এবং আমাদিগের সন্ততিবর্গ কতকগুলি অশ্রুতপূর্ব্ব উপন্যাস পাঠের দায় হইতে অব্যাহতি পায়।

যাঁহারা কায়স্থগণকে শূদ্র ভিন্ন অন্য পদবী দিতে অসম্মত, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধ পক্ষে আমরা কয়েকটি কথা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। যে সকল পাঠক এরূপ আলোচনা ভালবাসেন তাঁহাদিগের মনোরঞ্জনার্থ ঐ কথাগুলি নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

লেখকের মতে কায়স্থজাতি বর্ণসঙ্কর। বঙ্গদেশের বৈদ্য জাতি, ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতা হইতে উৎপন্ন একথা সকলেই স্বীকার করেন। মনুসংহিতা মতে এই জাতির আর এক নাম অম্বষ্ঠ। কিন্তু উড়িষ্যা ও পশ্চিম প্রদেশে অম্বষ্ঠ জাতি কায়স্থ বলিয়া গণ্য।

মনুলিখিত করণ নামক জাতি দুই প্রকার, এক ক্ষত্রিয় জাতির ব্রাত্যা অর্থাৎ গায়ত্রীবর্জ্জিত। দ্বিতীয়, বৈশ্য পিতা ও শূদ্র মাতা হইতে উৎপন্ন সঙ্কর জাতি; শেষোক্ত করণ জাতি লিপিব্যবসায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। উপরোক্ত দেশদ্বয়ে কায়স্থবর্ণের মধ্যে অম্বষ্ঠের সদৃশ করণ নামক একজাতিও দেখা যায়।

লিপিব্যবসায়ে কায়স্থগণের অধিকার তাহা নিঃসন্দেহ। বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠ বা করণ জাতি নাই এবং অন্যান্য দেশে বৈদ্য জাতি দেখিতে পাওয়া যায় না। পশ্চিমাঞ্চলে অম্বষ্ঠ ও করণের মধ্যে বিবাহ হয় না বটে, কিন্তু বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে বিবাহ হয়। যথা শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, মৈমনসিংহের পূর্ব্বাংশ, ত্রিপুরার উত্তরাংশ এবং ঢাকার উত্তর পূর্ব্ব প্রদেশ। এই সকল স্থানে বৈদ্যেরা কায়স্থ জাতির মধ্যে কুলীন বলিয়া গণ্য।

কিন্তু বিরুদ্ধপক্ষের দুটি কথাও প্রকাশ করা আবশ্যক। উল্লিখিত স্থানগুলি "পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশ" নামে বিখ্যাত। আর ঐ সকল দেশে কায়স্থেরা দুরবস্থাপন্ন হইলে শুঁড়ি পাত্রেও কন্যাদান করিয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল কন্যা পিতৃগৃহে কখন পুনরাগমন করিলে রন্ধনশালাতে প্রবেশ করিতে পারেন না।

কায়স্থ জাতির মধ্যে "দশকর্ম্ম" প্রচলিত আছে এবং স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ, এগুলি শূদ্র জাতির লক্ষণের বিপরীত।

পশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থেরা শূদ্রত্ব স্বীকার করেন না এবং কেহ কেহ যজ্ঞোপবীতও ধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের মৃতাশৌচের নিয়ম আমরা জানিতে পারি নাই।

এতদ্দেশে কায়স্থেরা দাস পদবী ধারণ করাতেই বিশিষ্ট রূপে শূদ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। কিন্তু কান্যকুব্জাগত পাঁচ জন কায়স্থের মধ্যে পুরুষোত্তম দত্ত দাস বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে স্পষ্টাক্ষরে অসম্মত হইয়াছিলেন। কিম্বদন্তী আছে যে এই জন্যেই দত্তবংশ কুলীন শ্রেণীতে পরিগণিত হয়েন নাই। পুরুষোত্তম দত্ত যে শূদ্র হইলে মিথ্যা এতাদৃশ স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে সাহসী হইবেন, তাহা বিশ্বাস হয় না। অতএব বোধ হয়, এক্ষণকার কুলীনেরা, মৌলিক দত্তের দোহাই দিয়া আপনাদিগের দাসত্ব কলঙ্ক অপনীত করিতে পারেন।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে কায়স্থদিগের আদি পুরুষ চিত্রগুপ্ত। কিন্তু ইনি কেন যমের সহচর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। চিত্রগুপ্তের গল্পে দুটী কথা প্রকাশ হয়। (১) গণ কায়স্থ প্রথমাবস্থায় কাহারও প্রিয় পাত্র ছিলেন না, প্রত্যুত যমের ন্যায় শত্রু বলিয়া গণ্য হইতেন। (২) তৎকালে তাঁহারা হিসাব রক্ষকের শ্রেষ্ঠ ছিলেন; ইহাতে তাঁহাদিগের অপক্ষপাতিত্ব ও অভ্রান্ত লিপির পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রী যঃ

উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

শৈবলিনী

ভীমা নামে বৃহৎ পুষ্করিণীর চারি ধারে, ঘন তালগাছের সারি। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমাভ রৌদ্র পুষ্করিণীর কালো জলে পড়িয়াছে; কালো জলে রৌদ্রের সঙ্গে, তালগাছের কালো ছায়া সকল অঙ্কিত হইয়াছে। একটি ঘাটের পাশে, কয়েকটি লতামণ্ডিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ, লতায় লতায় একত্রে গ্রন্থিত হইয়া, জল পর্য্যন্ত শাখা লম্বিত করিয়া দিয়া, জলবিহারিণী কুলকামিনীগণকে আবৃত করিয়া রাখিত। সেই আবৃত, অল্পান্ধকার মধ্যে শৈবলিনী এবং সুন্দরী ধাতুকলসী হস্তে জলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল।

যুবতীর সঙ্গে জলের ক্রীড়া কি? তাহা আমরা বুঝি না, আমরা জল নই। যিনি কখন রূপ দেখিয়া গলিয়া জল হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারিবেন। তিনিই বলিতে পারিবেন, কেমন করিয়া জল কলসী তাড়নে তরঙ্গ তুলিয়া, বাহুবিলম্বিত অলঙ্কার শিঞ্জিতের তালে তালে নাচে। হৃদয়োপরে গ্রন্থিত জলজপুষ্পের মালা দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে। সন্তরণ কুতূহলী ক্ষুদ্র বিহঙ্গমটিকে দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে। যুবতীকে বেড়িয়া বেড়িয়া তাহার বাহুতে, কণ্ঠে, স্কন্ধে, হৃদয়ে উকিঝুকি মারিয়া, জল তরঙ্গ তুলিয়া, তালে তালে নাচে। আবার যুবতী কেমন কলসী ভাসাইয়া দিয়া, মৃদু বায়ুর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া, চিবুক পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া, বিম্বাধরে জল স্পৃষ্ট করে; বক্তু মধ্যে তাহাকে গ্রহণ করে; সূর্য্যাভিমুখে প্রেরণ করে; জল পতন কালে বিম্বে বিম্বে শত সূর্য্য ধারণ করিয়া যুবতীকে উপহার দেয়। যুবতীর হস্তপদ সঞ্চালনে জল ফোয়ারা কাটিয়া নাচিয়া উঠে, জলেরও হিল্লোলে যুবতীর হৃদয় নৃত্য করে। দুই সমান। জল চঞ্চল; এই ভুবনচাঞ্চল্যবিধায়িনীদিগের

হৃদয়ও চঞ্চল। জলে দাগ বসে না, যুবতী হৃদয়েও না। কে কবে জলে বা যুবতীর হৃদয়ে স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারিয়াছে? চিত্র অঙ্কিত হয় না, কিন্তু উভয়েই ছায়া পড়ে। তুমি সরিয়া যাও, জলের ছায়া মিলাইবে; যুবতী হৃদয়স্থ ছায়াও মিলাইয়া যাইবে।

পুষ্করিণীর শ্যাম জলে স্বর্ণ রৌদ্র ক্রমে মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিতে দেখিতে সব শ্যাম হইল—কেবল তাল গাছের অগ্রভাগ স্বর্ণপতাকার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

সুন্দরী বলিল, "ভাই সন্ধ্যা হইল, আর এখানে না। চল বাড়ী যাই।"

শৈবলিনী। "কেহ নাই ভাই, চুপি চুপি একটি গান গা না।"

সু। "দুর হ! পাপ! ঘরে চ।"

শৈ। "ঘরে যাব না লো সই!

আমার মদনমোহন আস্‌চে ওই।

হায়! যাব না লো সই।"

সু। "মরণ আর কি? মদনমোহন ত ঘরে বোসে, সেইখানে চল না।"

শৈ। "তাঁরে বল গিয়া, তোমার মদনমোহিনী, ভীমার জল শীতল দেখিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে।"

সু। "নে এখন রঙ্গ রাখ্। রাত হলো—আমি আর দাঁড়াইতে পারি না। আবার আজ ক্ষেমির মা বল্‌ছিল এদিগে কয়টা গোরা এয়েছে।"

শৈ। "তাতে তোমার আমার ভয় কি?"

সু। "আ মলো তুই বলিস্ কি? ওঠ নহিলে আমি চলিলাম।"

শৈ। "আমি উঠবো না—তুই যা।" সুন্দরী রাগ করিয়া কলসী পূর্ণ করিয়া কূলে উঠিল। পুনর্ব্বার শৈবলিনীর দিগে ফিরিয়া বলিল, "হাঁ লো সত্য সত্য তুই কি এই সন্ধ্যাবেলা একা পুকুরঘাটে থাকিবি না কি?"

শৈবলিনী কোন উত্তর করিল না; অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। অঙ্গুলি নির্দ্দেশানুসারে সুন্দরী দেখিল, পুষ্করিণীর অপর পারে, এক তালবৃক্ষতলে,—সর্ব্বনাশ! সুন্দরী আর কথা না কহিয়া কক্ষ হইতে কলস ভূমে নিক্ষিপ্ত করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। পিত্তল কলস, গড়াইতে গড়াইতে, ঢক ঢক শব্দে উদরস্থ জল উদগীর্ণ করিতে করিতে, পুনর্ব্বার বাপীজল মধ্যে প্রবেশ করিল।

সুন্দরী তালবৃক্ষতলে একটা ইংরাজ দেখিতে পাইয়াছিল।

ইংরাজকে দেখিয়া শৈবলিনী হেলিল না দুলিল না—জল হইতে উঠিল না। কেবল বক্ষ পর্য্যন্ত জলমধ্যে নিমজ্জন করিয়া, আর্দ্র বসনে কবরীসমেত মস্তকের অর্দ্ধভাগ মাত্র আবৃত করিয়া, প্রফুল্ল রাজীববৎ জলমধ্যে বসিয়া রহিল। মেঘ-মধ্যে, অচলা সৌদামিনী হাসিল—ভীমার সেই শ্যামতরঙ্গে এই স্বর্ণকমল ফুটিল।

সুন্দরী পলাইয়া গেল, কেহ নাই দেখিয়া ইংরেজ ধীরে ধীরে, তালগাছের অন্তরালে অন্তরালে থাকিয়া ঘাটের নিকট আসিল। শৈবলিনী কুটিল অথচ বিস্ফারিত কটাক্ষে, তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ইংরেজ, দেখিতে অল্পবয়স্ক বটে। গুম্ফ বা শ্মশ্রু কিছুই ছিল না। কেশ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ; চক্ষুও ইংরেজের পক্ষে কৃষ্ণাভ। পরিচ্ছদের বড় জাঁক জমক; এবং চেন্ অঙ্গুরীয় প্রভৃতি অলঙ্কারের কিছু পারিপাট্য ছিল।

ইংরেজ ধীরে ধীরে ঘাটে আসিয়া, জলের নিকট আসিয়া বলিল, "I come again, fair lady."

শৈবলিনী বলিল, "আমি ত কতবার বলিয়াছি, আমি ও ছাই বুঝিতে পারি না।"

"Oh—ay—that nasty gibberish—I must speak it I suppose. হম again আয়া হায়।"

শৈল। "কেন? যমের বাড়ীর কি এই পথ?"

ইংরাজ না বুঝিতে পারিয়া কহিল, "কিয়া বোল্‌তা হ্যায়?"

শৈ। "বলি, যম কি তোমায় ভুলিয়া গিয়াছে?"

ইংরাজ। "যম! John you mean? হম্ জন্ নেহি, হম্ লরেন্স্।"

শৈ। "ভাল, একটা ইংরেজি কথা শিখ্‌লেম্, লরেন্স্ অর্থে বাঁদর।"

সেই সন্ধ্যাকালে শৈবলিনী এবং লরেন্স ফষ্টরে কি কথোপকথন হইল, তাহা আমরা সবিস্তারে বলিব না। কথোপকথন সমাপনান্তে লরেন্স ফষ্টর, এবং শৈবলিনী উভয়ে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেল। লরেন্স ফষ্টর, পুষ্করিণীর পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া আম্র বৃক্ষতল হইতে অশ্বমোচন করিয়া, তৎপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক টিবিয়ট নদীর তীরস্থ পর্ব্বত প্রতিধ্বনি সহিত শ্রুতগীতি স্মরণ করিতে করিতে চলিলেন। এক একবার মনে হইতে লাগিল, "সেই শীতল দেশের তুষাররাশির সদৃশ যে মেরি ফষ্টরের প্রণয়ে বাল্যকালে অভিভূত হইয়াছিলাম, এখন সে স্বপ্নের মত! দেশভেদে কি রুচিভেদ জন্মে? তুষারময়ী মেরি কি শিখারূপিণী উষ্ণদেশের সুন্দরীর তুলনীয়া? বলিতে পারি না।"

আমরা ফষ্টরের মনের কথা বলিলাম, কিন্তু শৈবলিনীর মনের কথা বলিতে পারিলাম না। স্ত্রীলোকের মনের কথা কে বুঝিতে পারে? ফষ্টর চলিয়া গেলে শৈবলিনী ধীরে ধীরে জলকলস পূর্ণ করিয়া কুম্ভকক্ষে বসন্তপবনারূঢ় মেঘবৎ মন্দপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। যথাস্থানে জল রাখিয়া শয্যাগৃহে প্রবেশ করিল।

তথায় শৈবলিনীর স্বামী, চন্দ্রশেখর কম্বলাসনে উপবেশন করিয়া, নামাবলীতে কটিদেশের সহিত উভয় জানু বন্ধন করিয়া, মৃৎপ্রদীপ সম্মুখে, তুলটে হাতে

লেখা পুতি পড়িতেছিলেন। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি তাহার পর একশত দশবৎসর অতীত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখরের বয়ঃক্রম প্রায় চত্বারিংশৎ। তাঁহার আকার দীর্ঘ, তদুপযোগী বলিষ্ঠ গঠন। মস্তক বৃহৎ, ললাট প্রশস্ত, তদুপরি চন্দন রেখা।

শৈবলিনী গৃহ প্রবেশ কালে মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "যখন ইনি জিজ্ঞাসা করিবেন, কেন এত রাত্র হইল ? তখন কি বলিব ?" কিন্তু শৈবলিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, চন্দ্রশেখর কিছু বলিলেন না। তখন তিনি ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্যের অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। শৈবলিনী হাসিয়া উঠিল।

তখন চন্দ্রশেখর চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "আজি এমত অসময়ে বিদ্যুৎ কেন ?"

শৈবলিনী বলিল, "আমি ভাবিতেছি না জানি আমায় তুমি কত বকিবে ?"

চন্দ্র। "কেন বকিব ?"

শৈ। "আমার পুকুর ঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, তাই।"

চন্দ্র। "বটেও ত—এখন এলে না কি ? বিলম্ব হইল কেন ?"

শৈ। "একটা গোরা আসিয়াছিল। তা, সুন্দরী ঠাকুরঝি তখন ডাঙ্গায় ছিল, আমায় ফেলিয়া দৌড়াইয়া পলাইয়া আসিল। আমি জলে ছিলাম ভয়ে উঠিতে পারিলাম না। ভয়ে একগলা জলে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সেটা গেলে তবে উঠিয়া আসিলাম।"

চন্দ্রশেখর অন্যমনে বলিলেন, "আর আসিও না।" এই বলিয়া আবার শাঙ্করভাষ্যে মনোনিবেশ করিলেন।

রাত্রি অত্যন্ত গভীরা হইল। তখনও চন্দ্রশেখর, প্রমা, মায়া, স্ফোট, অপৌরুষেয়ত্ব, ইত্যাদি তর্কে নিবিষ্ট। শৈবলিনী প্রথমতঃ, স্বামীর অন্ন ব্যঞ্জন, তাঁহার নিকট রক্ষা করিয়া, আপনি আহারাদি করিয়া পার্শ্বস্থ শয্যোপরি নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। এ বিষয়ে চন্দ্রশেখরের অনুমতি ছিল—অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি বিদ্যালোচনা করিতেন, অল্পরাত্রে আহার করিয়া শয়ন করিতে পারিতেন না।

সহসা সৌধোপরি হইতে পেচকের গম্ভীর কণ্ঠ শ্রুত হইল। তখন, চন্দ্রশেখর অনেক রাত্রি হইয়াছে বুঝিয়া, পুতি বাঁধিলেন। সে সকল যথাস্থানে রক্ষা করিয়া, আলস্য বশতঃ দণ্ডায়মান হইলেন। মুক্ত বাতায়ন পথে কৌমুদীপ্রফুল্ল প্রকৃতির শোভার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বাতায়ন পথে সমাগত চন্দ্রকিরণ সুপ্ত সুন্দরী শৈবলিনীর মুখে নিপতিত হইয়াছে! চন্দ্রশেখর প্রফুল্লচিত্তে দেখিলেন, তাঁহার গৃহসরোবরে চন্দ্রের আলোকে পদ্ম ফুটিয়াছে! তিনি দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, বহুক্ষণ ধরিয়া প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে, শৈবলিনীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে

লাগিলেন। দেখিলেন, চিত্রিত ধনুঃখণ্ডবৎ নিবিড় কৃষ্ণ, ভ্রযুগতলে, মুদিত পদ্ম কোরক সদৃশ, লোচনপদ্ম দুটি মুদিয়া রহিয়াছে;—সেই প্রশস্ত নয়নপল্লবে, সুকোমলা সমগামিনী রেখা দেখিলেন। দেখিলেন ক্ষুদ্র কোমল করপল্লব নিদ্রাবেশে কপোলে ন্যস্ত হইয়াছে—যেন কুসুমরাশির উপরে কে কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। মুখমণ্ডলে করসংস্থাপনের কারণে, সুকুমার রসপূর্ণ তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর ঈষদ্ভিন্ন হইয়া, মুক্তাসদৃশ দন্তশ্রেণী কিঞ্চিন্মাত্র দেখা যাইতেছে। একবার যেন, কি সুখ স্বপ্ন দেখিয়া, সুপ্তা শৈবলিনী ঈষৎ হাসিল—যেন একবার, জ্যোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ হইল। আবার সেই মুখমণ্ডল পূর্ব্ববৎ সুষুপ্তিসুস্থির হইল। সেই বিলাসচাঞ্চল্যশূন্য সুষুপ্তিসুস্থির বিংশতি বর্ষীয়া যুবতীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিয়া চন্দ্রশেখরের চক্ষে অশ্রুজল বহিল। চন্দ্রশেখর অধিক বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথম বয়স অধ্যয়নে গিয়াছিল—বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন—এই কল্পনা করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ কোন অরণ্যে এই প্রফুল্ল কুসুমটি দেখিতে পাইয়া, একবার মাত্র রূপতৃষ্ণার বশীভূত হইয়া, শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহ করিলে পর, যেমন অঙ্কুর হইতে দিনে দিনে বাড়িয়া মহাবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শৈবলিনীর উপর চন্দ্রশেখরের স্নেহ দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিল। সে যে শৈবলিনীর অতুলিত সৌন্দর্য্যগুণে হইল, এমত নহে। সে চন্দ্রশেখরের স্বভাবগুণে। সে স্নেহ চন্দ্রশেখরের হৃদয় মধ্যে দৃঢ়তর বদ্ধমূল।

চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর সুষুপ্তিসুস্থির মুখমণ্ডলের সুন্দর কান্তি দেখিয়া অশ্রুমোচন করিলেন। ভাবিলেন, "হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমি ত সর্ব্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত; আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া, এমন বিংশতিবর্ষীয়ার কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া, রমণীমুখপদ্ম কি ইহজন্মের সারভূত করিব? ছি! ছি! তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্রশেখর আহার করিতে ভুলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দলনী বেগম

বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার অধিপতি, নবাব আলিজা মীর কাসেম খাঁ, মুঙ্গেরে বসতি করিতেন। তাঁহার দুর্গমধ্যে প্রবেশ করি। তথায় অন্তঃপুরমধ্যে, একটি প্রকোষ্ঠের ভিতর, খাজা সরা দিগের প্রহরা অতিক্রম করিয়া, প্রবেশ করি। রাত্রির প্রথম যাম মাত্র অতীত হইয়াছে। প্রকোষ্ঠ মধ্যে, সুরঞ্জিত হর্ম্ম্যতলে, সুকোমল গালিচার বিছানা। রজত দীপে গন্ধ তৈল জ্বলিত, আলোক জ্বলিতেছে। সুগন্ধ এবং কুসুমদামের ঘ্রাণে গৃহ পরিপূরিত হইয়াছে। কিঙ্খাবের উপাধানে ক্ষুদ্র মস্তকটি বিন্যস্ত করিয়া একটি ক্ষুদ্রকায়া বালিকাকৃতা যুবতী শয়ন করিয়া গুলেস্তাঁ পড়িবার জন্য যত্ন পাইতেছে। যুবতী সপ্তদশ বর্ষীয়া, কিন্তু খর্ব্বাকৃতা বালিকার ন্যায় সুকুমার। গুলেস্তাঁ পড়িতেছে, এবং এক একবার উঠিয়া চাহিয়া দেখিতেছে, এবং আপন মনে কতই কি বলিতেছে। কখন বলিতেছে "এখনও এলেন না কেন?" আবার বলিতেছে "কেন আসিবেন? শতদাসীর মধ্যে আমি একজন দাসীমাত্র, আমার জন্য এতদূর আসিবেন কেন?" বালিকা আবার গুলেস্তাঁ পড়িতে প্রবৃত্ত হইল। আবার অল্পদূর পড়িয়াই, বলিল, "ভাল লাগে না। ভাল নাই আসুন, আমাকে স্মরণ করিলেই ত আমি যাই। তা আমাকে মনে পড়িবে কেন? আমি শতদাসীর মধ্যে একজন বৈত নই।" আবার গুলেস্তাঁ পড়িতে আরম্ভ করিল, আবার পুস্তক ফেলিল, বলিল, "ভাল ঈশ্বর কেন এমন করেন? একজন কেন আর একজনের পথ চেয়ে পড়িয়া থাকে? যদি তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে যে যাকে পায় সে তাকেই চায় না কেন? যাকে না পায় তাকে চায় কেন? আমি লতা হইয়া শালবৃক্ষে উঠিতে চাই কেন?" তখন যুবতী, পুস্তক ত্যাগ করিয়া, গাত্রোত্থান করিল। নির্দ্দোষ গঠন ক্ষুদ্র মস্তকে লম্বিত ভুজঙ্গরাশি তুল্য নিবিড় কুঞ্চিত কেশভার দুলিল—স্বর্ণ খচিত সুগন্ধ বিকীর্ণ উজ্জ্বল উত্তরীয় দুলিল—তাহার অঙ্গ সঞ্চালন মাত্র গৃহমধ্যে যেন রূপের তরঙ্গ উঠিল। অগাধ সলিলে যেমন চাঞ্চল্য মাত্রে তরঙ্গ উঠে, তেমনি তরঙ্গ উঠিল।

তখন, সুন্দরী এক ক্ষুদ্র বীণা লইয়া তাহাতে ঝঙ্কার দিল, এবং ধীরে ধীরে, অতি মৃদুস্বরে, গীত আরম্ভ করিল—যেন শ্রোতার ভয়ে ভীতা হইয়া গায়িতেছে। এমত সময়ে নিকটস্থ প্রহরীর অভিবাদন শব্দ এবং বাহকদিগের পদধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে, প্রবেশ করিল। বালিকা চমকিয়া উঠিয়া, ব্যস্ত হইয়া দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, নবাবের তাঞ্জাম। নবাব মীর কাসেম আলি খাঁ তাঞ্জাম হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নবাব আসন গ্রহণ করিয়া, বলিলেন, "দলনী বিবি কি গীত গায়িতেছিলে ?" যুবতীর নাম বোধ হয় দৌলতউন্নেসা। নবাব তাহাকে সংক্ষেপার্থ "দলনী" বলিতেন। এজন্য পৌরজন সকলেই "দলনী বেগম" বা "দলনী বিবি" বলিত।

দলনী লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিল। দলনীর দুর্ভাগ্যক্রমে নবাব বলিলেন, "তুমি যাহা গায়িতেছিলে, গাও আমি শুনিব।"

তখন মহা গোলযোগ বাঁধিল। তখন বীণার তার অবাধ্য হইল—কিছুতেই বেসুর সারে না। বীণা ফেলিয়া দলনী বেহালা লইল, বেহালাও বেসুরা বলিতে লাগিল, বোধ হইল। নবাব বলিলেন, "হইয়াছে, তুমি উহার সঙ্গে গাও।" তাহাতে, দলনীর মনে হইল যেন নবাব মনে করিয়াছেন, দলনীর সুর বোধ নাই। তারপর—তারপর, দলনীর মুখ ফুটিল না! দলনী কত মুখ ফুটাইতে চেষ্টা করিল, কিছুতেই মুখ, কথা শুনিল না—কিছুতেই ফুটিল না! মুখ ফোটে ফোটে, ফোটে না। মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলকমলিনীর ন্যায়, মুখ ফোটে ফোটে, ফোটে না। ভীরু-স্বভাব কবির, কবিতা কুসুমের ন্যায়, মুখ ফোটে ফোটে, ফোটে না। মানিনী স্ত্রীলোকের মানকালীন কণ্ঠাগত প্রণয় সম্বোধনের ন্যায়, ফোটে ফোটে, ফোটে না।

তখন দলনী সহসা বীণা ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি গায়িব না।"

নবাব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ? রাগ না কি ?"

দ। "কলিকাতার ইংরেজেরা যে বাদ্য বাজাইয়া গীত গায়, তাহাই একটি আনাইয়া দেন, তবেই আপনার সমক্ষে পুনর্ব্বার গীত গায়িব, নহিলে আর গায়িব না।"

মীরকাসেম হাসিয়া বলিলেন, "যদি সে পথে কাঁটা না পড়ে তবে অবশ্য দিব।"

দ। "কাঁটা পড়িবে কেন ?"

নবাব দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "বুঝি তাহাদিগের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। কেন তুমি সে সকল কথা শুন নাই ?"

"শুনিয়াছি" বলিয়া দলনী নীরব হইল। মীরকাসেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "দলনী বিবি, অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছ ?"

দলনী বলিল, "আপনি একদিন বলিয়াছিলেন, যে, যে ইংরেজদিগের সঙ্গে বিবাদ করিবে, সেই পরাজিত হইবে—তবে কেন আপনি তাহাদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহেন ;—আমি বালিকা, দাসী, এসকল কথা আমার বলা নিতান্ত অন্যায়, কিন্তু বলিবার একটা অধিকার আছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ভালবাসেন।"

নবাব বলিলেন, "সে কথা সত্য দলনী—আমি তোমাকে ভালবাসি।

তোমাকে যেমন ভালবাসি, আমি কখন স্ত্রীজাতিকে এরূপ ভালবাসি নাই, বা বাসিব বলিয়া মনে করি নাই।"

দলনীর শরীর কণ্টকিত হইল। দলনী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল— তাহার চক্ষে জল পড়িল। চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "যদি জানেন, যে ইংরেজের বিরোধী হইবে, সেই পরাভূত হইবে, তবে কেন তাহাদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন?"

মীরকাসেম কিঞ্চিৎ মৃদুতরস্বরে কহিলেন, "আমার আর উপায় নাই। তুমি নিতান্ত আমারই এইজন্য তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি, আমি নিশ্চিত জানি এ বিবাদে আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইব, হয়ত প্রাণে নষ্ট হইব। তবে কেন যুদ্ধ করিতে চাই? ইংরেজেরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারাই রাজা, আমি রাজা নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন? কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা বলেন, 'রাজা আমরা, কিন্তু প্রজা পীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর।' কেন আমি তাহা করিব? যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব— অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব? আমি সেরাজউদ্দৌলা নহি—বা মীরজাফরও নহি।"

দলনী মনে মনে বাঙ্গালার অধীশ্বরের শত শত প্রশংসা করিল। বলিল, "প্রাণেশ্বর! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমি কি বলিব? কিন্তু আমার একটি ভিক্ষা আছে। আপনি স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন না।"

মীর কা। "এ বিষয়ে কি বাঙ্গালার নবাবের কর্ত্তব্য যে স্ত্রীলোকের পরামর্শ শুনে? না বালিকার কর্ত্তব্য যে এবিষয়ে পরামর্শ দেয়?"

দলনী অপ্রতিভ হইল, ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল, "আমি না বুঝিয়া বলিয়াছি, অপরাধ মার্জ্জনা করুন। স্ত্রীলোকের মন সহজে বুঝে না বলিয়াই এসকল কথা বলিয়াছি। কিন্তু আর একটি ভিক্ষা চাই?"

"কি?"

"আপনি আমাকে যুদ্ধে সঙ্গে লইয়া যাইবেন।"

"কেন, তুমি যুদ্ধ করিবে নাকি? বল, গুরগণ খাঁকে বরতরফ করিয়া তোমায় বাহাল করি?"

দলনী আবার অপ্রতিভ হইল, কথা কহিতে পারিল না। মীরকাসেম, তখন সস্নেহভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন যাইতে চাও?"

"আপনার সঙ্গে থাকিব বলে।" মীরকাসেম অস্বীকৃত হইলেন। কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

দলনী তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "জাঁহাপনা! আপনি গণিতে জানেন, বলুন দেখি আমি যুদ্ধের সময়ে কোথায় থাকিব?"

মীরকাসেম হাসিয়া বলিলেন, "তবে কলমদান দাও।"

দলনীর আজ্ঞাক্রমে পরিচারিকা সুবর্ণ নির্ম্মিত কলমদান আনিয়া দিল।

মীরকাসেম হিন্দুদিগের নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন। শিক্ষামত অঙ্ক পাতিয়া দেখিলেন। কিছুক্ষণ পরে, কাগজ দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া, বিমর্ষ হইয়া বসিলেন। দলনী জিজ্ঞাসা করিল "কি দেখিলেন?"

মীরকাসেম বলিলেন, "যাহা দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তুমি শুনিও না।"

নবাব তখনই বাহিরে আসিয়া মীরমুন্সীকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, যে "মুরশীদাবাদে একজন হিন্দু কর্ম্মচারীকে পরওয়ানা দাও যে মুরশীদাবাদের অনতিদূরে বেদগ্রাম নামে স্থান আছে। তথায় চন্দ্রশেখর নামে এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করে। সে আমাকে গণনা শিখাইয়াছিল। তাহাকে ডাকাইয়া গণাইতে হইবে, যে যদি সম্প্রতি ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়, তবে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধ পরে, দলনী বেগম কোথায় থাকিবে?"

মীরমুন্সী তাহাই করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লরেন্স ফষ্টর

বেদগ্রামের অতি নিকটে পুরন্দরপুর নামক গ্রামে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশমের একটি ক্ষুদ্র কুঠি ছিল। লরেন্স ফষ্টর তথায় ফাকটর বা কুঠিয়াল। লরেন্স অল্প বয়সে মেরি ফষ্টরের প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরী স্বীকার করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। এখনকার ইংরেজদিগের ভারতবর্ষে আসিলে যেমন নানাবিধ শারীরিক রোগ জন্মে, তখন বাঙ্গালার বাতাসে ইংরেজদিগের অর্থাপহরণ রোগ জন্মিত; ফষ্টর অল্প কালেই সে রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং মেরির প্রতিমা তাঁহার মন হইতে দূর হইল। একদা তিনি প্রয়োজন বশতঃ বেদগ্রামে গিয়াছিলেন—ভীমা পুষ্করিণীর জলে প্রফুল্ল পদ্ম স্বরূপা শৈবলিনী তাঁহার নয়ন পথে পড়িল। শৈবলিনী গোরা দেখিয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু ফষ্টর ভাবিতে ভাবিতে কুঠিতে ফিরিয়া গেলেন। ফষ্টর ভাবিয়া ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে কটা চক্ষের অপেক্ষা কাল চক্ষু ভাল। এবং

কটা চুলের অপেক্ষা কাল চুল ভাল। অকস্মাৎ তাঁহার স্মরণ হইল যে সংসার সমুদ্রে স্ত্রীলোক তরণী স্বরূপ—সকলেরই সে আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—যে সকল ইংরেজ এদেশে আসিয়া, পুরোহিতকে ফাঁকি দিয়া, বাঙ্গালি সুন্দরীকে এ সংসারের সহায় বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা মন্দ করেন না। অনেক বাঙ্গালির মেয়ে, ধনলোভে ইংরেজ ভজিয়াছে,—শৈবলিনী কি ভজিবে না? ফষ্টর কুঠির কারকুনকে সঙ্গে করিয়া আবার বেদগ্রামে আসিয়া বনমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। কারকুন শৈবলিনীকে দেখিল—তাহার গৃহ দেখিয়া আসিল।—

বাঙ্গালির ছেলে মাত্রেই জুজু নামে ভয় পায়, কিন্তু একটি একটি এমন নষ্ট বালক আছে যে জুজু দেখিতে চাহে। শৈবলিনীর সেই দশা ঘটিল। শৈবলিনী, প্রথম প্রথম তৎকালের প্রচলিত প্রথানুসারে, ফষ্টরকে দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইত। পরে কেহ তাহাকে বলিল, "ইংরেজেরা মনুষ্য ধরিয়া সদ্য ভোজন করে না—ইংরেজ অতি আশ্চর্য্য জন্তু—একদিন চাহিয়া দেখিও।" শৈবলিনী চাহিয়া দেখিলেন—দেখিলেন ইংরেজ তাঁহাকে ধরিয়া সদ্য ভোজন করিল না। সেই অবধি শৈবলিনী ফষ্টরকে দেখিয়া পলাইত না—ক্রমে তাঁহার সহিত কথা কহিতেও সাহস করিয়াছিল, তাহাও পাঠক জানেন।

অশুভক্ষণে শৈবলিনী ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল—অশুভক্ষণে চন্দ্রশেখর তাঁহার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈবলিনী যাহা, তাহা ক্রমে বলিব, কিন্তু সে যাই হউক জাতি, কুল, ধর্ম্ম পরিত্যাগে সে অসমর্থা। ফষ্টরের যত্ন বিফল হইল।

পরে অকস্মাৎ কলিকাতা হইতে ফষ্টরের প্রতি আজ্ঞা প্রচার হইল যে "পুরন্দরপুরের কুঠিতে অন্য ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছে, তুমি শীঘ্র কলিকাতায় আসিবে। তোমাকে কোন বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবে।" যিনি কুঠিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি এই আজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফষ্টরকে সদ্যই কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল।

শৈবলিনীর রূপ ফষ্টরের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। দেখিলেন, শৈবলিনীর আশা ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। এই সময়ে যে সকল ইংরেজেরা বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তাঁহারা দুইটি মাত্র কার্য্যে অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা লোভ সম্বরণে অক্ষম, এবং পরাভব স্বীকারে অক্ষম। তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে এ কার্য্য পারিলাম না—নিরস্ত হওয়াই ভাল। এবং তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না, যে এ কার্য্যে অধর্ম্ম আছে, অতএব অকর্ত্তব্য। যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রথম ব্রিটেনীয় রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং পাপিষ্ঠ মনুষ্য সম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখন দেখা দেয় নাই।

লরেন্স ফষ্টর সেই প্রকৃতির লোক। তিনি লোভ সম্বরণ করিলেন না— বঙ্গীয় ইংরেজদিগের মধ্যে তখন ধর্ম্ম শব্দ লুপ্ত হইয়াছিল। সাধ্যাসাধ্যও বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে বলিলেন, "Now or never !"

এই ভাবিয়া, যেদিন কলিকাতায় যাত্রা করিবেন, তাহার পূর্ব্ব রাত্রে সন্ধ্যার পর শিবিকা, বাহক, কুঠির কয়জন বরকন্দাজ লইয়া সশস্ত্রে বেদগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সেই রাত্রে বেদগ্রামের বাসীরা সভয়ে শুনিলেন যে চন্দ্রশেখরের গৃহে ডাকাইতি হইতেছে। চন্দ্রশেখর সে দিন গৃহে ছিলেন না, মুরশিদাবাদ হইতে রাজকর্ম্মচারীর সাদর নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন—অদ্যাপি প্রত্যাগমন করেন নাই। গ্রামবাসীরা চীৎকার, কোলাহল, বন্দুকের শব্দ, এবং রোদন ধ্বনি শুনিয়া শয্যাতাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, যে চন্দ্রশেখরের বাড়ী ডাকাইতি হইতেছে—অনেক মশালের আলো। কেহ অগ্রসর হইল না। তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিল যে বাড়ী লুটিয়া ডাকাইতেরা একে একে নির্গত হইল। বিস্মিত হইয়া দেখিল যে কয়েকজন বাহকে একখানি শিবিকা স্কন্ধে করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। শিবিকার দ্বার রুদ্ধ—সঙ্গে পুরন্দরপুরের কুঠির সাহেব ! দেখিয়া সকলে সভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

দস্যুগণ চলিয়া গেলে প্রতিবাসীরা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, দ্রব্য সামগ্রী বড় অধিক অপহৃত হয় নাই—অধিকাংশই আছে। কিন্তু শৈবলিনী নাই। কেহ কেহ বলিল, "সে কোথায় লুকাইয়াছে, এখনই আসিবে।" প্রাচীনেরা বলিল, "আর আসিবে না—আসিলেও চন্দ্রশেখর তাহাকে আর ঘরে লইবে না। যে পাল্কী দেখিলে, ঐ পাল্কীর মধ্যে সে গিয়াছে।"

যাহারা প্রত্যাশা করিতেছিল যে শৈবলিনী আবার ফিরিয়া আসিবে, তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, শেষে বসিল। বসিয়া বসিয়া, নিদ্রায় ঢুলিতে লাগিল। ঢুলিয়া ঢুলিয়া, বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। শৈবলিনী আসিল না।

সুন্দরী নামে যে যুবতীকে আমরা প্রথমে পরিচিতা করিয়াছি, সেই সকলের শেষে উঠিয়া গেল। সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীর কন্যা, সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনী, শৈবলিনীর সখী। আবার তাহার কথা উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়া, এস্থলে এ পরিচয় দিলাম।

সুন্দরী বসিয়া বসিয়া, প্রভাতে গৃহে গেল। গৃহে গিয়া কাঁদিতে লাগিল।

প্রথম সর্গ

মনোরাজ্য প্রয়াণ

সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ
সাগর সীমায় যথা অস্ত যায় জলন্ত
তপন।
স্বপন রমণী, আইল অমনি,
নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ॥

সুকোমল চরণ-কমল দুটি
ছোঁয় কি না ছোঁয় মাটি, আঁচল ধরায়
পড়ে লুটি'।
করে পদ্মফুল, করে ঢুল ঢুল,
অলসিত আঁখি সম আধো আধো ফুটি'॥

কবির শিয়রে গিয়া ধীরে ধীরে
ছুঁয়াইল শতদল মুখে চক্ষে নাসিকার
শিরে।
পরশের বশে, মোহ-বন্ধ খসে,
অচেতন কবির চেতন আসে ফিরে॥

অচেতন চেতন! ঘুমন্তে জাগা!
সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়া নাই
আগা!
স্বপ্নের কৃপায় অন্ধে আঁখি পায়,
ঐশ্বর্য্যে কাঁপিয়া উঠে দরিদ্র অভাগা॥

ছায়া-রূপা রমণী সুযোগ ভাবি
কবির মনোমন্দিরে খুলি দিল রহস্যের
চাবি।
দেখিতে দেখিতে, অমনি চকিতে,
আলোকের পথ দিয়া রথ 'এল নাবি'॥

মনোরথ নাম তার, কামচারী;
আরোহিল তাহে কবি তন্দ্রার হইয়া
আজ্ঞাকারী।
অমনি বিমান, করে গাত্রোত্থান,
চাল'য় সারথী হয়ে কল্পনা কুমারী।

দেখিতে না দিয়া কোথা কোন্ স্থান,
বিপুল ধরার ধরা এড়াইয়া চলিল
বিমান।
গিরিসব তার, ভূতলে মিশায়
সমুদ্র হইয়া ক্ষুদ্র লভিল নির্ব্বাণ॥

কবিবর নাহি জানে কোথা রয়!
ক্ষণে ভয়, ক্ষণেকে সাহস হয়, ক্ষণেকে
বিস্ময়!
কিছুকাল পরে, আকুল অন্তরে,
সারথিরে নিরখিয়া সম্বোধিয়া কয়॥

"কোথায় গো সারথি! তোমারে ধন্ত!
নাহি দিক্ বিদিক্ অগম্য শূন্ত, হেথায়
কি জন্ত!
কহিছ না কথা, এ কেমন প্রথা,
চাও গো আমার পানে হইয়া প্রসন্ন॥"

কিবা রাসগুচ্ছ বাগাইয়া ধরি
চাহিল কবির পানে, মনোরাস কাড়িয়া,
সুন্দরী!
পরে গুণধরে, ফেলিল ফাঁফরে
"কি জিজ্ঞাসিতেছ" বলি মৌন পরিহরি॥

কেবা আর কাহারে করে জিজ্ঞাসা!
স্তব্ধ-পুলকিতচ্ছবি কবিবর! মুখে
নাই ভাষা!
জিজ্ঞাসা যা কিছু, পড়ি রহে পিছু,
হেরিতে বদন বিধু আঁখির পিপাসা॥

কোথা গেল কবির বাক্য-বিভব!
আনন্দের হিল্লোলে ভাসিয়া গেল মুহূর্ত্তে
সে সব!
ভয় আসি, কয় "স্বপ্ন এত নয়?"
কবি কহে "স্বপ্ন নহে, এ দেখি বাস্তব!"

"সেই চাঁদ বদন সুধার খনি!
সেই আঁখি, জীবিতের মরণ, মৃতের
সঞ্জীবনী!
অকূল পাথারে ফেলিয়া আমারে
কোথা লুকাইয়াছিলে বল মোরে ধনি!

কতকাল পরে আজি ভাগ্যোদয়!
পূর্ব্বে সে যখন তুমি দেখা দিতে, সে
এক সময়!
জাগিছে সে সব, হৃদে অভিনব,
যতনের বস্তু সে যে বচনের নয়!

"বেড়াতাম কত খুসিতে হাসিতে
বারেক না মনে হ'ত, পরিচয় তব
জিজ্ঞাসিতে।
শুধু জানিতাম, কলপনা নাম
নব নব সাজি সাজ, ছলিতে আসিতে॥

"এখন আবার, একি চমৎকার!
রথ লয়ে আসিয়াছ সারথির ধরিয়া
আকার!
অশ্ব—তেজে ভরা, মৃদু হস্তে মরা,
চারুতার কাছে আর দর্প খাটে কার!

"যাইতেছ কোথায় তা' বল শুনি";
"মনোরাজ্যে যাইতেছি" হাস্তমুখে
কহিল তরুণী।
শুনি মনোরাজ্য, করি শিরোধার্য্য
"লয়ে চল লয়ে চল" বলি' উঠে গুণী॥

তোমা সঙ্গে তথায় না যা'ব যদি,
কেন তবে এতেক সাধ্য-সাধনা শৈশব
অবধি।
অই মম জপ, অই মম তপ,
অই দিকে ধায় সদা বাসনার নদী॥

"মনোরাজ্য নামটি মধুতে ভরা!
ফুটে যথা পারিজাত বিচরে গন্ধর্ব্ব
অপ্সরা।
দলি' স্বর্ণরেণু, চরে কাম ধেনু,
কল্পতরু সুচারু ছায়ায় ছায় ধরা॥

"মনোবাঞ্ছা পূরিবে তথায় গিয়া।
মিলিবে সে সুখনিধি সদা চিন্তা যাহার
লাগিয়া।
ধরাতল-রূপ ছাড়ি অন্ধকূপ
এইবার বাঁচিব নিশ্বাস ত্যেরাগিয়া॥"

কবিবর বচন করিতে সাঙ্গ'
কল্পনা মধুরহাসি' হরি' লয়ে হরিণ
অপাঙ্গ
শিথিল আয়াসে, লোল দিল রাসে,
তেজে গরজিয়া উঠি ধাইল তুরঙ্গ ॥

মনোরাজ্য ক্রমে হৈল সন্নিকট,
দূর হইতে মনে লয় শোভে যেন চিত্র
অকপট।
গিরি নদী বন হর্ম্ম্য সুশোভন
স্তরে স্তরে শোভাকরে দিগন্তের পট ॥

সম্মুখে তোরণ-দ্বার শক্রধনু ;
ভিতরে সরসী হাসে চন্দ্রাভাসে
পুলকিততনু।
ঘন বনচ্ছায়, কজ্জলের প্রায়,
তীরে যথা নীরে তথা ভেদ নাহি অণু ॥

থামিল তুরঙ্গ রাজি ক্ষণ পরে
"নাম' কবি এই খানে" কল্পনা কহিল
সুধাস্বরে।
প্রফুল্ল অন্তরে, কবি অবতরে,
নামে বালা মরাল-নিন্দিত পদভরে ॥

"রম্য এযে উপবন" কহে কবি তখন
ফিরাইয়া নয়ন চৌদিক্ পানে।
পুষ্পলতা মিলি ঝুলি, সমীরে হেলিদুলি,
করিছে কোলাকুলি অভেদ প্রাণে ॥"

পথ দিব্য দেখা যায়, জ্যোৎস্নার কৃপায় ;
হেলিয়া তরু, তায়, ছায়া বিছায়।
নিকুঞ্জে ডাকিছে পিক, নিভৃত চারিদিক্
নয়ন অনিমিক, ফিরান' দায় ॥

হে গর্দ্দভ! আমার প্রদত্ত, এই নবীন তৃণ সকল ভোজন করুন্। ১।

আমি বহুযত্নে, গোবৎসাদির অগম্য প্রান্তর সকল হইতে, নবজল-কণানিষেক সুরভি তৃণাগ্রভাগ সকল, আহরণ করিয়া আনিয়াছি, আপনি সুন্দর বদনমণ্ডলে গ্রহণ করিয়া, মুক্তানিন্দিত দন্তে ছেদন পূর্ব্বক আমার প্রতি কৃপাবান্ হউন।

হে মহাভাগ! আপনার পূজা করিব ইচ্ছা হইয়াছে, কেননা আপনাকেই সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। অতএব হে বিশ্বব্যাপিন্! আমার পূজা গ্রহণ করুন্।

আমি পূজ্য ব্যক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, নানা দেশে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, আপনি সর্ব্বত্রই বসিয়া আছেন, সকলেই আপনার পূজা করিতেছে। অতএব হে দীর্ঘকর্ণ! আমারও পূজা গ্রহণ করুন্।

হে গর্দ্দভ! কে বলে তোমার পদগুলি ক্ষুদ্র। যেখানে সেখানে তোমারই বড় পদ, দেখিয়া থাকি। তুমি উচ্চাসনে বসিয়া, স্তাবকগণে পরিবৃত হইয়া, মোটা মোটা ঘাসের আঁটি খাইয়া থাক। লোকে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রশংসা করে।

তুমিই বিচারাসনে উপবেশন করিয়া, মহাকর্ণদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছ। তাহার অগাধ গহ্বর দেখিতে পাইয়া, উকীল নামক কবিগণ নানাবিধ কাব্যরস তন্মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। তখন তুমি শ্রবণতৃপ্তিসুখে অভিভূত হইয়া নিদ্রা গিয়া থাক।

হে বৃহন্মুণ্ড! তখন সেই কাব্যরসে আর্দ্রীভূত হইয়া, তুমি দয়াময় হইয়া, অসীম দয়ার প্রভাবে রামের সর্ব্বস্ব শ্যামকে দাও, শ্যামের সর্ব্বস্ব কানাইকে দাও; তোমার দয়ার পার নাই।

হে রজকগৃহভূষণ! কখনও দেখিয়াছি, তুমি লাঙ্গুল সঙ্গোপন পূর্ব্বক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া, সরস্বতীমণ্ডপ মধ্যে বঙ্গীয় বালকগণকে গর্দ্দভলোক প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতেছ। বালকেরা গর্দ্দভলোকে প্রবেশ করিলে,

"প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইল" বলিয়া, মহা গর্জ্জন করিয়া থাক। শুনিয়া আমরা ভয় পাই।

হে প্রকাণ্ডোদর! তুমিই চতুষ্পাঠীমধ্যে কুশাসনে উপবেশন করিয়া, তৈল-নিসিক্ত ললাটপ্রান্তরে চন্দনে নদী অঙ্কিত করিয়া, তুলটহস্তে শোভা পাও। তোমার কৃত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমরা ধন্য ধন্য করিতেছি। অতএব হে মহাপশো! আমার প্রদত্ত কোমল তৃণাঙ্কুর ভোজন কর।

তোমারই প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা—তুমি নহিলে আর কাহারও প্রতি কমলার দয়া হয় না। তিনি তোমাকে কখনও ত্যাগ করেন না, কিন্তু তুমি তাঁহাকে বুদ্ধির গুণে সর্ব্বদাই ত্যাগ করিয়া থাক। এই জন্যই লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য-কলঙ্ক। অতএব হে সুপুচ্ছ! তৃণ ভোজন কর।

তুমিই গায়ক। ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি সপ্তস্বরই তোমার কণ্ঠে। অন্যে বহুকাল, তোমার অনুকরণ করিয়া, দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিয়া, অনেক প্রকার কাশি অভ্যাস করিয়া, তোমার মত স্বর পাইয়া থাকে। হে ভৈরবকণ্ঠ, ঘাস খাও।

তুমি বহুকাল হইতে পৃথিবীতলে বিচরণ করিতেছ। তুমিই রামায়ণে রাজা দশরথ, নহিলে রাম বনে যাইবে কেন? তুমি মহাভারতে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, নহিলে পাণ্ডব পাশায় স্ত্রী হারিবে কেন? তুমি কলিযুগে বঙ্গদেশে বৃদ্ধ সেন রাজা ছিলে, —নহিলে বঙ্গদেশে মুসলমান কেন?

তুমিই ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলে, সন্দেহ নাই, নহিলে নবমীতে লাউ খাইতে নাই কেন? তুমিই আলঙ্কারিক, সাহিত্যদর্পণাদি তোমারই সৃষ্টি। কিঞ্চিৎ ঘাস খাও।

তুমি সুকবি—কাদম্বরী, বাসবদত্তা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট, জগন্মান্য কাব্য তোমারই প্রণীত। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় থাকিয়া, তুমিই বিদ্যাসুন্দরাদি প্রণয়ন করিয়াছিলে, সন্দেহ নাই। নহিলে এজন্মে তাহাতে তোমার এত প্রীতি কেন?

তুমি নানা রূপে, নানা দেশ আলো করিয়া, যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। এক্ষণে তপস্যাবলে, ব্রহ্মার বরে, তুমি বঙ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। হে লোমশাবতার! আমার সমাহৃত কোমল নবীন তৃণাঙ্কুর সকল ভক্ষণ কর, আমি আহ্লাদিত হইব।

হে মহাপৃষ্ঠ! তুমি কখন রাজ্যের ভার বহ, কখন পুস্তকের ভার বহ, কখন ধোপার গাঁটরি বহ। হে লোমশ! কোনটি গুরু ভার আমায় বলিয়া দাও।

তুমি কখন ঘাস খাও, কখন ঠেঙ্গা খাও, কখন গ্রন্থকারের মাথা খাও; হে লোমশ! কোনটি সুভক্ষ্য, অর্ব্বাচীনকে বলিয়া দাও।

হে সুন্দর! তোমার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি। তুমি যখন

গাছ তলায় দাঁড়াইয়া, নববর্ষাসারসিক্ত হইতে থাক, দুই মহাকর্ণ ঊর্দ্ধোত্থিত করিয়া, মুখচন্দ্র বিনত করিয়া, চক্ষু দুটি ক্ষণে মুদিত ক্ষণে উন্মেষিত করিতে করিতে ভিজিতে থাক,—তোমার পৃষ্ঠে, মুণ্ডে এবং স্কন্ধে বসুধারা বহিতে থাকে—তখন তোমাকে আমি বড় সুন্দর দেখি। হে লোকমনোমোহন! কিছু ঘাস খাও।

বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই, এজন্য তুমি শান্ত, বেগ দেন নাই এজন্য সুধীর, বুদ্ধি দেন নাই, এজন্য তুমি বিদ্বান্; এবং মোট না বহিলে খাইতে পাও না, এজন্য তুমি পরোপকারী। আমি তোমার যশোগান করিতেছি; ঘাস খাইয়া সুখী কর।

যেমন ভগবান্ কূর্ম্মরূপে, পৃষ্ঠে পৃথিবী বহন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণরূপে, অঙ্গুলিতে গিরি বহন করিয়াছিলেন, নাগরূপে, মস্তকে ধরণীর ভার বহন করিতেছেন, তেমনি তুমিও পশু, পশুরূপে মলিন বস্ত্রের ভার বহন কর। অতএব তোমারও পূজা করিব—এই ঘাস গ্রহণ কর।

তুমি বিধাতার অনুগ্রহে চতুর্ভুজ। এবং জাতিধর্ম্মবশতঃ সর্ব্বদা গোপীগণে পরিবৃত। পুচ্ছ চূড়া হইতে স্থানান্তরে গিয়াছে বটে, কিন্তু আছে। ঐ যে গর্জ্জন করিলে, ওকি বংশীরব? তুমি ভক্তের নিকট প্রকাশ করিয়া বল, আবার এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে কেন?

তুমি আবার কি কংস শিশুপালাদি অসুরের বধ করিতে আসিয়াছ? কংস এখন আর নাই – তিনি একটি "আকার" প্রাপ্ত হইয়া থালা ঘটি বাটি ইত্যাদিতে পরিণত হইয়াছেন—এবার তাহাতে উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইয়া সুখী হও। শিশুপালের উপর তোমার রাগ আছে সন্দেহ নাই কেননা শিশুপাল ইঁট মারিয়া সর্ব্বদা তোমার অস্থি ভাঙ্গিয়া দেয়। কিন্তু হে মহাবল! আমার পরামর্শ শুন, তাহাদিগের শারীরিক আঘাত করিও না। তুমি যে সম্বাদ পত্রের সম্পাদক হইয়া সপ্তাহে সপ্তাহে, তাহাদিগকে আপন বুদ্ধি দান করিতেছ, তাহাতেই শিশুপালের সর্ব্বনাশ হইবে।

অথবা তুমি কি আবার একটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধাইতে অবতীর্ণ হইয়াছ? এবারকার যুদ্ধ শস্ত্রে না শাস্ত্রে?

হে গর্দ্দভ! আমি অর্ব্বাচীন, কি বলিতে কি বলিলাম, তুমি আমার উপর রাগ করিও না। যিনি জগতের আরাধ্য তিনি সকল ভূতেই আছেন, এজন্য আমি তোমারও পূজা করিলাম। অন্য লোক যদি মনুষ্য পূজা করিতে পারে, তবে আমি তোমার পূজা না করি কেন? তুমি কি "grand etye" ছাড়া?

নন্দবংশোচ্ছেদ। করুণরসাশ্রিত নাটক। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীগোপালচন্দ্র মান্নার দ্বারা মুদ্রিত।

আমরা বলিতে পারি না যে নন্দবংশোচ্ছেদ নাটক পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমরা ইহাও বলিতে পারি না যে ইহা পাঠ করিয়া আমরা অসন্তুষ্ট হইয়াছি। এই নাটক হাম্লেটের অনুকরণ। হাম্লেটের অনুকরণ শুনিয়া পাঠকের মনে আশা হয়, যে যে সকল গুণে হাম্লেট্ নাটক শ্রেষ্ঠ মধ্যে গণ্য, তাহার কিছু না কিছু ইহাতে পাওয়া যাইবে। আমাদিগের সে আশা ফলবতী হয় নাই। অপ্রীতির কারণ এই, প্রীতির কারণ পশ্চাৎ বলিব। ফলে, হাম্লেটের সর্ব্বাঙ্গীন অনুকরণ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যও নহে। হাম্লেটের সঙ্গে নন্দবংশচ্ছেদের যে সাদৃশ্য তাহা অবস্থাগত—চরিত্রগত নহে। কুমার নন্দের চরিত্রে হাম্লেটের চরিত্র কিছুই নাই। নন্দের চরিত্র নাই বলিলেই হয়। তিনি এদেশী উপন্যাস ও নাটকের সাধারণ নায়ক—রত্নাবলী ও কাদম্বরীর নায়কদিগের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র মাত্র। শশীপ্রভার জন্য তাঁহার কৃত আক্ষেপোক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"নন্দ। (স্বগত) মন, আর কেন বিষময়ী ললনার চিন্তা কর? সে ত তোমার নয়। শশীপ্রভা! হাঃ প্রিয়ে! আমি নিশ্চয় জান্‌তেম্ যে তুমি একান্তই আমার, হায়! যে একমাত্র আশ্রয় অবলম্বন করে জীবন ধারণ কর্‌ছিলাম, এখন তাতেও বঞ্চিত হতে হলো। শশী! তোমার মনে এই ছিল? অথবা তোমার দোষ কি, শঠতা ও চাপল্য তোমাদের জাতীয় ধর্ম্ম। ঈশ্বর নারীর হৃদয় যে কোন উপকরণে নির্ম্মাণ করেছেন, কেবল তিনিই বল্‌তে পারেন ইত্যাদি।"

কবি যে হাম্লেটের প্রকৃত অনুকরণ করেন নাই—ভালই করিয়াছেন। কেননা, হাম্লেটের ন্যায় নাটক অনুকরণীয় নহে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হইবে, যে তাহার অনুকরণ অসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ, কাব্যের অনুকৃত কাব্য প্রায় অত্যুৎকৃষ্ট হয় না। তৃতীয়তঃ বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রায় অধিকাংশ অনুকরণ মাত্র—এখন অনুকরণ যত অল্প হয় ততই ভাল। অনুকরণ-প্রবৃত্তিজাত উৎকৃষ্ট কাব্যের অপেক্ষা লেখকের নিজ কল্পনাপ্রসূত একখানি নিকৃষ্টতর কাব্যের অধিক আদর করিতে প্রস্তুত আছি।

অতএব নন্দবংশোচ্ছেদ যে অসম্পূর্ণ অনুকরণ একজন্য তৎপ্রতি আমরা অপ্রীত নহি। অপ্রীতির কারণ এই যে ইহা কিয়দংশে অনুকরণ মাত্র; অথচ সেই অনুকরণে নাটকের কোন উৎকর্ষ সম্পাদিত হয় নাই।

কেবল, নায়িকা শশীপ্রভার চরিত্র সম্বন্ধে এই অপ্রীতির কারণ তাদৃশ বর্ত্তে না। অফিলিয়া শশীপ্রভার আদর্শ বটে; অফিলিয়ার ন্যায় শশীপ্রভাও উন্মাদিনী। কিন্তু শশীপ্রভার উন্মাদ, অফিলিয়ার উন্মাদের ন্যায় নহে, অথচ তাহা বড় মন্দ হয় নাই। কিন্তু তাহাতেও দোষ এই, যে পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের ন্যায়, তাঁহার উন্মাদ কেবল দেখাইবার জন্য; কাজের সময়ে জ্ঞান সম্পূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

নন্দ। বিনোদিনি, রাক্ষসী আবার কে? তোমার পিতাই ত রাক্ষস?

শশী। আরে! বাবা কেন রাক্ষস হতে যাবেন, তোমাদের বিচক্ষণা যে রাক্ষসী তা বুঝি জাননা?

নন্দ। (স্বগত) শশীর কথায় আমার সংশয় জন্মাচ্চে। প্রেয়সীর রাক্ষসী প্রলাপের কোন গূঢ় কারণ থাক্‌বে। (প্রকাশ্যে) বিচক্ষণা কিসে রাক্ষসী হল?

শশী। তোমার বাপ্‌কে যে খেয়েছে, তাকি জাননা?

নন্দ। তুমি কেমন করে জান্‌লে?

শশী। বৌ সব আমায় বলেছে।

নন্দ। কি বলেছে?

শশী। কি বলেছে, কি বলেছে, যাও আমি আর বলিব না।

নন্দ। ভাল, বৌ কেমন করে জান্‌লে, যে বিচক্ষণা বাবাকে খেয়েছে?

শশী। দাদা তাকে বলেছে।

নন্দ। কি বলেছে?

শশী। আঃরে! আবার বলে কি বলেছে, কি বলেছে, আমি আর কারও কাছে বলব না, কিছু বল্‌ব না।

নন্দ। কেন প্রিয়ে, বলবে না কেন?

শশী। আমায় যে ও সব কথা বলতে বারণ করেছে?

নন্দ। কে বারণ করেছে?

শশী। দাদা বারণ করেছে, বৌ বারণ করেছে—সব্বাই বারণ করেছে।

ইহার মধ্যে উন্মত্তের কথা কিছুই নাই—সকল কথা গুলি, অর্থযুক্ত, সঙ্গত, এবং পরিষ্কার। সত্য বটে ইহার মধ্যে এমত কথা অনেক আছে, যাহা কোন চতুরা স্ত্রীলোক শশীর স্থানীয়া হইলে নন্দের সাক্ষাতে প্রকাশ করিত না, কিন্তু এমত কথা কিছুই নাই যে সে অবস্থায় একটি সরলা অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকে বলিবার

সম্ভাবনা ছিল না। সরলতা বা চতুরতার অভাবই যে উন্মাদ নহে, ইহা বলা বাহুল্য।

এ সকল দোষ সত্বে নাটকখানি মন্দ হয় নাই। আধুনিক, নাটকের অবস্থা ভাবিতে গেলে নাটকখানি ভাল হইয়াছে বলিতে হইবে। অধিকাংশ বাঙ্গালা নাটক, ইহার অপেক্ষা অপকৃষ্ট। শশীপ্রভার চরিত্র, করুণরসাশ্রিত বটে। সেই চরিত্রটি এ নাটকের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র। রাণীর দুঃখে, এবং উপসংহৃতিতে, বিলক্ষণ করুণা আছে। আমাদের বিবেচনায় এই নাটক অভিনীত হইবার যোগ্য।

বঙ্গ শ্রুতবোধ। মহাকবি কালিদাস প্রণীত শ্রুতবোধের অনুকরণ ক্রমে বিরচিত। কলিকাতা, গুপ্তযন্ত্র।

গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় কবিতায় গ্রন্থের যে পরিচয় আছে, তাহার অধিক আর কোন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই ;—

উপজাতি ছন্দঃ।

যে পুস্তকে বিজ্ঞজনের জন্মে
বঙ্গীয়চ্ছন্দে শ্রুতমাত্র বোধ।
বিলোকনে ধিক্কৃত-এণ-কাণ্ডে !
তাহারে বঙ্গ শ্রুতবোধ জানি। ১।
অদীর্ঘ বর্ণে রয় একমাত্রা,
দীর্ঘাক্ষর প্রেমনিধে ! দ্বিমাত্র।
অহ্রস্ব যুক্তাদ্যক বর্ণ কিন্তু
হ্রপ্রান্তবর্ণে লঘুতা বিকল্পে ॥

The Fifteenth Anniversary Report of Family Club, Burrabazar &c. কলিকাতা নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস।

এখানি পাইয়া প্রীত হইলাম। বড়বাজারের সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। এই বিজ্ঞাপনীতে বাবু কালীমোহন দাসের উক্ত বিচার বিষয়ক একটি প্রবন্ধের সারমর্ম্ম সঙ্কলিত আছে। সেটি সবিস্তারে প্রকাশিত হইলে বোধ হয়, অনেকে অধিকতর প্রীত হইতেন।

The Legal Companion, Serampore.

ইহার নামই ইহার পরিচয়। আইন ব্যবসায়ীদিগের যাহা যাহা আবশ্যক তাহা সকলই ইহাতে পাওয়া যায়। ইহা অষ্টভাগে বিভক্ত। I. Civil Rulings. II. Criminal Rulings. III. Short Notes of Civil Rulings.

IV. Indian Council Acts. V. Bengal Council Acts. VI. Rules and Orders of the High Court. VII. Revenue Circular Orders. VIII. Important Government Orders.

যে কয়টি মোকর্দ্দমার বিষয় ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বিজ্ঞাপনী উত্তম হইয়াছে।

কৃষ্ণভক্তিসার। শ্রীউমানাথ রায় প্রণীত। কলিকাতা হিতৈষী যন্ত্র।

এখানি পদ্যগ্রন্থ। বৈষ্ণবদিগের কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার ইহাতে কৃষ্ণ-বিষয়ক কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন। বৈষ্ণবদিগের ইহা ভাল লাগিলেও লাগিতে পারে, কিন্তু অন্য কোন মনুষ্যের সাধ্য নাই যে ইহার এক পৃষ্ঠা পড়ে। ইহা যদি কৃষ্ণভক্তির সার, তবে সাধারণ কৃষ্ণভক্তি না জানি কি পদার্থ ?

সচরাচর মনুষ্যের বোধ এই যে গতি, জগতের বিশেষ অবস্থা; স্থিরতা জগতের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে, যে গতিই স্বাভাবিক অবস্থা; স্থিরতা কেবল গতির রোধ মাত্র। যাহা গতিবিশিষ্ট কারণ বশতঃ তাহার গতি রোধ হইলে, তাহার অবস্থাকে আমরা স্থিরতা বা স্থিতি বলি। যে শিলাখণ্ড, বা অট্টালিকাকে অচল বিবেচনা করিতেছি, বাস্তবিক তাহার মাধ্যা-কর্ষণের বলে গতিবিশিষ্ট; নিম্নস্থ ভূমি তাহার গতি রোধ করিতেছে বলিয়া তাহাকে স্থির বলিতেছি। এ স্থিরতাও কাল্পনিক; পৃথিবীতলস্থ অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেছি যে এই পর্ব্বত বা এই অট্টালিকা, অচল, গতিশূন্য—বস্তুতঃ উহার কেহই অচল বা গতিশূন্য নহে, পৃথিবীর উপরে থাকিয়া উহা পৃথিবীর সঙ্গে আবর্ত্তন করিতেছে। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিতে গেলে জগতে কিছুই গতিশূন্য নহে।

কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্। যাহা পৃথিবীর গতিতে গতিবিশিষ্ট তাহাকে চঞ্চল বলিবার প্রয়োজন করে না। তথাপিও পৃথিবীতে এমত কোন বস্তু নাই, যে মুহূর্ত্ত জন্য স্থির।

চারিপার্শ্বে চাহিয়া দেখ, বায়ু বহিতেছে, বৃক্ষপত্র সকল নাচিতেছে, জল চলিতেছে, জীব সকল নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পাদনার্থ বিচরণ করিতেছে। কিন্তু ইহার মধ্যেও কোন কোন বস্তু গতিশূন্য দেখা যাইতেছে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণে রুদ্ধ বাহ্যিকগতি ভিন্ন, ঐ সকল বস্তুর অন্য গতি আছে। সেই সকল গতি আভ্যন্তরিক।

বস্তু মাত্রেরই কিয়ৎ পরিমাণে তাপ আছে। যাহাকে শীতল বলি, তাহা বস্তুতঃ তাপশূন্য নহে। তাপের অল্পতাকেই শীতলতা বলি, তাপের অভাব কিছুতেই নাই। যে তুষারখণ্ডের স্পর্শে অঙ্গচ্ছেদের ক্লেশানুভব করিতে হয়, তাহাতেও তাপের অভাব নাই—অল্পতা মাত্র।

যাহাকে তাপ বলি, তাহার পরমাণু গণের আন্দোলন মাত্র। কোন বস্তুর পরমাণু সকল পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট এবং সন্তাড়িত হইলে, তাহা তরঙ্গবৎ আন্দো-

লিত হইতে থাকে। সেই ক্রিয়াই তাপ। যেখানে সকল বস্তুই তাপযুক্ত, সেখানে সকল বস্তুর পরমাণুই অহরহ পরস্পর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট, সন্তাড়িত, এবং সঞ্চালিত। অতএব পৃথিবীস্থ সকল বস্তুই আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট।

আলোক সম্বন্ধেও সেই কথা। ইথর নামক বিশ্বব্যাপী আকাশীয় তরল পদার্থের পরমাণু সমষ্টির তরঙ্গবৎ আন্দোলনই আলোক। সেই গতিবিশিষ্ট পরমাণু সকলের সঙ্গে নয়নেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়। সেই প্রকার তাপীয় তরঙ্গ-সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে তাপ অনুভূত করি। এই সকল আন্দোলন ক্রিয়া মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের অগোচর—উহা তাপরূপে এবং আলোকরূপেই আমরা ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক গ্রহণ করিতে পারি—অন্যরূপে নহে। তবে এই আন্দোলন ক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কারণ কি? ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা তাহা স্বীকার করিবার বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা এস্থলে বর্ণনীয় নহে।

পৃথিবীতলে আলোক সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। অতি অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রে, পৃথিবীতল একেবারে আলোকশূন্য নহে। অতএব সর্ব্বত্রেই সর্ব্বদা আলোকীয় আন্দোলনের গতি বর্ত্তমান।

বিজ্ঞানবিদেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে আলোক, তাপ, এবং মাধ্যাকর্ষণ তিনটিই পরমাণুর গতি মাত্র। অতএব পৃথিবীর সকল বস্তুই আভ্যন্তরিক গতি বিশিষ্ট। যৌগিক আকর্ষণের বলে সেই সকল গতি সত্বেও কোন বস্তুর পরমাণু সকল বিস্রস্ত ও পৃথগ্‌ভূত হয় না।

পৃথিবীতলে এইরূপ। তারপর, পৃথিবীর বাহিরে কি?

পৃথিবী স্বয়ং অত্যন্ত প্রখর বেগবিশিষ্টা, এবং অনন্তকাল আকাশমার্গে ধাবমানা। পৃথিবীর অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি যাহা সৌরজগতের অন্তর্গত তাহাও পৃথিবীর ন্যায় অবস্থাপন্ন সন্দেহ নাই। সেই সকল গ্রহ উপগ্রহে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাও পার্থিবপদার্থের ন্যায় সর্ব্বদা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক গতি বিশিষ্ট। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের দৌরবিক্ষণিক অনুসন্ধানে সে কথার অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।

সূর্য্য নামে যে বৃহৎ বস্তু এই সৌরজগতের কেন্দ্রীভূত, তাহা যেরূপ চাঞ্চল্য-পূর্ণ, তাহা মনুষ্যের অনুভব শক্তির অতীত। যে সূর্য্যমণ্ডলের তাপ, আলোক, আকর্ষণ এবং বৈদ্যুতাদিকী শক্তি পৃথিবীস্থ গতি মাত্রেরই কারণ, সেই সূর্য্য-মণ্ডলোপরে বা তদভ্যন্তরে যে নানাবিধ ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত গতি নিয়ত বর্ত্তিবে, তাহা বলা বাহুল্য। সেই চাঞ্চল্যের একটি উদাহরণ বঙ্গদর্শনের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় "আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত" নামক প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছিল।

কিন্তু সূর্য্যোপরে এবং সূর্য্যগর্ভে যে নিয়ত গতির আধিপত্য, কেবল ইহাই

নহে। সূর্য্য স্বয়ং গতি বিশিষ্ট। বিজ্ঞানবিদেরা স্থির করিয়াছেন, যে সূর্য্য স্বয়ং এই তাবৎ সৌরজগৎ সঙ্গে লইয়া প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮০ মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৭১০০ মাইল আকাশ পথে ধাবিত হইতেছে। এই ভয়ঙ্করবেগে এই পদার্থরাশি কোথায় যাইতেছে? কেহ বলিতে পারে না কোথায় যাইতেছে। আকাশের একটি নাক্ষত্রিক প্রদেশকে ইউরোপীয়েরা হরক্যুলিজ বলেন। সূর্য্য তন্মধ্যস্থ লাম্‌ডা নামক নক্ষত্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, কেবল এই পর্য্যন্ত নিশ্চিত হইয়াছে।

কিন্তু সূর্য্য এবং সৌরজগৎ ত বিশ্বের অতি ক্ষুদ্রাংশ। অন্ধকার রাত্রে অনন্ত আকাশমণ্ডল ব্যাপিয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক জ্বলিতে থাকে, তাহারা সকলেই এক একটি সৌর জগতের কেন্দ্রীভূত। সে সকল কি? গতি শূন্য? তাহাদিগেরও প্রাত্যহিক উদয়াস্তাদি গতি দেখিতে পাই, সেও পৃথিবীর প্রাত্যহিক আবর্ত্তনজনিত চাক্ষুষ ভ্রান্তি মাত্র। নাক্ষত্রিক লোকেও কি জগৎ চঞ্চল?

জ্যোতির্ব্বিদ্যার দ্বারা যতদূর অনুসন্ধান হইয়াছে, ততদূর জানিতে পারা গিয়াছে, যে নক্ষত্রলোকেও গতি সর্ব্বময়ী। যত অনুসন্ধান হইয়াছে, ততই বুঝা গিয়াছে যে সূর্য্যের যে প্রকৃতি নক্ষত্র মাত্রেরই সেই প্রকৃতি। গ্রহ ভিন্ন অন্য তারাকে নক্ষত্র বলিতেছি।

কতকগুলি নক্ষত্র সৌর গ্রহগণের ন্যায় বর্ত্তনশীল। যেখানে আমরা চক্ষে একটি নক্ষত্র দেখিতে পাই, দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে তথায় কখন কখন দুইটি, তিনটি বা ততোধিক নক্ষত্র দেখা যায়। কখন কখন ঐ দুই তিনটি নক্ষত্র পরস্পরের সহিত সম্বন্ধরহিত, এবং পরস্পর হইতে দূরস্থিত, অথচ দর্শক যেখান হইতে দেখিতেছেন, সেখান হইতে দেখিতে গেলে আকাশের একদেশে স্থিত দেখায়, এবং একটি সরল রেখার মধ্যবর্ত্তী হইয়া যুগ্ম নক্ষত্রের ন্যায় দেখায়। কিন্তু কখন কখন দেখা যায় যে, যে নক্ষত্রদ্বয় দেখিতে যুগ্ম, তাহা বাস্তবিক যুগ্মই বটে,—পরস্পরের নিকটবর্ত্তী এবং পরস্পরের সহিত নৈসর্গিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট। এই সকল যুগ্মাদি নক্ষত্র সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা পর্য্যবেক্ষণা ও গণনার দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে, উহারা পরস্পরকে বেড়িয়া বর্ত্তন করিতেছে। অর্থাৎ যদি ক, খ, এই দুইটি নক্ষত্রে একটি যুগ্ম নক্ষত্র হয়, তবে ক, খ, উভয়ের মাধ্যাকর্ষণিক কেন্দ্রের চতুঃপার্শ্বে ক, খ, উভয় নক্ষত্র বর্ত্তন করিতেছে। কখন কখন দেখা গিয়াছে, যে এইরূপ দুইটি কেন, বহু নক্ষত্রে এক একটি নাক্ষত্রিক জগৎ। তন্মধ্যস্থ বিভক্ত নক্ষত্রগুলি সকলই ঐ প্রকার আবর্ত্তনকারী। বিচিত্র এই যে নিউটন, পৃথিবীতে বসিয়া, পার্থিব পদার্থের গতি দেখিয়া, পার্থিব উপগ্রহ চন্দ্রের গতিকে উপলক্ষ করিয়া, যে সকল মাধ্যাকর্ষণিক গতির নিয়ম আবিষ্কৃত

করিয়াছিলেন, দূরবর্ত্তী এবং সৌরজগতের বহিঃস্থ এই সকল নক্ষত্রের গতিও সেই সকল নিয়মাধীন।

নক্ষত্রগণের প্রকৃতি এবং সূর্য্যের প্রকৃতি যে এক, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। ডাক্তার হুগিন্‌স্‌ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা আলোক পরীক্ষক যন্ত্রের সাহায্যে জানিয়াছেন, যে, যেসকল বস্তুতে সূর্য্য নির্ম্মিত, অন্যান্য নক্ষত্রেও সেই সকল বস্তু লক্ষিত হয়। অতএব সূর্য্যোপরি ও সূর্য্যগর্ত্তে যে প্রকার ভয়ঙ্কর কোলাহল, ও বিপ্লব, নিত্য বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হয়, তারাগণেও সেইরূপ হইতেছে, সন্দেহ নাই। যে নক্ষত্র দূরবীক্ষণ সাহায্যেও অস্পষ্ট দৃষ্ট আলোকবিন্দু বলিয়া বোধ হয়, তাহাতে ক্ষণমাত্রে যে সকল উৎপাত ঘটিতেছে, পৃথিবীতলে দশবর্ষের নৈসর্গিক ক্রিয়া একত্রিত করিলেও তাহার তুল্য হইবে না। সূর্য্যমণ্ডলের সামান্য মাত্র কোন পরিবর্ত্তনে যে বিপ্লব ও নৈসর্গিক শক্তিব্যয় সূচিত হয়, তাহাতে পলকমাত্রে এই পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রচণ্ড বাত্যার কল্লোল অথবা কর্ণবিদারক অশনি সম্পাত শব্দ হইতে লক্ষ লক্ষ লক্ষগুণে ভীমতর কোলাহল অনবরত সেই সৌরমণ্ডলে নির্ঘোষিত হইতেছে সন্দেহ নাই। আর এই যে সহস্র সহস্র, স্থির, শীতল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগণ দেখিতেছি, তাহাতেও সেইরূপ হইতেছে, কেননা সকলই সূর্য্যপ্রকৃতি বিশিষ্ট, বরং আমাদিগের সূর্য্য অনেক নক্ষত্রের অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং হীনতেজা। সিরিয়স নামক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, আমাদিগের নয়ন হইতে যত দূরে আছে, আমাদিগের সূর্য্য ততদূরে প্রেরিত হইলে, উহা তৃতীয়শ্রেণীর ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ন্যায় দেখাইত; আকাশের কতশত নক্ষত্র তদপেক্ষা উজ্জ্বল জ্বালায় জ্বলিত! কিন্তু যদি সূর্য্যকে অল্‌দেবরণ (রোহিণী ?) কস্তর, বেটেলগুস্‌ প্রভৃতি নক্ষত্রের স্থানে প্রেরণ করা যায়, তবে সূর্য্যকে দেখা যাইবে কি না সন্দেহ। প্রক্‌টর সাহেব বলেন যে, আকাশে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, বোধ হয় তাহার মধ্যে পঞ্চাশটিও আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবে না। অতএব সূর্য্যমণ্ডলে যেরূপ চাঞ্চল্যের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, অধিকাংশ নক্ষত্রে ততোধিক চাঞ্চল্য বর্ত্তমান, সন্দেহ নাই।

কেবল তাহাই নহে, সূর্য্য যেমন অতি প্রচণ্ডবেগে, গ্রহগণ সহিত, আকাশ-পথে ধাবমান, অন্যান্য নক্ষত্রগণও তদ্রূপ। বরং অনেক নক্ষত্রের বেগ সূর্য্যাপেক্ষা প্রচণ্ডতর। সিরিয়সের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ২০ মাইল, ঘণ্টায় ৭২০০০ মাইল। বেগা নামক উজ্জ্বল নক্ষত্রের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ মাইল, ঘণ্টায় ১৮০০০০ মাইল; কাষ্টর প্রতি সেকেণ্ডে ২৫ মাইল, ঘণ্টায় ৯৬০০০ মাইল। পোলাক্সের গতি সেকেণ্ডে ৪৯ মাইল, প্রায় বেগার ন্যায়। সপ্তর্ষির মধ্যের পাঁচটির গতি সিরিয়সের ন্যায়, একটির গতি বেগার ন্যায়। এই বেগ অতি ভয়ঙ্কর, বিশেষ

যখন মনে করা যায় যে, এই সকল প্রচণ্ডবেগশালী পদার্থের আকার অতি প্রকাণ্ড (সিরিয়স সূর্য্যাপেক্ষা সহস্রগুণ বৃহৎ) তখন বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

নক্ষত্র সকল অদ্ভুত গতিবিশিষ্ট হইলেও, চারি সহস্র বৎসরেও তত্তাবতের স্থানভ্রংশ মনুষ্যচক্ষে লক্ষিত হয় নাই। ঐ সকল নক্ষত্রের অসীম দূরতাই ইহার কারণ। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ সাহায্যে, আশ্চর্য্য মানযন্ত্র ও বিদ্যা কৌশলের বলে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুতি পর্য্যবেক্ষিত করিয়াছেন। তাহাতেই ঐ সকল গতি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

নাক্ষত্রিক গতিতত্ত্ব অতি আশ্চর্য্য। গগনের এক দেশে স্থিত নক্ষত্রও একদিগেই ধাবমান না হইয়াও নানাদিগে ধাবমান। কখন বা একদিকেই ধাবমান। কোথায় ধাবমান? কেন ধাবমান? সে সকল তত্ত্বের আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজনীয়, এবং এক প্রকার অসাধ্য।

যাহা বলা গেল, তাহাতে প্রতীয়মান হইতেছে, যে গতিই জাগতিক নিয়ম—স্থিতি নিয়ম রোধের ফলমাত্র। জগৎ সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা, চঞ্চল। সেই চাঞ্চল্য বিশেষ করিয়া বুঝিতে গেলে, অতি বিস্ময়কর বোধ হয়। জীবনাধারে, শোণিতাদির চাঞ্চল্যই জীবন। হৃৎপিণ্ড বা শ্বাসযন্ত্রের চাঞ্চল্য রহিত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলে পরেও, দৈহিক পরমাণু মধ্যে রাসায়নিক চাঞ্চল্য সঞ্চার হইয়া, দেহ ধ্বংস হয়। যেখানে দৃষ্টিপাত করিব, সেইখানে চাঞ্চল্য, সেই চাঞ্চল্য মঙ্গলকর। যে বুদ্ধি চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তাশালিনী! যে সমাজ গতি বিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল। বরং সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ভাল, তথাপি স্থিরতা ভাল নহে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নাপিতানী

ফষ্টর স্বয়ং শিবিকাসমভিব্যাহারে লইয়া দূরবর্ত্তিনী ভাগিরথীর তীর পর্য্যন্ত আসিলেন। সেখানে নৌকা সুসজ্জিত ছিল। শৈবলিনীকে নৌকায় তুলিলেন। নৌকায় হিন্দু দাস দাসী এবং প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এখন আবার হিন্দু দাস দাসী কেন?

ফষ্টর নিজে অন্য যানে কলিকাতায় গেলেন। তাঁহাকে শীঘ্র যাইতে হইবে—বড় নৌকায় বাতাস ঠেলিতে ঠেলিতে সপ্তাহে কলিকাতায় যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। শৈবলিনীর জন্য স্ত্রীলোকের আরোহণোপযোগী যানের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি যানান্তরে অগ্রগামী হইলেন। এমত শঙ্কা ছিল না, যে তিনি স্বয়ং শৈবলিনীর নৌকার সঙ্গে না থাকিলে, কেহ নৌকা আক্রমণ করিয়া শৈবলিনীর উদ্ধার করিবে। ইংরাজের নৌকা শুনিলে কেহ নিকটে আসিবে না।

প্রভাতবাতোত্থিত ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার উপর আরোহণ করিয়া শৈবলিনীর সুবিস্তৃতা তরণী দক্ষিণাভিমুখে চলিল—মৃদুনাদী বীচিশ্রেণী তর তর শব্দে নৌকাতলে প্রহত হইতে লাগিল। তোমরা অন্য শঠ, প্রবঞ্চক, ধূর্ত্তকে যত পার বিশ্বাস করিও, কিন্তু প্রভাতবায়ুকে বিশ্বাস করিও না। প্রভাতবায়ু বড় মধুর;—চোরের মত পা টিপি টিপি আসিয়া, এখানে পদ্মটি, ওখানে যূথিকা দাম, সেখানে সুগন্ধি বকুলের শাখা, লইয়া ধীরে ধীরে ক্রীড়া করে—কাহাকে গন্ধ আনিয়া দেয়, কাহারও নৈশ অঙ্গগ্লানি হরণ করে, কাহারও চিন্তাসন্তপ্ত ললাট স্নিগ্ধ করে, যুবতীর অলকরাজি দেখিলে তাহাতে অল্প ফুৎকার দিয়া পলাইয়া যায়। তুমি নৌকারোহী—দেখিতেছ এই ক্রীড়াশীল মধুর প্রকৃতি প্রভাত বায়ু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় নদীকে সুসজ্জিতা করিতেছে; আকাশস্থ দুই একখানা অল্প কালো মেঘকে সরাইয়া রাখিয়া, আকাশকে পরিষ্কার করিতেছে, তীরস্থ বৃক্ষগুলিকে মৃদু মৃদু নাচাইতেছে, স্নানাবগাহননিরতা

কামিনীগণের সঙ্গে একটু একটু মিষ্ট রহস্য করিতেছে—নৌকার তলে প্রবেশ করিয়া তোমার কানের কাছে মধুর সঙ্গীত করিতেছে। তুমি মনে করিলে বায়ু বড় ধীর প্রকৃতি,—বড় গম্ভীরস্বভাব, বড় আড়ম্বরশূন্য—আবার সদানন্দ! সংসারে যদি সকলই এমন হয় ত কি না হয়! দে নৌকা খুলিয়া দে! রৌদ্র উঠিল—তুমি দেখিলে যে বীচিরাজির উপরে রৌদ্র জ্বলিতেছে, সেগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বড় বড় হইয়াছে—রাজহংসগণ তাহার উপর নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে; গাত্র মার্জ্জনে অন্যমনা সুন্দরীদিগের মৃৎকলসী তাহার উপর স্থির থাকিতেছে না, বড় নাচিতেছে; কখন কখন ঢেউগুলা, স্পর্দ্ধা করিয়া সুন্দরীদিগের কাঁধে চড়িয়া বসিতেছে আর যিনি তীরে উঠিয়াছেন, তাঁহার চরণপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িতেছে—মাথা কুটিতেছে—বুঝি বলিতেছে,—"দেহি পদ পল্লব মুদারং!" নিতান্ত পক্ষে পায়ের একটু অলক্তক রাগ ধুইয়া লইয়া অঙ্গে মাখিতেছে। ক্রমে দেখিবে, বায়ুর ডাক একটু একটু বাড়িতেছে, আর সে জয়দেবের কবিতার মত কানে মিলাইয়া যায় না, আর সে ভৈরবীরাগিণীতে কানের কাছে মৃদু বীণা বাজাইতেছে না। ক্রমে দেখিলে বায়ুর বড় গর্জ্জন বাড়িল—বড় হুহুঙ্কারের ঘটা; তরঙ্গ সকল হঠাৎ ফুলিয়া উঠিয়া, মাথা নাড়িয়া, আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, অন্ধকার করিল। প্রতিকূল বায়ু নৌকার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল—নৌকার মুখ ধরিয়া জলের উপর আছড়াইতে লাগিল—কখন বা মুখ ফিরাইয়া দিল—তুমি ভাব বুঝিয়া পবন দেবকে প্রণাম করিয়া, নৌকা তীরে রাখিলে।

শৈবলিনীর নৌকার দশা ঠিক্ এইরূপ ঘটিল। অল্প বেলা হইলেই বায়ু প্রবল হইল। বড় নৌকা, প্রতিকূল বায়ুতে আর চলিল না। রক্ষকেরা ভদ্রহাটির ঘাটে নৌকা রাখিল।

ক্ষণকাল পরে নৌকার কাছে, এক নাপিতানী আসিল। নাপিতানী সধবা, খাটো রাঙ্গাপেড়ে সাড়ী পরা—সাড়ীর রাঙ্গা দেওয়া আঁচলা আছে—হাতে আলতার চুপড়ী। নাপিতানী নৌকার উপর অনেক কালো কালো দাড়ী দেখিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়াছিল। দাড়ীর অধিকারিগণ অবাক্ হইয়া নাপিতানীকে দেখিতেছিল।

একটা চরে শৈবলিনীর পাক হইতেছিল—এখনও হিন্দুয়ানি আছে—একজন ব্রাহ্মণ পাক করিতেছিল। একদিনে কিছু বিবি সাজা যায় না। ফষ্টর জানিতেন যে শৈবলিনী যদি না পলায়, অথবা প্রাণত্যাগ না করে, তবে সে অবশ্য একদিন টেবিলে বসিয়া যবনের কৃত পাক, উপাদেয় বলিয়া ভোজন করিবে—কিন্তু এখনই তাড়াতাড়ি কি? এখন তাড়াতাড়ি করিলে সকল দিক নষ্ট হইবে। এই ভাবিয়া ফষ্টর ভৃত্যদিগের পরামর্শমতে শৈবলিনীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ দিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ পাক করিতেছিল, নিকটে একজন দাসী দাঁড়াইয়া উদেযাগ করিয়া দিতেছিল। নাপিতানী সেই দাসীর কাছে গেল, বলিল,

"হাঁ গা—তোমরা কোথা থেকে আসচ গা ?"

চাকরাণী রাগ করিল—বিশেষ সে ইংরাজের বেতন খায়—বলিল, "তোর তা কিরে মাগী—আমরা যেখান্ থেকে আসি না কেন ? আমরা হিল্লী দিল্লী মক্কা থেকে আসচি।"

নাপিতানী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বলি তা নয়,—বলি আমরা নাপিত—তোমাদের নৌকায় যদি মেয়ে ছেলে কেহ কামায় তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

চাকরাণী একটু নরম হইল। বলিল, "আচ্ছা জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" এই বলিয়া সে শৈবলিনীকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল যে তিনি আল্‌তা পরিবেন কি না। যে কারণেই হউক, শৈবলিনী অন্যমনা হইবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, বলিলেন, "আল্‌তা পরিব।" তখন রক্ষকদিগের অনুমতি লইয়া, দাসী নাপিতানীকে নৌকার ভিতর পাঠাইয়া দিল। সে স্বয়ং পূর্ব্বমত পাকশালার নিকট নিযুক্ত রহিল।

নাপিতানী শৈবলিনীকে দেখিয়া আর একটু ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। এবং তাহার একটি চরণ লইয়া আলতা পরাইতে লাগিল। শৈবলিনী কিয়ৎকাল নাপিতানীকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া দেখিয়া বলিলেন,

"নাপিতানী তোমার বাড়ী কোথা ?"

নাপিতানী কথা কহিল না। শৈবলিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,

"নাপিতানী তোমার নাম কি ?"

তথাপি উত্তর পাইলেন না।

"নাপিতানী, তুমি কাঁদছ ?"

নাপিতানী মৃদু স্বরে বলিল, "না।"

"হাঁ কাঁদ্‌চ।" বলিয়া শৈবলিনী নাপিতানীর অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিলেন। নাপিতানী বাস্তবিক কাঁদিতেছিল। অবগুণ্ঠন মুক্ত হইলে নাপিতানী একটু হাসিল।

শৈবলিনী বলিল, "আমি আস্‌তে মাত্র চিনেছি। আমার কাছে ঘোম্‌টা ? মরণ আর কি ! তা এখানে এলি কোথা হতে ?"

নাপিতানী আর কেহ নহে—সুন্দরী ঠাকুরঝি। সুন্দরী চক্ষের জল মুছিয়া কহিল, "শীঘ্র যাও ! আমার এই সাড়ী পর, ছাড়িয়া দিতেছি। এই আল্‌তার চুপড়ী নাও। ঘোম্‌টা দিয়া নৌকা হইতে চলিয়া যাও।"

শৈবলিনী বিমনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এলে কেমন করে ?"

সু। "কোথা হইতে আসিলাম—কেমন করিয়া আসিলাম—সে পরিচয় দিন পাই ত এর পর দিব। তোমায় সন্ধানে এখানে আসিয়াছি। সাহেব যে কলিকাতা যাইবে তাহা সবাই জানে। সুতরাং বুঝিলাম যে তোমাকেও কলিকাতায় পাঠাইবে। লোকে বলিল, পাল্কী গঙ্গার পথে গিয়াছে। আমিও প্রাতে উঠিয়া কাহাকে কিছু না বলিয়া, হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে আসিলাম। অনেক দূর, পা ব্যথা হইয়া গেল। তখন নৌকা ভাড়া করিয়া তোমার পাছে পাছে আসিয়াছি। তোমার বড় নৌকা, চলে না, আমার ছোট নৌকা, তাই শীঘ্র আসিয়া ধরিয়াছি।"

শৈ। "একলা এলি কেমন করো্যে।"

সুন্দরীর মুখে আসিল, "তুই কালামুখী সাহেবের পাল্কী চড়্যে এলি কেমন করো্যে।" কিন্তু অসময় বুঝিয়া সে কথা বলিল না। বলিল,

"একেলা আসি নাই। আমার স্বামী আমার সঙ্গে আছেন। আমাদের ডিঙ্গী একটু দূরে রাখিয়া, আমি নাপিতানী সাজিয়া আসিয়াছি।"

শৈ। "তার পর?"

সু। "তার পর, তুমি আমার এই সাড়ী পর, এই আল্‌তার চুপড়ী নাও, ঘোমটা দিয়া নৌকা হইতে নামিয়া চলিয়া যাও, কেহ চিনিতে পারিবে না। তীরে তীরে যাইবে। ডিঙ্গীতে আমার স্বামীকে দেখিবে। নন্দাই বলিয়া লজ্জা করিও না—ডিঙ্গীতে উঠিয়া বসিও। তুমি গেলেই তিনি ডিঙ্গী খুলিয়া দিয়া, তোমায় বাড়ী লইয়া যাইবেন।"

শৈবলিনী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর তোমার দশা?"

সু। "আমার জন্যে ভাবিও না। বাঙ্গালায় এমন ইংরাজ আসে নাই, যে সুন্দরী বামণীকে এই নৌকায় পুরিয়া রাখিতে পারে। আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা, ব্রাহ্মণের স্ত্রী; আমরা মনে দৃঢ় থাকিলে পৃথিবীতে আমাদের বিপদ নাই। তুমি যাও, যে প্রকারে হয়, আমি রাত্রি মধ্যে বাড়ী যাইব। বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদন আমার ভরসা। তুমি আর বিলম্ব করিও না—তোমার নন্দাইয়ের এখনও আহার হয় নাই। আজ হবে কি না তাও বলিতে পারি না।"

শৈ। "ভাল, আমি যেন গেলেম। গেলে, সেখানে আমায় ঘরে নেবেন কি?"

সু। "ইল—লো! কেন নেবে না? না নেওয়াটা পড়ে রয়েছে আর কি?"

শৈ। "দেখ—ইংরেজে আমায় কেড়ে এনেছে,—আর কি আমার জাতি আছে?"

সুন্দরী বিস্মিতা হইয়া শৈবলিনীর মুখ পানে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শৈবলিনীর প্রতি মর্ম্মভেদী তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিল—ওষধিস্পৃষ্ট বিষধরের ন্যায় গর্ব্বিতা শৈবলিনী মুখ নত করিল। সুন্দরী কিঞ্চিৎ পরুষভাবে জিজ্ঞাসা করিল,

"সত্য কথা বলবি?"

শৈ। "বলিব।"

সু। "এই গঙ্গার উপর?"

শৈ। "বলিব। তোমার জিজ্ঞাসায় প্রয়োজন নাই, অমনি বলিতেছি। সাহেবের সঙ্গে আমার এপর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই। আমাকে গ্রহণ করিলে আমার স্বামী ধর্ম্মে পতিত হইবেন না।"

সু। "তবে তোমার স্বামী যে তোমাকে গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ করিও না। তিনি ধর্ম্মাত্মা, অধর্ম্ম করিবেন না। তবে আর মিছা কথায় সময় নষ্ট করিও না।"

শৈবলিনী একটু নীরব হইয়া রহিল। একটু কাঁদিল। চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "আমি যাইব—আমার স্বামীও আমায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু আমার কলঙ্ক কি কখন ঘুচিবে?"

সুন্দরী কোন উত্তর করিলেন না। শৈবলিনী বলিতে লাগিল, "ইহার পর পাড়ার ছোট মেয়েগুলা আমাকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিবে কি না, যে ঐ উহাকে ইংরাজে লইয়া গিয়াছিল? ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখন আমার পুত্র সন্তান হয়, তবে তাহার অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করিলে কে আমার বাড়ী খাইতে আসিবে? যদি কখন কন্যা হয়, তবে তাহার সঙ্গে কোন সুব্রাহ্মণে পুত্রের বিবাহ দিবে? আমি যে স্বধর্ম্মে আছি, এখন ফিরিয়া গেলে, কেই বা তাহা বিশ্বাস করিবে? আমি ঘরে ফিরিয়া গিয়া কি প্রকারে মুখ দেখাইব?"

সুন্দরী বলিল, "যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ঘটিয়াছে—সে ত আর কিছুতেই ফিরিবে না। কিছু ক্লেশ চিরকালই ভোগ করিতে হইবে। তথাপি আপনার ঘরে থাকিবে।"

শৈ। "কি সুখে? কোন সুখের আশায় এত কষ্ট সহ্য করিবার জন্য ঘরে ফিরিয়া যাইব? ন পিতা, ন মাতা, ন বন্ধু,—"

সু। "কেন স্বামী? এ নারী জন্ম আর কাহার জন্য?"

শৈ। "সব ত জান—"

সু। "জানি। জানি যে পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠা আছে, তোমার মত পাপিষ্ঠা কেহ নাই। যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্লভ, তাঁহার স্নেহে তোমার মন উঠে না। কিনা, বালকে যেমন খেলা ঘরের পুত্তলকে আদর করে, তিনি স্ত্রীকে

সেরূপ আদর করিতে জানেন না। কিনা, বিধাতা তাঁকে সং গড়িয়া রাজতা দিয়া সাজান নাই—মানুষ গড়িয়াছেন। তিনি ধর্ম্মাত্মা, পণ্ডিত, তুমি পাপিষ্ঠা; তাঁহাকে তোমার মনে ধরিবে কেন? তুমি অন্ধের অধিক অন্ধ, তাই বুঝিতে পার না, যে তোমার স্বামী তোমায় যেরূপ ভালবাসেন, নারীজন্মে সেরূপ ভালবাসা দুর্লভ—অনেক পুণ্য ফলে এমন স্বামীর কাছে তুমি এমন ভালবাসা পেয়েছিলে। তা, যাক্, সে কথা দূর হৌক—এখনকার সে কথা নয়। তিনি নাই ভাল বাসুন, তবু তাঁর চরণ সেবা করিয়া কাল কাটাইতে পারিলেই তোমার জীবন সার্থক! আর বিলম্ব করিতেছ কেন? আমার রাগ হইতেছে।"

শৈ। "দেখ, গৃহে থাকিতে মনে ভাবিতাম, যদি পিতৃ মাতৃ কুলে কাহারও অনুসন্ধান পাই, তবে তাহার গৃহে গিয়া থাকি। নচেৎ কাশী গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব। নচেৎ জলে ডুবিয়া মরিব। এখন কলিকাতায় যাইতেছি। যাই, দেখি কলিকাতা কেমন। দেখি, কলিকাতায় ভিক্ষা মিলে কি না। মরিতে হয়, নাহয় মরিব। মরণ ত হাতেই আছে। এখন আমার মরণ বই আর উপায় কি? কিন্তু মরি আর বাঁচি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আর ঘরে ফিরিব না। তুমি অনর্থক আমার জন্য এত ক্লেশ করিলে—ফিরিয়া যাও। আমি যাইব না। মনে করিও, আমি মরিয়াছি। আমি মরিব, তাহা নিশ্চিত জানিও। তুমি যাও!"

তখন সুন্দরী আর কিছু বলিল না। রোদন সম্বরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিল, বলিল, "ভরসা করি, তুমি শীঘ্র মরিবে! দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন মরিতে তোমার সাহস হয়! কলিকাতায় যাইবার পূর্ব্বেই যেন তোমার মৃত্যু হয়! ঝড়ে হোক্, তুফানে হোক্, নৌকা ডুবিয়া হোক্, কলিকাতায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে যেন তোমার মৃত্যু হয়।"

এই বলিয়া, সুন্দরী নৌকামধ্য হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া, আল্তার চুপড়ী জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রশেখরের প্রত্যাগমন

চন্দ্রশেখর, ভবিষ্যৎ গণিয়া দেখিলেন। দেখিয়া রাজকর্ম্মচারীকে বলিলেন, "মহাশয় আপনি নবাবকে জানাইবেন, আমি গণিতে পারিলাম না।"

রাজকর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মহাশয়?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "সকল কথা গণনায় স্থির হয় না। যদি হইত তবে মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ হইত। বিশেষ, জ্যোতিষে আমি অপারদর্শী।"

রাজপুরুষ বলিলেন, "অথবা রাজার অপ্রিয় সম্বাদ বুদ্ধিমান্ গণকে প্রকাশ করে না। যাহাই হউক, আপনি যেমন বলিলেন, আমি সেইরূপ রাজসমীপে নিবেদন করিব।

চন্দ্রশেখর বিদায় হইলেন। রাজকর্ম্মচারী তাঁহার পাথেয় দিতে সাহস করিলেন না। চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নহেন—ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। কাহারও কাছে দান গ্রহণ করেন না।

গৃহে ফিরিয়া আসিতে দূর হইতে চন্দ্রশেখর নিজগৃহ দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র তাঁহার মনে আহ্লাদের সঞ্চার হইল। চন্দ্রশেখর তত্বজ্ঞ, তত্বজিজ্ঞাসু। আপনাপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, বিদেশ হইতে আগমন কালে স্বগৃহ দেখিয়া হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হয় কেন? আমি কি এতদিন আহার নিদ্রার কষ্ট পাইয়াছি? গৃহে গেলে বিদেশ অপেক্ষা কি সুখে সুখী হইব? এ বয়সে আমাকে গুরুতর মোহবন্ধে পড়িতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ঐ গৃহমধ্যে আমার প্রেয়সী ভার্য্যা বাস করেন, এইজন্য আমার এ আহ্লাদ? ঋষিরা বলেন, সকলই মায়া! কিছুই মায়া নহে, তাঁহারাই মায়ার মায়ায় মুগ্ধ। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই আমি! যদি তাই, তবে কাহারও প্রতি প্রেমাধিক্য কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে কেন? সকলই ত সেই সচ্চিদানন্দ! আমার যে তল্পী লইয়া আসিতেছে তাহার প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিতে ইচ্ছা হইতেছে না কেন? আর সেই উৎফুল্ল কমলাননার মুখপদ্ম দেখিবার জন্য এত কাতর হইয়াছি কেন? আমি ভগবদ্বাক্যে অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু আমি দারুণ মোহজালে জড়িত হইতেছি। এ মোহজাল কাটিতেও ইচ্ছা করে না—যদি অনন্তকাল বাঁচি, তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব। কতক্ষণে আবার শৈবলিনীকে দেখিব?

অকস্মাৎ চন্দ্রশেখরের মনে অত্যন্ত ভয় সঞ্চার হইল। যদি বাড়ী গিয়া শৈবলিনীকে না দেখিতে পাই? কেন দেখিতে পাইব না? যদি পীড়া হইয়া থাকে? পীড়া ত সকলেরই হয়—আরাম হইবে। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, পীড়ার কথা মনে হওয়াতে এত অসুখ হইতেছে কেন? কাহার না পীড়া হয়? তবে যদি কোন কঠিন পীড়া হইয়া থাকে? চন্দ্রশেখর দ্রুত চলিলেন। যদি পীড়া হইয়া থাকে, ঈশ্বর শৈবলিনীকে আরাম করিবেন, আমি স্বস্ত্যয়ন করিব। যদি পীড়া ভাল না হয়! চন্দ্রশেখরের চক্ষে জল আসিল। ভাবিলেন, ভগবান, আমায় এ বয়সে এ রত্ন দিয়া আবার কি বঞ্চিত করিবেন! তাহারই বা বিচিত্র কি—আমি কি তাঁহার এতই অনুগৃহীত যে তিনি আমার কপালে সুখ বই দুঃখ বিধান করিবেন না? হয়ত ঘোরতর দুঃখ আমার কপালে আছে। যদি গিয়া দেখি শৈবলিনী নাই?—যদি গিয়া শুনি যে শৈবলিনী উৎকট রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে? তাহা হইলে

আমি বাঁচিব না। চন্দ্রশেখর অতি দ্রুতপদে চলিলেন, পল্লীমধ্যে পঁহুছিয়া দেখিলেন প্রতিবাসীরা তাঁহার মুখ প্রতি অতি গম্ভীরভাবে চাহিয়া দেখিতেছে—চন্দ্রশেখর সে চাহনির অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া হাসিল। প্রাচীনেরা তাঁহাকে দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। কেহ কেহ দূরে থাকিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইল। চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন—ভীত হইলেন—অন্যমনা হইলেন—কোন দিগে না চাহিয়া আপন গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দ্বার রুদ্ধ। বাহির হইতে দ্বার ঠেলিলে ভৃত্য বহির্ব্বাটীর দ্বার খুলিয়া দিল। চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া, ভৃত্য কাঁদিয়া উঠিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে ?" ভৃত্য কিছু উত্তর না করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

চন্দ্রশেখর মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন। দেখিলেন উঠানে ঝাঁট পড়ে নাই, চণ্ডীমণ্ডপে ধূলা। স্থানে স্থানে পোড়া মশাল—স্থানে স্থানে কবাট ভাঙ্গা। চন্দ্রশেখর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সকল ঘরেই দ্বার বাহির হইতে বন্ধ। দেখিলেন, পরিচারিকা তাঁহাকে দেখিয়া, সরিয়া গেল। শুনিতে পাইলেন, সে বাটীর বাহিরে গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন চন্দ্রশেখর, প্রাঙ্গন মধ্যে দাঁড়াইয়া, অতি উচ্চৈস্বরে বিকৃতকণ্ঠে ডাকিলেন,—

"শৈবলিনি !"

কেহ উত্তর দিল না ; চন্দ্রশেখরের বিকৃত কণ্ঠ শুনিয়া রোরুদ্যমানা পরিচারিকাও নিস্তব্ধ হইল।

চন্দ্রশেখর আবার ডাকিলেন। গৃহমধ্যে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল —কেহ উত্তর দিল না।

ততক্ষণ শৈবলিনীর চিত্রিত তরণীর উপর গঙ্গাম্বুসঞ্চারী মৃদুপবন হিল্লোলে, ইংরাজের লাল নিশান উড়িতেছিল—মাঝিরা সারি গায়িতেছিল।

* * * *

চন্দ্রশেখর সকল শুনিলেন।

তখন, চন্দ্রশেখর সযত্নে গৃহপ্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম শিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। তৈজস, বস্ত্র, প্রভৃতি, গার্হস্থ্য দ্রব্যজাত দরিদ্র প্রতিবাসীদিগের ডাকিয়া বিতরণ করিলেন। সায়াহ্নকাল পর্য্যন্ত এই সকল কার্য্য করিলেন। সায়াহ্নকালে আপনার অধীত, অধ্যয়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয়, গ্রন্থগুলিন সকল একে একে আনিয়া একত্রিত করিলেন। একে একে প্রাঙ্গণমধ্যে সাজাইলেন—সাজাইতে সাজাইতে এক একবার কোনখানি খুলিলেন—আবার না পড়িয়াই তাহা বাঁধিলেন,—সকল গুলিন প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া সাজাইলেন। সাজাইয়া, তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেম।

অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ক্রমে ক্রমে সকলই ধরিয়া উঠিল ; মন্নু, যাজ্ঞবল্ক, পরাশর, প্রভৃতি স্মৃতি ; ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য, প্রভৃতি দর্শন—কল্পসূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ্, একে একে সকলই অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিতে লাগিল। বহুযত্নসংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।

রাত্রি এক প্রহরে গ্রন্থদাহ সমাপন করিয়া, চন্দ্রশেখর উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না—কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।

অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত। সে কখন কি বলিত, কি করিত, তাহার স্থিরতা ছিল না। লেখা পড়া না জানিত, এমত নহে। কিছু ইংরাজি কিছু সংস্কৃত জানিত। কিন্তু যে বিদ্যায় অর্থোপার্জ্জন হইল না, সে বিদ্যা কি বিদ্যা? আসল কথা এই, সাহেব সুবোর কাছে যাওয়া আসা চাই। কত বড় বড় মূর্খ, কেবল নাম দস্তখত করিতে পারে,—তাহারা তালুক মুলুক করিল—আমার মতে তাহারাই পণ্ডিত। আর কমলাকান্তের মত বিদ্বান্, যাহারা কেবল কতকগুলা বহি পড়িয়াছে, তাহারা আমার মতে গণ্ডমূর্খ।

কমলাকান্তের একবার চাকরী হইয়াছিল। একজন সাহেব তাহার ইংরাজি কথা শুনিয়া, ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি কেরাণীগিরি দিয়াছিলেন। কিন্তু কমলাকান্ত চাকরি রাখিতে পারিল না। আপিসে গিয়া, আপিসের কাজ করিত না। সরকারী বহিতে কবিতা লিখিত—আপিসের চিটীপত্রের উপরে সেক্ষপীর নামক কে লেখক আছে, তাহার বচন তুলিয়া লিখিয়া রাখিত; বিল বহির পাতায় পাতায় ছবি আঁকিয়া রাখিত। একবার সাহেব তাহাকে মাস্কাবারের পে-বিল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। কমলাকান্ত বিলবহি লইয়া, একটি চিত্র আঁকিল, যে কতকগুলি নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে, সাহেব দুই চারিটা পয়সা ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছেন। নীচে লিখিয়া দিল "যথার্থ পে বিল।" অলঙ্কার স্বরূপ সাহেবের একটি লাঙ্গুল আঁকিয়া দিয়াছিল—এবং হস্তে একটি মর্ত্তমান রম্ভা দেখা যাইতেছিল। সাহেব নূতনতর পে বিল দেখিয়া কমলাকান্তকে মানে মানে বিদায় দিলেন।

কমলাকান্তের চাকরি সেই পর্য্যন্ত। অর্থেরও বড় প্রয়োজন ছিল না। কমলাকান্ত কখন দার পরিগ্রহ করেন নাই। স্বয়ং যেখানে হয়, দুইটি অন্ন পাইলেই হইত। যেখানে, সেখানে পড়িয়া থাকিত। অনেক দিন আমার বাড়ীতে ছিল। আমি তাহাকে পাগল বলিয়া যত্ন করিতাম। কিন্তু আমিও তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। সে কোথাও স্থায়ী হইত না। একদিন প্রাতে

উঠিয়া, ব্রহ্মচারীর মত গেরুয়া বস্ত্র পরিয়া, কোথায় চলিয়া গেল। কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাকে পাইলাম না। সে এ পর্য্যন্ত আর ফিরে নাই।

তাহার একটি দপ্তর ছিল। কমলাকান্তের কাছে ছেঁড়া কাগজ পড়িতে পাইত না; দেখিলেই তাহাতে কি মাথা মুণ্ড লিখিত কিছু বুঝিতে পারা যাইত না। কখন কখন আমাকে পড়িয়া শুনাইত—শুনিলে আমার নিদ্রা আসিত। কাগজগুলি একখানি মসীচিত্রিত, পুরাতন, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা থাকিত। গমন কালে, কমলাকান্ত আমাকে সেই দপ্তরটি দিয়া গেল। বলিয়া গেল, তোমাকে ইহা বখশিশ করিলাম।

এ অমূল্য রত্ন লইয়া আমি কি করিব? প্রথমে মনে করিলাম, অগ্নি দেবকে উপহার দিই। পরে লোকহিতৈষা আমার চিত্তে বড় প্রবল হইল। মনে করিলাম যে, যে লোকের উপকার না করে, তাহার বৃথায় জন্ম। এই দপ্তরটিতে অত্যুৎকৃষ্ট অনিদ্রার ঔষধ আছে—যিনি পড়িবেন তাঁহারই নিদ্রা আসিবে। যাঁহারা অনিদ্রা রোগে পীড়িত তাঁহাদিগের উপকারার্থে আমি কমলাকান্তের রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। সংখ্যাক্রমে তাহা প্রকাশ হইবে। অদ্য "একা" নামে প্রবন্ধটি প্রকাশ করিব।

শ্রীভীষ্মদেব খোষ নবীশ

প্রথম সংখ্যা।

একা

"কে গায় ওই?"

বহুকাল বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন? এই সঙ্গীত যে অতি সুন্দর, এমত নহে। পথিক পথ দিয়া, আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর;—মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাসে, আপনার মনের সুখের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলি স্পর্শের ন্যায়, ঐ গীতধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন?

কেন, কে বলিবে? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। অর্দ্ধাবৃতা সুন্দরীর নীল বসনের ন্যায় শীর্ণ শরীরা নীলসলিলা তরঙ্গিণী, সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন; রাজপথে, কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া, আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সঙ্গীতে আমার হৃদয় যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।

আমি একা—তাই এই সঙ্গীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরী মধ্যে, এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গতাড়িত জল বুদ্বুদ সমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্বুদ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র; আমি বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

তাহা জানি না—কেবল ইহাই জানি যে আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্য জন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধী, কিন্তু যদি ঘ্রাণ গ্রহণ কর্ত্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধী হইত না—ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

কিন্তু বারেক মাত্র শ্রুত ঐ সঙ্গীত আমাকে কেন এত মধুর লাগিল তাহা বলি নাই। অনেক দিন আনন্দোত্থিত সঙ্গীত শুনি নাই—অনেক দিন আনন্দানুভব করি নাই। যৌবনে, যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতিপুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্ম্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা রোহিনীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে, মনুষ্য চরিত্র এখনও তাই আছে। কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ হইত। আজি এই সঙ্গীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায়, যে সুখে, সেই আনন্দ অনুভূত করিতাম, সেই অবস্থা, সেই সুখ, মনে পড়িল। মুহূর্ত্ত জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া, মনে মনে, সমবেত বন্ধুমণ্ডলী মধ্যে বসিলাম; আবার সেই অকারণসঞ্জাত উচ্চহাসি হাসিলাম, যে কথা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া এখন বলি না, নিষ্প্রয়োজনেও চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম; আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল—তাই এ সঙ্গীত এত মধুর লাগিল। শুধু তাই নয়। তখন সঙ্গীত ভাল লাগিত,—এখন লাগে না—চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া, সেই গত যৌবনসুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্ব্বস্মৃতিসূচক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল।

সে প্রফুল্লতা, সে সুখ, আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে? অর্জ্জন এবং ক্ষতি উভয়ই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জ্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখদ সামগ্রী সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে স্ফূর্ত্তি কমে কেন? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা

যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? কোকিলকে স্বর না ভাবিয়া পাখী ভাবি কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমসুবাসিত, স্বচ্ছ কল্লোলিনীশীকরসিক্ত, বসন্ত-পবনবিধূত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঙ্গিল কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রঙ্গিল কাচ। যৌবনে অর্জ্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা। এখন অর্জ্জিত সুখ অধিক কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায়? তখন জানিতাম না কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে; যখন মনে ভাবিতেছি এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্ত্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিয়াছি, যে সংসার সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে; মনুষ্যহৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে। এখন জানিয়াছি যে বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না; ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই। এখন বুঝিতে পারিয়াছি, যে কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিত্তল সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদী।—কিন্তু কি বলিতে-ছিলাম ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি! উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয়বার শুনিতে চাহি না। উহা যেমন মনুষ্যকণ্ঠজাত সঙ্গীত, তেমনি সংসারের এক সঙ্গীত আছে। সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সঙ্গীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত আকুল! সে সঙ্গীত আর কি শুনিব না? শুনিব, কিন্তু নানা বাদ্যধ্বনি সংমিলিত, বহুকণ্ঠপ্রসূত সেই পূর্ব্বশ্রুত সংসারসঙ্গীত আর শুনিব না। সে গায়কেরা আর নাই—সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্যসহায় একমাত্র গীতধ্বনিতে কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—প্রীতিই ঈশ্বর। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার সঙ্গীত। অনন্ত কাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্যহৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক! মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত

আজি বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর আমরা সংশয় করি না—এই ভূমণ্ডলে বাঙ্গালী জাতির গৌরব হইবে। কেননা বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে—অকপটে বাঙ্গালী, বাঙ্গালী কবির জন্য রোদন করিতেছে।

যে দেশে একজন সুকবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য। যে দেশে সুকবি যশঃপ্রাপ্ত হয়, সে দেশের আরও সৌভাগ্য। যশঃ, মৃতের পুরস্কার—জীবিতের যথাযোগ্য যশঃ কোথায়? প্রায় দেখা যায়, যিনি যশের পাত্র, তিনি জীবিতকালে যশস্বী নহেন; যিনি যশের অপাত্র, তিনি জীবিতকালে যশস্বী। সক্রেতিস্ এবং যীশু খ্রীষ্টের দেশীয়েরা, তাঁহাদিগকে অপমান করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। কোপরনিকস্, গেলিলীয়, দান্তে, প্রভৃতির দুঃখ কে না জানে? আবার হেলি, সিওয়ার্ড প্রভৃতি মহাকবি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। এদেশে, আজিও দাশরথি রায়ের একটু যশ আছে। যে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি যশস্বী হইয়া জীবন সমাপন করেন, সে দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, যে যশস্বী হইয়া মরিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায়, যে বাঙ্গালা দেশ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে।

বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ। যাঁহারা ভূতত্ত্ব-বেত্তাদিগের মুখে শুনেন যে বাঙ্গালা, নদীমুখনীত কর্দ্দমে সম্প্রতি রচিত, তাঁহারা যেন না মনে করেন, যে কালি পরশ্ব হিমাচল পদতলে সাগরোর্ম্মি প্রহৃত হইত। সেরূপ অনুমান শক্তি কেবল হুইলর সাহেবের ন্যায় পণ্ডিতেরই শোভা পায়। কিন্তু এই প্রাচীন দেশে, দুই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষের কথা বিবাদের স্থল—নিশ্চয়-স্থল হইলেও শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।

যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত ইউরোপীয় আমাদিগের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি?—বাঙ্গালির মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্ম্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্য দেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন।

স্মরণীয় বাঙ্গালির অভাব নাই। কুল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায়, প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল! কেবলই কি বঙ্গদেশে?

আমাদের ভরসা আছে। আমরা স্বয়ং নির্গুণ হইলেও, রত্নপ্রসবিনীর সন্তান। সকলে সেই কথা মনে করিয়া, জগতীতলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে যত্ন কর। আমরা কিসে অপটু? রণে? রণ কি উন্নতির উপায়? আর কি উন্নতির উপায় নাই? রক্তস্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি সুখের পারে যাওয়া যায় না? চিরকালই কি বাহুবলই একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় হইতেছে? দেশভেদে, কালভেদে, কি উপায়ান্তর হইবে না?

ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ "শ্রীমধুসূদন।"

বঙ্গদেশ, বঙ্গ কবির জন্য রোদন করিতেছে। বঙ্গ কবিগণ মিলিয়া, বঙ্গীয় কবিকুলভূষণের জন্য রোদন করিতেছেন। কবি নহিলে কবির জন্য রোদনে কাহার অধিকার? আমরা এবিষয়ে কতকগুলি কবিতা প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে দুইখানি আমরা এইস্থানে প্রকটিত করিব। দুইখানিই দুইজন প্রসিদ্ধ কবির প্রণীত। প্রথম খানি, যাঁহার প্রণীত তাঁহার পরিচয় দিতে হইবে না।

স্বর্গারোহণ।

(১)

খোল খোল দ্বার　　খোল দ্রুতগতি　　হিরণ্ময় জ্যোতি যার,
বলিলা কৃতান্ত　　ডাকি অনুচরে　　মুখেতে প্রীতির ভার,
সম্বরি সংসার　　লীলা আপনার　　শ্রীমধুসূদন আসে,
সম্ভাষি আদরে　　লও রে তাহারে　　বাণী-পুত্রগণ পাশে,
কবি-কুঞ্জধাম　　পবিত্র কানন　　অমর ভবনে যাহা,
নিরঞ্জন স্থান　　সদা মধুময়　　দেখাও উহারে তাহা—
যাও দ্রুতগতি　　যাও যাও সবে　　সুখে বংশীধ্বনি কর,
কুসুমে গাঁথিয়া　　সুন্দর মালিকা　　মস্তক উপরে ধর,
ভুঞ্জি বহু দুখ　　সংসার কারাতে　　শ্রীমধু দুঃখেতে আসে,
ত্বরা করি যাও　　যশঃগীতি গাও　　লও কবিকুঞ্জ বাসে।

(২)

খুলিল ত্বরিতে   উত্তরে তোরণ   সঙ্গীত ঝঙ্কারে ধায় ;
দিগঙ্গনাগণে   দেবদূত সঙ্গে   রঙ্গে যশঃগীত গায়,
"এস এস সুখে   বাণীবরপুত্র   বঙ্গের উজ্জ্বল মণি,
স্বভাবের শিশু   সুধাতে পালিত   কল্পনা হীরার খনি,
বাল্মীকি হোমর   সুমন্ত্রে দীক্ষিত   মধুর সুতন্ত্রীধারী,
অকাল কোকিল   মরুতল-তরু   অনীর দেশের বারি,
এস ভাগ্যবান   কবিকুঞ্জ ধামে   চির সুখে কাল হর,
চিরজীবী হয়ে   চির আকাঙ্ক্ষিত   জয় মাল্য এই পর"
বলিতে বলিতে   ঘেরিয়া সকলে   মণ্ডলী করিয়া আসি,
দিগঙ্গনা দল   কুসুমের দামে   সাজায় শিরসি হাসি।

(৩)

সখীগণ চলে   কবি-কুঞ্জবনে   কলকণ্ঠ স্বরে সুরে,
কুসুম বাসিত   সুমন্দ মলয়   ঘ্রাণেতে প্রবেশে দূরে,
ঘন কুহু ধ্বনি   ভ্রমর ঝঙ্কার   শ্যামার সুন্দর তান,
বেণু বীণা রুত   অস্ফুট কাকলি   পুলকিত করে প্রাণ ;
ভুলে মর্ত্ত্য শোক   মধুমত্ত কবি   মধু সে আস্বাদ পায়,
অতুল আনন্দে   নয়ন বিস্ফারি   কবি কুঞ্জপানে চায় ;
চারি পাশে বামা   কলকণ্ঠ স্বরে   মধুর কীর্ত্তন করে,
আকাশে পবনে   সুবাসিতঘ্রাণে   মধুর সঙ্গীত স্বরে ;
যবে উতরিলা   কবি কুঞ্জধামে   শরীরে রোমাঞ্চ ধরি,
"কবি ধন্য তুমি   শ্রীমধুসূদন"   ধ্বনিল কানন ভরি।

(৪)

সদা মধুময়   কবিকুঞ্জ সেই   সুমিষ্ট সকলি তায়,
স্বভাবের গুণে   সকলি সুন্দর   ক্ষণে রূপভেদ পায়—
এই ইন্দ্রধনু   তনু মনোহর   গগন উজ্জ্বল করে,
ঝলকে ঝলকে   ক্ষণ পরে এই   বিজুলি সুহাস্য ধরে,
সতত সুন্দর   শরতের শশী   নীল নভঃতলে ভাসে,
সতত সুন্দর   কুসুমের রাশি   তরু কোলে কোলে হাসে,
স্বভাবের গুণে   সরসীর নীর   ক্ষীর সম শোভা পায়,
নদী নদ বারি   অমৃত সঞ্চারি   প্রবাহ ঢালিয়া যায়,
মধুময় যত   নিখিল জগতে   সকলি সেখানে ফলে,
সন্তাপ অনল   অশোক বাসনা   গিরি তরু বায়ু জলে।

(৫)

লীলা সাঙ্গ করি　হ'লে অবসর　অহে বঙ্গকুলরবি,
যতদিন ভবে　থাকিবে জীবন　ভাবিব তোমার ছবি ;—
আকর্ণ পূরিত　সেই নেত্রদ্বয়　সুহৃৎরঞ্জন ভান,
মধুচক্র সম　মধুর ভাণ্ডার　সরল কোমল প্রাণ,
আনন্দলহরী　ভাবার নির্ঝর　শোভিত আশার ফুলে,
উৎসাহ ভাসিত　বদন মণ্ডল　পঙ্কজ বান্ধব কুলে,
বীর অবয়ব　বীরভাষা-প্রিয়　গৌড়-সন্ততি সার,
প্রিয়ম্বদ সখা　প্রণয়ের তরু　কামিনী কণ্ঠের হার,
সাহিত্য কুসুমে　প্রমত্ত মধুপ　বঙ্গের উজ্জ্বল রবি
তোমার অভাবে　দেশ অন্ধকার　শ্রীমধুসূদন কবি।

(৬)

গেলে চলি মধু　কাঁদায়ে অকালে　পাইয়া বহুল ক্লেশ,
ক্ষিপ্ত গ্রহ প্রায়　ধরাতে আসিয়া　জ্বলিয়া হইলা শেষ,
ছিলে উদাসীন　গেলে উদাসীন　জয়মাল্য শিরে পরি,
অনাথ দুটীরে　কার কাছে বলো　গেলে সমর্পণ করি ;
ভেবেছিলা জানি　তুমি গত যবে　গৌড়বাসীরা সবে,
অনাথপালক　তোমার বালক　অঙ্কেতে তুলিয়া লবে,
হবে কি সে দিন　এ গৌড় মাঝে　পূরাবে তোমার আশা,
বুঝিবে কি ধন　দিয়াছ ভাণ্ডারে　উজ্জ্বল করিয়া ভাষা !
হায় মা ভারতী　চিরদিন তোর　কেন এ কুখ্যাতি নরে
যেজন সেবিল　ও পদযুগল　সেই জন দুঃখে মরে।

নিম্নে সন্নিবেশিত দ্বিতীয় কবিতা যে লেখনীপ্রসূত, তাহাও কাব্যপ্রিয়দিগের নিকট সুপরিচিত।

১

হা অদৃষ্ট !—কবিবর !　এই কি তোমার
ছিল হে কপালে ?
মধুসূদনের, হায় !　(শুনে বুক ফেটে যায় !)
এই পরিণাম বিধি লিখেছিল ভালে ?

২

দিয়াছিল যেই রত্ন　ভারতী তোমায়—
অপার্থিব ধন ;
রাজ্য বিনিময়ে আহা ! কেহ নাহি পায় তাহা,
দাতব্যচিকিৎসালয়ে তোমার মরণ ?

৩

কিম্বা কণ্টকিত হায়! যে বিধি করিল
গোলাপ কমল ;
সে বিধি পাষাণ মনে, দহিতে সুকবিগণে,
কবিত্ব অমৃতে দিল দারিদ্র অনল।

৪

বহু যুদ্ধে না পারিয়া করিতে নির্ব্বাণ
এই হুতাশন ;
প্রাণ পত্নী করে ধরি, নর লীলা পরিহরি,
পশিলে মধুসূদন অমর জীবন।

৫

কৃতঘ্ন মা বঙ্গভূমি! এতদিন তব
কবিত্ব কানন,
যেই পিকবর কল, উছলে, যমুনা জল
উছলিত ব্রজে শ্যাম বাঁশরী যেমন।

৬

সে মধু সখারে আজি পাষাণ পরাণে,
(কি বলিব হায়!)
অযত্নে মা অনাদরে, বঙ্গ কবিকুলেশ্বরে,
ভিক্ষুকের বেশে মাতা দিয়াছ বিদায়!

৭

মধুর কোকিল কণ্ঠে—অমৃত লহরী—
কে আর এখন,
দেশ দেশান্তরে থাকি, কে 'শ্যামাজন্মদে' ডাকি
নূতন নূতন তানে মোহিবে শ্রবণ ?

৮

তোমার মানস খনি করিয়া বিদায়,
কাল দুরাচার,
হরিল যে রত্ন হায়! কতদিনে পুনরায়,
ফলিবে এমন রত্ন ? ফলিবে কি আর ?

৯

শূন্য হলো আজি বঙ্গ কবি-সিংহাসন
মুদিল নয়ন
বঙ্গের অনন্ত কবি কল্পনা-সরোজ রবি,
বঙ্গের কবিতা মধু হরিল শমন।

১০

বঙ্গের কবিতে! আজি অনাথা হইলে
মধুর বিহনে ;
আজন্ম শৃঙ্খল ভরে দীনা ক্ষীণা কলেবরে,
বেড়াইতে বঙ্গালয়ে বিরস বদনে ;

১১

কল্পনার বলে সেই চরণ শৃঙ্খল
কাটিয়া যে জনে,
মধুর অমিত্রাক্ষরে তুলিয়া স্বরগোপরে,
দেখাইল তিলোত্তমা 'মুকুতা যৌবনে' ;

১২

রক্ষসৌধ কিরীটিনী স্বর্ণ লঙ্কাপুরে,
লইয়া তোমারে ;
মৈথিলী অশোকবনে, প্রমিলা সজ্জিত রণে
প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে বীর অহঙ্কারে,

১৩

দেখাইল ;—বেড়াইল কল্পনার বক্ষে
লইয়া তোমারে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ধরাতলে, প্রচণ্ড জলধিতলে ;
শুনাইল মেঘনাদ গভীর ঝঙ্কারে ;

১৪

ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা, নয়নের জলে—
প্রেম বিগলিত ;
সাজায়ে সুন্দর ডালা, গাঁথিয়া নূতন মালা
আদরে তোমার অঙ্গ করিল ভূষিত ;

১৫

পুণ্যখণ্ড ইউরোপে বসিয়া বিরলে
সেই দিন হায়!
গাঁথিয়া কল্পনা করে, পরাইল শ্রদ্ধাভরে
রত্নময় 'চতুর্দ্দশ' লহরী গলায়।

১৬

কৃষ্ণকুমারীর দুঃখে কাঁদাইয়া হায়;
বঙ্গবাসিগণ;
বঙ্গনাট্য রঙ্গাঙ্গনে, মোহিত দর্শকগণে,
পদ্মাবতী শর্ম্মিষ্ঠারে করিয়া সৃজন;

১৭

বঙ্গভাষা সুললিত কুসুম কাননে
কত লীলা করি,
কাঁদাইয়া গৌড় জন, সে কবি মধুসূদন
চলিল—বঙ্গের মধু বঙ্গ পরিহরি।

১৮

যাও তবে কবিবর! কীর্ত্তি রথে চড়ি
বঙ্গ আঁধারিয়া,
যথায় বাল্মীকি ব্যাস, কীর্ত্তিবাস, কালিদাস
রচিয়াছে সিংহাসন তোমার লাগিয়া।

১৯

যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া
কবিতাভাণ্ডারে;
অনন্ত কালের তরে গৌড় মন মধুকরে,
পানকরি, করিবেক যশস্বী তোমারে॥

শ্রীনঃ

কিন্তু "বঙ্গকবি সিংহাসন" শূন্য হয় নাই। এ দুঃখ সাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র! মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক! বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্ত ধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।—বং সম্পাদক।

বঙ্গদেশের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতের যে অংশ আছে, তাহাতে সামুদ্রিক সম্বুকাদি পাওয়া যায়। হিমালয়ে সামুদ্রিক সম্বুক কি প্রকারে আসিল? ভূতত্ত্ব-বিদেরা বলেন, যে পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশ ছিল না, তৎপরিবর্ত্তে হিমালয়-মূল পর্য্যন্ত কেবল সমুদ্র ছিল। পরে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র দ্বারা নানা দেশের প্রধৌত মৃত্তিকা বৎসর বৎসর আনীত হইয়া, ক্রমে চড়া পড়িয়া বাসোপযোগী স্থান হইয়াছে। বস্তুতঃ একথা নিতান্ত অসম্ভব নহে। কি প্রকারে এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হয়, সর চার্লস লায়েলের প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ব গ্রন্থে তাহা অতি বিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালার মৃত্তিকা অন্য দেশের ন্যায় প্রস্তর কি কাঁকর মিশ্রিত নহে; যে মৃত্তিকা শ্রোতোবেগে ভাসিয়া আসিতে পারে, বাঙ্গালার সর্ব্বস্থানে কেবল সেই মৃত্তিকা, অর্থাৎ পলি অথবা বালি। এদেশের যেখানে ইচ্ছা সেখানে খনন করা যাউক, পলি অথবা বালি ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যাইবে না। আর সেই পলি কি বালি যেরূপে স্তরে স্তরে আছে, তাহাতে উহা যে শ্রোত তাড়িত হইয়া আসিয়া সমুদ্রের স্থির জলস্পর্শে এক এক স্তরে জমিয়াছিল তাহা এক প্রকার বুঝা যায়। তদ্ভিন্ন যে সকল স্থানে কস্মিন কালে নদী থাকার কোন চিহ্নও নাই, সে সকল স্থান খনন করিলে কখন কখন বৃহৎ "পাটুলি" প্রভৃতি নৌকা পাওয়া যায়। তাহাতে বোধ হয় যে, ঐ সকল স্থানে এক সময় জল ছিল, ক্রমে ভরাট হইয়া বাসোপযোগী হইয়াছে।

আর এক কথা আছে। যদি শ্রোত তাড়িত পলি কি বালি দ্বারা বাঙ্গালার উৎপত্তি, তবে ক্রমে বাঙ্গালার আয়তন বাড়িবার সম্ভাবনা; কেননা পূর্ব্বমত বর্ষে বর্ষে অন্য দেশের মৃত্তিকা শ্রোতে অদ্যাপি আসিতেছে। যে কয়েক সহস্র বৎসরে পলি জমিয়া বাঙ্গালার বর্ত্তমান আয়তন হইয়াছে, আবার সেই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালা দ্বিগুণ হইতে পারে। বর্ষে বর্ষে পলি আসিয়া সমুদ্রে জমিতেছে; অতএব বর্ষে বর্ষে বাঙ্গালার আয়তন বৃদ্ধির সম্ভাবনা, কিন্তু বহুকালাবধি তাহার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই ইহার কারণ কি?

এই প্রশ্নের উত্তর কাপ্তেন সারওয়েল সাহেব দিয়াছেন*। তিনি বলেন যে বাঙ্গালার দক্ষিণ সমুদ্র মধ্যে এমত একটি প্রকাণ্ড গর্ত্ত আছে যে তাহা অতলস্পর্শ। বাঙ্গালা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া সেই অতলস্পর্শের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এক্ষণে যে মৃত্তিকা, স্রোত তাড়িত হইয়া বর্ষে বর্ষে আসিতেছে তাহা সমুদায় ঐ অতলস্পর্শে পড়িতেছে। পলি আর জমিতে পায় না, অতএব বাঙ্গালার আয়তন আর বৃদ্ধি হয় না। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি মানচিত্রে দেখাইয়াছেন যে সুন্দর বনের দক্ষিণে নদীমুখে এক্ষণে যত চর আছে, সকলের অগ্রভাগ সেই অতলস্পর্শাভিমুখে রহিয়াছে। পূর্ব্বদিকস্থ চরের মুখ পশ্চিম দিকে আছে, আর পশ্চিমদিকস্থ চরের অগ্রভাগ পূর্ব্বাভিমুখে আছে; অর্থাৎ মেঘনার নিকটস্থ হউক আর ভাগিরথীর নিকটস্থই হউক সমুদয় চরের মুখ সেই মধ্যবর্ত্তী অতলস্পর্শের দিগে রহিয়াছে।

এই অতলস্পর্শের কথা আর একজন কাপ্তেন লিখিয়াছেন। উহা এত গভীর যে তাহা পরিমাণ করিবার নিমিত্ত তিনি বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কোন ক্রমেই সফল হইতে পারেন নাই। আমাদের দেশে বিশ্বাস আছে যে, যেখানে অতলস্পর্শ তাহার উপরে পক্ষীটি পর্য্যন্ত উড়িতে পারে না, পড়িয়া যায়। এ বিশ্বাসের মূল কি, তাহা জানা নাই কিন্তু যে অতলস্পর্শের কথা উল্লেখ করা গেল তাহার উপর দিয়া জাহাজ পর্য্যন্ত গতায়াত করিয়া থাকে।

শুনা গিয়াছিল যে ভাগীরথী পৃথিবী বিচরণ করিয়া সাগর সঙ্গমের পর পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যিনি এই কথা প্রথমে প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি এই অতলস্পর্শের বিষয় জানিতেন এবং ইহা পাতালের পথ বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল।

সে যাহাই হউক, কাপ্তেন সেরওএন সাহেব এই অতলস্পর্শ সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্যের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কিছুকাল হইল সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী এই প্রকাণ্ড গর্ত্তের উত্তর দিকের নিম্নভাগ কিয়দংশ সেই অতলস্পর্শের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে, এবং তন্নিবন্ধন সেই দিকস্থ ভূমির উপরিভাগ নামিয়া গিয়াছে। এই অতলস্পর্শের উত্তরদিকে সুন্দরবন, অতএব সুন্দরবনের ভূমি নিম্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে তথায় সুন্দরবন ছিল না, ঐ স্থান নিম্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়াই সুন্দরবন হইয়াছে।

পূর্ব্বে এই স্থান বাঙ্গালার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। কি ধনে, কি বাণিজ্যে, ইহার তুল্য স্থান আর বাঙ্গালায় ছিল না। লংসাহেব এক স্থানে লিখিয়াছেন, যে প্রাচীন সুন্দরবনের একখানি মানচিত্র পারিস নগরে আছে; তাহাতে পাঁচটী নগরী সুন্দর-

*See Captain Sherwell's Report on Bengal Rivers.

বন মধ্যে থাকা দেখা যায়। সেদিন বেলী সাহেব মুখুয্যার মেগেজিনে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মেঘনার মুখে বাঙ্গালা নামে একটি নগর ছিল, এক্ষণে তাহা নাই। অদ্যাপিও সুন্দরবনের মধ্যে যে সকল ভগ্ন অট্টালিকা দেখা যায়, তাহার তুল্য অট্টালিকা বাঙ্গালার আর কোন রাজধানীতে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ঢাকা, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি পুরাতন রাজধানীতে এরূপ অট্টালিকার কোন চিহ্ন নাই। এই বনে যেরূপ চিত্রিত ইষ্টক পাওয়া যায়, তত্তুল্য ইষ্টক অদ্যাপিও কলিকাতায় ব্যবহার হয় নাই। এই ভাগে রাজা প্রতাপ আদিত্যের যশোহর নামে রাজধানী ছিল। অদ্যাপি তাঁহার যশরেশ্বরী দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু আর সে নগর নাই! যেখানে অষ্টাদশ বাজার ছিল বলিয়া কোন কোন গ্রন্থে বর্ণিত আছে, এক্ষণে সেই নগরসীমা মধ্যে অষ্টাদশের অধিক লোণা খাল প্রবাহিত হইতেছে। এই অঞ্চল নামিয়া গিয়াছে বলিয়াই, এত জলের ও খালের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যেখানে নবাব খাঞ্জা খাঁর রাজধানী ছিল, এক্ষণে সেখানে বাঁধ বাঁধিয়াও জুয়ারের জল নিবারণ হয় না।

বাঙ্গালার দক্ষিণ ভাগ যে নিম্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার আরো অনেক প্রমাণ আছে। সে সকল উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। তাহার মধ্যে কয়েক বৎসর হইল কলিকাতার পূর্ব্বাংশে একটি বাজারের নিকট এবং কেল্লার একস্থানে, প্রায় ৪০ কি ৫০ ফিট মৃত্তিকার নীচে একপ্রকার বৃক্ষ সমূলে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে অনেকে অনুভব করেন যে, এ অঞ্চল নিম্ন হয় নাই, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় ৪০ কি ৫০ ফিট উচ্চ হইয়াছে। কেননা, যেখানে জোয়ারের জল যায়, সেই স্থান ব্যতীত এই জাতীয় বৃক্ষ অপর স্থানে জন্মায় না, অতএব যেখানে ঐ বৃক্ষ সমূলে পাওয়া গিয়াছে, সেখানে এক সময়ে জোয়ারের জল অবশ্য আসিত; এক্ষণে যখন তাহার উপর ৪০। ৫০ ফিট মৃত্তিকা পাওয়া যাইতেছে, তখন ঐ স্থান উচ্চ হইয়াছে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, যখন বাঙ্গালার দক্ষিণ ভাগ নামিয়া যায়, তখন সেই সঙ্গে এই অঞ্চলও কতক নামিয়া গিয়াছিল এবং সেই নিম্ন অবস্থায় এই লোণা বৃক্ষ জন্মিয়াছিল, পরে ভাগীরথী আনিত পলি দ্বারাই হউক, বা অপর কোন কারণেই হউক, ঐ নিম্ন স্থান ভরাট হইয়া গিয়াছে; অতএব এক্ষণে ভরাট হইয়া গিয়াছে বলিয়াই যে ঐ স্থান নামিয়া যায় নাই এমত বিবেচনা করা অসঙ্গত।

অতলস্পর্শের নৈকট্য হেতু বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ নামিয়া যাওয়ার কথা কাপ্তেন সারওএন সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ হয় না, তাহার চিহ্ন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইতিবৃত্ত লেখকের মধ্যে অনেকে বলেন যে, পর্ত্তুগিজ প্রভৃতি ইউরোপীয় দস্যুদের অত্যাচারে অধিবাসিগণ পলায়ন করায় এই দক্ষিণ

ভাগ অরণ্যময় হইয়াছিল। আবার অনেকে বলেন যে, এক সময় মহামারী হওয়ায় এই অঞ্চল জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই দুই কারণের মধ্যে কোনটিই প্রকৃত নহে। বিলাতীয় দস্যুদের অত্যাচার হইয়া থাকুক, আর মহামারী হইয়া থাকুক, এই বহু জনাকীর্ণ স্থানে অসংখ্য লোণা খাল কি কারণে আসিল? পূর্ব্বে এসকল খাল ছিল না; থাকিলে কদাপি নগর স্থাপন হইতে পারিত না। খালের কথা দূরে থাকুক, এই ভাগের অধিকাংশ স্থান প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টার নিমিত্ত জলমগ্ন থাকে, যদি চিরকাল এইরূপ জলমগ্ন থাকিয়া আসিত, তাহা হইলে কস্মিন কালে এই স্থানে বসতি হইতে পারিত না। অতএব এই ভাগ যে নামিয়া গিয়াছে তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। এই ঘটনা বড় অধিক দিন হয় নাই; প্রায় তিনশত বৎসরের মধ্যে ঘটিয়া থাকিবে।

যাহাই হউক, এই অতলস্পর্শ আমাদের পক্ষে নিতান্ত শুভকারী নহে। কোন কালে যে ইহার উদরপূর্ত্তি হইবে, এমত আমাদের ভরসা নাই এবং উদর না পুরিলে যে কখন কি বিষম বিপদ ঘটিয়া উঠিবে, তাহা বলা যায় না। একবার আমাদের প্রায় সর্ব্বস্ব গিয়াছে, আবার কবে কি হয়।

যাহা ঘটিয়াছে তাহাই যে শেষ এমত বোধ হয় না, আবার কি ঘটিবে, হয়ত তাহার উদ্যোগ হইতেছে। সুন্দরবনে গেলে মধ্যে মধ্যে তোপধ্বনির ন্যায় শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে গভীর শব্দ কোথা হইতে আইসে তাহার নিশ্চয় হয় না। বরিশাল হইতে ইহা শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া তথাকার সাহেবেরা এই শব্দকে বরিশাল তোপ (Burisaul gun) বলেন কিন্তু অপর জেলার অন্তর্গত সুন্দরবনের নানা স্থান হইতে এই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল অঞ্চলের অপর সাধারণ সকলেই জানে যে ইহা তোপধ্বনি বা মনুষ্যকৃত কোন শব্দ নহে। অনেকে বিবেচনা করে যে, ইহা যমপুরীর কোন শব্দ হইবে, কেননা এই শব্দ বর্ষাকালে আরম্ভ হয়; আর সেই বর্ষাকালেই এ অঞ্চলে জ্বরপীড়ায় অনেক মরে। অনেক বিজ্ঞ ইংরাজেরা অনুভব করেন যে এই ভয়ানক শব্দ পৃথিবীর গর্ভ্ভ হইতে আসিতেছে। বাস্তবিক তাহা সত্য, কিন্তু এবার পৃথিবীর গর্ভ্ভে যে কি আছে, তাহা কেহই নিশ্চয় করিতে পারেন নাই।

সকলেই বলেন যে, বর্ষাকালে এই শব্দ আরম্ভ হইয়া থাকে। যদি তাহা সত্য হয়, তবে জলবৃদ্ধির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু সে সম্বন্ধ কি তাহা প্রকাশ নাই। বাঙ্গালায় ভূতত্ত্ববিৎ অতি অল্প আছেন তাঁহাদিগের মধ্যেও এবিষয়ে কেহ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যে সফল হইয়াছেন এমত বোধ হয় না। কেহ যে কোন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এমতও শুনা যায় নাই।

চিত্র-নভ-কিরীটিনী সচন্দ্র রজনী,
চিত্রি বিকসিত নৈশ কুসুম মালায়
উদ্যান, সরসীনীর; অযুত রতনে
চিত্রি সচঞ্চল চির নীল নীরনিধি,
ভাসিছে নিদাঘাকাশে। বিশ্ব চরাচর
নীরবে শান্তির সুধা করিতেছে পান।
চন্দ্রের একটি রশ্মি শিবিরের দ্বারে
রহিয়াছে শতরঞ্জি উপরে পড়িয়া,
যেন স্থির উল্কাখণ্ড স্থিরতর জ্যোতি।

নিরখিয়া সেই রশ্মি বিমল উজ্জ্বল,
উদাস হইল প্রাণ; পর্য্যঙ্ক ত্যাজিয়া
শিবির বাহিরে নব শ্যাম দূর্ব্বাদলে
বসিলাম মন সুখে; সম্মুখে আমার—
অনন্ত, অসীম সিন্ধু! চন্দ্রের কিরণে
খেলিছে অনিল সহ সলীল লহরী,
চুম্বি মৃদু কলকলে মম পদতলে
রজত বালুকাকীর্ণ ধবল সৈকতে।

দক্ষিণে আবার—মৃদু সুমধুর কলে
ছুটিয়াছে কল্লোলিনী* নাচিয়া নাচিয়া,
আলিঙ্গিয়া প্রতিকূল—তীরে গিরিচয়;
ধবল উত্তরী যেন মাধবের গলে।
অপূর্ব্ব প্রকৃতি শোভা! অদূর ভূধর
শোভিতেছে মেঘবৎ আকাশের গায়ে;
কেবল কোথায় কোন উচ্চ তরুবর,
অরণ্য হইতে তুলি উচ্চতর শির
করিতেছে আকাশের সীমা নিরূপণ;
চিত্রিত আকাশ—চন্দ্র—ভূধর—সাগর,
চিত্ত বিমোহিনী শোভা! মরি কি সুন্দর!

"এমন সময়ে" আমি ভাবিলাম মনে,
নিশা-হন্তা 'মেক্‌বেত' সাধিল মানস
সুপ্ত 'ডনকেনের' রক্তে; এমন সময়ে
নিভাইল অশ্বত্থামা, ভজিয়া ধূর্জ্জটি,—
পাণ্ডব বংশের পঞ্চ প্রদীপ উজ্জ্বল;
এমন সময়ে লঙ্ঘি উদ্যান প্রাচীর,
ভেটিল 'রোমিও' প্রাণ-প্রিয় জুলিয়েটে;
নিরখিল চন্দ্র সূর্য্য একত্রে উদয়;
এমন সময়ে, হায়! প্রণয় যন্ত্রণা
নিভাইতে সাগরিকা উদ্যান বল্লরী
লয়েছিল করে, দিতে কোমল গ্রীবায়,
উদ্বন্ধনে বিনাশিতে দুঃখের জীবন;
এমন সময়ে সুপ্ত কনক লঙ্কায়,
একাকিনী শোকাকুলা পতির বিরহে
কাঁদিল অশোক বনে সীতা অভাগিনী;

"এমন সময়ে—" সেই সমুদ্রের কূলে
ভাবিতে ভাবিতে দেহ হইল অবশ;
ক্রমে অজানিত সেই সমুদ্র বেলায়
শুইলাম, সুকোমল দূর্ব্বাদল ময়
শ্যামল শয্যায়। স্নিগ্ধ সমুদ্র নীরজ
অনীল বহিতেছিল অতি ধীরে ধীরে;
পশিলাম ক্রমে নিদ্রা-স্বপন-মন্দিরে।

* কর্ণফুলী নদী।

রত্ন সৌধ কিরীটিনী স্বর্ণ লঙ্কা জিনি,
দেখিনু শোভিছে রাজ্য জলধি হৃদয়ে
শত লঙ্কা পরিসরে; বাঁধা ছিল বলে
এক চন্দ্র, এক সূর্য্য, রাবণ দুয়ারে,
এইখানে সুকুমার প্রণয় শৃঙ্খলে
কত চন্দ্র, কত সূর্য্য, প্রতি ঘরে ঘরে
রহিয়াছে শৃঙ্খলিত। বহিতেছে বেগে
যেই রম্য রথশ্রেণী বাষ্পে হুতাশনে,
অতি তুচ্ছ তার কাছে পুষ্পকের গতি।

চপলা সন্দেশ বহ; যাহার পরশে
মরে জীব, সে বিদ্যুৎ দেশ দেশান্তরে,
কভু ছায়া পথে, কভু জলধির তলে,
বহিতেছে রাজ আজ্ঞা। অপূর্ব্ব কৌশল
বিরাজিয়া স্থানে স্থানে গণে অনায়াসে,
সময়ের গতি কিম্বা আকাশের তারা।

লঙ্কার অমৃত ফল বানরের করে
হইল নিঃশেষ, কিন্তু এ অপূর্ব্ব পুরে,
জাতীয়-গৌরব রূপ যে অমৃত ফল
ফলিতেছে অনিবার, বিনাশিতে তারে
পারিবে না নরে কিম্বা সমরে, অমরে।

এমন অমৃত পানে পুরবাসিগণ,
আনন্দে শান্তির কোলে করিয়া শয়ন
নিদ্রা যায় মন সুখে; হায় রে! কেবল
অন্ধকারে কারাগারে বসে একাকিনী
একটি রমণীমূর্ত্তি করিছে রোদন।

কতকাল রমণীর নয়নের জল,
ঝরিয়াছে কে বলিবে? সেই অশ্রুজলে
হইয়াছে দুঃখিনীর অঙ্কিত কপোল;
কবরী অবেণী-বদ্ধ, জটায় এখন
হইয়াছে পরিণত; হায়! করাঘাতে ক্ষত
বিক্ষত ললাট, স্থানে স্থানে কলঙ্কিত;
বহুমূল্য পরিধেয় নীল বস্ত্র খানি
হইয়াছে জীর্ণ শীর্ণ—নিতান্ত মলিন,
ততোধিক রমণীর মলিন বরণ।

বহুমূল্য রত্ন রাজি আছিল যথায়,
চরণে, প্রকোষ্ঠে, অংসে, উরসে, গ্রীবায়,
উদ্বন্ধন-লতিকার চিহ্নের মতন,
শ্বেত রেখা মাত্র এবে সর্ব্ব কলেবরে
রহিয়াছে বিদ্যমান, বাম করোপরে
রক্ষিত বদন চন্দ্র;—ফাটিল হৃদয়
এই মূর্ত্তিমতী শোক করি দরশন;

জিজ্ঞাসিনু "বল মাতা কে তুমি দুঃখিনী?
এমন বিষাদ মূর্ত্তি কিসের কারণ?"

বলিল রমণী অশ্রু মুছিয়া অঞ্চলে,
"দুঃখিনী ভারত লক্ষ্মী আমি বাছাধন!
আমিই অশোক বনে সীতা বিষাদিনী।"

শ্রীনঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা

প্রায় সকলেরই বিশ্বাস আছে, যে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষের মধ্যে তুলনা হইতে পারে না। দেশীয় লোকদের বিশ্বাস, যে প্রাচীন ভারতবর্ষ, বিদ্যা ও সভ্যতায়, আধুনিক ভারতবর্ষ হইতে ঈদৃশ অধিকতর গৌরবান্বিত ছিল, যে উভয়ে তুলনা হইতে পারে না। এদিকে জেম্‌স্ মিল ও মেন সাহেবের সম্প্রদায়ের ইংরাজেরা মনে করেন যে, ইংরাজের শাসনাধীনে আধুনিক ভারতবর্ষ ঈদৃশ উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, উভয় মধ্যে তুলনা হইতে পারে না।

আমরা একবার উভয়ের তুলনা করিয়া দেখিব। তুলনা অসম্ভব নহে। প্রাচীন ভারতের গৌরব বিস্তর বটে, কিন্তু আধুনিক ভারতও ঘৃণ্য নহে। এরূপ জনাকীর্ণ এবং বৈচিত্র্যবিশিষ্ট রাজ্য পৃথিবীতে আর নাই;—আধুনিক ভারতরাজ্যের যে আয়, তাহা পৃথিবীতলস্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য সকলের সহিত তুলনীয়। বিদ্যায় ও সভ্যতায় আধুনিক ভারতবর্ষীয়েরা ইউরোপ ও আমেরিকার বাহিরে, যে কোন জাতির সমকক্ষ—শ্রেষ্ঠ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

প্রাচীন ভারতবর্ষ বলিতে এ প্রবন্ধে হিন্দুরাজ্য বুঝাইবে। আধুনিক ভারত বলিলে, ইংরাজদিগের রাজ্যকাল বুঝাইবে। মুসলমান কালের কোন উল্লেখ করিব না।

প্রথমেই দেখা যায় যে প্রাচীন ভারতবর্ষ স্বাধীন, আধুনিক ভারতবর্ষ পরাধীন। কিন্তু ইহাতে সাধারণ লোকের একটু ভ্রম আছে। আধুনিক ভারতবর্ষ সমুদায়ই পরাধীন নহে—প্রাচীন ভারতবর্ষ সমুদায়ই স্বাধীন ছিল এমত নহে।

প্রথমোক্ত কথাটি অনেকেই অবগত আছেন—ভারতবর্ষে প্রায় চতুর্থাংশ ইংরাজের হস্তগত নহে। কিন্তু সেই সমুদায়ই হিন্দু রাজার শাসিত নহে—কিয়দংশে মুসলমান রাজা। আর হিন্দুই হউন, বা মুসলমানই হউন, সকল স্বাধীন রাজাই ইংরাজের আজ্ঞাকারী, ইংরাজের আজ্ঞানুসারে রাজ্য করিতে বাধ্য। অতএব যদি

কেহ বলেন, সমস্ত ভারতবর্ষই ইংরাজের অধীন, তবে তাঁহাদিগের সঙ্গে আমরা বিবাদ করিব না। দ্বিতীয় কথাটি ইতিবৃত্তজ্ঞ পণ্ডিতেরাই অবগত আছেন। শক, এবং যবন, * এই দুই জাতি কর্ত্তৃক আধুনিক পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক ভাগ যে অধিকৃত হইয়াছিল, জেম্‌স্ প্রিন্‌সেপ, জেনেরল কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাহার অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। হুবিষ্ক, কণিষ্কাদি শক জাতীয় ভারতীয় মহারাজাধিরাজেরা, এক্ষণে পুরাবৃত্তজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রের নিকট সুপরিচিত এবং মীননগর সংস্থাপক মীন (Menander) রাজার ন্যায়, যবন জাতীয় সম্রাটেরাও ইতিহাসে পরিচিত। অন্যূন ত্রিংশৎ সংখ্যক যোন জাতীয় রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা পঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিমের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। "অরুণদ্যবনো সাকেতম্" একথা পতঞ্জলি মহাভাষ্যে উদাহরণস্থলে এরূপভাবে লিখিয়াছেন যে, যবনকৃত অযোধ্যাবরোধ যে প্রকৃত ঘটনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। যবনেরা ভারত-বর্ষের মধ্যভাগ জয় না করিলে কখনও অযোধ্যা রোধ করিতে পারিত না। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রক্তবাহু নামে যবন আসিয়া উড়িষ্যা জয় করার কিম্বদন্তী প্রচলিত থাকা হণ্টর সাহেব লিখিয়াছেন। ডাক্তার ভাও দাজী প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মধ্য ভারতবর্ষে সাতজন যবন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে অন্ধ্র রাজাদিগের পর আটজন যবন রাজার কথা লেখা আছে। ডাক্তার হণ্টর, "উড়িষ্যা" নামক গ্রন্থে বিচ্ছিন্ন সূত্রগুলি সকল একত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে যবন রাজ্য ছিল। লোকে বলে, ডাক্তার হণ্টর কিছু কল্পনাপ্রিয়, তাঁহার কথার তত গৌরব নাই। ইহা স্বীকার করিলেও প্রাচীন মুদ্রা, পতঞ্জলি, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি প্রদত্ত প্রমাণে অবজ্ঞা করিবার কারণ নাই। পারসীকেরা (পহ্লব) ও আরবেরা প্রাচীন ভারতবর্ষের পশ্চিম ভাগের কিয়দংশ সময়ে সময়ে অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছিল, ইহা গ্রীক ও আরবদিগের লিখিত ইতিবৃত্তে কথিত আছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা সর্ব্বত্র চিরস্বাধীন ছিলেন না; শক, যবন, পহ্লব, এবং আরবেরা কখন কখন ভারতবর্ষের কোন কোন অংশে রাজা ছিল। আধুনিক ভারতবর্ষও সর্ব্বত্র পরাধীন নহে। তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সাধারণতঃ প্রাচীন ভারতবর্ষ স্বাধীন, সাধারণতঃ আধুনিক ভারতবর্ষ পরাধীন।

কিন্তু স্বাধীনতা, ও পরাধীনতা, এই সকল কথার তাৎপর্য্য কি, তাহা একবার বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে। আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে আধুনিক

* যবন শব্দে কেহ মুসলমান না বুঝেন। পূর্ব্বকালে যবন বা যোন শব্দে আসিয়াবাসী গ্রীকদিগের বুঝাইত, এমত প্রমাণ আছে। কোন কোন গ্রন্থে যবনেরা তুর্ব্বসু জাতীয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুলনার উদ্দেশ্য তারতম্য নির্দ্দেশ। কিন্তু কোন্ বিষয়ের তারতম্য আমাদিগের অনুসন্ধানের বিষয়? প্রাচীন ভারত স্বাধীন, আধুনিক ভারত পরাধীন একথা বলিয়া কি উপকার? আমাদিগের বিবেচনায়, এরূপ তুলনায় একটি মাত্র উদ্দেশ্য এই হওয়া আবশ্যক যে, প্রাচীন ভারতে মনুষ্য সুখী ছিল, কি আধুনিক ভারতবর্ষে অধিক সুখী? যদি প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা স্বাধীন বলিয়া অধিক সুখী ছিলেন, তবে এ বিষয়ের প্রাচীন ভারতবর্ষের অধিক সংশয় কি?

এতক্ষণে অনেকে আমাদিগের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন। স্বাধীনতায় যে সুখ তাহাতে সংশয় কি? যে সংশয় করে সে পাষণ্ড, নরাধম, ইত্যাদি। স্বীকার করি। কিন্তু স্বাধীনতাও পরাধীনতা অপেক্ষা কিসে ভাল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে ইহার সদুত্তর পাওয়া ভার।

বাঙ্গালী ইংরাজি পড়িয়া এ বিষয়ে দুইটি কথা শিখিয়াছেন—"Liberty," "Independence." তাহার অনুবাদে আমরা স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্রতা দুইটি কথা পাইয়াছি। অনেকেরই মনে বোধ আছে যে দুইটি শব্দে এক পদার্থকে বুঝায়। স্বজাতীর শাসনাধীন অবস্থাকেই ইহা বুঝায় এইটি সাধারণ প্রতীতি। রাজা যদি ভিন্নদেশীয় হয়েন, তবে তাঁহার প্রজাগণ পরাধীন, এবং সেই রাজ্য পরতন্ত্র। এই হেতু, এক্ষণে ইংরাজের শাসনাধীন ভারতবর্ষকে পরাধীন ও পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এই জন্য মোগলদিগের শাসিত ভারতবর্ষকে, বা সেরাজউদ্দৌলার শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বা পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এইরূপ সংস্কারে সমূলকতা বিবেচনা করা যাউক।

মহারাণী বিক্টোরিয়াকে ইংরাজ কন্যা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ প্রথম বা দ্বিতীয় জর্জ ইংরেজ ছিলেন না। তাঁহারা জর্ম্মান। তৃতীয় উইলিয়ম ওলন্দাজ ছিলেন। বোনাপার্টি কর্সিকার ইতালীয় ছিলেন। স্পেনের ভূতপূর্ব্ব রাজা আমাদিও ইতালীয়। ঐ রাজ্যের প্রাচীন বুর্বোঁ বংশীয় রাজারা ফরাসী ছিলেন। রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসনে ফিলিপ নামে একজন আরব একদা আরোহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে, এই সকল রাজ্যে তত্তদবস্থায় রাজা ভিন্নজাতীয় ছিলেন। ঐ সকল রাজ্য তত্তৎ কালে পরাধীন বা পরতন্ত্র ছিল, বলা যাইতে পারে কি না? কেহই বলিবেন না, যে বলা যাইতে পারে। যদি প্রথম জর্জ শাসিত ইংলণ্ডকে, বা আমাদিও শাসিত স্পেনকে পরাধীন বলা না গেল, তবে শাহ জাঁহা শাসিত ভারতবর্ষকে বা আলীবর্দ্দী শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বলি কেন?

দেখা যাইতেছে, যে শাসনকর্ত্তা ভিন্নজাতীয় হইলেই, রাজ্য পরতন্ত্র হইল

না। পক্ষান্তরে, শাসনকর্ত্তা স্বজাতীয় হইলেই রাজ্য যে স্বতন্ত্র হয় না, তাহারও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ওয়াশিংটনের কৃত যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকার শাসনকর্ত্তৃগণ, স্বজাতীয় ছিল। উপনিবেশ মাত্রেরই প্রথমাবস্থায় শাসনকর্ত্তা স্বজাতীয় হইয়া থাকে, কিন্তু সে অবস্থায় উপনিবেশ সকলকে কদাচ স্বতন্ত্র বলা যায় না।

তবে পরতন্ত্র কাহাকে বলি?

ইহা নিশ্চিত যে ইংরাজের অধীন আধুনিক ভারত পরতন্ত্র রাজ্য বটে। রোমকজিত, ব্রিটেন্ হইতে সিরিয়া পর্য্যন্ত রাষ্ট্র সকল পরতন্ত্র ছিল বটে। আলজিয়েরস্ বা জামেকা পরতন্ত্র রাজ্য বটে। কিসে এই সকল রাজ্য পরতন্ত্র? এ সকল এক একটি পৃথক রাজ্য নহে, ভিন্ন দেশবাসী রাজার রাজ্যের অংশ মাত্র। ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে থাকেন না—ভারতবর্ষের রাজা ভারতবর্ষে নাই। অন্যদেশে। যে দেশের রাজা অন্যদেশের সিংহাসনারূঢ় এবং অন্য দেশবাসী, সেই দেশ পরতন্ত্র।

দুইটি রাজ্যের এক রাজা হইলে তাহার একটি পরতন্ত্র, একটি স্বতন্ত্র। যে দেশে রাজা বাস করেন, সেইটি স্বতন্ত্র, যে দেশে বাস করেন না সেইটি পরতন্ত্র।

এইরূপ পরিভাষায় কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। ইংলণ্ডের প্রথম জেম্‌শ স্কটলণ্ড, ও ইংলণ্ড দুই রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, স্কটলণ্ড ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করিলেন। স্কটলণ্ড কি ইংলণ্ডকে রাজ্য দিয়া পরতন্ত্র হইল? বাবর শাহ, ভারত জয় করিয়া, দিল্লীতে সিংহাসন স্থাপন পূর্ব্বক, তথা হইতে পৈতৃক রাজ্য শাসিত করিতে লাগিলেন—তাঁহার স্বদেশ কি ভারতবর্ষের অধীন হইল? প্রথম জর্জ ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া তথায় অধিষ্ঠান করিয়া, পৈতৃক রাজ্য হ্যানোবর শাসিত করিতে লাগিলেন;—হ্যানোবর কি তখন পরতন্ত্র হইয়াছিল?

পরিভাষার অনুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, প্রথম জেম্‌স বা প্রথম জর্জ বা প্রথম মোগলের পূর্ব্বরাজ্যের পরতন্ত্রতা ঘটিয়াছিল। কিন্তু পারতন্ত্র ঘটিয়াছিল মাত্র, পরাধীনতা ঘটে নাই। আমরা Independence শব্দের পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্রতা, এবং Liberty শব্দের স্থানে স্বাধীনতা শব্দ এবং তত্তদভাব স্থানে তত্তদভাব সূচক শব্দ ব্যবহার করিতেছি।

তবে পারতন্ত্র্য এবং পরাধীনতার প্রভেদ কি? অথবা, স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার প্রভেদ কি?

ইংলণ্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতার এই অর্থ প্রচলিত আছে যে, যে রাজ্যের রাজা কর নির্দ্ধারণের কর্ত্তা নহে, প্রজাগণ করনির্দ্ধারণের কর্ত্তা, সেই রাজ্যের প্রজাই স্বাধীন, অন্যত্র নহে। যদি এই অর্থ গ্রহণ করা যায়, তবে ইংলণ্ড বহুকাল হইতে

স্বাধীন, এবং এক্ষণে অনেক ইউরোপীয় রাজ্য স্বাধীন, কিন্তু পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড ভিন্ন কোন ইউরোপীয় রাজ্য স্বাধীন ছিল না। আমরা সে অর্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য নহি—আমাদের উদ্দেশ্য সত্যানুসন্ধান, যাহাতে সত্য নির্ণয় হইবে, তাহাই করিব। তজ্জন্য যদি কোন শব্দ নূতন অর্থে ব্যবহার করিতে হয়, তাহাতেও আমরা সঙ্কুচিত হইব না।

ভিন্নদেশীয় লোক, কোন দেশে রাজা হইলে একটি অত্যাচার ঘটে। যাঁহারা রাজার স্বজাতি, দেশীয় লোকাপেক্ষা তাঁহাদিগের প্রাধান্য ঘটে। তাহাতে প্রজা পরজাতিপীড়িত হয়। যেখানে দেশীয় প্রজা, এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজার এইরূপ তারতম্য, সেই দেশকে পরাধীন বলিব। যে রাজ্য পরজাতিপীড়ন শূন্য তাহা স্বাধীন।

অতএব, পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে পারে। যথা প্রথম জর্জের সময়ে হানোবর, মোগলদিগের সময়ে কাবুল। পক্ষান্তরে কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে পারে, যথা নর্ম্মানদিগের সময়ে ইংলণ্ড ও ঔরঙ্গজেবের সময়ে ভারতবর্ষ। আমরা কুতবউদ্দিনের অধীন উত্তর ভারতবর্ষকে পরতন্ত্র ও পরাধীন বলি, আক্‌বরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি।

সে যাহাই হউক, প্রাচীন ভারত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; আধুনিক ভারতবর্ষ পরতন্ত্র ও পরাধীন। প্রথমে স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্য জন্য যে বৈষম্য ঘটিতেছে, তাহার আলোচনা করা যাউক—পশ্চাৎ স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কথা বিবেচনা করা যাইবে। রাজা অন্য দেশবাসী হইলে দুইটি মাত্র অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা, প্রথম, রাজা দূরে থাকিলে সুশাসনের বিঘ্ন হয়। দ্বিতীয়, রাজা যে দেশে অধিষ্ঠান করেন, সেই দেশের প্রতি তাঁহার অধিক আদর হয়, তাহার মঙ্গলার্থ দূরস্থ রাজ্যের অমঙ্গলও করিয়া থাকেন। এই দুইটি দোষ যে আধুনিক ভারতবর্ষে ঘটিতেছে না, এমত নহে। মহারাণী বিক্টোরিয়ার সিংহাসন দিল্লী বা কলিকাতায় স্থাপিত হইলে, ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী উৎকৃষ্টতর হইত তাহার সন্দেহ নাই, কেন না যাহা রাজার নিকটবর্ত্তী তাহার প্রতি রাজপুরুষদিগের অধিক মনোযোগ হয়। দ্বিতীয় দোষটিও ঘটিতেছে। ইংলণ্ডের গৌরবার্থ আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ হইল, ব্যয়ের দায়ী ভারতবর্ষ। "হোমচার্জেস" বলিয়া যে ব্যয় বজেটভুক্ত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলিই এইরূপ ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের ক্ষতি স্বীকার। এইরূপ অনেক আছে।

রাজা দূরস্থিত বলিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের সুশাসনের বিঘ্ন ঘটে বটে, কিন্তু তেমন রাজা স্বেচ্ছাচারী বলিয়া সুশাসনের যে সকল বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা ঘটে না। কোন রাজা, ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র,—অন্তঃপুরেই বাস করেন, রাজ্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল। কোন রাজা নিষ্ঠুর, কোন রাজা অর্থগৃধ্নু। প্রাচীন ভারতবর্ষে এ সকলে

গুরুতর ক্ষতি জন্মিত। আধুনিক ভারতবর্ষে দূরস্থিত রাজা বা রাজ্ঞীর কোন প্রকার দোষ ঘটিলে তাহার ফল, ভারতবর্ষে ফলিবার সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয়, যেমন আধুনিক ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য, ভারতবর্ষের মঙ্গল কখন কখন নষ্ট হয়, তেমনি প্রাচীন ভারতে রাজার আত্মসুখের জন্য রাজ্যের মঙ্গল নষ্ট হইত। পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্রের কন্যা হরণ করিয়া আত্মসুখ বিধান করিলেন, তাহাতে উভয় মধ্যে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া, উভয়ের অপ্রীতি ও তেজোহানি ঘটিতে লাগিল। তন্নিবন্ধন উভয়েই মুসলমানের হস্তে পতিত হইলেন। আধুনিক ভারতবর্ষে দূরবাসী রাজার আত্মসুখের অনুরোধে কোন অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু এটি কেবল পরতন্ত্রতা সম্বন্ধে উক্ত হইল, আমরা পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতায় প্রভেদ করিয়াছি। ভারতবর্ষে ইংরাজের প্রাধান্য, এবং দেশীয় প্রজা সকল তাঁহাদিগের নিকট অবনত, তাঁহাদিগের সুখের জন্য কিয়দংশে যে ভারতবাসীদিগের সুখের লাঘব ঘটিয়া থাকে, তাহা এদেশীয় কোন লোকেই অস্বীকার করিবেন না। এরূপ জাতির উপর জাতির পীড়ন প্রাচীন ভারতে ছিল না। ছিল না বটে, কিন্তু তত্তুল্য বর্ণপীড়ন ছিল। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, যে চিরকালই ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজা শূদ্র; উৎকৃষ্ট বর্ণত্রয় শূদ্রের তুলনায় অল্পসংখ্যক ছিলেন। সেই বর্ণত্রয়ের মধ্যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেশের শাসনকর্ত্তা। কিন্তু এসকল কথা একটু সবিস্তারে লেখা আবশ্যক হইল।

লোকের বিশ্বাস আছে যে, প্রাচীন ভারতে কেবল ক্ষত্রিয়ই রাজা ছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে, রাজকার্য্য দুই অংশে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধাদির ভার ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি ছিল; রাজব্যবস্থা নির্ব্বাচন, বিচার, ইত্যাদি কার্য্যের ভার ব্রাহ্মণের উপর ছিল। এক্ষণে যেমন সিবিল ও মিলিটরি এই দুই অংশে রাজকার্য্য বিভক্ত, তখনকার কর্ম্মভাগ কতকটা সেইরূপই ছিল। ব্রাহ্মণেরা সিবিল কর্ম্মচারী, ক্ষত্রিয়েরা মিলিটরি। এখনও যেমন মিলটরি অপেক্ষা সিবিল কর্ম্মচারীদিগের প্রাধান্য, তখনও সেইরূপ ছিল; রাজপুরুষদিগের মধ্যে, ক্ষত্রিয়েরাই রাজা নাম ধারণ করিতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদিগের উপরেও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়েরাই সর্ব্বদা রাজা ছিলেন এমত নহে। বোধ হয় আদ্য কালে, ক্ষত্রিয়েরাই রাজা ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধকালে মৌর্য্য প্রভৃতি সঙ্কর জাতীয় রাজবংশ দেখা যায়। চীন পরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ সিন্ধু পারে ব্রাহ্মণ রাজা দেখিয়া গিয়াছিলেন। অন্যত্রও ব্রাহ্মণেরা রাজা নাম ধারণ করিয়াছিলেন। মধ্যকালে অধিকাংশ রাজাই রাজপুত। রাজপুতেরা ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত সঙ্করজাতি মাত্র। ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য, প্রাচীন ভারতে চিরকাল অপ্রতিহত ছিল না; ব্রাহ্মণ-

দিগের গৌরব এক দিনের জন্য লঘু হয় নাই। বেদদ্বেষী বৌদ্ধদিগের সময়েও রাজকার্য্য ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে অন্য হস্তে যায় নাই—কেননা তাঁহারাই পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, এবং কার্য্যক্ষম। অতএব প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাই প্রকৃতরূপে রাজপুরুষ পদে বাচ্য। সুবিজ্ঞ লেখক, বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গাল মাগাজিনে একটি প্রবন্ধে যথার্থই লিখিয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মণেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ ছিলেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে আধুনিক ভারতবর্ষে দেশী বিলাতিতে যে বৈষম্য, তাহা প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বৈষম্যের অপেক্ষা কি গুরুতর?

রাজা ভিন্নজাতীয় হইলে যে জাতি পীড়া জন্মে, তাহা দুই প্রকারে ঘটে। এক রাজব্যবস্থা জনিত; আইনে বিধি থাকে, যে রাজার স্বজাতীয়গণের পক্ষে এই এইরূপ ঘটিবেক, দেশীয় লোকের পক্ষে অন্য প্রকার ঘটিবেক। দ্বিতীয়, স্বজাতিপক্ষপাতী রাজার ইচ্ছা জনিত; রাজপ্রসাদ, রাজা স্বজাতিকে দিয়া থাকেন। এবং তিনি স্বজাতিপক্ষপাতী বলিয়া রাজ্যের কার্য্যে স্বজাতিকেই নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ইংরাজশাসিত ভারতে, এবং ব্রাহ্মণশাসিত ভারতে এই দুইটি দোষ কি প্রকার বর্ত্তমান ছিল দেখা যাউক।

১ম। ইংরেজদিগের কৃত রাজব্যবস্থানুসারে, দেশী অপরাধীর জন্য এক বিচারালয়, বিলাতী অপরাধীর জন্য অন্য বিচারলয়। দেশী লোক ইংরেজ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু ইংরেজ দেশী বিচারক কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না। ইহা ভিন্ন ব্যবস্থাগত বৈষম্য আর বড় নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষা কত গুরুতর বৈষম্য ব্রাহ্মণ রাজ্যে দেখা যায়! ইংরেজের জন্য পৃথক্ বিচারালয় হউক, কিন্তু আইন পৃথক্ নহে। যেমন একজন দেশীয় লোক ইংরেজ বধ করিলে বধার্হ, ইংরেজ, দেশী লোককে বধ করিলে, আইন অনুসারে সেইরূপ বধার্হ। কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজ্যে শূদ্রহন্তা ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণহন্তা শূদ্রের দণ্ডের কত বৈষম্য! কে বলিবে, এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষ নিকৃষ্ট।

ইংরেজের রাজ্যে যেমন ইংরেজ দেশী লোক কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না, প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ ব্রাহ্মণ শূদ্রকর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারিত না। বাবু দ্বারকানাথ মিত্র, প্রধানতম বিচারালয়ে বসিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন—"রামরাজ্যে" তিনি কোথা থকিতেন?

২য়। ইংরেজের রাজ্যে রাজপ্রসাদ প্রায় ইংরেজেরই প্রাপ্য। কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে দেশীয়েরাও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণরাজ্যে শূদ্রদিগের ততটা ঘটিত কি না সন্দেহ। কিন্তু যখন শূদ্র, কখন কখন রাজ-সিংহাসনারোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তখন অন্যান্য উচ্চ পদও যে শূদ্রেরা সময়ে সময়ে অধিকৃত

করিত তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক ভারতে প্রাথমিক বিচার কার্য্য প্রায় দেশীয় লোকের দ্বারাই হইয়া থাকে,—প্রাচীন ভারতে কি প্রাথমিক বিচার কার্য্য শূদ্রের দ্বারা হইত? আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত অল্পই জানি যে একথা স্থির বলিতে পারি না। অনেক বিচার কার্য্য গ্রাম্য সমাজের দ্বারা নির্ব্বাহ হইত বোধ হয়। কিন্তু সাধারণতঃ কি বিচার, কি সৈনাপত্য, কি অন্যান্য প্রধান পদ সকল যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীয়ের হস্তে ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে বোধ হয়।

অনেকেই বলিবেন, ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রীয়ের প্রাধান্যে সাদৃশ্য কল্পনা সুকল্পনা নহে, কেন না ব্রাহ্মণ ক্ষত্রীয় শূদ্রপীড়ক হইলেও স্বজাতি—ইংরেজেরা ভিন্নজাতি। ইহার এইরূপ উত্তর দিতে ইচ্ছা করে যে, যে পীড়িত হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন, ও ভিন্ন জাতির পীড়ন উভয়ই সমান। স্বজাতীয়ের হস্তে পীড়া কিছু মিষ্ট, পরজাতীয়ের কৃত পীড়া কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না। কিন্তু আমরা সে উত্তর দিতে চাহি না। যদি স্বজাতীয়ের কৃত পীড়ায় কাহারও প্রীতি থাকে, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। আমাদিগের এই মাত্র বলিবার উদ্দেশ্য, যে আধুনিক ভারতের জাতিপ্রাধান্যের স্থানে প্রাচীন ভারতে বর্ণ প্রাধান্য ছিল। অধিকাংশ লোকের পক্ষে উভয়ই সমান।

তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকে স্বীয়বুদ্ধি, শিক্ষা, বংশ, এবং মর্য্যাদানুসারে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন না। যাহার বিদ্যা এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যদি বুদ্ধি সঞ্চালনের এবং বিদ্যার ফলোৎপত্তির স্থল না দেওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভারতবর্ষে এরূপ ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণ বৈষম্য গুণে তাহাও ছিল, কিন্তু এ পরিমাণে ছিল না। আর এক্ষণে রাজকার্য্যাদি সকল ইংরেজের হস্তে—আমরা পরহস্তরক্ষিত হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারিতেছি না। তাহাতে আমাদিগের রাজ্যরক্ষা, রাজ্যপালন বিদ্যা শিক্ষা হইতেছে না—জাতীয় গুণের স্ফুর্ত্তি হইতেছে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরাধীনতা একদিকে উন্নতিরোধক। তেমন, আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করিতেছি। ইউরোপীয় জাতির অধীন না হইলে আমাদিগের কপালে এ সুখ ঘটিত না। অতএব আমাদিগের পরাধীনতায় যেমন একদিগে ক্ষতি, তেমন আর একদিগে উন্নতি হইতেছে।

অতএব ইহাই বুঝা যায় যে, আধুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীর লোকের স্বাধীনতা জনিত কিছু সুখ ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় দুই তুল্য, বরং আধুনিক ভারতবর্ষ ভাল।

তুলনার প্রথম তত্ত্বে আমরা যাহা বলিলাম, তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি, অনেকের বুঝিবার সুবিধা হইবে।

১। ভিন্ন জাতীয় রাজা হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র বা পরাধীন হইল না।

ভিন্ন জাতীয় রাজার অধীন রাজ্যকেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলা যাইতে পারে।

২। স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা, পরতন্ত্রতা ও পরাধীনতা, ইহার আমরা ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছি।

বিদেশ নিবাসি রাজাধিকৃত রাজ্য পরতন্ত্র। যেখানে ভিন্নজাতির প্রাধান্য, সেই রাজ্য পরাধীন। অতএব কোন রাজ্য পরতন্ত্র অথচ পরাধীন নহে। কোন রাজ্য স্বতন্ত্র অথচ স্বাধীন নহে। কোন রাজ্য পরতন্ত্র এবং পরাধীন।

৩। প্রাচীন ভারতবর্ষ একান্ততঃ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ছিল না; আধুনিক ভারত একান্ততঃ পরতন্ত্র বা পরাধীন নহে। তবে প্রাচীন ভারত সাধারণতঃ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, এবং আধুনিক ভারতবর্ষ সাধারণতঃ পরতন্ত্র এবং পরাধীন।

৪। কিন্তু তুলনার উদ্দেশ্য উৎকর্ষাপকর্ষ। যে রাজ্যে লোক সুখী তাহাই উৎকৃষ্ট, যে রাজ্যে লোক দুঃখী তাহাই অপকৃষ্ট। স্বাতন্ত্র্যে ও স্বাধীনতায় প্রাচীন ভারতে প্রজা কি পরিমাণে সুখী এবং পারতন্ত্র্যে ও পরাধীনতায় আধুনিক ভারতে প্রজা কি পরিমাণে দুঃখী তাহাই বিবেচ্য।

৫। প্রথমতঃ স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্য। ইহার অন্তর্গত দুইটি তত্ত্ব। প্রথম, রাজা বিদেশস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষের সুশাসনের বিঘ্ন হইতেছে কি না? স্বদেশের মঙ্গলার্থ শাসনকর্ত্তৃগণ এদেশের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন কি না। স্বীকার করিতে হইবে যে, তত্তৎকারণে সুশাসনের বিঘ্ন ঘটিতেছে বটে এবং ভারতবর্ষের অমঙ্গল ঘটিতেছে বটে।

কিন্তু রাজার চরিত্রদোষে যে সকল অনিষ্ট ঘটিত, আধুনিক ভারতবর্ষে তাহা ঘটে না। অতএব প্রাচীন বা আধুনিক ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না।

৬। দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীনতা ও পরাধীনতা। আধুনিক ভারতবর্ষ প্রভুগণ পীড়িত বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতও বড় ব্রাহ্মণ পীড়িত ছিল। সে বিষয়ে বড় ইতরবিশেষ নাই। তবে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রীয়ের একটু সুখ ছিল।

৭। আধুনিক ভারতে কার্য্যগত জাতীয় শিক্ষা লোপ হইতেছে, কিন্তু বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চ্চার অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি হইতেছে।

অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতা তুল্য? তবে পৃথিবীর তাবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করে কেন? যাঁহারা এরূপ বলিবেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, আমরা সে তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত

নহি। আমরা পরাধীন জাতি—অনেক কাল পরাধীন থাকিব—সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের কেবল ইহাই উদ্দেশ্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু, তদ্বাসিগণ সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয় প্রজাদিগের অপেক্ষা সুখী ছিল কি না ? আমরা এই মীমাংসা করিয়াছি, যে অধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে। একটি বিষয়ের এই ফল, বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিলাম। পশ্চাৎ অন্যান্য বিষয়ের সমালোচনা করিব।

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার কত দিন হইতে? চিরকাল নহে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এক প্রকার স্থির করিয়াছেন, যে আর্য্য জাতিয়েরা ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহে। তাঁহারা বলেন যে, ইরাণ বা তৎ সন্নিহিত কোন স্থানে আর্য্য জাতিয়দিগের আদিম বাস। তথা হইতে তাঁহারা নানা দেশে গিয়া বসতি করিয়াছেন। এবং তথা হইতেই ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন। প্রথম কালে, আর্য্য জাতি কেবল পঞ্জাব মধ্যে বসতি করিতেন। তথা হইতে ক্রমে পূর্ব্বদেশ জয় করিয়া অধিকার করিয়াছেন।

যে সকল প্রমাণের উপর এই সকল কথা নির্ভর করে, তাহা সুশিক্ষিত মাত্রেই অবগত আছেন, এবং সুক্ষিত মাত্রেরই নিকট সে সকল প্রমাণ গ্রাহ্য হইয়াছে। অতএব তাহার কোন বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হইব না। যদি আর্য্যজাতীয়েরা উত্তর পশ্চিম হইতে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বভাগে আসিয়াছিলেন, তবে ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য যে অনেক পরে বঙ্গদেশে আর্য্যজাতীয়েরা আসিয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্য ক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥

এই বচন মনুসংহিতোদ্ধৃত। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যৎকালে মানব ধর্ম্মশাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছিল, তৎকালে বঙ্গদেশ শুদ্ধাচারবিশিষ্ট পুণ্য প্রদেশের মধ্যে গণ্য হইত না। অথচ আর্য্যাবর্ত্তের একাংশ বলিয়া গণিত হইত। কেননা ঐ বচনদ্বয়ের কিছু পরেই মনুতে আছে যে,

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়ো রেবান্তরং গির্য্যো * রার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥

* বিন্ধ্যাচল ও হিমবৎ।

কিন্তু বঙ্গদেশ, তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তের অংশ মধ্যে গণনীয় হইলেও তথায় আর্য্যধর্ম্ম প্রচলিত ছিল এমত বোধ হয় না। কেননা মনু সংহিতায় অন্যত্র আছে,

শানকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেনচ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্র দ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চৈনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥

এক্ষণে যাহাকে বঙ্গদেশ বলা যায়, তাহার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ পৌণ্ড্র নামে খ্যাত ছিল। যে অংশ মধ্যে কলিকাতা, বর্দ্ধমান, মুরশীদাবাদ, তাহা সেই অংশের অন্তর্গত। যাঁহারা সবিশেষ অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা উইলসন কৃত বিষ্ণু-পুরাণানুবাদের প্রদেশ তত্ত্ববিষয়ক পরিচ্ছেদটি দেখিবেন। বঙ্গ, পুণ্ড্র হইতে একটি পৃথক্ রাজ্য ছিল। এক্ষণে বাঙ্গালীতে ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলকেই "বঙ্গদেশ" বলে—সেই প্রদেশকেই প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ বলিত। কিন্তু অগ্রে পুণ্ড্র, পরে বঙ্গ। মহাভারতের সভাপর্ব্বে আছে, ভীম দিগ্বিজয়ে আসিয়া পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব এবং কৌশিকীকচ্ছবাসী মনৌজা রাজা এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ ভারতবর্ষে এই পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র দেশে আসিয়াছিলেন। সেই দেশের রাজধানীর নাম পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। জেনেরল কানিঙ হাম বলেন, যে আধুনিক পাবনাই প্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। বোধ হয় মালদহের অন্তঃপাতী পাণ্ডুয়া নামক গ্রামের অস্তিত্ব তিনি অবগত নহেন। এই পাণ্ডুয়াই যে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, এমত বিবেচনা করিবার বিশেষ কারণ আছে।

অতএব আধুনিক বঙ্গদেশের প্রধানাংশকে পূর্ব্বে পৌণ্ড্রদেশ বলিত। মনুর শেষোদ্ধৃত বচনে বোধ হইতেছে যে, তখন এ দেশে ব্রাহ্মণের আগমন হয় নাই, বা আর্য্যজাতি আইসে নাই। ইহা বলা যাইতে পারে যে, যেখানে পৌণ্ড্রদিগকে লুপ্তক্রিয় ক্ষত্রীয় মাত্র বলা হইতেছে, সেখানে এমত বুঝায় না যে, যখন মনুসংহিতা সঙ্কলন হয়, তখন বঙ্গদেশে আর্য্যজাতি আইসে নাই। বরং ইহাই বলা যাইতে পারে যে, তাহার বহুপূর্ব্বে ক্ষত্রিয়েরা এ দেশে আসিয়া আচারভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। যদি তাহা বলা যায়, তবে চীন, তাতার, পারস্য, এবং গ্রীস সম্বন্ধেও তাহা বলিতে হইবে, কেন না পৌণ্ড্রগণ সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, চৈন, শক, পহ্লব, এবং যবন সম্বন্ধেও তাহা কথিত হইয়াছে। মনু শক, যবন, পহ্লব, (কেহ লিখেন পহ্লব) এবং চৈনদিগকে যে শ্রেণী ভুক্ত করিয়াছেন, এতদ্দেশবাসী পৌণ্ড্র-দিগকে সেই শ্রেণীতে ফেলিয়া ছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, মনুসংহিতা সঙ্কলন কালে বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণবিহীন, অনার্য্য জাতির বাসস্থান ছিল।

সমুদ্রতীর হইতে পদ্মা পর্য্যন্ত প্রদেশে, এক্ষণে বহুসংখ্যক পুঁড়া ও পোদ জাতীয়ের বাস আছে। পুঁড়া শব্দটী পুণ্ড্র শব্দের অপভ্রংশ বোধ হয়; পোদ শব্দও তাহাই বোধ হয়। অতএব এই পুঁড়া ও পোদ জাতীয়দিগকে সেই পৌণ্ড্রদিগের বংশ বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহাদিগের মস্তকাদির গঠন তুরাণী, ককেশীয় নহে। তবে ককেশীয়দিগের সহিত মিশিয়া কতক কতক তদনুরূপ হইয়াছে। জাতিবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, ভারতবর্ষের আদিম বাসীরা সকলেই তুরাণীয় ছিল; আর্য্যেরা তাহাদিগকে পরাস্ত করায় তাহারা কতক কতক বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশ আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। আধুনিক কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি সেই আদিম জাতি। আর কতক গুলিন, জেতাদিগের আশ্রয়েই তাহাদিগের নিকট অবনত হইয়া রহিল। আধুনিক অনেক অপবিত্র হিন্দুজাতি তাহাদিগেরই বংশ। পুঁড়া এবং পোদগণকে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত বোধ হয়।

শতপথ ব্রাহ্মণে আছে;

"বিদেঘো মাথবোঽগ্নিং বৈশ্বানরং মুখে বভার তস্য গোতমো রাহূগণ ঋষিঃ পুরোহিত আস তস্মৈ হ স্মা মন্ত্র্যমানো ন প্রতিশৃণোতি নেন্মেঽগ্নি বৈশ্বানরো মুখান্নিষ্পদ্যাতা ইতি তমৃগ্‌ভির্হ্বয়িতুং দধ্রে। বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি। অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে বিদেঘেতি। স ন প্রতিশুশ্রাব।—উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্তইরতে। তব জ্যোতীংষ্যর্চয়ো বিদেঘা ইতি। সহ নৈব প্রতিশুশ্রাব। তংত্বা ধৃত স্নবীমহ ইত্যেবাভিব্যাহার দধাস্য ধৃতকীর্ত্তাবেবাগ্নি বৈশ্বানরো মুখাদুজ্জজ্বাল তং ন শশাক ধারয়িতুং সোঽস্য মুখান্নিষ্পেদে স ইমাং পৃথিবীং প্রপেদে। তর্হি বিদেঘো মাথব আস সরস্বত্যাং। স তত এব প্রাঙ্ দহন্নভীয়ায়েমাং পৃথিবীম্। তং গৌতমশ্চ রাহূগণো বিদেঘশ্চ মাথবো পশ্চাদ্ দহন্তম্ অন্বীয়তুঃ। স ইমাঃ সর্ব্বা নদীরতি দদাহ। সদানীরেত্যুত্তরাদ্ গিরের্নির্ধাবতি তাং হৈব নাতিদদাহ তাং হ স্ম তাং পুরা ব্রাহ্মণা ন তরন্তি অনতিদগ্ধা অগ্নিনা বৈশ্বানরেণেতি। তত এতর্হি প্রাচীনং বহবো ব্রাহ্মণাঃ। তদ্ হ অক্ষেত্রতরমিবাস স্রাবিতরমিব অস্বদিতমগ্নিনা বৈশ্বানরেণেতি। তদুহৈতর্হি ক্ষেত্রতরমিব ব্রাহ্মণা উ হি নূনমেনদ্ যজ্ঞৈরসিষ্বদন্। সাপি জঘন্যে নৈদাঘে সমিবৈব কোপয়তি তাবৎ সীতাঽনতি দগ্ধা হ্যগ্নিনা বৈশ্বানরেণ। স হোবাচ বিদেঘো মাথবঃ কাহং ভবানি ইতি। অত এব তে প্রাচীনং ভুবনমিতি হোবাচ। সৈষাপি এতর্হি কোশল বিদেহানাং-মর্য্যাদা তে হি মাথবাঃ।"

এক্ষণে সদানীরা নামে কোন নদী নাই। কিন্তু হেমচন্দ্রাভিধানে এবং অমর কোষে করতোয়া নদীর নাম সদানীরা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু দেখা

যাইতেছে যে, সে এ সদানীরা নদী নহে, কেননা শতপথ ব্রাহ্মণেই কথিত হইয়াছে, যে এই নদী কোশল (অযোধ্যা) এবং বিদেহ রাজ্যের (মিথিলা) মধ্যসীমা।

ইহাতে এই নিশ্চিত হইতেছে যে, অতি পূর্ব্বকালে মিথিলাতে ব্রাহ্মণ আসে নাই, কিন্তু যখন শতপথ ব্রাহ্মণ (ইহা বেদান্তর্গত) সঙ্কলিত হয়, তখন মিথিলায় ব্রাহ্মণ বাস করিত। শতপথ ব্রাহ্মণ প্রণয়নের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই আর্য্যগণ মিথিলাতে বাস করিত, সন্দেহ নাই, কেননা ঐ ব্রাহ্মণে বিদেহাধিপতি জনক সম্রাট্ বলিয়া বাচ্য হইয়াছেন। নবীন রাজ্যের রাজা প্রাচীনদিগের নিকট সম্রাট্ নাম লাভ করিবার সম্ভাবনা কি? যখন মিথিলায় এতকাল হইতে ব্রাহ্মণের বাস, তখন যে ব্রাহ্মণেরা তথা হইতে আধুনিক বাঙ্গালার উত্তরাংশে বিস্তৃত হয়েন নাই, এমত বোধও হয় না। তবে সে সময়ে বঙ্গদেশ স্পৃহণীয় বাসস্থান ছিল না, অথবা একেবারেই বা বাসযোগ্য ছিল না এমত কেহ কেহ বলিতে পারেন। ভূতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশ ছিল না; হিমালয়ের মূল-পর্য্যন্ত সমুদ্র ছিল। অদ্যাপি সমুদ্রবাসী জীবের দেহাবশেষ হিমালয় পর্ব্বতে পাওয়া গিয়া থাকে। কি প্রকারে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মুখানীত কর্দ্দমে বঙ্গদেশ সৃষ্টি তাহা সর চার্লস্‌লায়েম প্রণীত "Principles of Geology" নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেই আছে সদানীরা নদীর পরপারস্থিত প্রদেশ জলপ্লুত। "স্রাবিতর" শব্দে প্লবনীয় ভূমিই বুঝায়। যদি তখন, ত্রিহুৎ প্রদেশের এই দশা, তবে অপেক্ষাকৃত নবীন বঙ্গভূমি সুন্দরবনের মত অবস্থাপন্ন ছিল। কিন্তু সে সময়ে যে এদেশে মনুষ্যের বাস ছিল, ঐ শতপথ ব্রাহ্মণেই তাহার প্রমাণ আছে। ঐ পৌণ্ড্রেরাই তথায় বাস করিত। যথা, "অন্তান্ বঃ প্রজা তক্ষিষ্ট ইতি। ত এতে অন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দাঃ মূতিবাঃ ইতি উদন্ত্যাঃ বহবো ভবন্তি।" মহাভারতে সভাপর্ব্বে প্রাগুক্ত স্থানেই আছে যে ভীম পুণ্ড্র, বঙ্গাদি জয় করিয়া তাম্রলিপ্ত, এবং সাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছদিগকে জয় করিলেন। অতএব তৎকালে এদেশ আসমুদ্র জনাকীর্ণ ছিল। কিন্তু তথায় যে আর্য্যজাতির বাস ছিল এমত প্রমাণ মহাভারতে নাই। পুণ্ড্ররাজের নাম বাসুদেব। আর্য্যবংশীয় নহিলে এ নাম সম্ভবে না। কিন্তু নাম কবির কল্পিত বলিয়া বোধ করাই উচিত। যদি বল, ঐ স্থলেই অনার্য্যজাতিগণকে সমুদ্র তীরবাসী ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে পুণ্ড্রাদিজাতি ম্লেচ্ছ নহে; সুতরাং তাহারা আর্য্যজাতি। ইহার উত্তর এই যে ম্লেচ্ছ না হইলে আর্য্যজাতি হইল এমত নহে। ম্লেচ্ছ একটি অনার্য্যজাতি মাত্র; যবনাদি আর আর জাতি তাহা হইতে ভিন্ন। যথা মহাভারতের আদিপর্ব্বে—

যদোস্তু যাদবা জাতা স্তুর্ব্বসোর্যবনাঃ স্মৃতাঃ
দ্রুহ্যোঃ সুতাস্তু বৈভোজাঃ অনোস্তু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ

বরং ঐ মহাভারতেই পুণ্ড অনার্য্যজাতি মধ্যে গণিত হইয়াছে, যথা

যবনাঃ কিরাতাঃ গান্ধারাশ্চৈনাঃ শাবরবর্ব্বরাঃ
শকাস্তুষারাঃ কঙ্কাশ্চ পহ্লবাশ্চন্দ্রমদ্রকাঃ
পৌণ্ড্রাঃ পুলিন্দা রমঠাঃ কাম্বোজা শ্চৈবসর্ব্বশঃ

অতএব এই পর্য্যন্ত সিদ্ধ, যে যখন শতপথ ব্রাহ্মণ প্রণীত হয় তখন এ দেশে আর্য্য জাতির অধিকার হয় নাই, যখন মনুসংহিতা সঙ্কলিত হয় তখনও হয় নাই, এবং যখন মহাভারত প্রণীত হয়, তখন হয় নাই। ইহার কোন খানি কোন কালে সঙ্কলিত বা প্রণীত হয়, তাহা পণ্ডিতেরা এ পর্য্যন্ত নিশ্চিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা সিদ্ধ যে যখন ভারতে বেদ, স্মৃতি এবং ইতিহাস সঙ্কলিত হইতেছিল, তখন এদেশ ব্রাহ্মণ শূন্য অনার্য্য ভূমি। খ্রীষ্টের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বা তদ্বৎ কোন কালে এদেশে আর্য্যজাতির অধিকার হইয়াছিল, বলিলে কি অন্যায় হইবে? তাহা বলা যায় না।

মহাবংশ নামক সিংহলীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থে প্রকাশ যে, বঙ্গদেশ হইতে এক-জন রাজপুত্র গিয়া সিংহলে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। আমরা যে সিদ্ধান্ত করিলাম, মহাবংশের একথায় তাহার খণ্ডন হইতেছে না। বরং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বঙ্গীয় আর্য্যগণ অতি অল্পকাল মধ্যে বিশেষ উন্নতিশীল হইয়াছিলেন। হণ্টর সাহেব, প্রাচীন বঙ্গীয়দিগের নৌগমন পটুতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, একথা তাহারই পোষক হইতেছে। এবিষয়ে আমাদিগের অনেক কথা বাকি রহিল, অবকাশ হয় ত পশ্চাৎ বলিব।
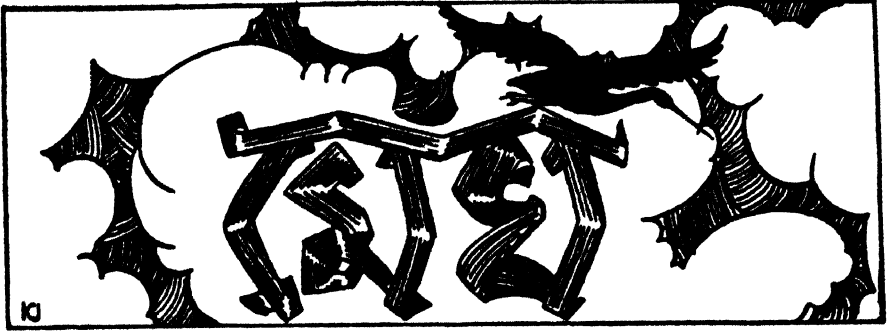
আমি বৃষ্টি করিব না। কেন বৃষ্টি করিব? বৃষ্টি করিয়া আমার কি সুখ? বৃষ্টি করিলে তোমাদের সুখ আছে। তোমাদের সুখে আমার প্রয়োজন কি?

দেখ, আমার কি যন্ত্রণা নাই? এই দারুণ বিদ্যুদগ্নি আমি অহরহ হৃদয়ে ধারণ করিতেছি। আমার হৃদয়ে সেই সুহাসিনীর উদয় দেখিয়া তোমাদের চক্ষু আনন্দিত হয়, কিন্তু ইহার স্পর্শ মাত্রে তোমরা দগ্ধ হও। সেই অগ্নি আমি হৃদয়ে ধরি! আমি ভিন্ন কাহার সাধ্য এ আগুন হৃদয়ে ধারণ করে?

দেখ, বায়ু আমাকে সর্ব্বদা অস্থির করিতেছে। বায়ুর দিগ্‌বিদিগ বোধ নাই, সকল দিক হইতে বহিতেছে! আমি যাই জলভারগুরু তাই বায়ু আমাকে উড়াইতে পারে না।

তোমরা ভয় করিও না, আমি এখনই বৃষ্টি করিতেছি—পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে। আমার পূজা দিও।

আমার গর্জ্জন অতি ভয়ানক—তোমরা ভয় পাইও না। আমি যখন মন্দ-গম্ভীরে গর্জ্জন করি, বৃক্ষপত্র সকল কম্পিত করিয়া, শিখিকুলকে নাচাইয়া, মৃদু গম্ভীর গর্জ্জন করি, তখন ইন্দ্রের হৃদয়ে মন্দার মালা দুলিয়া উঠে, নন্দসূনুশির্ষকে শিখিপুচ্ছ কাঁপিয়া উঠে, পর্ব্বত গুহায় মুখরা প্রতিধ্বনি হাসিয়া উঠে। আর বৃত্র নিপাত কালে, বজ্র সহায় হইয়া যে গর্জ্জন করিয়াছিলাম সে গর্জ্জন শুনিতে চাহিও না—ভয় পাইবে।

বৃষ্টি করিব বৈকি? দেখ, কত নবযূথিকাদাম, আমার জলকণার আশায় ঊর্দ্ধমুখী হইয়া আছে। তাহাদিগের শুভ, সুবাসিত, বদনমণ্ডলে স্বচ্ছ বারিনিসেক, আমি না করিলে কে করে?

বৃষ্টি করিব বৈকি? দেখ, তটিনীকূলের দেহের এখনও পুষ্টি হয় নাই। তাহারা যে আমার প্রেরিত বারি রাশিপ্রাপ্ত হইয়া, পরিপূর্ণ হৃদয়ে, হাসিয়া

হাসিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, কল কল শব্দে উভয় কূল প্রতিহত করিয়া, অনন্ত সাগরাভিমুখে ধাবিতা হইতেছে, ইহা দেখিয়া কাহার না বর্ষিতে সাধ করে?

আমি বৃষ্টি করিব না। দেখ, ঐ পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক, আমারই প্রেরিত বারি, নদী হইতে কলসী পূরিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং "পোড়া দেবতা একটু ধরণ করে না" বলিয়া আমাকেই গালি দিতেছে। আমি বৃষ্টি করিব না।

দেখ, কৃষকের ঘরে জল পড়িতেছে বলিয়া আমায় গালি দিতেছে। নহিলে সে কৃষক কেন? আমার জল না হইলে তাহার চাস হইত না—আমি তাহার জীবনদাতা। ভদ্র, আমি বৃষ্টি করিব না।

সেই কথাটি মনে পড়িল,

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরশ্চাতকস্তে সগর্ব্বঃ।

কালিদাসাদি যেখানে আমার স্তাবক সেখানে আমি বৃষ্টি করিব না কেন?

আমার ভাষা শেলি বুঝিয়াছিল, যখন বলি I bring fresh showers for the thirsting flowers, তখন সে গম্ভীরা বাণীর মর্ম্ম শেলি নহিলে কে বুঝিবে? কেন জান? সে আমার মত হৃদয়ে বিদ্যুদগ্নি বহে। প্রতিভাই তাহার বিদ্যুৎ।

আমি অতি ভয়ঙ্কর। যখন অন্ধকার কৃষ্ণকরাল রূপ ধারণ করি, তখন আমার ভ্রূকুটি কে সহিতে পারে? এই যে আমার হৃদয়ে কালাগ্নি বিদ্যুৎ, তখন পলকে পলকে ঝলসিতে থাকে। আমার নিঃশ্বাসে, স্থাবর জঙ্গম উড়িতে থাকে; আমার রবে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়।

আবার আমি কেমন মনোরম! যখন পশ্চিমগগনে, সন্ধ্যাকালে, লোহিত ভাস্করাঙ্কে বিহার করিয়া স্বর্ণতরঙ্গের উপর স্বর্ণ তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করি, তখন কে না আমায় দেখিয়া ভুলে? জ্যোৎস্না পরিপ্লুত আকাশে মন্দ পবনে আরোহণ করিয়া, কেমন মনোমোহন মূর্ত্তি ধরিয়া আমি বিচরণ করি। শুন পৃথিবীবাসিনীগণ! আমি বড় সুন্দর, তোমরা আমাকে সুন্দর বলিও।

আর একটা কথা আছে, তাহা বলা হইলেই, আমি বৃষ্টি করিতে যাই। পৃথিবীতলে একটী পরম গুণবতী কামিনী আছে, সে আমার মনোহরণ করিয়াছে। সে পর্ব্বত গুহায় বাস করে, তাহার নাম প্রতিধ্বনি। আমার সাড়া পাইলেই সে আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করে। বোধ হয় আমায় ভালবাসে। আমিও তাহার আলাপে মুগ্ধ হইয়াছি। তোমরা কেহ সম্বন্ধ করিয়া আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে পার?

সরোজিনী নাটক। শ্রীরাধানাথ বর্দ্ধন প্রণীত। ও শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, আই, সি বসু ১৮৭৩।

বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দে বিজ্ঞাপনে ইহাকে "যৎসামান্য নাটক খণ্ড" বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা "যৎসামান্য" বটে। ইহার কোন গুণ নাই। যেরূপ অপাঠ্য, অনভিনেয় নাটক নিত্য প্রকাশ হইতেছে, ইহা তাহারই সহস্রতম সংস্করণ মাত্র। বেশীর ভাগ, ইহাতে মেয়েলি ভাষার অসাধারণ প্রাবল্য। ইহার মধ্যে উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিরাও ইতরের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন। রাজা, রাজরাণী, রাজপুত্র প্রভৃতি মালা, দুলে, বাগ্দীর মত কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন। আবার কখন বিশুদ্ধ সংস্কৃতের দীর্ঘ সমাসের এত ঘটা যে ভবভূতির নাটকের মধ্যে তাদৃশ দীর্ঘ সমাস দুর্লভ। গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণেও বাঙ্গালা শব্দের বর্ণ যোজনার প্রাচীন পদ্ধতি পরিত্যক্ত হইয়া, হুতম পেঁচার অনুকরণ, জিজ্ঞাসার পরিবর্ত্তে "জিগ্গেস," শীঘ্রের পরিবর্ত্তে "শীগ্গির" পত্রের পরিবর্ত্তে "পত্তর" ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে। এই নাটকের বাঙ্গালা দেখিয়া আমরা আমাদিগের মাতৃভাষা বলিয়া চিনিতে পারিলাম না।

স্থানে স্থানে অত্যন্ত কদর্য্য রুচির পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। গঙ্গাধরের কথাবার্ত্তা সকল অত্যন্ত নীচ প্রবৃত্তির উদ্দীপক। সত্য বটে সংসারে তাদৃশ লোক অনেক আছে, এবং মনুষ্য হৃদয়ের চিত্রই কাব্যের উদ্দেশ্য। মনুষ্য হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি যেমন কাব্যের সামগ্রী, নিকৃষ্ট বৃত্তিও তদ্রূপ। রাবণ ব্যতীত রামায়ণ হইত না। দুর্য্যোধন ব্যতীত মহাভারত হইত না। কিন্তু নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলের কোন্ ভাগ বর্জ্জনীয়, কোন্ ভাগ অবলম্বনীয় তাহা যিনি বুঝিতে না পারেন তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। গঙ্গাধরের উক্তির কদর্য্য ভাগ উদ্ধৃত করিয়া পত্রস্থ করিতে গেলে, ভদ্র পাঠকদিগের রুচির বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে; কিন্তু আমাদিগের দেশে অনেক লোকেরই রুচি এমন দুর্দ্দশাপন্ন যে, উদাহরণের দ্বারা না দেখাইয়া দিলে তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, কি প্রকার বাক্য বিশুদ্ধ রুচির বিঘ্নকর বলিয়া আমরা পরিহার করিতে বলিতেছি। অতএব নিম্নোদ্ধৃত বাক্য সকল বঙ্গদর্শনে

সন্নিবেশিত করার যে অপরাধ তাহা পাঠকেরা আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন, আমরা সচরাচর এরূপ করিয়া থাকি না ; এবং সচরাচর করিব না। গঙ্গাধর একস্থানে বলিতেছেন, "আমরা ভাই তত বাছাবাছি করি না, আমাদের কাছে টক মিষ্টি সবই সমান, যখন যা পাই একবার চেখে নি, এই পর্য্যন্ত। আমাদের কাছে ভাল মন্দ বিচার নাই, আমরা বেশ্যা ও ভার্য্যাকে এক চক্ষে দেখি।"

পুনশ্চ—

"দেখ দেখি ভাই, আমরা কত সুখে আছি। অপর সাধারণ সকলেই আমাদের পদ পূজা কচ্চে। বাইরে ধর্ম্মাড়ম্বরের আর ইয়ত্তা নাই। ললাটে ত্রিপুণ্ড্র ; গলায় রুদ্রাক্ষ ; গায় শিব নামাবলী ; গৈরিক বসন পরিধান ; মুখে বরাবর হর হর গঙ্গাধর। পরম সংযমীর ন্যায় চাল চলন। কত লোকের শান্তি স্বস্ত্যয়ন, যাগ যজ্ঞ কচ্চি। ছেলে হবার জন্য কার্ত্তিক পূজা কচ্চি। প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা দিচ্চি। মহিলামণ্ডলে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা কচ্চি। কিন্তু ভিতরে ভিন্ন ভাব। কেবল মুখভারতীই সার, ধর্ম্মের সঙ্গে ভাশুর ভাদ্রবধূর সম্বন্ধ। বিবাহ করি না, অথচ বিবাহিত। বল্‌তে কি, লোক পরিণীত হয়ে যে সুখ ভোগ করে, আমরা তা না হয়েও সেই সুখ ভোগ কচ্চি। মরাল যেমন নীর পরিত্যাগ করে ক্ষীর গ্রহণ করে, আমরাও ঠিক সেই রূপ সারগ্রাহী।

কাঁটাজাল পরিহরি, সুখে তুলি ফুল।
পিয়ি মধু বাজে নাক মৌমাছির হুল।

তুমি যেমন নির্ব্বোধ, তেমনি ভুগচ।"

বোধ হয়, এই শ্রেণীর ভণ্ডদিগকে ঘৃণিত করাণই লেখকের উদ্দেশ্য। কিন্তু সে উদ্দেশ্য জন্য এ প্রকার উপায় অবলম্বনীয় নহে। স্বাস্থ্যবিধি শিখাইবার জন্য কাহাকেও নরকে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য নহে। কাদা ছানিতে গেলেই কিছু গায় লাগে। যে নাটকের কোন নায়কের দ্বারা এই সকল কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা কাহারও পঠনীয় বা দর্শনীয় নহে।

কবি যেখানেই করুণা, স্নেহ, প্রণয়, কোমলতা, মধুরতা, প্রভৃতি (রসের বলিব কি ?) অবতারণা করিতে গিয়াছেন, সেইখানেই দীনবন্ধু বাবুর নাটক সকলের নিকৃষ্টাংশের অনুকরণ মাত্র। তাহা অতি জঘন্য হইয়াছে।

উড়িষ্যা হইতে সর্ব্ব প্রথমে এই নাটক প্রকাশিত হইতেছে, বিশেষতঃ রচয়িতার এই প্রথমোদ্যম, বলিয়া আমরা তাঁহাকে মার্জ্জনা করিতে পারিলাম না। প্রথম হউক, শেষ হউক, নিকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া আদর পাইবার অধিকার কাহারও নাই।

জমীদার দর্পণ নাটক। শ্রীমীর মশাররফ হোসেন কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, মধ্যস্থ যন্ত্র।

জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্ত্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানি বাঙ্গালার চিহ্ন মাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা, এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ।

জমীদারদিগের অত্যাচারের উদাহরণের দ্বারা বর্ণিত করা উহার উদ্দেশ্য। নীলকরদিগের সম্বন্ধে বিখ্যাত নীলদর্পণের যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জমীদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্য।

এই দর্পণে জমীদারের যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, তাহা বিকৃত কি প্রকৃত সে বিষয়ের আমরা কিছুমাত্র আলোচনা করিতে চাহি না, এ তাহার সময় নহে। বঙ্গদর্শনের জন্মাবধি, এই পত্র প্রজার হিতৈষী। এবং প্রজার হিতকামনা আমরা কখন ত্যাগ করিব না। কিন্তু আমরা পাবনা জেলায় প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত এবং বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজনীয়। আমরা পরমর্শ দিই যে, গ্রন্থকারের এসময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ইহা আমাদিগের বলা কর্ত্তব্য যে নাটকখানি অনেকাংশে ভাল হইয়াছে। আমরা প্রজা, জমীদারের কথা বলিতে চাহি না, কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, শেসন আদালতের চিত্রটি অতি পরিপাটি হইয়াছে। তদংশ উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল, স্থানাভাব প্রযুক্ত পারিলাম না। কিন্তু সরোজিনী নাটকের স্থায়, ইহাতেও অনেক পরিহার্য্য কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রেট্ বারবারস্ ড্রামা। নাপিতেশ্বর নাটক। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান মিরর যন্ত্র।

গ্রন্থকারের নাম প্রকাশিত হয় নাই। হাবড়ার পুলিষের মোকদ্দমার বৃত্তান্ত লইয়া এই নাটক প্রণীত হইয়াছে। ইহারও নাটক চাই? কেন? বাঙ্গালির এই নাটকরোগ আমাদিগের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

নীলদর্পণকার প্রভৃতি যাঁহারা সামাজিক কুপ্রথার সংশোধনার্থ নাটক প্রণয়ন করেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা নাটকের অবমাননা করেন। নাটকের উদ্দেশ্য গুরুতর—যে সকল নাটক এইরূপ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়, সে সকলকে আমরা নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি—সমাজ সংস্করণ নহে। মুখ্য উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হইয়া, সমাজ

সংস্করণাভিপ্রায়ে নাটক প্রণীত হইলে, নাটকের নাটকত্ব থাকে না। কাজে কাজেই সে সকল নাটকের তাদৃশ ঔৎকর্ষ জন্মিতে পারে না এবং জন্মেও নাই। তবে এ সকল লেখকদিগের উদ্দেশ্য উত্তম; তাঁহাদিগের নাটক প্রণয়নের ফলও হিতকর; অতএব সে সকল নাটকে আমাদিগের আপত্তি নাই। বরং তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করি। নীলদর্পণ প্রভৃতি সময়োপযোগী এবং সুফলোৎপাদক, এবং কবিত্ব-গুণ বিশিষ্টও বটে, বলিয়া আমরা সে সকলের আদর করি। কিন্তু যখন নাটক-কারেরা আরও একটু নামিয়া, ফৌজদারী আদালতের মোকদ্দামার ফয়শালার সঙ্গে সঙ্গে এক একখানি নাটক যুড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন নাটক নাম কলঙ্কিত হইয়াছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমরা এরূপ নাটক পড়িব না, অথবা সমালোচন করিব না।

জমীদার ও প্রজা। শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র। কলিকাতা—মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

এই প্রবন্ধটি বক্তৃতা স্বরূপ জাতীয় সভায় পঠিত হইয়াছিল। বক্তৃতাটি অতি উত্তম হইয়াছে। আমরা যে ইহার বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না তাহাতে আমাদের দুঃখ রহিল। জমীদার ও প্রজা সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের যাহা বক্তব্য তাহার কিয়দংশ বঙ্গদেশের কৃষক সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। আর যাহা বলিতে বাকি আছে, তাহা এখন অসময় বলিয়া বলা হইল না। সেই জন্যই এ প্রবন্ধের বিস্তারিত সমালোচনা করিলাম না।

ভূতত্ত্ব বিচার। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন প্রণীত। চুঁচুড়া চিকিৎসা প্রকাশ যন্ত্র।

প্রাচীন মত সমর্থনোদ্দেশে ইহা প্রণীত হইয়াছে। পৃথিবীর আকার প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্পের স্বরূপ; পদ্মপুষ্পের মধ্যস্থলে যেমন বীজ কোষ অবস্থিতি করে, বীজ কোষের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট একটি কাঞ্চন গিরি সেইরূপ পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছে, ইত্যাদি বিষয় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। গ্রন্থের আকার ১৩৮ পৃষ্ঠা, এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতেই উহা মুদ্রিত হইয়াছে।

কেন হইবে না? অন্যের ন্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সমর্থনে অধিকারী। অন্যান্য বিষয়ে নানাপ্রকার ভ্রান্ত মত প্রচারিত হইতেছে, ভূতত্ত্ব বিষয়ে ভ্রান্তি প্রচারের অসম্ভাবনা কি? যিনি এ প্রকার মত সংস্থাপনের যত্ন দেখিয়া উপহাস করিবেন, তিনি নিজেই উপহাসাস্পদ। হিন্দুশাস্ত্রের অনন্তমহিমা, যতই পরিকীর্ত্তিত হয়, ততই সুখের বিষয়।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট আমরা বিনয়ে নিবেদন করিতেছি, যে আমরা

তাঁহার এই অনন্ত জ্ঞানের আকর স্বরূপ গ্রন্থখানি সমালোচনায় অক্ষম। আমাদিগের তত বিদ্যা নাই। ভরসা করি শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা তাঁহার পরিশ্রমের পুরস্কার করিবেন।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। হুগলী।

ইহার প্রথম খণ্ড বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনায় আমরা অক্ষম। গ্রন্থের ১৭০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই "যদি বঙ্গদর্শনের ন্যায় কোন সমালোচক আমার গ্রন্থের প্রশংসা করেন ভালই। আর যদি অপ্রশংসা করেন, তবে বুঝিব যে সম্পাদকের গ্রন্থের সম্ভবাতিরিক্ত প্রশংসা করি নাই, বলিয়াই তিনি আমাদের গ্রন্থের অপ্রশংসা করিয়াছেন।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদকের গ্রন্থ নিচয়ের যে পরিমাণে প্রশংসা করিয়াছেন, আমাদের বোধ হয় উক্ত লেখক তাহারও যোগ্য নহেন, এবং তজ্জন্য তিনি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ সন্দেহ নাই। বিশেষ ন্যায়রত্ন এই বঙ্গদর্শনকেও অনুগ্রহ করিয়া, "মন্দ নহে" বলিয়াছেন, এবং কালে ভালও বলিতে পারেন, এমন অল্প ভরসা দিয়াছেন। এই উপকার প্রাপ্তি বশতঃ আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থের সমালোচনায় পরাঙ্মুখ। যদি আমরা এ গ্রন্থের প্রশংসা করি, লোকে বলিবে বঙ্গদর্শন প্রত্যুপকারী মাত্র—যদি অপ্রশংসা করি, ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিবেন যে সম্ভবাতিরিক্ত প্রশংসার যে আকাঙ্ক্ষার আমি শঙ্কা করিয়াছিলাম, এ তাহার পরিচয়, ন্যায়রত্ন মহাশয় যে অত্যন্ত সুপণ্ডিত তাহা সকলেই জানে,—তিনি যে সুচতুর এই কৌশল তাহার প্রমাণ।

বস্তুতঃ এ কেবল কৌশল নহে। ১৭০ পৃষ্ঠায় তিনি স্পষ্টই পরিচয় দিয়াছেন যে তিনি সমালোচকদিগের ভয়ে বিশেষ ভীত। আমরা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করি, অতএব তাঁহার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া আপন কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিরত হইলাম। কেন না যদি আমরা ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম, তবে আমরা অপ্রশংসা করিতেই বাধ্য হইতাম। গ্রন্থকারের সহিত প্রায় কোথাও আমাদের মতের ঐক্য নাই। আমাদিগের বিবেচনায় উল্লিখিত "ভূতত্ত্ব বিচার" ভিন্ন এইরূপ ভ্রান্তি পরিপূর্ণ গ্রন্থ আমরা অল্পই দেখিয়াছি। প্রাচীন সংস্কার গুলির রক্ষা, উভয় গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সম্প্রদায় বিশেষের নিকট উভয় গ্রন্থই বিশেষ প্রশংসিত হইবে।

যদিও আমরা এ গ্রন্থের প্রকৃত সমালোচনা করিব না, তথাপি উল্লিখিত ভ্রান্তির একটা উদাহরণ দিতে হইল, কেন না সে কথার জন্য মনুষ্য জাতি মিলিয়া

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নামে মিথ্যাপরাধের নালিশ করিতে পারে, এবং রোশেফুকল্ নরক হইতে উঠিয়া আসিয়া চুরির নালিশ করিতে পারে। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, যে—

"মনুষ্য জাতির স্বভাব যাঁহারা উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারেন, আমরা যাঁহার নিকট অত্যধিক উপকৃত হই—তাহাকে দেখিতে পারি না, তাঁহার প্রতি দ্বেষ করি।" ২৫১ পৃষ্ঠা।

আমরা এ গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা করি নাই, তাহার এক কারণ এই যে, তাহা হইলে ন্যায়রত্ন মহাশয় মনে করিবেন, "এ ব্যক্তি আমার এ প্রশংসনীয় গ্রন্থে অত্যধিক উপকৃত হইয়াছে দেখিতেছি—অতএব এ আমার প্রতি দ্বেষ বিশিষ্ট সন্দেহ নাই।" ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাদিগকে তাঁহার দ্বেষক মনে করেন, ইহা আমাদিগের নিতান্ত অনিচ্ছা সুতরাং একারণেও আমরা গ্রন্থপ্রশংসায় বিরত হইলাম।

আমাদিগের প্রিয় সুহৃদ্ বাবু রামদাস সেনের জন্য আমরা বিশেষ চিন্তাকুল হইলাম। ন্যায়রত্ন মহাশয় আপন গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার "প্রিয়তম ছাত্র" রামদাস বাবুর নিকট বিশেষ উপকার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন। আমরা রামদাস বাবুকে একটু সতর্ক থাকিতে অনুরোধ করি। ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার প্রতি দ্বেষ বিশিষ্ট হইয়াছেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় অতি সুশিক্ষক, আমরা অবগত আছি। তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষায় তাঁহার ছাত্রেরা বিশেষ উপকৃত। ন্যায়রত্ন মহাশয়ও একটু সতর্ক থাকিবেন —ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি দ্বেষবিশিষ্ট। বিদ্যালয়ের চারি পার্শ্বে ইষ্টকাদি যেন পড়িয়া না থাকে।

[এদেশের সাধারণ লোকের সংস্কার আছে যে রহস্য প্রবন্ধ মাত্রেই কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি লক্ষিত হয়—কোন বিশেষ ব্যক্তিকে গালি না দেওয়া হইলে রহস্য কোথায়? এইরূপ কুসংস্কারবিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি, বঙ্গদর্শনে যে "গর্দ্দভ" শির্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছিল, ব্যক্তি বিশেষ তাহার উদ্দিষ্ট বলিয়া বুঝিয়াছেন। সে সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কেহ ভদ্রলোক থাকেন, তবে তাঁহাদিগের নিকট নিবেদিত হইতেছি যে, ঐ প্রবন্ধের কোন অংশে ব্যক্তি বিশেষ লক্ষিত হয় নাই। অথবা শ্রেণীবিশেষের সাধারণতঃ সকলেই হয়েন নাই। শ্রেণীবিশেষের অস্তিত্ব শূন্য আদর্শ মাত্র—যাহাকে ইংরেজ সমালোচকেরা "types" বলেন, তাহাই উহার লক্ষ্য। যেখানে প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের নাম আছে, সেখানেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে।— গর্দ্দভ লেখক।]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজনীতি

মহাভারতের সভাপর্ব্বে, দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্নচ্ছলে কতকগুলি রাজনৈতিক উপদেশ দিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে রাজনীতি কতদূর উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, উহা তাহার পরিচয়। মুসলমানদিগের অপেক্ষা হিন্দুরা যে রাজনীতিতে বিজ্ঞতর ছিলেন, উহা পাঠ করিলে সংশয় থাকে না। প্রাচীন রোমক এবং আধুনিক ইউরোপীয়গণ ভিন্ন আর কোন জাতি তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষীয় রাজারা যে অন্যান্য সকল জাতির অপেক্ষা অধিক কাল আপনাদিগের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, এই রাজনীতিজ্ঞতাই তাহার এক কারণ। হিন্দুদিগের ইতিবৃত্ত নাই; এক একটি শাসনকর্ত্তার গুণগান করিয়া শত শত পৃষ্ঠা লিখিবার উপায় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের কৃতকার্য্যের যে কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই অনেক কথা বলা যাইতে পারে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সহিত পৃথিবীর যে কোন রাজপুরুষের তুলনা করা যায়। আকবর তাঁহার ন্যায় উত্তর ভারত একচ্ছত্র করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে দুর্দ্ধর্ষ গ্রীক জাতির হস্ত হইতে স্বদেশোদ্ধার করিতে হয় নাই। চন্দ্রগুপ্ত আলেক্‌জাণ্ডারের বিজিত ভারতাংশের পুনরুদ্ধার করিয়া, তক্ষশীলা হইতে তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া, মহতী কীর্ত্তি স্থাপিতা করিয়াছিলেন। ভুবনবিখ্যাত যবন রাজাধিরাজ সিলিউকস্‌কে লাঘব স্বীকার করাইয়া, তাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। (হিন্দু হইয়া ঠিক বিবাহ করিয়াছিলেন এমতও বোধ হয় না—) ইতিহাসে তিনজন সাম্রাজ্য-নির্ম্মাতা বিশেষ পরিচিত—শার্লমান্, দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক, প্রথম পিটর—ভবিষ্যতে বিস্মার্ক সেই শ্রেণীতে স্থান পাইবেন কি না বলা যায় না, কেন না তাঁহার কীর্ত্তি স্থায়ী কি না তাহা এখনও জানা যায় নাই। আলেকজণ্ডর নাপোলিয়ন, বা ক্রম্বেল্ সে শ্রেণী মধ্যে আসন পান নাই, কেন না তাঁহাদের কীর্ত্তি তাঁহাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থায়ী, বা তাহাও নহে।

গজনবী মহম্মদের প্রায় সেইরূপ। আরব সাম্রাজ্য ও মোগল সাম্রাজ্য এক এক জনের নির্ম্মিত নহে। কিন্তু মাগধ সাম্রাজ্য একা চন্দ্রগুপ্তের নির্ম্মিত। এবং পুরুষানুক্রমে স্থায়ী বটে। তিনি শার্লমান, ফ্রেডরিক ও পিটরের সঙ্গে উচ্চাসনে বসিতে পারেন।

নারদের যে উপদেশ বাক্যের কথার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে এমত তত্ত্ব অনেক আছে, যে রাজনীতি বিশারদ ইংরাজেরাও তাহা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে চলিলে, তাঁহাদিগের উপকার হয়। এমত কদাচ বক্তব্য নহে যে হিন্দুরা এই সকল নৈতিক উক্তির অনুসারী হইয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে চলিতেন। কিন্তু ঈদৃশ নৈতিক তত্ত্ব যে তাঁহাদিগের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। যেখানে উদ্ভূত হইয়াছিল, সেখানে যে উহা কিয়দংশে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, তদ্বিষয়েও সংশয় করা অন্যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষের সহিত আধুনিক ভারতবর্ষের রাজনীতির তুলনা করিতে হইলে, প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজনীতির কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে ক্ষতি নাই। এজন্য প্রথমে আমরা উল্লিখিত নারদ বাক্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। ঐ কথা পাঠকেরা অনেকেই পড়িয়াছেন, তথাপি উহার পুনঃপাঠে কষ্ট বোধ হইবে, এমত বিবেচনা হয় না।

নারদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "মহারাজ! কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গসংস্কার, সেতু নির্ম্মাণ, আয় ব্যয় শ্রবণ, পৌরকার্য্য দর্শন ও জনপদ পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্য্য ত সম্যক্ প্রকারে সম্পাদিত হয়? * * নিঃশঙ্কচিত্ত কপট দূতগণ ত তোমার বা তোমার অমাত্যদিগের গূঢ়মন্ত্রণাসকল ভেদ করিতে পারে না? মিত্র, উদাসীন ও শত্রুদিগের অভিসন্ধি সমস্ত আপনি ত বুঝিয়া থাকেন? যথাকালে সন্ধি স্থাপনে ও বিগ্রহ বিধানে প্রবৃত্ত হয়েন? উদাসীন ও মধ্যমের প্রতি ত মাধ্যস্থ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন? আত্মানুরূপ, বৃদ্ধ বিশুদ্ধস্বভাব, সম্বোধনক্ষম, সৎকুলজাত, অনুরক্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিপদে ত অভিষিক্ত হইয়া থাকেন?"

সর জর্জ কাম্বেল সাহেব "আত্মানুরূপ" ব্যক্তিকে স্বীয় মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়াছেন বলিয়া দেশের লোক তাঁহার উপর রাগ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি বলিতে পারেন যে নারদ বাক্য আমার পক্ষে। আধুনিক ভারতীয় শাসনকর্ত্তাদিগের দুরদৃষ্ট এই যে বৃদ্ধ মন্ত্রী তাঁহাদিগের কপালে প্রায় ঘটে না। কিন্তু ইউরোপে নারদীয় বাক্য প্রতিপালিত হইয়া থাকে—বিস্মার্ক, গ্লাডষ্টোন, ডিস্রেলি, টিয়র, প্রভৃতি উদাহরণ। পরে—

"একাকী বা বহুজন পরিবৃত হইয়া ত মন্ত্রণা করেন না? মন্ত্রিত মন্ত্র ত জনপদ মধ্যে অপ্রচারিত থাকে?"

ইংরাজেরাও এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন, কেবল অতিরিক্ত এই বলেন, যে "মন্ত্রণা বিশেষ জনপদ মধ্যে প্রচার হওয়াই ভাল। অতএব সেই গুলি বাছিয়া বাছিয়া গেজেটে ছাপাই।" পরে—

"স্বল্পায়াসসাধ্য মহোদয় বিষয় সকল ত শীঘ্রই সম্পন্ন করিয়া থাকেন?"

আমাদিগের অনুরোধ যে প্রাচীন ঋষির এই বাক্য ইংরাজেরা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া কার্য্যালয়ে কার্য্যালয়ে প্রকটিত করুন। তৎপরে,—

"কৃষীবলেরা আপনার পরোক্ষে প্রকৃত ব্যবহার করিয়া থাকে? কারণ প্রভুর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ না থাকিলে এরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব সন্দেহ নাই।"

বিলাতী শাসন কর্ত্তা কিম্বা তাঁহাদিগের দেশী সমালোচক, কেহই অদ্যাপি এ কথার সারবত্তা অনুভূত করিতে সক্ষম হইলেন না। তৎপরে—

"অনারব্ধ কার্য্যের, পরীক্ষার্থ ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রকোবিদ বিচক্ষণ পরীক্ষক সকল ত নিযুক্ত করিয়া থাকেন?"

ইংরেজেরা এই কথার সম্যক্ প্রকারে অনুবর্ত্তী। সকল কার্য্যের পূর্ব্বেই কমিটি নিযুক্ত হইয়া থাকে। সকল কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ইংরেজেরা এক একটা কমিটি নিযুক্ত করেন কেন? একথা যিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহাকে দেয় উত্তর উল্লিখিত নারদ বাক্যে আছে। তৎপরে—

"সহস্র মূর্খ বিনিময় দ্বারা এক জন পণ্ডিতকে ত ক্রয় করিয়া থাকেন?"

আমরা এই কথাটির অনুমোদন করি না। মূর্খের দ্বারাই পৃথিবীর কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে—পণ্ডিত কোন কাজে লাগে? মিল্ পার্লিমেণ্টে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না,—ওয়েষ্ট্ মিলষ্টর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। লাপ্লাসকে বোনাপার্টি পণ্ডিত দেখিয়া উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন—কিন্তু লাপ্লাস কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম হইয়া দূরীভূত হইলেন। প্রবাদ আছে, একজন ভট্টাচার্য্য বন্ধ্যা ভার্য্যার বিনিময়ে দুগ্ধবতী গো লইয়া আসিয়াছিলেন। সেইরূপ রাজপুরুষেরা অপ্রিয়বাদী, আত্মমতভক্ত পণ্ডিতের বিনিময়ে আজ্ঞাকারী মূর্খই গ্রহণ করিয়া থাকেন। নারদ বলিয়াছেন বটে, যে "কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি অনায়াসে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয়েন।" এ কথা সত্য বটে; অতএব বিপদ কালে পণ্ডিতের আশ্রয় লইবে। সুখের দিনে মূর্খ;—দুঃখের দিনে পণ্ডিত।

পরে নারদ বলিতেছেন, "দুর্গ সকল ত ধন ধান্য উদক যন্ত্রে পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন? তথায় শিল্পিগণ ও ধনুর্দ্ধর পুরুষ সকল ত সর্ব্বদা সতর্কতা পূর্ব্বক কালযাপন করে?"

মিউটিনির পূর্ব্বে ইংরেজেরা যদি এই কথা স্মরণ রাখিতেন, তবে তাদৃশ

বিপদ ঘটিত না। সর হেন্‌রি লরেন্স এই কথা বুঝিতেন, বলিয়া লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সির রক্ষা হইয়াছিল।

"প্রচণ্ড দণ্ড বিধান দ্বারা প্রজাদিগকে ত অত্যন্ত উদ্বেজিত করেন না?"

ইউরোপীয়েরা অতি অল্পকাল হইল, এ কথা শিখিয়াছেন। এক পয়সা চুরীর জন্য প্রাণদণ্ড প্রভৃতি প্রচণ্ড দণ্ড, অতি অল্পকাল হইল, ইংলণ্ড হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

"নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেনাদিগের বেতনাদি প্রদানে ত বিমুখ হয়েন না? তাহা হইলে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাদিগের দ্বারা পদে পদে অনিষ্ট ঘটনা ও বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে।"

এই নীতির বিপরীতাচরণ কার্থেজ রাজ্য লোপের মূল। একা রোম কার্থেজ ধ্বংশ করে নাই।

"সৎকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত তোমার প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছে? তাহারা ত তোমার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও সম্মত আছে?"

এই নীতির অবজ্ঞায় ষ্টুয়ার্ট বংশ নষ্ট হয়েন। ভারতবর্ষীয় ইংরেজ রাজপুরুষেরা ইহা বিলক্ষণ বুঝেন। বুঝিয়া, কর্ণওয়ালিস্ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, ও কানিং ভারতীয় রাজগণকে পোষ্যপুত্র লইতে অনুমতি দিয়াছেন।

পরে, নারদ পেন্‌শ্যন দেওয়ার পরামর্শ দিতেছেন,

"মহারাজ! যাহারা কেবল আপনার উপকারের নিমিত্ত কাল কবলে নিপতিত ও যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পুত্র কলত্র প্রভৃতিকে ত ভরণ পোষণ করিতেছেন?"

ক্ষিপ্রকারিতার বিষয়ে—

"শত্রুকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া স্বীয় মন্ত্র কোষ ও ভৃত্য, ত্রিবিধ বল সম্যক্ বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে তাহাকে ত আক্রমণ করেন?"

অতি প্রধান রাজ্যাধ্যক্ষেরা এ তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন। "অবিলম্বে" কাহাকে বলে প্রথম নাপোলিয়ন বুঝিতেন। তাঁহার রণজয় সেই বুদ্ধির ফল। তৃতীয় নাপোলিয়ন "অবিলম্বে" প্রূসিয়দিগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রথম নাপোলিয়নের মত "মন্ত্র কোষ ও ভৃত্য" ত্রিবিধ বলের সম্যক্ বিচার না করিয়াই আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি, নারদ বাক্যে অবহেলা করিয়া নষ্ট হইলেন।

পরে সমদৃষ্টি পক্ষে,—

"যেমন পিতা মাতা সকল সন্তানকে সমান স্নেহ করেন, তদ্রূপ আপনি ত সমদৃষ্টিতে সমুদ্র মেখলা সমুদয় পৃথিবী অবলোকন করিতেছেন?"

ইংরেজেরা ভারতবর্ষে এই নারদীয় বাক্য মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করুন।

নিম্নলিখিত কথাটি বিস্মার্কের যোগ্য ;—

"সৈন্যদিগের ব্যবসায় ও জয়লাভ সামর্থ্য বুঝিয়া তাহাদিগকে ত অগ্রিম বেতন প্রদান পূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধে যাত্রা করিয়া থাকেন ?"

নিম্নলিখিত কথাটির আমরা অনুমোদন করি না, কিন্তু চতুর্দ্দশ লুই শুনিলে অনুমোদন করিতেন,—

"পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত শত্রুপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে ত যথাযোগ্য ধনদান করেন ?"

নিম্নলিখিত কথাগুলি গ্রেগরি বা ইগ্নেশ্যস লয়লার যোগ্য—

"স্বয়ং জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মপরাজয় পূর্ব্বক, ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র প্রমত্ত বিপক্ষ দিগকে ত পরাজয় করিতেছেন ?"

পরে,—

"বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণ কালে আপন অধিকার ত দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত করেন ?"

পৃথিবীতে যত সৈনিক জন্মিয়াছেন,তন্মধ্যে হানিবল্ একজন অত্যুৎকৃষ্ট। কিন্তু তিনি এই কথা বিস্মৃত হওয়াতে, সব হারাইয়া ছিলেন। তিনি যখন ইতালিতে অনিবার্য্য, সিপিও তখন আফ্রিকাতে সৈন্য লইয়া গিয়া, তাঁহার কৃত রণজয় সকল বিফল করিয়াছিলেন।

"এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার স্ব স্ব পদে ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন ?"

রোমকেরা ইহা করিতেন, এবং ভারতবর্ষে ইংরেজেরা ইহা করেন। এই জন্য এতদুভয় সাম্রাজ্য ঈদৃশ বিস্তার লাভ করিয়াছে।

নিম্নলিখিত তিনটি বাক্যে সমুদায় রাজকার্য্য নিঃশেষে বর্ণিত হইয়াছে—

"আপনি ত আভ্যন্তরিক ও বাহ্যজনগণ হইতে আপনাকে, আত্মীয়লোক হইতে তাহাদিগকে, এবং পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন ?"

তাহার পর বজেট ও এষ্টিমেটের কথা—

"আয় ব্যয় নিযুক্ত গণক ও লেখক বর্গ আপনার আয় সকল পূর্ব্বাহ্নে ত নিরূপণ করিতেছে ?"

আমরা জানিতাম এটি ভারতবর্ষে উইল্‌সন্ সাহেবের সৃষ্টি, কিন্তু তাহা নহে।

পরে—

"রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সন্তুষ্টচিত্তে কাল যাপন করিতেছে ?"

এই কথা, নারদ যেমন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমরা তেমনি লর্ড নর্থব্রুককে জিজ্ঞাসা করি।

অনেকের বোধ আছে, "ইরিগেশ্যন ডিপার্টমেণ্ট"টি ভারতবর্ষে একটি নূতন কাণ্ড দেখাইতেছে। তাহা নহে। নারদ বলিতেছেন—

"রাজ্য মধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবর সকল ত নিখাত হইয়াছে? কৃষি কার্য্য ত বৃষ্টিনিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে?"

একথা ইংরেজদিগের মনে থাকিলে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ ঘটিত না।

নিম্নলিখিত বাক্যটির প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ করিলে আমাদিগের বিবেচনায় ভাল হয়।

"কৃষকদিগের গৃহে বীজ ও অন্নাদির ত অসদ্ভাব নাই? আবশ্যক হইলে ত পাদিক বৃদ্ধিতে অনুগ্রহস্বরূপ শত সংখ্যক ঋণ দান করিয়া থাকেন?"

এক্ষণে এই নিয়মের অভাবে এ দেশের কৃষকেরা মহাজনের নিকট বিক্রীত। মহাজনের নিকটেও সকলে সকল সময়ে পায় না—অনেকেই অন্নাভাবে শীর্ণ—বীজাভাবে ভরসা শূন্য। যে পায় সেও দ্বিপাদবৃদ্ধিতে নহিলে পায় না। অনেকে বলিবেন যে, যে অর্থশাস্ত্র অনবগত সেই রাজাকে মহাজনি করিতে পরামর্শ দিবে—রাজার ব্যবসায়, সমাজের অনিষ্টকারক। অর্থশাস্ত্র ঘটিত যে আপত্তি তাহা আমরা অবগত আছি—এবং মহাভারতকারও অবগত ছিলেন। এই জন্যই নারদের ঐ বাক্য মধ্যেই তিনটি গুরুতর নিয়ম সন্নিবিষ্ট আছে। প্রথম—"আবশ্যক হইলে" ঋণ দিতে বলিতেছেন—ইহার অর্থ যে যাহাকে না দিলে চলে না তাহাকেই দিবেন। অতএব যে মহাজনের নিকট ঋণ পাইতে পারিবে, তাহাকে ঋণ দেওয়া এই কথায় প্রতিষিদ্ধ হইল। সুতরাং রাজা ব্যবসায়ী হইলেন না। যাহাকে রাজা না দিলে সে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে, তাহাকেই দিবেন। দ্বিতীয়তঃ "অনুগ্রহ স্বরূপ" দিবেন—অর্থাৎ ব্যবসায়ীর ন্যায় লাভাকাঙ্ক্ষায় দিবেন না। তবে পাদিক বৃদ্ধির কথা কেন? এ নিয়ম না করিলে যে সে নিষ্প্রয়োজনেও ঋণ লইবার সম্ভাবনা—বঞ্চক জাতি সর্ব্বত্রই আছে। আর ঋণ দিলেই কতক আদায় হয়, কতক আদায় হয় না। যদি বৃদ্ধির নিয়ম না থাকে তবে রাজাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ক্ষতি স্বীকার করিয়া রাজকোষ হইতে ঋণ দিতে হইলে রাজ্য চলা ভার। তৃতীয়তঃ "শত সংখ্যক" ঋণ দিবে—ইহার ঊর্দ্ধ দিবে না। অর্থাৎ প্রজার জীবন নির্ব্বাহার্থে যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন, তাহাই রাজা ঋণ স্বরূপ দিতে পারেন। ততোধিক ঋণ দান ব্যবসায়ীর কাজ। এই তিনটি নিয়মের দ্বারা অর্থশাস্ত্রবেত্তাদিগের আপত্তির মীমাংসা হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা অর্থশাস্ত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন।

নিম্নোদ্ধৃত নীতি, ইংরাজেরা এ পর্য্যন্ত শিখিলেন না। না শিখাতে তাঁহাদিগের ক্ষতি হইতেছে ;—

"হে মহারাজ! যথাকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বেশভূষা সমাধান করিয়া কালজ্ঞ মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত দর্শন প্রদান করেন ?"

যে রাজাকে প্রজাগণ কখন দেখিতে পায় না—তাঁহার প্রতি প্রজাদিগের অনুরাগ সঞ্চার হয় না। বিশেষতঃ এদেশের লোকের স্বভাবই এই। আর রাজদর্শন প্রজাগণের দুর্লভ হইলে, তাহাদিগের সকল প্রকার দুঃখ ও প্রকৃত অবস্থা রাজা বা রাজপুরুষেরা কখন জানিতে পারেন না।

হিন্দুরাজাদিগের ন্যায় মুসলমানেরাও এ কথা বুঝিতেন। এখন যেখানে সম্বৎসরে একটা দরবার বা "লেবী" হয়, সেখানে হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রাত্যহিক দরবার হইত।

পরে,—

"দুর্ব্বল শত্রুকে ত বলপ্রকাশপূর্ব্বক সাতিশয় পীড়িত করেন না ?"

তাহা হইলে দুর্ব্বল শত্রুও বলবান হইয়া উঠে। এই দোষে, স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ্ "নিম্নদেশ" অর্থাৎ বেলজম হলাণ্ড হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। ইংলণ্ড যে আমেরিক উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাহারও কারণ প্রায় এইরূপ।

তৎপরে,

"দুষ্ট অহিতকারী কদর্য্যস্বভাব দণ্ডার্হ তস্কর লোপ্ত্রসহ গৃহীত হইয়াও তাহাদিগের নিকটে ত ক্ষমা লাভ করিয়া থাকে না ?"

যে দেশে জুরির বিচার আছে, সে দেশের রাজপুরুষদিগকে আমরাও একথা জিজ্ঞাসা করি।

নারদ যে চতুর্দ্দশ রাজদোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহাও শ্রবণ যোগ্য,—যথা,

"নাস্তিক্য, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎকার ত্যাগ, আলস্য, চিত্ত-চাপল্য, নিরন্তর অর্থচিন্তা, অনর্থজ্ঞ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত বিষয়ের অনারম্ভ, মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গল কার্য্যের অপ্রয়োগ ও প্রত্যুত্থান, এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ।"

আর একটি বাক্যমাত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা নিরস্ত হইব—

"অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুবিহীন, প্রব্রজিত, ব্যক্তিদিগকে ত পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন ?"

এই প্রকার সারবান এবং একালেও আদরণীয় কথা আরও অনেক আছে। দুই একটা ভণ্ডামিও আছে—উদাহরণ স্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"সুস্বাদ অন্নপান দ্বারা গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগকে ত ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদান করিয়া থাকেন; একাগ্রচিত্ত হইয়া ত বাজপেয় ও পুণ্ডরীক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইয়া থাকেন? গুরুজন, বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি, দেবতা, তাপসগণ, চৈত্যবৃক্ষ, ও শুভফলপ্রদ ব্রাহ্মণদিগকে ত নমস্কার করিয়া থাকেন? * * লোক সকল ত মাঙ্গল্য বস্তু লইয়া আপনার পার্শ্বে অবস্থিতি করে?"

প্রাচীন রাজনীতির এই সামান্য পরিচয়ের পর, আধুনিক ও প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক তুলনায়, বারান্তরে প্রবৃত্ত হইব।

দ্বিতীয় সংখ্যা

মনুষ্য ফল।

আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে, আমার বোধ হয়, মনুষ্য সকল ফল বিশেষ—মায়া বৃন্তে সংসার বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে। সকলগুলি পাকিতে পায় না—কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়া যায়। কোনটি পোকায় খায়, কোনটীকে পাখীতে ঠোকরায়। কোনটি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। কোনটি সুপক্ক হইয়া, আহরিত হইলে, গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া দেব সেবায় বা ব্রাহ্মণ ভোজনে লাগে—তাহাদিগেরই ফলজন্ম বা মনুষ্যজন্ম সার্থক। কোনটি সুপক্ক হইয়া, বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িয়া, মাটিতে পড়িয়া থাকে, শৃগালে খায়। তাহাদিগের মনুষ্য জন্ম বা ফল জন্ম বৃথা। কতকগুলি তিক্ত, কটু বা কষায়,—কিন্তু তাহাতে অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। কতকগুলি বিষময়—যে খায় সেই মরে। আর কতকগুলি মাকাল জাতীয়—কেবল দেখিতে সুন্দর।

কখন কখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিতে পাই, যে পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথক্ জাতীয় ফল। আমাদের দেশের এক্ষণকার বড়মানুষদিগকে মনুষ্যজাতি মধ্যে কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি খাসা খাজা কাঁটাল, কতকগুলির বড় আটা, কতকগুলি কেবল ভুঁতুড়িসার, গোরুর খাদ্য। কতকগুলি ইচোঁড়ে পাকে, কতকগুলি কেবল ইচোঁড়ই থাকে, কখন পাকে না। কতকগুলি পাকিলে পাকিতে পারে, কিন্তু পাকিতে পায় না, পৃথিবীর রাক্ষস রাক্ষসীরা ইচোঁড়েই পাড়িয়া দাল্না রাঁধিয়া খাইয়া ফেলে।* যদি পাকিল, ত বড় শৃগালের দৌরাত্ম্য। যদি গাছ ঘেরা থাকে, ত ভালই। যদি কাঁটাল উচুডালে ফলিয়া থাকে, ভালই; নহিলে শৃগালেরা কাঁটাল কোন মতে উদরসাৎ করিবেন। শৃগালেরা কেহ, দেওয়ান, কেহ কারকুন, কেহ নাএব, কেহ গোমস্তা, কেহ মোছায়েব, কেহ

* পাকের রীতি সধবার একাদশীতে সবিস্তারে লিখিত আছে।

কেবল আশীর্ব্বাদক। যদি এ সকলের হাত এড়াইয়া, পাকা কাঁটাল ঘরে গেল, তবে মাছি ভন্ ভন্ করিতে আরম্ভ করিল। মাছিরা কাঁটাল চায় না, তাহারা কেবল একটু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন। এ মাছিটি কন্যাভার গ্রস্ত, উহাকে এক কোঁটা রস দাও,—ওটির মাতৃ দায়, একটু রস দাও। এটি একখানি পুস্তক লিখিয়াছে, একটু রস দাও ;—সেটি পেটের দায়ে একখানি সম্বাদপত্র করিয়াছে, উহাকেও একটু দাও। এ মাছিটি কাঁটালের পিসীর ভাশুর পুত্রের শ্যালার শ্যালীপুত্র—খাইতে পায়না, কিছু রস দাও ;—সে মাছিটির টোলে পৌনে চৌদ্দটী ছাত্র পড়ে, কিছু রস দাও। আবার এদিগে কাঁটাল ঘরে রাখাও ভালনা—পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠে। আমার বিবেচনায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া, উত্তম নির্জ্জল দুগ্ধের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া, কমলাকান্তের ন্যায় সুব্রাহ্মণকে ভোজন করানই ভাল।

এ দেশের সিবিল সর্ব্বিসের সাহেবদিগকে আমি মনুষ্যজাতিমধ্যে আম্রফল মনে করি। এ দেশে আম ছিল না, সাগর পার হইতে কোন মহাত্মা এই উপাদেয় ফল এ দেশে আনিয়াছেন। আম্র দেখিতে রাঙ্গা রাঙ্গা, ঝাঁকা আলো করিয়া বসে। কাঁচায় বড় টক—পাকিলে বড় সুমিষ্ট। কে বলিবে যে লরেন্স, রিকেট্স্, ফ্রিয়র, গ্রাণ্ট, ডাম্পিয়র, ফলের মধ্যে সুমিষ্ট ফল নহে ? তবে, কতকগুলা আম এমন কদর্য্য, যে পাকিলেও টক যায় না। কিন্তু দেখিতে বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা হয়, বিক্রেতা ফাঁকি দিয়া পঁচিশ টাকা শ বিক্রয় করিয়া যায়। কতকগুলি আম কাঁচামিঠে আছে—ভরসা করি পাকিলেও মিষ্ট থাকিবে। কতকগুলা জাঁতে পাকা। ব্যাপারীর বড় দরকার—অমুক বাড়ীতে পাঁচশত ফজরি কড়ার প্রয়োজন—গাছপাকা আম নাই—কাঁচা ভাঙ্গিয়া জাঁতে পাকাইয়া পাঠাইয়া দিল। লোকে "ইণ্ডিয়ান্ মুসলমান্স্" পড়িয়া—বিষ্ণু,—আমের চাকলা খাইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

আম্র, ব্রাহ্মণভোজনে লাগে বটে, কিন্তু সকল পাতে সমান পড়ে না। অমুক জেলায় ব্রাহ্মণেরা হাত গুটাইয়া বসিয়া আছে, ওদিগে টক আম পড়িয়াছে। যে দিগে ভাল আম পড়িয়াছে—সেদিগে বড় হুস হাস্ শব্দ শুনিতেছি—কর্ম্মকর্ত্তা ক্ষীরে কুলাইতে পারেন না।

সকলে আম্র খাইতে জানে না। সদ্য গাছ হইতে পাড়িয়া এ ফল খাইতে নাই। ইহা কিয়ৎক্ষণ সেলাম জলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করিও—যদি যোটে তবে সে জলে একটু খোষামোদ বরফ দিও—বড় শীতল হইবে। তার পরে ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে পার।

স্ত্রীলোকদিগকে লৌকিক কথায় কলা গাছের সহিত তুলনা করিয়া থাকে। কিন্তু সে গাছের কথা। কদলী ফলের সঙ্গে ভুবন মোহিনী জাতির আমি

সৌসাদৃশ্য দেখি না। স্ত্রীলোক কি কাঁদি কাঁদি ফলে? যাহার ভাগ্যে ফলে ফলুক—কমলাকান্তের ভাগ্যে ত নয়। কদলীর সঙ্গে কামিনীগণের এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য আছে যে উভয়েই বানর প্রিয়। কামিনীগণের এ গুণ থাকিলেও কদলীর সঙ্গে তাঁহাদিগের তুলনা করিতে পারি না। পক্ষান্তরে কতকগুলি কটুভাষী আছেন, তাঁহারা ফলের মধ্যে মাকাল ফলকেই যুবতীগণের অনুরূপ বলেন। যে বলে সে দুর্ম্মুখ—আমি ইহাদিগের ভৃত্যস্বরূপ; আমি তাহা বলিব না।

আমি বলি, রমণী মণ্ডলী এ সংসারের নারিকেল। নারিকেলও কাঁদি কাঁদি ফলে বটে, কিন্তু (ব্যবসায়ী নহিলে) কেহ কখন কাঁদি কাঁদি পাড়ে না। কেহ কখন দ্বাদশীর পারণার অনুরোধে, অথবা বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণ সেবার জন্য একটি আধটী পাড়ে। কাঁদি কাঁদি পাড়িয়া খাওয়ার অপরাধে যদি কেহ অপরাধী থাকে, তবে সে কুলীন ব্রাহ্মণেরা। কমলাকান্ত কখন সে অপরাধে অপরাধী নহে।

বৃক্ষের নারিকেলের ন্যায় সংসারের নারিকেলের বয়োভেদে নানাবস্থা। কচি বেলা উভয়ই বড় স্নিগ্ধকর—নারিকেলের জলে উদর স্নিগ্ধ হয়—কিশোরীর অকৃত্রিম বিলাসলক্ষণশূন্য প্রণয়ে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়। কিন্তু দুই নারিকেলের ডাবই ভাল। তখন দেখিতে কেমন উজ্জ্বল শ্যাম—কেমন জ্যোতিঃপুঞ্জ, রৌদ্র তাহা হইতে প্রতিহত হইতেছে—যেন সে নবীন শ্যাম শোভায় জগতের রৌদ্র শীতল হইতেছে। গাছের উপর কাঁদি কাঁদি নারিকেল, আর গবাক্ষ পথে কাঁদি কাঁদি যুবতী, আমার চক্ষে একই দেখায়—উভয়ই চতুর্দ্দিক্ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু দেখ—দেখিয়া ভুলিও না—এই চৈত্র মাসের রৌদ্রে গাছ হইতে পাড়িয়া ডাব কাটিও না—বড় তপ্ত। সংসারশিক্ষাশূন্যা কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ করিও না—তোমার কলিজা পুড়িয়া যাইবে। আম্রের ন্যায়, ডাবকেও বরফ জলে রাখিয়া শীতল করিও—বরফ না জোটে পুকুরের পাঁকে পুতিয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা করিও—মিষ্ট কথায় আয়ত্ত না করিতে পার, কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর আজ্ঞা, কড়া কথায় করিও।

নারিকেলের চারিটি সামগ্রী—জল, শস্য, মালা আর ছোবড়া। নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্নেহের আমি সাদৃশ্য দেখি। উভয়েই বড় স্নিগ্ধকর। যখন তুমি সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন এই শীতল জল পান করিও—সকল যন্ত্রণা ভুলিবে। তোমার দারিদ্র্য চৈত্রে, বা বন্ধুবিয়োগ বৈশাখে—তোমার যৌবন মধ্যাহ্নে বা রোগ-তপ্ত বৈকালে, আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে? মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে? গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে?

তবে, ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায়। রামার মা ঝুনো হইলে পর, রামার বাপ ঝালের চোটে বাড়ী ছাড়িয়াছিল। এইজন্য নারিকেলের মধ্যে ডাবেরই আদর।

নারিকেলের শস্য, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি। করকচি বেলায় বড় থাকে না; ডাবের অবস্থায় বড় সুমিষ্ট, বড় কোমল; ঝুনোর বেলায় বড় কঠিন, দন্তস্ফুট করে কার সাধ্য? তখন ইহাকে গৃহিণীপনা বলে। গৃহিণীপনা রসাল বটে, কিন্তু দাঁত বসে না। একদিকে, কন্যা বসিয়া আছেন, মায়ের অলঙ্কারের বাক্স হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ করিবেন,—কিন্তু ঝুনোর শস্য এমনি কঠিন, যে মেয়ের দাঁত বসিল না—ঝুনো, দয়া করিয়া একটি মাকড়ি বাহির করিয়া দিল। হয়ত পুত্র বসিয়া আছেন, মায়ের নগদ পুঁজির উপর দাঁত বসাইবেন,—ঝুনো, দয়া করিয়া নগদ সাতসিকা বাহির করিয়া দিল। স্বামী, প্রাচীন বয়সে একটি ব্যবসা ফাঁদিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ বয়সে হাত খালি—টাকা নহিলে ব্যবসায় হয় না—ঝুনোর পুঁজির উপর দৃষ্টি। দুই চারিটি প্রবৃত্তি রূপ দন্ত ফুটাইয়া দিলেন—বুড়া বয়সের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। শেষ যদি দাঁত বসিল নারিকেল জীর্ণ করিবার সাধ্য কি? যত দিন না টাকা ফিরাইয়া দেন, ততদিন অজীর্ণ রোগে রাত্রে নিদ্রা হয় না।

তার পরে মালা—এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা—কখন আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না; স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। মেরি সমরবিল্ বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন অষ্টেন উপন্যাস লিখিয়াছেন—মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালার মাপে।

ছোবড়া. স্ত্রীলোকের রূপ। ছোবড়া যেমন নারিকেলের বাহ্যিক অংশ, রূপও স্ত্রীলোকের বাহ্যিক অংশ। দুই বড় অসার;—পরিত্যাগ করাই ভাল। তবে ছোবড়ায় একটি কাজ হয়—উত্তম রজ্জু প্রস্তুত হয়, তাহাতে জাহাজ বাঁধা যায়। স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতেও অনেক জাহাজ বাঁধা গিয়াছে। তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টান, স্ত্রীলোকেরা রূপের কাছিতে কত ভারি ভারি মনোরথ টানে। যখন রথ টানা বারণের আইন হইবে,—তখন তাহাতে এ রথ টানা নিষেধের জন্য যেন একটা ধারা থাকে—তাহা হইলে অনেক নরহত্যা নিবারণ হইবে। আমি জানি না, নারিকেলের রজ্জু গলায় বাঁধিয়া কেহ কখন প্রাণত্যাগ করিয়াছে কি না, কিন্তু রমণীর রূপরজ্জু গলায় বাঁধিয়া কতলোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে?

বৃক্ষের নারিকেল এবং সংসারের নারিকেলের সঙ্গে, আমার বিবাদ এই যে আমি হতভাগা, দুইয়ের একেকেও আহরণ করিতে পারিলাম না। অন্য ফল আকর্ষী দিয়া পাড়া যায়, কিন্তু নারিকেল গাছে না উঠিলে পাড়া যায় না। গাছে উঠিতে

গেলেও হয় নিজের পায়ে দড়ি বাঁধিতে হইবে, না হয় ডোমের খোসামোদ করিতে হইবে।*

ডোমের খোসামোদ করিতেও রাজি আছি। কিন্তু আমার ভাগ্য দোষে কপালে নারিকেল যোটে না। আমি যেমন মানুষ, তেমনি গাছে তেমনি রূপগুণের আকর্ষী দিয়া নারিকেল পাড়িতে পারি। পারি, কিন্তু ভয় পাছে নারিকেল ঘাড়ে পড়ে। এমন অনেক শ্যামী, বামী, কামিনী আছে, যে কমলাকান্তকেও স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু পরের মেয়ে ঘাড়ে করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে, এ দীন অসমর্থ। অতএব এ যাত্রা, কমলাকান্ত ভক্তিভাবে, নারিকেল ফলটি বিশ্বেশ্বরকে দিলেন। তিনি একে শ্মশানবাসী, তাহাতে আবার বিষপান করিয়াছেন—ছাই ডাব নারিকেলে তাঁহার কি করিবে?

এদেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা দেশ হিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি শিমুল ফল ভাবি। যখন ফুল ফুটে তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা—বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না। একটু একটু পাতা ঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত; পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প রাঙ্গা দেখা যায় সেই সুন্দর। ফুলে গন্ধ মাত্র নাই—কোমলতা মাত্র নাই, কিন্তু তবু ফুল বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা। যদি ফুল ঘুচিয়া, ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম এইবার কিছু লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্র মাস আসিলে রৌদ্রের তাপে, অন্তর্লঘু ফল, ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে; তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়িয়া পড়ে!†

অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধুতূরা ফল। বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে, তাঁহাদিগের অতি সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতূরা। আমি অনেকদিন হইতে মানস করিয়াছি, কুক্কুট মাংস ভোজন করিয়া হিন্দু জন্ম পবিত্র করিব—কিন্তু এই অধম ধুতূরাগুলার কাঁটার জ্বালায়, পারিলাম না। গুণের মধ্যে এই যে, এই ধুতূরায় মদকের মাদকতা বৃদ্ধি করে। যে গাঁজাখোরের গাঁজায় নেশা হয় না, তাহার গাঁজার সঙ্গে দুইটা ধুতূরার বীচি সাজিয়া দেয়—যে সিদ্ধিখোরের সিদ্ধিতে নেশা না হয়, তাহার সিদ্ধির সঙ্গে দুইটা ধুতূরার বীচি বাটিয়া দেয়। বোধ হয় এই হিসাবেই, বঙ্গীয় লেখকেরা আপনাপন

---

* কমলাকান্ত বোধ হয় পুরোহিতকে ডোম বলিতেছে, কেননা পুরোহিতেই বিবাহ দেয়। উঃ কি পাষণ্ড!—ভীষ্মদেব।

† বঙ্গদর্শন এইরূপ শিমুলতুলা—কোন দিন বৈশাখী বাতাসে উড়িয়া যাইবে।—ভীষ্মদেব।

প্রবন্ধমধ্যে অধ্যাপকদিগের নিকট দুই চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন। প্রবন্ধ গাঁজার মধ্যে সেই বচন ধুতূরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে। এই নেশায় বঙ্গদেশ আজি কালি মাতিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেঁতুল বলিয়া গণি। নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু দুগ্ধকেও স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলেন। গুণের মধ্যে কেবল অম্লগুণ—তাও নিকৃষ্ট অম্ল। তবে এক গুণ মানি—ইহারা সাক্ষাৎ কাষ্ঠাবতার। তেঁতুল কাঠ নীরস বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল। সত্য কথা বলিতে কি, তেঁতুলের মত কুসামগ্রী আমি সংসারে দেখিতে পাই না। যেই কিয়ৎ পরিমাণে খায়, তাহারই অজীর্ণ হয়, সেই অম্ল উদগার করে। যেই অধিক পরিমাণে খায়, সেই অম্লপিত্তরোগে চির রুগ্ন। যাঁহারা সাহেব হইয়াছেন, টেবিলে বসিয়া, গ্যাসের আলোতে, বা আর্গাণ্ড জ্বালিয়া, ফয়জু খানসামার হাতের পাক, কাঁটা চামচে ধরিয়া খাইতে শিখিয়াছেন—তাঁহারা এক দায় এড়াইয়াছেন—তেঁতুলের অম্লের বড় ধার ধারিতে হয় না—আগা গোড়া তেঁতুলের মাছ দিয়া ভাত মারিতে হয় না। কিন্তু যাঁহাদিগকে চালা ঘরে বসিয়া, মুঙ্গেরে পাতর কোলে করিয়া, পদী পিসীর রান্না খাইতে হয়, তাহাদের কি যন্ত্রণা! পদী পিসী কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃস্নান করে, নামাবলি গায়ে দেয়, হাতে তুলসীর মালা, কিন্তু রাঁধিবার বেলা কলাইয়ের দাল, আর তেঁতুলের মাছ ছাড়া আর কিছুই রাঁধিতে জানেন না। ফয়জু জাতিতে নেড়ে, কিন্তু রাঁধে অমৃত!

আর একটি মনুষ্য ফলের কথা বলা হইলেই অদ্য ক্ষান্ত হই। দেশী হাকিমেরা কোন ফল বল দেখি? যিনি রাগ করেন করুন, আমি স্পষ্ট কথা বলিব, ইহারা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড। যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইহারা উঁচুতে ফলিলেন—নহিলে মাটিতে গড়াগড়ি যান। যেখানে ইচ্ছা সেখানে তুলিয়া দাও, একটু বড় বাতাসেই লতা ছিঁড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি। অনেকগুলি রূপেও কুষ্মাণ্ড, গুণেও কুষ্মাণ্ড।—তবে কুষ্মাণ্ড এখন দুই প্রকার হইতেছে—দেশী কুমড়া ও বিলাতী কুমড়া। বিলাতী কুমড়া বলিতে এমত বুঝায় না, যে এই কুমড়াগুলি বিলাত হইতে আসিয়াছে। যেমন দেশী মুচির তৈয়ারী জুতাকে ইংরাজি জুতা বলে, ইহারাও সেইরূপ বিলাতি। বিলাতি কুমড়ার যে গৌরব অধিক ইহা বলা বাহুল্য।

সংসারোদ্যানে আরও অনেক ফল ফলে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য, কদর্য্য—

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।
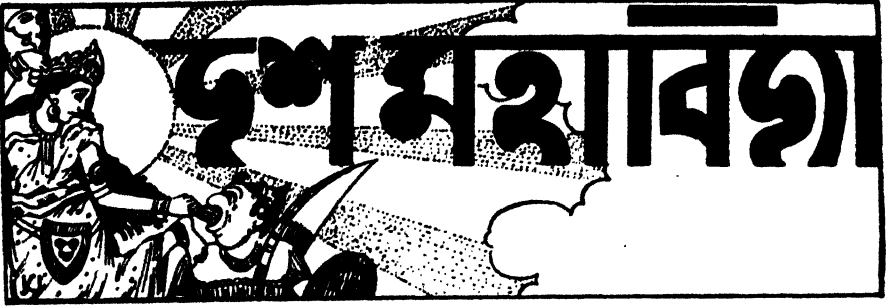
কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবীচ্ছিন্নমস্তাচ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যাচ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

আমি যে ঘরে বসি পূর্ব্বে সেই ঘরের চারিদিকে এই দশমহাবিদ্যা বিরাজ করিতেন। আমার ব্রাহ্ম বন্ধুগণ যখনই সেই গৃহে পদার্পণ করিতেন সেই সকল মূর্ত্তির অধিষ্ঠানে সর্ব্বদাই বিরক্তি প্রকাশ করিতেন; ছিন্নমস্তাকে দেখিয়া তাঁহারা খড়্গহস্ত হইতেন; কত বক্রোক্তি আমাকে এই দশমহাবিদ্যার জন্য শিরে বহন করিতে হইয়াছে; অশ্লীল কদর্য্য প্রভৃতি কত বিশেষণ পদ আমার রুচির পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

দশমহাবিদ্যার প্রতি আমার ভক্তি বড় অচলা নহে; ক্রমে তাঁহারা স্থানান্তরিত হইলেন; ও দেশী বিলাতী আলেখ্য শোভন-কারিণী আধুনিকী মহাবিদ্যাগণ সেই পৌরাণিকী মহাবিদ্যাদিগের স্থলে বিরাজ করিতেছেন। একটী দেশী মহাবিদ্যার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে; ইনি অতি সূক্ষ্ম কৃষ্ণকুল শ্বেতাম্বর পরিহিতা; আলুলায়িত কেশা; ইঁহার বক্ষস্থলের অর্দ্ধভাগ আচ্ছাদিত অর্দ্ধভাগ অনাবৃত; হস্তে ডায়মনকাটা বালা, তাহে উজ্জ্বল রসান; পদে ডায়মনকাটা মল, তাহে নকাশিপুটে; দক্ষিণ হস্তে সেই আলুলায়িত ঈষৎ সিক্ত কুন্তলরাশি ফুলাইতেছেন; ও বিকৃত বিকটকটাক্ষ ক্ষেপ করিতেছেন। চিত্রকর প্রতিমূর্ত্তির সুনাসায়, সুনথে গজমতি পরাইয়াছে; সুচিকণ বস্ত্রভেদ করিয়া গৌরাঙ্গীর গৌর কান্তি ফুটাইতেছে; গুচ্ছ গুচ্ছ কেশের সহিত দেবীর অঙ্গুলি গুলি কৌশলে চিত্রিত করিয়াছে।

আমা কর্ত্তৃক এই প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হয় নাই ইহা জানিয়াই হউক, অথবা আমি বঙ্গদর্শনে লিখিতে অভ্যাস করিতেছি বলিয়াই হউক, আমার উন্নতরুচি বন্ধু-

বর্গ আর এখন বড় রুচি বিষয়ে বাদানুবাদ করেন না। একজন আগন্তুক কেবল একদিন বলিয়াছিলেন যে "এসকল বড় ভাল নহে।" তিনি প্রস্থান করিলে পর শুনিলাম তিনি একজন স্কুলমাষ্টার; তাঁহার কথায় আর বড় আস্থা হইল না। আস্থা করি আর না করি আমি কিন্তু সেই পূর্ব্বস্থাপিত পৌরাণিকী ছিন্নহস্তা আর এই আধুনিকী ছিন্নশীলার মধ্যে বড় প্রভেদ দেখিতে পাই না।

একটি বিলাতী মহাবিদ্যার কথাও বলি। ইনি অপরাজিতাপুষ্পাভাক্ষী; ইঁহার বক্ষ অর্দ্ধাবৃতা; ইনি বেণীবদ্ধকেশা; ইঁহার রক্তাভ কপোল; যুগ্ম ভ্রূ, উৎসঙ্গে একটি বহুরোমশ মার্জ্জার; বিলাতী আসনে আসীনা; আসনের এক পার্শ্বে একটি কুক্কুর অর্দ্ধোত্থিত ভাবে দেবীর বস্ত্রাঞ্চল কর্ষণ করিতেছে; ক্রোড়স্থিত বিড়ালের প্রতি আক্রমণ করিতে ব্যগ্র হইয়াছে; দেবী বিড়ালকে বামহস্তে অভয় প্রদান করিয়া, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী প্রদর্শন করিয়া সারমেয়কে ভ্রুকুটি ভাবে যেন বলিতেছেন, "তিষ্ঠ"; আলেখ্যের নিম্নদেশে ইংরাজীতে লেখা আছে "বিবাদ"। এই সকল বিলাতী চিত্রের আমি সম্পূর্ণ রসজ্ঞ নহি; বরং পৌরাণিকী কমলাত্মিকা বা রাজরাজেশ্বরীর প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা হয়; তবে দেশীয় চিত্রের সহিত বিলাতীর তুলনায় বিলাতীয়েরই প্রশংসা ও গৌরব করিতে হয়।

যাহা হউক এই সকল আধুনিকী মূর্ত্তি এক্ষণে বসিবার গৃহে অধিষ্ঠান করেন। পৌরাণিকী দশমহাবিদ্যা আমার শয়নাগারে অন্তঃপুরে স্থান পাইয়াছেন।

দশমহাবিদ্যা আমার শয়নাগারে আছেন; আমি রাত্রির অল্পালোকে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই; বাল সূর্য্যের কিরণপাতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গ হয়; ধূমাবতী আমার সম্মুখে থাকেন; ছিন্নমস্তাকে পশ্চাতে রাখিয়াছি। এই সকল দেখিয়া, দেখিয়া এক্ষণে খেয়াল দেখিতেছি; যদি আমার মতি ভ্রম হয়, আমার রুচি সংশোধনকারিগণ দায়ী হইবেন।

আমার বোধ হয় যে এই ভারতবর্ষের দশ দশাই দশমহাবিদ্যা। এক্ষণে সপ্তমী দশা চলিতেছে, সেই দশার প্রতিমূর্ত্তিই ধূমাবতী মূর্ত্তি।

প্রথম দুই দশায় কালী ও তারা মূর্ত্তি। আর্য্য দস্যু বিবাদ লইয়া যখন ভারতবর্ষ প্রত্যহ রক্তে স্নান করিত, এ সেই তখনকার মূর্ত্তি। তখনই ভারতবর্ষ অনার্য্য জাতিদিগের জন্য "সদ্যশ্ছিন্ন শিরঃ খড়্গ বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজা" আবার তখনই আর্য্যদিগের প্রতি "অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধ পাণিকা"। তখন ভারত দস্যু শোণিতপ্লাবিত; "শিবাভির্ঘোর রাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতা"। ভারতের ভীম নৃশংসতাই কালী ও তারা মূর্ত্তি,—তখনই ভারত মাতা করাল বদনা, ঘোর মহামেঘপ্রভা, মুক্তকেশী, "কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডালী, গলদ্রুধিরচর্চ্চিতা, ঘোর রাবা, মহারৌদ্রী"। তখনই ভারত ক্ষেত্র অনার্য্যগণের জন্য অনন্ত চিতা স্বরূপ,

তাহাতেই—তারার ধ্যানে বলা হইয়াছে যে "জলচ্ছিতা মধ্যগতা, ঘোর দংষ্ট্রা করালিনী। সাবেশ স্মেরবদনা স্ত্র্যলঙ্কার বিভূষিতা ॥"

এই গেল ভারতের প্রথমাবস্থা, তাহার পর ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী দুই মূর্ত্তি। তখন আর পূর্ব্বের ভাব নাই। সে নৃশংসতা বিদূরিত হইয়াছে ; কিন্তু যুদ্ধ স্পৃহা এখনও যায় নাই।

এখন দেবী আর মুণ্ডমালা, করকাঞ্চী বিভূষিতা হইয়া, খড়্গ কাতি ধারণ করিয়া, ঘোর অট্টহাসে ভূমিকম্প, হৃৎকম্প সম্পাদন করেন না বটে, কিন্তু তথাপি রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে—

"রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর।
চারিহাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃ শর ॥"

এখন ভারত সিংহাসনের দেবতারাই মূল। হস্তে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর।

পাশাঙ্কুশ শাসনাস্ত্র ; ধনুর্ব্বাণ যুদ্ধাস্ত্র ; ভারত এক্ষণে রাজ্ঞী কিন্তু যুদ্ধার্থিনী। কিন্তু পরেই ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তিতে দেখুন,

"রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ।
পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ ॥"

সেই পাশাঙ্কুশ আছে কিন্তু সে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন রাজ্ঞী অভয় দানে সকলকে তুষ্ট করিতেছেন। এক্ষণে ভারত, রাজ্ঞী ; এক্ষণে ভারত, শান্তি। এটি বড় সুন্দর মূর্ত্তি। ভারতমাতা তখন যথার্থই ভুবনেশ্বরী।

তাহার পর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব। তান্ত্রিক যোগের সৃষ্টি। ভারত অধঃপাতে যাইবেন তাহারই সূচনা হইতেছে। ভারত আর রাজ্ঞীরূপে পাশাঙ্কুশ ধরিতে ইচ্ছা করেন না। তাহাতেই এক্ষণে

"অক্ষমালা পুঁথি বরাভয় চারিকর।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট উপর ॥"

পূর্ব্বের বরাভয় আছে কিন্তু পাশাঙ্কুশের পরিবর্ত্তে পুঁথি অক্ষমালা লইয়াছেন। ভারতে সংস্কৃত গ্রন্থের এই সময়ে অত্যন্ত আড়ম্বর, যোগের জপের বড়ই আড়ম্বর, তাহাতেই ভারতমাতা অক্ষমালা করে গ্রহণ করিয়াছেন ; শুদ্ধ অক্ষমালা লইয়াই ক্ষান্ত নহেন ; এখন

"রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল আসনা।
মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণ ভূষণা ॥"

"মুণ্ডমালা গলে" তান্ত্রিক শবসাধনা আরম্ভ হইয়াছে। ভারত উচ্ছিন্ন

যায় আর বিলম্ব নাই। তান্ত্রিক কালের ভারতের এই মূর্ত্তি; এখন আর ভারত রাজ্ঞী নহেন ভারত যোগিনী, ভারত ভৈরবী। এই ভৈরবী দশায় যত কেন অমঙ্গল হউক না, বহুল সংস্কৃত চর্চ্চা হইয়াছিল; নানা তন্ত্রের সৃষ্টি হয়; সেই সকল তন্ত্রে মগধ, মিথিলা, বঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ অদ্যাপি আকুল করিয়া রাখিয়াছে।

ষষ্ঠী দশায় তন্ত্র প্লাবন। ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি। স্বার্থপরতা ও স্বার্থ শূন্যতা উভয় যোগ নিষ্পন্না কঠোর বাতুলতা; নৃশংসতা; শোণিত স্পৃহা; কুৎসিত কাম প্রবৃত্তি; নির্লজ্জতা; এইগুলি এ মূর্ত্তির সমবায়ী কারণ। ইহার সংস্কৃত ধ্যান সংস্কৃতই থাকুক।

জবাকুসুম সঙ্কাশং রক্ত বন্ধুক সন্নিভং।

* * * * *

মধ্যেতুতাং মহাদেবীং সূর্য্যকোটি সমপ্রভাং।
ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকং॥
প্রসারিতমুখীং দেবীং লেলিহানাগ্রজিহ্বিকাং।
পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠবিনির্গতাং॥
বিকীর্ণ কেশপাশাঞ্চ নানাপুষ্পসমন্বিতাং।
দক্ষিণেচ করে কর্ত্রীং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং॥
দিগম্বরীং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ় পদেস্থিতাং।
অস্থিমালা ধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং॥

দেবীর সহচরী ডাকিনী বর্ণিনীর মূর্ত্তিও ঐরূপ ভয়ানক।

দেবী গলোচ্ছলদ্রক্তধারাং পানং প্রকুর্ব্বতীং।
বর্ণিনীং লোহিতাং সৌম্যাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাং॥
কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণ যোগতঃ।
নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং জ্বলত্তেজোময়ীমিব॥
প্রত্যালীঢ় পদাং দিব্যাং নানালঙ্কার ভূষিতাং।
সদা দ্বাদশ বর্ষীয়াং অস্থিমালা বিভূষিতাং॥
ডাকিনীং বামপার্শ্বেতু কল্পসূর্য্যান লোপমাং।
বিদ্যুজ্জটাত্রিনয়নাং দন্ত পংক্তি বলাকিনীং॥
দংষ্ট্রা করাল বদনাং * * * *
মহাদেবীং মহাঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাং॥

লেলিহান মহাজিহ্বাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং।
কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণ যোগতঃ॥
দেবী গলোচ্ছলদ্রক্তধারাপান প্রকুর্ব্বতীং।
করস্থিত কপালেন ভীষণেনাতি ভীষণাং॥

ভারতমাতা আপনার মুণ্ড আপনি কাটিয়াছেন, ভারত সঙ্গিনীরা সেই রক্ত পান করিতেছে; উন্মত্তা জ্ঞানহীনা ভারতমাতা আপনিও সেই রুধির ধারা গলাধঃকরণ করিতেছেন; ভৈরবী দশায় ভারত জপে বসিয়াছিলেন; এখন ভারত উচ্ছিন্ন হইয়াছেন। কুৎসিত কাম প্রবৃত্তির উপর ভারতমাতা নৃত্য করিতেছেন; আপনার শোণিতে আপনি মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন; লজ্জাহীনা নৃত্য করিতেছেন; মস্তকচ্ছিন্না নৃত্য করিতেছেন; জ্ঞানচ্ছিন্না নৃত্য করিতেছেন; কি ভয়ানক নৃত্য; উন্মত্ততা নৃশংসতা একত্র হইলে কি ভয়ানক ভাব হয়!!! ভারতমাতার এই ভাব! আর দেখিতে পারি না।

ভারতের কি এইবার সব ফুরাইল? ভারত নাম কি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইল? যবন শাসনে কি ভারতবর্ষীয়েরা যবনত্ব প্রাপ্ত হইবে? ছিন্নমস্তা কি দশমহাবিদ্যার শেষ বিদ্যা? না—দেবতারা মরেন না। ভারতমাতাও মরেন না। যবনের পর ইংরাজ আসিয়াছে, ভারতের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছে; ভারতকে জীবিত করিয়াছে; কিন্তু জীবিত করিয়াছে মাত্র; তেজোদান করিতে পারে নাই—ভারত জীর্ণ, ভারত শীর্ণ, ভারত মলিন, ভারত ক্ষুধায় আকুল, ভারত চিন্তায় ব্যাকুল। ভারতের এক হাতে কুলা, আর হাতে মালা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভারত মাতার এক্ষণে ধূমাবতীর দশা।

ভারতমাতা এক্ষণে—

বিমুক্ত কুন্তলা রূক্ষা বিধবা বিরল দ্বিজা।
কাকধ্বজ রথারূঢ়া বিলম্বিত * *॥
সূর্প হস্তাতি রূক্ষাক্ষা ধৃত হস্ত বরান্বিতা।
প্রবৃদ্ধঘোণাতু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা॥

বিধবা ভারতের পেটে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই: রূক্ষকেশা, রূক্ষাক্ষা; দন্ত বিরল হইয়াছে; শোকে তাপে দৃষ্টি কুটিল হইয়াছে, যেন সকল আশ্রয় পরিচ্যুতা হইয়া পুরাতন ভগ্নযান রথে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন; হায়! সেই রথের উপরি কাক বসিতেছে। বড় কুলক্ষণ; ভয়ে ভারত কাঁপিতেছেন, কাঁপিতে কাঁপিতে সেই কম্পিত হস্তে ভঙ্গী করিয়া বলিতেছেন, "আমায় রক্ষা কর, আমি দেবী এক্ষণে অনাথা, রক্ষা কর তোমার মঙ্গল হইবে।" উদ্ধত ইংরাজ শাসন কর্ত্তা! একবার

স্থিরচিত্তে এই মূর্ত্তির ধ্যান কর। একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখ। দেখ দেখি সোণার পুরী কি হইয়াছে? ভুবনেশ্বরী এখন পথের কাঙ্গালিনী হইয়াছেন। কাঙ্গালিনীকে দেখিয়া তোমার দুঃখ হয় না? তুমি মনুষ্য, অবশ্যই দুঃখ হয়। তবে এই সময় দুঃখে দুঃখে দুঃখীদিগের জন্য, ঐ দুঃখিনীর সন্তানগণের জন্য কিছু ব্যথারব্যথী ব্যবস্থা কর দেখি।

এখনও আমার জাগ্রত স্বপ্ন ভঙ্গ হয় নাই, আমার এখনও আশা হইতেছে যে ভারতমাতা আবার বগলা মূর্ত্তিতে দেখা দিবেন।

ইংরাজ অনুকম্পায় ভারতের বৈরি পক্ষ ভারতের কর-কবল-গত হইবে; ভারতমাতা আবার রত্ন গৃহে রত্ন সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইবেন, ভারতমাতা আবার সুভূষণে ভূষিতা হইবেন। এমন দিন হইবে। ভারতবাসিগণ, আইস সকলে আমার সঙ্গে এক স্বরে একবার সেই মূর্ত্তির ধ্যান কর;

মধ্যে সুধাব্ধি মণি মণ্ডপ রত্নবেদী সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীত বর্ণাং।
পীতাম্বরাভরণমাল্য বিভূষিতাঙ্গীং দেবীং স্মরামি ধৃত মুদ্গর বৈরিজিহ্বাং॥
জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং বামেন শত্রুং পরিপীড়য়ন্তীং।
গদাভি ঘাতেনচ দক্ষিণেন পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি॥

বগলা সিদ্ধবিদ্যার মন্ত্রে সকলে সিদ্ধ হইবার উপায় অবলম্বন কর; বগলা দেবীই তোমাদের ইষ্ট দেবতা হউন; হৃদয় পটে তোমরা এই দেবীর মূর্ত্তিই চিত্রিত করিয়া রাখ।

ইহার পরেই ভারতের মাতঙ্গী মূর্ত্তি। ভারতমাতা আপনার চিরপরিচিত দয়ার বশবর্ত্তিনী হইয়া সেই কর কবলিত শত্রুকে বিমুক্ত করিয়াছেন; আত্ম রক্ষার্থে খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়াছেন; শাসনাস্ত্র পাশাঙ্কুশ পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়াছেন; রত্ন পদ্মাসনে রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ভারতমাতা বহুকাল এভাব গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি ইহার পরেই মহালক্ষ্মীরূপে ভবে দেখা দিবেন;—

"সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ আসন অম্বুজ।
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ॥
চতুর্দ্দন্ত চারিশ্বেত বারণ হরিষে।
রত্ন ঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে॥"

ভারত মাতার যুগ যুগান্তরের মলরাশি শ্বেত হস্তিগণ অমৃত বারি সিঞ্চনে বিধৌত করিয়া দিতেছে। ভারতমাতা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন; পদ্মাসনে পদ্মাসনা পদ্মহস্তে জগতে অভয় দান করিতেছেন। আহা কি শুভদিন! শরীর রোমাঞ্চ হয়। সকলে একবার আনন্দ জয়ধ্বনি কর।

ভারত মাতার অভিষেক হইতেছে। মাতা, যোগিনী মূর্ত্তি, রাজ্ঞী মূর্ত্তি, এমন যে ভুবনে অতুলা ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি, মাতা তাহা গ্রহণ করেন নাই ; মা এখন মহালক্ষ্মী ভাবে শোভা পাইতেছেন ; সকলে জয়ধ্বনি কর। * * *

তাহাতেই বলিতেছিলাম, আমার বুঝি মতিভ্রম হইয়াছে। ভারতমাতা মহালক্ষ্মী মূর্ত্তি কতশত বৎসর পরে ধারণ করিবেন, আমি এখনই জয়ধ্বনি করিতে বসিলাম ! সম্মুখে কি দেখ দেখি—ঐ দেখ মাতার সেই ভগ্ন যান রথোপরি কাক বসিয়া আছে ; ডাকিতেছে ক-অ-অ-অ, ক-অ-অ-অ দেবীর ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিত ভ্রূকুটিপাতে অন্তর্দাহ হয় ; আর সহিতে পারি না !

মাতর্ব্বর্গলে আবিরাবিঃ।

বড় ভালবাসি আমি তোমারে ভূধর!
দেখিয়াছি বারবার, বাসনা না মিটে আর,
দেখিতে এসেছি পুনঃ ওরূপ সুন্দর;
করিতে অমৃত পান কে কবে কাতর?
যে নাহি দেখেছে কভু ওরূপ মাধুরী,
কি জানে সে কত শোভা ধরে নরপুরী?

২

তাপস-প্রবর তুমি হেন মনে হয়!
মলিন অজিন বেশ, শিরে শোভে শুভ্র কেশ,
লোমরাজিরূপে শোভে চারু তরুচয়,
যজ্ঞ-উপবীত গলে নির্ঝর নিচয়।
দিনকর-করজাল করিয়া ভক্ষণ
তৃপ্ত হও করি পান স্নিগ্ধ সমীরণ।

৩

গম্ভীর-প্রকৃতি তুমি, সুধীর-স্বভাব!
নাহি যেন কষ্ট ক্লেশ, ভাবনা নাহিক লেশ,
আছ বসি নাহি যেন কিছুরি অভাব,
কিবা শীতে কিবা গ্রীষ্মে সদা সমভাব।
করিতেছে কত জন সুদেহ মর্দ্দন,
তবু নাহি হয় তব ধ্যান বিভঞ্জন।

৪

এ ধরামণ্ডলে তুমি ধৈর্য্যঅবতার!
কত যে যাতনা সহ, কত দুঃখ ভার বহ,
পবন বরুণ রিপু উভয়ে তোমার;
বাত্যা গাত্রে বেত্র সদা করিছে প্রহার।
নাহিক বিকার তবু তিলেকের তরে,
কষ্ট, ক্লেশ, শোক, দুঃখ সহ অকাতরে।

৫

তব সহবাস-সুখে বাঙ্গালী বঞ্চিত!
বলহীন, ক্ষীণকায়, সোনার শৃঙ্খল পায়,
পিঞ্জরের পাখী সম গায় বসি গীত,
স্বাধীনতা সুখে এরা সুচির বঞ্চিত।
তব কাছে বাস যদি করে, হিমাচল,
দুর্ব্বল বাঙ্গালী হয় সতেজ, সবল।

৬

পূর্ব্ব উপাখ্যান এক হইল স্মরণ—
কপিল তাপসবর, ধ্যানে মগ্ন নিরন্তর,
অশ্ব অন্বেষিতে তথা এল বীরগণ,
ধ্যান-মগ্ন ঋষিবরে করিল পীড়ন;
সগর রাজার ষষ্টি-সহস্র তনয়,
তাপসের শাপে সব হলো ভস্মময়।

৭

তুমিও ত ধ্যানে মগ্ন ছিলে, গিরিবর!—
দুর্দ্দান্ত যবন যবে, বজ্রোপম ভীমরবে,
করিল প্রবেশ বলে ভারত ভিতর,
তুমিও ত ধ্যানে মগ্ন ছিলে, গিরিবর!
কেন না কটাক্ষ তুমি করিলে তখন?
ভস্মরাশি হতো সব অধম যবন।

৮

কেন না কটাক্ষ তুমি করিলে তখন ?
সগরের বংশ মত, ধ্বংস হতো রিপু যত,
গজনির শিরে হতো অশনি পতন,
বাবর তৈমুরলঙ্গ হইত নিধন।
গৌরী কি আসিত তবে ভারতে ন বার ?
আসিত কি দেরায়স্, শূর শিকন্দার ?

৯

কোথা গেল ভারতের সে পূর্ব্ব গৌরব ?
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির, কোথা ধনঞ্জয় বীর,
কোথা দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, কোথায় কেশব ?
কোথা মেঘনাদ বলী, কোথা বা রাঘব ?
কোথায় বাল্মীকি মনু, কোথা বেদব্যাস ?
কোথা বররুচি, মাঘ, কোথা কালিদাস ?

১০

চলে গেছে অস্তাচলে সে সব তপন !
উদিবে না আরবার, উজলিবে নাহি আর
ভারতের ক্ষীণ আঁখি, মলিন বদন,
অতল জলধি তলে হয়েছে মগন।
তুমি কেন আছ মিছে পড়িয়া হেথায়,
যাও, গিরিবর, নাহি দাসত্ব যথায়।

শ্রীনিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

আকবর বাদসাহ বাঙ্গালার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে আপন কোন বিশ্বস্ত রাজমন্ত্রীকে এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। রাজমন্ত্রী এখানে আসিয়া দেখিলেন, যে বাঙ্গালার মত শস্যশালিনী রাজ্য আর কোথাও নাই। তিনি বাদসাহের নিকট বিস্তর প্রশংসা করিয়া শেষ নারিকেলফল উপলক্ষে লিখিলেন যে, "অধিক আর কি বলিব, বিধাতা বাঙ্গালীর নিমিত্ত বৃক্ষশিরে পর্য্যন্ত দুই দুই টুক্‌রা রুটি আর এক এক পিয়ালা জল তুলিয়া রাখিয়াছেন। যে দেশের প্রতি বিধাতা এত সদয়, সে দেশের অধিবাসিগণ অপেক্ষা ভাগ্যবান্ আর কে আছে?"

বাঙ্গালা শস্যশালিনী বলিয়া রাজমন্ত্রী বাঙ্গালীকে ভাগ্যবান্ বলিয়াছিলেন। আবার, সম্প্রতি কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত এদেশ শস্যশালিনী বলিয়া আমাদিগকে দুর্ভাগ্যশালী বলিয়াছেন। যে দেশের উৎপাদিকা শক্তি অসাধারণ, তথাকার অধিবাসিগণের ভাগ্যও অসাধারণ, এই কথা বলিলে ইহার যুক্তি অপর সাধারণ সকলে বুঝিতে পারে; কিন্তু কেহ একথার বিপরীত বলিলে তাঁহাকে একান্ত হাস্যাস্পদ হইতে না হউক, তাঁহার কথা হঠাৎ গ্রাহ্য হইবে না।

কিন্তু যিনি বলিয়াছেন, যে, এদেশের অসাধারণ উৎপাদিকা শক্তিই আমাদের অনর্থের মূল, তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত * অতএব তাঁহার যুক্তি শুনিতে আমাদের ইচ্ছা হইতে পারে। সেই যুক্তির স্থূল মর্ম্ম সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে "যদি দুইটি দেশ এরূপ থাকে, যে উভয়ে সর্ব্বপ্রকারে সমান; কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, একটি দেশে সাধারণের আহারীয় বস্তু প্রচুর এবং সুলভ; আর অপর দেশটিতে তাহা দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য; তাহা হইলে যে দেশে আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রচুর এবং সুলভ, সেই দেশের সাধারণ লোক সংখ্যা অন্য দেশ অপেক্ষা সত্বর বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।"

---

* H. T. Buckle.

আর একস্থানে বলিয়াছেন যে "সাধারণ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদের পরস্পরের আয় অর্থাৎ শ্রমের মূল্য কমিয়া যায়। যে সংখ্যক মজুর সমাজের আবশ্যক, তদপেক্ষা অধিক হইলে মজুরির মূল্য কাজে কাজেই কমে। যে টাকা বৎসরে বৎসরে কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মজুর উপার্জ্জন করিত, সেই টাকা যদি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অপেক্ষা অধিক মজুরদিগের মধ্যে বিভক্ত হয়, তবে প্রত্যেকের অংশ পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যাইবে; তাহাতে শ্রমজীবিগণ দরিদ্র ব্যতীত কখন অন্যপ্রকার হইতে পারিবে না।

"যদি এইরূপে সাধারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া, তাহাদের পরস্পরের আয় হ্রাস করে, তাহা হইলে ধনীদিগের সহিত তাহাদের গুরুতর বৈষম্য জন্মে। অর্থেই ক্ষমতা। নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিরা দরিদ্র এইজন্য সমাজে তাহাদের কোন ক্ষমতা থাকে না; সমুদয় ক্ষমতা উচ্চশ্রেণীস্থদিগের হস্তগত হয়।"

সুপণ্ডিত বক্‌কল সাহেব এইরূপ কয়েকটি নিয়ম প্রথমে বলিয়া* শেষে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সমালোচন আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে "ভারতবর্ষে অপর সাধারণের আহার্য্য দ্রব্য অর্থাৎ চাউল প্রচুর এবং সুলভ, সেইজন্য ভারতবর্ষের নিম্নশ্রেণীর লোক বহুসংখ্যক। এই শ্রেণীর লোক বহুসংখ্যক হইলে যাহা ঘটিয়া থাকে, ভারতবর্ষে বহুকালাবধি তাহা ঘটিয়াছে, অর্থাৎ গুরুতর বৈষম্য ঘটিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী, আর কৃষক প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোক সকলে অতি দীন হীন। এরাজ্যে যাহারা ধনের সৃষ্টি করে, পরিণামে তাহারা সেই ধনের অতি অল্প অংশ পায়। অবশিষ্ট ধন সমুদায় খাজনা, সুদ, লাভ, ইত্যাদি আকারে উচ্চশ্রেণীদিগের করস্থ হয়। উচ্চশ্রেণীস্থগণ ধনী বলিয়া সমাজের সমস্ত ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তগত। রাজ্যের আর আর সমুদয় লোক তাঁহাদিগের নিকট করপুটে ভৃত্যবৎ কালযাপন করিতেছে।

"রাজ্য মাত্রেরই ধন মজুরী, খাজনা, সুদ, লভ্য, এই কয় প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে। যে রাজ্যে খাজনা প্রভৃতিতে সেই ধনের অধিকাংশ যায়, সেখানে মজুরীর অংশ অতি অল্প হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের খাজনার রেট অতি উচ্চ, উৎপন্নের অর্দ্ধেক খাজনায় যায়। সুদের নিয়ম শতকরা ১৫ হইতে ৬০ পর্য্যন্ত।

---

* "But it may be useful to capitulate the facts on which the argument is based. The facts, then, are simply these—The rate of wages fluctuates with the population; increasing when the labor market is undersupplied, diminishing when it is oversupplied. The population itself, though affected by many other circumstances, does undoubtedly fluctuate with the supply of food; advancing when the supply is plentiful, halting or receding when the supply is scanty."

Buckle's History of Civilization Vol. I, Ch. II.

এমত অবস্থায় কৃষক মোট উৎপন্নের অতি অল্প অংশ ব্যতীত আর কি পাইবে? খাজনা ও সুদ যত বাড়িবে কৃষকের লভ্য ততই কমিবে। এই কারণ ভারতবর্ষের সাধারণ লোকেরা কেবল মাত্র প্রাণধারণোপযোগী অর্থের নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইয়াছে। "কেবল তাহাই নহে। সকল রাজ্যেই দরিদ্রতা ঘৃণাস্পদ এবং ধনাঢ্যাবস্থা মান্য। ধনে ক্ষমতা জন্মে, সেই ক্ষমতা হইতে পীড়নের জন্ম; অতএব ভারতবর্ষের ধনিগণ দরিদ্রদিগকে বহুকালাবধি পীড়ন করিয়া আসিতেছেন। বরং সেই পীড়ন করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রে পর্য্যন্ত বিধি হইয়াছে। ভারতবর্ষের এই অপর সাধারণ ব্যক্তিদিগকে শূদ্র বলে। ইহাদিগের মধ্যে কেহ যদি কখন উচ্চশ্রেণীদিগের সহিত একাসনে বসে, মনুর শাস্ত্রানুসারে তাহাকে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা দগ্ধ করিতে হইবে। যদি ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসে, তবে তাহার যাবজ্জীবনের মত অঙ্গচ্ছেদ করিতে হইবে। যদি কোন শূদ্র শিক্ষাকাঙ্ক্ষায় কোন ধর্ম্ম পুস্তক শ্রবণ করে, তবে তাহার কর্ণে তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিতে হইবে। যদি শ্রবণ করিয়া আবার তাহা স্মরণ রাখে, তবে তাহার একেবারে প্রাণবধ করিতে হইবে। যদি উচ্চশ্রেণীস্থ কেহ শূদ্রহত্যা করে, তবে বিড়াল কি কুক্কুর হত্যার যে দণ্ড, তাঁহার পক্ষে কেবল তাহাই বিধান হইবে। শূদ্র ধন সঞ্চয় করিতে পারিবে না। আর একটি বিধান আছে। শূদ্রের দাসত্ব মোচন হইবে না; কেননা দাসত্ব তাহাদের নৈসর্গিক অবস্থা। বাস্তবিক তাহা সত্য। কাহার সাধ্য, নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা করিয়া শূদ্রের উদ্ধার করে?"

বক্‌কল সাহেব এইরূপ বিস্তর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের যে বৈষম্য দেখাইয়া বলিয়াছেন যে "কাহার সাধ্য শূদ্রের উদ্ধার করে?" সে বৈষম্য এক সময়ে সকল সমাজেই ঘটিয়া থাকে। একদিকে কতকগুলি ঐশ্বর্য্যশালী যথেচ্ছাচারী ব্যক্তি অত্যাচার করিতে থাকেন, আর একদিকে দীন দরিদ্রগণ সেই অত্যাচার প্রভুপীড়ন মনে করিয়া অতি শান্তভাবে তাহা সহ্য করিতে থাকে। এই বৈষম্যাবস্থা ইংলণ্ডে, ফ্রান্সদেশে ও জর্ম্মণিতে ছিল এবং অদ্যাপিও অনেক দেশে আছে। যৎকালে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড প্রভৃতি দেশে ফিউডল সিস্‌টম (Feudal System) প্রবল ছিল, তৎকালে ঐ সকল দেশের উচ্চ শ্রেণীর এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কি ভয়ানক বৈষম্য লক্ষিত হইত! বৈষম্য কাজে কাজেই হইবে। ঐ সময় রাজ্যের সমস্ত ভূমিই বিভক্ত হইয়া অল্পসংখ্যক লোকের হস্তগত হইয়াছিল। কেবল মাত্র সেই কয়েকটি ব্যক্তি দেশের ভূম্যধিকারী ছিলেন; অবশিষ্ট সকলে তাঁহাদের অধীন সামান্য প্রজা বা ভৃত্য বা গোলাম ছিল। যদি কোন দেশের সমস্ত ভূমি কেবল কয়েকটী জমিদার অধিকার করে, তবে সেই কয়েকটী ভূম্যধিকারীর অধিকার অতি বিস্তীর্ণ হয় সন্দেহ নাই। এবং তাঁহাদের ধন যে

তদনুরূপ বিপুল হয়, তাহা বলা বাহুল্য। ইংলণ্ডে এইজন্য ভূম্যধিকারীরা অসাধারণ ধনশালী হইয়াছিলেন; অর্থাৎ তাৎকালিক অবস্থায় প্রায় সমস্ত ধন তাঁহাদের হস্তগত হইত। বক্‌কল সাহেব আপনিই বলিয়াছেন "ধন হইলেই ক্ষমতা হয়" অতএব তাৎকালিক সমাজের সমস্ত ক্ষমতা তাঁহাদিগের হস্তগত হইয়াছিল। তাঁহাদের ক্ষমতা এতই প্রবল হইয়াছিল যে, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন। তাহার প্রতিরোধ করা কাহারও সাধ্য ছিল না। তাঁহারা দেশের আইন-কানন ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন; যে আইন দেশে ছিল, তাহা দ্বারা কেবল তাঁহাদের যথেচ্ছাচারিত্বের সাহায্য হইত মাত্র। অধিক কি, নববিবাহিতা যুবতী প্রথমে আপন ভূম্যধিকারীর গৃহে বাস না করিয়া স্বামীর গৃহে যাইতে পারিতেন না। মনুর যে বিধানগুলিন বক্‌কল সাহেব যত্নে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদপেক্ষা এই নিয়মটী নিতান্ত সামান্য পীড়নের পরিচায়ক নহে। যে স্থানে স্বামিগণ আপন আপন আত্মাবৎ প্রণয়িনী ভার্য্যা অন্যকে উপহার দিতে বাধ্য ছিলেন, সে স্থলে যে তাঁহাদের ধন সম্পত্তি নির্ব্বিঘ্নে ভোগ হইত অথবা যে তাঁহাদের ধন সম্পত্তি সঞ্চিত হইতে পারিত, এমত বোধ হয় না। উপরে যে কদর্য্য প্রথার উল্লেখ করা হইল, কেবল তাহাই উপলক্ষ করিয়া বিলাতের তাৎকালিক অবস্থা অনেক অনুভূত হইতে পারে। অনুভবেরও প্রয়োজন নাই যাহা ইতিবৃত্তে প্রমাণ আছে তাহাই যথেষ্ট। ঐ সময়ে ফিউডল লর্ডদিগের (Feudal Lords) একাধিপত্যের যেমত সীমা ছিল না, সেইরূপ আবার অপর সাধারণ দিগেরও দৈন্যের সীমা ছিল না। সে বৈষম্য ভারতবর্ষের বৈষম্য অপেক্ষা নিতান্ত অল্প নহে। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে যদি এই বৈষম্য ক্রমে অদৃশ্য হইয়া থাকে, তবে কেন না আমাদের দেশ হইতেও এক সময়ে তাহা অন্তর্হিত হইবে? সমাজের অবস্থা বিশেষে বৈষম্য থাকে। বক্‌কল সাহেব ভারতবর্ষের যে বৈষম্য দেখাইয়াছেন তাহা নিয়মাধীন। সমাজের প্রথম অবস্থায় শারীরিক শক্তিজনিত বৈষম্য হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় ধনজনিত বৈষম্য। তৃতীয় অবস্থায় বিদ্যাজনিত বৈষম্য। আবার চতুর্থ অবস্থায় এই সকল বৈষম্যের অপনয়ন হইতে থাকে।

প্রথম অবস্থায় সমাজের সকল ব্যক্তিই আপন আপন আহার্য্য দ্রব্যাদির আহরণে তৎপর থাকে। তদতিরিক্ত আর কোন চেষ্টা হয় না চেষ্টার সময়ও থাকে না। তৎকালে আহার্য্য দ্রব্যের এতই অপ্রতুল. যে তাহা আহরণ করিতে প্রায় সমস্ত সময়ই অতিবাহিত হয়। এই অবস্থার বৈষম্য শারীরিক শক্তিসম্ভূত।

কৃষিকর্ম্মে নৈপুণ্য জন্মিলে সমাজের দ্বিতীয় অবস্থা আরম্ভ হয়। তখন যে পরিমাণে শস্য সমাজের নিমিত্ত আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত উৎপন্ন হইতে থাকে।

সেই অতিরিক্ত অংশ ব্যক্তি বিশেষের নিকট সঞ্চিত হইয়া ধন সংজ্ঞায় পরিণত হয়, অতএব এই অবস্থার বৈষম্য ধনজাত—

যতদিন সমাজে ধনসঞ্চয় না হয়, ততদিন বিদ্যার অনুশীলন হয় না। সকলেই আপন আপন আহার্য্য সামগ্রী আহরণে ব্যস্ত থাকেন, বিজ্ঞান বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ কাহারও ঘটে না। পরে ধন সঞ্চয় হইলে অবকাশ হয়, এবং বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হয়। ইহা সমাজের তৃতীয় অবস্থা, এই অবস্থার বৈষম্য বিদ্যাজাত।

সমাজের চতুর্থাবস্থা কেবল ইউরোপের কোন কোন দেশে অল্পকাল হইল আরম্ভ হইয়াছে। এই অবস্থার চরম কি তাহা এ পর্য্যন্ত অনুভূত হয় নাই। বর্ত্তমানে এইমাত্র দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্ব পূর্ব্বাবস্থার বৈষম্যের এই চতুর্থ অবস্থায় অপনয়ন হইতেছে। প্রথমাবস্থার বৈষম্য অর্থাৎ শারীরিক শক্তিজাত বৈষম্য, নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্রে ও অপরাপর কৌশলে অনেক দিন পর্য্যন্ত অপনীত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে শারীরিক শক্তির আর পূর্ব্বমত গৌরব ও সম্মান নাই; বরং অনেকে এই শক্তিকে পশুদিগের একমাত্র উপায় ব্যতীত আর সভ্যতম মনুষ্যদিগের স্পৃহণীয় বলিয়া বোধ করেন না। সমাজে শারীরিক শক্তির যে প্রয়োজন ছিল, এক্ষণে তাহা প্রায় অগ্নি, বায়ু, বরুণ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি দেবতারা সম্পাদন করিতেছেন।

দ্বিতীয় অবস্থার বৈষম্য, অর্থাৎ ধনজাত বৈষম্য, অতি গুরুতর ছিল। তাহাও এই চতুর্থাবস্থায় অপনয়ন হইতেছে। বাণিজ্য বাড়িয়াছে অতএব লক্ষ্মীদেবী এক্ষণে আর পূর্ব্বমত অল্পসংখ্যক লোকের ক্রীতা দাসী নহেন। তাঁহার পদ শৃঙ্খল মুক্ত হইয়াছে, তিনি স্বাধীনা হইয়াছেন, এক্ষণে অনেক ঘরে তাঁহার যাতায়াত বাড়িয়াছে। কেবল যে ধন বাড়িয়াছে, বা অনেকে ধনী হইয়াছেন এমত নহে। মহাধনীদিগের সংখ্যা কমিয়াছে এবং মধ্যশ্রেণী ধনীদিগের সংখ্যা বাড়িয়াছে। অথবা পূর্ব্বে যাহাদিগকে মহাধনী বলিয়া বোধ হইত, এক্ষণে সেরূপ ধনীকে আর মহাধনী বলিয়া বোধ হয় না; দিন দিন ধন এতই সচরাচর হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে ধনে ক্ষমতা হইত, এক্ষণেও তাহাই হইয়া থাকে, কিন্তু সমাজের অধিকাংশ না হউক অনেকেই ধনী হইয়াছেন এইজন্য অনেকেই ক্ষমতাবান হইয়াছেন। পূর্ব্বে কেবল কয়েকজন মাত্র ধনী ছিলেন, তাঁহারা ক্ষমতাবান বলিয়া দরিদ্র ও অক্ষমদিগের প্রতি অত্যাচার ও পীড়ন করিতেন, কেহ প্রতিবন্ধক হইবার লোক ছিল না; এক্ষণে আর সে সময় নাই। ধনবানেরা পূর্ব্বে যাহাদিগের উপর পীড়ন করিতেন, এক্ষণে তাহাদের মধ্যে অনেকে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া স্বতন্ত্র আর এক শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের আর অন্নাভাব নাই, ধনীর নামে আর তাহাদের

অঙ্গ কণ্টকিত হয় না ; তাহারা এক্ষণে স্বয়ং ক্ষমতাবান এবং তাহাদের সংখ্যা অসীম। এই মধ্যশ্রেণী সৃষ্টি হওয়ায় ধনজাত বৈষম্য লোপ পাইতেছে।

এই চতুর্থ অবস্থায় ধনজাত বৈষম্য যেরূপে ক্রমে অপনীত হইয়া আসিতেছে, আবার সেইরূপে বিদ্যাজাত বৈষম্য অদৃশ্য হইতেছেন। এক্ষণে প্রায় সকলেই বিদ্যানুশীলনে সক্ষম, সকলেই সন্তানদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইতেছে। যে সকল ব্যক্তিরা তদ্বিষয়ে অমনোযোগী, কোন কোন দেশে তাহাদিগকে রাজদণ্ডার্হ হইবার বিধান হইয়াছে। যখন সকলেই পড়িতে শিখিবে তখন, সমাজে নূতন ফল ফলিবে। একজন বিলাতীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, "And wait a little, give time for the realization of the acme of social salvation, gratuitous and compulsory education ; how long will it take ? A quarter of a century, and then imagine the incalculable sum of intellectual development that this single word contains : every one can read !"

বিদ্যাজাত বৈষম্য অতি ভয়ানক। ভারতবর্ষের বৈষম্য সম্বন্ধে বকুকল সাহেব মনুর যে কয়েকটি বিধান উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি না বলুন, কিন্তু তাহা এই বিদ্যাজাত বৈষম্যের ফল। শূদ্র যদি কোন গ্রন্থ শ্রবণ করে, তবে তাহার কর্ণে তপ্ত তৈল ঢালিয়া দেও। শূদ্র যদি কোন গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া আবার তাহা স্মরণ রাখে, তবে তাহাকে প্রাণে বধ কর। অবশ্য বধ করিতে হইবে ; নতুবা ব্রাহ্মণের একাধিপত্য যায় ; বিদ্যার প্রভুত্ব ধনাপেক্ষা অধিক, তাহা ছাড়া হইবে না। ভারতবর্ষে রাজাধিরাজেরা ব্রাহ্মণকে পূজা করিতেন। ইউরোপে মহাবিক্রম-শালী ফিউডেল প্রভুরা কর্ডিনলদিগকে ভয় করিতেন। এমন কি, তাহাদিগের বেত্রাঘাত সম্রাটেরাও নতশিরে সহ্য করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আর সে সময় নাই। বিদ্যার দ্বার মুক্ত হইয়াছে, সকলেই বিদ্যা শিখিতেছে, সেই সঙ্গে বিদ্যাজাত বৈষম্য অন্তর্হিত হইয়াছে।

এই চতুর্থাবস্থায় আর একটি মহাশুভকর ব্যাপার ঘটিয়াছে। ব্যক্তি বিশেষের একাধিপত্য ক্রমে লোপ হইয়া আসিতেছে। সকল ক্ষমতাই সমাজের হস্তে ন্যস্ত হইতেছে। সম্রাট্ হইলেও আর একাধিপত্য করিতে পারেন না বা যথেচ্ছাচারী হইতে পারেন না। এক্ষণে সাধারণে তাঁহার দমন কর্ত্তা। তিনি সাধারণের অধীন। মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টিই ইহার মূল কারণ।

বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থায় অতি অল্প লোক ধনী বা বিদ্বান্ হইতেন। তাঁহারা তাৎকালিক সমাজে প্রভু ও প্রধান হইয়া উঠিতেন। অপর ব্যক্তিরা মূর্খ, নির্ব্বোধ ও দরিদ্র থাকিত, এইজন্য তাহাদের কোন ক্ষমতা ছিল না।

তাহারা পশুবৎ হইয়া প্রধানদিগের পার্শ্বে কালাতিপাত করিত। তাহাদিগের সংখ্যা লক্ষ গুণে অধিক হইলেও তাহারা পশুবৎ হইয়া প্রধানদিগের আজ্ঞা বহন করিত। এক একটি করিয়া দেখিলে দরিদ্র, মূর্খ, নির্ব্বোধ, এবং অক্ষম ব্যতীত তাহাদিগকে আর কিছুই বোধ হইবে না। কিন্তু তাহারা একত্র হইতে পারিলে সাগরতুল্য দুর্দ্দম এবং অজেয়। একত্র হইতে পারিলে পর্ব্বতবৎ দৃঢ় এবং ভয়ানক। কিন্তু ঐক্য না থাকিলে পথ-পার্শ্বস্থ রেণুতুল্য মাত্র; প্রতি বাতাগমে উড়িয়া যায়; আবার পদ দ্বারা মর্দ্দিত হইলে সেই মর্দ্দনকারীর পদদ্বয়কে জড়াইয়া ধরে। অনৈক্য তাহাদের এই বিনীত অবস্থার একটি প্রধান কারণ। এক্ষণে সামাজিক যে চতুর্থ অবস্থার কথা বলা যাইতেছে, তদ্দারা এই অনৈক্যের অপনয়ন হইয়াছে। পণ্ডিতবর মিল বলিয়াছেন যে, "সিংহ মনুষ্য অপেক্ষা মহাবল পরাক্রমশালী হইয়াও একতা শূন্য হওয়াতে মনুষ্য জাতির উচ্ছেদ করিতে পারিল না।" সমাজের প্রধান গ্রন্থি ঐক্য এবং সে গ্রন্থির রজ্জু সম্বাদপত্র।

সমাজের অবস্থা ভেদে বৈষম্য এবং তাহার অপনয়ন সম্বন্ধে আমরা যে এত কথা বলিলাম, তাহা কেবল বক্‌কল সাহেবের মতের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত। আমাদের দেশের যে বৈষম্য তিনি দর্শাইয়াছেন, তাহা ফ্রান্স দেশে ছিল, ইংলণ্ডে ছিল, জর্ম্মাণিতে ছিল। কিন্তু সমাজের চতুর্থাবস্থায় তাহা প্রায় সমুদায় অপনীত হইয়াছে। সেই অবস্থা যখন ভারতবর্ষের হইবে, তখন এদেশেরও বৈষম্য দূরীকৃত হইবে। উল্লিখিত ইউরোপীয় রাজ্যে ধনজাত বৈষম্য ছিল। আমাদের যে বৈষম্য বক্‌কল সাহেব দর্শাইয়াছেন, তাহাও সেই ধনজাত; তবে কেন না তাহার অপনয়ন হইবে? এক সময়ে আমাদের দেশে বিদ্যাজাত বৈষম্য ছিল, তাহা এক্ষণে বড় নাই। ধনজাত বৈষম্যই প্রবল। অতএব যে কারণে তাহা অন্য দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, সেই কারণে আমাদের দেশ হইতেও যাইবে।

কেহ কেহ বলিবেন, সমাজের যে চতুর্থ অবস্থা উল্লেখ করা হইয়াছে, সে অবস্থা এদেশে কিরূপে হইবে? আমরা বলি হইবে। যেরূপে হইবে তাহা সময়ান্তরে বলা যাইবে। আর হইবেই বা কেন বলি, হইতেছে বলিলেই স্বরূপোক্তি হয়। পূর্ব্বের বৈষম্য আর বড় নাই; এক্ষণে শূদ্র উচ্চাসনে উপবিষ্ট, ব্রাহ্মণ তাহার পার্শ্বে করপুটে দণ্ডায়মান। ব্রাহ্মণ অপরাধ করিলে আর পূর্ব্বমত অব্যাহতি পান না। এক্ষণে শূদ্রেরাও অপরাধী ব্রাহ্মণের দণ্ড করিতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় আর বাঙ্গালার সমুদায় ধন দুইচারিটী লোকের উদরস্থ হইতে পায় না। বর্দ্ধমান, নদিয়া, ২৪ পরগণা ও যশোহর এই চারি জিলা বলিলে বঙ্গদেশের যে অংশ বুঝায়, দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই অংশে কেবল ছয়টি কি সাতটি ধনী ছিলেন আর সকলে সামান্য অবস্থায় কালাতিপাত করিতেন। এক্ষণে সেই অংশে ছয় কি সাত সহস্র

ধনী বাস করিতেছেন। ধনীদিগের অত্যাচার যদিও যায় নাই কিন্তু হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট নিম্নশ্রেণীস্থদিগের বিদ্যাদানে বিশেষ সচেষ্ট। রাজপদ তাহাদিগের মধ্যে বিতরিত হইতেছে। রাজদণ্ড প্রদানের ক্ষমতাও তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে। এক্ষণে জমিদার অপরাধী হইলে প্রজায় দণ্ড করিতে পারে।

মূল কথা, আমাদের দেশে মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি হইতেছে। বাঙ্গালার আশা ভরসা এই শ্রেণীস্থদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, ইহাদের আত্মপদ স্মরণ রাখা উচিত। ইহাদের ভার গুরুতর সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা সে ভার বহনে সক্ষম। অন্ততঃ তাঁহাদিগকে সেই ভার বহনে উপযুক্ত হইতেও চেষ্টিত দেখা যাইতেছে। অল্পদিনের মধ্যে বিদ্যায় তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ দাঁড়াইয়াছেন। রাজপদ যাহা বাঙ্গালীতে পাইতে পারে, তাহা তাঁহারাই পাইতেছেন। উচ্চশ্রেণী-দিগের পরামর্শী তাঁহারাই দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু যাহা প্রার্থনীয় তাহা সকল গুলিন হয় নাই, বিশেষতঃ ঐক্যের অভাব রহিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সমাজকে বন্ধন করিবার রজ্জু সংবাদ-পত্র। কিন্তু সেরূপ সংবাদ-পত্র বাঙ্গালায় বড় অধিক দেখা যায় না। সম্পাদকের মধ্যে অনেকে দেশহিতৈষী বিদ্বান ও উন্নতস্বভাব সম্পন্ন আছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহাদেরই মধ্যে ঐকমত্য নাই। ঐকমত্য না থাকাও অনেক সময়ে ভাল এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেই জন্য ইচ্ছা পূর্ব্বক অনৈক্য হওয়া অনুচিত। সম্বাদপত্র-সম্পাদকের কার্য্য অতি গুরুতর; সকলের দ্বারা তাহার সম্পাদন সম্ভবে না। সম্বাদপত্র-লেখক রাজার মন্ত্রী, প্রজার বন্ধু, সমাজের শিক্ষক। এই কার্য্য সম্পাদন করিতে গেলে অসাধারণ বিদ্যা, বুদ্ধি, বিজ্ঞতা, গাম্ভীর্য্য, বহুদর্শিতা, সকলের সহিত সহৃদয়তা আবশ্যক। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় এই সকল গুণ আমাদের দেশে সম্পাদক মাত্রেরই যে আছে, এমত বোধ হয় না এবং সকলের নিকট তাহার প্রত্যাশা করাও যায় না। কেহ কেহ সকল কর্ম্মে অকর্ম্মণ্য বলিয়া সম্পাদক হইয়াছেন, ভাবিয়াছেন সম্বাদপত্র সম্পাদন অতি সহজ কথা। কতকগুলা গালি গালাজ করিতে পারিলেই হইল। কটূক্তি যত লেখা যাইবে পাঠকের তত মিষ্ট লাগিবে। আবার তাহাতে গ্রাহক বাড়িবে, বড় লোকে ভয় পাইবে, হাকিমেরা হাতে ধরিবে, ক্রমে যাহা ইচ্ছা তাহাই হইতে পারিব। এরূপ নীচাশয় সম্পাদক অধিক দিন স্থায়ী হয়েন না সত্য; কিন্তু প্রায় বিশবৎসর পূর্ব্বে এরূপ দুই এক জন সম্পাদক দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া সমাজের অনেক অনিষ্ট সাধন করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে যদিও সমাজ আর সেরূপ নাই, পাঠকের রুচিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সঙ্গত অসঙ্গত লেখা পাঠক মাত্রেই বিচার করিয়া দেখেন, তথাপি এরূপ লেখকগণ সম্পাদকীয় আসনে বসিবার যোগ্য নহেন, তাঁহারা

সমাজের অনিষ্ট করিতেছেন। নিতান্ত অনিষ্টও যদি না করিয়া থাকুন, তাঁহাদের দ্বারা কি সমাজ, কি গবর্ণমেণ্ট, কি প্রজা, কেহই কোন উপকার পাইতেছেন এমত বোধ হয় না। তাঁহারা যাহা লেখেন, তাহা শেষ করিয়া যদি প্রতিবার আপনাপনি জিজ্ঞাসা করেন যে, এই লেখাদ্বারা কাহার উপকার হইবে? সমাজের, না রাজার, না প্রজার কাহার উপকার হইবে? এবং সেই প্রশ্নের উত্তরে যদি কাহারও উপকার হইবে বলিয়া তাঁহার অকপট সিদ্ধান্ত হয়, তবে আমরা বলি, তিনি চিরকাল লিখুন, তিনি চিরজীবী হউন।

তাঁহার দ্বারা হিত হইবে, সমাজের উন্নতি হইবে। সম্বাদপত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

বপ লাসেন, মূলর প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের প্রগাঢ় পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় বলে ভাষাজ্ঞান বিষয়ে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে সে সকল অতি আশ্চর্য্য।—সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে গ্রীক, লাটিন, পারসী, সংস্কৃত, জেন্দ, প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা ও ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মন, বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক ভাষার মূল একই ভাষা ছিল। এ বিষয়ে নানা প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, নানা হেতুবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শব্দসাদৃশ্য একটি গুরুতর প্রমাণ। নানা ভাষায় একপ্রকার উচ্চারিত শব্দের এক অর্থ থাকিলে সেই সকল ভাষার এক মূল ছিল সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। সাদৃশ্যে সহোদরতা অনুমেয় সন্দেহ নাই।

সকল প্রকারের সকল শ্রেণীর শব্দেই সাদৃশ্য পাওয়া যায় না; যে যে অর্থ-বাচক শব্দে বিশেষ সাদৃশ্য আছে, তাহা আমরা কতক কতক সঙ্কলন করিতেছি; সেইরূপ প্রমাণ হইতে কি অনুমান হয় পরে বলা যাইবে। লাটিন অথবা গ্রীক ভাষার সহিত সংস্কৃতের বিশেষ সাদৃশ্য আছে; কিন্তু আমরা ঐ সকল ভাষা সমালোচনে অক্ষম, সুতরাং ইংরাজি ও সংস্কৃতে (অথবা বাঙ্গালাতে বলিলে বলা যায়) যে সাদৃশ্য আছে তাহা দেখাইয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইল। তবে যে সকল শব্দ লাটিন হইতে রূপান্তরিত হইয়া ইংরাজিতে ব্যবহৃত হয় তাহাও আমরা সঙ্কলন করিতে ত্রুটি করি নাই।

প্রথমতঃ প্রাণীদিগের নাম।

মনুষ্য	Man	বলী	Bull
উলূক	Owl	উক্ষা	Ox
ক্রমেলক	Camel	স্থির	Steer
গৌঃ	Cow	ধৌরেয়	Tauras
পিলু	Elephant	কর্কট	Cancer
মেঢ্র, বাঙ্গালা মেড়া	Mutton	সর্প	Serpent
এড়ক	Aries	হংস	Gander-Goose
উরণ		কারব	L. Corvus, E. Crow
		কোকিল	Cuckoo

মর্ক	Monkey	বাতুলি (বাঙ্গালা বাদুড়)	Bat
কুক্কুট	Cock	অশ্ব	Equas
শ্বন	Canis	মূষ	Mouse
শৃকাল, শৃগাল	Jackal	বরাহ	Boar
বিড়াল	Felus	ঋক্ষ	Arktos
প্লবগ	Frog	সারস	Cyrno
বিসার	L. Pisces, E. Fishes	মশক কীট	Mosquito
শঙ্খ	Conch	কৃমি	Vermin
পারাবত	Parrots	দহন	Dove

এই তালিকার অবয়ব বৃদ্ধি করিতে বহু শ্রমব্যয় হয় না কিন্তু যে কয়েকটি দেওয়া গেল তাহাতেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। এই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক বোধ হয়। বলী, উক্ষা, স্থির, ধোরেয় কয়েকটিই একার্থ বাচক; ইংরাজিতেও ঠিক চারিটি সেইরূপ শব্দ রহিয়াছে। মেচ্, এড়ক সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

পিলু শব্দে ও Elephant শব্দে সাদৃশ্য কি? সংস্কৃত পিলু শব্দের অন্ত উকার লোপ করিয়া ও প স্থানে ফ করিয়া আরবী ও পারসী পীল্ ও ফীল্ শব্দ; আরবী ভাষায় একটি সাধারণ উপসর্গ আল্ বা এল্। তাহাতেই এল্ ফীল্ হইল। গ্রীক Elephas ক্রমে লাটিন Elephantus ও পরে Elephant। বিলাতী শাব্দিকগণ যে "মহৎ" অর্থ বাচক হিব্রু ফীলা শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন বলেন তাহা স্পষ্টতই ভ্রম। পিলু শব্দ ও পাদ শব্দযোগে নিষ্পন্ন পিলু পাদ, অর্থ স্তম্ভ বিশেষ, পারসীতে ফীলপাও, বাঙ্গালা, পিলপে ও ইংরাজি pillar. এইরূপ কতকগুলি যৌগিক শব্দেও অসাধারণ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ সংখ্যা বাচক শব্দ

এক	Each		সপ্ত	Septa, Hepta, Seven	
অক্কৎ	L. Unus,	E. One	অষ্ট	Octo,	Eight
দ্বি, দুই	Twi,	Two	নব	Nono,	Nine
ত্রি, তিন	Tre,	Three	দশ	Deca	Ten
চতুর্, চারি	Quadur		বিংশতি	Vignity,	Twenty
পঞ্চ	Penta		&c.	&c.	
ষষ্	Sex or Hex, Six		শত	Centum,	Cent

ইংরাজি অপেক্ষা লাটিন গ্রীকের সহিত অধিক সাদৃশ্য আছে। তাহা ত অবশ্যই হইবে। বিংশতি, ত্রিংশৎ···শত প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্য পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আর্য্যগণ নানাস্থানী হইবার পূর্ব্বেই অঙ্কপাত বিষয়ে অথবা সংখ্যা নামকরণ বিষয়ে দার্শনিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং,

দার্শনিক পদ্ধতি হিন্দুদিগের স্থান হইতে গ্রীকেরা লইয়া যান বা গ্রীকদিগের নিকট হইতে হিন্দুরা লইয়া আসেন, পিথাগোর ইহার রপ্তানি করেন বা আমদানি করেন, ইত্যাদি তর্ক নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজনীয়।

তৃতীয়তঃ সম্পর্কবাচক শব্দ।

পিতৃ	L. Patri, Father	স্বসৃ	Sistre, Sister
জনক	King	দুহিতৃ	G. Thugater, Daughter
বাপ	Papa	নপ্তৃ, নাতি	Neptri, Nephew
মাতৃ	Matri, Mother	সূনু	Son
মা	Mamma	জ্ঞাতি	Agnati
ভ্রাতৃ	Fratri, Brother		

জামাতৃ বা জামাই শব্দের সদৃশ শব্দ ইংরাজিতে নাই—কিন্তু ফরাসী Gendre শব্দ ও পারসী দামাদ শব্দ একই অর্থ বাচক।

চতুর্থতঃ সর্ব্বনাম ও অব্যয় শব্দ।

অহম্ আমি	I (am)	অয়ং, ইয়ং	Yon
বয়ম্	We	ইতর	Either
মা	Me	অন্যতর	Another
অস্মান্	Us	সম	Same, Sym, Co
মম, মে, মোর	Mine, My	কিয়ৎ	What (Partly)
অস্মাকম্	Ours	সর্ব্ব	Solus, Whole
নঃ	G. Nos	তৎ	That
ত্বম্, তুমি	Thou	তত্র	Thither
যূয়ম্	You	কুত্র	Whether
ত্বাম ত্বা	Thee	অত্র	Hither
যুষ্মান্	You	পূর্ব্ব	Fore
তে	Thy	অন্তর	Intra, Inter
যুষ্মাকম্	Yours	মধ্য	Mid
কঃ যঃ	Who	নিকট	Neagh, Nigh
কম্ যম্	Whom	তিরস্	Through
কস্য যস্য	Whose	উপরি	Super, Hyper, Over
সা	She	পরি	Per,

এস্থলেও ইংরাজিতে সাদৃশ্য অপেক্ষাকৃত অল্প, তথাপি দেখিবেন, সংস্কৃতে যেখানে যু সেইখানেই ইংরাজিতে y আছে, যেখানে ম আছে সেখানে m আছে বহু পরিবর্ত্তনেও এই সকল চিহ্নের লোপ করিতে পারে নাই। ভাষার ইষ্টাম্প বহুকাল স্থায়ী।

পঞ্চমতঃ স্বর্গ বর্গ।

অগ্নি	Ignis	কন্দঃ, কদঃ, জলদঃ	Cloud
স্বরঃ, সূর্য্য	Sol		
হেলি	Helios		
সূর্য্য	Sun	পবিত্র	Pura, Pure
মাঃ	Moon	দ্যৌঃ	Zeus
দৈত্য	Titans	দ্যৌপিতর্	Jupiter
বরুণ	Uranus	কৈলাস	Cœlo, Ceiling
উষা	Eos	শর্ব্বর	Cerberos
তারা	Stella, Star	সরমা	Helena
দেব	Deos, Theos, Deity	পণিস	Paris
নক্ষত্র	Nocteros	বৃসয়	Briseis, G.
		বৃত্র	Orthros
দিব	Day	হরিৎ	Charites
নক্তং	Noctus	সারমেয়	Hermes (twilight)
কন্দর্প	Cupid	অমৃত	Ambrosium

য়ূনানি পুরাণে ও বৈদিক রচনায় নাম সাদৃশ্য ও আখ্যান সাদৃশ্য বিস্তার আছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উভয়ত্রই আমাদের জ্ঞান চতুষ্পাদ, সুতরাং এই সকল কথা সবিস্তারে লিখিতে হইলে কেবল চর্ব্বিত চর্ব্বণ হইয়া উঠে মাত্র। লজ্জায় বিরত হইতে হইল। যে পারিস ও হেলেনার প্রণয়সূত্র বিবাদে ট্রয় ধ্বংস হয় কথিত হইয়াছে, ও যাহার গানে হোমর য়ূনানী বাল্মীকি, তাঁহারাই বৈদিক আখ্যানে পণিস ও সরমা বলিয়া আখ্যাত ও মক্ষমূলর বলেন যে, হোমরের আখ্যানের ইতিবৃত্ত মূলক ভিত্তিমূল নাই; উহার ভিত্তি কল্পনার উপরি স্থাপিত ও প্রাত্যহিক ঘটনাবলি প্রায়ই বৈদিক গাথায় এইরূপ কল্পনা বলে সুন্দর রঙ্গে রঞ্জিত। যাহা হউক আর্য্যজাতি আদিমাবস্থার কঠোর পরিশ্রম হইতে বিশ্রাম লাভ করিয়া অবকাশ পাইয়া, কালব্যাপিনী চিন্তালব্ধা কল্পনাবলে স্বভাবকে রসে রঞ্জিত করিতে অভ্যস্ত হইয়া পরে পৃথক্ হয়, তাহা সুন্দর উপলব্ধি হইতেছে। কতদিন একত্রে ছিল? বোধ হয় কত শতশত বৎসর। আবার কি এক হইবে নাকি? হয়ত শতশত বৎসর পরে হইবে।

ষষ্ঠতঃ অঙ্গ বাচক

নাসা	Nasus, Nose	হৃৎ, হৃদয়	Heart
পদ	Pedis, Foot	শ্লেষ্মা	L. Phlegme
বক্ষঃ	Pectoris, Bosom	চুচুক	Teat
মন	Mind	অন্ত্র	Entrails

মেদ, মেটে	Meat	দন্ত	L. Dentis, E. Tooth
ভ্রূণ	Born, Scotch, Barn	কণ্ঠ	Gutteris
অস্থি	Osteos	স্কন্ধ	Cheek
ত্বচ্	Touch	গল	Glottis
বাক্	Voice, L. Vocus	অক্ষি	Eye, Eage S.
পল	Flesh	কপাল	Caput
নাভি	Nave	ভ্রূ	(Eye)-Brow

যে সকল শব্দ মধ্যে এক্ষণে সাদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে—সেই সকল শব্দ আর্য্য-জাতি পৃথক্ হইবার পূর্ব্বে অবশ্যই ব্যবহার করিত, এই কথা যদি স্থির হয়, তাহা হইলে দেশ ভেদের পূর্ব্বে শরীর সম্বন্ধে তাহাদিগের কিছু জ্ঞান জন্মিয়াছিল বলিতে হইবে। অল্পজ্ঞান ব্যতীত পল ও মেদের, গল ও কণ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণের প্রয়োজন ছিল না। অল্পজ্ঞান না থাকিলে হৃৎ শব্দ ও অন্ত্র শব্দ থাকিত না। শ্লেষ্মা শব্দটি এবিষয়ের একটি গুরুতর প্রমাণ। এমন ত হইতে পারে, ভিন্নদেশীয়েরা হিন্দুদিগের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে—তাহাতেই শরীর খণ্ডের নাম বিজ্ঞানের সহিত গ্রীক ভাষার অন্তর্গত হইয়াছে। ইহাও অসম্ভব নহে।

সপ্তমত: জড় পদার্থ বাচক বা ভূমিবর্গ

জ্যা	Ge	ফুল, ফুল্লরা	Flora
স্থিরা	Terra	পিষ্ট	Paste
ক্ষমা	Cosmos	বিষং	Poison
মৃত্তি	Materias, Matter	পাবক, পেরু	Pyre
চন্দন	Sandal		
তরু, দারু, দ্রুম	Tree	দ্বার	Door
পত্র	Feather	পাত্র	Pot
ধূম	G. Thumos, L. Fuma, E. Fume	শর্কর	Saccharus, Sugar
অয়স, আয়স, আরং	Ios, Iron	লেমু	Lemon
স্ুবর্ণ	Soveriegn	ভূর্জ	Birch
রাজা	Rex, Regis	কুটীর	Cot
প্রজা	Progeny	পল্লী	Villa
রাজ্য	Region	পথ	Path
স্তূপ	Stupa	অপ	Aqua
স্তম্ভ	Tomb	দ্রপ্স	Drop
বংশ	Bamboo	নৌ	Navy
শৈল	Hill	নাবিক	Navigator
শিলা	Hail-(Stone)	মরীচি	Mirage

বড়ি	Ball	ধাম	Domus
স্তর	Stratum	বার্বট, ভড়	Boat
দণ্ড	Stand	বাষ্প	Vapor
বর্ণক	Varnish	নীড়	Nidus

এই ভাগের তালিকার শেষ হয় না। ক্রমেই কলেবর বৃদ্ধি হইতে পারে। আর কতকগুলি বৃক্ষাদির নাম দেওয়া আমাদিগের উচিত ছিল; এক্ষণে সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। লেমু, ভূর্জ্জ, চন্দন কয়টি দেওয়া গেল। তাহাতেই বোধ হইবে ইংরাজ বাঙ্গালির পূর্ব্ব পুরুষেরা সমকটি বঙ্কবাসী ছিলেন। নানা হেতুবাদে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম পার্ব্বতীয় প্রদেশ আর্য্যজাতির সূতিকাভূমি অদ্যাপি এই প্রদেশের জনগণ, গৌর, সুশ্রী, আয়ত, বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী।

অষ্টমতঃ গুণবাচক শব্দ :—
ও নামবাচক শব্দ

লোভ	Love	সুরা	Sherry
সত্য	Sooth	বীরা	Beer
ধ্রুব	True	মদিরা	Medeira
যুবন্	Young, Juvene	অলি	Ale
যবীয়ান	Younger (brother)	মৃদু	L. Mollis, Mellow
বন্ধ	Bond, Band	জড়	Idiot
তনু (সূক্ষ্ম)	Thin, Tanned	স্ফূর্ত্তি	Spirit
মাত্রা	Metron	অন্ত	End
আয়ু	Æoum	কোণ	Gonos
চিহ্ন	Sign	সামান্য	Common
লোক	Locus	হোরা	Hour
শ্রেণী, শ্রেঢ়ী	Series	স্বাদু	Sweet
গরিষ্ঠ	Greatest	দক্ষ	Dext
লঘিষ্ঠ	Lightest, Least	মৃদান্ত	Mild
লিঙ্গং (ব্যাকং)	Lingua	জনিতা	G. Geneter, Progenetor
নাম	Name	প্রিয়	Philus, Friend
পুরোহিত	Presbyter, Priest	কেন্দ্র	Centre
পূর্ণ	Full	কৃষ্ণ	Dark
পবিত্র	Pure	শ্বেত	White
বিধবা	Widow	নব	Novum, New
মত্ত	Mad	নগ্ন	Naked
		কন্দ, কাণ্ড	Canto

গৌরব	Grave	অক্ষ (দণ্ড)	Axis
লঘু	Light	দ্বৈধ	Doubt
মূক	Mute	দ্বিবাদ	Debate
ধ্বনি	Din	পিঙ্গল	Puzzle
ধর্ম্ম	G. Thermos, L. Formus	ঋকৃথং	Riches
ভ্রম	Whirl, Brim	বর্ব্বর	Barbarian
আর্য্য	Aria	সাম	Song
যবন	Ionian	গমক	Gama, Gamut,
পণ	Pawn	ছন্দস্	Chant
চক্র	Circle	রূঢ়	Rude

এইভাগের শেষ করা যায় না। নানার্থ বাচক—নানা শব্দ সঙ্কলিত হইতে পারে। এতৎসম্বন্ধে অন্য কোন টীকা করা বৃথা।

নবমতঃ ধাতু বা ক্রিয়া বাচক শব্দ।

দৃশ ধাতু রূপান্তরে		গম, গমন	Going
পশ্য	Specio	গত	Got
যুজ, যোগ	Join, Jungo	গচ্ছতি	Goeth
বিদ, বেদ	Wit	গচ্ছসি	Goest
লম্ফ	Leap	সৃপ	Creep
জন, জন্ম	Gegno, Genus	অস্ অস্তি	Is, Esti
জ্ঞা জ্ঞান	Gnosco	ভূ	Be, Beon
স্থা, স্থান, স্থির	Sto, Stau	লিহ	(He) Licks
স্থল, স্থাণু	Stable, Stand	শ্রদ্ধা	Credo
মৃ, মর	Mors	ধৃষ	Dare
ফুল, ফুল্ল	Blown	বম, বান্ত	Vomitted
দা, দান	Donum	বপ, বাপ	Weaved, Woof
দদামি	Didomi G.	কৃত, কর্ত্তন	Cutting
ধা, দধামি	Tithemi G.		

[illegible] ছেন যে, সে সমুদয় গুলির সদৃশ ধাতু একটু রূপান্তরিত হইয়া গ্রীক ও লাটীন ভাষাতে প্রায়ই আছে। ধাতুর মিল অপেক্ষা প্রত্যয়ের মিল আরো চমৎকার; কিন্তু তাহা ইংরাজীতে দেখান যাইতে পারে না। ইংরাজী অতি সঙ্কর ভাষা। গ্রীক ভাষার সহিত সংস্কৃতের তিঙ্ প্রত্যয়ের সাদৃশ্য বিস্তার আছে।

ন, অন্ অ প্রভৃতি নিষেধ জ্ঞাপক শব্দের সাদৃশ্য অনেক ভাষাতেই আছে; সংস্কৃতের সহিত ইংরাজীর দেখান বৃথা।

কতকগুলি শব্দ আছে যাহাদিগের সাদৃশ্য দেখিয়া প্রতারিত হইতে হয়, যথা

তৈলপর্ণী Turpentine

তাম্রকূট Tobacco

আবার কতকগুলি যৌগিক শব্দ আছে, যাহাদিগের সদৃশতা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়; যথা

উপাধ্যায় Abbot

অধরেদ্যু Yesterday

ত্রিপদ Tripod

চতুষ্পদ Quadruped

চতুষ্পদ প্রভৃতি শব্দের মিল হওয়াই সম্ভব কেননা পদ শব্দ উভয় ভাষাতে থাকাতেই, সদৃশ সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত যোগ করিলে একরূপী ভিন্ন, ভিন্ন রূপী হইবে কেন?

কিন্তু উপাধ্যায় প্রভৃতি শব্দের সদৃশতা দ্বারা কিছুই প্রমাণীকৃত হইতে পারে না। কোন কোন বিখ্যাত গ্রন্থকার এরূপ সদৃশতা দেখাইয়াছেন নহিলে আমরা লিখিতাম না।

একজন ভাষাবিৎ বলেন যে বাইবেলে সলমনের জাহাজে যে Ophir বা Sophir এবং Kophiom লইয়া যাইবার উল্লেখ আছে তাহা সংস্কৃত সৌবীর ওকপি ব্যতীত আর কিছুই নহে। হওয়াই সম্ভব।

আমরা প্রমাণের উপসংহার করিলাম। এই সকল প্রমাণে অনুমান হয় যে ইংরাজ বাঙ্গালির, হিন্দু যুনানীর, পূর্ব্বপুরুষ একজাতি। পোকোক প্রভৃতি সাহেবেরা বলেন যে ভারতবর্ষীয়েরাই পূর্ব্বপুরুষ; আমরা তাহা বলিতে পারি না; মূলর প্রভৃতি যাহা বলিয়াছেন তাহাই যথার্থ ও যথেষ্ট; তাঁহারা বলেন যে আমরা জ্যেষ্ঠ সহোদরের বংশজ। ভাই, ইংরাজ, ভাষাজ্ঞান লাভ করিয়া, এই সত্যে বিশ্বাস করিয়া, জ্ঞাতিশত্রুত্ব সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইও না; জ্ঞাতিত্বের যদি এই ফল হয় তবে নিগারত্ব ভাল বলি। না—জ্ঞাতিশত্রুত্ব দেখাইও না; মৃত অগ্রজের সন্ততিদের ক্রোড়ে স্থান দেও, আপনার বলিয়া জগতে বিখ্যাত, পরিচিত কর, আমরাও খুল্লতাতের সমাদর ও ভক্তি করিব। তোমাদের জয় হউক, আমাদেরও জয় হউক।

দীনার শব্দ সংস্কৃতে ব্যবহার আছে, বোধ হয় গ্রীকদিগের পঞ্জাব প্রদেশীয় রাজত্বকালে Dinar মুদ্রা ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া থাকিবে, এক্ষণে অনেক শব্দ রসায়ন বিদ্যায় ও উদ্ভিদ বিদ্যায়, সংস্কৃত বিদ্যা হইতে ইংরাজী করিয়া লওয়া হইতেছে; যেমন ধুতুরা, কদম্ব ইত্যাদি। কিন্তু তাহা আমাদের সমালোচ্য নহে।

পোতাস শব্দ সংস্কৃত আছে, ইহা কিন্তু আধুনিক Potash শব্দ হইতে নীত বলা যাইতে পারে না; কেননা প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে, ইরিবেল্লিকা শব্দ আরো আশ্চর্য্যের বিষয়। নিদানে আছে :

"পীড়কা উত্তমাঙ্গস্থাং বৃত্তামুগ্ররুজাজ্বরাং। সর্ব্বাত্মিকাং সর্ব্বলিঙ্গাং জানিয়াদিরিবেল্লিকাং।"

ইহা ত স্পষ্টই Erysipelas of the head and face বলিয়া বোধ হয়। চিকিৎসক ভাষাবিৎ ইহার মীমাংসা করিবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জগৎ শেঠ

"কাজিয়া হবে কি?"

"বোধ হয় না। হইলে, মীরকাসেমের কি সাধ্য ইংরেজের সঙ্গে আঁটিয়া উঠে? ইহারা যমদূত।"

"তাহা বলা যায় না। পলাসীর কাণ্ড কেবল ফাঁকি। মীরজাফর আর আমরা অনুকূল না থাকিলে, মীরমদন আর মোহন লালের গোলায় সাহেব গোষ্টি আমতলায় শুইয়া থাকিতেন।"

যাঁহারা এই কথোপকথন করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের কৌলিক নাম জগতে বিখ্যাত হইয়াছে। তাঁহাদিগের নাম রাজা জগৎ শেঠ স্বরূপ চন্দ, এবং জগৎ শেঠ মাহাতাব রায়। তাঁহারা জগৎ শেঠ ফতে চন্দের পৌত্র। ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের ঐশ্বর্য্য অতুল। অদ্যাপিও তাহার তুল্য বিভব ভারতে কাহারও নাই। এক্ষণে ভারতবর্ষে এমন বণিক কে আছে যে কথায় কথায় কোটি মুদ্রার দর্শনী হুণ্ডীর টাকা নগদ ফেলিয়া দেন? যখন মীরহবীব মুরশিদাবাদ লুঠ করিয়াছিল, তখন সে জগৎ শেঠের ঘর হইতে দুই কোটি কেবল "আরকাটি" টাকা লইয়া গিয়াছিল—দেশী টাকার কথায় কাজ কি? সেই দুই কোটি টাকা তাঁহাদিগের তৃণ বলিয়া বোধ হয় নাই—তাঁহারা পূর্ব্ববৎ নবাবকে এক এক বারে কোটি মুদ্রার "দর্শনী" দিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকাল হইলে, লোকে বলিত, কুবের আসিয়া মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়াছেন।

ইঁহাদিগের ঐশ্বর্য্য অনুসারে প্রভুত্বও ঘটিয়াছিল। বিখ্যাত আর্ল্ অব্ ওয়ার-উইক যুদ্ধ বলে "নৃপতি-স্রষ্টা" নাম লাভ করিয়াছিলেন। জগৎ শেঠেরা ধন বলে নৃপতিস্রষ্টা হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেরাজউদ্দৌলার পর মীরজাফর যে মসনদে উঠিয়াছিলেন, তাহার এক প্রধান কারণ এই যে জগৎ শেঠেরা তাঁহার সহায়

ছিলেন। মীরজাফরের পর মীরকাসেম তৎপদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেও সেই সাহায্যে। এক্ষণে ইংরেজদিগের সহিত মীরকাসেমের বিবাদের সম্ভাবনা; এখন জগৎ শেঠেরা যাহার আনুকূল্য করিবেন, সেই মীরকাসেমের স্থলে রাজ্য করিবে। মীরকাসেম অতি চতুর; তিনি একথা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। মীরকাসেম মুঙ্গেরে থাকিতেন; জগৎ শেঠেরা মুরশিদাবাদে থাকিতেন, নবাবের নয়নের অতীত হইয়া তাঁহারা কখন কি করিবেন, কাহার পক্ষে হইবেন, মীরকাসেম এই ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন। ঈদৃশ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণকে এমন সময়ে আপন দৃষ্টি পথে রাখা কর্ত্তব্য বিবেচনায় তাঁহাদিগকে মুরশিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা বন্দীর ন্যায় কারারুদ্ধ হয়েন নাই বটে, কিন্তু মুঙ্গেরের বাহিরে যাইতে পারিতেন না।

হীরক খচিত তাম্বুল পাত্র হইতে একেবারে যুগল তাম্বুল গ্রহণ করিয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে স্বরূপ চন্দ বলিতে লাগিলেন, "তা যাই হউক, যুদ্ধে আমাদের বিশেষ আমোদ বা দুঃখ নাই। ইংরেজেরা আমাদের বন্ধু, তাহাদিগের জয় হইলে, আমাদের অমঙ্গল নাই, তবে এই পাজি মুসলমানকে যে কতকগুলা হুণ্ডি দিয়া রাখিয়াছি, সে টাকা গুলা লোকসান হইবে। বরং যুদ্ধ না হয়, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট আছি।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে একজন চোপদার আসিয়া সম্বাদ দিল, একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাহাতাব রায় জগৎ শেঠ বলিলেন, "দেওয়ানের কাছে সম্বাদ দাও, যাহা দিবার হয় দিবেন।" চোপদার বলিল, "তাহা আমি বলিয়াছিলাম; সে বলিল, 'আমি কাহারও নিকট ভিক্ষা লই না। মহারাজকে বলিও আমি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি—আমার নাম চন্দ্রশেখর'।"

রাজা স্বরূপচন্দ কহিলেন, "অতি যত্নে তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।"

চন্দ্রশেখর আসিলেন—মলিন বস্ত্র পরিধান; শুষ্ক স্কন্ধে মলিন উত্তরীয় দুলিতেছে। জগৎ শেঠেরা গাত্রোত্থান করিলেন,—তাঁহারা কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিতেন না। চন্দ্রশেখর পৃথগাসন গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিলেন।

অন্যান্য কথার পর, রাজা স্বরূপচন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কৃশ ও মলিন দেখিতেছি – কোন শারীরিক বা মানসিক পীড়া ত উপস্থিত নাই?"

চন্দ্রশেখর বৃথায় এতকাল জ্ঞানোপার্জ্জন করেন নাই। তিনি চিত্ত দমন করিতে শিখিয়াছিলেন। আপন বলে প্লাবনোদ্যত অশ্রু সংরুদ্ধ করিয়া স্থির স্বরে, স্থির ভঙ্গীতে, কহিলেন,

"মহারাজ, দরিদ্র ব্রাহ্মণের শোক তাপ শুনিতে কি আপনাদের ইচ্ছা করে? অথবা সে কথা জিজ্ঞাসায় আমার প্রয়োজন কি? আমি যাহা বলিতে আসিয়াছি, তাহা আমি বলিয়া যাইব। কখন দেখিয়াছেন, বহুকালের পুরাতন, জীর্ণ নীরস বৃক্ষে একটি মুকুল ফুটিয়াছে? যদি সে সুখ দেখিয়া থাকেন, তবে বুঝিবেন সে মুকুল সে বৃক্ষের কি অমূল্য রত্ন। এই শুষ্ক হৃদয়ে সেইরূপ একটি মুকুল ফুটিয়াছিল। আমি এক্ষণে সেই ছিন্নমুকুল বৃক্ষ মাত্র।"

এই বলিয়া চন্দ্রশেখর, অতি ধীর স্বরে, সংক্ষেপে, ফষ্টর কর্তৃক শৈবলিনী হরণ বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া জগৎ শেঠেরা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা স্বরূপচন্দ্র মহা দুঃখিতভাবে কহিলেন, "কি বলিব, আমরা মুঙ্গেরে বন্দী হইয়া আছি। ইংরেজের নিকট আমরা আর কোন খবর দিতে পারি না। নহিলে সেই দুরাত্মাকে দণ্ডিত করিতে অবশ্য পারিতাম, কেননা ইংরেজেরা আমার বাধ্য। কিন্তু এক্ষণে ইংরেজের সংস্রবে থাকিলে, নবাব আমাদিগের প্রাণ দণ্ড করিতে পারেন।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "এইরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলেই কি প্রাণদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন বিবেচনা করিয়াছেন?"

উভয় জগৎ শেঠ চকিতনেত্রে চন্দ্রশেখরের মুখ প্রতি চাহিলেন। স্বরূপচন্দ্র বলিলেন, "কি বলিতেছেন?"

চন্দ্র। আমি বলিতেছি যে, গঙ্গাসলিলাভ্যন্তরে, মীরকাসেমের আজ্ঞামতে, আপনাদিগের উভয় ভ্রাতার প্রাণ নষ্ট হইবে।

স্বরূপ। সে কি!

মাহাতাব। আপনি কি প্রকারে জানিলেন?

উভয়েরই বিশ্বাস ছিল, চন্দ্রশেখর কখনও, না জানিয়া, অনর্থক এ কথা বলিবেন না।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "যখন পূর্ব্বে, একবার আমাকে গণিতে বলিয়াছিলেন, তখন ইহা আমি গণিয়া জানিয়াছিলাম। অনর্থক চিরকালের জন্য আপনাদিগকে অসুখী করিব না, এইরূপ স্থির করিয়া, তখন একথা বলি নাই। কিন্তু এক্ষণে বলিবার সময় হইয়াছে।"

শুনিয়া উভয় ভ্রাতা অধোবদনে, চিন্তামগ্ন হইলেন।

রাজা স্বরূপচন্দ, ক্রমে ক্রমে অবশ শরীর হইয়া, উপাধানের উপর ভর করিয়া, শয়ানবৎ হইয়া নিশ্চেষ্ট হইলেন। দেখিয়া মাহাতাব রায় কহিলেন, "মহারাজ, এত বিমনা হইতেছেন কেন? ইনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত বটে, কিন্তু আমি কাহারও গণনার প্রতি বিশ্বাস করি না। ভবিষ্যৎ বলিতে পারে, মনুষ্যের সাধ্য

কি ? যদি এই পণ্ডিত ভবিষ্যৎ জানিবার ক্ষমতা রাখিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার উপস্থিত বিপদের বিষয় অবশ্য পূর্ব্বে অবগত থাকিতেন।”

শুনিয়া চন্দ্রশেখর কহিলেন, “মহারাজ! আমি নিজের অদৃষ্ট বিষয়ে কখন গণনা করি না, বা করিব না। সে বিষয়ে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যাহা অবশ্য ঘটিবে, তাহা আগে জানিলে কি হইবে ? আমি কি অগ্রে জানিলে ভবিতব্যের অন্যথা করিতে পারিতাম ? ভবিতব্য পুরুষকারের দ্বারা অন্যথা হইবার নহে। তবে পূর্ব্বজ্ঞানের কেবল এই ফল হইত যে, যে কয় বৎসর আমি সুখে কাল যাপন করিয়াছি, সে কয় বৎসরও আমার অসুখে যাইত।”

মাহা। মহাশয়, নিজের প্রতি যে দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদিগের প্রতিও সেই দয়া কেন প্রকাশ করিলেন না ? এ নিষ্ঠুর বাক্য কেন শুনাইলেন ?

চন্দ্র। আপনাদিগেরও প্রতি সেই দয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম বলিয়া, এত দিন এ কথা শুনেন নাই।

মাহা। তবে এক্ষণে ?

চন্দ্র। এক্ষণে ভবিতব্যে ছিল যে আজি আপনারা এই সম্বাদ আমার নিকট শুনিবেন। আমি কপটাচারী নহি। আমি এমত কথা বলিতেছি না, যে কেবল নিয়তের বশীভূত হইয়া, এ কথা বলিতে আসিয়াছি। আমি নিরাকাঙ্ক্ষ নহি। কিন্তু এমনও ভাবিবেন না যে নিজের কার্য্যোদ্ধারের জন্যই আপনাদিগকে এ পীড়া দিলাম। আমার কোন কার্য্যোদ্ধার আপনারা করিতে পারেন না। আপনাদিগের এ অতুল বিভবের শতগুণ বিভবেও আমার উপকার নাই। আমার উপকার মনুষ্য সাধ্য নহে। কিন্তু আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে তাহা অন্যের অদৃষ্টে নিত্য ঘটিতেছে, আরও ঘটিবে। দেশ উৎসন্ন গেল—রাজ্য অরাজক হইয়াছে। মুসলমান ঘোর অত্যাচারী এবং বিধর্ম্মী ; ইংরেজ ততোধিক অত্যাচারী এবং বিধর্ম্মী। কাহারও হস্তে হিন্দুর মঙ্গল নাই। কে রাজ্যোদ্ধার করিবে ? আপনারা দেশের চূড়া—আপনারা নবাবের ভয়ে কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছেন—তবে কে রাজ্যোদ্ধার করিবে ? নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া গাত্রোত্থান করুন—লোকের হিতসাধন করিয়া পুণ্য ধামে যাত্রা করুন। এমত ভরসা নাই যে আপনারা রাজ্যোদ্ধার করিয়া এই সাম্রাজ্য ভোগী হইতে পারিবেন। আপনারা যাহাই করুন না কেন, আপনারা গঙ্গাসলিলাভ্যন্তরে মীরকাসেমের আজ্ঞায় নিধন প্রাপ্ত হইবেন। আপনারা যদি এখন নবাবের হিতার্থী হইয়া, কায়মনোবাক্যে তাঁহার হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তথাপি গঙ্গাসলিলাভ্যন্তরে মীরকাসেমের আজ্ঞায় নিধন প্রাপ্ত হইবেন। যদি ইংরেজের অনুগত হইয়া, মীরকাসেমের বিপক্ষতাচরণ করেন, তথাপি গঙ্গা-সলিলাভ্যন্তরে মীরকাসেমের আজ্ঞায় নিধন প্রাপ্ত হইবেন। যদি কোন পক্ষ না

হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন, তথাপি গঙ্গাসলিলাভ্যন্তরে মীরকাসেমের আজ্ঞায় নিধন প্রাপ্ত হইবেন—কেননা ভবিতব্য অখণ্ডনীয়। তবে কেন নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন? প্রাণদান করিয়া পুণ্য ভূমির উদ্ধার করুন।

শুনিয়া সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। শুনিয়া কাহারও রক্ত প্রবাহ খরতর বহিল না। দেশবাৎসল্য তখনও বঙ্গদেশে জন্মে নাই—এখন জন্মিয়াছে কি? চন্দ্রশেখর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, বলিয়া গেলেন, "পুনশ্চ আসিব।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কুল্‌সম্

"না, চিড়িয়া নাচিবে না। তুই এখন তোর গল্প বল্।"

দলনী বেগম, এই বলিয়া, যে ময়ুরটা নাচিল না, তাহার পুচ্ছ ধরিয়া টানিল। আপনার হস্তের হীরক জড়িত বলয় খুলিয়া আর একটা ময়ুরের গলায় পরাইয়া দিল; একটা মুখর কাকাতুয়ার মুখে চোখে গোলাবের পিচকারী দিল। কাকাতুয়া "বাঁদী" বলিয়া গালি দিল। এ গালি দলনী স্বয়ং কাকাতুয়াকে শিখাইয়াছিল।

নিকটে একজন পরিচারিকা পক্ষীদিগকে নাচাইবার চেষ্টা দেখিতেছিল, তাহাকেই দলনী বলিল, "এখন তোর গল্প বল্।"

কুল্‌সম্ কহিল, "গল্প আর কি? হাতিয়ার বোঝাই দুই খানা কিস্তি ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাতে একজন ইংরেজ চড়ন্দার। সেই দুই কিস্তি আটক হইয়াছে। আলি ইব্রাহিম খাঁ বলেন যে নৌকা ছাড়িয়া দাও, উহা আটক করিলেই খানকা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই বাধিবে। গুরগণ খাঁ বলেন, লড়াই বাধে বাধুক। নৌকা ছাড়িব না।"

দ। "হাতিয়ার কোথায় যাইতেছে?"

কুল। "আজিমাবাদের* কুঠিতে যাইতেছে। লড়াই বাঁধে ত আগে সেইখানে বাঁধিবে। সেখান হইতে ইংরেজেরা হঠাৎ বেদখল্ না হয় বলিয়া তথায় হাতিয়ার পাঠাইতেছে। এই কথা ত কেল্লার মধ্যে রাষ্ট।"

দ। "তা গুরগণ খাঁ আটক করিতে চাহে কেন?"

কু। "বলে, সেখানে এত হাতিয়ার জমিলে লড়াই ফতে করা ভার হইবে। শত্রুকে বাড়িতে দেওয়া ভাল নহে। আলি হিব্রাহিম খাঁ বলেন, যে আমরা যাহাই করিনা কেন, ইংরেজকে লড়াইয়ে কখন জিতিতে পারিব না। অতএব আমাদের লড়াই না করাই স্থির। তবে নৌকা আটক করিয়া কেন লড়াই বাধাই? ফলে সে সত্য কথা। ইংরেজের হাতে রক্ষা নাই। বুঝি নবাব সেরাজউদ্দৌলার কাণ্ড আবার ঘটে।"

---

* পাটনা

দলনী অনেকক্ষণ চিন্তিত হইয়া রহিল।

পরে কহিল, "কুল্‌সম্‌, তুই একটি দুঃসাহসের কাজ কর্‌তে পারিস্‌?"

কু। "কি? ইলিস মাছ খেতে হবে, না ঠাণ্ডা জলে নাইতে হবে?"

দ। "দূর! তামাসা নহে। টের পেলে পর আলিজা তোকে আমাকে এক হাতীর দুই পায়ের তলে ফেলে দিবেন।"

কু। "টের পেলে ত? এত আতর গোলাপ সোনা রূপা চুরি করিলাম কই কেহ ত টের পেলে না? আমার মনে বোধ হয়, পুরুষ মানুষের চক্ষু কেবল মাথার শোভার্থ—তাহাতেই দেখিতে পায় না। কৈ, পুরুষে মেয়েমানুষের চাতুরী কখন টের পাইল, এমন ত দেখিলাম না।"

দ। "দূর! আমি খোজা খানসামাদের কথা বলি না। নবাব আলিজা অন্য পুরুষের মত নহেন। তিনি না জানিতে পারেন কি?"

কু। "আমি না লুকাইতে পারি কি? কি করিতে হইবে?"

দ। "একবার গুরগণ খাঁর কাছে একখানি পত্র পাঠাইতে হইবে?"

কুল্‌সম্‌ বিস্ময়ে নীরব হইল। দলনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিস?"

কু। "পত্র কে দিবে?"

দ। "আমি।"

কু। "সে কি? তুমি কি পাগল হইয়াছ?"

দ। "প্রায়।"

উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। তাহাদিগকে নীরব দেখিয়া ময়ূর দুইটা আপন আপন বাসযষ্টিতে আরোহণ করিল। কাকাতুয়া অনর্থক চীৎকার আরম্ভ করিল। অন্যান্য পক্ষীরা আহারে মন দিল।

কিছুক্ষণ পরে কুল্‌সম্‌ বলিল, "কাজ অতি সামান্য। একজন খোজাকে কিছু দিলেই সে এখনই পত্র দিয়া আসিবে। কিন্তু একাজ আমা হইতে হইবে না। নবাব জানিতে পারিলে উভয়ে মরিব।"

দ। "এই বুঝি বড়াই? ভাল আমিই পথ বলিয়া দিই। নবাবকে বলিবে কে? আমি বলিব না, কেন না তাহা হইলে আমারই মাথা যাইবে। তুমিও বোধ হয় ঐ কারণে বলিবে না—সে বিশ্বাস তোমার উপর না থাকিলে তোমার সাক্ষাৎ একথা আদৌ উত্থাপিত করিতাম না। তার পর খোজা। বিশ্বাসী খোজা কেহ কি নাই?"

কু। "আছে। খোজাকে ভয় করি না, কিন্তু গুরগণ খাঁ?"

দ। "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। আমি না জানিয়া সাহস করিব কেন?"

কু। "তোমার কর্ম্ম তুমি জান। আমি দাসী। পত্র দাও—আর কিছু নগদ দাও।"

পরে কুল্‌সম্ পত্র লইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গুর্‌গণ খাঁ

এই সময়ে বাঙ্গালায় যে সকল রাজ পুরুষ নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে গুরগণ খাঁ একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তিনি জাতিতে আরমানি; ইস্পাহান তাঁহার জন্মস্থান; কথিত আছে যে তিনি পূর্ব্বে বস্ত্র বিক্রেতা ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ গুণবিশিষ্ট এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি অল্পকালমধ্যে প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি নূতন গোলন্দাজ সেনার সৃষ্টি করিলেন। ইউরোপীয় প্রথানুসারে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত করিলেন, কামান বন্দুক যাহা প্রস্তুত করাইলেন, তাহা ইউরোপ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল; তাঁহার গোলন্দাজ সেনা সর্ব্বপ্রকারে ইংরেজের গোলন্দাজদিগের তুল্য হইয়া উঠিল। মীরকাসেমের এমত ভরসা ছিল যে তিনি গুর্‌গণ খাঁর সহায়তায় ইংরেজদিগকে পরাভূত করিতে পারিবেন। গুর্‌গণ খাঁর আধিপত্যও এতদনুরূপ হইয়া উঠিল; তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত মীরকাসেম কোন কর্ম্ম করিতেন না; তাঁহার পরামর্শের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে মীরকাসেম তাহা শুনিতেন না। ফলতঃ গুর্‌গণ খাঁ একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিলেন। মুসলমান কার্য্যাধ্যক্ষেরা সুতরাং বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, কিন্তু গুরগণ খাঁ শয়ন করেন নাই। একাকী, দীপালোকে কতক গুলি পত্র পড়িতেছিলেন। সেগুলি কলিকাতাস্থ কয়েকজন আরমানির পত্র। পত্র পাঠ করিয়া, গুরগণ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন। চোপদার আসিয়া দাঁড়াইল। গুরগণ খাঁ কহিলেন,

"সব দ্বার খোলা আছে?" চোপদার কহিল "আছে।"

গুর। "যদি কেহ এখন আমার নিকট আইসে—তবে কেহ তাহাকে বাধা দিবে না—বা জিজ্ঞাসা করিবে না, তুমি কে, একথা বুঝাইয়া দিয়াছ?"

চোপদার কহিল, "হুকুম তামিল হইয়াছে।"

গু। "আচ্ছা তুমি তফাতে থাক।"

তখন গুরগণ খাঁ পত্রাদি বাঁধিয়া উপযুক্ত স্থানে লুকায়িত করিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এখন কোন্ পথে যাই? এই ভারতবর্ষ এখন সমুদ্র

বিশেষ—যে যত ডুব দিতে পারিবে, সে তত রত্ন কুড়াইবে। তীরে বসিয়া ঢেউ গণিলে কি হইবে? দেখ আমি গজে মাপিয়া কাপড় বেচিতাম—এখন আমার ভয়ে ভারতবর্ষ অস্থির; আমিই বাঙ্গালার কর্ত্তা। আমি বাঙ্গালার কর্ত্তা? কে কর্ত্তা? কর্ত্তা ইংরেজ ব্যাপারী—তাহাদের গোলাম মীরকাসেম; আমি মীর কাসেমের গোলাম—আমি কর্ত্তার গোলামের গোলাম! বড় উচ্চপদ! আমি বাঙ্গালার কর্ত্তা না হই কেন? কে আমার তোপের কাছে দাঁড়াইতে পারে? ইংরেজ? একবার পেলে হয়। কিন্তু ইংরেজকে দেশ হইতে দূর না করিলে, আমি কর্ত্তা হইতে পারিব না। আমি বাঙ্গালার অধিপতি হইতে চাহি—মীর কাসেমকে গ্রাহ্য করি না—যে দিন মনে করিব, সেইদিন উহাকে মসনদ হইতে হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিব। সে কেবল আমার উচ্চপদে আরোহণের সোপান—এখন ছাদে উঠিয়াছি—মই ফেলিয়া দিতে পারি। কণ্টক কেবল পাপ ইংরেজ। বঙ্গদেশ ইংরেজেরই হইয়াছে বা শীঘ্র হইবে—আমি না থাকিলে এতদিন তাহারা মীর কাসেমকে তাড়াইয়া দিত। আমি তাহাদের কণ্টক, তাহারা আমার কণ্টক। তাহারা আমাকে হস্তগত করিতে চাহে—আমি তাহা-দিগকে হস্তগত করিতে চাহি। তাহারা হস্তগত হইবে না। অতএব আমি তাহাদের তাড়াইব। এখন মীর কাসেম মসনদে থাক্; তাহার সহায় হইয়া বাঙ্গালা হইতে ইংরেজ নাম লোপ করিব। সেই জন্যই উদ্যোগ করিয়া যুদ্ধ বাঁধাইতেছি। পশ্চাৎ মীরকাসেমকে বিদায় দিব। এই পথই সুপথ। কিন্তু আজি হঠাৎ এ পত্র পাইলাম কেন? এ বালিকা এমন দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হইল কেন?"

বলিতে বলিতে যাহার কথা ভাবিতেছিলেন, সে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। গুরগণ খাঁ তাঁহাকে পৃথক্ আসনে বসাইলেন। সে দলনী বেগম।

গুরগণ খাঁ বলিলেন, "আজি অনেক দিনের পর তোমাকে দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম। তুমি নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা অবধি আর তোমাকে দেখি নাই। কিন্তু তুমি এ দুঃসাহসিক কর্ম্ম কেন করিলে?"

দলনী বলিল "দুঃসাহসিক কিসে?"

গুরগণ খাঁ কহিল, "তুমি নবাবের বেগম হইয়া রাত্রে গোপনে একাকিনী চুরি করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, ইহা নবাব জানিতে পারিলে তোমাকে আমাকে দুইজনকেই বধ করিবেন।"

দ। "যদি তিনি জানিতেই পারেন তখন আপনাতে আমাতে যে সম্বন্ধ তাহা প্রকাশ করিব। তাহা হইলে রাগ করিবার আর কোন কারণ থাকিবে না।"

গুর। "তুমি বালিকা তাই এমত ভরসা করিতেছ। এতদিন আমরা এ সম্বন্ধ প্রকাশ করি নাই। তুমি যে আমাকে চেন, বা আমি যে তোমাকে চিনি, একথা এ পর্য্যন্ত আমরা কেহই প্রকাশ করি নাই—এখন বিপদে পড়িয়া একথা প্রকাশ করিলে, কে বিশ্বাস করিবে? বলিবে, এ কেবল বাঁচিবার উপায়। তুমি আসিয়া ভাল কর নাই।"

দ। "নবাব জানিবার সম্ভাবনা কি? পাহারাওয়ালা সকল আপনার আজ্ঞাকারী—আপনার প্রদত্ত নিদর্শন দেখিয়া তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহারা কি আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া প্রকাশ করিবে?"

গুর। "তাহারা কি তোমাকে চিনিয়াছে?"

দ। "বোধ হয় না। দেখিতেছেন, আমি ছদ্মবেশে আসিয়াছি। আপনি কি তাহাদিগকে আমার নাম বলিয়া দিয়াছেন?"

গু। "না। আমি বলিয়াছিলাম যে রঙ্গ মহাল হইতে একজন বাঁদী আমার খাদ্য লইয়া আসিবে নিদর্শন দেখাইলে ছাড়িয়া দিও। আবার পুনঃ প্রবেশ করিতে দিও।"

দ। "তবে কোন শঙ্কা নাই। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমি আসিয়াছি। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ হইবে এ কথা কি সত্য?"

গু। "একথা কি তুমি দুর্গে বসিয়া শুনিতে পাও না?"

দ। "পাই। কেল্লার মধ্যে রাষ্ট যে ইংরেজের সঙ্গে নিশ্চিত যুদ্ধ উপস্থিত। এবং আপনিই এ যুদ্ধ উপস্থিত করিতেছেন। কেন?"

গু। "তুমি বালিকা, তাহা কি প্রকারে বুঝিবে?"

দ। "আমি বালিকার মত কথা কহিতেছি? না বালিকার ন্যায় কাজ করিয়া থাকি? আমাকে যেখানে আত্মসহায় স্বরূপ নবাবের অন্তঃপুরে স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে বালিকা বলিয়া অগ্রাহ্য করিলে কি হইবে?"

গুর। "হোক। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার আমার ক্ষতি কি; হয়, হউক না।"

দ। "আপনারা কি জয়ী হইতে পারিবেন?"

গুর। "আমাদের জয়েরই সম্ভাবনা।"

দ। "এপর্য্যন্ত ইংরেজকে কে জিতিয়াছে?"

গুর। "ইংরেজেরা কয় জন গুরগণ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে?"

দ। "সেরাজ উদ্দৌলা তাহাই মনে করিয়াছিলেন। যাক;—আমি স্ত্রীলোক, আমার মন যাহা বুঝে আমি তাই বিশ্বাস করি। আমার মনে হইতেছে যে কোন মতেই আমরা ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইব না। এ যুদ্ধে

আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব আমি মিনতি করিতে আসিয়াছি আপনি এ যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিবেন না।”

গুর। “এ সকল কর্ম্মে স্ত্রীলোকের পরামর্শ অগ্রাহ্য।”

দ। “আমার পরামর্শ গ্রাহ্য করিতে হইবে। আমায় আপনি রক্ষা করুন! আমি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেছি।” এই বলিয়া দলনী রোদন করিতে লাগিলেন।

গুরগণ খাঁ বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, “তুমি কাঁদ কেন? না হয় মীরকাসেম সিংহাসনচ্যুত হইলেন,—আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাইব।”

ক্রোধে দলনীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সক্রোধে তিনি বলিলেন, “তুমি কি বিস্মৃত হইতেছ, যে মীরকাসেম আমার স্বামী?”

গুরগণ খাঁ কিঞ্চিৎ বিস্মিত, কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, “না বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু স্বামী কাহারও চিরকাল থাকে না। এক স্বামী গেলে আর এক স্বামী হইতে পারে। আমার ভরসা আছে তুমি এক দিন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নুরজাহান হইবে।”

দলনী ক্রোধে কম্পিত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া উঠিল। গলদশ্রু নিরুদ্ধ করিয়া, লোচনযুগল বিস্ফারিত করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে দলনী বলিতে লাগিল,

“তুমি নিপাত যাও! অশুভক্ষণে আমি তোমার ভগিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—অশুভক্ষণে আমি তোমার সহায়তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম। স্ত্রীলোকের যে স্নেহ, দয়া, ধর্ম্ম আছে, তাহা তুমি জান না। যদি তুমি এই যুদ্ধের পরামর্শ হইতে নিবৃত্ত হও, ভালই, নহিলে আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ নাই কেন? আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার শত্রু সম্বন্ধ। আমি জানিব যে তুমিই আমার পরম শত্রু। তুমিও জানিও আমি তোমার পরম শত্রু। এই রাজান্তঃপুরে আমি তোমার পরম শত্রু রহিলাম।”

এই বলিয়া দলনীবেগম বেগে পুরী হইতে বহির্গতা হইয়া গেলেন।

গুরগণ খাঁ বিহ্বলের ন্যায় বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন।

দলনীবিবি আবার ফিরিয়া আসিলেন। গুরগণ খাঁর পদতলে পতিত হইলেন, বলিলেন, “আমি মুখরা বালিকা—কি বলিতে কি বলিলাম—আমার উপর রাগ করিবেন না। নবাবের অনিষ্ট ঘটিলে আমি নিশ্চিত প্রাণত্যাগ করিব। আমায় রক্ষা করুন—ভগিনী বধ করিবেন না। আমায় রক্ষা করুন। যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হউন।”

ভগিনীর কাতরোক্তি শুনিয়া সেনাপতি কহিলেন, "যুদ্ধের কোন সূচনা এখনও হয় নাই। তুমি কেন অনর্থক কাতর হইতেছ? যুদ্ধ কোথায়?"

দলনী কহিলেন, "আপনি তবে নৌকা ছাড়িয়া দিউন।"

গুরগণ খাঁ কহিলেন, "সে নবাবের ইচ্ছা।"

দলনী দেখিলেন, সকল কথা বৃথা হইল। ভগ্নাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন। গমন কালে বলিলেন, "আপনি সাবধান থাকিবেন। আমাকে আপনার শত্রু করিবেন না। আত্মরক্ষার্থ আমি আপনার শত্রুতা করিতে পারি।"

নবম পরিচ্ছেদ

ভ্রাতার স্নেহ

দলনী বাহির হইলে গুরগণ খাঁ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন যে, দলনী আর এক্ষণে তাঁহার নহে, সে মীরকাসেমের হইয়াছে। ভ্রাতা বলিয়া তাঁহাকে স্নেহ করিলে করিতে পারে কিন্তু সে মীরকাসেমের প্রতি অধিকতর স্নেহবতী। ভ্রাতাকে স্বামীর অমঙ্গলার্থী বলিয়া যখন বুঝিয়াছে বা বুঝিবে, তখন স্বামীর মঙ্গলার্থ ভ্রাতার অমঙ্গল করিতে পারে। অতএব আর উহাকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। গুরগণ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন।

একজন শস্ত্রবাহক উপস্থিত হইল। গুরগণ খাঁ আজ্ঞা করিলেন, "শীঘ্র ঘোড়া লইয়া আইস।"

গুরগণ খাঁর অশ্বালয়ে সর্ব্বদা অশ্ব সজ্জিত থাকিত। তখনই সজ্জিত অশ্ব সম্মুখে আনীত হইল, তদুপরি আরোহণ করিয়া গুরগণ খাঁ অতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া দলনীর পূর্ব্বেই দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ রাত্রে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে?"

প্রহরী চিনিয়া অভিবাদন করিল। কহিল,

"হুজুরের হুকুম।"

গুরগণ খাঁ কহিলেন, "আচ্ছা। আমার হুকুম আর তাহাকে প্রবেশ করিতে দিবে না। বদলির সময়ে এ কথা প্রহরীকে বুঝাইয়া দিও।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রহরী সেলাম করিল। গুরগণ খাঁ ফিরিলেন।

যাইবার সময়ে পথি মধ্যে গুরগণ খাঁ দুইটি স্ত্রীলোক দেখিয়া গিয়াছিলেন। চিনিয়াছিলেন। দ্রুতবেগে তাহাদিগের পার্শ্ব দিয়া অশ্ব ধাবিত করিয়াছিলেন, রাত্রে তদবস্থায় কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। এখন দুর্গদ্বার হইতে

প্রত্যাবর্ত্তন কালে, আবার সেই দুইজন স্ত্রীলোকের সম্মুখীন হইলেন। তখন অশ্ব থামাইলেন।

বলিলেন,

"বেগমসাহেব! তোমার সঙ্গে কে?" বলা বাহুল্য যে ঐ দুইটী স্ত্রীলোকের মধ্যে একটি দলনী—পদব্রজে দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল।

দলনী "বেগমসাহেব" সম্বোধন শুনিয়া প্রথমে চমকিয়া উঠিল,—তাহার হৃদয়ের শোণিত শুকাইয়া গেল—কিন্তু তখনই ভ্রাতাকে চিনিতে পারিল—উত্তর করিল "আমার সঙ্গে কুল্‌সম্—পথিমধ্যে বিপদ ঘটাইতেছেন কেন?"

গুরগণ খাঁ কহিল "তোমাদের দুর্গ প্রবেশ আমি নিষেধ করিয়া আসিয়াছি।"

শুনিয়া দলনী ক্রমে ক্রমে, ছিন্নবল্লীবৎ, ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। চক্ষু দিয়া ধারা বহিতে লাগিল। বলিলেন "ভ্রাতঃ, আমার দাঁড়াইবার স্থান রাখিলে না।"

গুরগণ খাঁ বলিলেন, "আমার গৃহে আইস। আমি তোমাকে উপযুক্ত স্থানে রাখিব। আমার কোন অনুচরের গৃহে তোমার স্থান করিয়া দিব।"

দলনী বলিল, "তুমি যাও। গঙ্গার তরঙ্গ মধ্যে আমার স্থান হইবে।"

গুরগণ খাঁ অশ্বে কষাঘাত করিয়া চলিয়া গেল। সেই অন্ধকার রাত্রে, রাজ-পথে দাঁড়াইয়া দলনী কাঁদিতে লাগিল। মাথার উপরে নক্ষত্র জ্বলিতেছিল—বৃক্ষ হইতে প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধ আসিতেছিল—ঈষৎ পবনহিল্লোলে অন্ধকারাবৃত বৃক্ষপত্র সকল মর্ম্মরিত হইতেছিল। গুরগণ খাঁর অশ্বের পদধ্বনি দূর হইতে ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। দলনী কাঁদিয়া বলিল, "কুল্‌সম্!"

---

(১)

সাজা বঙ্গে আজি রঙ্গে নানা জাতি ফুলে ;
তুলে আন্ চাঁপা ফুল রতির শ্রবণদুল
জবাফুল রক্তিম হিঙ্গুলে ;

কুমুদ তড়াগ শোভা আন্ তুলে মনোলোভা
মনোলোভা মল্লিকা মুকুলে ;
রঙ্গময়ী চিরস্থী নিশিগন্ধা মধুমুখী
অরবিন্দ অপূর্ব্ব পারুলে ;

সুতনু অপরাজিতা কৃষ্ণচূড়া আনন্দিতা
আন্ রসবতী কেয়া ফুলে ;
নানা ফুলে সাজা অঙ্গ, আজি প্রস্ফুটিত বঙ্গ
শারদ পার্ব্বণে দুঃখ ভুলে।

আয় কুলবধূ যত, কুমুদ কহ্লার মত
চামেলি গোলাপ বান্ধি চুলে ;
পর সাটী নীলাম্বরি, বুটি, বেল, ত্রিলহরী—*
দিগম্বরী† চিত্র করা ফুলে ;

সুচিকণ বারাণসী, কটিতে বাঁধিয়া কসি
রাঙা কর অধর তাম্বুলে ;
রুচি মুখে সুধা হাসি, অবিরল পরকাশি
দেখা খুলে যৌবন মুকুলে ;

শরতে চাঁদের সঙ্গে, বঙ্গ আলো কর রঙ্গে
ভাবুকের মন যাহে ভুলে।—
সাজা বঙ্গে আজি রঙ্গে নানা জাতি ফুলে॥

(২)

আজি কি সুখের দিন শারদ পার্ব্বণ ;
এসোগো প্রাচীনা যারা লৈয়ে কড়ি ফুল ঝারা
কৌটা ঝাঁপী চিরুণী দর্পণ ;
শিঁথিতে সিন্দূর ভাঁজ ধর আরতির সাজ
পরো খুলে পাটের বসন ;
দধি দুগ্ধ মনোহরা ছানা চিনি থালা ভরা
তিল নাড়ু সুধা আস্বাদন ;

ঘুচুক চক্ষের পাপ ঘুচাও দুঃখীর তাপ
খই নাড়ু কর বিতরণ ;
দেও সুখে হাতে তুলে চির দুঃখ যাক্ ভুলে
পুরাতন অজীর্ণ বসন।

রাঁধ অন্ন পালি পালি পাতে পাতে দেও ঢালি
পরিপাটী বধূর রন্ধন।
দেও অন্ন দেও এনে প্রাণ পূরে খাই মেনে
আহা শোন বলে দুঃখী জন ;

অমিও বলিয়ে তাই এই বেলা খেয়ে যাই
পরে আর পাব না এমন ;
এখন যে সব দেখি বউ ঝির ঢেঁকা ঢেঁকি
পরে অন্ন ঘটে কদাচন ;
শরতে সুখের কাল আশ্বিন কেমন!

(৩)

হাস্‌রে শরত চাঁদ কিরণ বিস্তারি ;
পথে মাঠে কি বাহার চেয়ে দেখ একবার
পদব্রজে পথিকের সারি ;

---

*ডেপেড়ে। †ক্রেপ।

অই গৃহ দেখা যায়　　বলিতে বলিতে ধায়
　আশার কুহকে বলিহারি ;
আশয়ে মানস ফুটে　　হাসির তরঙ্গ ছুটে
　বঙ্গে আজি রঙ্গ দেখি ভারি ;

হাসারে বিনোদ শশী　　বিনোদ গগনে বসি
　প্রাচীন কিশোর যুবা ধনাঢ্য ভিকারী,
বিপুল বঙ্গের মাঝে　　সুর বিমোহন সাজে
　ছড়ায়েছ ভাল যাদু কারি ।—

জলে জলে চলে তরি,　　তরঙ্গ বিদার করি
　মনোসুখে দেখি আঁখি ভরি,
পুষ্প যেন জল ময়　　আলো মাখা তরিচয়
　ভেসে যায় নদী নদোপরি ;

করে খেলা দলে দলে　　ডাকই তেচেঙ্গা জলে
　পড়ে দাঁড় ঝুপ্ ঝুপ্ করি ;
ধীরে তরি আগুয়ান　　উচ্চে হয় সারিগান
　শ্রুতিমূলে সুধা বৃষ্টি করি ;

আনন্দে বিহ্বল মন　　ভাসে জলে কত জন
　বঙ্গে আজি কি সুখ লহরী ।
　হাস্‌রে শরত চাঁদ কিরণ বিস্তারি ।

(৪)

হাস্ রে আকাশে বসি কুমুদ রঞ্জন
জাল ধূপ জাল ধূনা　　শঙ্খ ঘণ্টা রব দূনা
　কর বঙ্গ বাসী যত জন ;
পড় মন্ত্র দ্বিজগণ　　জবা বিল্ব অগণন
　বৃষ্টি কর মাথায়ে চন্দন ;
ঢাল জল দূর্ব্বাদল　　পঞ্চ গব্য সিন্ধু জল
　স্বাহা স্বাহা বল অনুক্ষণ ;
ঢাল চরু ঢাল সুরা　　অঞ্জলি অঞ্জলি পূরা
　কর হোমে হব্য বরিষণ ;
নর দুঃখ নিবারিণী　　আর্য্যকুল নিস্তারিণী
　বঙ্গে বামা প্রতিমা এখন ।
নৌবতে মধুর বোল　　কাড়া কড় কড় রোল
　শানায়ের মধুর নিক্বণ,
মৃদঙ্গ গভীর তাল　　খঞ্জনী সুরসাল
　বাঁশরীর ললিত স্বনন,
সারঙ্গ মৃদু সুরা,　　ঘোর রব তান পূরা
　এস্‌রাজ্ মধুর বাদন,
বেহালা সুপরিপাটী,　　জল তরঙ্গ বাটী
　বীণারব কোকিল লাঞ্ছন,
আজি রঙ্গে বাজা বঙ্গে,　　গভীর দামামা সঙ্গে
　আজিরে সুখের দিন শারদ পার্ব্বণ ।

[প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে যাহা মহাভারত হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে । অনবধানতা বশতঃ যথাস্থানে এ কথা লিখিত হয় নাই ।]

তৃতীয় সংখ্যা

ইউটিলিটি*

বা

দর্শন ঝম।

১। হিতবাদ দর্শন।

বেন্থাম এই দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বলিতে কি, এখনকার ইউরোপের চিন্তাপ্রণালী, অর্দ্ধেক বেন্থাম অর্দ্ধেক কোম্‌তের মতানুসারিণী। চিত্ত মধ্যে এই দুই মতের সমুচিত সামঞ্জস্যই আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা।

বেন্থামের পর, ডুমন, মিল, অষ্টিন প্রভৃতি তাঁহার মতের সম্প্রসারণ করিয়াছেন। ঐ মতই এক্ষণে মান্য এবং গ্রাহ্য। যাঁহারা মানেন না, হিতবাদীরা বলেন তাঁহারা হিতবাদ দর্শন সম্যক বুঝিতে পারেন না।

এই মতের সার কথা এই যে যাহা হিতকর, তাহাই অনুষ্ঠেয় ও কর্ত্তব্য। যাহা অহিতকর, তাহা বর্জ্জনীয় এবং অকর্ত্তব্য। হিতাহিত ফলোৎপাদকতা ভিন্ন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের—অর্থাৎ পুণ্য পাপের—অন্য লক্ষণ নাই।

এই সকল দার্শনিকেরা কখন বঙ্গদেশে আইসেন নাই—আসিলে তাঁহাদের প্রণীত হিতবাদ শাস্ত্র এরূপ অসম্পূর্ণ থাকিত না। বাঙ্গালীর মত হিতবাদী

---

* "ইউটিলিটি" শব্দের অর্থ কি? ইহার কি বাঙ্গালা নাই? আমি নিজে ইংরেজি জানি না—কমলাকান্তও কিছু বলিয়া দেয় নাই—অতএব অগত্যা আমার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমার পুত্র, ডেক্সনারী দেখিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে—"ইউ" শব্দে তুমি বা তোমরা; "টিল্" শব্দে চাস করা, "ইট" শব্দে খাওয়া, "ই" অর্থে কি তাহা সে বলিতে পারিল না, কিন্তু বোধ করি কমলাকান্ত, "ইউ-টিল-ইট-ই" শব্দে ইহাই অভিপ্রেত করিয়াছেন, যে "তোমরা চাস করিয়াই খাও।" কি পাপ! সকলকেই চাসা বলিল! ঈদৃশ দুর্বৃত্ত দশানন নেশাখোর গজাননের রচনা পাঠ করাতেও পাপ আছে। কেবল বঙ্গদর্শন সম্পাদকের অনুরোধেই আমার এ সকল প্রকাশ করা। বোধ হয় আমার পুত্রটি ইংরেজি লেখা পড়ায় ভাল হইয়াছে, নচেৎ এরূপ দুরূহ শব্দের সদর্থ করিতে পারিত না।—শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীশ।

পৃথিবীতে আর কোন জাতি নাই। এ শাস্ত্র বাঙ্গালীর নিকট কার্য্যে পরিণত। যাহাতে হিত বা উপকার নাই, এমত কার্য্য আমরা কখন করি না, বা করিতে সম্মত হই না।

ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের সঙ্গে বাঙ্গালী হিতবাদীদিগের বিলক্ষণ ঐক্য আছে—কিন্তু কয়েকটি প্রধান বিষয়ে অনৈক্য আছে। সেই অনৈক্য স্থল সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রথম, ইউরোপীয়েরা বাঙ্গালীর ন্যায় বলিয়া থাকেন, যাহা হিতকর তাহাই কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহারা আরও বলেন, যে এই হিত অর্থে জগতের হিত বুঝিতে হইবে। আমরা বলি হিত অর্থে আপনার হিত বুঝিতে হইবে। যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই পুণ্য, যাহাতে নিজের অহিত তাহাই পাপ।

দ্বিতীয়, ইউরোপীয়েরা বলেন, এই "হিত" অর্থে যাহা আশু হিতকর, তাহা বুঝায় না, যাহা চরমে হিতকর তাহাই বুঝিতে হইবে। শুভাশুভ ফলানুসন্ধানে, অনন্ত কাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুণ্য পাপ নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। আমরা বলি তাহা নহে; আমি যত দিন বাঁচিব, কেবল ততদিনের মধ্যে যাহা ঘটিতে পারে তাহাই আমার আলোচ্য। আমি মরিয়া গেলে হিতাহিতের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ?

আমাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, যে আমি যতদিন বাঁচিব ততদিনের কথাই বা কেন ভাবিব? দেখিতেছি, একটি কর্ম্ম করিলে, অদ্য সুখী হইব, এক বৎসর পরে তন্নিবন্ধন অসুখী হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এক বৎসর আমি বাঁচিব কি না, তাহা কে বলিতে পারে? অদ্যকার সুখ নিশ্চিত, ভাবী দুঃখ অনিশ্চিত। অতএব যাহাতে আশু সুখ তাহাই হিতকর, এবং কর্ত্তব্য।

তৃতীয়, ইউরোপীয়েরা বলেন, যে কোন কার্য্যের জগদ্ব্যাপী এবং অনন্ত কাল স্থায়ী ফলাফল সচরাচর লোকে আপন বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অতএব, কার্য্যের ফলাফল বিজ্ঞেরা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্য। বাঙ্গালী বলেন, বিজ্ঞ, আমি এবং আমার পূর্ব্বপুরুষেরা। আমাদের তুল্য বিজ্ঞ কে? অতএব আমার নিজের মত এবং স্বর্গীয় মহাশয়দিগের মত ভিন্ন আর কোন মত গ্রাহ্য করিব না। কেবল দুইটি বিষয়ে পূর্ব্বপুরুষদিগের মত অগ্রাহ্য—আহারে, এবং পরিচ্ছদে। বুট পেণ্টলুন পরিব, মদ্য মাংস খাইব। আর যদি ইংরাজি না শিখিয়া একটু ইংরাজি ছড়াইতে পারি তাহা ছড়াইব। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বপুরুষদিগের মতেই চলিব।

আমি এই হিতবাদ মতে অমত করি না; বরং আমি ইহার অনুমোদক।

তবে, আপনারা জানেন কি না বলিতে পারি না, আমি একজন সুযোগ্য দার্শনিক। আমি এই হিতবাদ দর্শন অবলম্বন করিয়া, কিছু ভাঙ্গিয়া, কিছু গড়িয়া, একটি নূতন দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে, তাহা বাঙ্গালায় প্রচলিত হিতবাদ দর্শনের নূতন ব্যাখ্যা মাত্র। তাহার স্থূল মর্ম্ম আমি সংক্ষেপেতঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রাচীন প্রথানুসারে দর্শনটি সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে। এবং আমি স্বয়ংই সূত্রের ভাষ্য করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছি। বাঙ্গালাতেই সূত্রগুলি লিখিত হইয়াছে। আমি যে অসংস্কৃতজ্ঞ, এমত কেহ মনে করিবেন না। তবে সংস্কৃতে সূত্রগুলি কয় জন বুঝিতে পারিবে? অতএব, সাধারণ পাঠকের প্রতি অনুকূল হইয়া বাঙ্গালাতেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছি। সে সূত্র গ্রন্থের সারাংশ এই ;—

২। উদর দর্শন।

১। জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বর বিশেষকে উদর বলে।

ভাষ্য।

"বৃহৎ"—অর্থাৎ নাসিকা কর্ণাদি ক্ষুদ্র গহ্বরকে উদর বলা যায় না। বলিলে, বিশেষ প্রত্যবায় আছে।

"জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বর"—জীবশরীরস্থ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নহিলে পর্ব্বত গুহা প্রভৃতিকে উদর বলিয়া পরিচয় দিয়া কেহ তাহার পূর্ত্তির প্রত্যাশা করিতে পারেন।

"গহ্বর"—যদিও জীবশরীরস্থ গহ্বর বিশেষই উদর শব্দে বাচা, তথাপি অবস্থা বিশেষে অঙ্গুলি প্রভৃতিও উদর মধ্যে গণ্য। কোন স্থানে উদর পুরাইতে হয়, কোন স্থানে অঙ্গুলি পুরাইতে হয়।

২। উদরের ত্রিবিধ পূর্ত্তিই পরম পুরুষার্থ।

ভাষ্য।

সাংখ্যেরও এই মত। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ উদর পূর্ত্তি।

"আধিভৌতিক"—অন্ন ব্যঞ্জন সন্দেশ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভৌতিক সামগ্রীর দ্বারা উদরের যে পূর্ত্তি হয়, তাহাই আধিভৌতিক পূর্ত্তি।

"আধ্যাত্মিক"—ঋষি প্রভৃতি অনাহারে বা বায়ু ভক্ষণের দ্বারা যে উদর পূর্ত্তি করেন, তাহাকে আধ্যাত্মিক পূর্ত্তি বলা যায়। অথবা, যাঁহারা দাতার বাক্যে লুব্ধ হইয়া, আশায় বদ্ধ হইয়া, কালযাপন করেন, তাঁহাদিগেরও আধ্যাত্মিক উদর পূর্ত্তি হয়।

"আধিদৈবিক"—দৈবানুকম্পায় প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতির দ্বারা যাঁহাদের উদর পুরিয়া উঠে, তাঁহাদিগের আধিদৈবিক উদর পূর্ত্তি।

৩। এতন্মধ্যে আধিভৌতিক পূর্ত্তিই বিহিত।

ভাষ্য।

"বিহিত"—বিহিত শব্দের দ্বারা অন্যান্য পূর্ত্তির প্রতিষেধ হইল, কি না ভবিষ্যৎ ভাষ্যকারেরা মীমাংসা করিবেন।

এক্ষণে সিদ্ধ হইল, যে উদর নামক মহাগহ্বরে লুচি সন্দেশ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের প্রবেশেই পুরুষার্থ। অতএব এ গর্ত্তের মধ্যে কি প্রকার ভূত প্রবেশ করান যাইতে পারে, তাহা নির্ব্বাচন করা যাইতেছে।

৪। বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম, উপাসনা, বল, এবং প্রতারণা, এই ষড়্‌বিধ পুরুষার্থের উপায়, পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভাষ্য।

"বিদ্যা"—বিদ্যা কি, তাহা অবধারণ করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন লিখিতে ও পড়িতে শিখাকে বিদ্যা বলে। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যার জন্য লিখিতে বা পড়িতে শিখার প্রয়োজন নাই, গ্রন্থ লিখিতে সম্বাদ পত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল। কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করেন, যে লিখিতে জানে না সে পত্রাদিতে লিখিবে কি প্রকারে? আমার বিবেচনায় এরূপ তর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কুম্ভীরশাবক ডিম্ব ভেদ করিবামাত্র জলে গিয়া সাঁতার দেয়—অথচ কখন সাঁতার শিখে নাই। সেইরূপ বিদ্যা বাঙ্গালির স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখাপড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই।

"বুদ্ধি"—যে আশ্চর্য্য শক্তি দ্বারা তুলাকে লোহ, লোহকে তুলা বিবেচনা হয় সেই শক্তিকে বুদ্ধি বলে। কৃপণের সঞ্চিত ধন রাশির ন্যায় ইহা আমরা স্বয়ং সর্ব্বদা দেখিতে পাই, কিন্তু পরে কখন দেখিতে পায় না। পৃথিবীর সকল সামগ্রীর অপেক্ষা বোধ হয় জগতে ইহারই আধিক্য। কেননা কখন কেহ বলিল না যে ইহা আমি অল্প পরিমাণে পাইয়াছি।

"পরিশ্রম"—উপযুক্ত সময়ে ঈষদুষ্ণ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন, তৎপরে নিদ্রা, বায়ু সেবন, তামাকুর ধূম পান, গৃহিণীর সহিত প্রিয় সম্ভাষণ, ইত্যাদি গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের নাম পরিশ্রম।

"উপাসনা"—কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে হয় তাহার গুণানুবাদ বা দোষ কীর্ত্তন করিতে হয়। কোন ক্ষমতাশালী প্রধান ব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ কথা হইলে, যদি তিনি প্রকৃত দোষযুক্ত ব্যক্তি হয়েন, তবে তাঁহার দোষ

কীর্ত্তন করাকে নিন্দা বলে। আর তিনি যদি দোষী না হয়েন, তবে তাঁহার দোষ কীর্ত্তনকে স্পষ্ট বক্তৃত্ব অথবা রসিকতা বলে। গুণ পক্ষে, তিনি যদি গুণহীন হয়েন, তবে তাঁহার গুণ কীর্ত্তনকে ন্যায়নিষ্ঠতা বলে। আর যদি তিনি যথার্থ গুণবান হয়েন, তবে তাঁহার গুণ কীর্ত্তনকে উপাসনা বলে।

"বল"—দীর্ঘচ্ছন্দ বাক্য—মুখ চক্ষুর আরক্তভাব—ঘোরতর ডাক হাঁক,—মুখ হইতে অনর্গল, হিন্দী, ইংরেজি, এবং নিষ্ঠীবনের বৃষ্টি,—দূর হইতে ভঙ্গীর দ্বারা কিল, চড়, ঘুষা, এবং লাথি প্রদর্শন, ও সার্দ্ধ তিপ্পান্ন প্রকার অন্যান্য অঙ্গ-ভঙ্গী—এবং বিপক্ষের কোন প্রকার উদ্যম দেখিলে অকালে পলায়ন ইত্যাদিকে "বল" বলে।

বল ষড়-বিধ,—যথা

মৌখিক—অভিসম্পাত, গালি নিন্দা প্রভৃতি।

হাস্ত—কিল, চড় প্রদর্শন প্রভৃতি।

পাদ,—পলায়নাদি।

চাক্ষুষ—রোদনাদি। যথা চানক্যপণ্ডিত,—"বালানাং রোদনং বলং" ইত্যাদি

ত্বাচ—প্রহার, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি।

মানস—দ্বেষ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি।

"প্রতারণা"—নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পৃথিবীমধ্যে প্রতারক বলিয়া জানিও,

এক, পণ্যাজীব। প্রমাণ—দোকানদার জিনিষ বেচিয়া, আবার মূল্য চাহিয়া থাকে। মূল্যদাতা মাত্রেরই মত যে তিনি ক্রয়কালীন প্রতারিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয়, চিকিৎসক। প্রমাণ—রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইলে পরে যদি চিকিৎসক বেতন চায়, তবে রোগী প্রায় সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, যে আমি নিজে আরাম হইয়াছি ; এ বেটা অনর্থক ফাঁকি দিয়া টাকা লইতেছে।

তৃতীয়, ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি। ইঁহারা চিরপ্রথিত প্রতারক, ইহাদিগের নাম "ভণ্ড"। ইঁহারা যে প্রতারক তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, ইঁহারা অর্থাদির কামনা করেন না। ইত্যাদি।

৫। এই ষড়্‌বিধ উপায়ের দ্বারা উদরপূর্ত্তি বা পুরুষার্থ অসাধ্য।

ভাষ্য।

এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করা যাইতেছে। বিদ্যাদি ষড়্‌বিধ উপায়ের দ্বারা যে উদরপূর্ত্তি হইতে পারে না, ক্রমে তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

"বিদ্যা"—বিদ্যাতে যদি উদরপূর্ত্তি হইত তবে বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের অন্নাভাব কেন ?

"বুদ্ধি"—বুদ্ধিতে যদি উদরপূর্ত্তি হইত, তবে গর্দ্দভ মোট বহিবে কেন?

"পরিশ্রম"—পরিশ্রমে যদি হইত, তবে বাঙ্গালীবাবুরা কেরাণী কেন?

"উপাসনা"—উপাসনায় যদি হইত তবে সাহেবগণ কমলাকান্তকে অনুগ্রহ করেন না কেন? আমিত মন্দ পে বিল লিখি নাই।

"বল"—বলে যদি হইত, তবে আমরা পড়িয়া মার খাই কেন?

"প্রতারণা"—প্রতারণায় যদি হইত, তবে মদের দোকান কখন কখন ফেল হয় কেন?

৬। **উদরপূর্ত্তি বা পুরুষার্থ কেবল হিত সাধনের দ্বারা সাধ্য।**

ভাষ্য।

উদাহরণ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা লোকের কাণে মন্ত্র দিয়া তাহাদের হিতসাধন করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় জাতিগণ অনেক বন্যজাতির হিতসাধন করিয়াছেন, এবং রুসেরা এক্ষণে মধ্য-আসিয়ার হিতসাধনে নিযুক্ত আছেন। বিচারকগণ বিচার করিয়া দেশের হিতসাধন করিতেছেন। অনেকে সুবিক্রেয় এবং অবিক্রেয় পুস্তক ও পত্রাদি প্রণয়ন দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতেছেন। এ সকলের প্রচুর পরিমাণে উদরপূর্ত্তি অর্থাৎ পুরুষার্থ লাভ হইতেছে।

৭। **অতএব সকলে দেশের হিতসাধন কর।**

ভাষ্য।

এই শেষ সূত্রের দ্বারা হিতবাদ দর্শন, এবং উদর দর্শনের একতা প্রতিপাদিত হইল। সুতরাং এই স্থলে কমলাকান্ত সূত্র গ্রন্থের সমাপ্তি হইল। ভরসা করি, ইহা ভারতবর্ষের সপ্তম দর্শনশাস্ত্র বলিয়া আদৃত হইবে।

প্রয়োগ।

১

বহিছে পবন স্বনিয়া স্বনিয়া,
নিশ্বাসিছে তরু থাকিয়া থাকিয়া,
উপর আকাশে যেতেছে ভাসিয়া,
নিবিড় জলদ, দিক আঁধারিয়া।

২

বহিছে পবন স্বনিয়া স্বনিয়া,
ঝর ঝর ঝরে বরিষার জল;
পবন পরশে বিরহীর হিয়া,
বিরহ অনলে জ্বলিছে কেবল।

৩

বিরহীর হিয়া জ্বলিছে কেবল,
যত ঝরিতেছে বরিষার জল;
বিরহীর হিয়া জ্বলিছে কেবল,
যতই বিদ্যুৎ করে ঝল মল।

৪

গগনে জলদ গরজে গম্ভীর,
বহিছে জলার্দ্র শীতল পবন;
উথলিয়া ঢেউ প্রেম জলধির
চাহে বিদারিতে হৃদয় গগন।

৫

কোথায় গেলাস—ঢাল ব্রাণ্ডি, ঢাল,
নিবাইতে এই হৃদয় উচ্ছ্বাস;
এমন ঔষধ—হেন মায়া জাল—
মহৌষধি এই ব্রাণ্ডির গেলাস!

বিরাম।

৬

ঢাল বিষ ঢাল, যত পার খাও।
লুপ্ত হোক ভবে বাঙ্গালীর নাম
দাসের জীবনে কি কাজ? ডুবাও
সুরাপাত্র মাঝে ধর্ম্ম অর্থ কাম।

প্রয়োগ।

৭

এখনো প্রিয়ার বদন কমল
পড়িতেছে মনে; নয়ন যুগল—
বিদায় কালের সে চিত্র সজল,
চারিদিকে শুধু নিরখি কেবল।

৮

ঢাল ব্রাণ্ডি, ঢাল—ঢাল আরবার;
এ যাতনা প্রাণে নাহি সহে আর;
কেন মনে পড়ে আবার আবার?
কেন শুনি সদা বচন তাহার?

৯

আবার, আবার, ঢাল ভ্রান্তি, ঢাল;
আর না—ঢের্—হয়েছে এবার,
ঘুরিতেছে ধরা, আকাশ, পাতাল,
উথলিছে চিত্তে সুখ-পারাবার।

১০

যা বলে বলুক নির্ব্বোধ চাষায়,
এমন জিনিস নাহিক ধরায়;
ভ্রান্তি—না থাকিলে, জ্বলিত সদায়
মানব জীবন, দুঃখের শিখায়।

১১

সুখ যাহা বল সে কথার কথা,
দেখেছে কি কেহ? পেয়েছে কখন?
আকাশ কুসুম—মুকুতার লতা—
জীবনেতে মৃগতৃষ্ণিকার ভ্রম?

১২

ওই আকাশের নীলিমা মতন,
দুঃখই জীবন স্থিতি ও বিস্তার;
সুখ যাহা বল, বিদ্যুৎ যেমন,
বাড়ায় দ্বিগুণ নীলিমা তাহার।

১৩

ওই নরপতি বসে সিংহাসনে;
মাথায় মুকুট, রাজদণ্ড করে;
ওই যে ভিক্ষুক অবসন্ন মনে;—
উভয় সমান অসুখী অন্তরে।

১৪

তারতম্য এই—ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়,
ভুলিবে দরিদ্র, নিশীথে নিদ্রায়;
কত নরপতি সে সময়ে হায়!
নীরবে তিতাবে অশ্রুতে শয্যায়!

১৫

আজি সিংহাসনে—ধরার ঈশ্বর,
কালি রণাঙ্গনে—করেতে শৃঙ্খল;
গত ফ্রেঞ্চপতি,—'সিডন' সমর—
স্মরি কার নাহি ঝরে অশ্রুজল?

১৬

নাহি রাজ্যে সুখ;—নাহি সুখ ধনে;
ধনে ধন-তৃষা বাড়ে নিরন্তর;
চাতকের মত শত বরিষণে,—
কোথা সুখ?—শুধু তৃষ্ণায় কাতর।

১৭

পুরাকালে এই তৃষ্ণা অবতার,
সমগ্র পৃথিবী জিনি বাহুবলে;
"নাহি রাজ্য ভবে, কি জিনিব আর?"
বলিয়া, ভাসিল নয়নের জলে।

১৮

খোল ইতিহাস—জীবন কানন,
বল প্রবেশিয়া তাহার ভিতরে,
আছে কোন ফুল—কোন পুণ্যবান—
পশে নাহি কীট—যাহার অন্তরে?

১৯

নাহি সুখ তবে এই ধরাতলে,
নাহি সুখ এই মানব জীবনে;
আপন অবস্থা এই ভূমণ্ডলে,
নহে সুখকর কাহারো নয়নে।

২০

বিশেষ বাঙ্গালী চির পরাধীন;
দাসত্ব জনম, দাসত্ব জীবন;
হইবে জীবন দাসত্বে বিলীন,
দাসত্ব, যাহার অদৃষ্ট লিখন।

২১

ইহাদের আহা ! কি সুখ ভূতলে ?
যেই ইন্দ্রজাল, দুঃখের জীবন
করে সহনীয় মানব মণ্ডলে,
—শৌর্য্য, বীর্য্য, অসি, রাজ্য, সিংহাসন,—

২২

নাহি ইহাদের ; নাহি অনেকের
ঘরে অন্ন জল ; কি বলিব আর ?
বাঙ্গালী জীবন শোক সমুদ্রের,
কেমনে গণিব লহরী অপার ?

২৩

পূজে সারাদিন প্রভুর চরণ,
যবে মৃতপ্রায় ফিরে আসি ঘরে ;
ধরাতলে আহা ! কি আছে এমন,
জীবনের সাধ জন্মায় অন্তরে ?

২৪

কি আছে এমন পারে ভুলাইতে
বিদেশিনী সেই প্রিয়ার বদন ?
এমন কিছুই নাহি পৃথিবীতে,
যতক্ষণ নাহি পাসরি আপন।

২৫

কিসে তবে বল আপনা পাসরি ?
ডুবাই জীবন বিস্মৃতি সাগরে ?
কিসে ধরা দুঃখ সব পরিহরি,
লভি স্বর্গ-সুখ প্রফুল্ল অন্তরে ?

২৬

ব্রাণ্ডি ;—ব্রাণ্ডি বিনে, কিছু নাহি আর
অধীনতা দুঃখ করিতে বিনাশ ;
চিত্তে স্বাধীনতা করিতে সঞ্চার,
মহৌষধি এই ব্রাণ্ডির গেলাস !

বিরাম।

২৭

দাসত্ব জ্বালায় মরিবারে চাও ?
মরিবার তরে খুঁজিছি গরল ?
ঢাল এই বিষ—অধঃপাতে যাও
এ জলন্ত বারি—তরল অনল।

২৮

জ্ঞান বুদ্ধি লজ্জা ভরসা বিশ্বাস,
নীতি, ধর্ম্ম, সত্য, জাতীয় গৌরব।
এই বিষ তেজে হইবে বিনাশ
একা সুরা বঙ্গে বিনাশিবে সব।

২৯

এই তব ধার্য্য এতেই গৌরব,
কোথা চন্দ্রগুপ্ত ? কোথা হর্ষরাজ ?
যশ-কীর্ত্তি বুদ্ধি মিছাকথা সব
ঢাল ব্রাণ্ডি কর—পুরুষের কাজ।

প্রয়োগ

৩০

আবার, আবার, ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল ;
দেখ—সব দুঃখ ভেসেছে এবার ;
ঘুরিতেছে ধরা আকাশ পাতাল,
উথলিছে চিত্তে সুখ-পারাবার।

৩১

বম্ ভোলানাথ ! হর হর হর,
তুমি বিনে প্রভু, এই ভূমণ্ডলে
সুরার মাহাত্ম্য, অহে সুরেশ্বর,
কেমনে বুঝিবে নশ্বর সকলে ?

৩২

সুরা হতে সুর, সুরপতি শুনি ;
অসুর, অসুর সুরার বিহনে ;
সুরা হতে মর্ত্তে নাম সুরধুনী,—
পতিত-পাবনী বিখ্যাত ভুবনে।

৩৩

বম্ বম্ বম্, হর হর হর,
মত্ত—দেবগণ সুরার লাগিয়া ;
অনাদি, অনন্ত, সৃষ্টির ঈশ্বর,
কারণ-সাগরে ছিলেন ভাসিয়া।

৩৪

সুরা হতে সৃষ্টি ;—গোলাপি নেশায়,
শত সৃষ্টি পারি সৃজিতে হেলায় ;
মধ্যম নেশায়—সৃষ্টি স্থিতি পায় ;
প্রলয় কেবল, অধিক মাত্রায়।

৩৫

কোথাকার শশী কোথা গিয়া পড়ে,
পৃথিবী উপরে, নীচে নভঃস্থল ;
ঘোরে চরাচর চক্রের উপরে,
গিরি হয় নদী, সমুদ্র ভূতল !

৩৬

বম্ বম্ বম্ হর হর হর
সুরাসুরে দ্বন্দ্ব অমৃত লাগিয়া ;
শঙ্কর ঝাপটে কাঁপি থর থর,
সুধাভাণ্ড দিল মোহিনী ফেলিয়া।

৩৭

ফ্রেঞ্চ পুণ্যভূমে সে ভাণ্ড পড়িল ;
মর্ত্তে ব্রাণ্ডি নামে বিখ্যাত হইল ;
অধীনতা দুঃখে—পবিত্র সলিল—
তারিতে বাঙ্গালী বঙ্গেতে আসিল।

৩৮

সঙ্গে তুমি—তুমি কে ? যম ? কি ভয় !
জানি আমি ব্রাণ্ডি তব উপাদান ;
যেই বিষাধার বাঙ্গালীহৃদয়,
এই বিষ তাহে অমৃত সমান।

৩৯

শত মৃত্যু যার মুহূর্ত্তে সঞ্চার,
এক মৃত্যু তার কাছে কোন ছার !
এক যম তুমি—কি ভয় তোমার !
শত যম আছে উপরি আমার।

৪০

ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল, ঢাল আরবার,
জ্বলিতেছে বুক হতেছে অঙ্গার,
জেতা পরাজিতে সমান বিচার,
মাতব্রাণ্ডি ! যেন থাকে অনিবার !

অনেকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এবং তাঁহাদিগের গ্রন্থমালার সারমর্ম্ম অবগত হইবার নিমিত্ত বিশেষ উৎসুক এজন্য তাঁহাদিগের কথঞ্চিৎ কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য এতৎ প্রস্তাব সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বলিলেই, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ দাসকে বুঝায়, কিন্তু আমরা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণ-পরায়ণ অন্যান্য সাধু সচ্চরিত্র গ্রন্থকারের বিবরণও লিখিলাম। এই প্রস্তাব অতি সংক্ষেপে এবং অতি স্বল্প কালের মধ্যে সংকলিত হইয়াছে এজন্য যদি কোন ভ্রম লক্ষিত হয় তবে পণ্ডিত মণ্ডলী মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীরূপ, সনাতন ও জীবন গোস্বামী।

(বৈষ্ণব তোষিণী হইতে অনুবাদিত)

ত্রয়ী—অর্থাৎ তিন বেদরূপ মধুকরী, যাহার অমৃত নিস্যন্দিনী জিহ্বা স্বরূপ কল্প-লতিকাতে, বিশিষ্ট মনোজ্ঞ পদ ক্রমাদি আশ্রয় করিয়া পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিয়াছিল; রাজ-সভার সভ্যেরা সর্ব্বদা যে মহাত্মার পদসেবা করিত; সেই ভরদ্বাজ কুলপ্রবর কর্ণাটরাজ—যিনি এই ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ছিলেন, (৪) তাঁহার অনিরুদ্ধ নামে একটী পুত্র হইয়াছিল। অনিরুদ্ধ যশো বিষয়ে শশধর স্পর্দ্ধী, প্রভাবে ইন্দ্রের তুল্য, ভূপালবর্গের পূজ্য, সমগ্র যজুর্ব্বেদের বিশ্রামভূমি স্বরূপ, এবং লক্ষ্মীর আশ্রয় স্বরূপ ছিলেন। (৫) এই সুবিখ্যাত রাজার দুই মহিষী ছিল। রাজপত্নীদ্বয় অনিরুদ্ধ হইতে পুত্রদ্বয় লাভ করিয়াছিলেন। তাহার একের নাম শ্রীরূপেশ্বর, অপরের নাম হরিহর, তন্মধ্যে, জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর শাস্ত্র বিদ্যায় এবং কনিষ্ঠ হরিহর শস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। (৬) অনিরুদ্ধ দেব যৎকালে বৃন্দাবনে গমন করেন, তৎকালে স্বরাজ্যকে বিভাগ করিয়া রূপেশ্বর ও হরিহরকে প্রদান করিয়া যান। কিছুদিন পরে কনিষ্ঠ হরিহর স্বজ্যেষ্ঠ রূপেশ্বরকে রাজ্যবহিকৃত করিয়া দিলেন। (৭) এখন রূপেশ্বর শত্রু কর্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আটটী অশ্ব

গ্রহণ পূর্ব্বক পত্নী সমভিব্যাহারে পৌরস্ত্য দেশে প্রস্থান করিলেন। তত্রত্য রাজা শিখরেশ্বর তাঁহার সখা ছিলেন, রূপেশ্বর তাঁহারই আবাসে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে তথায় বাস করিতে করিতে তাঁহার একটী পুত্র হইল। পুত্রের নাম পদ্মনাভ রাখিলেন। (৮) গুণনিধান ও সুকৃতিবান পদ্মনাভের রসনায় সাঙ্গ যজুর্ব্বেদ—সবিস্তর উপনিষদ সকল তাণ্ডবিত হইয়াছিল। এবং তিনি কৃষ্ণ প্রেমে পূর্ণ হৃদয় হইয়াছেন, এইরূপ সকল মনুষ্যের কর্ণ পথে ধ্বনিত হইল। (৯) এক্ষণে, শিখরেশ্বরের অধিকারে বাস করিতে, পদ্মনাভের অস্পৃহা জন্মিল, তিনি গঙ্গাতটে বাস করিবার জন্য সমুৎসুক চিত্ত হইলেন। অনন্তর নরহট্ট নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। (১০) তথায় বাস করিয়া যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সেবায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার ১৮ অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। তন্মধ্যে, প্রথম—পুরুষোত্তম (১) দ্বিতীয় জগন্নাথ (২) তৃতীয় নারায়ণ (৩) চতুর্থ মুরারি (৪) পঞ্চম মুকুন্দ (৫) (১১) মহাত্মা মুকুন্দের এক পুত্র। নাম কুমার। এই শ্রীমান—কুমার শত্রু কর্ত্তৃক অপকৃত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। কুমারেরও অনেকগুলি পুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে তিন শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত। যে মহাত্মার বংশপরম্পরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র পূজ্য। (১২) দ্বিজবর কুমারের পুত্রত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সনাতন (১) তদনুজ শ্রীরূপ (২) কনিষ্ঠ বল্লভ (৩) এই ভ্রাতৃত্রয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের কৃপায় সামান্য রাজ্য হইতে বিরত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমাখ্য ভক্তিরাজ্যের সম্রাট্ হইয়াছিলেন। (১৩) যিনি সর্ব্ব কনিষ্ঠ বল্লভ তিনিই আমার পিতা। পিতা গঙ্গা সলিলে সঙ্গত হইয়া শ্রীরামপদ প্রাপ্ত হইলেন। জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যদ্বয় বৃন্দাবনে প্রস্থান করিলেন। এই মহাত্মাদ্বয় কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে মাথুর গুপ্ত প্রভৃতি তীর্থ আবিষ্কৃত হয়। এবং ইঁহারা ব্রজরাজ নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। (১৪) বিখ্যাত রঘুনাথ দাস ইঁহাদিগের সখা ছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমার্ণব তরঙ্গে বিলাস করত ইহাঁরা আর্য্যগণের আশ্চর্য্যাস্পদ হইয়াছিলেন। (১৫) প্রথিত আছে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরাহরণচ্ছলে গোপাল বালকের রূপ ধারণ করিয়া ইহাঁদিগের দৃষ্টি পথে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (১৬) এই প্রভুদ্বয় নানাবিধ যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীরূপ স্বামীর হংসদূত (১) উদ্ধব সন্দেশ [২] ছন্দোহষ্টাদশ [৩] এই তিন কাব্য গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। উৎকলিকাবল্লী [১] গোবিন্দ বিরুদাবলী [২] প্রেমেন্দু সাগর [৩]—প্রভৃতি স্তোত্র গ্রন্থ। বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব এই দুই নাটক গ্রন্থ। দানকেলি প্রভৃতি ভানিকা। মথুরা মাহাত্ম্য [১] পদ্যাবলী [২] নাটকচন্দ্রিকা (৩) সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃত (৪) ভক্তি রসামৃত সিন্ধু (৫)—প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থ। (১৬-২০)।

জ্যেষ্ঠ সনাতন স্বামিকৃত বহুতর গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ—ভাগবতামৃত ও হরিভক্তি বিলাস এবং দিক্‌প্রদর্শিনী নাম্নী ভাগবত টীকা। (২১)। এবং লীলা-স্তব টীপ্পনীও প্রসিদ্ধ বটে—আমি তাঁহার আজ্ঞাক্রমে যাহাকে সংক্ষিপ্ত করিলাম। ইহার নাম বৈষ্ণব তোষিণী।

জীব গোস্বামী স্বকৃত বৈষ্ণব তোষিণীর সমাপ্তি কালে এই রূপ পরিচয় দিয়াছেন।
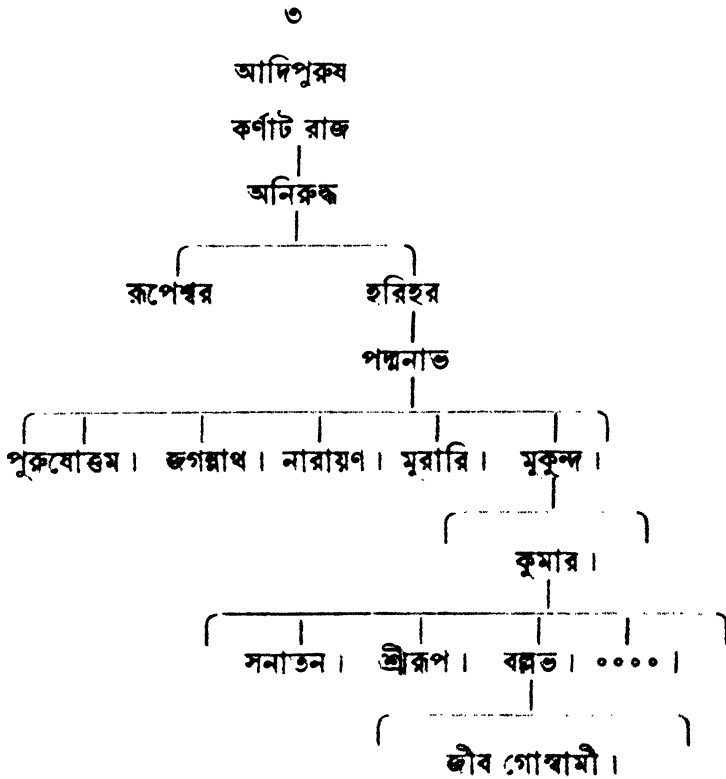
উজ্জ্বল নীল মণি। সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ। রচয়িতা শ্রীরূপ গোস্বামী। গদ্য ও পদ্যে সঙ্কলিত। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ লীলা বর্ণনচ্ছলে সাঙ্গোপাঙ্গ শৃঙ্গার রস নির্ণয়, ভক্তি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব নির্ণয়, কৃষ্ণ প্রেম বিবৃতি প্রভৃতি নানাবিধ আলঙ্কারিক বস্তু নির্ণয়। ১৫ পঞ্চদশ প্রকরণে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। শ্লোক সংখ্যা—অন্যূন ৬১০০। টীকার নাম "লোচন রোচনী।" প্রারম্ভ বাক্য—

—"নামাকৃষ্ট রসজ্ঞঃ শীলে নোপয়ন সদানন্দম্।
নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্মা প্রভুর্জয়তি ॥
মুখ্যরসেষু পুরায়ঃ সংক্ষেপেনোজ্জিতোরহস্যত্বাৎ।
পৃথগেব ভক্তি রসরাট্ সবিস্তরেণোচ্যতে মধুরঃ ॥"

ইত্যাদি সমাপ্তি বাক্য—

—"অয়মুজ্জ্বল নীলমণির্গহন মহাঘোষ সাগর প্রভবঃ।
জয়তু তব মকর কুণ্ডল পরিসবাসবৌ চিত্রীং দেবঃ।"

"ইতি সমাপ্তোঽয়মুজ্জ্বল নীলমণি নাম গ্রন্থঃ।"

হংসদূত। খণ্ড কাব্য। গ্রন্থকার রূপ গোস্বামী। শিখরিণীচ্ছন্দে রচিত। শ্লোক সংখ্যা ১০১। বিষয় শ্রীকৃষ্ণ বিরহে গোপীগণের অবস্থা বর্ণন, রাধিকার অবস্থা, তদনন্তর এক হংস সন্দর্শন করিয়া গোপীগণ তাঁহাকে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

আরম্ভ শ্লোক—"দুকূলং বিভ্রাণো দলিত হরিতাল দ্যুতিহরং" ইত্যাদি। সমাপ্তি বাক্য—কদাইত্যাদি—

উদ্ধব সন্দেশ। খণ্ড কাব্য। রচয়িতা রূপ গোস্বামী। মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দে গ্রথিত। গ্রন্থ সংখ্যা—১৩১, বিষয়—রাধিকা বিরহে শ্রীকৃষ্ণের মনোবৃত্তি বর্ণন, তদনন্তর উদ্ধব দ্বারা বৃন্দাবনে গোপ গোপিনী বিশেষতঃ রাধিকার নিকট বার্ত্তা প্রয়োগ বর্ণন। প্রারম্ভ—"সান্দ্রীভূতের্ণব বিটপিনাং ইত্যাদি"—সমাপ্তিবাক্য— "শ্রীদামাদ্যৈঃ শিশু সহচরৈঃ" ইত্যাদি।

বৃন্দাদেব্যষ্টক। অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরূপ গোস্বামী। বিষয়—বৃন্দা গুণকীর্ত্তন। গ্রন্থ সংখ্যা ৮। প্রারম্ভ বাক্য—

"বৃন্দাবনাধি দেবীত্বং সচ্চিদানন্দ রূপিণী।
সতত্বৈশ্বর্য্য সংযুক্তাং বৃন্দাদেবীং নমাম্যহম্।"

সমাপ্তি বাক্য—

"যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় বৃন্দাদেব্যষ্টকম শুভম্।
রাধাগোবিন্দ পাদাব্জে প্রেমভক্তি লভেদ্ধ্রুবং॥"

শ্রীরূপ চিন্তামণি। শার্দ্দূল বিক্রীড়িতচ্ছন্দে বিরচিত। শ্রীরূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত। বিষয়—শ্রীভগবদ্রূপ বর্ণন। গ্রন্থসংখ্যা ৩২ শ্লোক। প্রারম্ভ বাক্য—"চন্দ্রার্দ্ধং কলশং ত্রিকোণ ধনুষীখং গোষ্পদং প্রোষ্টিকাং" ইত্যাদি॥

সমাপ্তি বাক্য—"ইতি শ্রীরূপগোস্বামিনা বিরচিতঃ শ্রীরূপ চিন্তামণিঃ পূর্ণঃ।"

মথুরা মাহাত্ম্য। সংগ্রহ গ্রন্থ। শ্রীরূপ গোস্বামী ইহার সংগ্রহ কর্ত্তা। বিষয়— মথুরাতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন ও স্তুতি। শ্লোক সংখ্যা অন্যূন ১৫০০। প্রারম্ভ বাক্য—

—"হরিরপি ভজমানেভ্যঃ প্রায়ো মুক্তিং দদাতি নতুভক্তিং।
বিহিত তদুন্নতি সত্রাং মথুরে ধন্যাং নমামি ত্বাং।"

সমাপ্তি বাক্য—"ইতি মথুরা মাহাত্ম্য সংগ্রহঃ।"

ললিত মাধব নাটক। গ্রন্থকার শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী। ১০ দশ অংশে বিভক্ত।

অংশের নাম অঙ্ক। অবলম্বিত বিষয় শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলামাহাত্ম্য বর্ণন। সংখ্যা গদ্য পদ্যে অন্যূন ৩০০০ তিন সহস্র শ্লোক। প্রারম্ভ বাক্য নান্দী—

"সুররিপু সুদৃশামুরোজ কোকান্ মুখকমলানিব খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিল সুহৃচ্চকোর নান্দীশতু মুকুন্দ যশঃ শশীমুদংবঃ।"

ইত্যাদি সমাপ্তি বাক্য—

"যাতে লীলা + + + পরিমলোদ্‌গারি বন্যা পরীতা,
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরী মাধুরিভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুল পশুপীবাভ মুগ্ধাস্ত রাভিঃ
সম্বীত স্তং কলয় বদনোল্লাসি বেণুর্ব্বিহারং।"
কৃষ্ণ। প্রিয়ে! তথাস্ত—তদেহিস্তস্য স্তবাভ্যর্থনামবন্ধ্যাং
করবা বেতি সর্ব্বে কবৃতো নিষ্ক্রান্তঃ, নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।
খণ্ডের নাম বিভাগ। পূর্ণ মনোরথো নাম দশমোঽঙ্কঃ পূর্ণঃ।

ভক্তি রসামৃত সিন্ধু। সংগ্রহ গ্রন্থ। গ্রন্থকার শ্রীরূপ গোস্বামী। চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম পূর্ব্ব বিভাগ। দ্বিতীয়—দক্ষিণ বিভাগ। তৃতীয়—পশ্চিম বিভাগ। চতুর্থ—উত্তর বিভাগ। পূর্ব্ব বিভাগও চারি ভাগে বিভক্ত। বিভাগের নাম লহরী। প্রথম—সামান্য ভক্তি লহরী। দ্বিতীয় সাধন লহরী। তৃতীয় ভাব লহরী। চতুর্থ প্রেম নিরূপণ লহরী। দক্ষিণ বিভাগে ৫ লহরী। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব, ব্যভিচারী ভাব, ও স্থায়ী ভাবাখ্য লহরী।

পশ্চিম বিভাগে ৫ লহরী। শান্তাখ্য, দাস্যাখ্য, বাৎসল্যাখ্য, মাধুরাখ্য, সখ্যাখ্য লহরী।

উত্তর বিভাগে ৯ লহরী।—গৌণ রসাখ্য, মৈত্রীরসাখ্য, বৈর, সংযোগ রসাভাসাখ্য লহরী; রস, হাস্যাখ্য লহরী।

পূর্ব্ব বিভাগে বিষয়—ভক্তি, সাধন, ভাব ও প্রেম প্রভৃতি নির্ণয়। দক্ষিণ বিভাগে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব, ব্যভিচারীভাব, ও স্থায়ীভাব প্রভৃতির নির্ণয়।

পশ্চিম বিভাগে—শান্ত দাস্যাদি ভাব নির্ণয় ও তাহার উপযোগ। উত্তর বিভাগে—গৌণ রস ও মুখ্যরস বিচার, মৈত্রী, বৈর, সংযোগ, প্রভৃতি ভাব ও রস, রসাভাসাদি নির্ণয়, আনুষঙ্গিক অন্যান্য রস ভাবাদির অঙ্গ বিচার।

গ্রন্থ সংখ্যা সমুদায়ে ৬৯৬৯। তন্মধ্যে টীকা ৩৬৪৪—মূল ৩৩২৫ সহস্র। টীকার নাম দুর্গম সঙ্গমনী। ১৫৬৩ শকে এই গ্রন্থ রচিত। প্রারম্ভ বাক্য—

"অখিল রসামৃত মূর্ত্তিঃ প্রসৃমর রুচিরুদ্ধ তারকা পালিঃ।
কলিত শ্যামা ললিতো রাধা প্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি।"

সমাপ্তি বাক্য—"ইতি শ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধৌ উত্তর ভাগে গৌণভক্তি নিরূপণে রসাভাস লহরী নবমী। সমাপ্তোঽয়ং চতুর্থো বিভাগঃ।

"রামাঙ্ক শক্র গণিতেশাকে গোকুলমধিষ্ঠিতেনায়ং।

ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর্ব্বিটঙ্কিতঃ ক্ষুদ্র রূপেণ।"

ইতি শ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধুঃ সমাপ্তঃ।"

টীকাকার জীব গোস্বামি ॥

শ্রীনন্দ নন্দনাষ্টকং। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী বিরচিত। শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র। প্রারম্ভ শ্লোক। শুচারু বক্ত্র মণ্ডলং শ্রুতিঞ্চ রত্ন কুণ্ডলং। সুচর্চ্চিতাঙ্গ চন্দনং নমামি নন্দ নন্দনং। ১।

চাটু পুষ্পাঞ্জলি শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত শ্রীরাধা স্তোত্রং। ২৩ শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রারম্ভ শ্লোক।

নবগোরোচনাগৌরীং প্রবরেন্দি বরাম্বরাং।

মনিস্তব কবিদ্যোতীং বেণী ব্যালাঙ্গণা ফণাং। ১।

শ্রীমুকুন্দ মুক্তাবলিস্তবঃ। শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত। শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র। ৩১ শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রারম্ভ শ্লোক যথা

নবজলধর বর্ণ চম্পকোদ্ভাসিকর্ণ

বিকসিত নলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দ হাস্যম্।

কণক রুচি দুকূলং চারু বর্হাবচূলং

কমপিনিখিলসারং নৌমি গোপী কুমারম্।

স্তবাবলীর শ্লোক সমূহ মালিনী, চিত্র, জলধর মালা, রঙ্গিণী, তূণক, পজ্ঝটীকা, ভুজঙ্গপ্রয়াত, স্রগ্বিণী, জলোদ্ধত গতি, শালিনী, ত্বরিত গতি, শার্দ্দূল বিক্রীড়িত-চ্ছন্দে রচিত।

বিদগ্ধ মাধব নাটক। শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণন গ্রন্থ। দশ অঙ্কে সম্পূর্ণ।

গীতাবলি। শ্রীসনাতন গোস্বামী কৃত। নন্দোৎসব, দোল, রাস প্রভৃতি সংগীতে বর্ণিত।

শ্রীহরিভক্তি রসামৃত সিন্ধুর বিন্দু অর্থাৎ শ্রীহরি ভক্তি রসামৃত সিন্ধৌ চুম্বক রসাভাস লহরী নামক গ্রন্থ। শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত। এখানি ভক্তি রসামৃত সিন্ধু হইতে সংক্ষেপে সংকলিত।

ক্রমশঃ

শ্রীরাঃ।

ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুৎ, এবং আকাশ, বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে ভৌতিক সিংহাসন অধিকার করিয়া ছিলেন। তাঁহারাই পঞ্চভূত—আর কেহ ভূত নহে। এক্ষণে ইউরোপ হইতে নূতন বিজ্ঞান শাস্ত্র আসিয়া তাঁহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছেন। ভূত বলিয়া আর কেহ তাঁহাদিগকে বড় মানে না। নূতন বিজ্ঞান শাস্ত্র বলেন, আমি বিলাত হইতে নূতন ভূত আনিয়াছি, তোমরা আবার কে? যদি ক্ষিত্যাদি জড়সড় হইয়া বলেন, যে আমরা প্রাচীন ভূত, কনাদ-কপিলাদির দ্বারা ভৌতিক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রতি জীবশরীরে বাস করিতেছি, বিলাতী বিজ্ঞান বলেন, তোমরা আদৌ ভূত নও। আমার "Elementary Substances" দেখ—তাহারাই ভূত; তাহার মধ্যে তোমরা কই! তুমি, আকাশ, তুমি কেহই নও—সম্বন্ধ বাচক শব্দমাত্র। তুমি, তেজঃ, তুমি কেবল একটি ক্রিয়া,—গতি বিশেষ মাত্র। আর, ক্ষিতি, অপ্‌, মরুৎ, তোমরা এক এক জন দুই তিন বা ততোধিক ভূতে নির্ম্মিত। তোমরা আবার কিসের ভূত? সিংহাসন ছাড়। আমার সাতষট্টি পুত্তলী উহাতে বসাইব?

যদি ভারতবর্ষ, এমন সহজে ভূতছাড়া হইত তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এখনও অনেকে পঞ্চভূতের প্রতি ভক্তিবিশিষ্ট। বাস্তবিক ভূত ছাড়াইলে একটু বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। ভূতবাদীরা বলিবেন যে যদি ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, তবে আমাদিগের এ শরীর কোথা হইতে? কিসে নির্ম্মিত হইল?

নূতন বিজ্ঞান বলেন যে, "তোমাদের পুরাণ কথায় একেবারে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহি না। জীবশরীরের একটি প্রধান ভাগ যে জল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিব। আর মরুতের সঙ্গে শরীরের একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে,—এমন কি শরীরের বায়ুকোষে বায়ু না গেলে প্রাণের ধ্বংস হয়, ইহাও স্বীকার করি। তেজঃ সম্বন্ধে ইহা স্বীকার করিতে তোমাদের বৈশেষিকেরা যে জঠরাগ্নি কল্পনা করিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব আমার লিবিগ অতি সুকৌশলে প্রতিপন্ন

করিয়াছেন। আর যদি সন্তাপকেই তেজঃ বল, তবে মানি যে ইহা জীবদেহে অহরহ বিরাজ করে, ইহার লাঘব হইলে প্রাণের ধ্বংস হয়। সোডা পোতাস প্রভৃতি পৃথিবী বটে, তাহা অত্যল্প পরিমাণে শরীর মধ্যে আছে। আর আকাশ ছাড়া কিছুই নাই, কেন না আকাশ সম্বন্ধ জ্ঞাপক শব্দ মাত্র। অতএব শরীরে পঞ্চভূতের অস্তিত্ব এ প্রকারে স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমার প্রধান আপত্তি তিনটি। প্রথম, শরীরের সারাংশ এ সকলে নির্ম্মিত নহে; এ সকল ভিন্ন অন্য অনেক প্রকার উপকরণ আছে। দ্বিতীয়, ইহাদের ভূত বল কেন? তৃতীয়, ইহার সঙ্গে প্রাণাপানাদি বায়ু প্রভৃতি যে কতকগুলি কথা বল, বোধ হয়, হিন্দু রাজাদিগের আমলে আবকারির আইন প্রচলিত থাকিলে, সে কথাগুলির প্রচার হইত না।

"দেখ, এই তোমার সম্মুখে ইষ্টক নির্ম্মিত মনুষ্যের বাসগৃহ। ইহা ইষ্টক নির্ম্মিত, সুতরাং ইহাতে পৃথিবী আছে। গৃহস্থ ইহাতে পানাদির জন্য কলসী কলসী জল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। পাকার্থ, এবং আলোকের জন্য, অগ্নি জ্বালিয়াছে, সুতরাং তেজও বর্ত্তমান। আকাশ, গৃহ মধ্যে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। সর্ব্বত্র বায়ু যাতায়াত করিতেছে। সুতরাং এ গৃহও পঞ্চভূত নির্ম্মিত? তুমি যেমন বল, মনুষ্যের এ স্থানে প্রাণ বায়ু, ওস্থানে অপান বায়ু, ইত্যাদি, আমিও তেমনি বলিতেছি, এই দ্বার পথে যে বায়ু বহিতেছে, তাহা প্রাণবায়ু, ও বাতায়ন পথে যাহা বহিতেছে, তাহা অপান বায়ু ইত্যাদি। তোমারও নির্দ্দেশ যেমন অমূলক ও প্রমাণ শূন্য, আমার নির্দ্দেশ তেমনি প্রমাণ শূন্য। তুমি জীব শরীর সম্বন্ধে যাহা বলিবে, আমি এই অট্টালিকা সম্বন্ধে তাহাই বলিব। তুমি যদি আমার কথা অপ্রমাণ করিতে যাও, তোমার স্বপক্ষের কথাও অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। তবে কি তুমি আমার এই অট্টালিকাটি জীব বলিয়া স্বীকার করিবে?"

প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে এবং আধুনিক বিজ্ঞানে এই প্রকার বিবাদ। ভারতবর্ষবাসীরা মধ্যস্থ। মধ্যস্থেরা তিন শ্রেণী ভুক্ত। এক শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন, যে "প্রাচীন দর্শন, আমাদের দেশীয়। যাহা আমাদের দেশীয় তাহাই ভাল, তাহাই মান্য এবং যথার্থ। আধুনিক বিজ্ঞান বিদেশী, যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, সন্ধ্যা আহ্নিক করে না, উহারাই তাহাকে মানে। আমাদের দর্শন সিদ্ধ ঋষি প্রণীত, তাঁহাদিগের মনুষ্যাতীত জ্ঞান ছিল, দিব্য চক্ষে সকল দেখিতে পাইতেন কেন না তাঁহারা প্রাচীন এবং এদেশীয়। আধুনিক বিজ্ঞান যাঁহাদিগের প্রণীত, তাঁহারা সামান্য মনুষ্য। সুতরাং প্রাচীন মতই মানিব।"

আর এক শ্রেণীর মধ্যস্থ আছেন, তাঁহারা বলেন, "কোনটি মানিতে হইবে, তাহা জানি না। দর্শনে কি আছে, তাহা জানি না, বিজ্ঞানে কি আছে তাহাও জানি না। কালেজে তোতা পাখীর মত কিছু বিজ্ঞান শিখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু

যদি জিজ্ঞাসা কর কেন সে সব মানি, তবে আমার কোন উত্তর নাই। যদি ছুই মানিলে চলে, তবে ছুই মানি। তবে, যদি নিতান্ত পীড়াপীড়ি কর, তবে বিজ্ঞানই মানি, কেননা তাহা না মানিলে, লোকে আজি কালি মূর্খ বলে। বিজ্ঞান মানিলে লোকে বলিবে এ ইংরেজি জানে, সে গৌরব ছাড়িতে পারি না। আর, বিজ্ঞান মানিলে বিনা কষ্টে হিন্দুয়ানির বাঁধাবাঁধি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সে অল্প সুখ নহে। সুতরাং বিজ্ঞানই মানিব।"

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন, "প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র দেশী বলিয়া তৎপ্রতি আমাদিগের বিশেষ প্রীতি বা অপ্রীতি নাই। আধুনিক বিজ্ঞান সাহেবি বলিয়া তাহাকে ভক্তি বা অভক্তি করি না। যেটি যথার্থ হইবে তাহাই মানিব—ইহাতে কেহ খ্রীষ্টান, বা কেহ মূর্খ বলে, তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না। কোনটি যথার্থ, কোনটি অযথার্থ তাহা মীমাংসা করিবে কে? আমরা আপনার বুদ্ধিমত মীমাংসা করিব;—পরের বুদ্ধিতে যাইব না। দার্শনিকেরা আমাদিগের দেশী লোক বলিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করিব না—ইংরেজেরা রাজা বলিয়া তাঁহাদিগকে অভ্রান্ত মনে করি না। "সর্ব্বজ্ঞ" বা "সিদ্ধ" মানি না; আধুনিক মনুষ্যাপেক্ষা প্রাচীন ঋষিদিগের কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞানের উপায় ছিল, তাহা মানি না—কেননা যাহা অনৈসর্গিক তাহা মানিব না। বরং ইহাই বলি যে, প্রাচীনাপেক্ষা আধুনিকদিগের অধিক জ্ঞানবত্তার সম্ভাবনা। কেননা, কোন বংশে যদি পুরুষানুক্রমে সকলেই কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া যায়, তবে প্রপিতামহ অপেক্ষা প্রপৌত্র ধনবান হইবে সন্দেহ নাই। তবে, আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সকল গুরুতর তত্ত্বের মীমাংসা করিব কি প্রকারে? প্রমাণানুসারে। যিনি প্রমাণ দেখাইবেন, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিব। যিনি কেবল আনুমানিক কথা বলিবেন, তাহার কোন প্রমাণ দেখাইবেন না, তিনি আমার পিতৃ পিতামহ হইলেও তাঁহার কথায় অশ্রদ্ধা করিব। দার্শনিকেরা, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন, ক হইতে খ হইয়াছে, গর মধ্যে ঘ আছে, ইত্যাদি। তাঁহারা তাহার কোন প্রমাণ নির্দ্দেশ করেন না; কোন প্রমাণের অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমত কথা বলেন না, সন্ধান করিলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি কখন প্রমাণ নির্দ্দেশ করেন, সে প্রমাণও আনুমানিক বা কাল্পনিক, তাহার আবার প্রমাণের প্রয়োজন; তাহাও পাওয়া যায় না। অতএব আজন্ম মূর্খ হইয়া থাকিতে হয়, সেও ভাল, তথাপি দর্শন মানিব না। এদিকে বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিতেছেন, 'আমি তোমাকে সহসা বিশ্বাস করিতে বলি না, যে সহসা বিশ্বাস করে, আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি না; সে যেন আমার কাছে আইসে না। আমি যাহা তোমার কাছে প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিব, তুমি তাহাই বিশ্বাস

করিও, তাহার তিলার্দ্ধ অধিক বিশ্বাস করিলে তুমি আমার ত্যজ্য। আমি যে প্রমাণ দিব, তাহা প্রত্যক্ষ। একজনে সকল কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, এজন্য কতক গুলি তোমাকে অন্যের প্রত্যক্ষের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু যেটিতে তোমার সন্দেহ হইবে, সেইটি তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিও। সর্ব্বদা আমার প্রতি সন্দেহ করিও। দর্শনের প্রতি সন্দেহ করিলেই, সে ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু সন্দেহেই আমার পুষ্টি। আমি জীবশরীর সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, আমার সঙ্গে শবচ্ছেদ গৃহে, ও রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় আইস। সকলই প্রত্যক্ষ দেখাইব।' এই রূপ অভিহিত হইয়া, বিজ্ঞানের গৃহে গিয়া সকলই প্রমাণ সহিত দেখিয়া আসিয়াছি। সুতরাং বিজ্ঞানেই আমাদের বিশ্বাস।"

যাঁহারা এই সকল কথা শুনিয়া কুতূহল বিশিষ্ট হইবেন, তাঁহারা বিজ্ঞান মাতার আহ্বানানুসারে তাঁহার শবচ্ছেদ গৃহে এবং রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় গিয়া দেখুন, পঞ্চ ভূতের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে। জীব শরীরের ভৌতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যদি দুই একটা কথা বলিয়া রাখি, তবে তাঁহাদিগের পথ একটু সুগম হইবে।

বিষয় বাহুল্য ভয়ে কেবল একটি তত্ত্বই আমরা সংক্ষেপে বুঝাইব। আমরা অনুমান করিয়া রাখিলাম—যে পাঠক, জীবের শারীরিক নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। গঠনের কথা বলিব না—গঠনের সামগ্রীর কথা বলিব।

একবিন্দু শোণিত লইয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা কর। তাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার বস্তু দেখিবে। অধিকাংশই রক্তবর্ণ, এবং সেই চক্রাণুসমূহের বর্ণ হেতুই শোণিতের বর্ণ রক্ত, তাহাও দেখিবে। তন্মধ্যে, মধ্যে মধ্যে, আর কতকগুলি দেখিবে, তাহা রক্তবর্ণ নহে,—বর্ণহীন, রক্তচক্রাণু হইতে কিঞ্চিৎ বড়, প্রকৃত চক্রাকার নহে—আকারের কোন নিয়ম নাই। শরীরাভ্যন্তরে যে তাপ, পরীক্ষ্যমাণ রক্তবিন্দু যদি সেই রূপ তাপ সংযুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, এই বর্ণহীন চক্রাণু সকল সজীব পদার্থের ন্যায় আচরণ করিবে। আপনারা যথেচ্ছা চলিয়া বেড়াইবে, আকার পরিবর্ত্তন করিবে, কখন কোন অঙ্গ বাড়াইয়া দিবে, কখন কোন ভাগ সঙ্কীর্ণ করিয়া লইবে। এই গুলি যে পদার্থের সমষ্টি, তাহাকে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা প্রোটোপ্লাস্ম্ বা বিও প্লাস্ম্ বলেন। আমরা ইহাকে "জৈবনিক" বলিলাম। ইহাই জীব শরীর নির্ম্মাণের একমাত্র সামগ্রী। যাহাতে ইহা আছে তাহাই জীব, যাহাতে ইহা নাই তাহা জীব নহে। দেখা যাউক, এই সামগ্রীটি কি।

এক্ষণকার বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অনেকেই দেখিয়াছেন, আচার্য্যেরা বৈদ্যুতীয় যন্ত্র সাহায্যে জল, উড়াইয়া দেন। বাস্তবিক জল উড়িয়া যায় না; জল অন্তর্হিত

হয় বটে, কিন্তু তাহার স্থানে দুইটি বায়বীয় পদার্থ পাওয়া যায়—পরীক্ষক সেই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে ধরিয়া রাখেন। সেই দুইটি পুনর্ব্বার একত্রিত করিয়া আগুন দিলে আবার জল হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই দুইটি পদার্থের রাসায়নিকসংযোগে জলের জন্ম। ইহার একটির নাম অম্লজন বায়ু; দ্বিতীয়টির নাম জলজন বায়ু।

যে বায়ু পৃথিবী ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাতেও অম্লজন আছে। অম্লজন ভিন্ন আর একটি বায়বীয় পদার্থও তাহাতে আছে। সেটি যবক্ষারেও আছে, বলিয়া তাহার নাম যবক্ষার জন হইয়াছে। অম্লজন ও যবক্ষার জন সাধারণ বায়ুতে রাসায়নিক সংযোগে যুক্ত নহে। মিশ্রিত মাত্র। যাঁহারা রসায়নবিদ্যা প্রথম শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা শুনিয়া চমৎকৃত হয়েন যে হীরক ও অঙ্গার একই বস্তু। বাস্তবিক এ কথা সত্য, এবং পরীক্ষাধীন। যে দ্রব্য উভয়েরই সার, তাহার নাম হইয়াছে অঙ্গারজন। কাষ্ঠ তৃণ তৈলাদি যাহা দাহ করা যায়, তাহার দহ্যভাগ এই অঙ্গারজন। অঙ্গারজনের সহিত অম্লজনের রাসায়নিক সংযোগ ক্রিয়াকে দাহ বলে।

এই চারিটি পদার্থ সর্ব্বদা পরস্পরে রাসায়নিক যোগে সংযুক্ত হয়। যথা, অম্লজনে জলজনে জল হয়। অম্লজনে যবক্ষারজনে নাইট্রিক আসিড নামক প্রসিদ্ধ ঔষধ হয়। অম্লজনে, অঙ্গারজনে আঙ্গারিক অম্ল (কার্ব্বণিক আসিড) হয়। যে বাষ্পের কারণ সোডাওয়াটার উছলিয়া উঠে, সে এই পদার্থ। দীপশিখা হইতে এবং মনুষ্য নিশ্বাসে ইহা বাহির হইয়া থাকে। যবক্ষারজন এবং জলজনে আমনিয়া নামক প্রসিদ্ধ তেজস্বী ঔষধ হইয়া থাকে। অঙ্গারজন এবং জলজনে তারপিন তৈল প্রভৃতি অনেকগুলি তৈলবৎ এবং অন্যান্য সামগ্রী হয়। ইত্যাদি।

এই চারিটি সামগ্রী যেমন পরস্পরের সহিত রাসায়নিক যোগে যুক্ত হয়, সেইরূপ, সেইরূপ অন্যান্য সামগ্রীর সহিত যুক্ত হয় এবং সেই সংযোগেই এই পৃথিবী নির্ম্মিত। যথা সডিয়মের সঙ্গে ও ক্লোরাইনের সঙ্গে অম্লজনের সংযোগ বিশেষে লবণ; চূণের সঙ্গে অম্লজন ও অঙ্গারজনের সংযোগ বিশেষে মর্ম্মরাদি নানাবিধ প্রস্তর হয়; সিলিকন এবং আলুমিনার সঙ্গে অম্লজনের সংযোগে নানাবিধ মৃত্তিকা।

দুইটি সামগ্রীর রাসায়নিক সংযোগে যে এক ফল হয় এমত নহে। নানা মাত্রায় নানা দ্রব্যের সংযোগে নানা দ্রব্য হইয়া থাকে।

জলজন, অম্লজন, অঙ্গারজন, এবং যবক্ষারজন, এই চারিটিই একত্রে সংযুক্ত হইয়া থাকে। সেই সংযোগের ফল জৈবনিক। জৈবনিকে এই চারিটি সামগ্রীই থাকে, আর কিছুই থাকে না এমত নহে; অম্লজনাদির সঙ্গে কখন কখন গন্ধক, কখন পোতাস ইত্যাদি সামগ্রী থাকে। কিন্তু যে পদার্থে এই চারিটাই নাই, তাহা

জৈবনিক নহে; যাহাতে এই চারিটাই আছে তাহাই জৈবনিক। জীবমাত্রেই এই জৈবনিকে গঠিত; জীব ভিন্ন আর কিছুতেই জৈবনিক নাই। এই স্থলে জীব শব্দে কেবল প্রাণী বুঝাইতেছে এমত নহে। উদ্ভিদও জীব, কেননা তাহাদিগেরও জন্ম, বৃদ্ধি পুষ্টি ও মৃত্যু আছে। অতএব উদ্ভিদের শরীরও জৈবনিকে নির্ম্মিত। কিন্তু সচেতন ও অচেতন জীবে এ বিষয়ে একটু বিশেষ প্রভেদ আছে।

জৈবনিক জীব শরীর মধ্যেই পাওয়া যায়; অন্যত্র পাওয়া যায় না। জীব শরীরে কোথা হইতে জৈবনিক আইসে? জৈবনিক জীব শরীরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ জীব, ভূমি এবং বায়ু হইতে অম্লজনাদি গ্রহণ করিয়া আপন শরীর মধ্যে তৎসমুদায়ের রাসায়নিক সংযোগ সম্পাদন করিয়া জৈবনিক প্রস্তুত করে; সেই জৈবনিকে আপন শরীর নির্ম্মাণ করে। কিন্তু, নির্জ্জীব পদার্থ হইতে জৈবনিক পদার্থ প্রস্তুত করার যে শক্তি, তাহা উদ্ভিদেরই আছে। সচেতন জীবের এই শক্তি নাই; ইহারা স্বয়ং জৈবনিক প্রস্তুত করিতে পারে না; উদ্ভিদকে ভোজন করিয়া প্রস্তুত জৈবনিক সংগ্রহ পূর্ব্বক শরীর পোষণ করে। কোন সচেতন জীব মৃত্তিকা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু তৃণ ধান্য প্রভৃতি সেই মৃত্তিকার রস পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে, কেননা উহারা তাহা হইতে জৈবনিক প্রস্তুত করে; বৃষ মৃত্তিকা খাইবে না কিন্তু সেই তৃণ ধান্যাদি খাইয়া তাহা হইতে জৈবনিক গ্রহণ করিবে, ব্যাঘ্র আবার সেই বৃষকে খাইয়া জৈবনিক সংগ্রহ করিবে। যাঁহারা এদেশের জমীদারগণের দ্বেষক, তাঁহারা বলিতে পারেন যে, উদ্ভিদ জীবেরা এ জগতে চাসা, তাহারা উৎপাদন করে; অপরেরা জমীদার, তাহারা চাসার উপার্জ্জন কাড়িয়া খায়, আপনারা কিছু করে না।

এখন দেখ, এক জৈবনিকে সর্ব্বজীব নির্ম্মিত। যে ধান ছড়াইয়া তুমি পাখীকে খাওয়াইতেছ, সে ধান যে সামগ্রী, পাখীও সেই সামগ্রী, তুমিও সেই সামগ্রী। যে কুসুম, ঘ্রাণ মাত্র লইয়া, লোকমোহিনী সুন্দরী ফেলিয়া দিতেছেন, সুন্দরীও যাহা, কুসুমও তাই। কীটও যাহা, সম্রাটও তাই। যে হংসপুচ্ছ লেখনীতে আমি লিখিতেছি সেও যাহা আমিও তাই। সকলই জৈবনিক। প্রভেদও গুরুতর। জয়পুরী শ্বেত প্রস্তরে তোমার জলপান পাত্র বা ভোজন পাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে; সেই প্রস্তরে তাজমহল এবং জমা মসজিদও নির্ম্মিত হইয়াছে। উভয়ে প্রভেদ নাই কে বলিবে? গোষ্পদেও জল, সমুদ্রেও জল, গোষ্পদে সমুদ্রে প্রভেদ নাই কে বলিবে?

কিন্তু স্থূল কথা, বলিতে বাকি আছে। জৈবনিক ভিন্ন জীবন নাই, যেখানে জীবন সেইখানে জৈবনিক তাহার পূর্ব্বগামী। "অন্যথা সিদ্ধিশূন্যস্য নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বং" একথা যদি সত্য হয়, তবে জৈবনিকই জীবনের কারণ।

জৈবনিক ভিন্ন জীবন কুত্রাপি সিদ্ধ নহে, এবং জৈবনিক জীবনের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী বটে। অতএব আমাদের এই চঞ্চল, সুখদুঃখবহুল, বহু স্নেহাস্পদ জীবন, কেবল জৈবনিকের ক্রিয়া, রাসায়নিক সংযোগসমবেত জড় পদার্থের ফল। নিউটনের বিজ্ঞান, কালিদাসের কবিতা, হম্বোল্ট্ বা শঙ্করাচার্য্যের পাণ্ডিত্য—সকলই জড়পদার্থের ক্রিয়া; শাক্য সিংহের ধর্ম্মজ্ঞান, আকবরের শৌর্য্য, কোমতের দর্শনবিদ্যা সকলই জড়ের গতি। তোমার বনিতার প্রেম, বালকের অমৃত ভাষা, পিতার সদুপদেশ—সকলই জড়পদার্থের আকুঞ্চন সম্প্রসারণ মাত্র—জৈবনিক ভিন্ন ভিতরে আর ঐন্দ্রজালিক কেহ নাই। যে যশের জন্য তুমি প্রাণপাত করিতেছ, সে এই জৈবনিকের ক্রিয়া—যেমন সমুদ্র গর্জ্জন একপ্রকার জড়পদার্থকৃত কোলাহল, যশ তেমনি জড়পদার্থকৃত অন্যপ্রকার কোলাহল মাত্র। এই সর্ব্বকর্ত্তা জৈবনিক অম্লজন, জলজন, অঙ্গারজন এবং যবক্ষারজনের রাসায়নিক সমষ্টি। অতএব এই চারিটি ভৌতিক পদার্থই সর্ব্ব কর্ত্তা। ইহারা প্রকৃত ভূত, এবং এই ভূতের কাণ্ড সকল আশ্চর্য্য বটে। পাঠক দেখিবেন, যে আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত পঞ্চভূত হইতে এই আধুনিক ভূতগণের যে প্রভেদ তাহা কেবল প্রমাণগত। নচেৎ উভয়েরই ফল প্রকৃতিবাদ (Materialism) সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ হইতে আধুনিক প্রকৃতিবাদের প্রভেদ, প্রধানতঃ প্রমাণগত। তবে আধুনিক বলেন, ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, আমাদিগের পরিচিত এই ভূতগুলিই ভূত। যেই ভূত হউক তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই,—কেননা মনুষ্য জাতি ভূত ছাড়া হইল না। যুবেনল্ হইতে কার্লাইল পর্য্যন্ত অনেকে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন—গালি দিয়াও মনুষ্য জাতির ভূত ছাড়াইতে পারেন নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

রমানন্দ স্বামী

রমানন্দ স্বামী পরমহংস। তিনি লোকালয়ে বড় যাতায়াত করিতেন না। গঙ্গাতীরে, এক সন্ন্যাসীর মঠে বাস করিতেন। যাহারা তাঁহাকে চিনিত, তাহারা বলিত, ইনি সিদ্ধ পুরুষ।

সেই মঠে, এই রাত্রে, চন্দ্রশেখর তাঁহার সম্মুখে কুশাসনে উপবিষ্ট। উভয়ে প্রায় সমস্ত রাত্রি কথোপকথন হইয়াছে। সেই কথোপকথনের অল্পাংশ মাত্র আমরা বিবৃত করিব।

চন্দ্রশেখর বলিতেছেন, "দণ্ডাশ্রম গ্রহণ করিয়া কি হইবে প্রভো?"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "তোমাকে যে বুঝাইতে হইতেছে ইহাই আশ্চর্য্য। তুমি কোন্ শাস্ত্র না জান? দণ্ডাশ্রমের ফল সকলই জ্ঞান—আমি নূতন কি শুনাইব?"

চ। "তাহা জানি। ইহাও বলিয়াছি, যে সে সকল কথায় বড় ভক্তি নাই। "নিরঞ্জনঃ পরং সাম্যমুপৈতি" ইত্যাদি বাক্যে আমার কোন উপকার নাই, কেননা আমি রাগাদির বশীভূত। আমি দণ্ডাশ্রম গ্রহণ করিয়া, ভস্মের দ্বারা বহ্নিকে লুক্কায়িত করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে সেই অন্তঃস্থ বহ্নির দাহিকা শক্তি নিবৃত্ত হইবে না—তেমনি অন্তর্দাহ হইতে থাকিবে। আমি সংসারের মায়ায় আচ্ছন্ন। আমি দণ্ডাশ্রম গ্রহণ করিয়া কি করিব? যাহাতে আমার চিত্ত শান্তি লাভ করে, তাহাই আজ্ঞা করুন। শাস্ত্রালোচনায় শান্তি নাই, জ্ঞানোপার্জ্জনে শান্তি নাই, তীর্থপর্য্যটনে শান্তি নাই, সমাধি আমার আয়ত্ত নহে।"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "তমাত্মান মন্বিচ্ছাম যমাত্মানমন্বিদ্য সর্ব্বান্ লোকান্ আপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্।"

চন্দ্রশেখর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "গুরো! যদি আপনার জ্ঞান কেবল শাস্ত্রগত, তবে আমি বিদায় হই—আমার রোগের ঔষধ আপনার নিকটে নাই।"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "থাক, থাক। আমি কি এতকাল আত্মায় চিত্ত সংযোগ করিয়া এমনই লুপ্তবুদ্ধি হইয়াছি যে তোমার এই সামান্য ব্যাধির চিকিৎসা করিতে পারিব না। সেকি? তুমি ধীরতা অবলম্বন করিয়া, আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। প্রথমতঃ বল—তোমার ব্রাহ্মণীর পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টা করিয়াছ?"

চ। "পুনরুদ্ধার করিয়া কি করিব? তিনি যবনস্পৃষ্টা—"

র। "তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে।"

চ। "দৈব প্রায়শ্চিত্ত থাকিলে থাকিতে পারে। লৌকিক প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

র। "দেশান্তরে বাস।"

চ। "লৌকিক প্রায়শ্চিত্তও তুচ্ছ কথা। যদি তিনি আমার গ্রহণীয়া হয়েন, তবে লোকের অনুরোধে আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিব না। লোকে আমার দুঃখের ভাগী নহে। কিন্তু যিনি ম্লেচ্ছ কর্তৃক পরিগৃহীতা হইয়া আমার গৃহে জীবিতা আছেন, তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি তাঁহাকে গ্রহণ করিব না। এইজন্য আমি তাঁহার সন্ধানও করি নাই।"

র। "তবে তোমার অভীষ্ট কি? অনিষ্টকারীর দণ্ড?"

চ। "তাহা অসাধ্য নহে। প্রতাপরায় তাহা সাধন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্প বধে কি তাহার বিষ শমিত হয়? তবে অনর্থক প্রাণিহত্যা কেন?"

র। "তবে তোমার অভীষ্ট কি?"

চ। "তা ত জানি না। অনেক আত্মানুসন্ধান করিয়াছি, বুঝিতে পারি না। শান্তিই আমার অভীষ্ট।"

র। "জ্ঞানেই শান্তি।"

চ। "আমার এ সন্তাপাগ্নিতে জ্ঞান দগ্ধ হইয়া যায়। আমি চিরকাল জ্ঞানোপার্জ্জনই করিয়াছি। তাহার এই পরিণাম হইয়াছে। জ্ঞানের নিকট আমি জন্মের মত বিদায় লইয়াছি।"

র। "তোমার সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মে নাই, বলিয়াই এরূপ বলিতেছ। নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকঃ ইহামুত্রার্থফলভোগাবিরাগ শমদমাদি সাধন সম্পন্ মুমুক্ষত্বঞ্চ জ্ঞানম্। যাক্—সে সকল কথা তোমাকে বলিব না—একটা যৌক্তিক কথা বলি। জ্ঞানই শান্তির শ্রেষ্ঠ উপায়—কিন্তু কর্ম্মও শান্তিপ্রদ। যদি জ্ঞানমার্গ পরিহার করিলে, তবে কর্ম্মপথাবলম্বন কর। অহর্নিশ কার্য্যে চিত্ত নিবিষ্ট হইলে চিত্তস্থির হইবে।"

চ। "জপ হোম যাগাদি?"

র। "না, তোমাকে তাহা বলি না। বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত হও।"

চ। "অর্থ সংগ্রহে?"

র। "লোষ্ট্রে কি প্রয়োজন? তোমার অভিমত কার্য্য কি কিছু নাই?"

চ। "আছে। এই আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ম্লেচ্ছ কণ্টকের উদ্ধার।"

র। "রাগ দ্বেষাদির বশীভূত হইয়াই একথা বলিতেছ। এ ম্লেচ্ছ হইতে তোমার অনিষ্ট ঘটিয়াছে, এইজন্য এ সকল কথা মনে আসিতেছে। এ সকল প্রবৃত্তি শান্তি বিরোধিনী। ইহাদিগকে চিত্ত হইতে দূর কর—নচেৎ শান্তি দুষ্প্রাপণীয়া হইবে। তুমি কৃতাপরাধীর দণ্ডের কামনা কর নাই, ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম—কিন্তু একথা শুনিয়া বোধ হইল, তোমার চিত্ত বিকারশূন্য নহে। এ সকল প্রবৃত্তি দমন কর।"

চন্দ্রশেখর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কথা যথার্থ। অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,

"গুরো—কোন্ কার্য্য আমার কর্ত্তব্য? দেখুন, মন, ইচ্ছার বশবর্ত্তী নহে। আমি যদি মনে করি, আমি এই কার্য্যে মনঃসংযোগ করি, আমার কথায় কি এই নিরঙ্কুশ মত্তহস্তী বশীভূত হইয়া, সেই পথে চলিবে। মনকে নিবিষ্ট রাখে, এমন কি কার্য্য আছে? সাংসারিক নিত্য, সামান্য, কর্ম্ম সকল আমার দুঃখদায়ক। সে সকল কথার উল্লেখ করিবেন না।"

র। "আমারও তাহা অভিপ্রেত নহে। যে জ্ঞানভাণ্ডার গ্রন্থরাশি চিরকাল অধ্যয়ন করিয়া, স্বহস্তে তৎসমুদায়কে ভস্মাবশেষ করিয়াছে, তাহাকে সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে বলি না। তোমাকে একটি গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিই। যে সে ব্রত গ্রহণ করে, তাহার কর্ম্মের শেষ নাই—শোক সন্তাপে ক্লিষ্ট হইবার তাহার অবসর থাকে না। সেই ব্রত চিত্তরঞ্জন বটে; বোধ হয়, কর্ত্তার তাদৃশ প্রীতিকর কার্য্য সংসারে আর কিছুই নাই। তুমি সেই ব্রত গ্রহণ কর—নিশ্চয়ই শান্তি লাভ করিবে।"

চ। "আজ্ঞা করুন।"

র। "বোধ করি বুঝিয়াছ, আমি পরোপকার ব্রতের কথা বলিতেছি। অনন্যকাম, নিস্পৃহ, স্বার্থশূন্য হইয়া পরোপকার ব্রত অবলম্বন করিবে—নিশ্চিতই তোমার শান্তি লাভ হইবে।"

চন্দ্রশেখর কোন উত্তর করিলেন না। পর কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া কে পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিতে স্বীকার করে? কিন্তু মনুষ্য যদি পরিণামদর্শী হইত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিত, যে সুখাভিলাষীর এই শেষ আশ্রয়—আত্মসুখের এমন অমোঘ উপায় আর নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দলনীর কি হইল

একমাত্র পরিচারিকা সঙ্গে, নিশাকালে রাজমহিষী, রাজপথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কুলসম্ জিজ্ঞাসা করিল "এখন কি করিবেন?"

দলনী চক্ষু মুছিয়া বলিল, "আইস এই বৃক্ষতলে দাঁড়াই। প্রভাত হউক।"

কু। "এখানে প্রভাত হইলে আমরা ধরা পড়িব।"

দ। "তাহাতে ভয় কি? আমি কোন্ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে আমি ভয় করিব?"

কু। "আমরা চোরের মত পুরীত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। কেন আসিয়াছি, তা তুমিই জান। কিন্তু লোকে কি মনে করিবে, নবাবই বা কি মনে করিবেন, তাহা ভাবিয়া দেখ।"

দ। "যাহাই মনে করুক, ঈশ্বর আমার বিচারকর্ত্তা—আমি অন্য বিচার মানি না। না হয় মরিব, ক্ষতি কি?"

কু। "কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইবে?"

দ। "এখানে দাঁড়াইলে ধরা পড়িব—সেই উদ্দেশ্যেই এখানে দাঁড়াইব। ধৃত হওয়াই আমার কামনা। যে ধৃত করিবে, সে আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে?"

কু। "দরবারে।"

দ। "প্রভুর কাছে? আমি সেইখানেই যাইতে চাই। অন্যত্র আমার যাইবার স্থান নাই। তিনি যদি আমার বধের আজ্ঞা দেন, তথাপি মরিবার কালে তাঁহাকে বলিতে পাইব যে আমি নিরপরাধিনী। বরং চল, আমরা দুর্গ দ্বারে গিয়া বসিয়া থাকি—সেইখানে শীঘ্র ধরা পড়িব।"

এই সময়ে, উভয়ে সভয়ে দেখিল, অন্ধকারে এক দীর্ঘাকার পুরুষ মূর্ত্তি গঙ্গাতীরাভিমুখে যাইতেছে। তাহারা বৃক্ষতলস্থ অন্ধকার মধ্যে গিয়া লুকাইল। পুনশ্চ সভয়ে দেখিল, দীর্ঘাকার পুরুষ, গঙ্গার পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই আশ্রয় বৃক্ষের অভিমুখে আসিতে লাগিল। দেখিয়া স্ত্রীলোক দুইটী, আরও অন্ধকার মধ্যে লুকাইল।

দীর্ঘাকার পুরুষ সেইখানেই আসিল। বলিল, "এখানে তোমরা কে?" এই কথা বলিয়া, সে যেন আপনা আপনি, মৃদুতর স্বরে বলিল, "আমার মত পথে পথে নিশা জাগরণ করে, এমন হতভাগা আর কে আছে?"

দীর্ঘাকার পুরুষ দেখিয়া, স্ত্রীলোকদিগের ভয় জন্মিয়াছিল, কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ভয় দূর হইল। কণ্ঠ অতি মধুর—দুঃখ এবং দয়ায় পরিপূর্ণ। কুলসম্ বলিল,

"আমরা স্ত্রীলোক—আপনি কে?" পুরুষ কহিলেন, "আমরা? তোমরা কয় জন?"

কু। "আমরা দুই জন মাত্র।"

পু। "এ রাত্রে এখানে কি করিতেছ?"

তখন দলনী বলিল, "আমরা হতভাগিনী—আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া আপনার কি হইবে?"

শুনিয়া আগন্তুক বলিলেন, "অতি সামান্য ব্যক্তি কর্তৃক লোকের উপকার হইয়া থাকে—তোমরা যদি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাক—সাধ্যানুসারে অমি তোমাদের উপকার করিব।"

দ। "আমাদের উপকার প্রায় অসাধ্য—আপনি কে?"

আগন্তুক কহিলেন, "আমি সামান্য ব্যক্তি—দরিদ্র ব্রাহ্মণ মাত্র—আমার নাম চন্দ্রশেখর।"

দ। "আপনার নিবাস কোথায়?"

চ। "মুরশিদাবাদের নিকট।"

দ। "সেখানে চন্দ্রশেখর নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত আছেন শুনিয়াছি। আপনি যদি সেই চন্দ্রশেখর হয়েন, তবে আপনাকে বিশ্বাস করিব। আর আপনি যেই হউন, আপনার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে। যে ডুবিয়া মরিতেছে, সে অবলম্বনের যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করে না। কিন্তু যদি আমাদিগের বিপদ শুনিতে চান, তবে রাজপথ হইতে দূরে চলুন। রাত্রে কে কোথায় আছে বলা যায় না। আমাদের কথা সকলের সাক্ষাতে বলিবার নহে।"

তখন চন্দ্রশেখর বলিলেন, "তবে তোমরা আমার সঙ্গে আইস।" এই বলিয়া দলনী ও কুল্‌সমকে সঙ্গে করিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন। এক ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, দ্বারে করাঘাত করিয়া, "রামচরণ" বলিয়া ডাকিলেন। রামচরণ আসিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। চন্দ্রশেখর, তাহাকে আলো জ্বালিতে আজ্ঞা করিলেন।

রামচরণ প্রদীপ জ্বালিয়া, চন্দ্রশেখরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল। চন্দ্রশেখর তখন রামচরণকে বলিলেন, "তুমি গিয়া শয়ন কর।" শুনিয়া, রামচরণ একবার দলনী ও কুল্‌সমের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য যে রামচরণ সে রাত্রে আর নিদ্রা যাইতে পারিল না। ঠাকুরজী, এত রাত্রে দুইজন যুবতী স্ত্রী-লোক লইয়া আসিলেন কেন? এই ভাবনা তাহার প্রবল হইল। চন্দ্রশেখরকে রামচরণ দেবতা মনে করিত—তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় বলিয়াই জানিত—সে বিশ্বাসের খর্ব্বতা হইল না। শেষে রামচরণ সিদ্ধান্ত করিল, "বোধ হয় এই দুইজন স্ত্রী-

লোক সম্প্রতি বিধবা হইয়াছে—ইহাদিগকে সহ-মরণের প্রবৃত্তি দিবার জন্যই ঠাকুরজী ইহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন—কি জ্বালা, একথাটা এতক্ষণ বুঝিতে পারিতেছিলাম না।”

চন্দ্রশেখর একটা আসনে উপবেশন করিলেন—স্ত্রীলোকেরা ভূম্যাসনে উপবেশন করিলেন। প্রথমে দলনী আত্মপরিচয় দিলেন। শুনিয়া চন্দ্রশেখর চিনিলেন, যে ইহারই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি গণনা করিতে রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলেন না। পরে দলনী রাত্রের ঘটনা সকল অকপটে বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া, চন্দ্রশেখর মনে মনে ভাবিলেন, “ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্য ঘটিবে। তাই বলিয়া পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা কর্ত্তব্য তাহা অবশ্য করিব।” এই বলিয়া তিনি দলনীকে বলিলেন, “আমার পরামর্শ এই যে আপনি অকস্মাৎ নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন না। প্রথমে, পত্রের দ্বারা তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত করুন। যদি আপনার প্রতি তাঁহার স্নেহ থাকে তবে অবশ্য আপনার কথায় তিনি বিশ্বাস করিবেন। পরে তাঁহার আজ্ঞা পাইলে সম্মুখে উপস্থিত হইবেন।”

দ। “পত্র লইয়া যাইবে কে?”

চ। “আমি পাঠাইয়া দিব।”

তখন দলনী কাগজ কলম চাহিলেন। চন্দ্রশেখর রামচরণকে আবার উঠাইলেন। রামচরণ কাগজ কলম ইত্যাদি আনিয়া রাখিয়া গেল। দলনী পত্র লিখিতে লাগিলেন।

চন্দ্রশেখর ততক্ষণ, বলিতে লাগিলেন, “এ গৃহ আমার নহে। কিন্তু যতক্ষণ না রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হন, ততক্ষণ এইখানেই থাকুন। কেহ জানিতে পারিবে না, বা কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না।”

অগত্যা স্ত্রীলোকেরা তাহা স্বীকার করিল। লিপি সমাপ্ত হইলে, দলনী তাহা চন্দ্রশেখরের হস্তে দিলেন। স্ত্রীলোকদিগের অবস্থিতি বিষয়ে রামচরণকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া চন্দ্রশেখর লিপি লইয়া চলিয়া গেলেন।

রামচরণ প্রভাতে আসিয়া দেখিল, সহমরণের কোন উদ্যোগ নাই।

এই গৃহের উপরিভাগে অপর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছেন। এই স্থানে তাঁহার কিছু পরিচয় দিতে হইল। কেননা এই ইতিহাসের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রতাপ

সুন্দরী বড় রাগ করিয়াই শৈবলিনীর বজরা হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। সমস্ত পথ স্বামীর নিকটে শৈবলিনীকে গালি দিতে দিতে আসিয়াছিল। কখন "অভাগী" কখন, "পোড়ারমুখী" কখন "চুলোমুখী," ইত্যাদি প্রিয় সম্বোধনে শৈবলিনীকে অভিহিত করিয়া স্বামীর কৌতুক বর্দ্ধন করিতে করিতে আসিয়াছিল। ঘরে আসিয়া অনেক কাঁদিয়াছিল। তারপর চন্দ্রশেখর আসিয়া দেশত্যাগী হইয়া গেলেন। তারপর কিছু দিন অমনি অমনি গেল। শৈবলিনীর বা চন্দ্রশেখরের কোন সম্বাদ পাওয়া গেল না। তখন সুন্দরী ঢাকাই সাটী পরিয়া গহনা পরিতে বসিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিকন্যা এবং সম্বন্ধে ভগিনী। তাঁহার পিতা নিতান্ত অসঙ্গতিশালী নহেন। সুন্দরী সচরাচর পিত্রালয়ে থাকিতেন; তাঁহার স্বামী শ্রীনাথ, প্রকৃত ঘরজামাই না হইয়াও কখন কখন শ্বশুর বাড়ী আসিয়া থাকিতেন। শৈবলিনীর বিপদ্ কালে যে শ্রীনাথ বেদগ্রামে ছিলেন তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। সুন্দরীই বাড়ীর গৃহিণী। তাঁহার মাতা রুগ্ন এবং এবং অকর্ম্মণ্য। সুন্দরীর আর এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল; তাহার নাম রূপসী। রূপসী শ্বশুর বাড়ীতেই থাকিত।

সুন্দরী ঢাকাই সাটী পরিয়া অলঙ্কার সন্নিবেশ পূর্ব্বক পিতাকে বলিল, আমি রূপসীকে দেখিতে যাইব,—তাহার বিষয়ে বড় কুস্বপ্ন দেখিয়াছি। সুন্দরীর পিতা কৃষ্ণকমল চক্রবর্ত্তী, কন্যার বশীভূত, একটু আধটু আপত্তি করিয়া সম্মত হইলেন। সুন্দরী রূপসীর শ্বশুরালয়ে গেলেন—শ্রীনাথ স্বগৃহে গেলেন।

রূপসীর স্বামী প্রতাপ রায়, একজন জমীদার। সুন্দরীর শিবিকা তাঁহার বৃহৎ পুরী মধ্যে প্রবেশ করিল। রূপসী তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া, সাদরে গৃহে লইয়া গেল। প্রতাপ আসিয়া শ্যালীকে রহস্য সম্ভাষণ করিলেন।

পরে অবকাশমতে প্রতাপ, সুন্দরীকে বেদগ্রামের সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যান্য কথার পর চন্দ্রশেখরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুন্দরী বলিলেন, "আমি সেই কথা বলিতে আসিয়াছি। বলি শুন।"

এই বলিয়া সুন্দরী চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর নির্ব্বাসন বৃত্তান্ত সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া, প্রতাপ বিস্মিত এবং স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

কিঞ্চিৎ পরে মাথা তুলিয়া প্রতাপ কিছু রুক্ষভাবে, সুন্দরীকে বলিলেন, "এতদিন আমাকে একথা বলিয়া পাঠাও নাই কেন?"

সু। "কেন, তোমাকে বলিয়া কি হইবে?"

প্র। "কি হইবে? তুমি স্ত্রীলোক, তোমার কাছে বড়াই করিব না। আমাকে বলিয়া পাঠাইলে কিছু উপকার হইতে পারিত।"

সু। "তুমি উপকার করিবে কি না তা জানিব কি প্রকারে?"

প্র। "কেন তুমি কি জান না—আমার সর্ব্বস্ব চন্দ্রশেখর হইতে?"

সু। "জানি। কিন্তু শুনিয়াছি লোকে বড় মানুষ হইলে পূর্ব্বকথা ভুলিয়া যায়।"

প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া, ক্রোধে অধীর এবং বাক্য শূন্য হইয়া উঠিয়া গেলেন। রাগ দেখিয়া সুন্দরীর বড় আহ্লাদ হইল।

পরদিন প্রতাপ, এক পাচক ও এক ভৃত্য মাত্র সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। ভৃত্যের নাম রামচরণ। প্রতাপ কোথায় গেলেন, প্রকাশ করিয়া গেলেন না। কেবল রূপসীকে বলিয়া গেলেন, "আমি চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর সন্ধান করিতে চলিলাম। সন্ধান না করিয়া ফিরিব না।"

কলিকাতায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া ফষ্টর ও শৈবলিনীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। পরে অকস্মাৎ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরে গেলেন। তথায় চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ পাইলেন। যে গৃহে চন্দ্রশেখর দলনীকে রাখিয়া গেলেন, সে প্রতাপের বাসা।

সুন্দরী কিছুদিন ভগিনীর নিকটে থাকিয়া, আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া, শৈবলিনীকে গালি দিল। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, সুন্দরী, রূপসীর নিকট প্রমাণ করিতে বসিত যে শৈবলিনীর তুল্য পাপিষ্ঠা, হতভাগিনী আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই। একদিন রূপসী বলিল,

"তা ত সত্য, তবে তুমি তার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতেছ কেন?"

সুন্দরী বলিল, "তাঁর মুণ্ডপাত করিব বল্যে—তাঁকে যমের বাড়ী পাঠাব বল্যে—তাঁর মুখে আগুন দিব বল্যে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

রূপসী বলিল, "দিদি, তুই বড় কুঁদুলী।"

সুন্দরী উত্তর করিল; "সেই ছুঁড়িই ত আমায় কুঁদুলী করেছে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অনুমতি

মুঙ্গেরের যে সকল রাজকর্ম্মচারিগণ হিন্দু, চন্দ্রশেখর তাঁহাদিগের নিকট বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। মুসলমানেরাও তাঁহাকে চিনিত। তাঁহার নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, স্বয়ং নবাব তাঁহাকে মান্য করিতেন। সুতরাং সকল কর্ম্মচারিগণও তাঁহাকে মানিত।

মুন্সী রামগোবিন্দ রায়, চন্দ্রশেখরকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। চন্দ্রশেখর সূর্য্যোদয়ের পর মুঙ্গেরের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং রামগোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, দলনীর পত্র তাঁহার হস্তে দিলেন। বলিলেন, "আমার নাম করিও না। এক ব্রাহ্মণ পত্র আনিয়াছে এই কথা বলিও।" মুন্সী বলিলেন, "আপনি উত্তরের জন্য কাল আসিবেন।" কাহার পত্র তাহা মুন্সী কিছুই জানিলেন না। চন্দ্রশেখর পুনর্ব্বার, পূর্ব্ববর্ণিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দলনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "কল্য উত্তর আসিবে। কোন প্রকারে অদ্য কাল যাপন কর।"

দুই তালা বাড়ী। নীচে, দলনী ও কুল্‌সম্‌ ছিল। চন্দ্রশেখর, তাহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাতের পর উপরে উঠিলেন।

তথায়, এক কক্ষ মধ্যে, বিস্তৃত গালিচার উপর বসিয়া, এক যুবা পুরুষ—আলবোলায় তামাকু খাইতেছিলেন। তিনি চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ইনিই প্রতাপ রায়।

চন্দ্রশেখর, উপবেশন করিলে, যুবাও উপবেশন করিলেন। তখন চন্দ্রশেখর বলিলেন,

"প্রতাপ, এই যবন কন্যাদিগের বিষয়, রামচরণকে যেরূপ বলিয়াছিলাম—সকলই সেইরূপ হইয়াছে ত?"

প্রতাপ রায় বলিলেন, "সেইরূপই হইয়াছে। কোন প্রকার চিন্তা নাই।"

পরে অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর, প্রতাপ বলিলেন, "মহাশয়! আর কতদিন আমি মুঙ্গেরে বাস করিব? আমাকে অনুমতি করুন, আমি কার্য্য সিদ্ধ করি। আমি একজন ফৌজদারকে স্বহস্তে বধ করিয়াছি—দুইজনকে কর্ম্মত্যাগ করাইয়াছি—এবং সেরাজউদ্দৌলার খালসা জমী কাড়িয়া আপন বলে ভোগ করিয়াছি। অনুমতি করেন, তবে আমি কলিকাতা এক রাত্রে দগ্ধ করিতে পারি।"

চন্দ্রশেখর হাসিয়া বলিলেন, "পরাপরাধে পরস্য দণ্ডং? কলিকাতার কয়জন আমার কাছে অপরাধী—কলিকাতা দাহ করিবে কেন?"

প্র। "তবে অনুমতি করুন্‌, দুরাত্মা ফষ্টরকেই দণ্ডিত করি?"

চ। "জগদীশ্বর তাহার দণ্ড বিধান করিবেন—আমরা কেন হস্ত কলঙ্কিত করিব? আমিও রাগ দ্বেষাদি বশীভূত সামান্য মনুষ্য। বরং বোধ হয়, অন্যের অপেক্ষা এ সকল পশুবৃত্তি আমার হৃদয়ে অধিকতর বলবতী। অতএব যদি ফষ্টরকে দণ্ডিত করিলে, আমার পূর্ব্ব সুখ ফিরিয়া পাইতাম—তবে আমি তাহাতে অগ্রসর না হইতাম, এমত নহে। কিন্তু এখন ফষ্টরকে দণ্ড করিয়া আমার উপকার নাই, তবে পরের অনিষ্ট করিব কেন?"

প্র। "তবে কি বধূ ম্লেচ্ছ দস্যুর হস্তে থাকিবেন?"

চ। "না। সে বিষয়ে মনঃস্থির করিয়াছি। পতি ধর্ম্মে আমি বিমুখ হইব না। যদি পার, তাঁহার উদ্ধার কর। উদ্ধার করিয়া, তাঁহাকে কাশী প্রেরণ করিতে হইবে। তথায়, রমানন্দ স্বামীর কৃপায়, তাঁহার চিরপ্রবাসের ব্যবস্থা হইবে।"

প্রতাপ, গাত্রোত্থান করিয়া চন্দ্রশেখরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "মহাশয়, আপনার কৃপায় আমি আজি বধূর উদ্ধার করিব।"

চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজি ? সে কি ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আজি। শৈবলিনী মুঙ্গেরে আছেন।"

শুনিয়া চন্দ্রশেখরের শরীর কণ্টকিত হইল। কিন্তু তিনি আর কিছু না বলিয়া, ধীর ভাবে বলিলেন,

"যদি উদ্ধার করিতে পার, আপাততঃ জগৎশেঠের গৃহে তাঁহাকে রাখিও। তার পর রমানন্দস্বামীর আশ্রয়ে গিয়া তাঁহার নিকটে সবিশেষ নিবেদন করিও। যেমন যেমন বলিবেন, সেইরূপ করিও। আমার সঙ্গে তোমার এখানে আর সাক্ষাৎ হইবে কি না বলিতে পারি না। এই যবন কন্যাদিগের একটা উপায় হইলেই আমি তীর্থ যাত্রা করিব। কেবল রমানন্দস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেই এখানে আসিয়াছিলাম।"

এই বলিয়া চন্দ্রশেখর প্রতাপকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া প্রস্থান করিলেন। প্রতাপ বুদ্ধিমান, সকল বুঝিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গঙ্গাতীরে

কলিকাতার কৌন্‌সিল স্থির করিয়াছিলেন, নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। সম্প্রতি আজিমাবাদের কুঠিতে কিছু অস্ত্র পাঠান আবশ্যক। সেই জন্য এক নৌকা অস্ত্র বোঝাই দিলেন।

আজিমাবাদের অধ্যক্ষ ইলিস্ সাহেবকে কিছু গুপ্ত উপদেশ প্রেরণ আবশ্যক হইল। আমিয়ট্ সাহেব নবাবের সঙ্গে গোলযোগ মিটাইবার জন্য মুঙ্গেরে আছেন—সেখানে তিনি কি করিতেছেন, কি বুঝিলেন, তাহা না জানিয়াও ইলিস্‌কে কোন প্রকার অবধারিত উপদেশ দেওয়া যায় না। অতএব একজন চতুর কর্ম্মচারীকে তথায় পাঠান আবশ্যক হইল। সে আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার উপদেশ লইয়া ইলিসের নিকট যাইবে, এবং কলিকাতার কৌন্সিলের অভিপ্রায় ও আমিয়টের অভিপ্রায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে।

এই সকল কার্য্যের জন্য গবর্ণর বন্সিটার্ট ফষ্টরকে পুরন্দরপুর হইতে আনিলেন। তিনি অস্ত্রের নৌকা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া লইয়া যাইবেন; এবং আলিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাটনা যাইবেন। সুতরাং ফষ্টরকে কলিকাতায় আসিয়াই পশ্চিম যাত্রা করিতে হইল। তিনি একখানি পৃথক নৌকায় শৈবলিনীকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। শৈবলিনীকে কলিকাতায় বাস করিতে হইল না।

প্রতাপ রায়, কলিকাতায় আসিয়া এ সকল বৃত্তান্ত সন্ধানে জানিতে পারিলেন। জানিয়া, মুঙ্গেরে ফষ্টরকে ধরিতে পারিবেন ভরসায় সেখানে গেলেন। প্রথমে তথায়, ফষ্টরের আগমনের কোন সম্বাদ পাইলেন না। কিন্তু চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ পাইলেন। বুঝিলেন যে অনুসন্ধান চন্দ্রশেখরের অভিপ্রেত নহে। সে কথা মনে স্থান না দিয়া, প্রতাপ, মুঙ্গেরে বাসা করিয়া, ফষ্টরের সন্ধানে নিযুক্ত হইলেন।

পরে ফষ্টর অস্ত্রের নৌকা এবং শৈবলিনীর সহিত মুঙ্গেরে আসিয়া, তীরে নৌকা বাঁধিলেন। আলিয়টের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া বিদায় হইলেন, কিন্তু এমত সময়ে গুরগণ খাঁ নৌকা আটক করিলেন। তখন আলিয়টের সঙ্গে নবাবের সঙ্গে বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। অদ্য আলিয়টের সঙ্গে ফষ্টরের এই কথা স্থির হইল, যে যদি নবাব নৌকা ছাড়িয়া দেন ভালই, নচেৎ কাল প্রাতে ফষ্টর অস্ত্রের নৌকা ফেলিয়া পাটনায় চলিয়া যাইবেন।

সেই রাত্রে প্রতাপ চন্দ্রশেখরের অনুমতি পাইয়া শৈবলিনীর উদ্ধারের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু প্রতাপ এস্থানে নিঃসহায়—সহায়ের মধ্যে রামচরণ—আর নিজের সাহস। সেই সাহায্য মাত্র অবলম্বন করিয়া, প্রতাপ, যমদূতের হস্ত হইতে শৈবলিনীকে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন।

ফষ্টরের দুইখানি নৌকা মুঙ্গেরের ঘাটে বাঁধা; একখানি দেশী ভড়—আকারে বড় বৃহৎ। আর একখানি বজ্‌রা। ভড়ের উপর কয়েক জন নবাবের শিপাহী পাহারা দিতেছে। তীরেও কয়েক জন শিপাহী। এই খানিতে অস্ত্র বোঝাই—এই খানিই গুরগণ খাঁ আটক করিতে চাহেন।

বজ্‌রা খানিতে অস্ত্র বোঝাই নহে। সেখানি ভড় হইতে হাত পঞ্চাশ দূরে আছে। সেখানে কেহ নবাবের পাহারা নাই। ছাদের উপর একজন "তেলিঙ্গা" নামক ইংরেজদিগের শিপাহী বসিয়া নৌকা রক্ষণ করিতেছিল।

রাত্রি সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর। অন্ধকার রাত্র, কিন্তু পরিষ্কার। বজ্‌রার পাহারা-ওয়ালা একবার উঠিতেছে, একবার বসিতেছে, একবার ঢুলিতেছে। তীরে একটা কসাড় বন ছিল। তাহার অন্তরালে থাকিয়া এক ব্যক্তি তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। নিরীক্ষণকারী স্বয়ং প্রতাপ রায়।

প্রতাপ রায় দেখিলেন, প্রহরী ঢুলিতেছে। তখন প্রতাপ রায়, আসিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিলেন। প্রহরী জলের শব্দ পাইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে জিজ্ঞাসা করিল "হুকমদার ?" প্রতাপ রায় উত্তর করিলেন না। প্রহরী ঢুলিতে লাগিল। নৌকার ভিতরে ফষ্টর সতর্ক হইয়া জাগিয়া ছিলেন। তিনিও প্রহরীর বাক্য শুনিয়া, বজরার মধ্য হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন একজন জলে স্নান করিতে নামিয়াছে।

এমত সময়ে কসাড় বন হইতে অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দ হইল। বজ্‌রার প্রহরী, গুলির দ্বারা আহত হইয়া জলে পড়িয়া গেল। প্রতাপ তখন, যেখানে নৌকার অন্ধকার ছায়া পড়িয়াছিল, সেইখানে আসিয়া ওষ্ঠ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রহিলেন।

বন্দুকের শব্দ হইবা মাত্র, ভড়ের শিপাহীরা "কিয়া হ্যায় রে ?" বলিয়া গোলযোগ করিয়া উঠিল। নৌকার অপরাপর লোক জাগরিত হইল। ফষ্টর বন্দুক হাতে করিয়া বাহির হইলেন।

লরেন্স ফষ্টর বাহিরে আসিয়া চারিদিক ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহার "তেলিঙ্গা" প্রহরী অন্তর্হিত হইয়াছে—নক্ষত্রালোকে দেখিলেন তাহার মৃত দেহ ভাসিতেছে। প্রথমে মনে করিলেন, নবাবের শিপাহীরা মারিয়াছে—কিন্তু তখনই কসাড় বনের দিগে অল্প ধূমরেখা দেখিলেন। আরও দেখিলেন তাঁহার সঙ্গের দ্বিতীয় নৌকার লোক সকল বৃত্তান্ত কি জানিবার জন্য দৌড়িয়া আসিতেছে। আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে ; তীরে, নগর মধ্যে আলো জ্বলিতেছে—গঙ্গাকূলে শত শত বৃহত্তরণী শ্রেণী, অন্ধকারে নিদ্রিতা রাক্ষসীর মত নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে—কল কল রবে অনন্ত প্রবাহিণী গঙ্গা ধাবিতা হইতেছেন। সেই স্রোতে প্রহরীর শব ভাসিয়া যাইতেছে। পলকমধ্যে ফষ্টর এই সকল দেখিলেন।

কসাড় বনের উপর ঈষত্তরল ধূমরেখা দেখিয়া, ফষ্টর স্বহস্তস্থিত বন্দুক উত্তোলন করিয়া সেই বনের দিগে লক্ষ্য করিতে ছিলেন। ফষ্টর বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, যে এই বনান্তরালে লুক্কায়িত শত্রু আছে। ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, যে শত্রু অদৃশ্য থাকিয়া প্রহরীকে নিপাত করিয়াছিল, সে এখনই তাঁহাকেও নিপাত করিতে পারে। কিন্তু তিনি পলাসীর যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ; দেশী লোকে যে ইংরেজকে লক্ষ্য করিবে একথা তিনি মনে স্থান দিলেন না। বিশেষ ইংরেজ হইয়া যে দেশী শত্রুকে ভয় করিবে—তাহার মৃত্যু ভাল। এই ভাবিয়া তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া বন্দুক উত্তোলন করিয়া ছিলেন—কিন্তু তন্মুহূর্ত্তে কসাড় বনের ভিতর অগ্নি শিখা জ্বলিয়া উঠিল—আবার বন্দুকের শব্দ

হইল—ফষ্টর মস্তকে আহত হইয়া, প্রহরীর ন্যায়, গঙ্গাস্রোতোমধ্যে পতিত হইলেন। তাঁহার হস্তস্থিত বন্দুক সশব্দে নৌকার উপরেই পড়িল।

প্রতাপ সেই সময়ে, কটি হইতে ছুরিকা নিষ্কোষিত করিয়া, বজ্‌রার বন্ধন-রজ্জু সকল কাটিলেন। সেখানে জল অল্প, স্রোতঃ মন্দ, বলিয়া নাবিকেরা নোঙ্গর ফেলে নাই। ফেলিলেও লঘুহস্ত, বলবান প্রতাপের বিশেষ বিঘ্ন ঘটিত না। প্রতাপ বজ্‌রা জলে ঠেলিয়া দিয়া এক লাফ দিয়া বজরার উপর উঠিলেন।

এই ঘটনা গুলি বর্ণনায় যে সময় লাগিয়াছে, তাহার শতাংশ সময় মধ্যেই সে সকল সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রহরীর পতন, ফষ্টরের বাহিরে আসা, তাঁহার পতন এবং প্রতাপের নৌকারোহণ, এই সকলে যে সময় লাগিয়াছিল, ততক্ষণে দ্বিতীয় নৌকার লোকেরা বজরার নিকটে আসিতে পারে নাই। কিন্তু তাহারাও আসিল।

আসিয়া দেখিল, নৌকা প্রতাপের কৌশলে বাহির জলে গিয়াছে। একজন সাঁতার দিয়া নৌকা ধরিতে আসিল। প্রতাপ একটা লগি তুলিয়া তাহার মস্তকে মারিলেন। সে ফিরিয়া গেল। আর কেহ অগ্রসর হইল না। সেই লগি জলতলে স্পৃষ্ট করিয়া প্রতাপ আবার নৌকা ঠেলিলেন। নৌকা ঘুরিয়া গভীর স্রোতোমধ্যে পড়িয়া বেগে পূর্ব্বাভিমুখে ছুটিল।

লগি হাতে, প্রতাপ ফিরিয়া দেখিলেন, আর একজন "তেলিঙ্গা" শিপাহী নৌকার ছাদের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া বন্দুক উঠাইতেছে। প্রতাপ লগি ফিরাইয়া শিপাহীর হাতের উপর মারিলেন; তাহার হাত অবশ হইল—বন্দুক পড়িয়া গেল। প্রতাপ সেই বন্দুক তুলিয়া লইলেন। ফষ্টরের হস্তচ্যুত বন্দুকও তুলিয়া লইলেন। তখন তিনি নৌকাস্থিত সকলকে বলিলেন,

"শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়। মুরশীদাবাদের নবাবও আমাকে ভয় করেন। এই দুই বন্দুক আর লগির বাড়ী, বোধ হয় তোমাদের কয়েকজনকে একেলাই মারিতে পারি। তোমরা যদি আমার কথা শুন, তবে কাহাকেও কিছু বলিব না। আমি হালে যাইতেছি—দাঁড়ীরা সকলে দাঁড় ধরুক। আর আর সকলে যেখানে যে আছ সেইখানে থাক। নড়িলেই মরিবে—নচেৎ শঙ্কা নাই।"

এই বলিয়া প্রতাপ রায় দাঁড়ীদিগকে এক একটা লগির খোঁচা দিয়া উঠাইয়া দিলেন। তাহারা ভয়ে জড় সড় হইয়া, দাঁড় ধরিল। প্রতাপ রায় গিয়া নৌকার হাল ধরিলেন। কেহ আর কিছু বলিল না। নৌকা দ্রুতবেগে চলিল। ভড়ের উপর হইতে দুই একটা বন্দুক শব্দ হইল, কিন্তু কাহাকে লক্ষ্য করিতে হইবে, নক্ষত্রালোকে তাহা কিছু কেহ অবধারিত করিতে না পারাতে, সে শব্দ তখনই নিবারিত হইল।

তখন ভড় হইতে জন কয়েক লোক বন্দুক লইয়া এক ডিঙ্গিতে উঠিয়া, বজরা ধরিতে আসিল। প্রতাপ প্রথমে কিছু বলিলেন না। তাহারা নিকটে আসিলে, দুইটি বন্দুকই তাহাদিগের উপর লক্ষ্য করিয়া ছাড়িলেন। দুই জন লোক আহত হইল। অবশিষ্ট লোক ভীত হইয়া, ডিঙ্গী ফিরাইয়া পলায়ন করিল।

কসাড় বনে লুক্কায়িত রামচরণ, প্রতাপকে নিষ্কণ্টক দেখিয়া, এবং ভড়ের শিপাহীগণ কসাড়বন খুঁজিতে আসিতেছে দেখিয়া, ধীরে ধীরে আপনার বন্দুকটি বনমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া, সরিয়া গেল।

কলিকাতায়, এবং তন্নিকটস্থ প্রদেশে, ভদ্র লোকে এক্ষণে যাত্রার প্রতি হতাদর হইয়াছেন বটে, কিন্তু যাত্রাই এক্ষণকার গ্রাম্য উৎসব। তদুপলক্ষে বারইয়ারী, তদুপলক্ষে ভিক্ষা, তদুপলক্ষে চুরী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। যাত্রাকরেরা উপাস্য ব্যক্তি; তাহাদের আনিতে হইলে উপাসনা করিতে হয়।

এই কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রথমতঃ বোধ হইবে যে বাঙ্গালার আধুনিক যাত্রা অশ্রুতপূর্ব্ব উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, নতুবা এত আদর কেন? যাত্রা শুনিতে লোকের এতই বা ব্যগ্রতা কেন? বস্তুতঃ আধুনিক যাত্রার সর্ব্বদাই প্রশংসা শুনা যায়। কিন্তু প্রশংসা, সকল সময় গুণের পরিচায়ক নহে। অনেক সময় বরং তাহার বিপরীত বুঝায়। যিনি প্রশংসা করেন তিনি যদি স্বয়ং গুণগ্রাহী হন তবেই তাঁহার প্রশংসা গুণব্যঞ্জক নতুবা সন্দেহ স্থল।

“অমুক অধিকারী বড় যাত্রা করিয়াছে, মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার উপলক্ষে কেমন তামাদি ও নাতকজারী ঘটাইল। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কথায় নাতকজারী ঘটান অল্প গুণপনা নহে। পরমানন্দ কি শ্রীদামশুভল প্রভৃতি প্রাচীন যাত্রাকরের প্রশংসা কর, কিন্তু তাহারা কি এরূপ নাতকজারী ঘটাইতে পারিত? সাধ্য কি! তাহারা এরূপ আইন আদালতের কথা কখনও জানিত না।” আধুনিক যাত্রার এই এক জাতীয় প্রশংসা।

“গত রাত্রে দূতী এক চক্র শব্দ লইয়া কি চমৎকার গুণপনা দেখাইল। রথচক্র, রমণীচক্র, নয়নচক্র, প্রেমচক্র, চক্রীরচক্র এইরূপ কত চক্র সাজাইল। এমন যাত্রা কি আর হয়! এ যাত্রা শুনিলে কথা শেখা যায়, অভিধান পাঠের ফল হয়।” এই আর এক জাতীয় প্রশংসা।—

এই সকল প্রশংসা শুনিলে অনেকেই দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই। আমাদের যাত্রার অবস্থা বড় অপকৃষ্ট এবং শ্রোতৃগণের রুচি ততোধিক অপকৃষ্ট বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইবে। রুচি সম্বন্ধে কতকগুলিন কথা ১২৭৯ সালের নবম সংখ্যক বঙ্গদর্শনে আমরা বলিয়াছি, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে আর অধিক বলিবার ইচ্ছা

নাই। আপাততঃ কেবল যাত্রার অভিনয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার অভিলাষ। কিন্তু আমরা যাত্রাকে উপলক্ষ করিয়া যাহা বলিতেছি, তাহা এ দেশীয় অন্যান্য নৃত্য গীত পদ্ধতি পক্ষেও বর্ত্তিবে।

নৃত্য।

যাত্রার প্রসঙ্গ হইলে অগ্রেই নৃত্যের কথা মনে পড়ে। সুর, তাল, লয়, মান, বেশবিন্যাস, কথা বার্ত্তা, অঙ্গভঙ্গি, সকলই মনে হয়, কিন্তু নৃত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। এক্ষণকার যাত্রার নৃত্যই প্রবল, সকলেই নৃত্য করে। কি মেহতর, কি ভিস্তি, কি মালিনী, কি বিদ্যা, সকলেই নৃত্য করে। কৃষ্ণ নৃত্য করেন, রাধা নৃত্য করেন, রাবণ নৃত্য করেন, সীতা নৃত্য করেন, কৈকেয়ী নৃত্য করেন, বোধ হয় বৃদ্ধ রাজা দশরথও নৃত্য করিতেন, কিন্তু তিনি প্রায় সকল যাত্রার দলে, "বিহালা-ওয়ালা।" নৃত্য করিতে গেলে বিহালা বন্ধ হয়, নতুবা তাহার ত্রুটি ছিল না।

যাত্রায় মেহতর নৃত্য করে কেবল নেসার ভরে। কিন্তু আর সকলে কেন নৃত্য করে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতান্তর থাকিতে পারে। ভিস্তি নৃত্য করে বুঝি জলের ভরে, মালিনী নৃত্য করে বুঝি বয়সের ভরে, বিদ্যা নৃত্য করেন বুঝি যৌবনের ভরে, রাধা নৃত্য করেন বুঝি প্রেমের ভরে, রাবণ নৃত্য করেন বুঝি মৃত্যুর ভরে, কিন্তু সীতা, কৈকেয়ী, ভগবতী, হস্তী, জাম্বুবান, অশ্ব প্রভৃতি কেন নৃত্য করে কে বলিতে পারে?

কিন্তু এক কথা আছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালা অনেক কাঁদিয়াছে; কীর্ত্তনের ছলে অনবরত নয়নাশ্রু বর্ষণ করিয়াছে; প্রণয় ভরে, স্নেহ ভরে বাঙ্গালা অনেক কাঁদিয়াছে। সন্ধ্যা সমীরণের ন্যায় একাকিনী বনে, উপবনে, মর্ম্মপীড়ায় অনেক কাঁদিয়াছে। শেষ অনাথিনী নিরুপায় হইয়া অস্পষ্ট স্বরে কি বলিতে বলিতে সাগর সলিলে মিশাইয়া গিয়াছে। আর সে বাঙ্গালা নাই, বাঙ্গালা এক্ষণে নূতন। বাঙ্গালা এক্ষণে বালক। সেই জন্য এত নৃত্য। বালক আপনিও নৃত্য করে, আবার বৃদ্ধপিতামহকেও নৃত্য করিতে বলে। বালকের নৃত্য আবশ্যক, আমাদের শিরা মস্তিষ্ক মাংসপেশী সকলই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, নৃত্য আবশ্যক।

যে কোন সমাজেই হউক নৃত্য বলিলে পদদ্বয়ের সঞ্চালন জনিত দেহের মনোহর আন্দোলন বুঝায়, কিন্তু বঙ্গসমাজে কেবল দেহের মধ্যভাগের সঞ্চালন জনিত দেহের যে ঘৃণিত আন্দোলন তাহাকেই নৃত্য বলে। কি লজ্জাকর নৃত্য! বাঙ্গালী সভ্য হইয়াছে এইজন্য এই নৃত্য আপনি দেখে, কন্যাকে মাতাকে দেখায়, বালক বালিকাকে দেখায় আবার বাহবা দেয়। বাহবা কাহার প্রাপ্য? বোধ হয় বাহবা আমরাই পাইতে পারি।

"খেমটানাচ"! চমৎকার কথা! গ্রাম্য বাবুদিগের পক্ষে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র। বারইয়ারীর পাণ্ডাদিগের জীবনসর্ব্বস্ব। যে পাণ্ডা নরক হইতে নিজ গ্রামে নর্ত্তকী আনিলেন, তিনি মনে করিলেন যেন হিমালয় হইতে গঙ্গা আনিয়াছেন, তিনি গ্রামের ভগীরথ জন্মিয়াছেন। এই গ্রাম্য ভগীরথদিগের জন্ম সার্থক। তাঁহাদের অনুকম্পায় গ্রামের অনেকেই চরিতার্থ হইলেন। চরিতার্থ হউন কিন্তু অনেক ছেলেও ডুবিল।

পূর্ব্বে বাঙ্গালায় খেমটা ছিলনা। পূর্ব্বপদ্ধতি অনুসারে অদ্যাপি যে সকল কালীয়দমন যাত্রা আছে তাহাতে এই নৃত্য প্রচলিত নাই। কোন কোন দলে লোকরঞ্জন করিবার নিমিত্ত এই ঘৃণিত নৃত্য স্বতন্ত্র নর্ত্তক দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু মালিনী কি বিদ্যার ন্যায়, দূতী কি রাধিকা খেমটা নাচেন না। কালীয়দমন যাত্রায় যে রূপ দেখা যায় তাহাতে বোধ হয় যে, পূর্ব্বে বাঙ্গালার নৃত্য প্রণালী স্বতন্ত্র ছিল এবং সে নৃত্য নিতান্ত গাম্ভীর্য্য-শূন্য ছিলনা, কিন্তু এই আধুনিক খেমটা নাচ কোথা হইতে আসিল? কে আনিল? অথবা তাহা জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য। যে দেশে তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, যে দেশে দেবার্চ্চনায় পঞ্চমকার আবশ্যক, সে দেশে খেমটার জন্ম হইবে অসম্ভাবনা কি? খেমটা বাঙ্গালার নৃত্য; বাইদিগের নৃত্য মহারাষ্ট্রীয়। খেমটা তান্ত্রিক, মহারাষ্ট্রীয় নৃত্য পৌরাণিক। পুরাণের ন্যায় এই নৃত্যের গাম্ভীর্য্য আছে।

খেমটা নাচ, চন্দ্রহার, চাবির সিকল, শান্তিপুরে ধুতি, যাত্রার মেতরাণী, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী এ সকল একজাতীয়। তীব্র, উগ্র এবং উত্তপ্ত।

যে নৃত্য লইয়া বাঙ্গালা উন্মত্ত হইয়াছে, এখনকার সুর সেই নৃত্যের প্রতিপোষক এবং উদ্দীপক। বাঙ্গালার আর পূর্ব্ব সুর নাই। যে সুর শুনিলে যেন জন্মান্তরীণ সুখ চকিতের ন্যায় স্মরণপথে আসিয়া হৃদয় কম্পিত করিয়া যাইত, আর সে সুর নাই। যে সুর ধীরে ধীরে তোমার রক্ত স্তমিত করিয়া তোমায় অবশ করিয়া যাইত, এখন আর সে সুর নাই। যে সুর শুনিলে সামান্য প্রদীপ হইতে নয়ন ফিরাইয়া চন্দ্রালোক প্রতি চাহিতে, এক্ষণে আর সে সুর নাই। যে সুর শুনিলে আতর দূরে নিক্ষেপ করিয়া পদ্মগন্ধ আকাঙ্ক্ষা করিতে, এক্ষণে আর সে সুর নাই। এক্ষণে বাঙ্গালার সুর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বাঙ্গালার নৃত্যানুযায়ী সুর হইয়াছে।

মনের অনেক প্রকার যন্ত্রণা বাক্যে প্রকাশ হয় না, তাহা কেবল সুরে প্রকাশ হয়। দুঃখ যত গভীর ততই বাক্যের অতীত। ব্যথিত অন্তঃকরণ মধ্যে কিরূপ তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয়, বাক্যে তাহা দেখিতে পায় না; দেখিতে পাইলেও তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। বাক্য অন্ধ, বাক্য অসম্পূর্ণ। এই জন্য যে

গ্রন্থকর্ত্তা কেবল ব্যথিত ব্যক্তিকে কথকগুলা কথা বলিয়াই তাহার গভীর মর্ম্মপীড়া বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তিনিই নিষ্ফল হইয়াছেন। ব্যথিত ব্যক্তি স্বয়ং আপনার যন্ত্রণা বাক্যে বিবৃত করিতে পারে না "আমি মরিলাম" "আমি গেলাম" এ সকল কথা অতি সাধারণ, সর্ব্বদাই শুনা যায়। অজীর্ণ হইলেও লোকে "আমি মলাম, আমি গেলাম," বলে। গভীর মর্ম্মপীড়ার এ ভাষা নহে; তাহা স্বতন্ত্র। কেহ মর্ম্মপীড়ার কথা অন্যকে বলিতে চাহে না; বরং তাহা আপনার নিকট আপনি বলিতে ইচ্ছা করে। আপনি বক্তা আপনি শ্রোতা। কিন্তু সে স্থলে বাক্য ব্যবহার হয় না; কেবল সুর ব্যবহার হয়। সুর যেন তাপিত অন্তরের এক মাত্র ভাষা। সন্তান শোকে সন্তপ্ত দুঃখিনী ভূমিতলে মুখ লুকাইয়া ক্রন্দন করে, ক্রন্দন কেবল সুর। অনেক সময়, সে সুরের সঙ্গে কোন বাক্য সংযোগ থাকে না অথচ সেই মর্ম্মভেদী সুর শুনিয়া তোমার অঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তোমার হৃদয় বিস্ফারিত হইল, তুমি সেই সুরের অর্থ বুঝিতে পারিলে; তুমি ধীরে ধীরে নয়নাশ্রু মুছিলে। "আমি মরিলাম" এই ভাব বাক্যে সর্ব্বদা শুনিতেছ। অথচ তাহাতে কর্ণপাতও কর না, কেন? আবার বাক্য প্রয়োগ না করিয়া কেবল সুরে সেই ভাব জানাইলে তোমার অন্তর আর্দ্র হইয়া আইসে, তাহাই বা কেন? বাক্যে যাহা শুনিলে তাহা অনেক সময় মিথ্যা হইলেও হইতে পারে কিন্তু সুরে তাহা কখনই হয় না। বাক্য অনেক সময় মৌখিক, সুর সকল সময় আন্তরিক। সুরে যদি তুমি চঞ্চল না হইলে তবে বুঝিতে হইবে যে সে সুর উদ্দিষ্টভাব-ব্যঞ্জক নহে, তাহা বেসুর।

আন্তরিক প্রত্যেক ভাবের এক একটি স্বতন্ত্র সুর আছে। শোকের সুরে পৃথক, হর্ষের সুর পৃথক। পৃথক বলিয়াই পৃথক পৃথক রাগরাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। আমাদের যাত্রাকরগণ তাহা অনুধাবন না করিয়া হর্ষ বিষাদ একই সুরে গাইয়া থাকে, এইজন্য আমাদের গীত বেসুরা।

কিন্তু আমাদের রাগ রাগিণী ভাব ব্যঞ্জক বলিয়া রাষ্ট্র নাই। কোন্ রাগিণীর দ্বারা শোক প্রকাশ হইবে, কোন্ রাগিণীর দ্বারা উন্মত্ততা প্রকাশ হইবে, তাহা সংগীত ব্যবসায়ীরা বলেন না। কিন্তু তাহা না বলুন, কোন রাগ বা রাগিণী তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে গায়িতে পারিলে তাহা স্থির হইত। কিন্তু এক্ষণে কোন রাগ রাগিণী সম্পূর্ণ ভাবে শুনিতে পাওয়া যায় না। যখন তাহা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যাইত, কিম্বদন্তী আছে, তৎকালের সঙ্গীতবিদেরা যে কোন ভাব ইচ্ছা হইত তৎক্ষণাৎ সুরের দ্বারা শ্রোতার মনোমধ্যে তাহা উদ্দীপন করিতে পারিতেন। এমন কি বন্য জন্তুদিগের অন্তর পর্য্যন্ত আর্দ্র করিতে পারিতেন। কোন কোন সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তির এতদূর পর্য্যন্ত বিশ্বাস আছে যে কেবল মনুষ্য চিত্ত নহে, সুরজ্ঞের নিকট পূর্ব্বে

জড়পদার্থ পর্য্যন্ত আজ্ঞাকারী ছিল। মেঘ আসিয়া বৃষ্টি করিত; অগ্নি আসিয়া দাহ করিত; একবার এক সুরজ্ঞ আপনার আহুত অগ্নিতে আপনি পুড়িয়া মরিয়াছিলেন। চমৎকার কথা! ইহার মর্ম্ম অসীম! এই সকল কিম্বদন্তী অমূলক হউক, অগ্রাহ্য হউক, হাস্যাস্পদ হউক কিন্তু সুরের অসাধারণ শক্তির প্রতি লোকের যে বিশ্বাস আছে এই কিম্বদন্তী তাহার পরিচয় স্বরূপ।

সঙ্গীত সম্বন্ধে যে উন্নতি হইয়াছিল, বোধ হয় শিক্ষা দোষে এক্ষণে তাহা অনেক লোপ পাইয়াছে। এক্ষণকার ব্যবসায়িগণ কেবল রাগিণীর পর্দ্দা লইয়া বিতণ্ডা করেন অমুক রাগিণীর মধ্যম "যান" অমুক রাগিণীতে মধ্যম বর্জ্জিত। তাহারা এইরূপে কেবল রাগিণীর পর্দ্দা শিক্ষা করেন রাগিণী শিক্ষা করেন না। ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকার কেবল ইষ্টক চিনিয়া ক্ষান্ত হন, অট্টালিকার আকার দেখেন না। পর্দ্দা প্রতি অধিক মনোযোগ হওয়ায় রাগিণীর মূল উদ্দেশ্য ক্রমে অদৃশ্য হইয়াছে। আবার "ডাগরবাণী" "খণ্ডারবাণী" প্রভৃতি "বোল বাণী"র সৃষ্টি হওয়ায় সেই অদৃশ্যতার আরো সাহায্য করিয়াছে। শেষ রাগিণী সঙ্কর জাতি হইয়া সকল লোপ করিয়াছে। এক রাগিণীর স্কন্ধের উপর আর এক রাগিণীর মস্তক বসিয়া এক নূতন রাগিণী সৃষ্ট হইল। হর্ষব্যঞ্জক সুরের স্কন্ধের উপর বিষাদব্যঞ্জক সুরের মস্তক বসিল; গুণিগণ মধ্যে "বাহবা" পড়িয়া গেল। গণেশের অনুকরণ হইল। গণেশ গায়ক। গণেশের স্কন্ধে হস্তীর মুণ্ড।

এক্ষণে বাঙ্গালার সুর প্রায় এইরূপ। এ রাগিণীর দুইটি পর্দ্দা ও রাগিণীর চারিটি পর্দ্দা লইয়া আমাদের সুর। ইহা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। সকল বিষয়েই আমাদের এইরূপ। আর্য্যের ব্রহ্মা অনার্য্যের মনসা লইয়া আমাদের দেবতা। মুসলমানের চাপকান ইংরাজের ট্রাউজার লইয়া আমাদের পোষাক। সংস্কৃত ধাতু এবং পারশ্য নাম লইয়া আমাদের বাঙ্গালা ভাষা। সে যাহাই হউক, বাঙ্গালার পূর্ব্ব সুর লোপ পাইয়াছে। এক্ষণকার আর প্রায় কোন সুরই আন্তরিক ভাব প্রবাচক নহে, এই জন্য যে ভাবের গীত হউক কোন একটা সুরে গাইলেই হইল। তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই, শ্রোতা ও গায়ক এক্ষণে রুচি সম্বন্ধে তুল্য।

এক্ষণে বাঙ্গালা গীতে যে কয়েকটি সুর ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা সঙ্কর জাতি হউক, অসম্পূর্ণ হউক, লঘু হউক, তাহাতে আমাদের স্বভাবের কিঞ্চিৎ ছায়া পাওয়া যায়। আমরা এক্ষণে শোকাকুল নহি, আমরা নিরানন্দ নহি, আমরা এক্ষণে উল্লাসপ্রিয়। আমাদের সুরেও সেই উল্লাসের ছায়া আছে। উল্লাস আনন্দ নহে, উল্লাসে গাম্ভীর্য্য নাই, আমাদের সুরও সেইরূপ। সুরের নাম পৃথক পৃথক আছে, কিন্তু সে সকল সুর প্রায় এক জাতীয় হইয়াছে। বাঙ্গালায়

আর বড় শোকের সুর নাই। কুচিহ্ন। শোকে সহৃদয়তা জন্মে, ঐক্য হয়। আন্তরিক শোক সকলের অদৃষ্টে ঘটে না ; শোক পবিত্র ; শোক স্বর্গীয়। শোক আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের নৃত্যের গাম্ভীর্য্য নাই ; সুরেরও গাম্ভীর্য্য নাই। সুর স্বভাবব্যঞ্জক। আমাদের সুর সামান্য ; আমরাও সামান্য। লক্ষ্ণাউর ওয়াজাদালিও সামান্য ; যখন তাহার মর্ম্মকথা তিনি আদ্ধায় গাইয়াছিলেন, তাঁহার মানসিক শক্তি তখনই বুঝা গিয়াছিল। তিনি বুলবুলি হইয়া এক সূক্ষ্ম শাখায় বসিয়া মস্তক হেলাইয়া অর্দ্ধ মুদিত নয়নে আদ্ধা গাইতেছিলেন। তিনি গরুড়ের গীত শুনেন নাই। গরুড় গীত গায় ; সাগর সন্নিহিত উচ্চ পর্ব্বত চূড়ায় বসিয়া উচ্চ স্বরে গীত গায়। সাগর শিহরিয়া উঠে ; ছুলিয়া উছলিতে থাকে ; সাগরে তরঙ্গ উঠে ; মেঘমালা ঝুলিয়া পড়ে। সন্তানদিগকে ক্রোড়ে টানিয়া মায়াদেবী ঊর্দ্ধনেত্রে সেই উচ্চ চূড়ার প্রতি সভয়ে চাহিয়া থাকেন। গরুড় প্রতিভা। তাহাই বিষ্ণুকে একবার স্বর্গে একবার পাতালে লইয়া যাইত। লক্ষ্ণাউয়ের নবাব বুলবুলি। তাঁহার এক সুর। আমরাও হর্ষ বিষাদ এক সুরে গাই। আমাদের শোক তাপ যদি থাকে তাহা অতি সামান্য, সেই জন্য আমাদের সুরও সামান্য।

সুর ব্রহ্ম। চমৎকার কথা! যিনি একথা বলিয়াছিলেন তিনি সুর বুঝিয়াছিলেন। মহাদেব গায়ক। আরও চমৎকার কথা। সুর মহামৃত মহাদেবের কণ্ঠের যোগ্য। শ্রোতা কে? মনুষ্য নহে, সিংহ নহে, পর্ব্বত নহে, সাগর নহে। এ সকল সামান্য, ক্ষুদ্র। মহাদেবের গীত গর্জ্জিল ; দেবলোক চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, অতিবাহিত করিয়া মহাসুর চলিল। দূরে কোটি কোটি সূর্য্য মহাসুরে প্লাবিত, কম্পিত, মহাসুর তথাপি প্রধাবিত। অনন্ত আকাশে মহাদেবের মহাসুর প্রধাবিত, চিরকাল প্রধাবিত। সময় অনন্ত, আকাশ অনন্ত, সুর অনন্ত। অনন্ত। অনন্তের অর্থ অনুভব হয় না, মনুষ্যের সাধ্যাতীত। মহাদেব গায়ক ; শ্রোতা অনন্ত। মহাদেব কোথায় বসিয়া গায়িতেছেন? হিমালয়ে নহে। হিমালয় ক্ষুদ্রস্থান। তথায় বসিয়া বেদব্যাস, বাল্মীকি গান করুন। হিমালয় মহাদেবের যোগ্য নহে। তথায় ভীষ্মদেব বাস করুন। মহাদেবের স্থান কোথা? প্রতিভাশালী ব্যক্তির অতলস্পর্শ অন্তরে তাঁহার এক মাত্র স্থান।

সে কথা এক্ষণে যাউক। সুর এবং বাক্যে গীত। সুরে ভাব উদ্দীপন করে বাক্য সংযোগে তাহা আরও স্পষ্টীকৃত হয়। সুরে তোমার মন আকর্ষণ করিল, তুমি স্তব্ধ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিলে, চিত্ত চঞ্চল হইল, নিকটে তোমার

শিশু ক্রীড়া করিতেছিল, তুমি তাহাকে ক্রোড়ে লইলে। সুর বড় মধুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল? সন্তানকে আদর করিয়া থাক এক্ষণে আরও আদর করিতে ইচ্ছা হইল। এমত সময়ে সুরে বাক্য সংযোগ হইল। গায়ক গাইল,

"জনম অবধি হম রূপ নিহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল।"

তোমার স্নেহ উছলিয়া উঠিল। তুমি আপন মনের কথা আপনি বুঝিতে পারিলে। গীত কৃতকার্য্য হইল।

আমরা অনেকে আপন মনের কথা আপনি বুঝিতে পারি না। তাহা কবিরা আমাদের বুঝাইয়া দেন। আমরা কেবল মনের বেগ অনুভব করি মাত্র। একজন সামান্য ব্যক্তি যদি প্রেমাসক্ত হয়, প্রণয়ের অতি অল্প মাধুরি সে ব্যক্তি বুঝিতে পারিবে। প্রণয় পাত্রীর দর্শনে সুখ, তাহার অদর্শনে অসুখ, এই মাত্র সে ব্যক্তি বুঝিতে পারিবে। কিন্তু প্রণয় সাগর। সকলের অন্তরে সেই অগাধ সাগর, সেই দুর্দ্দম সাগর উছলিতেছে। প্রেমাসক্ত ব্যক্তি তাহার বেগে কখন হর্ষিত কখন বিষাদিত হইতেছে; অথচ সেই সাগরে যে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ মালা উঠিতেছে, পড়িতেছে, তাহার কোনটিই সে ব্যক্তি দেখিতে পাইতেছে না। তাহারে একটি তরঙ্গ দেখাও; গাও

"দেখিয়া পালটি দেখি তবু আঁখি
তিরপিত নয়"

প্রণয়ী সামান্য হইলেও তৎক্ষণাৎ এই তরঙ্গ চিনিতে পারিবে। তাহার প্রণয় পাত্রীকে সে কতবার অনিমিষ লোচনে দেখিয়াছে, সর্ব্বদা দেখিতেছে তথাপি তাহার নয়নের পরিতৃপ্তি নাই। কিন্তু তাহা সে আপনি জানিত না। কবি তাহা জানিতেন। প্রণয়ীকে প্রণয়ের আর একটী নিকটস্থ তরঙ্গ দেখাও। গাও

"নবরে নব; নিতুই নব, যখনই হেরি তখনই নব"

প্রণয়ী মাত্রেই একথা বুঝিতে পারিবেন। যিনি প্রণয় পাত্রীকে নিত্য নূতন না দেখিয়া থাকেন তিনিও একথা বুঝিতে পারিবেন কবি তাহা জানিতেন। স্বয়ং কখন প্রণয়াসক্ত হইয়া থাকুন বা না থাকুন কবি প্রণয়ের সকল ভঙ্গি জানেন; সকলের অন্তর জানেন; কবি অন্তর্যামী। কবি ব্রহ্মা। কবি সৃষ্টি করেন। সরমা ব্রহ্মার মানসকন্যা, সীতা বাল্মীকির মানসকন্যা, ডেসিডিমনা সেক্ষপিয়রের মানসকন্যা।

যিনি অন্তরের কথা জানেন না, যিনি আশার উন্মত্ততা, নৈরাশার কাতরতা জানেন না; যিনি স্নেহের কোমলতা, শোকের গভীরতা, যুবতীর পবিত্রতা জানেন না তিনি কবি নহেন। তিনি গীত বাঁধিবার অনধিকারী। অনধিকারীরাই

এক্ষণে আমাদের যাত্রার গীত বাঁধে। জেলে মালা কুমার কামার প্রভৃতি অশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে যে কেহ কথায় মিল করিতে পারিল সেই মনে করিল আমি গীত গাঁথিলাম যাত্রাকর তাহা গান করিয়া ভাবিলেন আমি গীত গাইলাম। শ্রোতারা মনে করিলেন আমরা গীত শুনিলাম। বস্তুতঃ কথার মিল ব্যতীত আধুনিক গীতে আর কিছুই নাই। গীতে কেবল কথা গাঁথা হয়, বর্ণ বাছিয়া এক একটি করিয়া গাঁথা হয়। "বী" শব্দর পর "ণা" শব্দ গাঁথা গিয়াছে অতএব এই দুই শব্দ মধ্যে মধ্যে গাঁথিলে গাথনির বড় শোভা হইবে। "বীণা" শব্দ অল্প অল্প ছেদ দিয়া গাঁথা গেল, গীত অপূর্ব্ব হইল।

"ওবীণা বাজবীণা হরিনাম বিনা" ইত্যাদি।

গীত শুনিয়া শ্রোতৃগণ ধন্য ধন্য করিলেন, কেহ বা সিকি দিলেন, কেহ বা পয়সা দিলেন, কেহ বা পুরাতন বস্ত্র দিলেন। গীতগায়কের উপযুক্ত পারিতোষিক হইল।

যাত্রায় সমস্ত রাত্রি গাইতে হইবে, অতএব অনেক গীত আবশ্যক। সঙ্গত হউক আর অসঙ্গত হউক, ভাবপূর্ণ হউক আর না হউক, আবশ্যক হউক আর না হউক, গীত গাঁথিতে হইবে, গাইতেও হইবে। সুন্দর পুরী প্রবেশ কিরূপে করিবেন এই ভাবে আর্দ্র হইয়া যাত্রাওয়ালা গীত বাঁধিলেন।

"রাজার বাড়ী পাকা কোটা,
চারিদিগে প্রাচীর আঁটা,
বল মাসী কেমন করে যাব।"

ইত্যাদি

এই আশ্চর্য্য গীত শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের মধ্যে বাহবা পড়িয়া থাকে "কপাট আঁটা" থাকিলে পুরে প্রবেশ সুকঠিন এই ভাবটি তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিলেন। ভাব অপূর্ব্ব শ্রোতৃবর্গের রুচিও অপূর্ব্ব।

আধুনিক যাত্রার উদ্দেশ্য চিত্তবৃত্তির পরিচয় দিয়া লোকের পরিতৃপ্তি সাধন করা। যে সকল কবি এক্ষণে গীত বাঁধিতেছেন তাঁহারা ক্রমে সেই সকল চিত্তবৃত্তিকে ঘৃণিত ও অপবিত্র করিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরের প্রণয় নরকের প্রণয়। কৃষ্ণ রাধার প্রণয় প্রায় তাহাই দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক যাত্রার দোষে কৃষ্ণ রাধাকে গোয়ালা বলিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বে কবির গুণে তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া বোধ হইত। (ক্রমশঃ)

১

এই মধুমাসে, মধুর বাতাসে,
শোন্‌লো মধুর বাঁশী।
এই মধু বনে, শ্রীমধুসূদনে,
দেখলো সকলে আসি॥

মধুর সে গায়, মধুর বাজায়,
মধুর মধুর ভাবে।
মধুর আদরে, মধুর অধরে,
মধুর মধুর হাসে॥

মধুর শ্যামল, বদন কমল,
মধুর চাহনি তায়।
কনক নূপুর, মধুকর যেন,
মধুর বাজিছে পায়॥

মধুর ইঙ্গিতে, আমার সঙ্কেতে,
কহিল মধুর বাণী।
সে অবধি চিতে, মাধুরি হেরিতে,
ধৈরয নাহিক মানি॥

এ সুখ রঙ্গেতে, পরলো অঙ্গেতে,
মধুর চিকন বাস।
তুলি মধুফুল, পর কানে দুল,
পুরাও মনের আশ॥

গাঁথি মধুমালা, পর গোপ বালা,
হাসলো মধুর হাসি।
চল যথা বাজে, যমুনার কূলে,
শ্যামের মোহন বাঁশী॥

২

চল যথা বাজে, যমুনার কূলে,
ধীরে ধীরে ধীরে বাঁশী।
ধীরে ধীরে যথা, উঠিছে চাঁদনি,
স্থল জল পরকাশি॥

ধীরে ধীরে রাই, চল ধীরে যাই,
ধীরে ধীরে ফেল পদ।
ধীরে ধীরে শুন, নাদিছে যমুনা,
কল কল গদ গদ॥

ধীরে ধীরে জলে, রাজ হংস চলে,
ধীরে ধীরে ভাসে ফুল।
ধীরে ধীরে বায়ু, বহিছে কাননে,
দোলায়ে আমার দুল॥

ধীরে যাবি তথা, ধীরে কবি কথা,
রাখিবি দোঁহার মান।
ধীরে ধীরে তার, বাঁশীটি কাড়িবি,
ধীরেতে পুরিবি তান॥

ধীরে শ্যাম নাম, বাঁশীতে বলিবি,
শুনিব কেমন বাজে।
ধীরে ধীরে চূড়া, কাড়িয়ে পরিবি,
দেখিব কেমন সাজে॥

ধীরে বন মালা, গলাতে, দোলাবি,
দেখিব কেমন দোলে।
ধীরে ধীরে তার, মন করি চুরি,
লইয়া আসিবি চলে॥

৩

শুন মোর মন, মধুরে মধুরে,
জীবন করহ সায়।
ধীরে ধীরে ধীরে, সরল সুপথে,
নিজ গতি রেখ তায়॥

এ সংসার ব্রজ, কৃষ্ণ তাহে সুখ,
মন তুমি ব্রজনারী।
নিতি নিতি তার, বংশীরব শুনি,
হতে চাও অভিসারী॥

যাও যাবে মন, কিন্তু দেখ যেন,
একাকী যেওনা রঙ্গে।
মাধুর্য্য ধৈরয, সহচরী দুই,
রেখ আপনার সঙ্গে॥

ধীরে ধীরে ধীরে কাল নদী তীরে,
ধরম কদম্ব তলে।
মধুর সুন্দর, সুখ নটবর,
ভজ মন কুতূহলে॥

১

আবার শুনিতে পাই সেই সুধা রব যে
এ আঁধার নিশিতে !
তেমনি মধুর স্বরে, পরাণ শীতল করে,
সুশীতল জলে যেন জুড়াইছে তৃষিতে ॥

এই যে গভীর নিশি, অন্ধকার দশদিশি,
শশী হীন গগন মণ্ডল ।
ধরায় নাহিক রব, অচেতন জীব সব,
সমীরণ বহিছে কেবল ॥

এ হেন সময়ে আসি, কেরে বাজাইছ বাঁশী,
সুধারাশি বরষি শ্রবণে ।
এ রবে কি দুঃখ রহে, বাজাও বাঁশরী অহে,
কর স্নিগ্ধ এ তাপিত জনে ॥

বহুদিন শুনি নাই, এ জগতে কার ঠাঁই,
সুধাময় সঙ্গীত এমন ।
যত জ্বালা ছিল প্রাণে, বাঁশীরে তোমার গানে
একেবারে হইল মগন ॥

২

এই যে আবার দেখি কাল মেঘ আসিয়া
ছাইতেছে গগনে ।
কখন যেতেছে চলে, কখন মিলিছে দলে,
কালি দিয়া নভঃস্থলে আঁধারিছে ভুবনে ॥

প্রবল বহিছে বায়, থাকি থাকি শুনা যায়,
অস্ফুট সে মুরলির ধ্বনি ।
কভু কাছে কভু দূরে, কভুবা শ্রবণ-পুরে,
আবার নীরব যেন হতেছে অমনি ॥

ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝানিল ! —বাঁশীরব ফুরাইল,
আর নাহি পশিছে শ্রবণে ।
কি হ'ল অন্তর মম, তরঙ্গ তাড়িত সম
ভগ্ন তরী নিরাশা পুলিনে ॥

কেন বাঁশী বাজাইল, কেন প্রাণ হরে নিল,
কেন মন দিলেম তাহায় !
যে দারুণ দুঃখানলে, এখনো অন্তর জ্বলে
তবু তাহে পতঙ্গের প্রায় ॥

কুলকালিমা। কলিকাতা নন্দযন্ত্র। ত্রৈলোক্যনাথ দে এণ্ড কোং পাথুরিয়াঘাটা।

বঙ্গীয় কৌলীন্য প্রথা, এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। গ্রন্থখানির মুদ্রাকার্য্য অতি কদর্য্য হইয়াছে, দেখিয়া আপাততঃ অভক্তি জন্মে। কিন্তু এরূপ উৎকৃষ্টগ্রন্থ অধুনা বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর প্রকাশিত হইতে দেখা যায় না। গ্রন্থকার যে সকল গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সবিস্তারে সমালোচনার যোগ্য ; এবং সবিস্তারে সমালোচনা করিব বলিয়াই আমরা কয়মাস এই গ্রন্থখানি ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু তদুপযুক্ত অবকাশ এপর্য্যন্ত পাইলাম না, অথচ সাধারণ সমীপে এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের পরিচয় দিতে আর অধিক কাল বিলম্ব করা উচিত বোধ করি না।

গ্রন্থকার, কৌলীন্য প্রথার সংস্থাপক বল্লাল সম্বন্ধে, তাঁহার চরিত্র, এবং অভিপ্রায় সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। তাঁহার সকল কথার আমরা অনুমোদন করি না, কিন্তু যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার চিন্তাশীলতার বিশেষ পরিচয় দিতেছে। লেখক পুরাবৃত্তজ্ঞ, অতি যত্নে পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি যে বিশেষ সুশিক্ষিত, তাহা গ্রন্থ পাঠে পরিচয় পাওয়া যায়। অধুনা, অশিক্ষিত, বা অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত। এই লেখকের ন্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া আমাদিগের আহ্লাদ জন্মে।

স্থূল বিষয় ভিন্ন, এই গ্রন্থমধ্যে এমত অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা আছে, যে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি ভিন্ন, অসারগ্রাহীর নিকটে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই ; এবং যিনি সারগ্রাহী নহেন, তিনি বোধ হয় তাহার গৌরব বুঝিতেও পারেন না।

গ্রন্থের ভাষাটিও অতি মনোহর এবং সুকৌশল বিশিষ্ট। লেখক বিচক্ষণ লিপিদক্ষ। কিন্তু মুদ্রাকার্য্যের দোষে স্থানে স্থানে অশুদ্ধি লক্ষিত হয়।

বহুবিবাহ নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত কি না, এই বিষয়ে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠকদিগকে পড়িতে অনুরোধ করি।

গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করি, এ গ্রন্থের মধ্যে গীত এবং কবিতা কেন?

কাব্যানুবাদ। প্রথম ভাগ। পারিস রহস্য। কলিকাতা। মিনারভা যন্ত্র।

কতিপয় বন্ধু একত্রিত হইয়া কতকগুলি ইউরোপীয় কাব্যের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রথমে বিখ্যাত "Mysteries of Paris" নামক গ্রন্থের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহাও অদ্যাপি সম্পূর্ণ হয় নাই। আমরা ষাট পৃষ্ঠা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

গ্রন্থ যেখানে সম্পূর্ণ হয় নাই সেখানে সমালোচনার সময়ও উপস্থিত হয় নাই। তবে পরামর্শ দিবার এই উপযুক্ত সময় বটে। আমাদিগের পরামর্শ অনুবাদকেরা গ্রাহ্য করিবেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা বলায় হানি নাই। আমাদিগের বিবেচনায় পারিস রহস্য লইয়া আরম্ভ না করিলে ভাল হইত। পারিস রহস্য গ্রন্থ ভাল বটে, এবং রচনাশক্তির বিশেষ পরিচয় উহাতে আছে, কিন্তু উহাতে রুচির বিকৃতি জন্মে। রুচির বিকৃতি জন্মে, একথা বলার এমত উদ্দেশ্য নহে যে উহা অশ্লীলতাপূর্ণ, বা পাপের উদ্দীপক। তাহা নহে। কিন্তু উহাতে অদ্ভুতের অত্যন্ত বাহুল্য। অপ্রাকৃত অদ্ভুত উহাতে কিছু নাই—কিন্তু যাহা প্রকৃত অথচ অদ্ভুত, তাহারই অবতারণা ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ঈদৃশ গ্রন্থপাঠে রুচির এমন বিকৃতি জন্মে, যে পাঠকের অদ্ভুত ভিন্ন আর কিছু ভাল লাগে না—চিত্তশোধক বিশুদ্ধ কাব্যরসে ভক্তি থাকে না। বিশেষ গ্রন্থের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, উহা পাপের চিত্রে পরিপূর্ণ। ইউজীঁ স্যুর লিপিশক্তির গুণে সেই সকল চিত্রেরও একটু আকর্ষণী শক্তি ঘটিয়াছে। এই পারিস রহস্যে ইংলণ্ডে অতি কদর্য্য ফল ফলিয়াছে—ইহারই অনুকরণে রেণল্‌ড্‌স নামক গ্রন্থকারের "Mysteries of London" প্রভৃতি কদর্য্য গ্রন্থ সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের দেশের লোকের রুচি, আজি কালি এই সকল গ্রন্থেরই অনুসারিণী। তাঁহারা সৎকাব্যে ও রেণল্‌ড্‌সের কাব্যে প্রভেদ কি, তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন না। এমত অবস্থায় পারিস্ রহস্যের বাঙ্গালা অনুবাদারম্ভ দৃষ্টে আমরা দুঃখিত হইয়াছি। ইহা বঙ্গসমাজের দুর্ভাগ্য মনে করি। যদি অনুবাদকেরা "Bride of Lammermoor," "Kenilworth," "Ivanhoe," "Rienze," "Les miserables" প্রভৃতি কোন গ্রন্থ লইয়া কাব্যানুবাদ আরম্ভ করিতেন, আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইতাম।

ইহারা প্রকৃত অনুবাদ করিতেছেন না; যাহাতে এ দেশের লোকের পাঠোপযোগী হয়, তৎসাধনে চেষ্টা করিতেছেন। সে সঙ্কল্প উত্তম। কিন্তু স্থানে

স্থানে তাহাতে বড় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া উঠিতেছে। যথা ৩৬ পৃষ্ঠায়, পারিসে বসিয়া একজন ফরাশী বদমাস বলিতেছে, "বেশ্যার আবার মোন্দাগ্নি?" (!!) *

পরিশেষে বক্তব্য যে ইউজীঁস্যুর আশ্চর্য্য রচনা শক্তির কোন চিহ্ন এই অনুবাদে পাওয়া যায় না। একে ইহা মূল ফরাশী হইতে অনুবাদিত নহে,—মূলের ইংরাজি অনুবাদ হইতে অনুবাদিত, তাহাতে আবার ইহাও ইংরাজির যথার্থ অনুবাদ নহে—কতক অনুবাদ কতক "পুটিন" করা—সুতরাং ইহা ইউজীঁস্যুর গ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় অনুবাদকেরা এই কয়টি বিষয়ে সতর্ক হইলে ভাল হয়।

জয়দেব চরিত। শ্রীরজনী কান্ত গুপ্ত প্রণীত। জি, পি, রায় এণ্ড কোং ১৯৩০।

চরিত লেখক ভূমিকায় পাঠকের স্থানে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল না, অকালে কাল তাঁহারে গ্রাস করিতে আসিতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। আমরা জানি গ্রন্থকার একজন অল্পবয়স্ক ছাত্র ও সুলেখক, তাঁহাকে আমরা এ বয়সে হারাইলে বিশেষ দুঃখিত হইতাম; পাঠককে বলিতেছি নূতন গ্রন্থকার অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং আমরা ভরসা করি পাঠক তাঁহার দেখা মধ্যে মধ্যে প্রাপ্ত হইবেন।

জয়দেব চরিত গ্রন্থে কয়টী বিষয়ের আলোচনা আছে। কবির পরিচয়, তাঁহার ভাষার পরিচয়, কবিত্বের পরিচয় ও জয়দেব সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তী সকলের সমালোচন। প্রথমতঃ কবির পরিচয় সম্বন্ধে চরিত লেখক বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। তাহার প্রশংসা করি। অজয় নদের তীরস্থ কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলি গ্রামে জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন, একথা সকলেই জানেন। কিন্তু তিনি কত কালের লোক? এ প্রশ্নের উত্তর তত সহজ নহে।

রূপ, সনাতনের সনাতন বলেন যে, জয়দেব বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক।

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ। কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ।" এই শ্লোকটি লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপের দ্বারে প্রস্তর ফলকে খোদিত ছিল; ইহাতেও জয়দেবের নাম আছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্থের আরম্ভেও ঐ সকল নাম আছে। যথা

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিগিরাং, জানীতে জয়দেব এব শরণঃ

---

* "বেশ্যার আবার মন্দাগ্নি" লিখিলে কি ক্ষতি ছিল? ৩০ পৃষ্ঠায় দেখিলাম "[illegible]" লেখা আছে। ইত্যাদি

শ্লাঘ্যো দুরূহ দ্রুতে। শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয় রচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধনস্পর্দ্ধী কোপি নবিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ীকবি ক্ষ্মাপতিঃ॥

ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হয় যে, জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক। লক্ষ্মণ সেন কোন সময়ে রাজত্ব করেন?

ইতিহাসবেত্তা মিনহাজুদ্দীন বলেন ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন বখতিয়ার খিলিজি বঙ্গ জয় করেন তখন লক্ষ্মণিয়া নামে রাজা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন ও তিনি অশীতিবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। মার্শমান প্রভৃতি সাহেবেরা ইহাকেই লক্ষ্মণ সেন বলেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় দেখাইয়াছেন, যে লক্ষ্মণিয়া লক্ষ্মণ সেন নহেন, তিনি লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র। ও সম্ভবতঃ তাঁহার নাম লক্ষ্মণেয়। সুতরাং ১১২৩ হইতে ১২০৩ অব্দ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণেয়ের রাজত্বকাল। তাঁহার পূর্ব্বে লক্ষ্মণসেনের পর লক্ষ্মণ সেনের দুই পুত্র রাজা ছিলেন; তাঁহাদের রাজত্বকাল ন্যূনতঃ এক এক বৎসর করিয়া ধরিলে ১১২৩ অব্দে লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব শেষ হয়। আবুলফাজেল বলেন, তিনি ১১২৬ অব্দে বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহা হইলে তাঁহার রাজত্বকাল পাঁচ বৎসর হইল মাত্র। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থে লিখিয়াছেন, লক্ষ্মণ সেন কৈশোরাবস্থায় হলায়ুধকে সভাপণ্ডিত করেন, যৌবনকালে মহামাত্য করেন, ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মাধিকার করিয়াছিলেন। এ ত পাঁচ বৎসরের বিবরণ নহে, সুতরাং আবুল-ফাজেলের নির্দ্দেশ বাক্যে অবশ্য ভ্রম আছে। বল্লালসেন ১০৯৭ অব্দে দানসাগর গ্রন্থ প্রকাশ করেন; সম্ভবতঃ ইহার পরও তিনি আরও তিন চারি বৎসর জীবিত ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের অভিষেক কাল খ্রীষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর আরম্ভেই ধরিতে হইবে। ১১০১ হইতে ১১২১ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব কাল। জয়দেব এই সময়ের লোক। লাসেন অনুমান করেন গীতগোবিন্দ রচয়িতা খ্রীষ্টীয় সার্দ্ধৈকাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত ছিলেন। এইসকল প্রমাণ সঙ্কলন ও প্রদর্শন করিয়াও নূতন গ্রন্থকার বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে।

তিনি লিখিয়াছেন, "যদি প্রাচীন অনুকারক রচয়িতৃগণকে, অনুকৃত রচনার স্বত্ব ব্যবহৃত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে নিম্ন লিখিত প্রমাণানুসারে এল্‌ফিনষ্টোনের মত (অর্থাৎ যে জয়দেব চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক) কথঞ্চিৎ গ্রাহ্য হইতে পারে।". "বিদ্যাপতি যেরূপ চৈতন্য অপেক্ষা প্রাচীন, সেইরূপ জয়দেবও বিদ্যাপতি অপেক্ষা প্রাচীন।" খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভে চৈতন্য দেবের লীলা খেলা, তার একশতবৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতি, তার একশতবৎসর পূর্ব্বে জয়দেব; সুতরাং খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জয়দেবের আবির্ভাব অসম্ভাবিত নহে।

এ গুলি নিতান্ত অসার হেতুবাদ, অনেকেই অনুমোদন করিবেন না। গ্রন্থের এই ভাগটী সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রমপরিপূর্ণ।

দ্বিতীয়তঃ জয়দেবের রচনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন; "জয়দেবের রচনা, সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তিনী। 'চল সখি কুঞ্জং' প্রভৃতি বাক্য এ বিষয়ের প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল।"

বঙ্গদর্শনে* লিখিত হইয়াছিল "জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তিনী ভাষা।" "চল সখি কুঞ্জং" বলিলে নায়িকাকে আধ ঘোমটা টানা পেড়ে শাড়ী পরিহিতা বলিয়াই বোধ হয়। যেন বাঙ্গালীর মেয়ে বাঙ্গালা কথাই কহিল।" এতৎ সম্বন্ধে অন্য সমালোচন করিবার প্রয়োজন নাই।

তৃতীয়তঃ জয়দেবের কবিত্ব। এ বিষয়ে বোধ হয় দুই মত হইতে পারে না। গীতগোবিন্দ পৃথিবীর মধ্যে একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট গীত কাব্য।

চতুর্থতঃ প্রচলিত কিম্বদন্তীগুলি হইতে সুন্দররূপে অনুমিত হইতে পারে, যে জয়দেব কবি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, ধর্ম্মশীল ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম পদ্মাবতী। জয়দেবের মেলা অদ্যাপি হয়, তাহাতে বোধ হয় যে জয়দেব চৈতন্যর পূর্ব্বে একজন ধর্ম্ম সংস্কারক ছিলেন, গৌরাঙ্গের বেগবতী বাহিনীতে তাঁহার স্রোত পরে মিশাইয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞানসার। শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত। সংবৎ ১৯২৯।

গ্রন্থখানি দেখিয়া আমরা তুষ্ট হইয়াছি। পুস্তকের ভাষা সরল ও সম্পূর্ণ বিশদ। গ্রন্থকার পরিশ্রম করিয়াছেন ও অনেকগুলি পরিষ্কার উৎকট চিত্র দিয়া ব্যয় স্বীকার করিয়াছেন। পুস্তকখানি বিদ্যালয় সমূহের নিম্নশ্রেণীস্থ বালকদিগের সুন্দর পাঠোপযোগী পুস্তক হইয়াছে। গ্রন্থের প্রধান দোষ ইহার মনোবিজ্ঞান ভাগ। "বাহ্য বস্তুর" মতে বুভুৎসা, আসঙ্গ লিপ্সা, প্রভৃতি যতগুলি সনস্ত ধাতু আছে সকল গুলিই ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি। সেই মতের পুনর্ম্ম্রাঙ্কনের প্রয়োজন কি? "ধর্ম্ম করিলে চিত্তের প্রসন্নতা, অধর্ম্ম করিলে চিত্তের সঙ্কোচ ও অনুতাপ যে মনোবৃত্তি হইতে উপস্থিত হয়, তাহাকেই চৈতন্য কহে।"—না—আমরা ভরসা করি গ্রন্থকার মনোবিজ্ঞান ভাগ বিজ্ঞানসার হইতে একেবারে উঠাইয়া দিবেন।

আর একটি কথা আছে। গ্রন্থকার যেরূপ বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেইরূপ হওয়াই কি উচিত? তিনি সোডা না বলিয়া "সিতক্ষারদ" বলেন, পোতাস না বলিয়া "সিতক" বলেন অথচ পোতাস শব্দ সংস্কৃতে আছে।

---

* প্রথম খণ্ড ৩৭৭ পৃষ্ঠা।

এরূপ রীতি স্বদেশ ভাষা প্রিয়তা হইতে উৎপন্ন বটে কিন্তু তাহা স্বদেশ ভাষা প্রিয়তার ভ্রংশতা মাত্র। এইরূপ সংস্কৃত নিবিষ্টি হইতেই বঙ্গভাষার জারজত্ব সম্পাদন হয়, কাম্বেল সাহেব বলিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার কথার অর্থ নাই তথাপি এ কথা বলিতে পারা যায় যে এই এপিডেমিকগ্রস্ত দেশে সোডা, কুইনাইনের আর নূতন নামের সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? বাঙ্গালা পাঠশালে একবার সিতক্ষারদ শিখিয়া যাইয়া আবার ইংরাজি পাঠকালে শিখিতে হইল যে সিতক্ষারদ সোডাকে বলে মাত্র। যদি বলেন যে পূর্ব্বেই তাহা শিখান হইয়াছে মাত্র। আমরা জিজ্ঞাসা করি এরূপ দুই দুই শব্দ শিখাইয়া বালমস্তিষ্ক ভারগ্রস্ত ও অকর্ম্মণ্য করিবার আবশ্যকতা কি? বলিবেন ভাষার বিশুদ্ধতা যত্নে রক্ষণীয়া। যাহা অধিকাংশ লোকে বুঝে তাহাই ত ভাষা তাহার বিশুদ্ধতা সহজেই রক্ষিত হয়; পণ্ডিত চৌকিদারে মধ্যে মধ্যে তাহার লোপ করিবার চেষ্টা করেন। এরূপ পাণ্ডিত্য কদর্য্য। ভরসা করি বিজ্ঞানসারকার গ্রন্থের এই ভাগেরও সংশোধন করিবেন। আমাদের বিবেচনায় মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা ডিপার্টমেণ্টের শিক্ষকেরা বা ছাত্রেরা যেরূপ শব্দ অধ্যাপনায় বা শিক্ষাকালে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহারই প্রচার করা সাধারণের আপাততঃ কর্ত্তব্য।

লীলাবতী। শ্রেঢ়ী ব্যবহার পর্য্যন্ত উপরোক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। এখানি সাত আট বৎসর হইল মুদ্রিত হইয়াছে গ্রন্থকার সমালোচন জন্য বিজ্ঞানসারের সহিত পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে কেবল পাটীগণিত আছে মাত্র। প্রত্নপ্রিয় মহাশয়গণ ব্যতীত এই গ্রন্থে কাহারও কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। ভাস্করাচার্য্য শ্রেঢ়ী ব্যবহারে যে সকল জটিল নিয়ম দিয়াছেন সে সকল অতি আশ্চর্য্য বটে কিন্তু এক্ষণে লগারিথিম উদ্ভাবনের পর কে আর সেই সকল নিয়মের অনুসারী হইয়া সময় নষ্ট করিতে যাইবে? তবে যে সকল পুরাণ-প্রিয় মহোদয় হিন্দু গণিতের উন্নতি অবনতি পর্য্যালোচনা করিবেন তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম গুলি বিশেষ উপকারী বটে। সেরূপ লোক এ বাঙ্গালায় কয়জন আছেন? যাঁহারা আছেন তাঁহারা কি সংস্কৃত জানেন না যে এই অনুবাদের সাহায্যগ্রহণ করিবেন? সুতরাং এরূপ অনুবাদিত গ্রন্থের প্রয়োজনাভাব। বীরেশ্বর বাবুর যদি অর্থ প্রাপ্তি গ্রন্থ প্রকাশের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে তিনি এরূপ অনুবাদ প্রচারে বিরত হউন। আর যদি তিনি সঙ্গতিপন্ন লোক হয়েন তাহা হইলে লীলাবতীর শেষ ভাগের ও ক্ষেত্র ব্যবহার ভাগের অনুবাদ প্রচার করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞের অনুসন্ধানস্পৃহতা, কৌতূহল ও পুরাণ প্রিয়তার চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ উপকার করুন। এরূপ উপকার করিলে পুণ্য বই পাপ হইবে না।

"বৈদিকী হিংসা হিংসা ন ভবতি"। প্রহসন, চার অঙ্কোমে। উভয় গ্রন্থই বারাণসীতে মুদ্রিত হইয়াছে, যদিও ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশক ও বিভিন্ন যন্ত্রে মুদ্রিত উভয়েরই নাম পত্রে লিখিত আছে "হাস্য রসিকোঁকে আনন্দার্থ" প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতেই আমাদের মনে কিছু সন্দেহ হয় গ্রন্থের স্থানে স্থানে দেখিয়া সে সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে। যে হাস্য রসে তাড়ীর দোকানে ঢেউ খেলায় প্রকাশক দ্বয় সেই রসের বিস্তৃতি জন্য পুস্তিকার অবতারণা করিয়াছেন। যেখানে গ্রন্থকার নাই মুদ্রাযন্ত্র আছে সেখানে অবশ্যই এইরূপ ঘটিবে। বটতলার রসের তরঙ্গ আমরা একটু একটু কাটাইয়া উঠিতেছি এখন সেই তরঙ্গ বারাণসীতে বিক্রম বিস্তার করিতেছে। যে তরঙ্গ হিল্লোলে হুতোমের আত্মভূত ভাইগণ লীলা খেলা করিয়া বেড়াইতেছিলেন, "শনিবারের বড় মজা" "সোমবারের বড় দায়" প্রভৃতি অপরূপ গ্রন্থ কলাপ যে রুচির পরিচয়; সেই তরঙ্গেই খোট্টার দল নাচিয়া উঠিয়াছেন, সেই রুচিরই পরিচয় দিতে বসিয়াছেন। "জম্বীর নীর পরিপূরিত মৎস্য খণ্ডে" "বৈদিকী হিংসা" এইরূপ সারগর্ভ সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন;—রাগ কাম্বরা তাল চর্চ্চরী। ধন্য রে লোগ যে মাংস খাতে। মচ্ছ বকরা লরা শশক হরনা চিড়া ভেড় ইত্যাদি নিত চাড জাতে॥

এইরূপ তালে এইরূপ ভাবার্থ কবিত্ব ব্যঞ্জক গান সকল রচনা করিয়াছেন। হিন্দুস্থানীরা লেখা পড়া শেখেনা আর এখন কে বলিবে? স্থানে স্থানে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে ও তাহারা বাঙ্গালীর মত কেতাব লিখিতে শিখিল। এইবার তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বর্ত্তমান অবস্থা
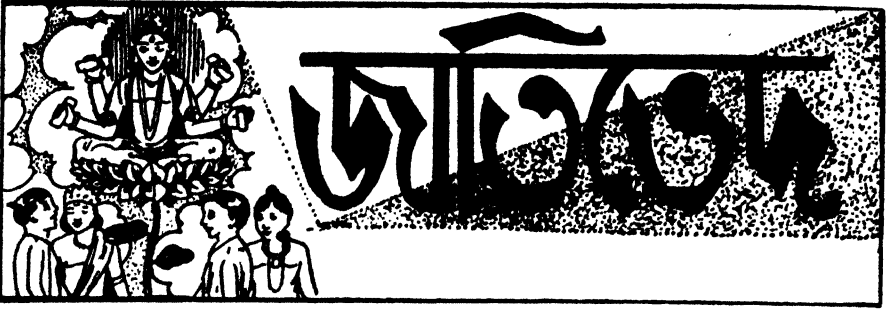
এতদ্দেশস্থ জাতিগণ যে কত শ্রেণিতে বিভক্ত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ গৌড়ীয়, দ্রাবিড়াদি কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণেরা, কান্যকুব্জ সারস্বত, গৌড়ীয় ইত্যাদি অবান্তর শ্রেণিতে বিভক্ত। রেভরেণ্ড সেরিং সর্ব্বশুদ্ধ এইরূপ ৩৫টী শ্রেণি গণনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরা উপরি লিখিত কান্যকুব্জ শ্রেণির অন্তর্গত। যথা বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয়। তদ্ব্যতীত বৈদিকেরা স্বতন্ত্র। বৈদিক শ্রেণির মধ্যে দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বলিয়া দুই শ্রেণি। ইহার অতিরিক্ত যে সকল থাক আছে সেগুলি প্রসিদ্ধ নহে।

ফলতঃ মনুষ্যবর্গের শ্রেণিবিভাগ করিতে হইলে উত্তরোত্তর শ্রেণির মধ্যে শ্রেণি হইয়া বহুসংখ্যক এবং নানাবিধ অবান্তর শ্রেণি অবশ্যই উৎপন্ন হইবেক। এইজন্য এক এক প্রকার শ্রেণির এক একটী পৃথক্ নাম থাকা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগকে যদি "জাতি" বলা যায় তাহা হইলে রাঢ়ীয় বারেন্দ্র এবং বৈদিক দিগের প্রতি "জাতি" শব্দ প্রয়োগ করা অন্যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণাদি শ্রেণি গুলিও অপর কোন শ্রেণির অন্তর্গত বটে; তাহার নাম কি? যদি বল "হিন্দু" তবে সেই হিন্দু শব্দের উত্তর আবার জাতি পদ কিরূপে ব্যবহার করা যাইবেক?

ইংরাজিতে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শ্রেণি বুঝাইবার জন্য তিনটী পৃথক্ নাম আছে, যথা race, nation এবং caste। এই তিনটীর স্থলেই এক মাত্র জাতিশব্দ প্রয়োগ করিলে অর্থের ব্যত্যয় হয় না। কিন্তু তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি বিভাগের কিঞ্চিৎ গোলযোগ হয়। এইজন্য আমরা প্রস্তাব করি, যে,

race শব্দে "বংশ" nation শব্দে "জাতি" এবং caste শব্দে "বর্ণ" শব্দ ব্যবহৃত হয়। আমরা প্রস্তাব করিলাম বলিয়াই যে এই প্রবন্ধের সর্ব্বত্র ঐরূপ অর্থ রক্ষা করিয়া শব্দ কয়েকটী প্রয়োগ করিব এমত নহে। কেবল যেখানে প্রভেদ প্রদর্শন করা আবশ্যক সেই খানেই ঐ শব্দগুলি উল্লিখিত অর্থে নিযুক্ত হইবে।

পাশ্চাত্য পুস্তকাদিতে আমাদিগকে আর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া সর্ব্বদা বর্ণিত হইয়া থাকে। কিন্তু সংস্কৃত কালেজের একজন প্রধান অধ্যাপক আমাদিগকে বলিয়াছেন, যে "সংস্কৃত পুস্তকে 'আর্য্য' শব্দ কোন সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যবহার হয় নাই। যেখানে উক্ত শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, সেখানে উহার অর্থ 'ধার্ম্মিক'।" 'আর্য্য' শব্দের আভিধানিক অর্থ এই।

"কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বা আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥"

শ্রীযুক্ত তারানাথ বাচস্পতির সংস্কৃত অভিধান।

অর্থ। "যাহারা কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে অকর্ত্তব্য কর্ম্মের আচরণ করে না এবং প্রকৃত আচারনিষ্ঠ তাহাদিগকে 'আর্য্য' কহে।"

পাশ্চাত্য ভাষাতে ঐ শব্দের মর্ম্ম এই যে পূর্ব্বকালে এতদ্দেশের চাতুর্ব্বর্ণ জাতি, এবং গ্রীক, জেন্দভাষী এবং জরমান আদি কতিপয় জাতি সকলেই এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই আদিম মৌলিক জাতির নাম আর্য্য। কল্পনাটি সত্য হউক বা না হউক এতদর্থে আর্য্য শব্দের পরে "বংশ" পদ প্রয়োগ করিলে ক্ষতি নাই।

কিন্তু আমাদিগের জাতি নাম (nationality) কি? আর্য্য বলিলে দুই দোষ হয়। প্রথমতঃ যে পদার্থের নাম আর্য্য বলিয়া স্থির হইতেছে তাহা কল্পনা মাত্র। এই নামের কোন পাত্র যে কখন পৃথিবীতে ছিল, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। অতএব ঐ নাম দিয়া আমাদিগের জাতি ব্যক্ত করিলে সেই কল্পনাকে চিররক্ষিত প্রত্যক্ষ বস্তু বলিয়া বোধ হইবেক। অপর, আর্য্য নামের মধ্যে এতগুলি অবান্তর শ্রেণি পরিগণিত হইতে পারে যে তাহার মধ্যে অনেক শ্রেণির সহিত আমাদিগের বাহ্যিক কোন সম্বন্ধই দৃষ্ট হইবেক না, এবং সেই সকল শ্রেণির পৃথক্ পৃথক্ জাতি-নাম বিদ্যমান আছে। অতএব আমাদের জাতিনাম আর্য্য না হইয়া বংশ নাম আর্য্য বলাই ভাল।

যদি বল আমাদিগের জাতি নাম "হিন্দু" তাহাতেও দোষ হয়। হিন্দু শব্দ "সিন্ধু" নাম হইতে উৎপন্ন। ইহার এক অর্থে সিন্ধু ব্রহ্মপুত্রের অন্তর্গত সমগ্র ভারতবাসিগণকে বুঝাইতে পারে। কিন্তু অনেক খ্রীষ্টান ও মুসলমান হিন্দুস্থান মধ্যে বাস করিয়াও হিন্দুপদে বাচ্য নহেন। বস্তুতঃ হিন্দু শব্দটী ধর্ম্ম বোধক। এক

জাতীয় লোক সকলেই যে এক ধর্ম্মাক্রান্ত হইবেক তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব জাতি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত হিন্দু শব্দ প্রয়োগ করা যায় না।

বাস্তবিক বঙ্গীয় মুসলমানের অধিকাংশ হিন্দুবংশোদ্ভব, এবং ইহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা রাজপ্রভাবে সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই। প্রাচীন পাঠান এবং মোগল বংশীয় মুসলমানেরা যদি বাঙ্গালাতে থাকেন তাঁহারাও ক্রমশঃ উপরোক্ত মুসলমানদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া হিন্দুরক্ত ধারণ করিতেছেন। অতএব কেবল ধর্ম্মভেদ এবং পূর্ব্বকালীন মনোমালীন্য হইতেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পৃথক্ ভাব রহিয়াছে। এই সকল কারণে আমরা বলি যে আমাদিগের জাতি নাম হিন্দু নহে "বাঙ্গালি।" হিন্দু পদ ধর্ম্ম বিশেষের বিশেষণ মাত্র।

অনন্তর বাঙ্গালি শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হইবেক ; যেন ইহাতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই অনায়াসে পরিগণিত হইতে পারে।

যাঁহারা স্থির চিত্তে ইদানীন্তন জরমান জাতির অদ্ভুত উন্নতি, পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা জাতিত্বের লক্ষণ নির্ণয় করিবার জন্য বিশেষ ক্লেশ পাইবেন না। ভাষাই জাতি বিষয়ক ঐক্যের মূল। যাহারা মাতৃক্রোড় হইতে এক ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, যাহারা নিরন্তর উক্ত ভাষাতে চিন্তা করে, এবং যাহারা স্বভাবতঃ একই ভাষাতে আলাপ করে, তাহারা সকলেই এক জাতি ; সকলেই ভ্রাতৃত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং পরস্পরের দোষগুণজনিত খ্যাতি নিন্দার ভাগী।

অনেকানেক খ্রীষ্টান এবং ইংলণ্ডদর্শী বাঙ্গালিকে স্বজাতিত্যাগের দোষ দিলে, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, যে "তোমরাই আমাদিগকে বিধর্ম্মী এবং অনাচারী বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু মাতৃভূমি বঙ্গদেশ এবং সমগ্র বাঙ্গালি জাতির প্রতি আমাদিগের মায়া কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই।" এবিষয়ে বিস্তর বাদানুবাদ হইয়াছে ; কিন্তু আমাদিগের বিবেচনা এই যে ইহাঁদিগের ভাষা কি তাহা স্থির হইলেই জাতি নির্ণীত হইবেক।

মনুষ্যগণ সকলেই পৃথক, কিন্তু নানাবিধ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের ঐক্য সংস্থাপন করেন। যাহারা একজাতি বলিয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে তাহারা অপূর্ব্ব স্নেহরসে আর্দ্রিত হয়। অতএব যাহাতে এতদ্দেশের নানাবিধ লোক পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে, এরূপ কোন উপায় অবলম্বন করিয়া আমাদিগের জাতি নিরূপণ করা আবশ্যক।

আমরা বাঙ্গালি জাতি। ভালই হই আর মন্দই হই, আমরা বাঙ্গালি। বাঙ্গালিগণ বঙ্গ নাম ঘৃণা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহার হেতু কেবল আত্মগ্লানি-

জনিত তীব্র দুঃখ। বস্তুতঃ, বাঙ্গালিরা যে বাঙ্গালিদিগকে মন্দ বাসেন এমত নহে। যদি কেহ বাল্যকালে বিদ্যার প্রতি অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া প্রবীণ বয়সে সমস্ত অলস বালকের প্রতি কটূক্তি করেন তাহা হইলে তাঁহার স্নেহহীনতা প্রকাশ হয় না। সেইরূপ বাঙ্গালির মুখে বাঙ্গালির নিন্দা নির্ম্মমতার লক্ষণ নহে, নিদারুণ ক্ষোভের ফল মাত্র। যদি কখন আমাদিগের বংশাবলী ধরাতলে স্বজাতির মহিমা প্রকাশ করিতে পারে তখন আর বাঙ্গালি নাম হেয় হইবেক না। কিন্তু বাঙ্গালিরা যদি পরস্পরের প্রতি জাতি স্নেহে আসক্ত না হয়েন তবে কখনই আমাদিগের গোষ্ঠীবর্গ বঙ্গ নাম উজ্জ্বল করিতে পারিবেন না। অতএব বাঙ্গালি মাত্রেই একজাতি এই সংস্কার এই সময় হইতে আমাদিগের মনে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

বাঙ্গালিরা ভবিষ্যতে স্বনামে ধন্য হইবেক এতদপেক্ষা মহৎ কামনা আর কি হইতে পারে? কিন্তু সেই কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত কি উপায় অবলম্বিত হইতেছে? আমরা দেখিয়াছি যে কৃতবিদ্য যুবকই হউন আর বিচক্ষণ ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপকই হউন, সকলেই মুসলমানের নামে খড়্গাহস্ত। কিন্তু মুসলমানদিগকে বাঙ্গালি জাতি হইতে বর্জ্জন করিলে আমাদিগের দেহের অর্দ্ধেক পরিত্যক্ত হইবেক। যে ব্রহ্মার শরীর হইতে চতুর্ব্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছিল এখনকার হিন্দু মুসলমানেরাও সেই ব্রহ্মার অঙ্গ। অতএব পরস্পরের মধ্যে সৌহৃদ্য বাঞ্ছনীয়।

মুসলমানদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দুগণের উপরে আধিপত্য করিয়াছেন। তৎকালে একপক্ষ প্রধান এবং অপর পক্ষ অধীন ছিলেন। একপক্ষের পীড়ন দ্বারা অন্য সম্প্রদায় উত্যক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন ত, আর সেরূপ নাই এখন উভয়েই ভিন্ন রাজার অধীন এবং তুল্য সুখদুঃখ ভোগী। এখনও কি সেই অতীত কালের কথা স্মরণ করিয়া পরস্পরের বৈরসাধন করিতে হইবেক? যদি পুরাতন কুসংস্কার পরিত্যাগ করা এতই কঠিন হয় তবে বিদ্যোপার্জ্জনের ফল কোথায়? রাজদ্বার এবং শ্মশানে কেবল বন্ধু পরীক্ষা হয় এমত নহে, বন্ধুলাভও হইতে পারে। বাঙ্গালিগণ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। যদি এখনও হিন্দু মুসলমান জাতি পরস্পরের সহায়তা করেন তবে গাঢ় বন্ধুতা অবশ্যই জন্মিবে। আকবরের চেষ্টা পণ্ড হইয়াছে কিন্তু তাঁহার সেই মহীয়সী বাসনাও কি তাঁহার দেহের সহিত সমাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে? ভরসা করি ভারত কবিগণ হিন্দু মুসলমানকে অকৃত্রিম প্রণয়ে আবদ্ধ করিবার জন্য দেবী সরস্বতীরে আরাধনা করিবেন।

ফলতঃ প্রাগুক্ত সম্প্রদায়দ্বয়ের প্রতি একান্ত অনুরোধ এই, যে তাঁহারা আমাদিগের ধর্ম্ম আচার ও পরিচ্ছদ ত্যাগই করুন, ইউরোপের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া আমাদিগের দেশ এবং আমাদিগের চরিত্রের নিন্দাই করুন, আর পুণ্য ভূমি

ইংলণ্ডকে স্বদেশ (Home) বলিয়া সম্বোধনই করুন, কিন্তু তাঁহাদিগের সন্তানবর্গকে যেন মাতৃক্রোড়ে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা না দেন। যদি তাঁহারা আমাদিগের মায়া ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহাতে আমরা ক্ষুব্ধ হইব বটে; কিন্তু যদি তাঁহারা উক্ত প্রণালীতে আত্ম বংশাবলীকে বঙ্গমাতার ক্রোড় হইতে অপহরণ করিয়া প্রকৃতরূপে উহাদিগের জাতি পরিবর্ত্তন করেন, তবে তাঁহাদিগের মুখাবলোকন না করাই ভাল।

জাতি শব্দে একভাষী, এবং "বংশ" নামক শ্রেণীর অবান্তর শ্রেণী স্থির হইল। সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদিকে বর্ণ বলাই শ্রেয়ঃ। বঙ্গভাষী হিন্দুদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যবর্ণ পাওয়া যায় না, এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য সকলে শূদ্র নামে গণ্য। অতএব শূদ্রগণকে একটী বর্ণ বলিলে, কায়স্থ নবশাক আদিকে নামান্তর দ্বারা ব্যক্ত করা বিহিত হইবেক; কিন্তু পরে প্রদর্শিত হইবেক, যে প্রকৃত শূদ্র বর্ণ এখন পাওয়া যায় না। জাতি নামে যত শ্রেণী দেখা যায়, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর সকলেই বর্ণ সঙ্কর। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মধ্যে যেরূপ ভেদ, ভিন্ন ভিন্ন শূদ্র শ্রেণীগণের মধ্যেও এখন সেইরূপ ভেদ দৃষ্ট হয়। অতএব কায়স্থাদি সকলকে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ বলিয়া তৎসমুদায়ের প্রতি শূদ্র শব্দের পরিবর্ত্তে "শূদ্রবর্ণ সমূহ" পদ প্রয়োগ করিলে, কিছু ক্ষতি দেখা যায় না। ব্যাকরণ মতে সঙ্কর জাতির প্রতি বর্ণ পদ প্রয়োগ করা অবিহিত হইতে পারে; কিন্তু প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তাহা স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গভাষিগণের মধ্যে যত বর্ণ আছে, তাহার গণনা করিবার জন্য বিভর্লি সাহেবের লোকসংখ্যা রিপোর্ট ভিন্ন শ্রেষ্ঠতর উপায় দৃষ্ট হয় না। সংস্কৃত শাস্ত্রে যে সকল সঙ্কর বর্ণের নাম দেখা যায়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য। যে সকল বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কতকগুলির শাস্ত্রীয় নাম অপভ্রংশ হওয়াতে এবং শাস্ত্রোক্ত ব্যবহারের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হওয়াতে, তদ্বিষয়ের কোন নিশ্চিত মীমাংসা করা দুষ্কর। প্রাগুক্ত রিপোর্টে যত বর্ণের নাম প্রকাশ হইয়াছে, তৎসমুদায় পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না; কারণ অনেকানেক বর্ণ কেবল বিশেষ বিশেষ জেলাতেই পাওয়া যায়। এই জন্যে যাঁহারা ঐ সকল জেলার বিষয় অবগত নহেন, তাঁহারা প্রাগুক্ত বিশেষ বিশেষ বর্ণের পরিচয়ও প্রাপ্ত হয়েন না। হাদি হোতৃ (Hadi-hotri) নামক বর্ণ, যে বঙ্গভাষী ইহা আমরা কখনই সহজে মনে করিতে পারিতাম না; কিন্তু লোকসংখ্যা রিপোর্টে প্রকাশ যে ঐ বর্ণ কেবল মৈমনসিংহে আছে। অতএব কাজেকাজেই উহাদিগকে, বঙ্গভাষী বলিয়া মনে করিতে হইবেক। এইরূপ দুই তিন জেলা বাসী, নানা জাতি আছে; তাহাদিগের পরিচয় কেবল লোক সংখ্যার রিপোর্টেই পাওয়া যায়।

কিন্তু বিভর্লি সাহেব বঙ্গভাষিগণকে পৃথক্ করিয়া গণনা করেন নাই। সুতরাং হিন্দু এবং অৰ্দ্ধ হিন্দু নামক দুই শ্রেণীতে, তিনি যে ৯৪টী বর্ণের নাম করিয়াছেন, তাহার কোন্গুলি বাঙ্গালি এবং কোন্গুলি অন্য ভাষী তাহা স্থির করা যায় না; কিন্তু কতকগুলি যে বঙ্গভাষী নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য লোক সংখ্যার রিপোর্ট আমাদিগের নিন্দার ভাজন হইয়াছে। বিভর্লি সাহেব Ethnology শাস্ত্রানুসারে, বঙ্গবাসীদিগের শ্রেণী বিভাগ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু উক্ত শাস্ত্রের বিধি সমগ্র অদ্যাপি সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। তদ্ভিন্ন ঐ সকল বিধি অনুসারে কতকগুলি লোকের বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়া, তাহাদিগের জাতি বা বংশ নির্ণয় করা অতীব কঠিন কার্য্য এবং ইহাতে নানা প্রকার মতভেদ উপস্থিত হইতে পারে। লোক সংখ্যার রিপোর্টে এরূপ বিভাগ করা কর্ত্তব্য যে, সকলে তাহা সহজে বুঝিতে পারে। অনন্তর তাদৃশ শ্রেণীর উৎপত্তি স্থির করা প্রয়োজন হইলে, তাহার ভার Ethnology শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের হস্তে সমর্পণ করাই যুক্তি সিদ্ধ।

বিভর্লি সাহেব লিখিয়াছেন যে "বাঙ্গালাতে (অর্থাৎ লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অধিকার মধ্যে) যে সকল বর্ণ এবং শ্রেণী পাওয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা সহস্র অপেক্ষা ন্যূন হইবেক না। আর যদি উহাদিগের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে গণনা করা যায়, তাহা হইলে সমুদায়ের সংখ্যা বহু সহস্র হইবেক। • • • এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের বর্ণ ও শ্রেণী পৃথক্ রূপে প্রকাশ করা গিয়াছে। ইহাতে মনুকৃত চির প্রতিপালিত চাতুর্ব্বর্ণ ভেদের পরিবর্ত্তে ব্যবসা ভেদের প্রতি দৃষ্টি করা গিয়াছে।" ইহাতেই বঙ্গভাষী ব্রাহ্মণগণ হিন্দিভাষীর মধ্যে এবং হিন্দীভাষিগণ বঙ্গভাষীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন!

যাহা হউক এই নিয়মানুসারে মেং বিভর্লি সমস্ত বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীকে, বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, ছোট নাগপুর এবং আসাম এই পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অনন্তর নিজ বঙ্গবাসিগণের মধ্যে এই কয়েকটী ভাগ করিয়াছেন। যথা ১। আসিয়া বহির্ভূত জাতি। ২। মিশ্র (ইউরোপ এবং আসিয়া মিশ্রিত জাতি।) ৩। আসিয়া আন্তর্গত জাতি।

আসিয়া অন্তর্গত জাতি সমূহ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—১। ভারতবর্ষ এবং ব্রিটিশ বর্ম্মা বহির্ভূত। ২। ভারতবর্ষ এবং ব্রিটিশ বর্ম্মা অন্তর্গত।

এই পর্য্যন্ত বাস অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু নেপালি এবং মণিপুরী জাতিগণকে ভারতবর্ষ ও ব্রিটিশ বর্ম্মা বহির্ভূত বলিয়া গণ্য করা অন্যায় হইয়াছে।

অনন্তর বিভর্লি সাহেব ভারতবর্ষ ও ব্রিটিশ বর্ম্মাবাসীদিগকে এইরূপে

বিভাগ করিয়াছেন, যথা। ১। আদিম অসভ্য বংশ (গারো, কোল, নেপচান, ইত্যাদি) ২। অৰ্দ্ধ হিন্দু যথা বাগ্দী, বেদিয়া, চণ্ডাল, ডোম, ইত্যাদি। ৩। হিন্দু। ৪। যাহারা হিন্দু কিন্তু বর্ণভেদ মান্য করে না, যথা বৈষ্ণব ও খ্রীষ্টান। ৫। মুসলমান, ৬। ব্রহ্মবাসী (মগ)

এই বিভাগগুলি নিতান্ত অযৌক্তিক। কোন্ জাতি আদিম এবং কাহারা আধুনিক এ বিষয় জাতি সম্বন্ধীয় বিশেষ পুস্তকে আলোচনা করিলে ক্ষতি নাই এবং তদুপলক্ষে লোক সংখ্যার রিপোর্ট বিশিষ্টরূপে কার্য্য কারক হইতে পারে। বিভর্লি সাহেব স্বয়ং উক্ত বিষয়ের মীমাংসা করাতে সর্ব্বসাধারণ তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন কি না সন্দেহের স্থল, কারণ লোকে এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ Ethnology শাস্ত্রজ্ঞদিগেরই অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করে। তাঁহার নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিবার বাসনা থাকিলে পুস্তকান্তরে তাহা চরিতার্থ করাই কৰ্ত্তব্য ছিল। লোক সংখ্যার উদ্দেশ্য এই যে সকলেই দেশের অবস্থা বুঝিতে পারিবে ইহাতে কোন ব্যক্তির এমত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করা কৰ্ত্তব্য নহে যে তাহাতে সামান্য লোক হতবুদ্ধি হইয়া যায়। এ স্থলে বিদেশীয় পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা মতে বঙ্গভাষিগণের অঙ্গহীন করিয়া কতকগুলি লোককে হিন্দু সমাজ বহির্ভূত আদিম জাতি বলিয়া গণনা করা কোন মতেই সঙ্গত হয় নাই। কাহারা পূর্ণ হিন্দু এবং কাহারা অৰ্দ্ধ হিন্দু অন্ততঃ এই বিষয়টীর বিচার প্রকৃত হিন্দুগণের হস্তে সমর্পণ করাই কৰ্ত্তব্য ছিল।

শ্রেণির গর্ভে শ্রেণি বিভাগ করিতে হইলে তাহার নিয়ম এই যে গর্ভস্থ শ্রেণি সমূহের লক্ষণ দৃষ্টে তন্মধ্যে যে সামান্য লক্ষণ পাওয়া যায় তদনুসারে ব্যাপক শ্রেণি সংস্থাপন করিতে হয়। আর কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণি লইয়া তাহার অবান্তর শ্রেণিগুলিকে পৃথক করিতে হইলে গর্ভস্থ শ্রেণিগুলির বিভিন্নতা বিষয়ে ঐক্য রক্ষা করিতে হয়। যেমন পুষ্প—ইহার শ্রেণি বিভাগ করিতে হইলে শ্বেত নীল লাল ইত্যাদি অথবা সুগন্ধ, নির্গন্ধ, দুর্গন্ধ, অথবা শীত বসন্ত বর্ষা ইত্যাদি কালের পুষ্প এইরূপ নানাপ্রকার অবান্তর শ্রেণি হইতে পারে কিন্তু বিভাগের সময়ে বর্ণ অথবা গন্ধ অথবা ঋতু এইরূপ কোন একটী বিষয় স্থির করিয়াই তদনুসারে বিভাগ নিষ্পন্ন করিতে হয়। নতুবা একাধিক প্রণালী অবলম্বন পূৰ্ব্বক যদি পুষ্প জাতির এইরূপ শ্রেণি করা যায়, যথা ১ শ্বেত পুষ্প ২ কণ্টক বিশিষ্ট পুষ্প ৩ সুগন্ধ পুষ্প ৪, বর্ষাকালীন পুষ্প। তাহা হইলে শ্রেণিবিভাগ দ্বারা লোকের বিবেচনার সাহায্য না হইয়া বরং মহা বিঘ্নই জন্মে। বিভর্লি সাহেব ঠিক এইরূপ করিয়াছেন।

তাঁহার অৰ্দ্ধে কতকগুলি বর্ণ ধৰ্ম্ম অনুসারে কতকগুলি উৎপত্তি

অনুসারে এবং কতকগুলি নিবাস ভূমি অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ হইয়াছে। এরূপ তালিকা যিনি প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি এই কার্য্য নির্ব্বাহের পক্ষে নিতান্ত অযোগ্য।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে একটি কল্পনা আছে যে আর্য্য বংশীয়েরা দেশান্তর হইতে ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক ক্রমশঃ আদিম নিবাসিগণকে তাঁহাদিগের মতাবলম্বী করিয়াছেন। এই কল্পনানুসারে লোক সংখ্যার B. চিহ্নিত পঞ্চম ফর্দ্দে (V. B.) ১ আদ্যবংশ, ২ অর্দ্ধ হিন্দু এবং ৩ হিন্দু এই তিনটী শ্রেণি হইয়াছে। আবার ধর্ম্ম অনুসারে (৩) হিন্দু (৪) বৈষ্ণবাদি ও (৫) মুসলমান এই তিনটী শ্রেণি হইয়াছে এবং পরিশেষে ষষ্ঠ শ্রেণিতে মগজাতি, তাহাদিগের আদি নিবাস অনুসারে পরিগণিত হইয়াছে। হয়ত বিভলি সাহেব মনে করিয়াছেন যে সাঁওতাল নেপচান ইত্যাদি জাতিগণের কেহ মুসলমান বা খ্রীস্টান ধর্ম্মাক্রান্ত নহে। যদি একথা সত্য হয় তবে তাহা ফর্দ্দে দেখাইলেই আমরা নিতান্ত বাধিত হইতাম। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের অর্থ করা ভার, একথা বিভলি সাহেব নিজেও স্বীকার করিয়াছেন তবে সাঁওতাল মগেরা যে হিন্দু নহে এবং হাড়ি বাগ্দির ধর্ম্মের অর্দ্ধাংশ হিন্দু, একথা তিনি কোথায় পাইয়াছেন? আর বাঙ্গালি খ্রীষ্টানগণ যে, কি গুণে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত একত্রিত হইল; তাহা বুঝিবার জন্য বোধ হয়, পুণ্য ভূমি ইংলণ্ড দর্শন করা আবশ্যক।

ভাষা অনুসারে শ্রেণি বিভাগ করিলে উল্লিখিত বিভাগ দোষ হইত না এবং আর একটি দোষ পরিত্যক্ত হইতে পারিত।

লোক সংখ্যার রিপোর্টে এত কথা পাওয়া যায় কিন্তু বঙ্গভাষীর সংখ্যা কত তাহা নিরাকৃত হয় নাই।

এই কথা অভিনব নহে। মিসনরি সাহেবেরা ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিয়াছেন। ইহাতেই বোধ হয় যে লোকসংখ্যা কালে বঙ্গভাষার বিস্তার প্রদর্শন করণের অভিপ্রায় ছিল না। যেখানে দেখা যাইতেছে যে হিন্দু মুসলমান ভেদ দেখাইবার জন্য এত যত্ন সহকারে একটী মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে যে তাহাতে প্রতি জেলাতে উহাদিগের পরস্পরের হার ,হারি সংখ্যা মূর্ত্তিমান্ দেখিতে পাওয়া যায় এবং যখন এই রিপোর্ট প্রকাশ হইবার এত অল্পকাল মধ্যেই বঙ্গভাষী মুসলমানদিগকে উর্দ্দূভাষী করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের বিশেষ যত্ন দেখা যাইতেছে সেখানে আমরা এ কথা মনে করিতে পারি না—যে কেবল বিস্মৃতি ক্রমেই বঙ্গভাষীদিগের সংখ্যা ও নিবাস প্রদর্শিত হয় নাই। ফলতঃ মুসলমানগণ আপাততঃ রাজ প্রসাদে মুগ্ধ হইয়া কিছুদিন বঙ্গভাষার পরিবর্ত্তে উর্দ্দূ অবলম্বন করিতে পারেন কিন্তু পরিণামে সমস্ত বঙ্গভাষিগণের

সহিত এক জাতিত্ব সংস্থাপন জন্য তাঁহারা অবশ্যই পুনর্ব্বার বঙ্গভাষার সমাদর করিবেন।

সত্য বটে সাঁওতাল জাতিগণের মধ্যে নানা ভাষা প্রচলিত আছে। ঐসকল ভাষা রাজকর্ম্মচারিগণের বিদিত নহে এবং তদনুসারে শ্রেণি বিভাগ করা কঠিন; কিন্তু যাহাদিগের ভাষাগুলি কথঞ্চিৎ অভ্যস্ত হইয়াছে তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া, অবশিষ্ট অজ্ঞাত ভাষার বক্তা জাতিগণকে এক শ্রেণি করিলে ক্ষতি হইত না।

এ বিষয়ে বাহুল্য লেখার প্রয়োজন নাই। যদ্যপি ভবিষ্যতে কোন লোক সংখ্যা হইবার সময় এই সকল আপত্তি কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের বিবেচনার স্থল হয় তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত লেখা গিয়াছে তাহাতেই তাঁহাদিগের চেতনা হইবেক নতুবা বাঙ্গালিদিগের অরণ্যে রোদন পূর্ব্বজন্মের ফল, তাহাতে লিপি বাহুল্যে লাভ কি?

অনন্তর লোক সংখ্যা রিপোর্টে হিন্দু বর্ণগণের ব্যবসায় অনুসারে কয়েকটি শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু উক্ত প্রণালী মতে বিভাগ করা অসাধ্য।

বর্ণসমূহের ব্যবসা নির্দ্দেশের স্থল এক শাস্ত্রোক্তি, দ্বিতীয় দেশাচার। আমরা যতদূর শাস্ত্রানুসন্ধান করিতে পারিয়াছি তাহাতে এই প্রকাশ হইয়াছে যে শাস্ত্রে যে সকল বর্ণের নাম পাওয়া যায় তন্মধ্যে সকলের ব্যবসা নির্দ্দিষ্ট নাই। যে যে স্থলে ব্যবসা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অনেকগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের ঐক্য নাই। এবং বর্ত্তমান কালে সেই সকল ব্যবসাবলম্বিগণ বিভিন্ন নাম ধারণ করিতেছে।

শাস্ত্রোক্তি পরিত্যাগ করিয়া দেশাচার গ্রহণ করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেক বর্ণের জাতি ব্যবসা সর্ব্বত্র সমান নহে সুতরাং কোন্ ব্যবসা আদিম এবং কোন্গুলি অভিনব তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। তবে এই উদ্দেশে লোক সংখ্যা করিলে এই সকল বিষয় নির্ণীত হইতে পারে। ইহার একটী উদাহরণ এই। লোকসংখ্যা রিপোর্টে কাপালিজাতি তন্তুবায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা একটি প্রবাদ বচন শুনিয়াছি তাহাতে কাপালিগণ কৃষি ব্যবসায়ী বলিয়া বোধ হয়। যথা "বামন চোসা হুঁকো, তৃণ চোসা সেঁকো, কায়েত চোসা জমি, আর কাপালি চোষ্লা ভূমি"। বস্তুতঃ কোন কোন স্থানে বস্ত্র ব্যবসায়ী কাপালি থাকিতে পারে; লেখক কাপালি বর্ণকে কৃষক বলিয়াই জানেন, এইরূপ নানা বর্ণ আছে সুতরাং এমত স্থলে কোন্ বর্ণের প্রকৃত ব্যবসা কি তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর।

ব্যবসাভেদ, জাতিভেদের একটি প্রধান লক্ষণ বটে কিন্তু যে পর্য্যন্ত লোকের ব্যবসা পরিবর্ত্তন বিষয়ে রাজনিষেধ রহিত হইয়াছে সেই অবধি ব্যবসা অনুসারে বর্ণ বিভাগ করা পণ্ডশ্রমের মধ্যে গণ্য হইবেক।

বিভর্লি সাহেবকৃত বর্ণ শ্রেণী তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত কিন্তু দেশাচার মতে এখনও বর্ণ বিভাগের একটি প্রকরণ প্রচলিত আছে। যথা তারতম্য ভেদ। লোকে কোন কোন বর্ণকে শ্রেষ্ঠ, কোন বর্ণকে মধ্যম এবং কাহাকে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। হেতু যাহাই হউক কার্য্যে ইহাদিগের মধ্যে সম্মান ও সমাদর বিষয়ে বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাও এত মতভেদে পূর্ণ যে আমরা কোন পরিষ্কার মীমাংসা করিতে পারিব এমত ভরসা করি না। যেখানে বর্ণ সংখ্যা সহস্রাধিক এবং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে আহার উপবেশন ও আলাপ বিষয়ে এতাদৃশ ভেদ সেখানে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সমস্ত বর্ণের আচার ব্যবহার বিষয়ক নিগূঢ় নিয়ম আয়ত্ত হওয়া সহজ নহে। ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যেমন একদিগে কায়স্থগণ আপনাদিগকে সুবর্ণবণিক এবং সদ্‌গোপ অপেক্ষা মাননীয় বলিয়া জানেন সেইরূপ পক্ষান্তরে শেষোক্ত বর্ণদ্বয় আপনাদিগকে কায়স্থ অপেক্ষা কোন মতে নিকৃষ্ট বলিতে অসম্মত।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে সঙ্কীর্ণ বর্ণ সকল পিতৃ ও মাতৃ বর্ণের মর্য্যাদানুসারে প্রথম মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

সঙ্কীর্ণ বর্ণ উৎপত্তি বিষয়ে কয়েকটী প্রকরণ আছে। তদনুসারে নানা প্রকার সাঙ্কর্য্য হইতে পারে।

১। চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বর্ণের পুরুষ এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্ণের নারী এতদুভয় হইতে সঙ্কীর্ণ বর্ণ হইলে এক প্রকার সাঙ্কর্য্য হয়।

২। ঐরূপ স্ত্রী পুরুষ মধ্যে যখন এক কি দুই বর্ণ ব্যবধান থাকে যথা ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যা, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রা এবং ক্ষত্রিয় ও শূদ্রা এরূপ স্থলে সঙ্কীর্ণ বর্ণ হইলে অন্য এক প্রকার সাঙ্কর্য্য হয়।

৩। প্রতিলোম প্রণালী মতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিনা ব্যবধানে অথবা এক জাতির ব্যবধানে সঙ্কীর্ণ বর্ণ উৎপন্ন হইলে তৃতীয় প্রকার সাঙ্কর্য্য হয়।

৪। প্রতিলোম বিধানে দ্বিবর্ণ ব্যবধানে বিবাহ হইয়া চতুর্থ প্রকার সাঙ্কর্য্য জন্মে। যথা শূদ্র ব্রাহ্মণী সংযোগে চণ্ডাল বর্ণ।

৫। ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কীর্ণ বর্ণের সাঙ্কর্য্য। ইহাদিগের মধ্যেও প্রতিলোম ও অনুলোম বিবাহ বিবেচনাতে তারতম্য জন্মে। কিন্তু শুদ্ধ জাতীয় সঙ্কীর্ণ বর্ণ সমূহের ক্রম পরিষ্কাররূপে নির্ণীত না হইলে সঙ্কীর্ণ জাতির মিশ্র বর্ণের মধ্যে তারতম্য নিরূপণ করা অসাধ্য।

৬। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে সঙ্কীর্ণ বর্ণের উৎপত্তি বিষয়ে মাতৃ বর্ণ সম্বন্ধে কখন পত্নী কখন কন্যা এবং কখন নারী শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। অতএব ইহাতেও সাঙ্কর্য্যের কিরূপ ভেদ গণিত হইয়াছে তাহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই। উক্ত

পুরাণ মতে বেণরাজা বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী পুরুষদিগকে বলপূর্ব্বক সংগত করাইয়া সঙ্কীর্ণ বর্ণ উৎপাদন করিয়াছিলেন।

৭। উশনা সংহিতামতে চৌর্য্য এবং যথাবিধি বিবাহের দ্বারাও সাঙ্কর্য্যের বিভিন্নতা হইয়াছে। যথা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ার বিবাহ দ্বারা সূত; সমন্ত্র বিবাহ দ্বারা সুবর্ণ (বর্ণ ব্রাহ্মণ?) এবং চৌর্য্য দ্বারা, বৈদ্য উৎপন্ন হইয়াছে। এই চৌর্য্য শব্দের মধ্যে যে গান্ধর্ব্ব্য বিবাহ গণ্য হয় নাই তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যাহা হউক এতগুলি বিধান মতে বর্ণ সমগ্রের ন্যূনাতিরেক স্থির করা প্রায় অসম্ভব বলিলেই হয়। কিন্তু তাহাতে আর এক বিঘ্ন এই যে অনেক বর্ণের উৎপত্তি বিষয়ে শাস্ত্রকারদিগের ঐকমত্য নাই। সুতরাং উৎপত্তি অনুসারে বর্ণ সমূহের ক্রম নির্ণয় করা যাইতে পারে না।

আমরা জাতিভেদে বর্ত্তমান অবস্থা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান কালে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে তারতম্য প্রবল রহিয়াছে। অথচ তাহার পরিষ্কার নিয়ম পাওয়া যায় না। অতএব বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণকে মূল গণ্য করিয়া নিম্নলিখিত ফর্দ্দ প্রস্তুত করা গেল। প্রাগুক্ত পুরাণ অবলম্বন করিবার হেতু এই উহার সহিত দেশাচারের অনেক ঐক্য লক্ষিত হইয়াছে।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ মতে সঙ্কীর্ণ বর্ণ নির্ণয়।

যে বর্ণের পুরুষের ঔরসে উৎপন্ন তাহার নাম	যে বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন তাহার নাম	সঙ্কীর্ণ বর্ণের নাম	মন্তব্য কথা
প্রথম শ্রেণী—			
ব্রাহ্মণ	বৈশ্যা	অম্বষ্ঠ	মনুসংহিতাতে এই বর্ণের উৎপত্তি এই রূপই লিখিত আছে। উশনা সংহিতার মতেও ঐরূপ। কিন্তু শেষোক্ত সংহিতা মতে বৈদ্য জাতির উৎপত্তি বিভিন্ন—যথা ব্রাহ্মণ ঔরসে, এবং ক্ষত্রিয়ার গর্ভে। সচরাচর অম্বষ্ঠ বৈদ্য বর্ণের নামান্তর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।
ব্রাহ্মণ	শূদ্রা	বারজীবী	অর্থাৎ বারুই নবশায়কদিগের মধ্যে গণ্য।
”	অব্যক্ত	গন্ধবণিক কাংস্তকার শঙ্খকার	অব্যক্ত নামটী ক্ষত্রিয়া হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। নতুবা এই তিন বর্ণ উপরিলিখিত কোন বর্ণের সহিত গণ্য হইত।

যে বর্ণের পুরুষের ঔরসে উৎপন্ন তাহার নাম	যে বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন তাহার নাম	সঙ্কীর্ণ বর্ণের নাম	মন্তব্য কথা

প্রথম শ্রেণী—

অনুলোম ক্রমে

ক্ষত্রিয়	অব্যক্ত	রাজপুত্র	এখানে অব্যক্ত নামটী বৈশ্যা অনুমান হয়।
		উগ্র ক্ষত্রিয়	মনুমতে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে উগ্র উৎপন্ন। উশনা মতে "শূদ্রস্ত (? শূদ্রায়া) বিপ্রসংসর্গাৎ জাত উগ্র ইতিস্মৃতঃ"।
,,	শূদ্রকন্যা	নাপিত	উশনা সংহিতা মতে নাপিত ও কুম্ভকার বিপ্র ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে চৌর্য্য দ্বারা উৎপন্ন। এই বর্ণ নবশাকের মধ্যে গণ্য।
		মোদক	শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সরকার ব্যবস্থা দর্পণে মোদকের প্রতিশব্দ মধুনাপিত এবং চৈতন্য দেবের সময়ে মধুনামক অনেক সামান্য নাপিত হইতে উহারা উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। ইহারা নবশাকের মধ্যে গণ্য এবং একটী পরাশর বচনেও এই নাম পাওয়া যায়, অতএব এত আধুনিক বোধ হয় না। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ মতে ইহাদিগের ব্যবসা "গুড় কর্ম্মাণি"।
বৈশ্য	শূদ্রা	করণ	মনুবচনের সহিত ঐক্য। করণ এবং কায়স্থ লইয়া যে সকল গোলযোগ আছে তাহার কিঞ্চিৎ প্রথম পরিচ্ছেদে প্রকাশ করা গিয়াছে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ মতে করণ বর্ণের ব্যবসা রাজকার্য্য ও লিপিকর্ম্ম। কায়স্থের কোন উল্লেখ নাই। লেখকের মতে করণ এবং কায়স্থ এক।

যে বর্ণের পুরুষের ঔরসে উৎপন্ন তাহার নাম	যে বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন তাহার নাম	সঙ্কীর্ণ বর্ণের নাম	মন্তব্য কথা
দ্বিতীয় শ্রেণী—			
ক্ষত্রিয়	ব্রাহ্মণী	মালাকর	নবশাকের মধ্যে গণ্য।
বৈশ্য	ক্ষত্রিয়া	ভূরাজ	
		মাগধ	মনুর সহিত ঐক্য আছে কিন্তু উশনা সংহিতামতে বৈশ্য ঔরসে ব্রাহ্মণী গর্ভে মাগধের জন্ম হয়।
		গোপ	নবশাকের মধ্যে গণ্য কিন্তু গোপশব্দে সদ্‌গোপ কি পল্লব গোপ তদ্বিষয়ে দ্বিমত আছে। আভীর বর্ণের পার্শ্ব লিখিত টিপ্পনী দেখ।
”	ব্রাহ্মণ কন্যা	তাম্বুলি	
		তৈলিক	নবশাকের মধ্যে গণ্য। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে ইহাদিগের ব্যবসা গুবাক বিক্রয় বলিয়া লিখিত আছে।
শূদ্র	অব্যক্ত অনুমান বৈশ্যা অথবা বৈশ্য কন্যা	কর্ম্মকার	ব্যবসা লৌহ কর্ম্ম।
		দাস	ধীবর বর্ণের পার্শ্ব লিখিত টিপ্পনী দেখ, কিন্তু বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ মতে ইহাদিগের ব্যবসা কৃষিকর্ম্ম।
অব্যক্ত অনুমান শূদ্র	ক্ষত্রিয়া	কুম্ভকার	উশনা ও মনুসংহিতার মত বিভিন্ন। নাপিত বর্ণের পার্শ্বে দেখ।
		তন্তুবায়	নিম্নে তক্ষা বর্ণের পার্শ্বে দেখ।

(বাম পার্শ্বে: প্রতিলোম জন্মে)

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ মতে এই বিংশতি বর্ণ প্রথম শ্রেণিতে পরিগণিত। ইহার মধ্যে যে সকল বর্ণ চিনিতে পারা যায় তাহা দেশাচার মতেও সৎশূদ্রের মধ্যে গণ্য কেবল দাস বর্ণ যদি ধীবরের অন্তর্গত হয় তবে ইহা ব্যত্যয় হইবেক। নবশাক জাতির বিষয়ে শব্দকল্পদ্রুমে নিম্নলিখিত পরাশর বচনধৃত হইয়াছে।

গোপমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজি।
কুলাল কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কঃ॥

যে বর্ণের পুরুষের ঔরসে উৎপন্ন তাহার নাম	যে বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন তাহার নাম	সঙ্কীর্ণ বর্ণের নাম	মন্তব্য কথা
দ্বিতীয় শ্রেণী—			
অম্বষ্ঠ	বৈশ্যা	স্বর্ণকার সুবর্ণবণিক	
করণ	ঐ	তক্ষা	তক্ষা শব্দের আভিধানিক অর্থ ছুতার। মনূক্ত অযোগব বর্ণ উক্ত ব্যবসায়ী। অযোগব মনু মতে শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে এবং উশনা সংহিতা মতে বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন। শেষোক্ত শাস্ত্র মতে ইহারা তন্তুবায় বিশেষ।
		রজক	উশনা সংহিতা মতে এই বর্ণ পুক্কশ ঔরসে এবং বৈশ্য কন্যার গর্ভজাত। এবং পুক্কশ শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত। মনুমতে পুক্কশ নিষাদ ঔরসে শূদ্রের গর্ভে উৎপন্ন।
গোপ	ঐ	তৈলকারক আভীর	মনুমতে আভীর বর্ণ ব্রাহ্মণ ঔরসে অম্বষ্ঠার গর্ভে উৎপন্ন। আমরা মনে করি যে আভীর শব্দের অর্থ পল্লব গোপ অথবা গোয়ালা, এবং ইতিপূর্ব্বে যে গোপ বর্ণের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহার অর্থ প্রচলিত, সদ্‌গোপ। লেখকের কোন বিচক্ষণ সদ্‌গোপ বন্ধু বলিয়াছেন, যে উক্ত বর্ণীয়েরা আপনাদিগকে নবশাক বলিয়া গণ্য করেন না; কিন্তু বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণমতে গোপ, করণ ও বৈশ্যের সহিত এক শ্রেণীতে পরি-গণিত। আর এখনকার গোয়ালা বর্ণ

যে বর্ণের পুরুষের ঔরসে উৎপন্ন তাহার নাম	যে বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন তাহার নাম	সঙ্কীর্ণ বর্ণের নাম	মন্তব্য কথা
			জল আচরণীয় হইলেও সমাজে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য, ইহার প্রমাণ এই যে, গোয়ালার ব্রাহ্মণেরা পতিত। অতএব সদ্‌গোপ এবং গোয়ালা বর্ণ শাস্ত্রোক্ত গোপ এবং আভীর বর্ণের সহিত এক এইরূপ স্থির করিলে উভয় দিক রক্ষা হয়। আভীর এবং আহির একই শব্দ অনুমান হয়।
গোপ	শূদ্রা	ধীবর	এই নাম বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ ভিন্ন অন্য পুস্তকে পাই নাই। কিন্তু শব্দকল্পদ্রুমের লিপিমতে কৈবর্ত্ত বর্ণ "বেশ্যা গর্ভে ক্ষত্রিয়স্যৌরস জাতঃ। ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণং। তৎ পর্য্যায় দাসঃ ধীবরঃ ইত্যমরঃ। দাসেরকঃ জালিকঃ। ইতি জটাধরঃ।" এই ধীবর দাস বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণোক্ত ধীবর দাসের সহিত এক কি না পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। মনুমতে কৈবর্ত্ত বর্ণ নিষাদ ঔরসে অযোগবীর গর্ভজাত।
		শৌণ্ডিক	উশনা সংহিতা মতে শূদ্রস্ত (শূদ্রায়াং) বিপ্র সংসর্গাৎ জাত উগ্র ইতি স্মৃতঃ তস্যৈব চাবসম্বৃত্যা জাতঃ শুণ্ডিক উচ্যতে॥
মাগধ	শূদ্রা	শেখর জালিক	ধীবর বর্ণের পার্শ্বের টীকা দেখ।
মালাকর	ঐ	নট শাবাক	

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ মতে এই দ্বাদশটি বর্ণ মধ্যম শ্রেণীতে পরিগণিত। এই পুরাণের স্থানান্তরে দ্বিতীয় অথবা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বর্ণ সংখ্যা ষোড়শ বলিয়া প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু অতিরিক্ত চারিটী বর্ণের নাম আমরা স্থির করিতে পারি নাই।

তৃতীয় শ্রেণী—

শূদ্র	ব্রাহ্মণী	চণ্ডাল	মনু ও উশনা সংহিতা উভয়ের সহিত ঐক্য।
রজক	বৈশ্যা	ঘটজীবী	

যে বর্ণের পুরুষের ঔরসে উৎপন্ন তাহার নাম	যে বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন তাহার নাম	সঙ্কীর্ণ বর্ণের নাম	মন্তব্য কথা
আভীর	বৈশ্যকন্যা	তক্ষ চর্ম্মকার	উশনা সংহিতা মতে সূত ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে চর্ম্মকারের উৎপত্তি। এবং বৈদেহির ঔরসে বিপ্রার গর্ভে চর্ম্মোপজীবী নামক অপর এক বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। সূত বর্ণ উক্ত সংহিতা মতে দুই প্রকার এবং মনু মতে আর এক প্রকার এই তিনপ্রকার পাওয়া যায়—ইহার সহিত কোন মতে বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের সামঞ্জস্য হয় না। অপর মনু ধিগ্বন ও কারাবর নামক দুই প্রকার চর্ম্মব্যবসায়ীর নাম করিয়াছেন। তাহাদিগের উৎপত্তির সহিতও কিছুই মিলে না।
তৈলকার	বৈশ্যা	দোলাবাহী	(দুলিয়া বেহারা ?)
ধীবর	শূদ্রা	মল্ল	মনু মতে এই বর্ণ ক্ষত্রিয় জাতির ব্রাত্য (পতিত)
আভীর	গোপ কন্যা	বরুড়	
স্বর্ণকার	বৈশ্যপত্নী	মলেগ্রাহী	(মেথর কি ?)
স্বর্ণবণিক	ঐ	কুড়ব	

এই কয়েক বর্ণ অন্ত্যজ শূদ্র। এতদ্ভিন্ন নিম্ন লিখিত কয়েক বর্ণের বিষয় প্রাগুক্ত পুরাণে লিখিত আছে কিন্তু শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট নাই।

দেবল	বৈশ্যা	গণক বাদক	
বেণরাজার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন		পুলিন্দ পুক্কশ খস কাম্বোজ	মনু ও উশনা সংহিতাতে এই কয়েকটী বর্ণের বিভিন্ন উৎপত্তি পাওয়া যায়।
		ম্লেচ্ছ যবন সুহ্ম শবর খর	

মনুসংহিতা, বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ এবং উশনা সংহিতা হইতে উল্লিখিত বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইল। এতদ্ভিন্ন শব্দকল্পদ্রুমে অন্যান্য শাস্ত্রের যে সকল বচন পাওয়া যায় তাহাতে এতাদৃশ আশা জন্মে না যে বিশেষরূপ যত্ন করিলে সমস্ত শাস্ত্র হইতে এক্ষণকার বর্ণ সমগ্রের আদি ও ক্রম সুচারুমতে স্থিরীকৃত হইতে পারে। তবে বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে যে তিনটী শ্রেণী পরিগণিত হইয়াছে তাহা এখন প্রচলিত আছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে যে সকল বর্ণের নাম পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশও উক্ত পুরাণের লিপি মতে সর্ব্বসাধারণের সমীপেও উত্তম মধ্যম অধম বলিয়া গণ্য।

উপরিস্থিত তালিকা দেখিলে বোধ হইবেক যে এখনকার বর্ণ সমূহের মধ্যে যেগুলির নাম শাস্ত্রে পাওয়া যায় তাহারা সমস্তই সঙ্কীর্ণ বর্ণ। যে নামগুলি শাস্ত্রীয় নামের সহিত ঐক্য করা যায় না তাহা শাস্ত্রীয় নামের অপভ্রংশ অথবা আধুনিক বর্ণের নাম। উভয় কল্পনাতেই তাহারা বর্ণসঙ্কর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে অমিশ্র শূদ্রবর্ণ কোথায়? আমরা শূদ্র নামে কোন পৃথক্ বর্ণের কথা শুনি নাই। লোক সংখ্যার রিপোর্টে শূদ্র বলিয়া কৃষি ব্যবসায়ি মধ্যে বর্ণের যে একটি নাম আছে তাহা ব্যাপক নাম, প্রকৃত কোন বর্ণের নাম নহে। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেবের কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিত আছে— মহারাষ্ট্র এবং বঙ্গদেশে প্রকৃত শূদ্র বর্ণ আছে। মহারাষ্ট্র দেশস্থ শূদ্রের কথা বলিতে পারি না কিন্তু বঙ্গদেশে অমিশ্র শূদ্র নাই।

এই জন্য আমরা বলিয়াছি যে কায়স্থাদি সকলেই ব্রাহ্মণের ন্যায় এক একটী পৃথক্ বর্ণ অথচ ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলেই শূদ্র পদে বাচ্য অতএব বর্ত্তমান কালে শূদ্র শব্দে "সঙ্কীর্ণ বর্ণ সমূহ" এই অর্থ স্থির হইতেছে।

আমরা মনে করিতাম যে, বিভিন্ন বর্ণের তারতম্য অনুসারে অন্ন গ্রহণ, হুঁকা ব্যবহার এবং জলাচরণের ব্যবহার প্রচলিত আছে। অতএব এই সকল ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত বর্ণের ক্রম নির্ণয় করিতে পারিব। যথা ব্রাহ্মণের অন্ন শূদ্রের গ্রহণীয় কিন্তু শূদ্রস্পৃষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণের ত্যজ্য। এবং কায়স্থাদি সৎশূদ্রের স্পৃষ্ট জল ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু মধ্যম বা অন্ত্যজ বর্ণের জল ব্রাহ্মণের অস্পর্শীয়।

কিন্তু এই নিয়ম সকল বর্ণের মধ্যে তুল্যরূপে রক্ষিত হয় না, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শূদ্র স্পৃষ্ট জল গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে বৈধ নহে। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণগণ পাকার্থ স্বহস্তে ভিন্ন জলাহরণ করেন না। অপর রজক ধীবর শৌণ্ডিক আদি বর্ণ দেশাচার মতে বৈদ্য ও কায়স্থ অপেক্ষা হীন কিন্তু উহারা কেহ বৈদ্য বা কায়স্থের অন্নগ্রহণ করে না। তদ্ভিন্ন কলিকাতায় যেরূপ হউক পল্লিগ্রামে

সুবর্ণবণিকেরা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সমীপে নবশাক অপেক্ষা হীন বলিয়া গণ্য। এমন কি যে কায়স্থগণ উক্ত বণিকদিগকে আপনাদিগের আসনে উপবেশন করিতে দেন না কিন্তু কলিকাতার সান্নিধ্যে ধনাঢ্য সুবর্ণ বণিক এবং কৈবর্ত্তগণ কায়স্থের হুঁকা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আমরা অন্ন ভোজন লইয়া অনেক বিচার করিয়া থাকি কিন্তু একজন অধ্যাপক ব্যবস্থা দিয়াছেন যে "শাস্ত্রানুসারে 'পরান্ন ভোজন' নিষিদ্ধ, আর পরপাক ভক্ষণ করিতে যে নিষেধ আছে তাহা দুই একস্থান ভিন্ন পাওয়া যায় না এবং তাহাতেও কেবল সামান্য পাপ হয়," "পরান্ন" শব্দে পরের অন্ন; ইহাতে একজন ব্রাহ্মণ অন্য কোন ব্রাহ্মণের অন্নগ্রহণ করিলে তাহাও পরান্ন বলিয়া গণ্য হইতেছে। যাহা হউক এতদ্দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে এক্ষণকার অন্নগ্রহণ বিষয়ক নিষেধ কেবল আধুনিক দেশাচার মাত্র।

ব্রাহ্মণগণ অপর সমস্ত বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে কাহার দ্বিমত নাই। শ্রাদ্ধ বিবাহ দীক্ষা আদি বিষয়ে কতিপয় বর্ণ (যথা যুগী) ব্যতীত সকলেরই ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিতে হয় ইহাতে ব্রাহ্মণের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হইয়া থাকে; অতএব যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের পাতিত্য অনুসারে যজমানের ক্রম নির্ণীত হইতে পারে।

এ বিষয়ে ভাটপাড়ার জনৈক অধ্যাপক যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহার সারাংশ নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

"এক্ষণে ক্রিয়ালোপ ও বেদের অদর্শন এই দুই কারণে বৈশ্যজাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বৈদ্যজাতি বৈশ্যের মধ্যে গণিত হওয়াতে তাহারাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে সুতরাং বৈদ্য ও কায়স্থ উভয় জাতিরই যাজন করিলে তুল্য পাপ হইবে। যদি কোন ব্রাহ্মণ লোভ পরবশ হইয়া বৈদ্য বা কায়স্থের যাজন করেন তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণ যাজন লব্ধ ভুক্তাবশিষ্ট ধন অগাধ জলে নিক্ষেপ করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে এবং পুনর্ব্বার উঁহার উপনয়ন দিতে হইবেক। দ্বাদশবার ঐরূপ যাজন করিলে পতিত হইবেক। কিন্তু জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত একজন মাত্র সৎশূদ্রের যাজন করিলে পাপী হইবেক না।

"জ্ঞান পূর্ব্বক নবশাকদিগের যাজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে এবং যাজককে পুনর্ব্বার উপনয়ন দিতে হইবে। ছয়বার ঐরূপ যাজন করিলে পতিত হইবে।

"কৈবর্ত্ত পুলিন্দ (পোদ শব্দের পরিবর্ত্তে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে) প্রভৃতি জাতির একবার মাত্র যাজন করিলেই পতিত হইবে।"

সংস্কৃত কালেজের জনৈক অধ্যাপকও প্রায় ঐরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন।

কেবল তিনি বলেন যে, বৈদ্যজাতির যাজনে পাতিত্য জন্মে না আর বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মতে প্রথম শ্রেণীস্থ বিংশতি প্রকার সৎশূদ্রের যাজনে কোন দোষ নাই। যথা

বিংশতিনাং জাতিনাং পুরোধা শ্রোত্রিয়া বরং
অন্যেষাং ষোড়শানান্তু পুরোধা পতিতো দ্বিজঃ॥
তজ্জাতি তুল্যতাং যায়াদ্ব্রহ্ম বন্ধুর্ভবেদপি।

দেশাচার মতে কৈবর্ত্ত এবং গোয়ালা আদি অন্যান্য বর্ণের যাজন করিলে যাজক ব্রাহ্মণ পতিত হয়েন কিন্তু কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ কৈবর্ত্ত অপেক্ষা হেয় বলিয়া গণ্য। এই নিয়ম কৈবর্ত্তের সমান অন্য বর্ণের যাজ্ঞিক দিগের প্রতি বর্ত্তে না। যদি পতিত হইলে ব্রাহ্মণের সকল বর্ণ অপেক্ষা হেয় হওয়াই যুক্তি সিদ্ধ হয় তবে কৈবর্ত্ত ভিন্ন অন্য বর্ণীয় ব্রাহ্মণের প্রতি পৃথক্ নিয়ম কেন? আমরা ইহার কোন মীমাংসা করিতে পারি নাই। কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণদিগের উৎপত্তি বিষয়ে একটী গল্প প্রচলিত আছে কিন্তু তাহা শাস্ত্রসম্মত বোধ হয় না।

অশূদ্র পরিগ্রাহী এবং সৎশূদ্রের যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শ্রেণী বিভিন্নতা অথবা কৌলীন্য ভেদ না থাকিলে পাতিত্য জন্য বিবাহাদির কোন ব্যাঘাত হয় না। স্থূল কথা এই যে এখনকার শূদ্রগণকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা দেশাচার সম্মত। তন্মধ্যে যেগুলির নাম বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাওয়া যায় তাহারা তত্তৎ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। অবশিষ্ট বর্ণ সকল তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত।

ভাবী লোকসংখ্যাকালে বর্ণভেদ প্রকাশ করণার্থ বঙ্গভাষীদিগকে প্রথমতঃ ধর্ম্ম অনুসারে বিভক্ত করা কর্ত্তব্য। অনন্তর হিন্দু ধর্ম্মের সীমা স্থির করিবার জন্য শাক্ত শৈব আদি কতকগুলি ধর্ম্মশ্রেণী নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী দিগের মধ্যে কতক অংশ জাতিভেদ রক্ষা করেন আর কতক লোক জাতি বৈষ্ণব নামে পরিচিত। ইহারা অন্ত্যজ শূদ্র শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। অতএব বৈষ্ণবদিগকে পৃথক্ না করিয়া হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রকাশ করিলেই ভাল হয়। জাতি বৈষ্ণবদিগের ব্যবসা নানাবিধ।

হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যেই বর্ণভেদ বিশিষ্টরূপে প্রচলিত, অতএব বর্ণভেদ প্রদর্শন করিবার জন্য বঙ্গভাষী হিন্দুদিগের একটী পৃথক্ ফর্দ্দ দিয়া (১) ব্রাহ্মণ (২) সৎশূদ্র (৩) মধ্যমশূদ্র (৪) অন্ত্যজ শূদ্র এই চারি শ্রেণীর মধ্যে বিভর্লী সাহেবের কল্পিত হিন্দু বৈষ্ণব ও অর্দ্ধ হিন্দু সকলকেই স্ব স্ব স্থানে সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে।

উহাদিগের ব্যবসা প্রকাশ করিতে হইলে উক্ত সাহেবের রিপোর্টের ষষ্ঠ সংখ্যক ফর্দ্দে যেরূপ জেলানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসার লোকসংখ্যা করা হইয়াছে সেইরূপ বর্ণ অনুযায়ী লোকসংখ্যার একটি পৃথক্ ফর্দ্দ প্রস্তুত করা আবশ্যক। এই ফর্দ্দে জাতি বৈষ্ণবদিগের ব্যবসাও প্রদর্শন হইতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে ব্যক্ত করা গিয়াছে বিভর্লী সাহেবের প্রণালী মতে বঙ্গভাষিগণের সংখ্যা এবং আমাদিগের প্রদর্শিত অন্ত্যজ শূদ্রগণের সংখ্যা নির্ণীত হইতে পারে না। কারণ শেষোক্ত বর্ণগণের যে তালিকা উক্ত সাহেব দিয়াছেন তাহার কোন্ গুলি বঙ্গভাষী এবং কাহারা হিন্দী ভাষী তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। তবে কথঞ্চিৎ রূপে বঙ্গভাষী দিগের লোকসংখ্যা প্রদর্শন করিবার জন্য নিম্নলিখিত ফর্দ্দ প্রস্তুত করা গেল।

হিন্দু (অর্থাৎ বিভর্লি সাহেবের অর্দ্ধ হিন্দু শুদ্ধ)

শ্রেণী	বর্ণ	সংখ্যা		মোট
১ম শ্রেণী	ব্রাহ্মণ	১১,০০,১০৫		
	ভাট	৬৮,৩৫৩		
				১১,৬৮,৪৫৮
২য় শ্রেণী	কায়স্থ	১১,৬০,৪৭৮		
	বৈদ্য	৬৮,৩৫৩		
	নবশাক			
	সদ্গোপ	৬৩৫৯৮৫		
	মালি	৯৭০২৩		
	তৈলি	৩১৮৩৯০		
	তন্তুবায়	৩৫৮৬৮৯		
	মোদক	৯৪৬৮৭		
	বারুই	১৫৬৮০৭		
	কুম্ভকার	২৮১৭৫৮		
	কর্ম্মকার	২৫০২৮৫		
	নাপিত এই বর্ণ, হাজামের সহিত পরিগণিত হইয়াছে; শেষোক্ত হিন্দি ভাষী বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া আনুমানিক সংখ্যা ধরা গেল—	৪০০০০০		
		২৫৯৩৬২৪		
	উগ্র (আগুরি)	৭০৬০৬		
	তাম্বুলি	৫৯৭২৬		
	গন্ধবণিক	১,২৭,১৭৮		
	কাংস্যকার	২৪,৩৩০		
	শঙ্খকার	১১৪৫৩		
			২৯৩২৯৩	
				৪১,১৫,৭৪৮
৩য় শ্রেণী				
	সুবর্ণবণিক	১১৬,৪২৭		

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণোক্ত
ধীবর ?
কৈবর্ত্ত ২০,৬৪,৩৯৪
জেলিয়া ৩,৬১,৯১৭
——— ২৪২৬৩১১
গোয়ালা
(আভীর ?) ৩,২৫,১৬৩
শৌণ্ডিক ৪,৩০,৫৮২
রজক ২,২৪,৯৪১
ছুতার (তক্ষা ?) ১৭৭,৭৫৫
স্বর্ণকার ৬০,৩৬৬
———
৪০,৬১,৫৪০

চতুর্থ শ্রেণী

বিভর্লি সাহেবের ফর্দ্দের অবশিষ্ট ৮২,৯০,৯৯৩
ইহার মধ্যে অনেক হিন্দী ভাষী থাকিল।

চারি শ্রেণীর সমষ্টি	১৭৫,৩৬,৭৩৯
বৈষ্ণব	৪১১,৭১৮
বঙ্গভাষী খ্রীষ্টান	২৭,৭০৫
মুসলমান	১৭৬,০৮,৭৩০
	৩৫৫,৮৩,৯৯২

ইহা ব্যতীত পূর্ণিয়া মানভূম গোয়ালাপাড়া এবং সাঁওতাল পরগণাতে বিস্তর বঙ্গভাষী আছে তাহাদিগকে গণনা করিলে সমস্ত বঙ্গভাষীর সংখ্যা ৩৬,০০৪,০০০ হইতে পারে। এই সংখ্যা এলাহাবাদ মিসনরি কনফরেন্স সভার রিপোর্টে ধৃত হইয়াছে। বিভর্লি সাহেব বঙ্গভাষীদিগের নিবাস প্রদর্শন করিবার জন্য কোন নক্সা দেন নাই কিন্তু উক্ত সভার রিপোর্টে এইরূপ একটি নক্সা আছে তাহা দেখিয়া আমরা পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি।

ক্রমশঃ

শ্রী যঃ

বেদের অপর নাম "ত্রয়ী" অর্থাৎ ঋক্, যজু, সাম এই তিন বেদ এবং অথর্ব্ববেদ সংহিতাবেদ পরিশিষ্ট নামে প্রসিদ্ধ কিন্তু আধুনিক কালে "ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ব বেদঃ" এই চারি বেদ মান্য। এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে প্রচলিত। পূর্ব্বে বেদ-জ্ঞান-বিহীন ব্যক্তিগণ মনে করিতেন অথর্ব্ববেদ কোরানের এক অংশ মাত্র, এজন্য আর্য্যগণের মান্য নহে। বিষ্ণু পুরাণে এই চারি বেদের বিষয় লিখিত আছে।

গায়ত্রঞ্চ ঋচশ্চৈব ত্রিবৃহৎ স্তোমং রথন্তরম্
অগ্নি ষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্ মুখাৎ।
যজুংষি ত্রৈষ্টুভং ছন্দস্তোমং পঞ্চদশং তথা।
বৃহৎ সাম তথোক্থঞ্চ দক্ষিণাদসৃজন্ মুখাৎ।
সামানি জগতীচ্ছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশং তথা।
বৈরূপ মতি রাত্রঞ্চ পশ্চিমাদসৃজন্মুখাৎ।
একবিংশমথর্ব্বাণিমাপ্তোর্যামানমেবচ।
অনুষ্টুভং সবৈরাজম্ উত্তরাদসৃজন্মুখাৎ।

অনন্তর ব্রহ্মা প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী, ছন্দঃ, ঋগ্বেদ, ত্রিবৃহৎ স্তোম অর্থাৎ স্তোত্র সাধন ঋক্ সমুদায়, রথন্তর নামক সামবেদ ও অগ্নিষ্টোম যাগ এই সমুদায় উৎপাদন করিলেন। পরে তাঁহার দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ ত্রিষ্টুপ ছন্দ, পঞ্চদশ স্তোম নামক সামবেদের গান, বৃহৎ সাম, ও উক্থম্ অর্থাৎ সোমসংস্থ যাগ এই সমুদায় উদ্ভূত হইল।

সামবেদ জগতীচ্ছন্দঃ, সপ্তদশ স্তোম নামক সামবেদের গান, বৈরূপ নামক সাম গান, অতি রাত্র যাগ, ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ হইতে এতৎসমুদায়ের উৎপত্তি হয়। একবিংশ স্তোম, অথর্ব্ববেদ, আপ্তোর্যাম নামক যাগ, অনুষ্টুপ ছন্দ, ও বৈরাজ সাম ইহারা ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে উৎপন্ন হইল।*

*পুরাণ প্রকাশ। বিষ্ণু পুরাণ প্রথম অংশ ৫ অধ্যায়। কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

প্রজাপতির চতুর্মুখ হইতে চারি বেদ উৎপত্তি পৌরাণিক মত। এ বিষয় বিষ্ণু পুরাণের ন্যায় ভাগবত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং হরিবংশে লিখিত আছে কিন্তু প্রাচীন মত মান্য করিতে হইলে বেদত্রয়ী ঋক্, যজু, সাম। নাস্তিক চূড়ামণি বৃহস্পতি কহেন "ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।" বৈদিক গ্রন্থ নিচয়ের মধ্যে তিনবেদ মাত্রের উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, পূর্ব্বে এক-মাত্র প্রজাপতি ছিলেন, তিনি সৃষ্টির কামনা করিলেন এবং তাঁহার কঠোর তপস্যার ফল স্বরূপ পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং বায়ু এই তিন লোকের সৃষ্টি হইল। তিনি এই তিন লোকে তাপ প্রদান করিলে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য এই তিনটী জ্যোতিঃ উদ্ভূত হয়। পুনরায় এই তিন জ্যোতিতে ভগবান প্রজাপতি উত্তাপ প্রদান করিলে তাহা হইতে ঋক্, যজু, সাম বেদোৎপত্তি হইল। তাহাতে পুনর্ব্বার উত্তাপ প্রদত্ত হইলে এই তিন বেদের সার স্বরূপ ঋগ্বেদ হইতে "ভূঃ" যজুর্ব্বেদ হইতে "ভুবঃ" এবং সামবেদ হইতে "স্বঃ" (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) সমুদ্ভূত হইল। ঋগ্বেদিগণ হোত্রী, যজুর্ব্বেদিগণ অধ্বর্য্যু, এবং সামবেদিগণ উদ্‌গাতা নামে খ্যাত হইলেন। এইরূপে তিন বেদের জ্যোতি হইতে ব্রাহ্মণগণের সকল কর্ম্মের বিধি নিরূপিত হইল।

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ মধ্যেও এইমত তিন বেদের উল্লেখ আছে। পুরুষসূক্ত মধ্যেও লিখিত আছে—পুরুষ হইতে তিন বেদের সৃষ্টি হইল, ইহাতে অথর্ব্ব বেদের নাম উল্লেখ নাই। সায়নাচার্য্য কহেন যজুর্ব্বেদ ভিত্তি স্বরূপ, তাহাতে ঋক্, সামবেদ চিত্রিত হইয়াছে। এ সকল পাঠে বোধ হয় ঋক, যজু, সাম বেদের পরে অথর্ব্ববেদ রচিত হয় এবং এক্ষণে যে অথর্ব্ববেদ পাওয়া যায় তাহা অথর্ব্বাঙ্গি-রসঃ শ্রীমদথর্ব্ব বেদ সংহিতা নামে খ্যাত। পৌরাণিক কালে চারি বেদ প্রচলিত ছিল, সুতরাং সকল পুরাণেই চারি বেদের উল্লেখ আছে।

বেদ নিত্য, মনু কহেন—

—সর্ব্বেষাস্তু স নামানি কর্ম্মাণিচ পৃথক্ পৃথক্।
বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে ॥

হিরণ্যগর্ভরূপে অবস্থিত সেই পরমাত্মা সকলের নাম অর্থাৎ মনুষ্য জাতির মনুষ্য, গোজাতির গো ইত্যাদি ; ও ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের বেদোক্ত অধ্যয়নাদি কর্ম্ম এবং অন্যান্য জাতির লৌকিক কর্ম্ম অর্থাৎ কুলালের ঘট নির্ম্মাণ কুবিন্দের পট নির্ম্মাণ ইত্যাদি প্রথমত বেদ শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া পূর্ব্ব কল্পে যাহার যেরূপ ছিল এ কল্পেও সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিলেন।*

---

* মনুসংহিতা। শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

বেদ নিত্য হইল এবং ঈশ্বর তাহাই পাঠ করিয়া দ্বিতীয় কল্পে সৃষ্টি করিলেন। আশ্চর্য্য বিশ্বাস! আশ্চর্য্য কৌশল! মনু লিখিয়াছেন, কাহার সাধ্য অবিশ্বাস করে। কপিল ঘোর নাস্তিক, ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিলেন "প্রমাণাভাবাৎ নতৎসিদ্ধিঃ" অথচ বেদ মানিলেন। দার্শনিকগণ সকলেই বেদ ঈশ্বর প্রণীত স্বীকার করিয়াছেন। কেবল গৌতম তাহার প্রতিবাদ করিয়া বেদ পৌরুষেয় বলিয়াছিলেন কিন্তু তাহা বেদ মনুষ্য প্রণীত বলা ন্যায়-সূত্রকারের ইচ্ছা ছিল কি না তাহা ভাল জ্ঞাত হওয়া যায় না। বেদ নিত্য বলিয়াও শেষ হইল না তাহা আবার ঈশ্বরের "গাইড"! আর বলিতে সাহস হয় না, যেটুকু লিখিলাম তাহাতেই প্রাচীন সম্প্রদায় আমার উপর বিলক্ষণ কোপ প্রকাশ করিবেন। সে দিন আমারে একজন কহিলেন "কায়স্থ হইয়া বেদের আলোচনা করিলে কখনই নিরোগী হইতে পারিবেন না।"

বেদ শব্দের প্রকৃত অর্থ "জ্ঞান" কিন্তু সোমরস এবং গোমাংসের প্রশংসাযুক্ত মন্ত্রে কিরূপ জ্ঞান লাভ হয় বলিতে পারি না। বৈদিক কালে সকলেই উন্মত্ত, সকলেই বেদকে মান্য করিতেন। যজ্ঞস্থলে নিষ্ঠুরতার একশেষ পশু হিংসা ঘটিত। এ সময় বুদ্ধদেব—

"নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহশ্রুতি জাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশু ঘাতম্।"

তিনি পশু হিংসার নিন্দা করিয়া ভারতবর্ষীয়গণকে "অহিংসা পরমোধর্ম্মে" দীক্ষিত করিলেন এবং ক্রমেই আর্য্যগণ বৈদিক নিষ্ঠুর ভয়াবহ কার্য্য কলাপ হইতে নিবৃত্ত হইল। পুরাণে তাঁহাকে ভগবানের অবতার স্থির করিল, এবং ক্রমেই তাঁহার যশোঘোষণা হইতে লাগিল। তথাহি কল্কি পুরাণে—

পুনরিহ বিধিকৃত বেদধর্ম্মানুষ্ঠান বিহিত নানা দর্শন সংঘৃণঃ
সংসার কর্ম্ম ত্যাগ বিধিনা ব্রহ্মাভাস বিলাস চাতুরীঃ
প্রকৃতি বিমান নাম সম্পাদয়ন্ বুদ্ধাবতার স্তমসি॥

পুনর্ব্বার আপনিই বিধাতৃ-বিহিত-বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে অর্থাৎ যাগাদি করণে নানা প্রকার ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক সংসার পরিত্যাগ দ্বারা মিথ্যা মায়া প্রপঞ্চ পরিহার করিবার উপদেশ দিবার জন্য বুদ্ধ অবতার হইয়া প্রাকৃতিক বিষয়ের অবমাননা করেন নাই।*

বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না কেবল নির্ব্বাণ কামনাই তাঁহার মতে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি আর্য্যগণকে "অহিংসাপরমোধর্ম্ম" সাধন করিতে উপদেশ দিলেন, সকলেই তাঁহার জ্ঞানময় বিশুদ্ধ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বৈদিক যাগ-

---

* কল্কি পুরাণ। শ্রীযুক্ত জগমোহন তর্কালঙ্কার কর্তৃক পরিশোধিত ও ভাষান্তরিত।

যজ্ঞে ও কর্ম্মকাণ্ডে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল এবং কিয়ৎকালের মধ্যে ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধধর্ম্ম ব্যাপ্ত হইল। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ কামনায় বনে গমন করিলেন। ধর্ম্মের আশ্চর্য্য কুহক! বিচিত্র বিশ্বাস! কল্য বেদে লোকের অটল ভক্তি ছিল, অদ্য নব-ধর্ম্মের আবির্ভাবে তাহা লোপ পাইল।

বেদ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয় তাহার বিশেষ তর্ক করিবার আবশ্যকতা নাই, কেননা বৈদিক সূক্তের উল্লিখিত ঋষিগণ সেই সেই সূক্ত প্রণেতা, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদি কেহ কৌশল করিয়া কহেন যে ঋষিগণ যোগবলে স্ব স্ব নামে প্রচারিত সূক্ত নিচয় ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে এক একটি সূক্ত তাঁহাদিগের স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপক হইবে কেন? যথা ঋগ্বেদ সংহিতা প্রথম মণ্ডলস্থ, পঞ্চদশানুবাকে দ্বাদশ সূক্তং*

কুৎসঋষি পংক্তি ছন্দঃ বিশ্বেদেবা দেবতা

১২০৭

১। চ্‌ন্দ্রমা অ্‌প্‌স্ব   ১। স্তুরা সুপ্‌র্ণো ধাবতে দিবি। নবো হিরণ্য নেময়ঃ প্‌দং বিন্দতি বিদ্যুতো বিত্তংমে। অ্‌স্য রোদসী!

১।১ জলময় মণ্ডলের মধ্যে বর্ত্তমান, সূর্য্য রশ্মিযুক্ত চন্দ্রমা দ্যুলোকে ধাবিত হইতেছেন। হে দীপ্তিমান রমণীয় প্রান্ত—চন্দ্র-রশ্মি সকল! আমার ইন্দ্রিয়গণ তোমাদিগের প্রান্ত ভাগও জানিতে পারিতেছে না। হে স্বর্গ ও পৃথিবি! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

এদিগে এই পর্য্যন্ত! ইহার আর তর্ক নাই। বেদকে সমস্ত জগতের মূলীভূত কারণ বল বা মহাভূতের নিশ্বাস কি প্রজাপতি শ্মশ্রু বল কিছুতেই কিছু করিতে পারিবে না। তর্কের প্রবল তরঙ্গে সকল শেষ হইয়া যাইবেক।

বেদ প্রচার লিখিতে গিয়া তৎ সম্বন্ধে না কথার তরঙ্গ উঠিল কিন্তু কি করা যায়, এই উনবিংশ শতাব্দীতে মনের কথা গোপন রাখা অন্যায়, এজন্য এতৎ সম্বন্ধে কিছুই পাঠক মহাশয়গণের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিলাম না। ইহাতে তাঁহারা আমাকে যাহা মনে করেন করিবেন, যখন ইউরোপে ডারুইন বানর হইতে মনুষ্য উৎপত্তি বিষয়ক মত প্রচার এবং ব্যকনরের ন্যায় পণ্ডিতগণ ঈশ্বরের স্থায়িত্ব লোপ করিবার মানসে গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী হইয়াছেন, তখন আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রচলিত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ দুই চারিটী কথায় আর কি হইতে পারে?

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। সপ্তম কল্প। চতুর্থ ভাগ। শ্রাবণ ১৭৯২ শক ১ কুৎস ঋষি কূপে পতিত হইয়া এই সূক্ত দ্বারা চন্দ্র, স্বর্গ ও পৃথিবী প্রভৃতির স্তব করিয়াছেন।

উপসংহার কালে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা আবশ্যক। বেদ অভ্রান্ত ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া তৎসম্বন্ধে দোষ অনুসন্ধান করা হইতেছে কিন্তু তাহা না হইলে উহা অতি প্রাচীন কালের একমাত্র গ্রন্থ এবং তাহার ভাষাও অতি প্রগাঢ় সুতরাং সকলের মাননীয়। বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে শ্রুতি গানে কাননের পশু পক্ষীও মোহিত হয়। ইহার মধ্যে মধ্যে কবিতা সরস—কবিত্ব সম্পন্ন এবং তাহাতে আদিম কালের মনুষ্যের মনের ভাব উত্তমরূপ ব্যক্ত করিতেছে। এজন্যই বেদ জর্ম্মন নিবাসী পণ্ডিতগণের কণ্ঠহার হইয়াছে এবং এজন্যই কি স্বদেশে, কি বিদেশে ইহার মান্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। এতাদৃশ ভূমণ্ডলের মধ্যে এক মাত্র প্রাচীন বৃহৎ গ্রন্থের বহুল প্রচার অতীব আনন্দজনক। পূর্ব্বে বেদের নাম মাত্র ছিল। সমুদয় ভারতবর্ষ অনুসন্ধান করিলে এক খানি পরিশুদ্ধ বেদ পাওয়া যাইত কি, না, সন্দেহ। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় "ব্রিটীশ মিউসিয়মে" অধ্যাপক রসেনকে ঋগ্বেদ সংহিতার প্রতিলিপি লইতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি ঋগ্বেদ দর্শন করেন নাই। কর্ণেল পলিয়র প্রথমে সমুদয় বেদ সংগ্রহ করিয়া "ব্রিটীশ মিউসিয়মে" প্রেরণ করেন। ইহার পূর্ব্বে কোল ব্রুক বেদ সংগ্রহের চেষ্টা করিলে, ম্লেচ্ছকে ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রদান করা অন্যায় বিবেচনায় জনৈক মহারাষ্ট্রীয় শাস্ত্রী তাঁহাকে বৈদিক ছন্দে দেব দেবীর স্তব পূর্ণ একখানি গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিল তিনিও তাহা বেদ ভ্রমে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিচারির রোমান ক্যাথলিক পাদ্রি বারথানমির নিকট Ezur Vedam নামক একখানি কৃত্রিম যজুর্ব্বেদ ছিল। উহা ফাদার রবার্ট ডি নোবিলী নামক জেসুইট পাদ্রির উপদেশানুসারে কোন সুচতুর মান্দ্রাজি শাস্ত্রীর দ্বারা সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। এই গ্রন্থখানি সুবিখ্যাত লেখক ভলটেয়ার প্রাপ্ত হইয়া সাদরে ১৭৬১ খৃঃ অঃ রএল লাইব্রেরী অব ফ্রান্স নামক পুস্তকালয়ে উপঢৌকন প্রদান করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের আজি কালি বৈদিক গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন প্রকার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই, তাঁহারা বেদশাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য বঙ্গদেশের বিষয়ী ব্যক্তির ত কথাই নাই, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বৈদিক গ্রন্থ সম্বন্ধে অতীব কৌতুকাবহ ভ্রম হইয়া থাকে; কেহ নারদ পঞ্চরাত্রের রাধিকাস্তোত্র* সাম বেদোক্ত এবং কেহ বা গোপাল নৃসিংহ, তথা রাম তাপনী গ্রন্থ প্রকৃত শ্রুতি মনে করিয়া থাকেন।

---

* স্তোত্রঞ্চ সামবেদোক্তং প্রপঠেদ্ভক্তি সংযুতঃ।
রাধে রাসেশ্বরী রম্যা রামা চ পরমাত্মনঃ।
রাসোদ্ভবা কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা।
কৃষ্ণপ্রাণাধি দেবী চ মহা বিষ্ণোঃ প্রসূরপি। ইত্যাদি।

এক্ষণে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রযত্নে চারি বেদ প্রচারিত হইয়াছে, এজন্য আমরা তাঁহাদিগের অধ্যবসায় এবং পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি। ৬ই এপ্রিল, ১৮৪৭ সালে আসিয়াটীক সোসাইটীর উত্তেজনায় একটি সভা হয়। ঐ সভায় বেদ প্রচারের প্রস্তাব হইলে মৃত অধ্যাপক রোএর সাহেবকে, বেদ বারাণসীস্থ পণ্ডিতগণের সাহায্যে উত্তমরূপ পরিদর্শনান্তর মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার ভার অর্পিত হয় এবং এজন্য গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ হইতে ৫০০্ শত টাকা বার্ষিক ব্যয় প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। আসিয়াটীক সোসাইটী কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ একালপর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথমাষ্টকের দুই অধ্যায় ভাষ্য সহিত।

সটীক কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা (প্রকাশ হইতেছে)।

সটীক কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (সম্পূর্ণ)।

সটীক সামবেদ (প্রকাশ হইতেছে)।

গোপথ ব্রাহ্মণ—সম্পূর্ণ।

তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ সটীক (প্রকাশ হইতেছে)।

ইউরোপ খণ্ডে নিম্নলিখিত বেদ প্রকাশিত হইয়াছে।

রোমান অক্ষরে ঋগ্বেদ সংহিতা কিয়দংশ অধ্যাপক অফ্রেক্ট সাহেব কর্ত্তৃক ১৮৬১ সালে বারলিনে মুদ্রিত।

ঋগ্বেদ সংহিতা, সায়নাচার্য্য কৃত ভাষ্যসহ ভট্ট মোক্ষমূলর দ্বারা প্রকাশিত, সম্পূর্ণ।

রোমান অক্ষরে ঋগ্বেদ মরুতের স্তোত্র ইংরাজী অনুবাদসহ ভট্ট মোক্ষমূলর কর্ত্তৃক ইংরাজী অনুবাদিত এবং প্রকাশিত।

সামবেদ, অধ্যাপক বেন্‌ফি কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১ খণ্ড।

ঐ, মহামহোপাধ্যায় উইলসন এবং ডাক্তার ষ্টিভন্‌সন্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২ খণ্ড।

সামবেদোক্ত বংশ ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ওএবর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সামবেদের অদ্ভুত ব্রাহ্মণ। অধ্যাপক ওএবর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সাম বিধান ব্রাহ্মণ ইংরাজী অনুবাদ সহ বর্ণেল সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখা সটীক; অধ্যাপক ওএবর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ সটীক; অধ্যাপক ওএবর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অথর্ব্ববেদ অধ্যাপক রথ এবং হুইট্‌নী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ঋগ্বেদের ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ—অনুবাদ সহ অধ্যাপক হগ কর্ত্তৃক বোম্বাই নগরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ১ খণ্ড।

আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কিয়দংশ ঋগ্বেদ সংক্ষিপ্ত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। "প্রত্নকম্রনন্দিনী" সম্পাদক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ সামবেদ—ঐন্দ্র পর্ব্ব।

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক অনুবাদ সহ সাম বিধান ব্রাহ্মণ সটীক সাম স্থচি, আরণ্য সংহিতা, মন্ত্র ব্রাহ্মণ এবং ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ সটীক (কিয়দংশ) দৈবত ব্রাহ্মণ (কিয়দংশ) "প্রত্নকম্রনন্দিনী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অত্যতনীয় সুবিখ্যাত সামবেদাচার্য্য সামশ্রমী মহাশয় বৈদিক গ্রন্থ নিচয় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হওয়াতে আমরা তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শ্রীরামদাস সেন।
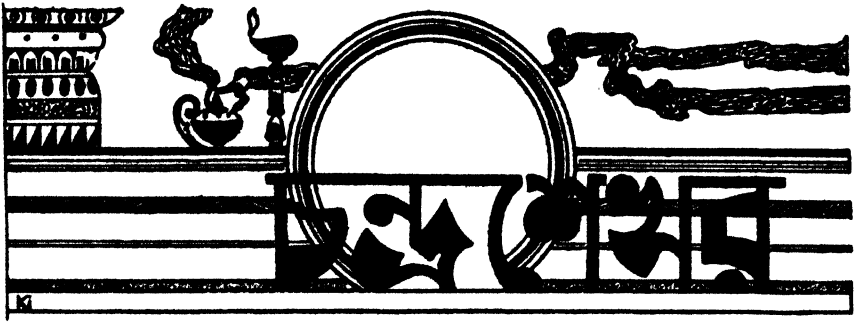
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বজ্রাঘাত

সেই নৈশ গঙ্গাবিচারিণী তরণী মধ্যে নিদ্রা হইতে জাগিল—শৈবলিনী।

বজরার মধ্যে দুইটি কামরা—একটিতে ফষ্টর ছিলেন, আর একটিতে শৈবলিনী এবং তাহার দাসী। শৈবলিনী এখনও বিবি সাজেন নাই—পরণে কালা-পেড়ে সাড়ী, হাতে বালা, পায়ে মল—সঙ্গে সেই পুরন্দরপুরের দাসী পার্ব্বতী। শৈবলিনী নিদ্রিতা ছিল—কে বলিবে সেই মহাশত্রুর নৌকায় বসিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল কি না? শৈবলিনী স্বপ্ন দেখিতেছিল—সেই ভীমা পুষ্করিণী চারি পাশে জলসংস্পর্শপ্রার্থী শাখারাজিতে বাপী তীর অন্ধকারের রেখা যুক্ত—শৈবলিনী যেন তাহাতে পদ্ম হইয়া মুখ ভাসাইয়া রহিয়াছে। সরোবরের প্রান্তে যেন এক সুবর্ণ নির্ম্মিত রাজহংস বেড়াইতেছে—তীরে একটা শ্বেত শূকর বেড়াইতেছে। রাজহংস দেখিয়া, তাহাকে ধরিবার জন্য শৈবলিনী যেন উৎসুক হইয়াছেন; কিন্তু রাজহংস তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছে। শূকর শৈবলিনী পদ্মকে ধরিবার জন্য ফিরিয়া বেড়াইতেছে; রাজহংসের মুখ দেখা যাইতেছে না, কিন্তু শূকরের মুখ দেখিয়া, বোধ হইতেছে যেন ফষ্টরের মুখের মত। শৈবলিনী রাজহংসকে ধরিতে যাইতে চান, কিন্তু চরণ মৃণাল হইয়া জলতলে বদ্ধ হইয়াছে—তিনি গতিশক্তি রহিত। এদিকে শূকর বলিতেছে আমার কাছে আইস আমি হাঁস ধরিয়া দিব।—প্রথম বন্দুকের শব্দে শৈবলিনীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—তাহার পর প্রহরীর জলে পড়িবার শব্দ শুনিলেন। অসম্পূর্ণ—ভগ্ন নিদ্রার বশে কিছু ভাল বুঝিতে পারিলেন না। সেই রাজহংস—সেই শূকর মনে পড়িতে লাগিল। যখন আবার বন্দুকের শব্দ হইল, এবং বড় গণ্ডগোল হইয়া উঠিল, তখন তাঁহার সম্পূর্ণ নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাহিরের কামরায় আসিয়া দ্বার হইতে একবার দেখিলেন—কিছু বুঝিতে পারিলেন না। আবার ভিতরে আসিলেন। ভিতরে আলো

জ্বলিতেছিল। পার্ব্বতীও উঠিয়াছিল। শৈবলিনী পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইতেছে, কিছু বুঝিতে পারিতেছ ?"

পা। "কিছু না। লোকের কথায় বোধ হইতেছে, নৌকায় ডাকাত পড়িয়াছে—সাহেবকে মারিয়া ফেলিয়াছে। আমাদেরই পাপের ফল।"

শৈ। "সাহেবকে মারিয়াছে, তাতে আমাদের পাপের ফল কি ? সাহেবেরই পাপের ফল।"

পা। "ডাকাত পড়িয়াছে—বিপদ আমাদেরই।"

শৈ। "কি বিপদ ? এক ডাকাতের সঙ্গে ছিলাম, না হয় আর এক ডাকাতের সঙ্গে যাইব। যদি গোরা ডাকাতের হাত এড়াইয়া কালা ডাকাতের হাতে পড়ি তবে মন্দ কি ?"

এই বলিয়া, শৈবলিনী ক্ষুদ্র মস্তক হইতে পৃষ্ঠোপরি বিলম্বিত বেণী আন্দোলিত করিয়া একটু হাসিয়া, ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর গিয়া বসিলেন। পার্ব্বতী বলিল, "এ সময়ে তোমার হাসি আমার সহ্য হয় না।"

শৈবলিনী বলিলেন, "অসহ্য হয়, গঙ্গায় জল আছে, ডুবিয়া মর। আমার হাসির সময় উপস্থিত হইয়াছে, আমি হাসিব। একজন ডাকাতকে ডাকিয়া আন না, একটু জিজ্ঞাসা পড়া করি।"

পার্ব্বতী রাগ করিয়া বলিল, "ডাকিতে হইবে না; তাহারা আপনারা আসিবে।"

কিন্তু চারি দণ্ড কাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইল, ডাকাত কেহ আসিল না। শৈবলিনী তখন দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আমাদের কি কপাল! ডাকাতেরাও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না।" পার্ব্বতী কাঁপিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে নৌকা আসিয়া, এক চরে লাগিল। নৌকা সেইখানে কিছুক্ষণ লাগিয়া রহিল। পরে, তথায় কয়েকজন লাঠিয়াল এক শিবিকা লইয়া উপস্থিত হইল। অগ্রে অগ্রে রামচরণ।

শিবিকা, বাহকেরা চরের উপর রাখিল। রামচরণ বজরায় উঠিয়া প্রতাপের কাছে গেল। পরে প্রতাপের উপদেশ পাইয়া, সে কামরার ভিতর প্রবেশ করিল। প্রথমে সে, পার্ব্বতীর মুখপ্রতি চাহিয়া শেষে শৈবলিনীকে দেখিল। শৈবলিনীকে বলিল, "আপনি নামুন।"

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে,—কোথায় যাইব ?"

রামচরণ বলিল, "আমি আপনার চাকর। কোন চিন্তা নাই—আমার সঙ্গে আসুন। সাহেব মরিয়াছে।"

শৈবলিনী নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিয়া রামচরণের সঙ্গে আসিল। রামচরণের

সঙ্গে সঙ্গে নৌকা হইতে নামিল। পার্ব্বতী সঙ্গে যাইতেছিল—রামচরণ তাহাকে নিষেধ করিল। পার্ব্বতী ভয়ে নৌকার মধ্যেই রহিল। রামচরণ শৈবলিনীকে শিবিকা মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলে, শৈবলিনী শিবিকারূঢ়া হইলেন। রামচরণ শিবিকা সঙ্গে প্রতাপের গৃহে গেলেন। চন্দ্রশেখর, জগৎশেঠের গৃহে লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তত রাত্রে সেদিগে সুবিধা নহে, বলিয়া রামচরণ প্রতাপের আলয়েই শৈবলিনীকে লইয়া গেল।

তখনও দলনী এবং কুল্‌সম সেই গৃহেতেই বাস করিতেছিলেন। তাহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে বলিয়া যেখানে তাহারা ছিল সেখানে শৈবলিনীকে লইয়া গেল না। উপরে, লইয়া গিয়া, তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া, রামচরণ আলো জ্বালিয়া রাখিয়া শৈবলিনীকে প্রণাম করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিদায় হইল।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী?" রামচরণ সে কথা কানে তুলিল না।

রামচরণ, আপনার বুদ্ধি খরচ করিয়া শৈবলিনীকে প্রতাপের গৃহে আনিয়া তুলিল, প্রতাপের সেরূপ অনুমতি ছিল না। তিনি রামচরণকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "পাল্কী জগৎশেঠের গৃহে লইয়া যাইও।" রামচরণ পথে ভাবিল—"এরাত্রে জগৎশেঠের ফটক খোলা পাইব কি না? দ্বারবানেরা প্রবেশ করিতে দিবে কি না? জিজ্ঞাসিলে কি পরিচয় দিব? পরিচয় দিয়া কি আমি খুনে বলিয়া ধরা পড়িব? সে সকলে কাজ নাই এখন বাসায় যাওয়াই ভাল।" এই ভাবিয়া সে পাল্কী বাসায় আনিল।

এদিগে প্রতাপ, পাল্কী চলিয়া গেল দেখিয়া, নৌকা হইতে নামিলেন। পূর্ব্বেই সকলে তাঁহার হাতের বন্দুক দেখিয়া, নিস্তব্ধ হইয়াছিল—এখন তাঁহার লাঠিয়াল সহায় দেখিয়া কেহ কিছু বলিল না। প্রতাপ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া আত্মগৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি গৃহদ্বারে আসিয়া দ্বার ঠেলিলে, রামচরণ দ্বার মোচন করিল। রামচরণ যে তাঁহার আজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করিয়াছে, তাহা গৃহে আসিয়াই রামচরণের নিকট শুনিলেন। শুনিয়া কিছু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "এখনও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া জগৎশেঠের গৃহে লইয়া যাও। ডাকিয়া লইয়া আইস।"

রামচরণ আসিয়া দেখিল,—লোকে শুনিয়া বিস্মিত হইবে—শৈবলিনী নিদ্রা যাইতেছেন। এ অবস্থায় নিদ্রা সম্ভবে না? সম্ভবে কি না তাহা আমরা জানি না,—আমরা যেমন ঘটিয়াছে তেমনি লিখিতেছি। রামচরণ শৈবলিনীকে জাগরিত না করিয়া, প্রতাপের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তিনি ঘুমাইতেছেন—ঘুম ভাঙ্গাইব কি?" শুনিয়া প্রতাপ বিস্মিত হইল—মনে মনে বলিল, "চাণক্য পণ্ডিত

লিখিতে ভুলিয়াছেন ; নিদ্রা স্ত্রীলোকের ষোলগুণ।” প্রকাশ্যে বলিলেন, “এত পীড়াপীড়িতে প্রয়োজন নাই। তুমিও ঘুমাও—পরিশ্রমের একশেষ হইয়াছে। আমিও এখন একটু বিশ্রাম করিব।”

রামচরণ বিশ্রাম করিতে গেল। তখনও কিছু রাত্র আছে। গৃহ—গৃহের বাহিরে নগরী—সর্ব্বত্র শব্দহীন, অন্ধকার। প্রতাপ একাকী নিঃশব্দে উপরে উঠিলেন। আপন শয়ন কক্ষাভিমুখে চলিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দ্বার মুক্ত করিলেন—দেখিলেন পালঙ্কে শয়ানা, শৈবলিনী! রামচরণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল যে প্রতাপের শয্যাগৃহেই সে শৈবলিনীকে রাখিয়া আসিয়াছে।

প্রতাপ, জ্বালিত প্রদীপালোকে দেখিলেন, যে শ্বেত শয্যার উপর কে নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকালীন গঙ্গার স্থির শ্বেতবারি বিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল শ্বেতপদ্মরাশি ভাসাইয়া দিয়াছে। মনোমোহিনী স্থিরশোভা! দেখিয়া, প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, বা ইন্দ্রিয় বশ্যতা প্রযুক্ত যে তাঁহার চক্ষু ফিরিল না এমত নহে—কেবল অন্যমন বশতঃ তিনি বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল—অকস্মাৎ স্মৃতি-সাগর মথিত হইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল।

শৈবলিনী নিদ্রা যান নাই—চক্ষু মুদিয়া আপনার অবস্থা চিন্তা করিতেছিলেন। চক্ষু নিমীলিত দেখিয়া, রামচরণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, যে শৈবলিনী নিদ্রিতা। গাঢ় চিন্তা বশতঃ প্রতাপের প্রথম প্রবেশের পদধ্বনি শৈবলিনী শুনিতে পান নাই। প্রতাপ বন্দুকটি হাতে করিয়া উপরে আসিয়াছিলেন। এখন বন্দুকটি দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন। কিছু অন্যমনা হইয়াছিলেন—সাবধানে বন্দুকটি রাখা হয় নাই ; বন্দুকটি রাখিতে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে শৈবলিনী চক্ষু চাহিলেন—প্রতাপকে দেখিতে পাইলেন। শৈবলিনী চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন শৈবলিনী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “এ কিএ? কে তুমি!”

এই বলিয়া, শৈবলিনী চীৎকার করিয়া, পালঙ্কে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

প্রতাপ জল আনিয়া, মূর্চ্ছিতা শৈবলিনীর মুখমণ্ডলে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন—সে মুখ শিশির নিসিক্ত পদ্মের মত শোভা পাইতে লাগিল। জল, কেশগুচ্ছ সকল আর্দ্র করিয়া, কেশগুচ্ছ সকল ঋজু করিয়া, ঝরিতে লাগিল—কেশ, পদ্মাবলম্বী শৈবালবৎ শোভা পাইতে লাগিল।

অচিরাৎ শৈবলিনী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল। প্রতাপ সরিয়া দাঁড়াইলেন। শৈবলিনী, স্থির ভাবে বলিলেন, “কে তুমি? প্রতাপ? না কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছ?”

প্রতাপ বলিলেন, "আমি প্রতাপ।"

শৈ। "একবার নৌকায় বোধ হইয়াছিল, যেন তোমার কণ্ঠ কানে প্রবেশ করিল ; কিন্তু তখনই বুঝিয়াছিলাম, যে সে ভ্রান্তি। আমি স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে তোমাকে জাগিয়াছিলাম, সেই কারণে ভ্রান্তি মনে করিলাম।"

এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শৈবলিনী নীরব হইয়া রহিলেন। শৈবলিনী সম্পূর্ণরূপে সুস্থিরা হইয়াছেন দেখিয়া প্রতাপ বিনাবাক্যব্যয়ে গমনোদ্যত হইলেন। শৈবলিনী বলিলেন, "যাইও না।"

প্রতাপ অনিচ্ছা পূর্ব্বক দাঁড়াইলেন। শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমার এই বাসা।"

শৈবলিনী বস্তুতঃ সুস্থিরা হয়েন নাই। হৃদয় মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছিল—তাঁহার নখ পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল—সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। তিনি, আর একটু নীরব থাকিয়া, ধৈর্য্য সংগ্রহ করিয়া, পুনরপি বলিলেন, "আমাকে এখানে কে আনিল ?"

প্র। "আমরাই আনিয়াছি।"

শৈ। "আমরাই ? আমরা কে ?"

প্র। "আমি আর আমার চাকর।"

শৈ। "কেন তোমরা এখানে আনিলে ? তোমাদের কি প্রয়োজন ?"

প্রতাপ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখ দর্শন করিতে নাই। তোমাকে ম্লেচ্ছের হাত হইতে উদ্ধার করিলাম,—আবার তুমি জিজ্ঞাসা কর এখানে কেন আনিলে ?"

শৈবলিনী ক্রোধ দেখিয়া ক্রোধ করিলেন না—বিনীত ভাবে, প্রায় বাষ্প গদগদ হইয়া বলিলেন, "যদি ম্লেচ্ছ ঘরে থাকা আমার এতই দুর্ভাগ্য মনে করিয়াছিলে,—তবে আমাকে সেইখানে মারিয়া ফেলিলে না কেন ? তোমাদের হাতে ত বন্দুক ছিল।"

প্রতাপ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তাও করিতাম—কেবল স্ত্রীহত্যার ভয়ে করি নাই। কিন্তু তোমার মরণই ভাল।"

শৈবলিনী কাঁদিল। পরে রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল,—"আমার মরাই ভাল—কিন্তু অন্যে যাহা বলে বলুক,—তুমি আমায় এ কথা বলিও না। আমার এ দুর্দ্দশা কাহা হতে ? তোমা হতে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে ? তুমি। কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া, কুপথ সুপথ জ্ঞানশূন্য হইয়াছি ? তোমার জন্য। কাহার জন্য চিরদুঃখিনী হইয়াছি ? তোমার জন্য।

কাহার জন্য আমি গৃহধর্ম্মে মন রাখিতে পারিলাম না? তোমারই জন্য। তুমি আমায় গালি দিও না।”

প্রতাপ বলিলেন, “তুমি পাপিষ্ঠা, তাই তোমায় গালি দিই। আমার দোষ? ঈশ্বর জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নহি। ঈশ্বর জানেন, আমি তোমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত তোমাকে সর্পিণী মনে করিয়া, ভয়ে, তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ—তোমার প্রবৃত্তির দোষ। তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমার দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি?

শৈবলিনী গর্জ্জিয়া উঠিল—বলিল “তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি, তোমার ঐ অতুল্য দেবতা মূর্ত্তি লইয়া আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবন কালে, ও রূপের জ্যোতিঃ কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম, ত তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম, ত মরিলাম না কেন? তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না, যে যদি তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে, ফষ্টর আমার কে?”

শুনিয়া, প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল—সমীপস্থা উৎফুল্ললোচনা শৈবলিনীকে রাক্ষসী বোধ হইতে লাগিল—তিনি বৃশ্চিক দষ্টের ন্যায় পীড়িত হইয়া, সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।

সেই সময়ে বহির্দ্বারে একটা বড় গোল উপস্থিত হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্

রামচরণ নৌকা হইতে শৈবলিনীকে লইয়া উঠিয়া গেলে, এবং প্রতাপ নৌকা পরিত্যাগ করিয়া গেলে, যে তেলিঙ্গা শিপাহী প্রতাপের আঘাতে অবসন্ন হস্ত হইয়া ছাদের উপরে বসিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে তটের উপর উঠিল। উঠিয়া, যে পথে শৈবলিনীর শিবিকা গিয়াছে সেই পথে চলিল। অতি দূরে থাকিয়া শিবিকা লক্ষ্য করিয়া, তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সে জাতিতে মুসলমান। তাহার নাম বকাউল্লাখাঁ। ক্লাইবের সঙ্গে প্রথম যে সেনা বঙ্গদেশে আসিয়াছিল, তাহারা মান্দ্রাজ হইতে আসিয়াছিল, বলিয়া, ইংরেজদিগের দেশী সৈনিকগণকে তখন বাঙ্গালাতে তেলিঙ্গা বলিত; কিন্তু এক্ষণে অনেক হিন্দুস্থানী হিন্দু ও মুসলমান ইংরেজ সেনাভুক্ত হইয়াছিল। বকাউল্লার নিবাস, গাজিপুরের নিকট।

বকাউল্লা শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্য থাকিয়া, প্রতাপের বাসা পর্য্যন্ত আসিল। দেখিল যে শৈবলিনী প্রতাপের গৃহে প্রবেশ করিল। বকাউল্লা, তখন আমিয়ট সাহেবের কুঠিতে গেল।

বকাউল্লা তথায় আসিয়া দেখিল, কুঠিতে একটা বড় গোল পড়িয়া গিয়াছে। বজরার বৃত্তান্ত আমিয়ট সকল শুনিয়াছেন। শুনিল যে আমিয়ট সাহেব বলিয়াছেন যে, যে অদ্য রাত্রেই অত্যাচারকারীদিগের সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, আমিয়ট সাহেব তাহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন। বকাউল্লা তখন আমিয়ট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল—তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিল,—বলিল যে "আমি সেই দস্যুর গৃহ দেখাইয়া দিতে পারি।" আমিয়ট্ সাহেবের মুখ প্রফুল্ল হইল—কুঞ্চিত ভ্রূ ঋজু হইল—তিনি চারিজন শিপাহী এবং একজন নাএককে বকাউল্লার সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলেন; বলিলেন, যে দুরাত্মাদিগকে ধরিয়া এখনই আমার নিকটে লইয়া আইস। বকাউল্লা কহিল যে তবে দুইজন ইংরেজ সঙ্গে দিউন—প্রতাপ রায় সাক্ষাৎ সয়তান—এদেশীয় লোক তাহাকে ধরিতে পারিবে না।

গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্ নামক দুইজন ইংরেজ আমিয়টের আজ্ঞামত বকাউল্লার সঙ্গে সশস্ত্রে চলিলেন।

গমন কালে গল্‌ষ্টন্ বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সে বাড়ীর মধ্যে কখন গিয়াছিলে?"

বকাউল্লা বলিল, "না।"

গল্‌ষ্টন্ জন্‌সন্‌কে বলিল, "তবে বাতি ও দেসলাইও লওও। হিন্দু তেল পোড়ায় না—খরচ হইবে।"

জন্‌সন্ পকেটে বাতি ও দীপশলাকা গ্রহণ করিলেন।

তাঁহারা তখন, ইংরেজদিগের যুদ্ধযাত্রা কালের গভীর পদবিক্ষেপে রাজপথ বহিয়া চলিলেন। কেহ কথা কহিল না। পশ্চাতে চারিজন শিপাহী নাএক ও বকাউল্লা চলিল। নগর প্রহরিগণ পথে তাঁহাদিগকে দেখিয়া, ভীত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্ শিপাহী লইয়া প্রতাপের বাসার সম্মুখে, নিঃশব্দে আসিয়া, দ্বারে ধীরে ধীরে করাঘাত করিলেন। রামচরণ উঠিয়া দ্বার খুলিতে আসিল।

রামচরণ অদ্বিতীয় ভৃত্য। পা টিপিতে, গা টিপিতে, তৈল মাখাইতে, সুশিক্ষিত হস্ত। বস্ত্রকুঞ্চনে, অঙ্গরাগ করণে, বড় পটু। রামচরণের মত ফরাশ নাই —তাহার মত দ্রব্যক্রেতা দুর্লভ। কিন্তু এ সকল সামান্য গুণ। রামচরণ লাঠি বাজিতে মুরশিদাবাদ প্রদেশে প্রসিদ্ধ—অনেক হিন্দু ও যবন তাহার হস্তের গুণে

ধরাশয়ন করিয়াছিল। বন্দুকে, রামচরণ কেমন অভ্রান্তলক্ষ্য এবং ক্ষিপ্রহস্ত, তাহার পরিচয় ফষ্টরের শোণিতে গঙ্গাজলে লিখিত হইয়াছিল।

কিন্তু এ সকল অপেক্ষা রামচরণের আর একটি সময়োপযোগী গুণ ছিল—ধূর্ত্ততা। রামচরণ শৃগালের মত ধূর্ত্ত। অথচ অদ্বিতীয় প্রভুভক্ত এবং বিশ্বাসী।

রামচরণ, দ্বার খুলিতে আসিয়া ভাবিল, "এখন দুয়ারে ঘা দেয় কে? ঠাকুর মশাই? বোধ হয়, কিন্তু যাহোক একটা কাণ্ড করিয়া আসিয়াছি—রাত্রিকালে না দেখিয়া দুয়ার খোলা হইবে না।"

এই ভাবিয়া রামচরণ নিঃশব্দে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া শব্দ শুনিতে লাগিল। শুনিল, দুইজনে অস্ফুটস্বরে একটা বিকৃত ভাষায় কথা কহিতেছে—রামচরণ তাহাকে "ইণ্ডিল মিণ্ডিল" বলিত—এখনকার লোকে বলে, ইংরেজি। রামচরণ মনে মনে বলিল, "রস বাবা! দুয়ার খুলি ত বন্দুক হাতে করিয়া—ইণ্ডিল মিণ্ডিলে যে বিশ্বাস করে, সে শ্যালা।"

রামচরণ আরও ভাবিল, "বুঝি একটা বন্দুকের কাজ নয়, কর্ত্তাকেও ডাকি।" এই বলিয়া রামচরণ প্রতাপকে ডাকিবার অভিপ্রায়ে দ্বার হইতে ফিরিল।

এই সময়ে ইংরেজদিগেরও ধৈর্য্য ফুরাইল। জন্‌সন্ বলিল, "অপেক্ষা কেন, লাথি মার, ভারতবর্ষীয় কবাট, ইংরেজি লাথিতে টেকিবে না।"

গল্‌ষ্টন্ লাথি মারিল। দ্বার, খড় খড়, ছড় ছড়, ঝন ঝন করিয়া উঠিল। রামচরণ দৌড়াইল। শব্দ প্রতাপের কানে গেল। প্রতাপ উপর হইতে সোপান অবতরণ করিতে লাগিলেন। সেবার কবাট ভাঙ্গিল না।

পরে জন্‌সন্ লাথি মারিল। কবাট ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল।

"এইরূপে ব্রিটিশ পদাঘাতে সকল ভারতবর্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ুক!" বলিয়া ইংরেজেরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিপাহীগণ প্রবেশ করিল।

সিঁড়িতে রামচরণের সঙ্গে প্রতাপের সাক্ষাৎ হইল। রামচরণ চুপি চুপি প্রতাপকে বলিল, "অন্ধকারে লুকান—ইংরেজ আসিয়াছে—বোধ হয় আম্‌বাত্তের কুঠি থেকে।" রামচরণ আমিয়টের পরিবর্ত্তে আম্‌বাত্ত বলিত।

প্র। "ভয় কি?"

রা। "আট জন লোক।"

প্র। "আপনি লুকাইয়া থাকিব—আর এই বাড়ীতে যে কয়জন স্ত্রীলোক আছে তাহাদের দশা কি হইবে! তুমি আমার বন্দুক লইয়া আইস।"

রামচরণ যদি ইংরেজদিগের বিশেষ পরিচয় জানিত, তবে প্রতাপকে কখনই লুকাইতে বলিত না। তাহারা যতক্ষণ কথোপকথন করিতেছিল, ততক্ষণে

সহসা গৃহ আলোকে পূর্ণ হইল। জন্‌সন্ জ্বালিত বর্ত্তিকা একজন শিপাহীর হস্তে দিলেন।

বর্ত্তিকার আলোকে ইংরেজেরা দেখিল, সিঁড়ির উপর দুইজন দাঁড়াইয়া আছে। জন্‌সন্ বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এই ?"

বকাউল্লা ঠিক চিনিতে পারিল না। অন্ধকার রাত্রে সে প্রতাপ ও রামচরণকে দেখিয়াছিল—সুতরাং ভাল চিনিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ভগ্ন হস্তের যাতনা অসহ্য হইয়াছিল—যে কেহ তাহার দায়ে দায়ী। বকাউল্লা বলিল—"হাঁ ইহারাই বটে।"

তখন ব্যাঘ্রের মত লাফ দিয়া, ইংরেজেরা সিঁড়ির উপর উঠিল। শিপাহীরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল দেখিয়া, রামচরণ ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রতাপের বন্দুক আনিতে উপরে উঠিতে লাগিল।

জন্‌সন্ তাহা দেখিলেন, নিজ হস্তের পিস্তল উঠাইয়া, রামচরণকে লক্ষ্য করিলেন। রামচরণ, চরণে আহত হইয়া, চলিবার শক্তি রহিত হইয়া বসিয়া পড়িল।

প্রতাপ নিরস্ত্র, পলায়নে অনিচ্ছুক। এবং পলায়নে যে রামচরণের দশা ঘটিল তাহাও দেখিলেন। প্রতাপ ইংরেজদিগকে স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে ? কেন আসিয়াছ ?" গল্‌ষ্টন্ প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি প্রতাপ রায়।"

সে নাম বকাউল্লার মনে ছিল। বজরার উপরে, বন্দুক হাতে, প্রতাপ গর্ব্বভরে বলিয়াছিলেন, "শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়।" বকাউল্লা বলিল, "জনাব, এই ব্যক্তি সরদার।"

জন্‌সন্, প্রতাপের এক হাত ধরিল, গল্‌ষ্টন্ আর এক হাত ধরিল। প্রতাপ দেখিলেন, বল প্রকাশ অনর্থক। নিঃশব্দে সকল সহ্য করিলেন। নাএকের হাতে হাতকড়ি ছিল, প্রতাপের হাতে লাগাইয়া দিল। গল্‌ষ্টন্ পতিত রামচরণকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটা ?" জন্‌সন্ দুইজন শিপাহীকে আজ্ঞা দিলেন, যে "উহাকেও লইয়া আইস।" দুইজন শিপাহী রামচরণকে টানিয়া লইয়া চলিল।

এই সকল গোলযোগ শুনিয়া দলনী ও কুল্‌সম্ জাগ্রত হইয়া মহা ভয় পাইয়াছিল। তাঁহারা কক্ষদ্বার ঈষন্মাত্র মুক্ত করিয়া এই সকল দেখিতেছিল। সিঁড়ির পাশে তাহাদের শয়ন ঘর।

যখন ইংরেজেরা, প্রতাপ ও রামচরণকে লইয়া নামিতেছিলেন, তখন শিপাহীর করস্থ দীপের আলোক, অকস্মাৎ ঈষন্মুক্ত দ্বারপথে দলনীর নীলমণিপ্রভ

চক্ষুর উপর পড়িল। বকাউল্লা সে চক্ষু দেখিতে পাইল। দেখিয়াই বলিল, "ফষ্টর সাহেবের বিবি!" গল্‌ষ্টন্‌, জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যও ত! কোথায়?"

বকাউল্লা পূর্ব্বকথিত দ্বার দেখাইয়া কহিল, "ঐ ঘরে।"

জন্‌সন্‌ ও গল্‌ষ্টন্‌ ঐ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলনী এবং কুল্‌সম্‌কে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা আমাদের সঙ্গে আইস।"

দলনী ও কুল্‌সম্‌, মহাভীতা এবং লুপ্তবুদ্ধি হইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সেই গৃহমধ্যে শৈবলিনীই একা রহিল। শৈবলিনীও সকল দেখিয়াছিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পাপের বিচিত্র গতি

যেমন যবন কন্যারা অল্প দ্বার খুলিয়া, আপনাদিগের শয়নগৃহ হইতে দেখিতেছিল, শৈবলিনীও সেইরূপ দেখিতেছিল। তিন জনই স্ত্রীলোক, সুতরাং স্ত্রীজাতি সুলভ কুতূহলে তিন জনেই পীড়িতা; তিন জনেই ভয়ে কাতরা; ভয়ের স্বধর্ম্ম ভয়ানক বস্তুর দর্শন পুনঃ পুনঃ কামনা করে। শৈবলিনীও আদ্যোপান্ত দেখিল। সকলে চলিয়া গেলে, গৃহমধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া শয্যোপরি বসিয়া শৈবলিনী চিন্তা করিতে লাগিল।

ভাবিল "এখন কি করি? একা, তাহাতে আমার ভয় কি? পৃথিবীতে আমার ভয় নাই। মৃত্যুর অপেক্ষা বিপদ নাই। যে স্বয়ং অহরহ মৃত্যুর কামনা করে তাহার কিসের ভয়? কেনই আমার সেই মৃত্যু হয় না? আত্মহত্যা বড় সহজ—সহজই বা কিসে? এতদিন জলে বাস করিলাম, কই একদিনও ত ডুবিয়া মরিতে পারিলাম না। রাত্রে যখন সকলে ঘুমাইত, ধীরে ধীরে নৌকার বাহিরে আসিয়া, জলে ঝাঁপ দিলে কে ধরিত? ধরিত—নৌকায় পাহারা থাকিত। কিন্তু, আমিও ত কোন উদ্যোগ করি নাই। মরিতে বাসনা, কিন্তু মরিবার উদ্যোগ করি নাই।—তখনও আমার আশা ছিল—আশা থাকিতে মানুষে মরিতে পারে না। কিন্তু আজ? আজ মরিবার দিন বটে। তবে প্রতাপকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে—প্রতাপের কি হয় তাহা না জানিয়া মরিতে পারিব না। প্রতাপের কি হয়? যাহোক না, আমার কি? প্রতাপ আমার কে? আমি তাহার চক্ষে পাপিষ্ঠা—সে আমার কে? কে, তাহা জানি না—সে শৈবলিনী পতঙ্গের জলন্ত বহ্নি—সে এই সংসার প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ—সে আমার মৃত্যু। আমি কেন গৃহত্যাগ করিলাম, কেন ম্লেচ্ছের সঙ্গে আসিলাম, কেন সুন্দরীর সঙ্গে ফিরিলাম না?"

শৈবলিনী আপনার কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল। যেখানে প্রাচীর পার্শ্বে, শৈবলিনী স্বহস্তে করবীর বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল—সেই করবীর সর্ব্বোচ্চশাখা প্রাচীর অতিক্রম করিয়া, রক্তপুষ্প ধারণ করিয়া, নীলাকাশকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া দুলিত, কখন তাহাতে ভ্রমর বা ক্ষুদ্র পক্ষী আসিয়া বসিত, তাহা মনে পড়িল। তুলসী মঞ্চ—তাহার চারিপার্শ্বে পরিষ্কৃত, সুমার্জ্জিত ভূমি, গৃহপালিত মার্জ্জার, পিঞ্জরে স্ফুটবাক্ পক্ষী, গৃহ পার্শ্বে সুস্বাদু আম্রের উচ্চবৃক্ষ—সকল স্মরণ পটে চিত্রিত হইতে লাগিল। কত কি মনে পড়িল! কত সুন্দর, সুনীল, মেঘশূন্য আকাশ, শৈবলিনী ছাদে বসিয়া দেখিতেন, কত সুগন্ধ প্রস্ফুটিত ধবল কুসুম, পরিষ্কার জল-সিক্ত করিয়া, চন্দ্রশেখরের পূজার জন্য, পুষ্পপাত্র ভরিয়া রাখিয়া দিতেন; কত স্নিগ্ধ, মন্দ, সুগন্ধী বায়ু, ভীমাতটে সেবন করিতেন, জলে কত ক্ষুদ্র তরঙ্গে স্ফাটিক বিক্ষেপ দেখিতেন, তাহার তীরে কত কোকিল ডাকিত। শৈবলিনী আবার নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "মনে করিয়াছিলাম, গৃহের বাহির হইলেই প্রতাপকে দেখিব; মনে করিয়াছিলাম, আবার পুরন্দরপুরের কুঠিতে ফিরিয়া যাইব—সেখান হইতে ফিরিঙ্গীকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যাইব—গিয়া প্রতাপের পদতলে লুটাইয়া পড়িব। আমি পিঞ্জরের পাখী, সংসারের গতি কিছুই জানিতাম না। জানিতাম না, যে মনুষ্যে গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে; জানিতাম না, যে ইংরেজের পিঞ্জর লোহার পিঞ্জর—আমার সাধ্য কি ভাঙ্গি। অনর্থক কলঙ্ক কিনিলাম, জাতি হারাইলাম, পরকাল নষ্ট করিলাম।" পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর একথা মনে পড়িল না, যে পাপের অনর্থকতা আর সার্থকতা কি? বরং অনর্থকতাই ভাল। কিন্তু একদিন সে এ কথা বুঝিবে; একদিন প্রায়শ্চিত্ত জন্য সে অস্থি পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবে। সে আশা না থাকিলে, আমরা এ পাপ চিত্রের অবতরণা করিতাম না। পরে সে ভাবিতে লাগিল "পরকাল? সে ত যেদিন প্রতাপকে দেখিয়াছি, সেই দিন গিয়াছে। যিনি অন্তর্যামী তিনি সেই দিনেই আমার কপালে নরক লিখিয়াছেন। ইহকালেও আমার নরক হইয়াছে—আমার মনই নরক—নহিলে এত দুঃখ পাইলাম কেন? নহিলে দুই চক্ষের বিষ ফিরিঙ্গীর সঙ্গে এতকাল বেড়াইলাম কেন? শুধু কি তাই, বোধ হয়, যাহা কিছু আমার ভাল, তাহাতেই অগ্নি লাগে। বোধ হয়, আমারই জন্য, প্রতাপ এই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে,—আমি কেন মরিলাম না?"

শৈবলিনী আবার কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে চক্ষু মুছিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিল; অধর দংশিত করিল; ক্ষণকাল জন্য তাহার প্রফুল্ল রাজীবতুল্য মুখ, রুষ্ট সর্পের চক্রের ভীমকান্ত শোভা ধারণ করিল। সে আবার বলিল, "মরিলাম না

কেন ?” শৈবলিনী সহসা কক্ষাল হইতে একটি “গোঁজে” বাহির করিল। তন্মধ্যে তীক্ষ্ণধার ক্ষুদ্র ছুরিকা ছিল। শৈবলিনী ছুরিকা গ্রহণ করিল। তাহার ফলক নিষ্কোষিত করিয়া, অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা তৎসহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। বলিল, “বৃথায় কি এ ছুরি সংগ্রহ করিয়াছিলাম? কেন এতদিন এ ছুরি আমার এ পোড়া বুকে বসাই নাই? কেন,—কেবল আশায় মজিয়া। এখন ?” এই বলিয়া শৈবলিনী ছুরিকাগ্রভাগ হৃদয়ে স্থাপিত করিল। ছুরি সেইভাবে রহিল। শৈবলিনী ভাবিতে লাগিল, “আর একদিন, ছুরি এইরূপে নিদ্রিত ফষ্টরের বুকের উপর ধরিয়াছিলাম। সেদিন তাহাকে মারি নাই; সাহস হয় নাই; আজিও আত্মহত্যায় সাহস হইতেছে না। এই ছুরির ভয়ে দুরন্ত ইংরেজও বশ হইয়াছিল—সে বুঝিয়াছিল, যে, সে আমার কামরায় প্রবেশ করিলে, এই ছুরিতে হয় সে মরিবে, নয় আমি মরিব। দুরন্ত ইংরেজ ইহার ভয়ে বশ হইয়াছিল,—আমার এ দুরন্ত হৃদয় ইহার ভয়ে বশ হইল না। মরিব ? না—আজ নহে। মরি, ত সেই বেদগ্রামে গিয়া মরিব। সুন্দরীকে বলিব, যে আমার জাতি নাই, কুল নাই, কিন্তু এক পাপে আমি পাপিষ্ঠা নহি। তারপর মরিব।—আর তিনি—যিনি আমার স্বামী—তাঁহাকে কি বলিয়া মরিব ? সে কথা ত মনে করিতে পারি না। মনে করিলে বোধ হয়, আমাকে শত সহস্র বৃশ্চিকে দংশন করে—শিরায় শিরায় আগুন জ্বলে। আমি তাঁহার যোগ্যা নহি, বলিয়া আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তাতে কি তাঁর কোন ক্লেশ হইয়াছে ? তিনি কি দুঃখ করিয়াছেন ? না—আমি তাঁহার কেহ নহি। পুঁতিই তাঁহার সব। তিনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না। একবার নিতান্ত সাধ হয় সেই কথাটি আমাকে কেহ আসিয়া বলে—তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন। তাঁহাকে আমি কখন ভালবাসি নাই—কখন ভাল বাসিতে পারিব না—তথাপি তাঁহার মনে যদি কোন ক্লেশ দিয়া থাকি, তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারি হইল। আর একটি কথা তাঁহাকে বলিতে সাধ করে,—কিন্তু ফষ্টর মরিয়া গিয়াছে, সে কথার আর সাক্ষী কে ? আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে ?” শৈবলিনী শয়ন করিল। শয়ন করিয়া, সেইরূপ চিন্তাভিভূত রহিল। প্রভাতকালে তাহার নিদ্রা আসিল—নিদ্রায় নানাবিধ কুস্বপ্ন দেখিল। যখন তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে—মুক্ত গবাক্ষপথে গৃহমধ্যে রৌদ্র প্রবেশ করিয়াছে। শৈবলিনী চক্ষুরুন্মীলন করিল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে যাহা দেখিল তাহাতে বিস্মিত, ভীত, স্তম্ভিত হইল !

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শিখিতে কে পারে ?

সেই দিন প্রাতে চন্দ্রশেখর, দলনী বেগমের প্রতি নবাবের কিরূপ অভিপ্রায় প্রচারিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই রাত্রে যে প্রতাপ শৈবলিনীর উদ্ধারে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, চন্দ্রশেখরের তাহা স্মরণ ছিল ; কিন্তু তিনি ক্রমে রমানন্দ স্বামীর উপদেশের বশবর্ত্তী হইতেছিলেন ; চিত্ত-সংযম এবং আত্ম-বিসর্জ্জন অভ্যাস করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে রামগোবিন্দ রায়ের কাছে গেলেন। রামগোবিন্দ বলিল, "আপনি যে পত্র দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এপর্য্যন্ত শেষ করিতে পারি নাই। দলনী বেগম কোথায় গিয়াছে, তাহারই সন্ধানে নবাব বড় ব্যস্ত।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "ঐ পত্রমধ্যে সেই সন্ধানই আছে।"

রামগোবিন্দ বিস্মিত হইল। বলিল, "পূর্ব্বে বলেন নাই কেন ?"

চ। "বলিলে কোন বিশেষ ফল হইবে, এমত বুঝি নাই।"

রাম। "ভাল, নবাবের বার হইলেই ইহা শীঘ্র শেষ করিব। ততক্ষণ—"

চ। "ততক্ষণ আমি ফিরিয়া আসিতেছি।"

চন্দ্রশেখর, তখন এই সকল কথা দলনীকে বলিতে প্রতাপের বাসায় আসিলেন। তথায়, যে ঘরে দলনীকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সন্ধান করিয়া দেখিলেন, দলনী বা কুল্‌সম্‌ নাই। রামচরণের সন্ধান করিয়া, সন্ধান পাইলেন না। ঘরের কবাট ভাঙ্গা দেখিয়া বড় চিন্তিত হইলেন।

প্রতাপের সন্ধানার্থ উপরে উঠিলেন। দেখিলেন সিঁড়িতে রক্তের চিহ্ন ; রামচরণের আহত চরণ হইতে রক্ত পড়িতে পড়িতে গিয়াছিল সেই রক্তের চিহ্ন। চন্দ্রশেখর বুঝিলেন, কোন বিশেষ বিপদ ঘটিয়াছে। তখন তিনি দ্রুতপদে, প্রতাপের সন্ধানে উপরে উঠিলেন। দেখিলেন, প্রতাপ কোথাও নাই—তাহার শয্যোপরি নিদ্রিতা শৈবলিনী।

শৈবলিনীকে দেখিয়া চন্দ্রশেখরের দেহাগ্রভাগ কিঞ্চিৎ নমিত হইয়াছিল বটে ; কিন্তু তাহা ক্ষণকাল জন্য। চিত্তবেগ আপনি সম্বৃত হইল।

জ্বরের প্রদাহে দহ্যমান রোগী, স্বচ্ছ শীতল জল দেখিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ঝাঁপ দেয় না। চন্দ্রশেখর কিয়ৎক্ষণ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া, অনিমিক লোচনে, সুষুপ্তা পত্নীর মুখমণ্ডল দেখিতে লাগিলেন। আর একদিন, এইরূপ তাহার সুষুপ্তিসুস্থির সুকৃষ্ণ ভ্রূপল্লবাদি শোভিত, বদন মণ্ডল দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল। সেই সময়ে শৈবলিনীর নিদ্রা

ভঙ্গ হইল। শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকেই দ্বারপথে দেখিয়া, বিস্মিত, ভীত এবং স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

শৈবলিনী নিদ্রোত্থিতা হইয়াছেন, দেখিয়া চন্দ্রশেখর আর দাঁড়াইলেন না। নীচে গেলেন। সেখানে বহির্দ্বারে ভগ্ন কবাটের উপর বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ সেই ভাবে রহিলেন। সে স্থৈর্য্যের কথা বর্ণনা করা যায় না—ভর্ত্তার অনুগামিনী চিতারূঢ়া সাধ্বীর স্থৈর্য্যের ন্যায়, সেই অদ্ভুত, অলৌকিক, অচিন্তনীয় স্থৈর্য্য! যে জীবন্তে অগ্নি মধ্যে, হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিতে পারে না, সে সেই স্থৈর্য্যের কথাও অনুমান করিতে পারে না।

চন্দ্রশেখর তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, একজন প্রতিবাসীর গৃহে গেলেন। সে একজন লোহার দ্রব্য বিক্রেতা, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, বলিতে পার, যাহারা এখানে বাসা করিয়াছিল তাহারা কোথায় গিয়াছে?"

পণ্যাজীব কহিল, "কাল ও বাড়ীতে বড় গোলমাল গিয়াছে। গোলমালের শব্দে আমরা উঠিয়া দেখিলাম, কয়জন শিপাহী, উহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গেল। স্ত্রী-পুরুষ সকল ধরিয়া লইয়া গেল। একটা বন্দুকের শব্দও শুনিয়াছিলাম।"

চ। "তাহারা কি নবাবের শিপাহী না ইংরেজের শিপাহী?"

দোকানদার বলিল, "তাহা জানি না।"

চ। "কেহ জখম হইয়াছিল?"

দো। "তাহা জানি না—কিন্তু একজনকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহাকে চিনি। সে বাড়ীর চাকর।"

চন্দ্রশেখর সেস্থান হইতে জগৎশেঠের গৃহে গেলেন। জগৎশেঠদিগের সঙ্গে তাঁহার যে কথোপকথন হইল, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। চন্দ্রশেখর গেলে, জগৎশেঠেরা প্রতাপের বাসায় শিবিকা প্রেরণ করিলেন। তথা হইতে শৈবলিনী জগৎশেঠের গৃহে আনীতা হইলেন। তিনি জাতিভ্রষ্টা বলিয়া তাঁহার পৃথক্ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

চন্দ্রশেখর, জগৎশেঠের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তখন সেই অলৌকিক ধৈর্য্যের গ্রন্থি শিথিল হইল। বোধ হইল যেন, এ সংসারের যাহা কিছু কার্য্য বাকি ছিল, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি আর চলিতে পারিলেন না—পথিপার্শ্বে শীতল আম্র বৃক্ষচ্ছায়ায়, ধূলির উপর গিয়া শয়ন করিলেন। ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, "শৈবলিনি! শৈবলিনি! শৈবলিনি! তুমি আমার ঘরে আইস—আমি তোমায় গ্রহণ করিব!" আবার সেখান হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; দ্রুতপদে রমানন্দ স্বামীর আশ্রমে

গেলেন, রমানন্দ স্বামীকে দেখিয়া বলিলেন, "গুরো! আর সহ্য করিতে পারি না। আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি শৈবলিনীকে গ্রহণ করি।"

রমানন্দ স্বামী কহিলেন, "তাহাকে পাওয়া গিয়াছে?"

চন্দ্রশেখর কথার উত্তর করিলেন না—কেবল বলিলেন, "আজ্ঞা করুন, আমি তাহাকে গ্রহণ করি।"

রমানন্দ স্বামী, ভাব বুঝিয়া, বলিলেন, "বসো, কিছু শাস্ত্রীয় কথার আলোচনা করা যাউক—তুমি পণ্ডিত, তাহাতে তোমার মনঃস্থির হইবে।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "দেখুন, কোন শাস্ত্রে আছে, স্লেচ্ছাসক্তা ব্যভিচারিণীকে গ্রহণ করা যাইতে পারে? সেই শাস্ত্র আমাকে বলুন।"

রমানন্দ স্বামী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন, "চন্দ্রশেখর, আমিও তোমার মত পুথি সকল ভস্ম করিয়া ফেলিব; তোমার মত জ্ঞানী ব্যক্তিও যদি এইরূপ অধীর, নশ্বর সুখাভিলাষী, মায়া মুগ্ধ, তবে জ্ঞানোপার্জ্জনের ফল কি?"

চন্দ্রশেখর অধোবদনে রহিলেন।

কোথা হতে পাখি তুমি এসেছ উড়িয়া ?—
নহে ত এদেশে বাস,
কোথা থাক বার মাস ?
কোন সুখধাম পাখি এসেছ ত্যজিয়া ?
এদেশের পাখী যত,
নহে ত তোমার মত,
নাহি গায় অবিরত অদৃশ্য হইয়া—
কে তুমি রে বল পাখি যথার্থ করিয়া।

২

না জানি বিহঙ্গ তুমি বিচিত্র কেমন !—
যেখানে সেখানে যাই,
ও রব শুনিতে পাই,
জেগে ওঠে হৃদয়েতে কতই স্বপন,
কত কথা পড়ে মনে,
ওরে পাখি তোর গানে,—
মিছামিছি আঁখি নীরে ভাসি কি কারণ ?
বল পাখি খুলে বল তব বিবরণ।

৩

এত গাও তবু তুমি না হও কাতর।
দিবা নিশি নাহি জ্ঞান,
কেবলি করিছ গান
কেমনে অন্তরে রয়ে কাঁদাও অন্তর ?
যামিনী গভীরা হ'লে,
জগত ঘুমায়ে গেলে,
মনে করি নিদ্রা যাব,
নিদ্রা গিয়ে জুড়াইব,
অমনি শ্রবণে পশি তব কণ্ঠস্বর
কাঁপায় হৃদয় তন্ত্রী, পাখি নিরন্তর।

৪

তখন এমনি, হায় ! জ্ঞান হয় মনে
চিনি পাখি আমি তোরে,
লুকাবি কেমন করে ?
কেমনে অন্তরে আর থাকিবি গোপনে ?
মনে করি ভুলি নাই,
আবার ভুলিয়ে যাই,
কেবলি শুনিতে পাই,
কিন্তু তোরে ওরে পাখি, না দেখি নয়নে
বল পাখি বল তোর কিবা আছে মনে।

৫

আমারো একটী পাখী ছিলরে কেমন !—
সোণার পিঞ্জর ছেড়ে,
একদিন গেল উড়ে
তদবধি আর নাহি দিল দরশন ;
কত আদর দিয়ে তারে,
কতই যতন করে,
পাছে দুঃখ হয় তার
একটী বিহঙ্গ আর
সখা করে তার কাছে করিনু স্থাপন,
তবু সে নিদয় পাখী গেল কি কারণ ?

৬

বিচ্ছেদ যন্ত্রণা পাখি বড়ই দারুণ !—
এস দেখি দেখি, পাখি,
তুমি সেই পাখী নাকি,
চিনিতে পারিবে কিসে সখারে এখন,
বহুদিন হ'লো বলে
তারে কি গিয়েছ ভুলে,
তার যে হৃদয় মাঝে
এ বিরহ বজ্র বাজে,
সেও যে তোমার রব করিয়া শ্রবণ
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া চাহে করিতে ভ্রমণ।

৭

মোর দিব্য ওরে পাখি, যেওনা কোথায় ;
দিবা নিশি কাছে থাক,
অই বলে অই ডাক,
আর যে কিছুই ভাল লাগেনা ধরায় !
হেন ইচ্ছা হয় মনে
পাখী হয়ে পাখী সনে,
ভূমণ্ডল পরিহরি,
বিমানে বিহার করি,
ভ্রমি তব সাথে সাথে যথায় তথায়—
এ ভবে থাকিতে আর মন নাহি চায় !

শ্রীগোপাল কৃষ্ণ ঘোষ।

চতুর্থ সংখ্যা

পতঙ্গ

বাবুর বৈঠকখানায় সেজ জ্বলিতেছে—পাশে আমি, মোসায়েবি ধরণে বসিয়া আছি। বাবু দলাদলির গল্প করিতেছেন,—আমি আফিঙ্গ চড়াইয়া ঝিমাইতেছি। দলাদলিতে চটিয়া, মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিয়াছি। নাচার! বিধিলিপি! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি ক্রিয়া পরম্পরার একটি ফল এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্য রাত্রে নসীরাম বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং আমার সাধ্য কি যে তাহার অন্যথা করি।

ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিলাম যে একটা পতঙ্গ আসিয়া, ফাণুষের চারি পাশে শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। "চোঁ-ও-ও" "বোঁ-ও-ও" করিয়া শব্দ করিতেছে। আফিমের ঝোঁকে মনে করিলাম, পতঙ্গের ভাষা কি বুঝিতে পারি না? কিছুক্ষণ কাণ পাতিয়া শুনিলাম—কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে পতঙ্গকে বলিলাম, "তুমি কি ও চোঁ বোঁ করিয়া বলিতেছ, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন হঠাৎ আফিম প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ প্রাপ্ত হইলাম—শুনিলাম, পতঙ্গ বলিল, "আলোর সঙ্গে কথা কহিতেছি—তুমি চুপ কর।" আমি তখন চুপ করিয়া পতঙ্গের কথা শুনিতে লাগিলাম। পতঙ্গ বলিতেছে—

দেখ, আলো মহাশয়, তুমি সেকালে ভাল ছিলে—পিতলের পিলসুজের উপর মেটে প্রদীপে শোভা পাইতে—আমরা স্বচ্ছন্দে পুড়িয়া মরিতাম। এখন আবার সেজের ভিতর ঢুকিয়াছ—আমরা চারিদিগে ঘুরে বেড়াই—প্রবেশ করিবার পথ পাই না, পুড়িয়া মরিতে পাই না।

দেখ, পুড়িয়া মরিতে আমাদের রাইট আছে—আমাদের চিরকালের হক্। আমরা পতঙ্গ জাতি, পূর্ব্বাপর আলোতে পুড়িয়া মরিয়া আসিতেছি—কখন কোন আলো আমাদের বারণ করে নাই। তেলের আলো, বাতির আলো, কাঠের আলো,

কোন আলো কখন বারণ করে নাই। তুমি কাঁচ মুড়ি দিয়া আছ কেন প্রভু ? আমরা গরিব পতঙ্গ—আমাদের উপর সহমরণ নিষেধের আইন জারি কেন ? আমরা কি হিন্দুর মেয়ে, যে পুড়িয়া মরিতে পাব না ?

দেখ, হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ। হিন্দুর মেয়ের আশা ভরসা থাকিতে কখন পুড়িয়া মরিতে চাহে না—আগে বিধবা হয়, তবে পুড়িয়া মরিতে বসে। আমরাই কেবল সকল সময়েই আত্মবিসর্জ্জনে ইচ্ছুক। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীজাতির তুলনা ?

আমাদিগের ন্যায়, স্ত্রীজাতিও রূপের শিখা জ্বলিতে দেখিলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে বটে। ফলও এক,—আমরাও পুড়িয়া মরি, তাহারাও পুড়িয়া মরে। কিন্তু, দেখ, সেই দাহতেই তাদের সুখ,—আমাদের কি সুখ ? আমরা কেবল পুড়িবার জন্য পুড়ি, মরিবার জন্য মরি। স্ত্রীজাতিতে পারে ? তবে আমাদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা কেন ?

শুন, যদি জ্বলন্ত রূপে শরীর না ঢালিলাম তবে এ শরীর কেন ? অন্যজীবে কি ভাবে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা পতঙ্গ জাতি আমরা ভাবিয়া পাই না, কেন এ শরীর ?—লইয়া কি করিব ? নিত্য নিত্য কুসুমের মধু চুম্বন করি, নিত্য নিত্য বিশ্বপ্রফুল্লকর সূর্য্য কিরণে বিচরণ করি—তাহাতে কি সুখ ? ফুলের সেই একই গন্ধ, মধুর সেই একই মিষ্টতা, সূর্য্যের সেই এক প্রকারই প্রতিভা। এমন, অসার, পুরাতন, বৈচিত্র্যশূন্য জগতে থাকিতে আছে, কাঁচের বাহিরে আইস, জ্বলন্ত রূপশিখায় গা ঢালিব।

দেখ, আমার ভিক্ষাটি বড় ছোট—আমার প্রাণ, তোমাকে দিয়া যাইব, লইবে না ? দিব বৈ ত গ্রহণ করিব না। তবে ক্ষতি কি ? তুমি রূপ পোড়াইতে জন্মিয়াছ, আমি পতঙ্গ, পুড়িতে জন্মিয়াছি ; আইস, যার যে কাজ করিয়া যাই। তুমি হাসিতে থাক, আমি পুড়ি।

তুমি বিশ্বধ্বংসক্ষম—তোমাকে রোধিতে পারে জগতে এমন কিছুই নাই—তুমি কাঁচের ভিতর লুকাইয়াছ কেন ? তুমি জগতের গতির কারণ—কার ভয়ে তুমি ডোমের ভিতর লুকাইয়াছ ? কোন্ ডোমে এ ডোম গড়িয়াছে ? কোন্ ডোমে তোমাকে এ ডোমের ভিতর পুরিয়াছে ? তুমি যে বিশ্বব্যাপী, কাঁচ ভাঙ্গিয়া আমায় দেখা দিতে পার না ?

তুমি কি ? তা আমি জানি না—আমি জানি না—কেবল জানি যে তুমি আমার বাসনার বস্তু—আমার জাগ্রতের ধ্যান—নিদ্রার স্বপন—জীবনের আশা—মরণের আশ্রয়। তোমাকে কখন জানিতে পারিব না—জানিতে চাহিও না—যে

দিন জানিব সেই দিন, আমার সুখ যাইবে। কাম্য বস্তুর স্বরূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে ?

তোমাকে কি পাইব না ? কতদিন তুমি কাঁচের ভিতর থাকিবে ? আমি কাঁচ ভাঙ্গিতে পারিব না ? ভাল থাক—আমি ছাড়িব না—আবার আসিতেছি—বোঁ—ও—ও

পতঙ্গ উড়িয়া গেল।

নসীরাম বাবু ডাকিল, "কমলাকান্ত!" আমার চমক হইল—চাহিয়া দেখিলাম—বুঝি বড় ঢুলিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু চাহিয়া দেখিয়া নসীরামকে চিনিতে পারিলাম না—দেখিলাম, মনে হইল একটা বৃহৎ পতঙ্গ বালিশ ঠেসান দিয়া, তামাকু টানিতেছে। সে কথা কহিতে লাগিল—আমার বোধ হইতে লাগিল যে সে চোঁ বোঁ করিয়া কি বলিতেছে। এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল, যে মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে—সকলেই মনে করে সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাঁধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান বহ্নি, ধন বহ্নি, মান বহ্নি, রূপ বহ্নি, ধর্ম্ম বহ্নি, ইন্দ্রিয় বহ্নি, সংসার বহ্নিময়। আবার সংসার কাচময়। যে আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই—কই তা ত পাই না—আবার ফিরিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া যাই—আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে, সংসার এতদিন পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধর্ম্মবিৎ চৈতন্য দেবের ন্যায় ধর্ম্ম মানসপ্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয়জন বাঁচিত ? অনেকে জ্ঞান বহ্নির আবরণ কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়, সক্রেতিস্, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। রূপ বহ্নি, ধন বহ্নি, মান বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে, আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার, মান বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্য্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন ;—জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞান বহ্নিজাত দাহের গীত "Paradise Lost"; ধর্ম্মবহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেণ্ট পল। ভোগবহ্নির পতঙ্গ "আণ্টনি, ক্লিওপেত্রা" ; রূপবহ্নির, রোমিও ও জুলিয়েট, ঈর্ষ্যাবহ্নির ওথেলো। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরের ইন্দ্রিয় বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহ বহ্নিতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি।

বহ্নি কি আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এসকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি মানে। ধর্ম্ম পুস্তক হারি

মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি, তাহা কি কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?

দেখ ভাই, পতঙ্গের দল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোন ফল নাই। পার, আগুনে পড়িয়া পুড়িয়া মর। না পার, চল, "বোঁ" করিয়া চলিয়া যাই।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

আইল গোধূলি—সৌর রঙ্গভূমে,
নামিল পশ্চিমে ধীরে যবনিকা
ধূসর বরণা, ফুরাইল ক্রমে
দিনেশ দৈনিক গতি অভিনয়।
অষ্টমীর চন্দ্র—রজতের চাপ!—
নভঃ মধ্যস্থলে বিষণ্ণ বদনে
ভাসিল; লোভিতে যেন প্রিয় রবি
আলিঙ্গন, ভ্রমি অলক্ষিতে শশী
অর্দ্ধ সৌর রাজ্য, বিরহেতে কৃশ
নিরাশা মলিন।

এমন সময়ে,
ওই সরোবরে বসিয়া নীরবে,
করেতে কপোল কে ওই রমণী?
যেন নিদাঘের আকাশ হইতে
একটী নক্ষত্র সরোবর ঘাটে
পড়েছে খসিয়া; কিম্বা হায় কোন
বিষধর ফণী, রেখেছে খুলিয়া
মস্তকের মণি? এই নিশিথিনী
শ্বেত কলেবরে, বর্ষিতেছে যথা
বিকচ নলিনী শিশিরের বিন্দু;
তেমতি বামার নয়ন কমল
বর্ষিতেছে অশ্রু; চন্দ্রের কিরণ,
না ছুঁইতে অশ্রু সরসী হৃদয়,
চুম্বিছে তরল সেই মুক্তাফল।

অবনত মুখে ভাসমান ওই
ধাতু কলসীর পৃষ্ঠের উপর
অযত্নে দক্ষিণ করে সুকোমল
রক্ষিত; আনন্দে কলসী সে সুখ
পরশে নাচিছে; নাচিছে যেমতি
বঙ্গ বিরহিণী হৃদয় চঞ্চল
শারদ উৎসবে পতির মিলনে।
হায় সে আনন্দে চক্রে চক্রে ওই
চঞ্চল হিল্লোল করিছে বিকীর্ণ
সরসী হৃদয়ে; আনন্দে গলিয়া
সুনীল সরসী থেকে থেকে যেন
উন্মত্তের প্রায়, ডুবায়ে কলসী,
চুম্বিছে বামার কর কমলিনী।
থেকে থেকে যেন আনন্দে বিহ্বল,
প্রেমাস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসে "কি তুমি?
কে তুমি?"

কে তুমি? আজি বঙ্গালয়
আনন্দ আগার, এসেছেন উমা*
বৎসর অন্তরে, আজি বঙ্গদেশ
সুখ-পারাবার; হিমালয় হতে
আনন্দ-জাহ্নবী শত মুখে আজি
বঙ্গে আবির্ভূত, ভাসিয়াছে তাহে
বাঙ্গালির দুঃখ দারিদ্র দুঃসহ;

---

* বোধ হয় এই কাব্য শারদীয়া পূজার সময়ে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু পূজার পরে ইহা সম্পাদক প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই জন্য যথাসময়ে প্রকাশিত হয় নাই।

ভুলিয়াছে সব, নিরখি উমার
প্রসন্ন স্নেহার্দ্র বদন চন্দ্রিমা।
মুহূর্ত্তেক তরে, ভুলিয়াছে সবে
দাসত্ব শৃঙ্খল,—অদৃষ্ট দুর্ব্বার !—
কি সুখের দিন—এই তিন দিন
বাঙ্গালী জীবনে—তিন বিন্দু বারি
বঙ্গ মরুভূমে—এই তিন মণি
অন্ধকার খনি বঙ্গ সম্বৎসরে ;
তিনটী নক্ষত্র হায় ! বাঙ্গালীর
দুঃখ পারাবারে ; এমন সুখের—
ওই শুন ওই আরতির ধ্বনি !
নানা বাদ্যযন্ত্র মিশি এক তানে,
তুলিছে আকাশে আনন্দের ধ্বনি,
ওই শুন ওই আরতির ধ্বনি !
সেই রূপ আজি বঙ্গবাসি মন
একানন্দ স্রোতে হইয়া বিলয়
বহিছে স্বরগ পথে ; বঙ্গদেশ
আজি ধরাতলে প্রীতিপারাবার
পবিত্র নির্ম্মল—প্রত্যেক বাঙ্গালী
উর্ম্মি মাত্র তার।

এমন সময়ে
বসে একাকিনী, সজল নয়না
কে তুমি রমণি ? কেন বিশ্ব প্লাবী
আনন্দ প্রবাহ, পশিলনা তব
কোমল হৃদয়ে ? তুলিল না তাহে
একটী হিল্লোল ? হেন সৌরকর
নাহি পশে যে হৃদয়ে, নাহি জানি
হায় ! সে হৃদয় অরণ্য কেমন !
বাজিতেছে যেই আনন্দ সঙ্গীত
বঙ্গ-চিত্ত-যন্ত্রে, কাঁদাইল কেন
তোমার হৃদয় বীণা ? তোল মুখ,—
বলনা কে তুমি ?

বিষাদে নিশ্বাসি
তুলিল বদন বামা ; দেখিলাম—
বঙ্গের দুঃখিনী বিধবা রমণী।

শ্রীনঃ।

পূর্ব্বে যে গ্রন্থদ্বয়ের বিবরণে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম অদ্য তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেছি। কয়েক মাস পূর্ব্বে আমাদিগের পুরোহিতের মৃত্যু হয়। তিনি নিজে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার বাসা হইতে এক রাশি হস্ত লিখিত গ্রন্থ লব্ধ হইল। অধিকাংশই জীর্ণ ও অসম্পূর্ণ তন্মধ্যে দুইটী যমক কাব্য প্রাপ্ত হই।

১নং গ্রন্থ ১১ পত্রে সম্পূর্ণ কিন্তু প্রথম পত্র অবিদ্যমান। কদর্য্য ও অশুদ্ধ নাগরাক্ষরে লিখিত। দ্বিতীয় পত্রে "হেকুন্দ সমানদন্তি কুন্দ কলিকাপস্থমান দশনে সখি প্রিয়হীনাহৃদয়াবনীরদৈঃ" ইত্যাদি বলিয়া টীকা আরম্ভ হইয়াছে ও মূল স্থলে "হংসীনদম্মেঘভয়াদ্দ্বস্তি" ইত্যাদি শ্লোক বিলিখিত। ইহাতে বোধ হয় যে প্রথম পত্রে মূলের "নিচিতং খমুপেত্য নীরদৈঃ প্রিয়হীনাহৃদয়াবনীরদৈঃ" ইত্যাদি যমক কাব্যের আদ্য শ্লোক ও টীকাস্থলে কোনরূপ মঙ্গলাচরণ বা আত্ম পরিচয় ছিল। শেষ পত্রে লিখিত আছে "ইতি শ্রীকালিদাস বিরচিতং ঘটখর্পর মূল টীকায়াং সম্পূর্ণং।"

এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থালয়ে একটি বঙ্গাক্ষরে লিখিত ঘটখর্পর টীকা আছে। উহাতে রচয়িতার নাম নাই ও উপর্য্যুক্ত টীকা হইতে স্বতন্ত্র। এপর্য্যন্ত কথঞ্চিৎ এরূপ বলা যাইতে পারে যে ঘটখর্পর গ্রন্থকার ও কালিদাস টীকাকার কিন্তু ২নং গ্রন্থ দর্শনে সেরূপ সিদ্ধান্ত করিবার আর পথ থাকে না। উহা দুই পত্রে তিন পৃষ্ঠায় স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ নাগরাক্ষরে লিখিত। এই গ্রন্থে কেবল মূল মাত্র আছে। "কালিদাস বিরচিতং ঘটখর্পরাখ্য কাব্যং সমাপ্তং লিখিতং" বলিয়া শেষ হইয়াছে। ১নং গ্রন্থ ২১ শ্লোকে সম্পূর্ণ। ২নং ও এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থ ২২ শ্লোকে সম্পূর্ণ।

বোধ করি এইরূপ প্রমাণ অবলম্বন করিয়াই বোম্বাইয়ের পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে ঘটখর্পর একজন স্বতন্ত্র কবি নহেন। কিন্তু লেখকদের এরূপ ভ্রম বিরল নহে। তাহারা প্রায়ই একের গ্রন্থ অন্যের বলিয়া পরিচয় দেয়। পূর্ব্ব পত্রে ইহার দুই একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীদেব কৃত বিক্রমচরিত ও শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য অনুসারে বর্দ্ধমান বা মহাবীরের নির্ব্বাণের ৪৭০ বৎসর পরে বিক্রমাদিত্য নব অব্দ স্থাপন করেন। এ বৃত্তান্ত কোলব্রুক্ উল্লিখিত প্রবাদের সহিত বিরোধী নহে।

কালিদাস সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কবি। যদি কাত্যায়ন-বররুচির ন্যায় তাঁহার দুই নাম থাকিত, তাহা হইলে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কোন কোষকার বা টীকাকার তদ্বিষয়ের উল্লেখ করেন নাই কেন? মাতৃগুপ্ত কৃত কুমারসম্ভব রঘুবংশ কেন কাহারো দৃষ্টিগোচর হয় না? রাঘব ভট্ট কালিদাস কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলের টীকার মধ্যে যখন মাতৃগুপ্তের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, নিঃসন্দেহ তাঁহার মতে মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস দুই পৃথক্ ব্যক্তি। নাটকত্রয়ে কালিদাস আপনাকে মাতৃগুপ্ত না বলিয়া কালিদাস কহিয়াছেন।* উদ্ভট শ্লোকাবলীতে মাতৃগুপ্তের প্রশংসা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। "উপমা মাতৃগুপ্তস্য" "কবিমাতৃগুপ্তঃ" এরূপে শ্লোক কেন রচিত হয় নাই? যদি কালিদাস ও মাতৃগুপ্ত অভিন্ন, তবে অদ্যাবধি কেন প্রথম নামটি প্রচলিত ও অপর নামটি অপ্রসিদ্ধ? মাতৃগুপ্ত যে সেতুকাব্যের প্রণেতা কোন্ গ্রন্থে দৃষ্ট হইল? তিনি প্রবরসেন কর্ত্তৃক নিষ্কাষিত হইয়া বারাণসী-ধামে বাস করেন। যাঁহার দ্বারা রাজ্যচ্যুত হইলেন তাঁহার অধিকারে বাস না করিয়া চাটুকার বৃত্তি অবলম্বন করিবেন ইহা কদ্দূর সম্ভব? অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফল স্বরূপ একাধিক কালিদাস লব্ধ হইয়াছে। সেতুকাব্যের সম্ভবতঃ লেখক কালিদাস যে নবরত্নের কালিদাস ইহারি বা কি প্রমাণ? কালিদাস কোন্ গ্রন্থে কাশ্মীরের বর্ণনা করিয়াছেন? সুন্দররূপে অশুদ্ধ প্রতিপন্ন না করিতে পারিলে চির প্রচলিত প্রবাদ কেন পরিত্যক্ত হইবে?

শ্রীপ্রাণনাথ পণ্ডিত।

পুনশ্চ। বররুচি শীর্ষক প্রবন্ধে "কবিরয়ং বিক্রমাদিত্যসভ্যঃ তস্মিন রাজ্ঞী লোকান্তরং প্রাপ্তে এতন্নিবন্ধং কৃতবান্" এই পদের অনুবাদ স্বরূপ লিখিত হইয়াছে "সুবন্ধু বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন, ও তাঁহার রাজ্ঞী লোকান্তরগত হইলে বাসবদত্তা রচনা করেন।" বস্তুতঃ "তস্মিন্ রাজ্ঞী" অর্থশূন্য। "তস্মিন্ রাজ্ঞি" শুদ্ধ পাঠ। এক মুহূর্ত্তকাল বিবেচনা করিলেই প্রতিপন্ন হইবে যে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর বাসবদত্তা রচিত হয় ইহাই প্রকৃত অর্থ।

*সূত্র। আর্য্যে অভিরূপ ভূয়িষ্ঠা পরিষৎ অত খলু কালিদাস গ্রথিতবস্তুনা অভিজ্ঞানশকুন্তলনামধেয়েন নবেন নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভিঃ। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

পারি। প্রথিতযশসাং ধাবক সৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমান কবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ। মালবিকাগ্নিমিত্রম্।

সূত্র অহমস্যাং কালিদাস গ্রথিতবস্তুনা বিক্রমোর্ব্বশীনাম্না নবেন ত্রোটকেনোপস্থাস্যে। বিক্রমোর্ব্বশী।

তমোলুক পত্রিকা। মাসিকপত্র। কলিকাতা চিৎপুর রোড্, সুচারু যন্ত্র। ইহার দুই খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আনন্দের প্রথম কারণ এই যে তমোলুক হইতে একখানি সাহিত্য বিষয়ক পত্র প্রচারারম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় আনন্দের বিষয় এই যে, এই পত্রখানি উৎকৃষ্ট।

প্রথম খণ্ডে "পত্রিকা সূচনা", "সন্দেহ স্থল", "স্ত্রীলোক দ্বারা শাসিত রাজ্য", "পদ্মমুখী", "জনষ্টুয়ার্টমিল", "সাঁওতালদিগের সভ্য করণ", "মাইকেল মধুসূদন দত্ত", "হিন্দু আচার ব্যবহার সমালোচনা", "সৈনিকস্বপদ দেশীয়দিগের প্রাপ্য", "নূতন গ্রন্থের সমালোচনা", এই কয়টী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডেও ঐরূপ। সবিশেষ লিখিবার প্রয়োজন নাই।

লেখকদিগের লিপিশক্তি ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে যদিও তমোলুক সামান্য নগর, তথাপি তথা যে মাসিকপত্র প্রচারিত হইয়াছে, তাহা রাজধানীর অধিকাংশ সাহিত্য বিষয়ক পত্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

যাঁহারা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহারা যে দেশহিতৈষী, সুযোগ্য এবং সাহিত্যপ্রিয় তমোলুক পত্রিকা তাহার প্রমাণ।
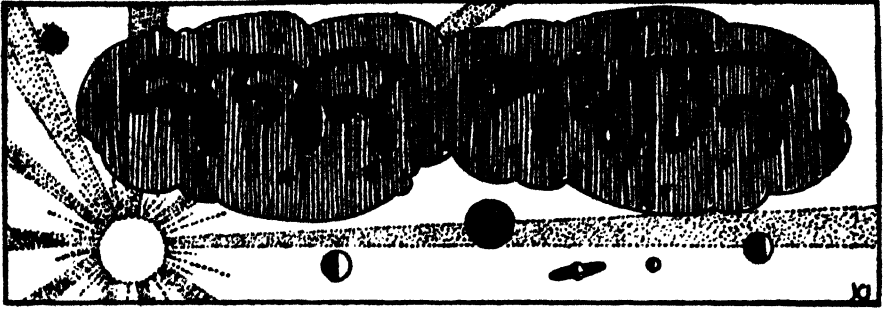
পুরাণেতিহাসাদিতে কথিত আছে পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজগণ আকাশ-মার্গে রথ চালাইতেন। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহারা সচরাচর এ পাড়া ও পাড়ার ন্যায়, স্বর্গলোকে বেড়াইতে যাইতেন, কথায় কথায় সমুদ্রকে গণ্ডূষ করিয়া ফেলিতেন; কেহ জগদীশ্বরকে অভিশপ্ত করিতেন, কেহ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের কথা স্বতন্ত্র; সামান্য মনুষ্যদিগের কথা বলা যাউক।

সামান্য মনুষ্যের চিরকাল বড় সাধ গগন পর্য্যটন করে। কথিত আছে, তারন্তম নগরবাসী আর্কাইতস নামক এক ব্যক্তি ৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে একটি কাষ্ঠের পক্ষী প্রস্তুত করিয়াছিল; তাহা কিয়ৎক্ষণ জন্য আকাশে উঠিতে পারিয়াছিল। ৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, সাইমন নামক এক ব্যক্তি রোম নগরে প্রাসাদ হইতে প্রাসাদে উড়িয়া বেড়াইবার উদ্যোগ পাইয়াছিল। এবং তৎপরে কনস্তান্তিনোপল নগরে একজন মুসলমান ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দান্তে নামক একজন গণিতশাস্ত্রবিৎ পক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া আপন অঙ্গে সমাবেশ করিয়া থ্রাসিমীন হ্রদের উপর উঠিয়া গগনমার্গে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ রূপ করিতে করিতে একদিন এক উচ্চ অট্টালিকার উপর পড়িয়া তাঁহার পদ ভঙ্গ হয়। মাম্‌স্‌বরি নিবাসী অলিবর নামক একজন ইংরেজেরও সেই দশা ঘটে। ১৬৩৮ সালে গোল্‌ড্‌উইন নামক একব্যক্তি শিক্ষিত হংসদিগের সাহায্যে উড়িতে চেষ্টা করেন। ১৬৭৮ সালে বেনিয়র নামক একজন ফরাসি পক্ষ প্রস্তুত পূর্ব্বক হস্ত পদে বাঁধিয়া উড়িয়াছিল। ১৭১০ সালে লরেন্স দে গুজ্‌মান নামক একজন ফরাসি দারুনির্ম্মিত বায়ুপূর্ণ পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশে উঠিয়াছিল। মার্কুইস্ দে বাকবিল নামক একজন আপন অট্টালিকা হইতে উড়িতে চেষ্টা করিয়া নদীগর্ভে পতিত হন। ব্লানসার্ডেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল।

১৭৬৭ সালে বিখ্যাত রসায়ন বিদ্যার আচার্য্য ডাক্তার ব্লাক প্রচার করেন

যে জলজন বায়ু পরিপূর্ণ পাত্র আকাশে উঠিতে পারে। আচার্য্য কাবালো ইহা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণীকৃত করেন, কিন্তু তখনও ব্যোমযানের কল্পনা হয় নাই।

ব্যোমযানের সৃষ্টিকর্ত্তা মোনগোলফীর নামক ফরাশী। কিন্তু তিনি জলজন বায়ুর সাহায্য অবলম্বন করেন নাই। তিনি প্রথমে কাগজের বা বস্ত্রের গোলক নির্ম্মিত করিয়া তন্মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু পূরিতেন। উত্তপ্ত হইলে বায়ু লঘুতর হয়; সুতরাং তৎসাহায্যে গোলক সকল ঊর্দ্ধে উঠিত। আচার্য্য চার্ল্‌স প্রথমে জলজন বায়ুপূরিত ব্যোমযানের সৃষ্টি করেন। গ্লোব নামক ব্যোমযানে উক্ত বায়ু পূর্ণ করিয়া প্রেরণ করেন; তাহাতে সাহস করিয়া কোন মনুষ্য আরোহণ করে নাই। রাজপুরুষেরাও প্রাণিহত্যার ভয় প্রযুক্ত কাহাকেও আরোহণ করিতে দেন নাই। এই ব্যোমযান কিয়দ্দূর উঠিয়া ফাটিয়া যায়; জলজন বাহির হইয়া যাওয়ায়, ব্যোমযান তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হয়। গোনেস নামক ক্ষুদ্র গ্রামে উহা পতিত হয়। অদৃষ্টপূর্ব্ব খেচর দেখিয়া গ্রাম্য লোকে ভীত হইয়া, মহা কোলাহল আরম্ভ করে।

অনেকে একত্রিত হইয়া গ্রাম্য লোকেরা দেখিতে আইল যে, কিরূপ জন্তু আকাশ হইতে নামিয়াছে। দুই জন ধর্ম্মযাজক বলিলেন, যে ইহা কোন অলৌকিক জীবের দেহাবশিষ্ট চর্ম্ম। শুনিয়া গ্রামবাসিগণ তাহাতে ঢিল মারিতে আরম্ভ করিল, এবং খোঁচা দিতে লাগিল। তন্মধ্যে ভূত আছে, বিবেচনা করিয়া, গ্রাম্য লোকেরা ভূত শান্তির জন্য দলবদ্ধ হইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, পরিশেষে মন্ত্রবলে ভূত ছাড়িয়া পলায় কিনা, দেখিবার জন্য আবার ধীরে ধীরে সেইখানে ফিরিয়া আসিল। ভূত তথাপি যায় না—বায়ু সংস্পর্শে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করে। পরে একজন গ্রাম্যবীর, সাহস করিয়া তৎপ্রতি বন্দুক ছাড়িল। তাহাতে ব্যোমযানের আবরণ ছিদ্র বিশিষ্ট হওয়াতে, বায়ু বাহির হইয়া, রাক্ষসের শরীর আরও শীর্ণ হইল। দেখিয়া সাহস পাইয়া, আর একজন বীর গিয়া তাহাতে অস্ত্রাঘাত করিল। তখন ক্ষত মুখ দিয়া বহুল পরিমাণে জলজন নির্গত হওয়ায়, বীরগণ তাহার দুর্গন্ধে ভয় পাইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু এজাতীয় রাক্ষসের শোণিত ঐ বায়ু। তাহা ক্ষতমুখে নির্গত হইয়া গেলে, রাক্ষস ছিন্নমুণ্ড ছাগের ন্যায় "ধড় ফড়" করিয়া মরিয়া গেল। তখন বীরগণ প্রত্যাগত হইয়া তাহাকে অশ্বপুচ্ছে বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া গেলেন। এদেশে হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটি রক্ষাকালী পূজা হইত, এবং ব্রাহ্মণেরা চণ্ডীপাঠ করিয়া কিছু লাভ করিতেন।

তার পরে, মোনগোল্‌ফীর আবার আগ্নেয় ব্যোমযান (অর্থাৎ যাহাতে জলজন না পূরিয়া, উত্তপ্ত সামান্য বায়ুপূরিত হয়) বর্সেল হইতে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে আধুনিক বেলুনের ন্যায় একখানি "রথ" সংযোজন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সেবারও মনুষ্য উঠিল না। সেই রথে চড়িয়া একটি মেষ, একটি

কুক্কুট, ও একটি হংস স্বর্গ পরিভ্রমণে গমন করিয়াছিল। পরে স্বচ্ছন্দে গগন বিহার করিয়া, তাহারা স্বশরীরে মর্ত্ত্যধামে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহারা পুণ্যবান্ সন্দেহ নাই।

এক্ষণে ব্যোমযানে মনুষ্য উঠিবার প্রস্তাব হইতে লাগিল। কিন্তু প্রাণি-হত্যার আশঙ্কায় ফ্রান্সের অধিপতি, তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে, যদি ব্যোমযানে মনুষ্য উঠে, তবে যাহারা বিচারালয়ে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাধীন হইয়াছে, এমত দুই ব্যক্তি উঠুক—মরে মরিবে। শুনিয়া পিলাতর দে রোজীর নামক একজন বৈজ্ঞানিকের বড় রাগ হইল—"কি! আকাশমার্গে প্রথম ভ্রমণ করার যে গৌরব, তাহা দুর্ব্বৃত্ত নরাধমদিগের কপালে ঘটিবে!" একজন রাজপুরস্ত্রীর সাহায্যে রাজার মত ফিরাইয়া তিনি মার্ক্ইস দার্লান্দের সমভিব্যাহারে ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া আকাশপথে পর্য্যটন করেন। সে-বার নির্ব্বিঘ্নে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার দুই বৎসর পরে—আবার ব্যোমযানে আরোহণ পূর্ব্বক, সমুদ্র পার হইতে গিয়া, অধঃপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। যাহা হউক, তিনিই মনুষ্য মধ্যে প্রথম গগনপর্য্যটক। কেননা, দুষ্মন্ত, পুরুরবা, কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতিকে মনুষ্য বিবেচনা করা, অতি ধৃষ্টের কাজ! আর যিনি জয় রাম বলিয়া পঞ্চম বায়ুপথে সমুদ্র পার হইয়াছিলেন, তিনিও মনুষ্য নহেন, নচেৎ তাঁহাকে এই পদে অভিষিক্ত করার আমাদিগের আপত্তি ছিল না।

দে রোজীরের পরেই চার্লস্ ও রবর্ট একত্রে, রাজভবন হইতে, ছয় লক্ষ দর্শকের সমক্ষে জলজনীয় ব্যোমযানে উড্ডীন হয়েন। এবং প্রায় ১৪০০০ ফীট ঊর্দ্ধে উঠেন।

ইহার পরে ব্যোমযানারোহণ বড় সচরাচর ঘটিতে লাগিল। কিন্তু অধিকাংশই আমোদের জন্য। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পরীক্ষার্থ যাঁহারা আকাশপথে বিচরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১৮০৪ সালে গাই লুসাকের আরোহণই বিশেষ বিখ্যাত। তিনি একাকী ২৩০০০ ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়া নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছিলেন। ১৮৩৬ সালে গ্রীন এবং হলণ্ড সাহেব, পনের দিবসের খাদ্যাদি বেলুনে তুলিয়া লইয়া, ইংলণ্ড হইতে গগনারোহণ করেন। তাঁহারা সমুদ্র পার হইয়া, আঠার ঘণ্টার মধ্যে জর্ম্মানির অন্তর্গত উইলবর্গ নামক নগরের নিকট অবতরণ করেন। গ্রীন অতি প্রসিদ্ধ গগন পর্য্যটক ছিলেন। তিনি প্রায় চতুর্দ্দশ শত বার গগনারোহণ করিয়াছিলেন। তিনবার, বায়ুপথে সমুদ্রপার হইয়াছিলেন—অতএব, কলিযুগেও রামায়ণের দৈববলসম্পন্ন কার্য্য সকল পুনঃসম্পাদিত হইতেছে। গ্রীন, দুইবার সমুদ্র মধ্যে পতিত হয়েন—এবং কৌশলে প্রাণরক্ষা করেন। কিন্তু বোধ হয়, জেম্‌স্ গ্লেশর অপেক্ষা কেহ অধিক ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। তিনি ১৮৬২ সালে

উলবর্হাম্‌টন হইতে উড্‌ডীন হইয়া প্রায় সাত মাইল ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। তিনি বহু-শতবার গগনোপরি ভ্রমণ পূর্ব্বক, বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমেরিকার গগন পর্য্যটক ওয়াইজ সাহেব, ব্যোমযানে আমেরিকা হইতে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া ইউরোপে আসিবার কল্পনায়, তাহার যথাযোগ্য উদ্যোগ করিয়া, যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমুদ্রোপরে আসিবার পূর্ব্বে বাত্যা মধ্যে পতিত হইয়া অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সাহস অতি ভয়ানক!

পাঠকদিগের অদৃষ্টে সহসা যে গগন পর্য্যটন সুখ ঘটিবে, এমত বোধ হয় না, এজন্য, গগন পর্য্যটকেরা আকাশে উঠিয়া কিরূপ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের প্রণীত পুস্তকাদি হইতে সংগৃহীত করিয়া এস্থলে সন্নিবেশ করিলে বোধ হয়, পাঠকেরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। সমুদ্র নামটি কেবল জল সমুদ্রের প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু যে বায়ু কর্ত্তৃক পৃথিবী পরিবেষ্টিত তাহাও সমুদ্র বিশেষ; জলসমুদ্র হইতে ইহা বৃহত্তর। আমরা এই বায়বীয় সমুদ্রের তলচর জীব। ইহাতেও মেঘের উপদ্বীপ, বায়ুর স্রোতঃ প্রভৃতি আছে। তদ্বিষয়ে কিছু জানিলে ক্ষতি নাই।

ব্যোমযান অল্প উচ্চ গিয়াই মেঘ সকল বিদীর্ণ করিয়া উঠে। মেঘের আবরণে পৃথিবী দেখা যায় না, অথবা কদাচিৎ দেখা যায়। পদতলে অচ্ছিন্ন, অনন্ত দ্বিতীয় বসুন্ধরাবৎ মেঘজাল বিস্তৃত। এই বাষ্পীয় আবরণে ভূগোলক আবৃত; যদি গ্রহান্তরে জ্ঞানবান জীব থাকে, তবে তাহারা পৃথিবীর বাষ্পীয়াবরণই দেখিতে পায়; পৃথিবী তাহাদিগের প্রায় অদৃশ্য। তদ্রূপ আমরাও বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণের রৌদ্র প্রদীপ্ত, রৌদ্র প্রতিঘাতী, বাষ্পীয় আবরণই দেখিতে পাই। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের এই রূপ অনুমান।

এইরূপ, পৃথিবী হইতে সম্বন্ধ রহিত হইয়া, মেঘময় জগতের উপরে স্থাপিত হইয়া দেখা যায়, যে সর্ব্বত্র, জীবশূন্য, শব্দশূন্য, গতিশূন্য, স্থির, নীরব। মস্তকো-পরে, আকাশ অতি নিবীড় নীল—সে নীলিমা আশ্চর্য্য। আকাশ বস্তুতঃ চিরা-ন্ধকার—উহার বর্ণ গভীর কৃষ্ণ। অমাবস্যার রাত্রে প্রদীপ শূন্য গৃহমধ্যে সকল দ্বার গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া থাকিলে যেরূপ অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশের প্রকৃত বর্ণ তাহাই। তন্মধ্যে, স্থানে স্থানে নক্ষত্র সকল, প্রচণ্ড জ্বালা বিশিষ্ট। কিন্তু তদালোকে অনন্ত আকাশের অনন্ত অন্ধকার বিনষ্ট হয় না—কেন না এই সকল প্রদীপ বহুদূরস্থিত। তবে যে আমরা আকাশকে অন্ধকারময় না দেখিয়া উজ্জ্বল দেখি, তাহার কারণ বায়ু। সকলেই জানেন সূর্য্যালোক সপ্তবর্ণময়। স্ফটিকের দ্বারা বর্ণগুলি পৃথক্ করা যায়—সপ্তবর্ণের সংমিশ্রণে সূর্য্যালোক। বায়ু জড় পদার্থ,

কিন্তু বায়ু আলোকের পথ রোধ করে না। বায়ু, সূর্য্যালোকের অন্যান্য বর্ণের পথ ছাড়িয়া দেয় কিন্তু নীলবর্ণকে রুদ্ধ করে। রুদ্ধ বর্ণ, বায়ু হইতে প্রতিহত হয়। সেই সকল প্রতিহত বর্ণাত্মক আলোক লেখা আমাদের চক্ষুতে প্রবেশ করায়, আকাশ উজ্জ্বল নীলিমাবিশিষ্ট দেখি—অন্ধকার দেখি না।* কিন্তু যত উর্দ্ধে উঠা যায়, বায়ুস্তর তত ক্ষীণতর হয়; গাগনিক উজ্জ্বল নীলবর্ণ ক্ষীণতর হয়; আকাশের কৃষ্ণত্ব কিছু কিছু সেই আবরণ ভেদ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য উর্দ্ধলোকে গাঢ় নীলিমা।

শিরে এই গাঢ় নীলিমা—পদতলে, তুঙ্গ শৃঙ্গ বিশিষ্ট পর্ব্বতমালায় শোভিত মেঘলোক—সে পর্ব্বতমালাও বাষ্পীয়—মেঘের পর্ব্বত—পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, তদুপরি আরও পর্ব্বত—কেহবা কৃষ্ণমধ্য, পার্শ্বদেশ রৌদ্রের প্রভাবিশিষ্ট—কেহ বা রৌদ্র-স্নাত, কেহ যেন শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত, কেহ যেন হীরক নির্ম্মিত। এই সকল মেঘের মধ্য দিয়া ব্যোমযান চলে। তখন, নীচে মেঘ, উপরে মেঘ, দক্ষিণে মেঘ, বামে মেঘ, সম্মুখে মেঘ, পশ্চাতে মেঘ। কোথাও বিদ্যুৎ চমকিতেছে, কোথাও ঝড় বহিতেছে, কোথাও বৃষ্টি হইতেছে, কোথাও বরফ পড়িতেছে। মস্যুর ফন্ বিল একবার একটি মেঘ গর্ভস্থ রন্ধ্র দিয়া ব্যোমযানে গমন করিয়াছিলেন; তাঁহার কৃত বর্ণনা পাঠ করিয়া বোধ হয় যেমন মুঙ্গেরের পথে পর্ব্বতমধ্য দিয়া, বাষ্পীয় শকট গমন করে, তাঁহার ব্যোমযান মেঘ মধ্য দিয়া সেইরূপ পথ দিয়া গমন করিয়াছিল।

এই মেঘলোকে সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য—ভূলোকে তাহার সাদৃশ্য অনুমিত হয় না। ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া অনেকে একদিনে দুইবার সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছেন। এবং কেহ কেহ একদিনে দুইবার সূর্য্যোদয় দেখিয়াছেন। একবার সূর্য্যাস্তের পর রাত্রি সমাগম দেখিয়া, আবার ততোধিক উর্দ্ধে উঠিলে দ্বিতীয়বার সূর্য্যাস্ত দেখা যাইবে। এবং একবার সূর্য্যোদয় দেখিয়া আবার নিম্নে নামিলে সেই দিন দ্বিতীয় সূর্য্যোদয় অবশ্য দেখা যাইবে।

ব্যোমযান হইতে যখন পৃথিবী দেখা যায় তখন উহা বিস্তৃত মানচিত্রের ন্যায় দেখায়; সর্ব্বত্র সমতল—অট্টালিকা, বৃক্ষ, উচ্চভূমি, এবং অভ্রোন্নত মেঘও, যেন সকলই অনুচ্চ, সকলই সমতল, ভূমিতে চিত্রিতবৎ দেখায়। নগর সকল যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঠিত প্রতিকৃতি, চলিয়া যাইতেছে বোধ হয়। বৃহৎ জনপদ উদ্যানের মত দেখায়। নদী শ্বেত সূত্র বা উরগের মত দেখায়। বৃহৎ অর্ণবযান সকল বালকের ক্রীড়ার জন্য নির্ম্মিত তরণীর মত দেখায়। যাঁহারা লণ্ডন বা পারিস্ নগরীর উপর উত্থান করিয়া-

---

* কেহ কেহ বলেন যে বায়ুমধ্যস্থ জল বাষ্প হইতে প্রতিহত নীল রশ্মি লেখাই আকাশের উজ্জ্বল নীলিমার কারণ।

ছেন, তাঁহারা দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন,—তাহার প্রশংসা করিয়া ফুরাইতে পারেন নাই। গ্লেশর সাহেব লিখিয়াছিলেন যে তিনি লণ্ডনের উপরে উঠিয়া এককালে ত্রিশলক্ষ মনুষ্যের বাসগৃহ নয়নগোচর করিয়াছেন। রাত্রিকালে মহানগরী সকলের রাজপথস্থ দীপমালা সকল অতি রমণীয় দেখায়।

যাঁহারা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে যত উর্দ্ধে উঠা যায়, তত তাপের অল্পতা। শিমলা, দারজিলিঙ্গ প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্থানের শীতলতার কারণ এই, এবং এইজন্য হিমালয় তুষারমণ্ডিত। (আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে হিমকে ভারতবর্ষীয় কবি "একোহি দোষো গুণ সন্নিপাতে" বিবেচনা করিয়াছিলেন; আধুনিক রাজপুরুষেরা, তাহাকেও গুণ বিবেচনা করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছেন।) ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া উর্দ্ধে উত্থান করিলেও ঐরূপ ক্রমে হিমের আতিশয্য অনুভূত হয়। তাপ, তাপমান যন্ত্রের দ্বারা মিত হইয়া থাকে। যন্ত্র ভাগে ভাগে বিভক্ত। মনুষ্য শোণিত কিছু উষ্ণ, তাহার পরিমাণ ৯৮ ভাগ। ২১২ ভাগ তাপে জল বাষ্প হয়। ৩২ ভাগ তাপে জল তুষারত্ব প্রাপ্ত (তাপে জল তুষার হয় এ কোন্ কথা? বাস্তবিক তাপে জল তুষার হয় না, তাপাভাবেই হয়। ৩২ ভাগ তাপ জলের স্বাভাবিক তাপের অভাব বাচক।)

পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সংস্কার ছিল যে উর্দ্ধে তিনশত ফিট প্রতি এক ভাগ তাপ কমে। অর্থাৎ তিনশত ফিট উঠিলে একভাগ তাপ হানি হইবে—ছয়শত ফিট উঠিলে দুই ভাগ তাপ কমিবে—ইত্যাদি। কিন্তু গ্লেশর সাহেব বহুবার পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে উর্দ্ধে তাপহানি এরূপ একটি সরল নিয়মানুগামী নহে। অবস্থা বিশেষে তাপহানির লাঘব গৌরব ঘটিয়া থাকে। মেঘ থাকিলে, তাপহানি অল্প হয়—কারণ, মেঘ তাপরোধক এবং তাপগ্রাহক। আবার দিবাভাগে যেরূপ তাপহানি ঘটে, রাত্রে সেরূপ নহে। গ্লেশর সাহেবের পরীক্ষার ফল নিম্নলিখিত মত—

ভূমি হইতে হাজার ফিট পর্য্যন্ত মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় তাপহানির পরিমাণ ৪.৫ ভাগ; মেঘ না থাকিলে ৬.২ ভাগ, দশ হাজার ফিট পর্য্যন্ত মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় ২.২ ভাগ, মেঘ না থাকিলে ২ ভাগ। বিশ হাজার ফিট উর্দ্ধে, মেঘাচ্ছন্নে ১.১ ভাগ; মেঘ শূন্যে ১.২ ভাগ। ত্রিশ হাজার ফিট উর্দ্ধে মোট ৬২ ভাগ তাপহ্রাস পরীক্ষিত হইয়াছিল, ইত্যাদি। তাপহ্রাস হেতু উর্দ্ধে স্থানে স্থানে তুষার-কণা (snow) দৃষ্ট হয়; এবং ব্যোমযান কখন কখন তন্মধ্যে পতিত হয়। উর্দ্ধে শীতাধিক্য, অনেক সময়ে যানারোহীদিগের কষ্টকর হইয়া উঠে—এমন কি অনেক সময়ে হাত পা অবশ হয় এবং চেতনা অপহৃত হয়।

উর্দ্ধে তাপাভাবের কারণ, তপ্ত বা তাপ্য সামগ্রীর অভাব। রৌদ্র ভূমে

যেমন প্রখর, উর্দ্ধে বরং ততোধিক প্রখরতর বোধ হয়। কিন্তু তাহাতে কি তপ্ত হইবে? ভূমি অতি দূরে, বায়ু অতিক্ষীণ,—অল্প পরমাণু। দশ বারটি তুলোর বস্তা উপর্য্যুপরি রাখিয়া দেখিবেন—উপরিস্থ তুলার ভারে, নিম্নস্থ বস্তার তুলা গাঢ়তর হইয়াছে। তেমনি নিম্নস্থ বায়ুই গাঢ়—উপরিস্থ বায়ু ক্ষীণ। পরীক্ষার দ্বারা স্থির হইয়াছে—যে এক ইঞ্চি দীর্ঘ প্রস্থে, এরূপ ভূমির উপর যে ভার, তাহার পরিমাণ সাড়ে সাত সের। আমরা মস্তকের উপর অহরহ এই ভার বহন করিতেছি—তজ্জন্য কোন পীড়া বোধ করি না কেন? উত্তর, "অগাধ জল সঞ্চারী" মৎস্য উপরিস্থ বারি রাশির ভারে পীড়িত হয় না কেন? উপরিস্থ বায়ুস্তর সমূহের ভারে নিম্নস্থ বায়ুস্তর সকল ঘনীভূত—যত উর্দ্ধে যাওয়া যায়, বায়ু তত ক্ষীণ হইতে থাকে। গগন পর্য্যটকেরা ইহা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন গুরুতা অনুসারে, ৩৳০ মাইল উর্দ্ধের মধ্যেই অর্দ্ধেক বায়ু আছে; এবং পাঁচ ছয় মাইলের মধ্যেই সমুদায় বায়ুর তিন ভাগের দুই ভাগ আছে। এই জন্য উর্দ্ধে উঠিতে গেলে, নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়। মস্যূর ফ্লামারিয়ঁ দশসহস্র ফীট উর্দ্ধে উঠিয়া, প্রথম বারে, যেরূপ কষ্ট অনুভূত করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন, যথা—

"সাতটা বাজিতে এক পোওয়া থাকিতে আমার শরীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব আভ্যন্তরিক শীতলতা অনুভূত করিতে লাগিলাম। তৎসহিত তন্দ্রা আসিল। কষ্টে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলাম। কর্ণ মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ হইতে লাগিল এবং আধ মিনিট কাল, আমার হৃদ্রোগ উপস্থিত হইল। কণ্ঠ শুষ্ক হইল। আমি এক পাত্র জল পান করিলাম—তাহাতে উপকার বোধ হইল। যে বোতলে জল ছিল—তাহার ছিপি খুলিবার সময়ে, যেমন শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপি সশব্দে বেগে উঠিয়া পড়ে, জলের বোতলের ছিপি খুলিতে সেইরূপ হইল। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। তখন আমাদিগের মস্তকের উপরে বায়ু, এক ভাগ কম হইয়াছিল। যখন বোতলে ছিপি আঁটিয়া গগনে যাত্রা করিয়াছিলাম, তখনকার অপেক্ষা এখনকার বায়ুর ভার এক ভাগ কম হইয়াছিল।"

দুই একবার গগনমার্গে যাতায়াত করিলে এ সকল কষ্ট সহ্য হইয়া আইসে, কিন্তু অধিক উর্দ্ধে উঠিলে সহিষ্ণু ব্যক্তিরও কষ্ট হয়। গ্লেশর সাহেব এ সকল কষ্ট বিশেষ সহিষ্ণু ছিলেন, কিন্তু ছয় মাইল উর্দ্ধে উঠিয়া তিনিও চেতনাশূন্য ও মুমূর্ষু হইয়াছিলেন। ২৯০০০ ফিট উপরে উঠিলে পর, তাঁহার দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া আইসে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আর তাপমান যন্ত্রের পারদ স্তম্ভ অথবা ঘড়ির কাঁটা দেখিতে সক্ষম হইলেন না। টেবিলের উপর এক হাত রাখিলেন। যখন টেবিলের উপর হাত রাখিলেন, তখন হস্ত সম্পূর্ণ সবল; কিন্তু তখনই সে হাত আর উঠাইতে পারিলেন না—তাহার শক্তি অন্তর্হিতা হইয়াছিল। তখন দেখিলেন দ্বিতীয় হস্তও

সেই দশাপন্ন হইয়াছে—অবশ। তখন একবার গাত্রালোড়ন করিলেন—গাত্র চালনা করিতে পারিলেন, কিন্তু বোধ হইল যেন হস্ত পদাদি নাই। ক্রমে এইরূপে তাঁহার সকল অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল; ভগ্নগ্রীবের ন্যায় মস্তক লম্বিত হইয়া পড়িল, এবং দৃষ্টি একেবারে বিলুপ্ত হইল। এইরূপে তিনি অকস্মাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছিলেন, এমত সময়ে, হঠাৎ তাঁহার চৈতন্যও বিলুপ্ত হইল। পরে ব্যোম-যানের "সারথি," রথ নামাইলে তিনি পুনর্ব্বার জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন।

রথ নামাইল কি প্রকারে? ব্যোমযানের গতি দ্বিবিধ, প্রথম, ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ বা অধঃ হইতে ঊর্দ্ধ। দ্বিতীয় দিগন্তরে; যেমন শকটাদি অভিলষিত দিগে যায় সেইরূপ। ব্যোমযান অভিলষিত দিগন্তরে চালনা করা এ পর্য্যন্ত মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই—চালক মনে করিলে, উত্তরে, পশ্চিমে, বামে বা দক্ষিণে, সম্মুখে বা পশ্চাতে যান চালাইতে পারেন না। বায়ুই ইহার যথার্থ সারথি, বায়ু যে দিকে লইয়া যায়, ব্যোমযান সেই দিকে চলে। কিন্তু অধোর্দ্ধ গতি মনুষ্যের আয়ত্ত। ব্যোমযান লঘু করিতে পারিলেই ঊর্দ্ধে উঠিবে এবং পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুর অপেক্ষা গুরু করিতে পারিলেই নামিবে। ব্যোমযানের "রথে" কতকটা বালুকা বোঝাই থাকে; তাহার কিয়দংশ নিক্ষিপ্ত করিলেই পূর্ব্বাপেক্ষা লঘুতা সম্পাদিত হয়—তখন ব্যোমযান আরও ঊর্দ্ধে উঠে। এইরূপে ইচ্ছাক্রমে ঊর্দ্ধে উঠা যায়। আর যে লঘু বায়ু কর্ত্তৃক বেলুন পরিপূরিত থাকায় তাহা গগনমণ্ডলে উঠিতে সক্ষম, তাহার কিয়দংশ নির্গত করিতে পারিলেই উহা নামে। ঐ বায়ু নির্গত করিবার জন্য ব্যোমযানের শিরোভাগে একটি ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্র সচরাচর আবৃত থাকে, কিন্তু তাহার আবরণে একটি দড়ি বাঁধা থাকে; সেই দড়ি ধরিয়া টানিলেই লঘু বায়ু বাহির হইয়া যায়; ব্যোমযান নামিতে থাকে।

দিগন্তরে গতি মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে বটে, কিন্তু মনুষ্য বায়ুর সাহায্য অবলম্বন করিতে সক্ষম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন দিগভিমুখে বায়ু বহিতে থাকে। যখন ব্যোমারোহী ভূমির উপরে দক্ষিণ বায়ু দেখিয়া, যানারোহণ করিলেন তখনই হয়ত, কিয়দ্দূর উঠিয়া দেখিলেন যে বায়ু উত্তরে; আরও উঠিলে হয়ত দেখিবেন যে বায়ু পূর্ব্বে কি পুনশ্চ দক্ষিণে। ইত্যাদি। কোন্ স্তরে কোন্ সময়ে কোন্ দিগে বায়ু বহে, ইহা যদি মনুষ্যের জানা থাকিত, তাহা হইলে ব্যোমযান মনুষ্যের আজ্ঞাকারী হইত। যাঁহারা সুচতুর, তাঁহারা কখন কখন বায়ুর গতি অবধারিত করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে গগন পর্য্যটন করিয়াছেন। ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসে মস্যুর ভিসান্দর কালে নগর হইতে নেপ্চ্যুন নামক বেলুনে গগনারোহণ করেন। চারি হাজার ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়া দেখিলেন যে তাঁহাদিগের গতি উত্তর সমুদ্রে! অপরাহ্ণে এইরূপ তাঁহারা অকস্মাৎ

অনিচ্ছার সহিত, অনন্ত সাগরের উপর যাত্রা করিলেন। কিন্তু তখন উপায়ান্তর ছিল না। এই শঙ্কটে তাঁহারা দেখিলেন যে নিম্নে মেঘ সকল দক্ষিণগামী। তখন তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া সমুদ্র বিহারে চলিলেন। এইরূপে তাঁহারা ২১ মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রোপরে বাহির হইয়া যান। তাহার পর লঘু বায়ু নির্গত করিয়া দিয়া, নীচে নামেন। বায়ুর সেই নিম্ন স্তরে দক্ষিণ বায়ু পাইয়া তৎকর্ত্তৃক বাহিত হইয়া পুনর্ব্বার ভূমির উপরে আসেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ অবতরণ করেন না। তারপর সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইল। বাষ্পের গাঢ়তা বশতঃ নিম্নে ভূতল দেখা যাইতেছিল না। এমত অবস্থায় তাঁহারা কোথায় যাইতেছিলেন, তাহা জানিতে পারেন নাই। অকস্মাৎ নিম্ন হইতে গম্ভীর সমুদ্র কল্লোল উত্থিত হইল। তখন অন্ধকারে পুনর্ব্বার অনন্ত সাগরোপরে বিচরণ করিতেছেন জানিতে পারিয়া, তাঁহারা আবার নিম্নে নামিলেন। আবার দক্ষিণ বায়ুর সাহায্যে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন।

উত্তর সমুদ্রে বিচরণ কালে তাঁহারা কয়েকটি অদ্ভুত ছায়া দেখিয়াছিলেন। দেখিলেন যে, সমুদ্রে যে সকল বাষ্পীয়াদি জাহাজ চলিতেছিল, উর্দ্ধে মেঘ মধ্যে তাহার প্রতিবিম্ব। মেঘ মধ্যে তেমনি সমুদ্র চিত্রিত হইয়াছে—সেই চিত্রিত সমুদ্রে তেমনি প্রকৃত জাহাজের ন্যায় ছায়ার জাহাজ চলিতেছে। সেই সকল জাহাজের তলদেশ উর্দ্ধে, মাস্তুল নিম্নে; বিপরীত ভাবে, জাহাজ চলিতেছে। মেঘরাশি বৃহদ্দর্পণ স্বরূপ সমুদ্রকে প্রতিবিম্বিত করিয়াছিল।

মস্যূর ফ্লামারিয়ঁ আর একটি আশ্চর্য্য প্রতিবিম্ব দেখিয়াছিলেন। দিবাভাগে, প্রায় পাঁচ সহস্র ফিট, উর্দ্ধে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদিগের প্রায় শত ফিট্ মাত্র দূরে, দ্বিতীয় একটি বেলুন চলিয়াছে। আরও দেখিলেন, যে সেই দ্বিতীয় বেলুনটির আকৃতি তাঁহাদিগের বেলুনেরই আকৃতি; যেমন তাঁহাদিগের বেলুনের নিম্নে "রথ" যুক্ত ছিল, এবং তাহাতে যাঁহারা দুই জন আরোহী বসিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বেলুনেও সেইরূপ রথ, এবং সেইরূপ দুইজন আরোহী। আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই দুইজন আরোহীর অবয়ব—তাঁহাদিগেরই অবয়ব! তাঁহারাই সেই দ্বিতীয় বেলুনে বসিয়া আছেন! একটি বেলুনে যেখানে যাহা ছিল—যেখানে যে দড়ি, যেখানে যে সূতা, যেখানে যে যন্ত্র, দ্বিতীয় বেলুনে ঠিক তাহাই আছে! মস্যূর ফ্লামারিয়ঁ দক্ষিণ হস্তোত্তোলন করিলেন—ভৌতিক ফ্লামারিয়ঁ বাম হস্তোত্তোলন করিল! তাঁহার সঙ্গী একটা পতাকা উড়াইলেন—ভৌতিক সঙ্গী একটা তদ্রূপ পতাকা উড়াইল!

আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে সেই ভৌতিক ব্যোমযানের ভৌতিক রথের চতুঃপার্শ্বে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল সকল প্রতিভাত হইতেছিল। মধ্যে হরিৎ শ্বেতাভ মণ্ডল, তন্মধ্যে রথ। তৎপার্শ্বে ক্ষীণ নীল মণ্ডল; তাহার বাহিরে

হরিদ্রাবর্ণ মণ্ডল; তৎপরে কপিশ রক্তাভ মণ্ডল; শেষে অতসীকুসুমবৎ বর্ণ; তাহা ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া মেঘের সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে।

এই বৃত্তান্ত বুঝাইবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে হইতে পারে না। ইহা —বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে ইহা জলবাষ্পের উপর প্রতিসৌর বিম্ব* মাত্র।

গগনপথে পার্থিব শব্দ সহজে গমন করে, কিন্তু সকল সময়ে নহে, এবং সকল শব্দের গতি তুল্য রূপ নহে। মেঘাচ্ছন্নে শব্দরোধ ঘটে। গ্লেশর সাহেব চারি মাইল ঊর্দ্ধ হইতে রেইলওয়ে ট্রেনের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন। এবং বিশ হাজার ফিট উপরে থাকিয়া কামানের শব্দ শুনিয়াছিলেন। একটি ক্ষুদ্র কুক্কুরের রব দুই মাইল উপর হইতে শুনিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু চারি হাজার ফিট উপরে থাকিয়া বহু সংখ্যক মনুষ্যের কোলাহল শুনিতে পান নাই। মস্যূর ফ্লামারিয়ঁ আকাশ হইতে ভূমণ্ডলের বাদ্য শুনিতে পাইতেন। তাঁহার বোধ হইত যেন মেঘ মধ্যে কে সঙ্গীত করিতেছে।

অনেকেই অবগত আছেন যে, যখন পারিস অবরুদ্ধ হয়, তখন ব্যোমযান-যোগে পারিস হইতে গ্রাম্য প্রদেশে ডাক যাইত। শিক্ষিত পারাবত সকল সেই সকল ব্যোমযানে চড়িয়া যাইত; তাহাদের পুচ্ছে উত্তর বাঁধিয়া দিলে লইয়া ফিরিয়া আসিত। লঘুতার অনুরোধে সেই সকল পত্র ফটোগ্রাফের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্রাকারে লিখিত হইত—অতিবৃহৎ পত্র এক ইঞ্চির মধ্যে সমাবিষ্ট হইত। পড়িবার সময়ে অনুবীক্ষণ ব্যবহার করিতে হইত। স্থানাভাব বশতঃ এই কৌতুকাবহ তত্ত্ব আমরা সবিস্তারে লিখিতে পারিলাম না।

উপসংহার কালে বক্তব্য যে ব্যোমযান এখনও সাধারণের গমনাগমনের উপযোগী বা যথেচ্ছ বিহারের উপায় স্বরূপ হয় নাই। গ্লেশর সাহেব বলেন যে, বেলুনের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; যানান্তর ইহার দ্বারা সূচিত হইতে পারে; যানান্তর সূচিত না হইলে সে আশা পূর্ণ হইবে না। মনুষ্য কখন উড়িতে পারিবে কি না, মস্যূর ফ্লামারিয়ঁ এই তত্ত্বের সবিস্তারে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে একদিন মনুষ্যগণ অবশ্য পক্ষীদিগের ন্যায় উড়িতে পারিবে; কিন্তু আত্মবলে নহে। যখন মনুষ্য, পক্ষ বা পক্ষবৎ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক বলে তাহা সঞ্চালন করিতে পারিবে, তখন মনুষ্যের বিহঙ্গ পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। দে লোম নামক একজন ফরাসী একটি মৎস্যাকার বেলুন কল্পনা করিয়াছেন, তিনি বিবেচনা করেন তৎসাহায্যে মনুষ্য যথেচ্ছা আকাশপথে যাতায়াত করিতে পারিবে। কিন্তু সে যন্ত্র হইতে এপর্য্যন্ত কোন ফলোদয় হয় নাই বলিয়া আমরা তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম না।

---

* Ant' helia

আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের যতই কেন গৌরব করি না, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে এখন অনেকগুলি নূতন কার্য্য হইতেছে। নল রাজার রথচালনাশক্তি সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, তাহাতে সামান্য লোকের কোন লভ্য ছিল না। উক্ত রথের সহিত কেহ কেহ ইদানিন্তন রেইলওয়ের তুলনা করিয়া থাকেন। কিন্তু উভয়ের আরোহিসংখ্যার কথা দূরে থাকুক, এখন শেষোক্ত কার্য্যে যত অর্থব্যয় হইতেছে, প্রাচীন কালে সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা অভাবনীয় ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখন নানা প্রকারে যে বিপুল অর্থব্যয় হইতেছে সর্ব্বসাধারণই তাহার উপকারভোগী। তখন অর্থব্যয় হইত না এমত নহে। এক একটী যজ্ঞে প্রচুর ব্যয় হইত কিন্তু ক্রিয়া সমাধান্তে তাহার বিশেষ চিহ্ন থাকিত না। তাজমহলের ন্যায়, অপূর্ব্ব অট্টালিকা পৃথিবীতে নাই একথা বলিলে আমাদিগকে কেহ বৃথা গর্ব্বকারী বলিবেন না, কিন্তু যদি কল্য তাজমহল তোপে উড়ান হয়, তবে লোকের মনে ক্ষোভ হইবে মাত্র, কাহারও গ্রাসাচ্ছাদনের কোন ব্যাঘাত হইবে না। কিন্তু যদি আজি রাত্রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সমস্ত সেতুগুলি ভাঙ্গিয়া যায়, তবে কত ক্লেশ উপস্থিত হইবেক, তাহা কে গণনা করিতে পারে? লোকের যাতায়াতের কষ্ট ধরিব না; কিন্তু ব্যবসার যে ক্ষতি হইবেক, তাহা আর ইহজন্মে পূরণ হইবে না। আর যদি রেইলওয়ে একবারে বন্ধ হইয়া যায়, তবে কত কত গ্রাম নগর আদি বিবিধ প্রকার ভূসম্পত্তির সমৃদ্ধি চিরকালের মত জলাঞ্জলি দিতে হইবেক।

ভূমিতে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা বিক্রয় করিবার জন্য অন্ততঃ কিয়দংশ স্থানান্তরে নীত হয়। দ্রব্য আমদানী রপ্তানীতে যে খরচ পড়ে তাহা মূল্য হইতে কর্ত্তিত হইলে লভ্যাংশ পাওয়া যায়। অতএব যাহাতে রপ্তানীর খরচ সুলভ হয়, তাহাতে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে উপকৃত হয়েন। একদিকে দ্রব্যের মূল্য হ্রাস এবং পক্ষান্তরে উৎপাদনকারী ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বর্দ্ধিত হয়। রেইলওয়ের দ্বারা অল্প সময়ে এবং স্থল বিশেষে অল্প মূল্যে দ্রব্যাদি আমদানী করা যায়। অল্প সময়ে

আমদানী হইলে তাহা অল্পকাল মধ্যে বিক্রয় করিতে পারা যায়, সুতরাং যে স্থলে পূর্ব্বে এক ক্ষেপ আমদানী রপ্তানী হইত, রেইলওয়ের সাহায্যে সেখানে যদি দশ ক্ষেপ হইতে পারে, তবে পূর্ব্বে এক মূল ধনে যত কার্য্য হইত, এখন সেই ধনে প্রায় তাহার দশগুণ টাকার ব্যবসা এবং তদনুযায়ী লভ্য বৃদ্ধি হইতে পারে।

অতএব রেলওয়ের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট যেমন অল্প সৈন্যে, এই রাজ্য রক্ষা করিবার ক্ষমতা লাভ করিতেছেন, আমরাও সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকারে অর্থ লাভ করিতেছি।

যেমন রেইলওয়ে সেইরূপ পবলিক্-ওয়ার্কের কোন কোন কার্য্য, যথা খাল, পাকা রাস্তা আদির দ্বারাও দেশের উপকার হইতেছে। এ সমস্ত কার্য্যে যে ধনব্যয় হয়, তাহা কোন একজন লোকের নহে। এত টাকার সংস্থান কাহারই নাই। উহা নানা ব্যক্তির নিকট কর্জ্জ বা সেয়ারের দ্বারা সংগৃহীত হয়। রেইলওয়ের ধন অধিকাংশ ইংলণ্ডবাসীরাই দিয়াছেন। তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে বার্ষিক সুদ প্রাপ্ত হয়েন। এই সুদের মধ্যে যে পরিমাণ রেইলওয়ের উপস্বত্ব হইতে সংকুলান হয়, তাহা বাদে অবশিষ্ট গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত হয়। গবর্ণমেণ্ট আমাদের নিকট নানা প্রকার কর লইয়া, তাহা হইতে উক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। সুতরাং রেইলওয়ের কার্য্যে ইংরাজেরা টাকা দিয়াছেন, আমরা সুদ দিতেছি। প্রাচীন কালে এরূপ কোন ব্যবসা ছিল না। কেবল রেইলওয়ে নয় এখন এইরূপ নানাবিধ উপায়ের দ্বারা ধনবৃদ্ধি হইতেছে।

অর্থ শাস্ত্রের একটি কথা এই যে, কোন দেশে একটি নূতন ব্যবসা আরম্ভ হইলে, কিম্বা কোন পুরাতন ব্যবসা বৃদ্ধি হইলে, সেই ব্যবসার দ্রব্যজাত উৎপাদনের নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক লোক খাটাইতে হয়; এবং সেই সকল লোকের বেতন দিবার জন্য, মূল ধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়। মজুরের বেতন পূর্ব্ব প্রচলিত নিয়ম অপেক্ষা বৃদ্ধি করিয়া না দিলে অধিক মজুর পাওয়া যায় না; কারণ তাহারা অর্থলোভ ভিন্ন এক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হয় না। মজুরের বেতন বৃদ্ধি করিলে, তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের উন্নতি হয়। এবং অন্যান্য দেশে দেখা যায় যে সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের বিবাহ সংখ্যাও বর্দ্ধিত হয়। বিবাহ বৃদ্ধি হইলে, লোক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উহা হইতে আহারীয় সামগ্রীর প্রতি টান বৃদ্ধি হয়। অতএব উভয় হেতুতেই মজুরের বেতন বৃদ্ধির দ্বারা অন্নবস্ত্রের টান অধিক হইয়া, তাহার মূল্য বৃদ্ধি হয়। এই বিষয়ের প্রতিকার করিবার জন্য অন্যত্র হইতে, সুলভ দ্রব্য আমদানী করা আবশ্যক।

ইংরাজাধিপত্যে এতদ্দেশে যে সকল নূতন ব্যবসা হইতেছে, তাহাতে অন্ন-

বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। ফলেও সকলে দেখিতে পাইতেছেন যে তাহাই ঘটিয়াছে। কিন্তু খাদ্য সামগ্রী এতদ্দেশে অন্যত্র অপেক্ষা এত সুলভ যে বিদেশীয় আমদানীর দ্বারা তাহার মূল্য লাঘব হইতে পারে না। আমরা যখন খাদ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি জন্য খেদ করি, তৎকালে স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, অন্যান্য দেশে ঐ সকল দ্রব্য অপেক্ষাকৃত অনেক মহার্ঘ। পূর্ব্বে এ দেশের লোকেরা যে খাদ্য সৌলভ্য ভোগ করিতেন এখন তাহারই কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে। সম্প্রতি বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ হইবার ঘোরতর আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে; এমত সময়ে নেপাল গবর্ণমেণ্ট স্বরাজ্যের শস্য রপ্তানী বন্ধ করাতে আমাদিগের মনে যেরূপ ভাব উদয় হইয়াছে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু নেপাল হইতে এখানে ধান্য আমদানী হইলে, তথায় ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি হইত। অতএব আমরা যখন কেবল মূল্য বৃদ্ধি নিবারণের নিমিত্ত রপ্তানী বন্ধ করাইবার বাসনা করি তৎকালে, যে রাজ্যে বঙ্গদেশের শস্য আমদানী হয় সেখানকার অবস্থার প্রতি অনুধাবন করা কর্ত্তব্য।

এতদ্দেশের সুলভ দ্রব্য অন্য দেশে রপ্তানী হওয়াতে যে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে তাহার বৃদ্ধি অংশ দুই ভাগে বিভক্ত করা কর্ত্তব্য। এক, যাহা এই দেশের ক্রেতৃগণ এতদ্দেশের বিক্রেতাদিগকে দেয়, তাহাতে কেবল এক শ্রেণীর উন্নতি এবং অন্য শ্রেণীর অবনতি হয়; সুতরাং সমগ্র দেশের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। দ্বিতীয় ভাগ বিদেশীয় ক্রেতৃগণ এই দেশের লোককে দেয়, ইহাই প্রকৃত বর্দ্ধিত ধন। অতএব খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিতে শ্রেণী বিশেষের সুখ দুঃখ যাহাই হউক সমগ্র রাজ্যের কোন ক্ষতি হয় নাই।

ইহার প্রতিকারও যে কিছু হয় নাই এমত নহে। এতদ্দেশে পূর্ব্বে বস্ত্র অতিশয় মহার্ঘ ছিল এবং যদি বিদেশের আমদানী না থাকিত, তাহা হইলে অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় এখন বস্ত্রের মূল্য আরো বৃদ্ধি হইত সন্দেহ নাই। অতএব যেমন খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে সেইরূপ বস্ত্রের মূল্য হ্রাস হইয়াছে।

অর্থ শাস্ত্রের বিধান মতে ভূমি, ধন এবং লোক এই তিনের উন্নতি ব্যতীত কোন দেশের উৎপন্ন বৃদ্ধি হইতে পারে না। এতদ্দেশে এতকাল বাণিজ্যের উন্নতি ছিল না। শ্রমোপজীবিগণ যাহা উৎপাদন করিত তাহা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হওয়াতে লভ্যাংশ এতদ্দেশের ক্রেতৃগণই ভোগ করিতেন। ইতর শ্রেণীর স্কন্ধে শ্রমের ভার দিয়া ভদ্রমণ্ডলী অল্প আয়াসেই দিনপাত করিতেন। এখন বিদেশের বাজার হইতে এই দেশের দ্রব্যের প্রতি টান পড়াতে শ্রমোপজীবিগণের উপার্জ্জন বর্দ্ধিত হইয়াছে, সুতরাং ভদ্রশ্রেণীগণ বাহুল্য পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারিলে, উন্নতি লাভ দূরে থাকুক পূর্ব্বাবস্থা রক্ষা করিতেও পারিবেন না। ভদ্র-

শ্রেণী বুদ্ধিবলে অর্থলাভ করেন, অতএব তাঁহাদিগের সেই দিকেই মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। যতদিন চাকরির আয় ছিল ততদিন তাহা অবলম্বন করিয়া ভদ্রমণ্ডলী আপনাদিগের পদ রক্ষা করিয়াছেন। পূর্ব্বে এ দেশে এত প্রকার চাকরি ছিল না এবং রাজভাণ্ডার হইতে চাকরির নিমিত্তেও এত বেতন ব্যয় হইত না। কিন্তু চাকরির সংখ্যা এবং বেতনের সীমা আছে। আর যত দিন এদেশের দ্রব্যাদি বিদেশীয় দ্রব্যের সহিত তুল্য মূল্য না হয় এবং যতদিন এদেশের মজুরের বেতন ঊর্দ্ধ সীমা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন খাদ্যের মূল্য অবশ্যই বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক। অতএব কেবল চাকরি অবলম্বনের দ্বারা ভদ্রমণ্ডলী যদি প্রাচীন পদ রক্ষা করিবার আশা করেন, তবে তাহাতে নিষ্ফল হইয়া তাঁহারা নিদারুণ দারিদ্র্য-যন্ত্রণাতে পীড়িত হইবেন।

এতদ্দেশে অধিকাংশ লোক মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিলে, তাহাতে, হয় কোম্পানীর কাগজ, নচেৎ ভূমি সম্পত্তি ক্রয় করেন। প্রথম উপায়ের দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে ঋণদান করা হয়। গবর্ণমেণ্ট ঋণগ্রহণ করিয়া এতদ্দেশে রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন এবং কতক অংশ পবলিক্ ওয়ার্কে নিযুক্ত করিয়াছেন। অতএব এতদ্দেশীয় কোম্পানীর কাগজ ক্রেতৃগণের যে পরিমাণ অর্থ শেষোক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে তাহা হইতে দেশের কিছু কিছু ধন বৃদ্ধি হইতেছে। যাঁহারা ভূমি ক্রয় করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ভূমি আবাদ করে, এরূপ লোক অতি অল্প। অধিকাংশ কেবল প্রজাগণের নিকট কর সংগ্রহ কার্য্যেই নিযুক্ত থাকেন। এতদ্দ্বারা শ্রমোপ-জীবিগণ বিদেশীয় মহাজনের নিকট যে অর্থ আহরণ করিতেছে তাহার কিয়দংশ জমিদারেরা গ্রহণ করেন। এই কার্য্য আইনসঙ্গত হইলেও ইহার দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি হয় না, কারণ কৃষকের ধন জমিদারের সিন্দুকে প্রবেশ করিলে দেশের কোন লাভ নাই বরং শ্রমোপজীবিগণের অন্নবস্ত্রের উপায় সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়।

শ্রেণীবিশেষের হস্তে অধিক পরিমাণে অর্থ থাকিলে দেশের যে বল বৃদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে আমরা এস্থলে কিছু বলিব না। ধনবৃদ্ধি বিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভদ্রমণ্ডলীর উদ্বর্ত্ত ধনের অধিকাংশ জমিদারীতে নিযুক্ত হওয়াতে দেশের পক্ষে কোন লভ্য হইতেছে না। ফলতঃ আমরা চাকরি এবং জমিদারীর আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ না করিলে কখন দেশের উন্নতি হইবেক না।

যাহাদিগের ধন উদ্বর্ত্ত হয়, অন্ততঃ তাহারাই জমিদারীর পরিবর্ত্তে অন্য বিষয়ে অর্থ ব্যয় করিতে পারেন। কিন্তু যাহাদিগের উপার্জ্জনের বৃদ্ধি নাই, অথচ খাদ্য দ্রব্যের মূল্যাধিক্য জন্য বিলক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধি আছে, তাহাদিগের ব্যয় সঙ্কীর্ণ না করিলে, তাহারা কখন মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, মূলধন ব্যতীত ব্যবসা করিবার উপায় নাই।

আমাদিগের স্ব স্ব দেহ সম্বন্ধে বাবুআনা খরচ যৎসামান্য। বিবাহ শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশন দেবোপাসনা আদি উৎসব ক্রিয়াতে এবং কুপোষ্য প্রতিপালনেই অনেক অর্থ নষ্ট হয়। দরিদ্রকে অন্নদান আর কুপোষ্য প্রতিপালনে অনেক ভেদ। যে ব্যক্তি আপনার আহারোপযোগী ধন কোন প্রকারে উৎপাদন করিতে পারে না, সেই প্রকৃত দরিদ্র; এবং এতাদৃশ লোকের অভাব, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণই সংকুলান করিবেন। কিন্তু যাহাদিগের ক্ষমতা থাকা সত্বেও আলস্য বা অভিমান বশতঃ আপনাদিগের উপজীবিকা উৎপাদন করে না, তাহারা কাজে কাজেই অন্যের অন্নভোক্তা হয় এবং তাহারাই প্রকৃত কুপোষ্য।

উৎসব উপলক্ষে ভোজন করান আমাদিগের জাতীয় ধর্ম্ম। লোককে না খাওয়াইলে বাঙ্গালির চিত্তবিনোদন হয় না। অনেকে মনে করেন ভোজন করাইলে পরোপকার হয়। ফলতঃ যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ চারি আনা মূল্যের খাদ্যে জীবন ধারণ করে, তাহাকে একদিন আট আনা মূল্যের কোন উপাদেয় সামগ্রী খাওয়াইলে বিশেষ ফলোদয় হয় না। ঐ আট আনার মধ্যে চারি আনা তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়, অবশিষ্ট চারি আনা কেবল ভোজন সুখের জন্য ব্যয়িত হয়, তদভাবে তাহার কোন কষ্ট হয় না। অতএব প্রথমোক্ত চারি আনা মাত্র তাহাকে দান করা হয়। আবার মনে কর যে, নিমন্ত্রণ না খাইলে সেই সময়ে সে দুই আনার কার্য্য করিত কিন্তু গৃহে থাকিলে চারি আনা উপার্জ্জন করিত। অতএব নিমন্ত্রণ-কারী যে আট আনা ব্যয় করিলেন তাহার চারি আনা নিমন্ত্রিতের ঘরে গেল কিন্তু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক দুই আনা নষ্ট হইল। অতএব তাহার প্রাপ্তি কেবল দুই আনা মাত্র হইতেছে আর যে চারি আনা ভোজন সুখে নিযুক্ত হইল তাহা বস্তুতঃ মোদকগণ প্রাপ্ত হইল। মোদকগণ যদি উহা না পাইত তবে অন্য কার্য্যের দ্বারা সেই চারি আনা উপার্জ্জন করিতে পারিত, সুতরাং উহা পাইয়া তাহাদিগের আয় বৃদ্ধি হইল না। ফলতঃ বাবুআনা খরচ মাত্রই অকর্ম্মণ্য। শরীর পোষণ জন্য যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্ত ব্যয়ের নাম বাবুআনা খরচ। প্রথমোক্ত ব্যয় নির্ব্বাহান্তে যে ধন উদ্বর্ত্ত হয় তাহা হইতে ধন বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে ক্রমাধীন দেশের উন্নতিই হইতে থাকে। বাবুআনাতে অর্থ ব্যয় করিলে তাহা কেবল কতকগুলি লোকে প্রাপ্ত হয়। অতএব উৎসব ক্রিয়া এবং কুপোষ্যপালনে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহা বৃথা। মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর পক্ষে কুপোষ্যপালনের ব্যয় অল্প কিন্তু উৎসবের ব্যয় বিস্তর। তাহা খর্ব্ব করিয়া মূলধন সংগ্রহ না করিলে রক্ষা নাই।

ইতিপূর্ব্বে রেইলওয়ে জনিত ধনবৃদ্ধির উল্লেখ করা গিয়াছে। তদ্বিষয়ে আর কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। কোন কোন অর্থশাস্ত্রবেত্তা বলেন যে এতদ্দেশে রেইলওয়ে আদিতে ইংলণ্ডবাসীদিগের অর্থ ব্যয় হওয়াতে উল্লিখিত প্রকারে দেশের

মহোপকার হইতেছে। আমরা ইংলণ্ডের অধীন না হইলে এই লাভ কখনই পাইতাম না।

এতদ্দেশের অবস্থার প্রতি অনুধাবন করিলে আমাদিগের মনে হয় যে এখন ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বৃদ্ধি না হইলে আমাদিগের মঙ্গল হইবেক না। ধনবৃদ্ধির যে তিন উপায় উল্লিখিত হইয়াছে তদন্তর্গত লোকের উন্নতিনামক পদার্থ মধ্যেই এই বুদ্ধিবৃদ্ধি গণ্য হইল। পুরাকাল হইতে এতদ্দেশে যে সকল ধনবৃদ্ধির উপায় প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা এখন আমরা সভ্য মণ্ডলীর সমকক্ষ হইতে পারিব না। অতএব বিদেশীয় কৌশলে ধনবৃদ্ধি করিতে না শিখিলে আমাদিগের সম্যক্ উন্নতি হইবেক না। রেইলওয়ে ও অন্যান্য কল কৌশল আদির দ্বারা কি প্রকারে ধনবৃদ্ধি করিতে হয় তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। এখন ইংলণ্ডের যে ধন এতদ্দেশে আসিতেছে, তাহা ইংরাজেরাই ব্যয় করিতেছেন, সুতরাং তাহাতে ধনবৃদ্ধি হইলেও আমাদিগের বুদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছে না। যদি কল্যই ইংলণ্ডবাসীরা কোন কারণে এতদ্দেশে অর্থ প্রেরণ করিতে ক্ষান্ত হয়েন, তবে আমরা আর নূতন রেইলওয়ে কি নূতন কোন কল স্থাপন করিতে পারিব না। যাহা এখন বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা ইংরাজের সাহায্য বিনা চলে কি না সন্দেহ। চলিলেও তাহার ক্ষয় আছে, কিন্তু পুনঃ সংস্থাপনের উপায় নাই, অতএব ইংলণ্ডের ধন এতদ্দেশে এখনও স্থায়ী হইতে পারে নাই।

কিন্তু এতদ্দ্বারা মজুরের বেতন বৃদ্ধি হইতেছে। কোন কার্য্যে এইরূপ বেতন বৃদ্ধি হইলে অন্য ব্যবসাতে মজুরের সংখ্যা কমিয়া যায়। তাহাতে সেই ব্যবসার দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হইয়া সর্ব্বসাধারণের ব্যয় বৃদ্ধি হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রাগুক্ত অবস্থায় মজুরদিগের আয় বৃদ্ধির সহিত বিবাহ এবং বংশ বৃদ্ধি হয়, সুতরাং কোন কোন ব্যবসার মজুর কমিয়া যে বিঘ্ন উদয় হয়, অল্পকাল মধ্যে তাহার খণ্ডনও হইয়া যায়।

অতএব যদি বিবাহ বা বংশ বৃদ্ধির কোন ব্যাঘাত থাকে তবে এক ব্যবসার উন্নতি হইলে অন্য ব্যবসার ক্ষতি হয়।

আমাদিগের দেশে এতদ্বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা কি? লোকসংখ্যা রিপোর্টে বিভর্লি সাহেব লিখিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে যত বংশ বৃদ্ধি এত কুত্রাপি দেখা যায় না। এতদ্দেশে যেমন অপুত্রক বিধবা আছে, ইংলণ্ড আদি দেশে সেইরূপ বয়স্থা কুমারী সংখ্যাও বিস্তর। তবে এদেশে যেমন অল্প বয়সে সন্তান হয় এমত আর কুত্রাপি দেখা যায় না, সুতরাং অন্য দেশ অপেক্ষা এতদ্দেশে বংশ বৃদ্ধি অধিক হওয়াই সম্ভব।

ইংলণ্ডে অনধিক ১১ বৎসর বয়স্ক সন্তান সংখ্যা লোকসংখ্যার শত প্রতি প্রায় সাড়ে উনত্রিশ জন অথবা ২৯'৪৪। বাঙ্গালাতে ঐরূপ সন্তানের সংখ্যা শতকরা

৩৪৷৷০ অথবা ৩৪'৫

পাঞ্জাবের ৩৫৷৷—৩৫'৪২

অযোধ্যায় ৩৬—   ৩৬'

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ৩৫৷৷ অথবা ৩৫'৫৮ কিন্তু বংশ বৃদ্ধি হইলে লোক বৃদ্ধি হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এতদ্দেশে লোক বৃদ্ধি হইতেছে না একথা বলা যায় না—কিন্তু যাঁহারা এ সকল বিষয় আলোচনা করেন তাঁহাদের ধারণা এই যে ইংলণ্ড আদি দেশে মৃত্যু বাদে যে পরিমাণ লোক বৃদ্ধি হয় এতদ্দেশে তত হয় না। সুতরাং যেমন বংশ বৃদ্ধি সেইরূপ মৃত্যু সংখ্যাও এখানে অধিক হইবেক। অতএব বংশ বৃদ্ধি হইলেও এতদ্দেশে লোক বৃদ্ধি হয় না।

এদেশে যে ব্যয়স্থা কুমারী প্রায় থাকে না তাহা সকলেই জানেন, সুতরাং বিবাহ বৃদ্ধির দ্বারাও লোক বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই জন্য আমরা মনে করি যে বিদেশীয় ধন সমাগমের দ্বারা অর্থশাস্ত্রবেত্তৃগণ এদেশের যত উন্নতির প্রত্যাশা করেন, তাহা ঘটে না। এদেশের মৃত্যুসংখ্যা না কমিলে নূতন ব্যবসা সংস্থাপন দ্বারা কেবল এক ব্যবসায়ী লোক অন্য ব্যবসাতে নিযুক্ত হইবেক তাহাতে সমগ্র দেশের বিশেষ উন্নতি হইবেক না।

এতদ্দেশে ইতর লোকেরাই কৃষিকর্ম্ম এবং কারখানার কল সমূহের কার্য্যাদি করে। ভদ্রমণ্ডলী তাহার কোন প্রকার সাহায্য করেন না, সুতরাং ভদ্রসন্তানদিগের দ্বারা এদেশের উৎপন্ন বৃদ্ধি হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা নাই। অতএব ভদ্রলোকের সংখ্যা বৃদ্ধিতেও দেশের বিশেষ উপকার নাই, বরং হ্রাস হইলে উহাদিগের কতক ক্লেশ মোচন হইতে পারে। কিন্তু এতদ্দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি না হইতে পারিলেও লোকের আয়ুঃ এবং বল বৃদ্ধি হইবার যথেষ্ট স্থল আছে। তাহা সুসিদ্ধ হইলে লোক বৃদ্ধির তুল্য উপকারই হইবেক।

এতদুভয়ের উপায়, আমাদিগের আহারের উৎকর্ষ সাধন এবং বাল্য বিবাহ রহিত করণ। চিকিৎসক মাত্রেই বলেন যে উদ্ভিদ পদার্থ অপেক্ষা মাংসাহার দ্বারা অধিক পরিমাণে বলাধান হয়। "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" আর, বলবান নিরামিষাশিগণের বিষয় যতই বল, বৈদ্য, ডাক্তার, হাকিম সকলের মতেই মাংসাহার অতীব বলকারী।

যদি এবিষয়ে কোন কোন ব্যক্তির ভিন্ন মত থাকে তথাচ অল্প বয়সে সন্তান জন্মিলে যে দুর্ব্বল এবং অল্পায়ুঃ হয়, একথাতে আর বিন্দুমাত্র মতান্তর নাই। তথাচ এতদ্দেশে বাল্য বিবাহ রহিত করণের কোন উদ্যোগ নাই এবং বৈষ্ণব ব্যতীত ব্রাহ্মেরাও কেহ কেহ নিরামিষাশী হইতে ব্যগ্র হইতেছেন।

স্থূল কথা এই যে—

১। ইদানিন্তন রেলওয়ে আদি নানাবিধ কার্য্য দ্বারা এতদ্দেশস্থ অনেক লোকের অর্থলাভ হইতেছে। তাহাতে খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন বস্তুর মূল্য হ্রাসও হইতেছে।

২। প্রাগুক্ত মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা দেশের কোন ক্ষতি না হইলেও শ্রেণী বিশেষের অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে। উহার প্রতিকার জন্য লোকের ব্যয় লাঘব এবং দেশের উৎপন্ন বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

৩। দেখিতে পাওয়া যায় যে এতদ্দেশে উৎসবাদিতে অনেক অর্থনাশ হয় এবং কুপোষ্যপালনের যেরূপ প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাতে অনেকের কেবল আলস্যের বৃদ্ধিই হয়। অন্যথা প্রতিপালকদিগের ব্যয় লাঘব এবং প্রতিপালিত ব্যক্তিদিগের দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে পারে। ধনবান ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই সমস্ত কথা তুচ্ছ হইলেও মধ্যবর্ত্তী এবং দরিদ্র শ্রেণীস্থ ভদ্রলোকের পক্ষে ইহা অতি গুরুতর কথা। ইঁহারা কোন প্রকারে ব্যয় লাঘব করিতে পারিলে মূলধন সঞ্চয় করিতে পারিবেন। যাঁহারা কায়িক শ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন না তাঁহাদিগের আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য মূলধন সঞ্চয় করা অত্যাবশ্যক।

৪। আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য এখন ইউরোপ আদি প্রদেশের অনুকরণ পূর্ব্বক নূতন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়াছে। যথা রেইলওয়ে চালান, জাহাজ চালান, জইণ্ট ষ্টক কোম্পানী ইত্যাদি। কিন্তু এতদ্দেশে এখন রেইলওয়ে আদি যে সমস্ত নূতন কার্য্য হইতেছে তাহা নির্ব্বাহ করিবার ভার অধিকাংশ বিদেশীয়দিগের হস্তে থাকাতে বাঙ্গালিগণ প্রাগুক্ত নূতন কৌশল শিখিতে পারিতেছেন না।

৫। অন্যান্য দেশে লোকের ধনবৃদ্ধি হইতে বিবাহ বৃদ্ধি এবং পরিণামে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া দ্রব্যের মূল্য হ্রাস হয়; কিন্তু এতদ্দেশে তাহার সম্ভাবনা বিরল; কারণ আমাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোক অবিবাহিতা থাকে না।

৬। ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে বর্ত্তমান অবস্থাতে দেশের কোন লভ্য নাই—কারণ ইঁহারা দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারেন না—কেবল ক্ষয় করেন মাত্র। ভক্ষ্যদ্রব্য যথাযথ থাকা স্থলে ভোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধিতে কেবল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং লোকের দারিদ্র্য বৃদ্ধি হয়।

৭। কিন্তু শ্রমোপজীবীদিগের মধ্যে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও বলবৃদ্ধি আয়ুঃ বৃদ্ধি এবং মৃত্যু সংখ্যার হ্রাসের দ্বারা তত্তুল্য ফললাভ হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অত্র প্রস্তাবে দুটি উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে;—বাল্য বিবাহ নিবারণ এবং মাংসাহার প্রচলন।*

*সম্পাদকের মতের বিপরীত মতও বঙ্গদর্শনে প্রকাশের কোন আপত্তি নাই, এই কথা পাঠকদিগের যেন স্মরণ থাকে। অনেকেই তাহা ভুলিয়া যান, এজন্য মধ্যে মধ্যে সে কথা স্মরণ করিয়া দেওয়া ভাল।

বং সম্পাদক।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতিয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্র বিশেষ। বাঙ্গালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবি—জয়দেব—গীতিকাব্যের প্রণেতা। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস, এবং চণ্ডীদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আরও কতকগুলিন এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্য প্রণেতা আছেন; তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন চারি পাঁচ জন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন, আর একজন প্রসিদ্ধ গীতি-কবি। তৎপরে কতকগুলি "কবিওয়ালার" প্রদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীতি এমত সুন্দর আছে, যে ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবি-ওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই। আধুনিক কবি-দিগের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একজন অত্যুৎকৃষ্ট। হেম বাবুর গীতি কাব্যের মধ্যে এমত অংশ অনেক আছে, যে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় তুলনা রহিত। অবকাশ-রঞ্জিনীর কবি, আর একজন উৎকৃষ্ট গীতি কাব্য প্রণেতা। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপা-ধ্যায়ের প্রণীত কাব্য নিচয়ের মধ্যে এক একখানি অতি সুন্দর গীতি কাব্য পাওয়া যায়। সম্প্রতি "মানস বিকাশ" নামে যে কাব্য গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তৎ সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে।

সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। জল উপরিস্থ বায়ু এবং নিম্নস্থ পৃথিবীর অবস্থানুসারে, কতকগুলি অলংঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া কোথাও বাষ্প, কোথাও বৃষ্টি বিন্দু, কোথাও শিশির, কোথাও হিমকণা বা বরফ, কোথাও কুজ্ঝটিকা রূপে পরিণত হয়।

মানস বিকাশ। কলিকাতা প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

তেমনি সাহিত্যও দেশ ভেদে, দেশের অবস্থা ভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জ্ঞেয়, সন্দেহ নাই; এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কোম্‌ৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে রূপ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে, যে সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশ ভেদে, রাজ বিপ্লবের প্রকার ভেদ, সমাজ বিপ্লবের প্রকার ভেদ, ধর্ম্ম বিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকার ভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে। কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বক্‌ল ভিন্ন কেহ বিশেষ রূপে পরিশ্রম করেন নাই, এবং হিতবাদ মতপ্রিয় বক্লের সঙ্গে কাব্য সাহিত্যের সম্বন্ধ কিছু অল্প। মনুষ্য চরিত্র হইতে ধর্ম্ম এবং নীতি মুছিয়া দিয়া, তিনি সমাজ তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত। বিদেশ সম্বন্ধে যাহা হউক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ তত্ত্ব কেহ কখন উত্থাপন করিয়াছেন এমত আমাদের স্মরণ হয় না। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে মক্ষমূলরের গ্রন্থ বহুমূল্য বটে, কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যের সঙ্গে সে গ্রন্থের সামান্য সম্বন্ধ। ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের প্রকৃত গতি কি? তাহা জানি না, কিন্তু তাহার গোটাকত স্থূল স্থূল চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ভারতীয় আর্য্যগণ অনার্য্য আদিম বাসীদিগের সহিত বিবাদে ব্যস্ত; তখন ভারতবর্ষীয়েরা অনার্য্য কুল প্রমথনকারী, ভীতিশূন্য, দিগন্তবিচারী, বিজয়ী বীর জাতি। সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। তারপর ভারতবর্ষের অনার্য্য শত্রু সকল ক্রমে বিজিত এবং দূরপ্রস্থিত; ভারতবর্ষ আর্য্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য, এবং মহা সমৃদ্ধিশালী। তখন আর্য্যগণ বাহ্য শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগতা অনন্তরত্ন-প্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে, তাহা কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্য্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে—অন্য শত্রুর অভাবে সেই পৌরুষ পরস্পরের দমনার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ের কাব্য মহাভারত। বল যাহার, ভারত তাহার হইল। বহু কালের রক্ত বৃষ্টি শমিত হইল। স্থির হইয়া, উন্নত প্রকৃতি আর্য্যকুল শান্তিসুখে মন দিলেন। দেশের ধন বৃদ্ধি, শ্রী বৃদ্ধি, ও সভ্যতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোমক হইতে যবদ্বীপ ও চৈনিক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছুটিতে লাগিল; প্রতি নদীকূলে অনন্তসৌধমালাশোভিত মহানগরী সকল মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষীয়েরা সুখী হইলেন। সুখী এবং কৃতী। এই সুখ ও কৃতিত্বের ফল, কালিদাসাদির নাটক ও মহাকাব্য সকল।

কিন্তু লক্ষ্মী বা সরস্বতী কোথাও চিরস্থায়িনী নহেন ; উভয়েই চঞ্চলা। ভারতবর্ষ ধর্ম্ম শৃঙ্খলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল, যে সাহিত্যরস-গ্রাহিণী শক্তিও তাহার বশীভূতা হইল। প্রকৃতাপ্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল। সাহিত্যও ধর্ম্মানুকারিণী হইল। কেবল তাহাই নহে, বিচার শক্তি ধর্ম্ম মোহে বিকৃত হইয়াছিল—প্রকৃত ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত কামনা করিতে লাগিল। ধর্ম্মই তৃষ্ণা, ধর্ম্মই আলোচনা, ধর্ম্মই সাহিত্যের বিষয়।— এই ধর্ম্ম মোহের ফল পুরাণ।

ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপনা করিয়াছিলেন, যে তথাকার জল বায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজোলুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জল বাস্পপূর্ণ,ভূমি নিম্না এবং উর্ব্বরা, এবং তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্য্য তেজঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্য্য প্রকৃতি কোমলতাময়ী আলস্যের বশবর্ত্তিনী, এবং গৃহসুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, যে আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতি কাব্য সৃষ্ট লইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতা পূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতী প্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতি চরিত্রানুকারী গীতি কাব্য সাত আট শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতি কাব্যের এত বাহুল্য।

বঙ্গীয় গীতিকাব্য লেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল, প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন ; আর একদল, বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্য হৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। একদল মানব হৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্য প্রকৃতিকে দীপ করিয়া, তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন ; আর একদল, আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জ্বল করেন, অথবা মনুষ্য চরিত্র খনিতে যে রত্ন মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান বিদ্যাপতি। জয়দেবাদির কবিতায়, সতত মাধবী যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলয়দল শ্রেণী, স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকর-বৃন্দ, কোকিলকূজিতকুঞ্জ, নবজলধর, এবং তৎসঙ্গে কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, বিম্বোষ্ঠ, সরসীরুহলোচন, অলস-নিমেষ, এই সকলের চিত্র, বাতোন্মথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য। বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাঁহা-

দিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই এমত নহে—বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানব হৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ সুতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ; কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্ত্তে মনুষ্য হৃদয়ের গূঢ় তলচারী ভাব সকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয়গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত। তাহার কারণ কেবল এই বাহ্যপ্রকৃতির শক্তি। স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে স্থূল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আধিক্যে কবিতা একটু ইন্দ্রিয়ানুসারিণী হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতি মনুষ্য হৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, সুতরাং তাঁহার কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংশ্রব শূন্য, বিলাস শূন্য, পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত রাধাকৃষ্ণের বিলাস পূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয় পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি, আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা, উৎফুল্ল কমল জাল শোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর; বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গসঙ্কুলা নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা। জয়দেবের গান, মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি; বিদ্যাপতির গান, সায়াহ্ন সমীরণের নিঃশ্বাস।

আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাঁহাদিগকে এক এক ভিন্ন শ্রেণীর গীতকবির আদর্শ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা বলিয়াছি। যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্ত্তে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহা গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে তদ্রূপই বর্ত্তে।

আধুনিক বাঙ্গালি গীতিকাব্য লেখকগণকে একটি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা আধুনিক ইংরেজি গীতকবিদিগের অনুগামী। আধুনিক ইংরেজি কবি ও আধুনিক বাঙ্গালি কবিগণ সভ্যতা বৃদ্ধির কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন। পূর্ব্ব কবিগণ, কেবল আপনাকে চিনিতেন, আপনার নিকটবর্ত্তী যাহা তাহা চিনিতেন। যাহা আভ্যন্তরিক, বা নিকটস্থ, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানিতেন, তাহার অননুকরণীয় চিত্র সকল রাখিয়া গিয়াছেন। একালকার কবিগণ জ্ঞানী—বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ। নানাদেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও বহুবিষয়িণী হইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি

দূরসম্বন্ধগ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও দূরসম্বন্ধ প্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তা গুণের লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, বা বিচিত্র, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কবিত্বশক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সঙ্কীর্ণ কূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।

মানস বিকাশ এই কথা প্রমাণ করিতেছে। আমরা মানস বিকাশ পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি—"মিলন" ও "কাল" নামক দুইটি কবিতা উৎকৃষ্ট। "কাল" হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

সহসা যখন বিধির আদেশে,
সুধাংশু কিরণ শোভি নভোদেশে,
রজত ছটায় ধাইল হরষে,
ভুবনময়,
নর নারী কীট পতঙ্গ সহিত
বসুন্ধরা যবে হইল সৃজিত
গ্রহ উপগ্রহ হইল শোভিত
হলো উদয়।
তখন ত কাল প্রচণ্ড শাসনে,
রাখিতে সকলে আপন অধীনে
সব সময়॥

দুরন্ত দংশন কাল রে তোমার,
তব হাতে কারও নাহিক নিস্তার,
ছোট বড় তুমি কর না বিচার,
বধ সকলে,
রাজেন্দ্র মুকুট করিয়া হরণ,
দুঃখ নীরে কর নিমগন,
পদযুগে পশে করয়ে দলন,
আপন বলে,
সুখের আগারে বিষাদ আনিয়া
কতশত নরে যাও ভাসাইয়া,
নয়নজলে।

এ কবিতা উত্তম, কিন্তু ইহাতে বড় ইংরেজি ইংরেজি গন্ধ কয়। প্রাচীন বাঙ্গালি গীতিকাব্যলেখকেরা এ পথে যাইতেন না; কালের কথা গায়িতে গেলে, সৃষ্টির আদি, রাজেন্দ্রের মুকুট, সমগ্র মনুষ্য জাতির নয়নজল তাঁহাদিগের মনে পড়িত না; এসকল জ্ঞান ও বুদ্ধি বিস্তৃতির ফল। প্রাচীন কবি, কালের গতি ভাবিতে গেলে, আপনার হৃদয়ই ভাবিতেন; নিজ হৃদয়ে কালের "দুরন্ত দংশন" কি প্রকার, তাহার বিষ কেমন, তাহাই দেখিতেন। কাল-সম্বন্ধে একটি প্রাচীন কবিতা তুলনার জন্য আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

এখন তখন করি, দিবস গোয়াঙলু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি, বরিখ গোয়াঙলু
খোয়লু এ তনুয়াক আশা॥
বরিখ বরিখ করি, সময় গোয়াঙলু
খোয়াঙলু এ তনু আশে।

হিমকর কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করবি মাধবি মাসে॥
অঙ্কুর তপন তাপে তনু যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সোপিয়া লেহে॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি, ইত্যাদি।

কাব্যে অন্তঃ-প্রকৃতি ও বহিঃ-প্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃ-প্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থা বিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃ-প্রকৃতি বর্ণনীয়, তাহা অন্তঃ-প্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃ-প্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃ-প্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি, ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে এক দিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপর দিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এ স্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আনুরক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ, কালিদাস ও জয়দেব। আধ্যাত্মিকতা দোষের উদাহরণ, পোপ ও জনসন।

ভারতচন্দ্রাদি বাঙ্গালি কবি, যাঁহারা কালিদাস ও জয়দেবকে আদর্শ করেন, তাঁহাদের কাব্য ইন্দ্রিয়পর। কোন মূর্খ না মনে করেন, যে ইহাতে কালিদাসাদির কবিত্বের নিন্দা হইতেছে—কেবল কাব্যের শ্রেণী নির্ব্বাচন হইতেছে মাত্র। আধুনিক, ইংরেজি কাব্যের অনুকারী বাঙ্গালি কবিগণ, কিয়দংশে আধ্যাত্মিকতা দোষে দুষ্ট। মধুসূদন, যেরূপ ইংরেজি কবিদিগের শিষ্য, সেইরূপ কতকদূর জয়দেবাদির শিষ্য, এই জন্য তাঁহাতে আধ্যাত্মিক দোষ তাদৃশ স্পষ্ট নহে। হেমচন্দ্র, নিজের প্রতিভা শক্তির গুণে নূতন পথ খনন করিতেছেন, তাঁহারও আধ্যাত্মিকতা দোষ অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট কিন্তু অবকাশ রঞ্জিনীর লেখক এবং মানস বিকাশ লেখকের এ দোষ বিলক্ষণ প্রবল। নিম্নশ্রেণীর কবিদিগের মধ্যেও ইহা প্রবল। যাঁহারা নিত্য পয়ার রচনা করিয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিতেছেন, তাঁহারা যেন না মনে করেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমরা এ দোষ আরোপিত করিতেছি; অন্তঃপ্রকৃতি বা বহিঃ প্রকৃতি কোন প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের কোন দোষই নাই।

মানস বিকাশের কবিতার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা, "মিলন," কিন্তু তাহার অধিকাংশ উদ্ধৃত না করিলে তাহার উৎকর্ষ অনুভূত করা যায় না। তাহা কর্ত্তব্য নহে এবং তদুপযুক্ত স্থানও আমাদিগের নাই। এজন্য "প্রেম প্রতিমা" হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

আইল বসন্ত বিজন কাননে,
অমনি তখনি সহাস্য বদনে,
তরুলতা যথা বিবিধ ভূষণে,
সাজায় কায়,

তুমিও যেখানে কর পদার্পণ,
সুখচন্দ্র তথা বিতরে কিরণ,
বিষাদ, হুতাশ, জনম মতন
চলিয়া যায়।

তব আবির্ভাবে, ভুবন মোহিনী,
মরুভূমে বহে গভীর বাহিনী,
ফোটে পরিজাত আসিয়া আপনি
ধরণী তলে,
আঁধার আকাশে হিমাংশু কিরণ
হাসি হাসি করে কর বিতরণ,
ভাসে যেন, মরি অখিল ভুবন,
সুখ সলিলে॥

কে বলে কেবল নন্দন কাননে,
ফোটে পারিজাত? ফোটে না এখানে
দেখ চেয়ে এই সংসার-কাননে
ফুটেছে কত!
গৃহস্থের ঘরে, রাজার ভবনে,
রোগীর শিয়রে, বিজন কাননে,
কতশত ফুল প্রফুল্ল বদনে
ফোটে নিয়ত!

ইংরেজ শিষ্য, এইরূপে প্রেম বর্ণন করিলেন, ইহার সঙ্গে কণ্ঠিধারী বৈরাগিগণ কৃত প্রেমবর্ণন তুলনা করুন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আর একজন হাফ ইংরেজ হাফ জয়দেব চেলার কৃত কবিতা শুনুন; এ কবিতারও উদ্দেশ্য প্রেমোচ্ছ্বাস বর্ণনা।

"মানস সরসে সখি ভাসিছে মরাল রে
কমল কাননে।
কমলিনী কোন ছলে, ডুবিয়া থাকিবে জলে,
বঞ্চিয়া রমণে।
যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তারপাশে
মদন রাজার বিধি, লঙ্ঘিব কেমনে।
যদি অবহেলা করি, রুষিবে সম্বর অরি,
কে সম্বরে স্মরশরে, এ তিন ভুবনে॥
ওই শুন পুন বাজে মজাইয়া মন রে
মুরারির বাঁশী।
সুমন্দ মলয় আনে, ও নিনাদ মোর কানে
আমি শ্যাম দাসী।

জলদ গরজে যবে, ময়ূরী নাচে সে রবে,
আমি কেন না কাটিব শরমের ফাঁশী?
সৌদামিনী ঘন সনে, নাচে সদানন্দ মনে
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকা বিলাসী॥

* * * *

সাগর উদ্দেশে নদী ভ্রমে দেশে দেশে রে
অবিরাম গতি!
গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশি রূপবতী॥
আমার প্রেম-সাগর, দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে রব আমি? ধিক্ এ কুমতি!
আমার সুধাংশু নিধি, আমারে দিয়াছে বিধি,
বিরহ আঁধারে আমি? ধিক্ এ যুকতি!"

এক্ষণে বৈষ্ণবের দলের দুই একটা গীত—

সই, কি না সে বঁধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নহে পরতীতে
যেন দরিদ্রের হেম॥

হিয়ায় হিয়ার, লাগিবে লাগিয়ে,
চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া, বাইয়ের দোসর,
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে॥

তিলে কত বেরি, মুখ নিহারয়ে,
আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূর মানয়ে,
তেঁই সদাই লয় নাম॥
জাগিতে ঘুমাইতে, আন নাহি চিতে
রসের পসরা কাছে।
জ্ঞানদাস কহে, এমতি পীরিতি,
আর কি জগতে আছে॥

পুনশ্চ,

সোই পীরিতি পিয়া সে জানে।
যে দেখি যে শুনি, চিতে অনুমানি,
নিছনি দিবে পরাণে ॥
মো যদি সিনান, আগিলা ঘাটে,
পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গের জল, পরশ লাগিয়ে,
বাহু পশারিয়া রয় ॥
বসনে বসন লাগিবে লাগিয়ে
একই রজকে দেয়।

মোর নামের আধ আখর পাইলে
হরিষ হইয়ে লেয় ॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়ে
ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস, যেদিকে যেদিন
সেদিকে সেদিন থাকে ॥
মনের আকুতি বেকত* করিতে
কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক রায় শেখর
কিছু বুঝে অনুমানে ॥

পরিশেষে আমাদের গীত কাব্যের আদিপুরুষ, এ শ্রেণীর সকল কবির আদর্শ, জয়দেব গোস্বামীর একটি গীত উদ্ধৃত করিব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জয়দেব যেমন সুকবি, তেমনি রসিক—তাঁহার কবিতার রস বড় গাঢ়। আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালি—তত গাঢ় রস বঙ্গদর্শনের পাঠকদিগের সহিবে না। তবে যাত্রাকরদিগের কৃপায়, অনেকেই তাঁহার দুই একটি গীত, বুঝুন না বুঝুন, শুনিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহারা বুঝিয়াছেন, বা গীত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জয়দেবের একটি গীত স্মরণ করুন—"বদসি যদি কিঞ্চিদপি" ইত্যাদি গীত স্মরণ করিলেও চলিবে। এই কয়টি কবিতা তুলনা করিয়া দেখিলে দেখিবেন,

প্রথম, জয়দেবে বহিঃ-প্রকৃতি ভক্তি ইন্দ্রিয়পরতায় দাঁড়াইয়াছে।

দ্বিতীয়, জ্ঞানদাস ও রায় শেখরে বহিঃ-প্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতির পশ্চাদ্বর্ত্তিনী এবং সহচরী মাত্র। আর কবিতার গতি অতি সঙ্কীর্ণ পথে—নিকট সম্বন্ধ ছাড়িয়া দূর সম্বন্ধ বুঝাইতে চায় না—কিন্তু সেই সঙ্কীর্ণ পথে গতি অত্যন্ত বেগবতী।

তৃতীয়, মধুসূদনের কবিতায়, সেই গতি পরিসর পথবর্ত্তিনী হইয়াছে—দূর সম্বন্ধে ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছে—কিন্তু কবিতার আর সে পাষাণভেদিনী শক্তি নাই, নদীর স্রোতের ন্যায়, বিস্তৃতিতে যাহা লাভ হইয়াছে, বেগে তাহার ক্ষতি হইয়াছে।

চতুর্থ, মানস বিকাশে, আধ্যাত্মিকতা দোষ ঘটিয়াছে।

"মানস বিকাশ" অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য নহে—অনুৎকৃষ্টও নহে। অনেক স্থানেই নবীনত্বের অভাব—অনেক স্থানে তাহার অভাব নাই। কবির বাক্‌শক্তি, এবং পদ্য-বিন্যাস শক্তি প্রশংসনীয়। "মিলন" নামক কাব্যের প্রথমাংশ এমন সুন্দর, যে তাহা হেম বাবুর যোগ্য বলা যায়; কিন্তু শেষাংশ তত ভাল নহে। ফলে এই কবি বিশেষ আদরের যোগ্য সন্দেহ নাই।

* ব্যক্ত
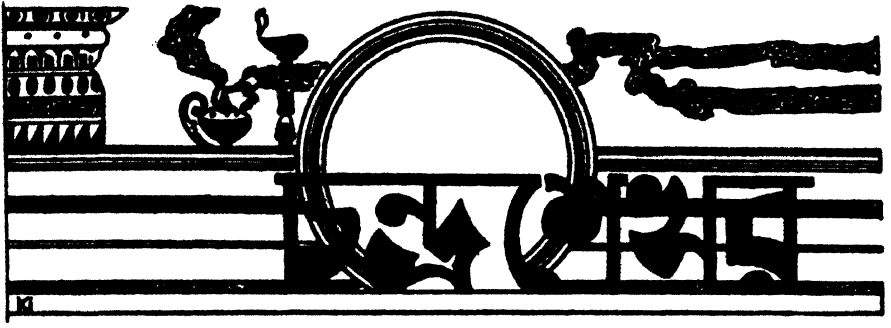
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

রমানন্দস্বামীর উপদেশ

রমানন্দস্বামী বলিলেন, "শুন, বৎস! জ্ঞানের কথা তোমায় কিছু বলিব না। জ্ঞান তোমার পক্ষে বৃথা। কিছু যুক্তি বলি।"

রমানন্দস্বামী প্রথমে, যযাতি, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ প্রভৃতি প্রাচীন রাজগণের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, নলরাজা প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেন। দেখাইলেন, সার্ব্বভৌম মহা পুণ্যাত্মা রাজগণ চিরদুঃখী—কদাচিৎ সুখী। পরে, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেন—দেখাইলেন, তাঁহারাও দুঃখী। দানব পীড়িত, অভিশপ্ত ইন্দ্রাদি দেবতার উল্লেখ করিলেন—দেখাইলেন সুরলোকও দুঃখপূর্ণ। শেষে, মনোমোহিনী বাক্‌শক্তির দৈবাবতরণা করিয়া, অনন্ত, অপরিজ্ঞেয়, বিধাতৃহৃদয় মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দেখাইলেন, যে যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি এই দুঃখময় অনন্ত সংসারের অনন্ত দুঃখরাশি অনাদি অনন্ত কালাবধি হৃদয় মধ্যে অবশ্য অনুভূত করেন। যিনি দয়াময়, তিনি কি সেই দুঃখরাশি অনুভূত করিয়া দুঃখিত হয়েন না? তবে দয়াময় কিসে? দুঃখের সঙ্গে দয়ার নিত্য সম্বন্ধ—দুঃখ না হইলে দয়ার সঞ্চার কোথায়? যিনি দয়াময়, তিনি অনন্ত সংসারের অনন্ত দুঃখে অনন্ত কাল দুঃখী—নচেৎ তিনি দয়াময় নহেন। যদি বল, তিনি নির্ব্বিকার, তাঁহার দুঃখ কি? উত্তর এই যে, যিনি নির্ব্বিকার, তিনি সৃষ্টিস্থিতি সংহারে স্পৃহাশূন্য—তাঁহাকে স্রষ্টা বিধাতা বলিয়া মানি না। যদি কেহ স্রষ্টা বিধাতা থাকেন, তবে তাঁহাকে নির্ব্বিকার বলিতে পারিনা—তিনি দুঃখময়। তবে তুমি আমি কে, যে দুঃখ পাইলে কাঁদিব?

রমানন্দস্বামী বলিতে লাগিলেন, এই সর্ব্বব্যাপী দুঃখ নিবারণের উপায় কি নাই? উপায় নাই; তবে যদি সকলে সকলের দুঃখ নিবারণের জন্য নিযুক্ত থাকে, তবে কথঞ্চিৎ নিবারণ হইতে পারে। দেখ, বিধাতা স্বয়ং অহরহ সৃষ্টির দুঃখ নিবারণে নিযুক্ত। সংসারের সেই দুঃখ নিবৃত্তিতে ঐশিক দুঃখেরও নিবারণ হয়।

দেবগণ জীবদুঃখ-নিবারণে নিযুক্ত—তাহাতেই দৈব সুখ। নচেৎ ইন্দ্রিয়াদির বিকার শূন্য দেবতার অন্য সুখ নাই। পরে ঋষিগণের লোক হিতৈষিতা কীর্ত্তিত করিয়া ভীষ্মাদি বীরগণের পরোপকারিতার বর্ণনা করিলেন। দেখাইলেন, যেই পরোপকারী সেই সুখী, অন্য কেহ সুখী নহে। তখন রমানন্দস্বামী শতমুখে পরোপকার ধর্ম্মের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ, পুরাণেতিহাস, প্রভৃতি মন্থন করিয়া অনর্গল ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রযুক্ত করিতে লাগিলেন। শব্দ সাগর মন্থন করিয়া শত শত মহার্থ শ্রবণমনোহর, বাক্য পরম্পরা কুসুমমালাবৎ গ্রন্থন করিতে লাগিলেন—সাহিত্য ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া, সারবতী, রসপূর্ণা, সদলঙ্কার বিশিষ্টা কবিতা নিচয় বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বোপরি, আপনার অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগের মোহময়ী প্রতিভান্বিতা ছায়া বিস্তারিতা করিলেন। তাঁহার সুকণ্ঠ নির্গত, উচ্চারণ কৌশলযুক্ত সেই অপূর্ব্ব বাক্য সকল চন্দ্রশেখরের কর্ণে তূর্য্যনাদবৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল। সে বাক্য সকল কখন মেঘগর্জ্জনবৎ গম্ভীর শব্দে শব্দিত হইতে লাগিল—কখন বীণানিক্কণবৎ মধুর বোধ হইতে লাগিল। চন্দ্রশেখর বিস্মিত মোহিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া রমানন্দস্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "গুরুদেব! আজি হইতে আমি আপনার নিকট এ মন্ত্র গ্রহণ করিলাম। আজি হইতে পাপিষ্ঠা পত্নীকে ভুলিতে পারিব।"

রমানন্দস্বামী চন্দ্রশেখরকে আলিঙ্গন করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

রামগোবিন্দের দৌত্য

সেই দিন সায়াহ্নে রামগোবিন্দ রায়, জগৎশেঠের আলয়ে আসিয়া দেখা দিলেন। উভয় ভ্রাতা, নবাবের মুন্সীর উপযুক্ত, সাদর সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে বসাইয়া, স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। দেখিলেন মুন্সীর মুখ অপ্রফুল্ল। রাজা স্বরূপচন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুন্সীজি, আজ কিছু ক্ষুণ্ণভাব দেখি কেন?"

মুন্সী বলিলেন, "আমি যে কথা বলিতে আসিয়াছি, তাহা সুখের কথা নহে, এজন্যই হাসি খুসি করিতে পারিতেছি না। নহিলে মহারাজের দর্শন পাইয়া যে আনন্দ প্রকাশ করিবে না, এমন নরাধম কে?"

স্বরূপচন্দ জানিতেন, নবাব তাঁহাদিগের প্রতি অপ্রসন্ন, এজন্য কোন অমঙ্গল সম্বাদের আশঙ্কা করিয়া, বিষণ্ণ হইয়া রহিলেন। মুন্সী বলিতে লাগিলেন, "সম্প্রতি নবাবের একটি বেগম অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করিয়াছে। নবাব

তাহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত।" এই বলিয়া বৃদ্ধ মুন্সী স্থিরভাবে স্বরূপচন্দের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

স্বরূপচন্দ বলিলেন, "তার পর"।

রাম। "তার পর, আপনি তাহার কোন সন্ধান বলিতে পারেন ?"

স্ব। "আমি !"

রাম। "আপনি কি আপনার কোন লোক জন ?"

স্ব। "সেকি ?"

রাম। "বেগম কোন দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া বহির্গত হইয়া, প্রতাপ রায় নামক এক ব্যক্তির বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেখান হইতে নবাবকে তিনি পত্র লিখিয়াছিলেন। আজি সেখানে তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক গিয়াছিল। কিন্তু দেখা গেল, যে সেখানে কেহ নাই। তদারকে জানা গিয়াছে, যে মহারাজের শিবিকা এবং দাস দাসী গিয়া বেগমকে এখানে লইয়া আসিয়াছে। এ কি সত্য ?"

স্বরূপচন্দের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি ভয়বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন, "একটি স্ত্রীলোক সেখান হইতে আনাইয়াছি বটে। কিন্তু সে বেগম নহে, একটি আশ্রয়হীনা ব্রাহ্মণ কন্যা। তাহার স্বামীর অনুরোধে তাহাকে গৃহে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছি।"

মুন্সীজি মনে মনে হাসিলেন। ভাবিলেন, "যাহার স্বামী সঙ্গে, সে আবার কেমন আশ্রয়হীনা ব্রাহ্মণ কন্যা। শেঠজি বুড়া রামগোবিন্দের চক্ষে ধূলা দিবার চেষ্টায় আছেন।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "একথা কি নবাব বিশ্বাস করিবেন ?"

স্বরূ। "নাহয় তাঁহাকে আনাই, আপনি দেখুন।"

রা। "আমার এমন মাথার উপর মাথা নাই, যে নবাবের বেগমকে আনাইয়া দেখি। তিনি ভ্রাতৃবধূর অপেক্ষাও অদর্শনীয়া।"

স্ব। "তবে তাঁহাকে মায়নার জন্য, নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিতেছি।"

বুড়া, হাসিয়া বলিল, "পাঠান যদি, তবে একজন সুন্দরী দেখিয়া পাঠাইবেন যে নবাব এওজ রাখিলে রাখিতে পারিবেন।"

মহাতাপ চন্দ এতক্ষণ কিছু বলেন নাই, কিন্তু, আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "মুন্সীজি, সেদিন আমরাই মীরকাসেমকে নবাব করিয়াছি। তাঁহার কাছে, আমাদিগের নিবেদন জানাইবেন, যে যখন ভবিষ্যতে আমাদের কাছে দূত পাঠাইতে হইবে, তখন যেন সেই কথা স্মরণ করিয়া একজন ভদ্রলোক পাঠান।"

রামগোবিন্দ, একটি দাঁত বাহির করিয়া একটু হাসিলেন। মোটে সেই একটি দাঁত—বাকি গুলিন, যথা সময়ে, কালপ্রাপ্ত হইয়া, অনন্ত ধামে গমন করিয়াছিল—এই একটি দাঁত, পূর্ব্বকালের স্মারক চিহ্ন স্বরূপ বিরাজ করিতেছিল—কুরুবংশে

রাজা পরীক্ষিতের ন্যায় একা পৃথিবী উজ্জ্বল করিতেছিল। রামগোবিন্দ, পূর্ব্ব গৌরবের সেই পতাকা উড়াইয়া দিয়া, একটু হাসিলেন; বলিলেন, "রাগ করিতে নাই। আমি বুড়া সুড়া হইয়াছি, দুইটা হাসির কথা বলিলেও বলিতে পারি।"

এই বলিয়া মুন্সীজি গাত্রোত্থান করিলেন। বাম হস্তে জোড়ার দামন গুটাইয়া ধরিলেন, দক্ষিণ হস্তে লাট্টুদার পাগড়ি মাথায় একটু সরাইয়া বসাইলেন; লক্কাদার জুতা যোড়াটি অতি যত্নে পদস্থ করিলেন,—তখন ধীরে ধীরে, পাল ভরা নৌকার মত, মন্দ পবনে চলিলেন। শিবিকায় উঠিবার সময়ে কতকগুলি বালক, "জগন্নাথ জি কি জয়!" বলিয়া তাঁহাকে সেলাম করিল।

স্বরূপচন্দ, মহাতাপ রায়কে ভর্ৎসনা করিলেন, "নবাবের লোককে এমন কথা বলিতে হয়।"

মহাতাপ রায় বলিলেন, "ভয় নাই, আমি রামগোবিন্দকে চিনি। উহার কথা নবাব বড় কানে তুলেন না।"

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

রাজদর্শনে

রামগোবিন্দ রায়, নবাব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, জগৎশেঠের গৃহে যান নাই। যদি বেগমের সন্ধান আনিয়া সরফরাজ হইতে পারেন, এই আশায় গিয়াছিলেন। সন্ধান আনিয়া নবাবের নিকট আরজি পাঠাইলেন—যে বেগম শেঠদিগের গৃহে আছেন, কিন্তু শেঠেরা তাহা স্বীকার করিবেন না, বা বেগমকে ছাড়িবেন না। নবাব রামগোবিন্দকে ডাকাইয়া, বাচনিক জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন।

নবাব বড় ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান, নির্ব্বোধের কাজ করিলেন না, একজন বিশ্বাসী এবং বিচক্ষণ খোজাকে আদেশ করিলেন, তুমি শিবিকা লইয়া, জগৎশেঠের সম্মতি ক্রমে, যে স্ত্রীলোক তাহার বাড়ীতে থাকে, তাহাকে লইয়া আইস। জগৎশেঠেরা অসম্মত হয়, দ্বারে পাহারা রাখিয়া আমাকে সম্বাদ পাঠাইও।

খোজা বলিল, "আমি বেগমকে চিনি। জগৎশেঠের গৃহে যে স্ত্রীলোক আছে, সে যদি বেগম না হয়, তবে কেন আনিব?"

ন। "তথাপি আনিও। যদি ইহা সত্য হয় যে সে, প্রতাপ রায়ের বাসায় ছিল, তবে সে বেগমের সম্বাদ দিতে পারিবে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিব।"

খোজা বলিল, "জাহাপনা, গোলামের অপরাধ মাপ হউক। যদি তাহাদিগের ঘরের স্ত্রীলোক হয়, তবে তাহারা সম্মত হইবে কেন ?"

নবাব বলিলেন, "তাহাদিগের পরিবার সকল মুরশিদাবাদে—এ কোন বেশ্যা হইবে। আর যদি পুরবধূই হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? শেঠেরা সেরাজউদ্দৌলার কিরূপ মান রক্ষা করিয়াছিল, তাহা কি মনে নাই ?"

খোজা বিদায় হইয়া, রাজা স্বরূপ চন্দের নিকট আসিয়া সবিশেষ জানাইল। জগৎশেঠ ভাবিলেন, যে, যে স্ত্রীলোক ফিরিঙ্গীর সহবাস করিয়াছে, তাহাকে একবার নবাবের দুর্গে পাঠাইতে ক্ষতি কি ? জগৎশেঠ সম্মত হইলেন।

শৈবলিনী শুনিল, তাঁহাকে কেল্লায় যাইতে হইবে। কেন, তাহাও শুনিল। অকস্মাৎ তাঁহার মনে এক দুরভিসন্ধি উপস্থিত হইল। কবিগণ, আশার প্রশংসায় মুগ্ধ হয়েন। আশা, সংসারের অনেক সুখের কারণ বটে, কিন্তু আশাই দুঃখের মূল। যত পাপ কৃত হয়, সকলই লাভের আশায়। কেবল, সৎকার্য্য কোন আশায় কৃত হয় না। যাঁহারা স্বর্গের আশায় সৎকার্য্য করেন তাঁহাদের কার্য্যকে সৎকার্য্য বলিতে পারি না। আশায় মুগ্ধ হইয়া শৈবলিনী, আপত্তি না করিয়া শিবিকারোহণ করিল।

খোজা, শৈবলিনীকে দুর্গে আনিয়া অন্তঃপুরে নবাবের নিকটে লইয়া গেল। নবাব দেখিলেন, এত দলনী নহে। আরও দেখিলেন, দলনীও এরূপ আশ্চর্য্য সুন্দরী নহে। আরও দেখিলেন, যে এরূপ লোকবিমোহিনী তাঁহার অন্তঃপুরে কেহই নাই।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

শৈ। আমি ব্রাহ্মণ কন্যা।

নবাব। তুমি জগৎশেঠের কে ?

শৈ। কেহ নই।

নবাব। জগৎশেঠের গৃহে তবে আছ কেন ?

শৈ। তাঁহারা আমাকে লইয়া আসিয়াছেন।

নবাব। কেন আনিয়াছেন ?

শৈ। তাহা জানি না।

নবাব হাসিলেন। বলিলেন, "কবে আনিয়াছেন ?"

শৈ। আজ।

ন। কোথা হইতে আনিয়াছেন ?

শৈ। যেখানে কাল বেগম ছিলেন, সেই স্থান হইতে।

যখন, গলষ্টন্, ও জনসন দলনী ও কুলসমকে প্রতাপের গৃহ হইতে লইয়া যায়,

শৈবলিনী তাহা দেখিয়াছিলেন। তাহারা কে তাহা তিনি জানিতেন না। মনে করিয়াছিলেন, চাকরাণী, বা নর্ত্তকী। কিন্তু যখন জগৎশেঠের ভৃত্য তাঁহাকে বলিল, যে নবাবের বেগম প্রতাপের গৃহে ছিল, এবং তাঁহাকে সেই বেগম মনে করিয়া নবাব লইতে পাঠাইয়াছেন, তখনই শৈবলিনী বুঝিয়াছিলেন, যে বেগমকেই ইংরেজেরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

নবাব, শৈবলিনীর উত্তর শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ?"

শৈ। দেখিয়াছি।

নবাব। কোথায় দেখিলে?

শৈ। যেখানে আমরা কাল রাত্রে ছিলাম।

ন। সে কোথায়? প্রতাপ রায়ের বাসায়?

শৈ। আজ্ঞা হাঁ।

ন: বেগম সেখান হইতে কোথায় গিয়াছেন জান?

শৈ। দুই জন ইংরেজ তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

ন। কি বলিলে?

শৈবলিনী পূর্ব্ব প্রদত্ত উত্তর, পুনরুক্ত করিলেন। নবাব, মৌনী হইয়া রহিলেন। অধর দংশন করিয়া শ্মশ্রু উৎপাটন করিলেন। গুরগণ খাঁকে ডাকিতে আদেশ করিলেন। শৈবলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ইংরেজ বেগমকে ধরিয়া লইয়া গেল, জান।"

শৈ। না।

ন। প্রতাপ তখন কোথায় ছিল?

শৈ। তাঁহাকেও উহারা সেই সঙ্গে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

ন। তাঁহার বাসায় আর কোন লোক ছিল?

শৈ। একজন চাকর ছিল, তাহাকেও ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

নবাব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, তাহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, জান?"

শৈবলিনী এতক্ষণ, সত্য বলিতেছিল, এখন মিথ্যা আরম্ভ করিল। বলিল "না"

ন। প্রতাপ কে? তাহার বাড়ী কোথায়?

শৈবলিনী প্রতাপের সত্য পরিচয় দিল।

ন। এখানে কি করিতে আসিয়াছিল?

শৈ। সরকারে চাকরি করিবেন বলিয়া।

ন। তোমার কে হয় ?

শৈ। আমার স্বামী।

ন। তোমার নাম কি ?

শৈ। রূপসী।

অনায়াসে শৈবলিনী এই উত্তর দিল। পাপিষ্ঠা এই কথা বলিবার জন্যই আসিয়াছিল।

নবাব বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এখন গৃহে যাও।"

শৈবলিনী বলিল, "আমার গৃহ কোথা—কোথা যাইব ?"

নবাব বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন শেঠের গৃহে ? সেইখানে ত ছিলে ?"

শৈ। যদি দয়া করিয়া আমাকে সেখান হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তবে আমি সেখানে আর যাইব না। কেন সেখানে যাইব ? তাহারা আমার কেহ নহে।

নবাব আরও বিস্মিত হইলেন, মনে করিলেন জগৎশেঠ কোন অত্যাচার-প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি কোথায় যাইবে ?"

শৈ। আমার স্বামীর কাছে। আমার স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দিন। আপনি রাজা, আপনার কাছে নালিশ করিতেছি ;—আমার স্বামীকে ইংরেজ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে ; হয়, আমার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিন, নচেৎ আমাকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিন। যদি আপনি অবজ্ঞা করিয়া ইহার উপায় না করেন, তবে এইখানে আপনার সম্মুখে আমি মরিব। সেই জন্য এখানে আসিয়াছি।

সম্বাদ আসিল, গুরগণ খাঁ হাজির। নবাব, শৈবলিনীকে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এইখানে অপেক্ষা কর। আমি আসিতেছি।"

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

নূতন শক

নবাব গুরগণ খাঁকে, অন্যান্য সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "ইংরেজদিগের সঙ্গে বিবাদ করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে। আমার বিবেচনায় বিবাদের পূর্ব্বে আমিয়টকে অবরুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, কেন না আমিয়ট্ আমার পরম শত্রু। কি বল ?"

গুরগণ খাঁ কহিলেন, "যুদ্ধে আমি সকল সময়েই প্রস্তুত। কিন্তু দূত অস্পর্শনীয়। দূতের পীড়ন করিলে, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া আমাদের নিন্দা হইবে। —আর—"

নবাব। আমিয়ট কাল রাত্রে এই শহর মধ্যে এক ব্যক্তির গৃহ আক্রমণ

করিয়া, তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। যে আমার অধিকারে থাকিয়া অপরাধ করে, সে দূত হইলেও আমি কেন তাহার দণ্ড বিধান না করিব ?

গুর। যদি সে এরূপ করিয়া থাকে, তবে সে দণ্ড যোগ্য। কিন্তু তাহাকে কি প্রকারে ধৃত করিব ?

নবাব। এখনই তাহার বাসস্থানে শিপাহী ও কামান পাঠাইয়া দাও। তাহাকে স্বগণে ধরিয়া লইয়া আসুক।

গুর। তাহারা এ শহরে নাই। অদ্য দুই প্রহরে চলিয়া গিয়াছে।

নবাব। সে কি ? বিনা এত্তেলায় ?

গুর। এত্তেলা দিবার জন্য হে নামক একজনকে রাখিয়া গিয়াছে।

নবাব। এরূপ হঠাৎ, বিনা অনুমতিতে পলায়নের কারণ কি ? ইহাতে আমার সহিত অসৌজন্য হইল, তাহা জানিয়াই করিয়াছে।

গুর। তাহাদের হাতিয়ারের নৌকায় চড়ন্দার ইংরেজকে কে কাল রাত্রে খুন করিয়াছে। আমিয়ট বলে, আমাদের লোকে খুন করিয়াছে। সেই জন্য রাগ করিয়া গিয়াছে। বলে, এখানে থাকিলে জীবন অনিশ্চিত।

নবাব। কে খুন করিয়াছে শুনিয়াছ ?

গুর। প্রতাপ রায় নামক এক ব্যক্তি।

নবাব। আচ্ছা করিয়াছে। তাহার দেখা পাইলে খেলোয়াৎ দিব। প্রতাপ রায় কোথায় ?

গুর। তাহাদিগকে সকলকে বাঁধিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে। সঙ্গে লইয়া গিয়াছে কি আজিমাবাদ পাঠাইয়াছে, ঠিক শুনি নাই।

নবাব। এতক্ষণ আমাকে এ সকল সম্বাদ দাও নাই কেন ?

গুর। আমি এই মাত্র শুনিলাম।

এ কথাটি মিথ্যা। গুরগণ খাঁ আদ্যোপান্ত সকল জানিতেন ; তাঁহার অনভিমতে আমিয়ট কদাপি মুঙ্গের ত্যাগ করিতে পারিতেন না। কিন্তু গুরগণ খাঁর দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—প্রথম, দলনী মুঙ্গেরের বাহির হইলেই ভাল ; দ্বিতীয়, আমিয়ট একটু হস্তগত থাকা ভাল, ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা উপকার ঘটিতে পারিবে।

নবাব গুরগণ খাঁকে বিদায় দিলেন। গুরগণ খাঁ যখন যান, নবাব তাঁহার প্রতি ক্রূর বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ এই, "যতদিন না যুদ্ধ সমাপ্ত হয়, ততদিন তোমায় কিছু বলিব না—যুদ্ধকালে তুমি আমার প্রধান অস্ত্র। তার পর দলনী বেগমের ঋণ তোমার শোণিতে পরিশোধ করিব।"

নবাব তাহার পর মীর মুন্সীকে ডাকিয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে

মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকি খাঁর নামে পরওয়ানা পাঠাও; যে যখন আমিয়টের নৌকা মুরশিদাবাদে উপনীত হইবে, তখন তাঁহাকে ধরিয়া আবদ্ধ করে, এবং তাঁহার সঙ্গের বন্দীগণকে মুক্ত করিয়া, হুজুরে প্রেরণ করে। স্পষ্ট যুদ্ধ না করিয়া কলে কৌশলে ধরিতে হইবে ইহাও লিখিয়া দিও। পরওয়ানা তটপথে বাহকের হাতে যাউক—অগ্রে পৌছিবে।

নবাব অন্তঃপুরে প্রত্যাগমন করিয়া আবার শৈবলিনীকে ডাকাইলেন। বলিলেন, "এক্ষণে তোমার স্বামীকে মুক্ত করা হইল না। ইংরেজেরা তাহাদিগকে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছে। মুরশিদাবাদে হুকুম পাঠাইলাম, সেখানে তাহাদিগকে ধরিবে। তুমি এখন—"

শৈবলিনী হাত যোড় করিয়া কহিল, "বাচাল স্ত্রীলোককে মার্জ্জনা করুন—এখন লোক পাঠাইলে ধরা যায় না কি?"

নবাব। "ইংরেজদিগকে ধরা অল্পলোকের কর্ম্ম নহে। অধিক লোক সশস্ত্রে পাঠাইতে হইলে, বড় নৌকা চাই। ধরিতে ধরিতে তাহারা মুরশিদাবাদ পৌছিবে। বিশেষ যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিয়া, কি জানি যদি ইংরেজেরা আগে বন্দীদিগকে মারিয়া ফেলে। মুরশিদাবাদে সুচতুর কর্ম্মচারী সকল আছে, তাহারা কলে কৌশলে ধরিবে।"

শৈবলিনী বুঝিল, যে তাঁহার সুন্দর মুখখানিতে অনেক উপকার হইয়াছে। নবাব তাঁহার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া, তাঁহার সকল কথা বিশ্বাস করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিতেছেন। নহিলে এত কথা বুঝাইয়া বলিবেন কেন? শৈবলিনী সাহস পাইয়া আবার হাত যোড় করিল। বলিল, "যদি এ অনাথিনীকে এত দয়া করিয়াছেন, তবে আর একটি ভিক্ষা মার্জ্জনা করুন। আমার স্বামীর উদ্ধার অতি সহজ—তিনি স্বয়ং বীরপুরুষ। তাঁহার হাতে অস্ত্র থাকিলে তাঁহাকে ইংরেজ কয়েদ করিতে পারিত না—তিনি যদি এখন হাতিয়ার পান, তবে তাঁহাকে কেহ কয়েদ রাখিতে পারিবে না। যদি কেহ তাঁহাকে অস্ত্র দিয়া আসিতে পারে তবে তিনি স্বয়ং মুক্ত হইতে পারিবেন, সঙ্গীদিগকে মুক্ত করিতে পারিবেন।"

নবাব হাসিলেন, বলিলেন, "তুমি বালিকা, ইংরেজ কি তাহা জান না। কে তাঁহাকে সে ইংরেজের নৌকায় উঠিয়া অস্ত্র দিয়া আসিবে?"

শৈবলিনী মুখ নত করিয়া, অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "যদি হুকুম হয়, যদি নৌকা পাই, তবে আমিই যাইব।"

নবাব উচ্চ হাস্য করিলেন। হাসি শুনিয়া শৈবলিনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, বলিল, "প্রভু, না পারি আমি মরিব—তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই।

কিন্তু যদি পারি, তবে আমারও কার্য্য সিদ্ধি হইবে, আপনারও কার্য্য সিদ্ধি হইবে।"

নবাব শৈবলিনীর কুঞ্চিত ভ্রূশোভিত মুখ মণ্ডল দেখিয়া বুঝিলেন, এ সামান্যা স্ত্রীলোক নহে। ভাবিলেন, "মরে মরুক আমার ক্ষতি কি? যদি পারে ভালই—নহিলে মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকি কার্য্য সিদ্ধি করিবে।" শৈবলিনীকে বলিলেন, "তুমি কি একাই যাইবে?"

শৈ। স্ত্রীলোক, একা যাইতে পারিব না। যদি দয়া করেন, তবে সঙ্গে একজন দাসী, একজন রক্ষক আজ্ঞা করিয়া দিন।

নবাব, চিন্তা করিয়া, মসীবুদ্দীন নামে একজন বিশ্বাসী, বলিষ্ঠ, এবং সাহসী খোজাকে ডাকাইলেন। সে আসিয়া প্রণত হইল। নবাব তাহাকে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোককে সঙ্গে লও, এবং এক জন হিন্দু বাঁদী সঙ্গে লও। ইনি যে হাতিয়ার লইতে বলেন, তাহাও লও। নৌকার দারোগার নিকট হইতে একখানি দ্রুতগামী ছিপ লও। এই সকল লইয়া, এইক্ষণেই মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা কর।"

মসীবুদ্দীন জিজ্ঞাসা করিল, "কোন কার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে?"

নবাব। "ইনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিবে। বেগমদিগের মত, ইঁহাকে মান্য করিবে। যদি দলনী বেগমের সাক্ষাৎ পাও, সঙ্গে লইয়া আসিবে।"

মসীবুদ্দীন কহিল, "গোলাম প্রাণপণে হুকুম তামিল করিবে, কিন্তু আজি যদি হঠাৎ হিন্দু বাঁদী না পাওয়া যায়, তবে গোলাম অমনি যাইবে, না বিলম্ব করিবে?"

শৈবলিনী বলিলেন, "বাঁদী হিন্দু না হইলেও চলিবে।"

পরে উভয়ে নবাবকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল। খোজা যেরূপ করিল, শৈবলিনী দেখিয়া দেখিয়া, সেইরূপ মাটি ছুঁইয়া, পিছু হটিয়া সেলাম করিল, নবাব হাসিলেন।

নবাব গমন কালে বলিলেন, "বিবি স্মরণ রাখিও। কখন যদি মুস্কিলে পড় তবে মীরকাসেমের কাছে আসিও।"

শৈবলিনী পুনর্ব্বার সেলাম করিল। মনে মনে বলিল, "আসিব বৈকি? হয়ত রূপসীর সঙ্গে স্বামী লইয়া দরবার করিবার জন্য তোমার কাছে আসিব।"

মসীবুদ্দীন পরিচারিকা ও নৌকা সংগ্রহ করিল। এবং শৈবলিনীর কথা মত বন্দুক, গুলি, বারূদ, পিস্তল, তরবারি ও ছুরি সংগ্রহ করিল। মসীবুদ্দীন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না যে এ সকল কি হইবে। মনে মনে করিল যে এ দোশরা চাঁদ সুলতানা।

সেই রাত্রেই তাহারা নৌকারোহণ করিয়া যাত্রা করিল।

কলিকাতায় একটি অশ্লীলতা নিবারণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে অধিকাংশ বাঙ্গালা সম্বাদ পত্র এই সভার বিরোধী।

যাঁহারা এই সভা সম্বন্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারেন। যথা—

১ম। কতকগুলি পত্র ইহার অনুমোদন করেন। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প, এবং হয় ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত।

২য়। কতকগুলি পত্র, বিবেচনা করেন, এরূপ সভার উদ্দেশ্য উত্তম বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, বরং ইহার দ্বারা অনিষ্ট ঘটিতে পারে। বাঙ্গালির সর্ব্বপ্রধান সম্বাদপত্র হিন্দুপেট্রিয়ট এই মতাবলম্বী।

৩য়। দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্র সকল অশ্লীলতা প্রিয় নহেন, বরং অশ্লীলতা দ্বেষী, এবং সুসভ্যতা ও সুনীতির পরিপোষক। তাঁহারা যথার্থই এ সভার দ্বারা অনিষ্টোৎপাতের আশঙ্কা করেন বলিয়া, ইহার অনুমোদনে বিরত। কিন্তু আর এক শ্রেণীর পত্র আছে—তাহারা অশ্লীলতাপ্রিয়। অশ্লীলতা এবং অসভ্যতা তাহাদিগের ব্যবসায়—এবং ব্যবসায় হানির আশঙ্কাতেই তাঁহারা এ সভার বিদ্বেষী।

তৃতীয় শ্রেণীর সম্বাদ পত্রের কথার উল্লেখ পর্য্যন্ত অনাবশ্যক, কেন না, কেহ তাঁহাদিগের কথা শুনিবে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর আপত্তি সকল ভঞ্জনের যোগ্য বটে, কিন্তু আমরা সে চেষ্টা পাইব না। তাহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা এই সভা সংস্থাপিত্রা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

ইহা সত্য বটে যে অশ্লীলতা নিবারণী সভা যদি সদ্বিবেচনা এবং ধীরতার সহিত কার্য্য না করেন, তবে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য বিফল হইবে, বরং অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা। কিন্তু, এমত কোন চিহ্ন এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, যে এ সভার কার্য্য সদ্বিবেচনা এবং ধীরতার সহিত সম্পন্ন হইবে না। যত দিন না সেরূপ

কোন চিহ্ন পাওয়া যায়, ততদিন ইহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করা অন্যায়। দোষ না দেখিয়া দোষী বলিয়া নিন্দা করা অন্যায়। যত দিন দোষ না দেখা যায়, ততদিন এরূপ মহৎ কার্য্যের অনুমোদন করাই কর্ত্তব্য।

অশ্লীলতা, বঙ্গদেশীয় দিগের জাতীয় দোষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা ইহা অত্যুক্তি বিবেচনা করিবেন তাঁহারা বাঙ্গালির রহস্য, বাঙ্গালির গালি, নিম্ন শ্রেণীর বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের কোন্দল, এবং বাঙ্গালির যাত্রা, কবি পাঁচালী মনে ভাবিয়া দেখুন। মুহূর্ত্ত জন্য বাঙ্গালি কৃষকের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া দেখুন—বাঙ্গালির প্রণীত যে সকল কাব্য গ্রন্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত তাহা পাঠ করিয়া দেখুন। বাঙ্গালির চরিত্রে অশ্লীলতার ন্যায় কোন দোষই সর্ব্বব্যাপী নহে। যাঁহারা এরূপ বদ্ধমূল দোষের বিলোপের উদ্যোগ করিতেছেন, তাঁহাদের যত্ন বিফল হইবার সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা সাধুবাদ এবং সহায়তার পাত্র সন্দেহ নাই।

কেহ মনে করিতে পারেন, যে অশ্লীলতা এবং অসভ্যতা, অজ্ঞানের ফল। দেশে যত বিদ্যালোচনার বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, দেশ যত অন্যান্য বিষয়ে সভ্যতার পথে উঠিবে, তত স্বতঃই অশ্লীলতার হ্রাস হইবে। যদি ইহা সত্য হইত, তবে আমরা অশ্লীলতা নিবারণী সভার অনুমোদন করিতাম না। বলিতাম, যে ইহার নিবারণ জন্য এত উদ্যমের প্রয়োজন নাই—আপনিই যাইবে। বহুবিবাহ সম্বন্ধে অনেকে বলেন, যে ইহা স্বতঃই নিবৃত্তি পাইবে। বঙ্গদর্শনেও ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অশ্লীলতা সম্বন্ধে কি ঐরূপ বলা যাইতে পারে না?

তাহা বলা যায় না। জ্ঞানালোক সহকারে অশ্লীলতার দিন দিন হ্রাস দূরে থাকুক, বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এখন, এমন অনেক সম্বাদ পত্র ও পুস্তক দেখিতে পাই, যে তাদৃশ অশ্লীল পত্র বা পুস্তক পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব্বে কোথাও দেখা যাইত না। এসকল পত্র বা পুস্তক অবশ্য অনেকের দ্বারা পঠিত হয়, নচেৎ লুপ্ত হইত। অতএব অশ্লীলতাপ্রিয় পাঠকদিগের সংখ্যা যে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে সংশয় নাই। এক্ষণকার কতকগুলি পুস্তক ও পত্রের যে ভয়ানক অবস্থা তাহাতে আমরা তাঁহাদিগের রুচির সঙ্গে পূর্ব্বকালের কবিওয়ালা ও পাঁচালিওয়ালা দিগের কোন প্রভেদ দেখিতে পাই না। প্রভেদের মধ্যে এই যে এখন দণ্ডবিধির আইনে অশ্লীলতার দণ্ডের জন্য একটি ধারা আছে, পূর্ব্বে সেরূপ বিধান ছিল না। সুতরাং এক্ষণকার অশ্লীলতা কিছু অস্পষ্ট, পূর্ব্বকার অশ্লীলতা স্পষ্ট। ভাবের কদর্য্যতা একই প্রকার।

একদিন এমন ভরসা হইয়াছিল বটে, যে অশ্লীলতা কিছু কমিতেছে। ব্রাহ্ম সমাজ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিশুদ্ধ লিপিপ্রণালী, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশুদ্ধ

লিপিপ্রণালী, লং সাহেবের যত্ন, ইত্যাদি কারণেই কমিতেছিল বোধ হয়। এক্ষণে, ক্রমশঃ হ্রাস না পাইয়া, অশ্লীলতা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ কি ?

ইহার কারণ, আমাদের বিবেচনায়, সামান্য শিক্ষার বৃদ্ধি। এ আশ্চর্য্য কথা বটে, যে শিক্ষা বৃদ্ধিতে দুর্নীতির বৃদ্ধি হয়, এবং আপাততঃ একথা যে অশ্রদ্ধেয় বোধ হইবে, ইহা আমরা স্বীকার করি। ইহাও স্বীকার করি, যে সামান্য শিক্ষা হইলেও, শিক্ষার বৃদ্ধিতে সচরাচর অশ্লীলতা বা অন্য প্রকার দুর্নীতির বৃদ্ধি সম্ভবপর নহে। বঙ্গ সমাজের আধুনিক অপ্রাকৃত অবস্থা জন্যই, সামান্য শিক্ষায় এ কুফল ফলিয়াছে।

সামান্য শিক্ষার বৃদ্ধি হওয়ায়, অল্প শিক্ষিত পাঠকের শ্রেণী বাড়িয়াছে। তাহারা কি পড়িবে ? তাহারা প্রায় বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য ভাষায় অনধিকারী,—যদি জানে ত কিছু সংস্কৃত—সংস্কৃত ভাষায় যে দুই চারিখানি গ্রন্থ চলিত আছে, তাহা পড়িয়া শেষ করিয়াছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ পাঠকই কিছু কিছু ইংরেজি জানেন, কিন্তু সে এরূপ সামান্য যে তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট ইংরেজি গ্রন্থের রসাস্বাদনে তাহারা সক্ষম হয় না—"Mysteries" পর্য্যন্ত তাহাদের বুদ্ধির সীমা—তাহাও সকলের আয়ত্ত নহে। তাহারা কি পড়িবে ? তাহাদের মনোরঞ্জনার্থ এক শ্রেণীর লেখক উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারাও সেই অল্প শিক্ষিত শ্রেণীর লোক—তাহাদের রুচি মার্জ্জিত এবং পরিশুদ্ধ হয় নাই—সুতরাং অশ্লীলতা এবং কদর্য্যতা প্রিয়। লেখক পাঠক উভয়ই এক শ্রেণীর লোক—পরস্পরে বিলক্ষণ সহৃদয়তা—সুতরাং সেই অশ্লীলতা আদৃত এবং পুরস্কৃত হয়।

এমত অবস্থায় অন্য সমাজে কি হয় ? পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, যাঁহারা সুশিক্ষিত, বিশুদ্ধ রুচি, তাঁহারাই অগ্রসর হইয়া অশিক্ষিত পাঠকের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। সুশিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁদের পৃষ্ঠ পোষক হয়েন, তাঁহারাই সেই বলে, অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে শাসিত ও শিক্ষিত করিয়া তুলেন।

এখানে ইংরেজি চর্চ্চার জন্য সেরূপ ঘটে না। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা, ইংরেজি লিখেন, অথবা ইংরেজি লিখিয়া কোন ফল নাই, বলিয়া আদৌ লিখেন না,—এদেশে সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতের শিক্ষার ভার সচরাচর গ্রহণ করেন না। সুতরাং সামান্যরূপ শিক্ষিত লেখকদিগেরই আধিপত্য। এবং সেই কারণেই অশ্লীলতার বৃদ্ধি।

ইহা সত্য বটে, যে সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কতকগুলি মহদাশয় ব্যক্তি বাঙ্গালা লেখক শ্রেণীভুক্ত, এবং আজিকালি কতকগুলি সম্বাদ পত্র ও সাময়িক পত্র সুশিক্ষিত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু এসকলের সংখ্যা অধিক নহে—এবং সুশিক্ষিত সম্প্রদায় ইহাদিগের পৃষ্ঠ রক্ষাকারী নহেন বলিয়া ইহাদিগের বল নাই।

ইহাদিগের সাহস অল্প ; দুর্নীতির শাসনে তাদৃশ যত্ন নাই। অনেকগুলি এমন ভদ্র এবং প্রিয়বাদী, যে তাঁহাদিগের দ্বারা দুর্নীতি নিবারণের আশা করি না।

এই বলহীনতার কারণ উপরেই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। সুশিক্ষিত সম্প্রদায়, ইহাদিগের পৃষ্ঠ রক্ষা করেন না। সুশিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গালা পড়েন না। তাঁহারা বাঙ্গালা পড়েন না বলিয়া, তাঁহাদিগের অনুমোদন জনিত যে বল তাহা সুশিক্ষিত বাঙ্গালা লেখকেরা প্রাপ্ত হয়েন না। সেই বল নাই বলিয়া তাঁহাদের সাহস নাই। সুশিক্ষিতের অনুগ্রহ নাই, বলিয়া তাঁহাদিগকে অশিক্ষিতের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলিতে হয়।

অনেকে হয়ত বঙ্গদর্শনকে অকৃতজ্ঞ বলিবেন। বঙ্গদর্শন সুশিক্ষিত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বিশেষ আদৃত, ইহা আমরা জানি। সুশিক্ষিতে পৃষ্ঠ পোষণ করেন না, এ উক্তি বঙ্গদর্শনের পক্ষে শোভা পায় না, ইহা আমরা স্বীকার করি। আমরা বঙ্গদর্শনের কথা বলিতেছি না—এবং বঙ্গদর্শনের প্রতি সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কৃপা আছে বলিয়াই, আমরা বঙ্গদর্শনে এ সকল কথা বলিতেছি। নহিলে বলিতে পারিতাম না।

ইহা ভিন্ন অশ্লীলতা বৃদ্ধির আরও অনেক কারণ আছে। এক কারণ, মদ্যাদি মাদকে বাঙ্গালির আসক্তি বৃদ্ধি ; দ্বিতীয় নিষ্পাপ আমোদের হ্রাস। তাস, সতরঞ্চ প্রভৃতির অন্য গুণ নাই বটে, কিন্তু তাহাতে যাঁহারা রত হইতেন, তাঁহারা তাহাতে এক প্রকার আমোদ পাইতেন, অন্য আমোদ খুঁজিতেন না। এক্ষণে তাস পাশার প্রভাব কমিয়াছে, অশ্লীল আমোদ তাহার স্থানীয় হইয়াছে।

যে কারণেই হউক, অশ্লীলতার বৃদ্ধির লক্ষণ দেখিয়াই আমরা অশ্লীলতা নিবারণী সভার অনুমোদন করিতেছি। কিন্তু অনুমোদন করিতেছি, বলিয়াই এমত বুঝিতে হইবে না, যে এ সম্বন্ধে সভার পক্ষীয়েরা যত কথা বলিয়াছেন, সকলেই আমরা সম্মত। অনেক স্থানে যে অশ্লীলতা পঙ্কিল স্বভাবের পরিচায়ক নহে, তাহা আমরা স্বীকার করি। এমন লোক আমরা দেখিয়াছি যে তাঁহাদের কথোপকথন অশ্রাব্য, এবং চরিত্র অনুকরণীয় এবং পবিত্রতায় অতুল্য। এমন অনেক কাব্য আছে যে তাহার অশ্লীলতায় অপবিত্রতার ছায়াও নাই। এমন অনেক কাব্য আছে, যে তাহা অশ্লীলতা দোষযুক্ত হইলেও মনুষ্যবুদ্ধিসৃষ্ট রত্নের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া চিরকাল আদরে রক্ষণীয়। কোন কোন স্থানে, অশ্লীলতা, কাব্যের উৎকর্ষপক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। যিনি একথা হঠাৎ বুঝিতে পারিবেন না, তিনি দুর্য্যোধনের সভায় দ্রৌপদীর কথা, মহাভারতে পাঠ করিবেন। ইহাও আমরা স্বীকার করি, যাহার চরিত্র বিশুদ্ধ, অশ্লীলতা তাহাকে কলুষিত করিতে পারে না। "আমার পুত্রটির স্বভাব পবিত্র—

অশ্লীল গ্রন্থ পড়িলে সে পাপপ্রিয় হইবে,” যিনি এরূপ আশঙ্কা করেন, তাঁহার বুদ্ধির আমরা প্রশংসা করি না। এসকল স্বীকার করিলেও অশ্লীলতা সমাজের বিশেষ অনিষ্টকর অবশ্য বলিব। ইহার একটি ভয়ানক ফল এই যে ইহা বিশুদ্ধ চরিত্রের কোন অনিষ্ট না করুক, পাপাসক্তের পাপ স্রোতঃ বৃদ্ধি করে। অশ্লীলতা, পাপাগ্নির ইন্ধন স্বরূপ। যেখানে অগ্নি নাই, সেখানে শুধু কাষ্ঠে অগ্ন্যুৎপাত হয় না; কিন্তু যেখানে অগ্নি আছে, সেখানে কাষ্ঠে তাহা জ্বালিত, বর্দ্ধিত এবং সর্ব্ব গ্রাসক অবস্থায় পরিণত হয়। এই অগ্নিতে বঙ্গদেশ দগ্ধ হইতেছে। অশ্লীলতা দমন হইলে পাপস্রোতঃ কিছু মন্দীভূত হইবে আমাদিগের এমন ভরসা আছে।

এ কথা সমূলক না হইলেও আর একটি গুরুতর কথা আছে। বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক, বিশুদ্ধ রুচিই একটি মনুষ্যের পরম সুখ। অশ্লীলতা সেই সুখের বিঘ্ন কারক। যাঁহারা বলেন, অশ্লীলতায় ধর্ম্মহানি হয় না বলিয়া, তাহা দমনের আবশ্যকতা নাই, তাঁহারা এ কথা বুঝেন না।

অশ্লীলতা নিবারণী সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক, ইহা আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই অবকাশে, সভাকে দুই একটি পরামর্শ দিবার বাসনা করি।

১ম। অনেক সময়ে, উপদেশ, ভৎসনা নিন্দার দ্বারা যেরূপ কার্য্য সিদ্ধি হয়, দণ্ডের দ্বারা সেরূপ হয় না। সভা, এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া, যেখানে উপদেশ, বা নিন্দার দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারিবে, সেখানে দণ্ডের উদ্যোগ না করেন, ইহা আমাদিগের পরামর্শ। দণ্ডে যে সকল লোকের চরিত্র শোধন হয় নাই, উপদেশাদির দ্বারা তাহাদিগের চরিত্র শুদ্ধি ঘটিতে দেখা গিয়াছে। কথায় হইলে প্রহারে কাজ কি?

২য়। অনেক স্থানে যে উপদেশাদি বৃথা হইবে, ইহা আমরা স্বীকার করি। এমন অনেক বক্তা ও লেখক দেখিতে পাই, যে তাঁহারা ভদ্র লোকের নিন্দার ভয় করেন না। সেখানে দণ্ড প্রযুজ্য। কিন্তু আইনের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে দণ্ড বিধানের তাদৃশ সুবিধা নাই। অশ্লীলতা কি? তাহা আইনে কোথাও পরিষ্কৃত হয় নাই। কি দণ্ডনীয়? এ বিষয়ে মতভেদ সর্ব্বদাই ঘটে। যে অশ্লীলতা ইঙ্গিত মাত্রে ব্যক্ত তাহা কি বর্ত্তমান আইনে দণ্ডনীয়? দ্ব্যর্থ অশ্লীলতা দণ্ডনীয় কি না এ সকল স্থলে দণ্ডের অনিশ্চয়তা ঘটিবে। সভার উচিত যে যাহাতে আইনটি পরিষ্কৃত হয় তাহা করেন।

৩য়। একজন মালীর প্রভু একদা পুষ্পোদ্যানে জঙ্গল দেখিয়া মালীকে ভৎর্সনা করিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিতে আদেশ করেন। পর দিন আসিয়া বাবু

দেখিলেন, জঙ্গল পরিষ্কার হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট ফুলগাছ মারা গিয়াছে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফুলগাছ কাটিলে কেন ?" মালী বলিল, "নহিলে জঙ্গল সাফ হয় না।" কাজটা শেষে এই মালীর মত না হয়। জঙ্গল কাটিতে উৎকৃষ্ট কাব্য-কুসুমলতা সকলের উচ্ছেদ না হয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গোবিন্দ বিরুদাবলী শ্রীরূপকৃত। স্তব গ্রন্থ। প্রারম্ভ শ্লোক :—
ইয়ং মঙ্গল রূপাস্যা গোবিন্দ বিরুদাবলী।
যস্যাঃ পঠনমাত্রেণ শ্রীগোবিন্দ প্রসীদতি॥

শেষ শ্লোকঃ। যস্তৌতি বিরুদাবল্যা মথুরামণ্ডলে হরিং।
অনয়া রম্যয়া তস্মৈ তূর্ণ মেষ প্রতুসতি॥

গোপাল চম্পু। জীবরাজ কৃত। গোপাল-লীলা-বর্ণন-গ্রন্থ। প্রারম্ভ বাক্য। অম্ভোজম্মরমত্যনল্প করকা ভৃঙ্গাবলী মেকতঃ পঞ্চেষোঃ শরমন্মতোর্দ্ধশশিনং সূতে নবপল্লবং।' ইত্যাদি—

পরিসমাপ্তি বাক্য।

মদয়তি মনো মদীয়ং তনুজঘন ভারতীরস বিলাসঃ
কিমু সুতনু নীর বিহারী নহি নহি চম্পু বিহারোৎয়ঃ॥

(২) ষট্ সন্দর্ভ। এই গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা স্থানীয়। ছয়টী মহা প্রকরণে বিভক্ত। বিভাজক প্রকরণের নাম সন্দর্ভ। যথা—প্রথম (১) তত্ত্ব সন্দর্ভ। (২য়) ভগবৎ সন্দর্ভ। (৩য়) পরমাত্ম সন্দর্ভ। (৪র্থ) কৃষ্ণঃ সন্দর্ভ। (৫ম) ভক্তি সন্দর্ভ। (৬ষ্ঠ) প্রীতি সন্দর্ভ। গ্রন্থকার জীব গোস্বামী।

বিষয়

তত্ত্ব সন্দর্ভে—প্রমাণ সমুদায়ের মধ্যে ভাগবতের প্রধানতা,—ভগবতের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য, সামান্যাকারে তত্ত্ব নির্ণয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিবরণ।

ভগবৎ সন্দর্ভে—ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্ম তত্ত্ব, ব্রহ্মাদি দেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব-যোগ্যতা, বৈকুণ্ঠাদি স্থান নির্ণয়, বিশুদ্ধ সত্ত্ব নিরূপণ, ব্রহ্ম স্বরূপের সশক্তিকতা, বিশুদ্ধ শক্তির আশ্রয়তা, শক্তির অচিন্ত্যতা, তাদৃশ শক্তির স্বাভাবিকতা, শক্তির নানাত্ব, শক্তির আন্তরঙ্গাদি নিরূপণ, মায়া শক্তি, স্বরূপ শক্তি, গুণস্বরূপতা, স্থুল সূক্ষ্মাতিরিক্তত্ব, প্রত্যক স্বরূপতা, স্বপ্রকাশ রূপতা, জন্ম কর্ম্মাদির অপ্রাকৃতত্ব,

শ্রী বিগ্রহের পূর্ণরূপতা, বৈকুণ্ঠ, পরিচ্ছদ ও পার্ষদ প্রভৃতি বর্ণনা, ত্রিপাৎবিভূতি, অনুভাবানুসারে ঋষিদিগের ব্রহ্মে আনন্দোৎকর্ষতা, ভগবানের লক্ষণ বর্ণন, শ্রীকৃষ্ণ বেদ ও ভক্তি প্রাপ্য প্রভৃতি।

(৩য়) পরমাত্ম সন্দর্ভে। পরমাত্মা ও তৎস্বরূপ ভেদ, গুণাবতারের তারতম্য, জীব, মায়া, জগৎ ও তৎপরিণামিত্ব, বিবর্ত্ত সমাধান, পরমাত্মা হইতে জগতের অভেদ এবং জগৎ হইতে পরমাত্মা ভিন্ন, জগতের সত্যতা, স্বামীর অভিপ্রায় প্রকাশ, নির্গুণ ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বাদির সমন্বয়, লীলাবতারের প্রয়োজন, ভগবানের প্রতি শাস্ত্র তাৎপর্য্য কথন প্রভৃতি।

(৪র্থ) শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা, অংশবোধক বাক্যের সমন্বয়, তাঁহার পূর্ণতা, ভগবান স্বামিত্ব যোজনা, অবতার প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণে শাস্ত্র মাত্রের তাৎপর্য্যতা, অভ্যাস, প্রতিনিধি বাক্য, গতি শাস্ত্রের ভগবানেই গতি, মতান্তরের অপবাদ, নাম মহিমা, গীতাদি শাস্ত্রের গতি, শ্রীকৃষ্ণে শাস্ত্র সমন্বয়, অংশ প্রবেশ যুক্তি, শ্রীকৃষ্ণ রূপের নিত্যতা, দ্বিভুজাদি সত্বেই নিত্যতা, গোলক নিরূপণ, বৃন্দাবনাদির নিত্যতা, গোলক বৃন্দাবনের অভেদ, এতৎপক্ষে প্রমাণ বাক্য প্রদর্শন, যাদবগণ ও গোপালগণ তাঁহার নিত্যপরিবার, প্রকট ও অপ্রকট লীলাব্যবস্থা, বিভুত্ব সত্বেই বৃন্দাবনে স্থিতি, দুই প্রকার লীলার সমন্বয় গোকুল মণ্ডলে তাঁহার প্রকাশাতিশয়, কৃষ্ণ মহিষীগণের স্বরূপ শক্তিত্ব, মহিষী অপেক্ষা গোপীগণের শ্রেষ্ঠতা, গোপীগণের নাম, গোপীগণের মধ্যে রাধিকার শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি।

(৫ম) ভক্তি সন্দর্ভে। ভগবান ভক্ত মাত্রের গম্য বা বোধ্য, নানাবিধ প্রমাণ দ্বারা কৃষ্ণ তত্ত্ব নিশ্চয়, অন্বয় ব্যতিরেক প্রদর্শন দ্বারা তত্ত্ব প্রদর্শন, কৃষ্ণ বহির্মুখের নিন্দা, কৃষ্ণে অনর্পিত কর্ম্মের অনাদর, যোগের অনাদর, জ্ঞান মার্গ, ভক্তির নিত্যতা, ভক্তির দশবিধ লক্ষণ, তাঁহার সর্ব্বফল দাতৃত্ব, ভক্ত্যাভাসের অপরাধতা, উল্লিখিত ফলের অপ্রাপ্তি বিষয়ে সমাধান, ভগবানের নির্গুণত্ব, স্বপ্রকাশত্ব, পরমানন্দত্ব কথন, নিষ্কাম ভক্তির প্রশংসা, অধিকারী ভেদে ব্যবস্থা প্রভেদ, সৎসঙ্গতা ভগবৎ প্রাপ্তির নিদান, মহত্বের লক্ষণ ও তৎপ্রভেদ, সৎ বিশেষ লক্ষণ, গুর্ব্বাশ্রয় বিবেক, ভক্তি ভেদে জ্ঞান ভেদ, অহংগ্রহ উপাসনা, ভক্তির বিশেষ লক্ষণ, গুরু সেবা মহাভাগবৎ প্রসঙ্গ, তৎপরিচর্য্যা, সামান্যতঃ বৈষ্ণব সেবা, শ্রবণাদি জ্ঞানাঙ্গে বিচার, অপরাধ ও অনুরাগ বিচার, ভজনাবিশেষ, সিদ্ধি ক্রম ইত্যাদি।

(৬ষ্ঠ) প্রীতি সন্দর্ভ। ভগবৎ প্রীতির পুরুষার্থতা, তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পরম পুরুষার্থতা, তদ্দ্বারা মুক্তি, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভেদ, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির উৎক্রান্ত্যাদি, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বর্ণন, মুক্তি অপেক্ষা প্রীতির শ্রেষ্ঠতা, সদ্যোমুক্তি ও ক্রম মুক্তি, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের লক্ষণ, জীবন্মুক্তের লক্ষণ, ভগবৎ সাক্ষাৎকারের মাত্রাত্তর

মুক্তি, অন্তর্বাহ্য ভেদে সাক্ষাৎকারের দ্বৈবিধ্য, উৎক্রান্তি ও মুক্তি, সালোক্যাদি মুক্তি ভেদ, সামীপ্য মুক্তির আধিক্যতা, ভক্তির মুক্তি সাধনতা, ভক্তিই উপদেশ্য, উপগতি, সমাধান, ভগবৎ প্রীতির স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ, আবির্ভাব বিশেষ, প্রীতি লক্ষণ, বাক্যের নিষ্কর্ষ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব ও তাঁহার পূর্ণত্ব, রতি প্রভৃতির লক্ষণভেদ, অভিমান ভেদে, প্রীতি ও ভক্তি প্রভেদ, ব্রজদেবীগণের শুদ্ধ প্রেমতা, জ্ঞান-ভক্তির ব্যবস্থা, ভক্তি তারতম্য উৎকর্ষ তারতম্য, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদির অনুভব তারতম্য, গোকুলবাসিগণের শ্রেষ্ঠত্ব, তন্মধ্যে সখীগণের শ্রেষ্ঠতা, তন্মধ্যে গোপাঙ্গনারা শ্রেষ্ঠা, তন্মধ্যে রাধিকা শ্রেষ্ঠা, ভগবৎ প্রীতির রসত্ব স্থাপন, আলম্বন বিভাব, সন্দেহ নিরাস, উদ্দীপন বিভাব, গুণ কথন, বিরোধিগুণ কথন, প্রেম, ধীরোদাত্তাদি-প্রভেদ, ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যাদি, ধর্ম্মজ্ঞান লীলার সমাধান, উদ্দীপকদ্রব্য ও কালাদি, প্রকাশলীলার আধিক্য, অনুভাব ও সঞ্চারি ভাব বিচার, রসের পাঞ্চবিধ্য, গৌণ রসের সপ্তকত্ব, রসাভাস, মুখ্যরস, শান্তাখ্য ভক্তিরস, দাস্য ভক্তিরস, প্রশ্রয় ভক্তিরস, বাৎসল্য, মৈত্রী, বল্লভ ভেদ, মদ মানাদি, উদ্দীপন বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব, ব্যভিচারিভাব, স্থায়িভাব, সম্ভোগাত্মক ও মোদাত্মক ভাব বিচার, ভাবভেদ, বিপ্রলম্ভাদি বিভাগ, পূর্ব্বরাগাখ্য বিপ্রলম্ভ সংভোগ, স্থায়িভাব, প্রেম বৈচিত্তাখ্যসংভোগ, প্রবাসাখ্যসংভোগ, সম্ভোগভেদ, মানাখ্য সংভোগাদি।

গ্রন্থ সংখ্যা।

১ম সন্দর্ভে—৪৭৫, ২য় সন্দর্ভে—২৭৪০, ৩য় সন্দর্ভে—১৭৬৮, ৪র্থ সন্দর্ভে—৪৬২৬, ৫ম সন্দর্ভে—৩১৭৫, ৬ষ্ঠ সন্দর্ভে—৪০০০ শ্লোক।

বাক্য সংখ্যা।

১ম ২৫, ২য় ১২২, ৩য় ১০৯, ৪র্থ ১৯৯, ৫ম ৩৪০, ৬ষ্ঠ ৪২৯।

গোপাল ভট্ট।

গোপাল ভট্ট ভট্টমারি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম বঙ্কট ভট্ট। শ্রীচৈতন্যদেব চতুর্ম্মাস্যা করিয়া চারিমাস গোপাল ভট্টের আবাসে অবস্থিতি করেন এবং সেই সময় তাঁহার সহিত অতীব সখ্যতা হওয়াতে তাঁহাকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সতত শ্রীচৈতন্যদেবের মুখ কমল নিঃসৃত উপদেশ মালা শ্রবণে তাঁহার হৃদয় কন্দরে বৈরাগ্য বীজ সংরোপিত হইল, এবং অচীরকাল মধ্যে সংসারের মায়া পরিত্যাগ করত শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন; পথিমধ্যে কাশী নিবাসী প্রবোধানন্দ সরস্বতী দণ্ডীর আবাসে কিছুকাল থাকিয়া তাঁহার নিকট শিষ্য হইয়া যতিবেশ পরিগ্রহ করতঃ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন।

গোপাল ভট্ট, রূপ সনাতন, এবং শ্রীজীব কর্ত্তৃক বৃন্দাবন মাহাত্ম্য বিস্তারিত

হয়। সনাতন গোবিন্দ দেবের, শ্রীজীব রাধাদামোদরের এবং গোপাল ভট্ট রাধা-রমণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গোপাল ভট্ট, ভক্ত দাসকে পূজারি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার দৌহিত্র সন্তানেরা অদ্যাপি রাধারমণ বিগ্রহের সেবায় নিয়োজিত আছেন।

গোপালভট্ট রঘুনাথ দাস, রূপসনাতন গোস্বামীর প্রীতিবর্দ্ধনার্থ শ্রীহরিভক্তি বিলাস সংগ্রহ করেন। তাঁহার কৃত অন্য কোন গ্রন্থ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে।

ভক্তি বিলাস। নামান্তর হরিভক্তি বিলাস। ধর্ম্মকার্য্য ব্যবস্থা গ্রন্থ। শ্রীমৎ গোপালভট্ট কর্ত্তৃক সংগৃহীত। বিংশ বিলাসে গ্রন্থ সমাপ্তি। বিষয়—বৈষ্ণব দিগের যাবৎ কর্ত্তব্যতা, অনুষ্ঠান নির্ণয় প্রভৃতি। টীকার নাম দিগ্‌দর্শিনী। গ্রন্থ সংখ্যা—অন্যূন ৮০০০ শ্লোক। প্রারম্ভ বাক্য—"চৈতন্যদেবং ভগবন্তমাশ্রয়ে শ্রী বৈষ্ণবানাং প্রমুদেহঞ্জ সালিখন্। আবশ্যকং কর্ম্ম বিচার্য্য সাধুভিঃ সাঙ্গং সমাহৃত্য সমস্ত শাস্ত্রতঃ।"

সমাপ্তি বাক্য—"শ্রীনন্দ সুন্দর মুকুন্দ পদারবিন্দ প্রেমামৃতাব্ধিরস তুন্দিন মানসায় নানার্থ বৃন্দ মনুসন্দধতে নচস্বং তেষাং পদাব্জ মকরন্দ মধুব্রতঃ স্যাম্।"

"ইতি শ্রীগোপাল ভট্ট বিলিখিত শ্রীভগবদ্ভক্তি বিলাসে প্রাসাদিকো নাম বিংশো বিলাসঃ। সমাপ্তোঽয়ং ভক্তি বিলাসঃ।"

রঘুনাথ দাস গোস্বামী।

ইনি কায়স্থ কুলোদ্ভব। মহামহোপাধ্যায় উইলসন সাহেব ইঁহাকে ভ্রম ক্রমে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ স্থির করিয়াছেন এবং তৎপাঠে সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়েরও এতৎ সম্বন্ধে ভ্রম সংশোধিত হয় নাই; তথাহি হরি ভক্তি বিলাস টীকা—"শ্রীরঘুনাথ দাসো নাম গৌড় কায়স্থ কুলাব্জ ভাস্করঃ।" রঘুনাথ দাস অতীব ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র। "ভক্ত মালে" লিখিত আছে ইঁহার পিতার নবলক্ষের সম্পত্তি ছিল কিন্তু তিনি সমুদায় তুচ্ছ বোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবের কৃপাকণা প্রাপ্তি জন্য অপরূপ রূপলাবণ্যবতী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। তথায় চৈতন্য দেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি দাস গোস্বামীকে যৌবনাবস্থায় ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত সন্দর্শনে যাহার পর নাই স্নেহ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ দাস শেষাবস্থায় বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে বাস করিতেন। তথায় শ্রীরূপ, সনাতন এবং গোপাল ভট্টের সঙ্গে বৈরাগ্যাবস্থায় কালাতিপাত করিতেন। চৈতন্যদেব জাতিভেদ মানিতেন না। তাঁহার অন্যান্য ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণের ন্যায় ইঁহার প্রতিও স্নেহের কিছু মাত্র ত্রুটী হইত না। এজন্য দাস গোস্বামীকে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণের ন্যায় পদ প্রদান করিয়াছিলেন। বিদ্যা

ও ভক্তির জন্য ইনি আচার্য্য পদ বাচ্য হইয়াছেন। রঘুনাথ দাস বিলাপ কুসুমাঞ্জলি স্তব রচনা করেন। ষড় গোস্বামী নামাষ্টকে রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, শ্রীজীব এবং গোপাল ভট্ট গোস্বামীর এইরূপ স্তব লিখিত আছে যথা—

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তণ মগ্ন নর্ত্তনপরৌ প্রেমা মৃতাম্ভোনিধী ধীরৌ ধীরজনপ্রিয়ৌ প্রিয় করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ শ্রীচৈতন্য কৃপাভরৌ ভুবি ভরৌ ভারাবহন্তারবৌ বন্দে রূপ সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপাল কৌ।

বিলাপ কুসুমাঞ্জলি স্তোত্র। পদ্যময় গ্রন্থ। রঘুনাথ দাস গোস্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত। সংস্কৃত, বসন্ততিলক ও শার্দ্দূল বিক্রীড়িত প্রভৃতি বহুবিধচ্ছন্দে গ্রথিত। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে সংসার তপ্ত ভক্তের বিলাপ। আনুষঙ্গিক শ্রীকৃষ্ণ লীলা বর্ণন। শ্লোক সংখ্যা ১০১। প্রারম্ভ বাক্য—

"ত্বং রূপমঞ্জরি সখি প্রথিতা পুরেঽস্মিন্ পুংসঃ পরস্য বদনং নহি পশ্যসীতি।"

সমাপ্তি বাক্য—

"বিলাপ কুসুমাঞ্জলি হৃদিনিধায় পাদাম্বুজে মায়াবত সমর্পিত স্তব স্তনোতু তুষ্ণীম্ মনাক্।"

"ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথ দাস গোস্বামিনা বিরচিতঃ শ্রীবিলাপ কুসুমাঞ্জলি স্তব সমাপ্তিঃ॥"

মনোশিক্ষা।

শিখরিণী প্রভৃতিচ্ছন্দোনির্ম্মিত উপদেশ গ্রন্থ। গ্রন্থ কর্ত্তা শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী। বিষয়—কৃষ্ণভক্তিরসে মনোমজ্জন করা। গ্রন্থ সংখ্যা ১২ শ্লোক।

প্রারম্ভ—

"অথ মনোশিক্ষা। গুরোগোষ্ঠে গোষ্ঠাল ইত্যাদি"—

কবিকর্ণপূর।

১৫২৪ খৃঃ অঃ নদীয়া জিলার অন্তঃপাতী কাঞ্চনপল্লী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বৈদ্যকুলোদ্ভব শিবানন্দ সেনের পুত্র। ইহার পূর্ব্বনাম পরমানন্দ দাস, তৎপরে চৈতন্য দেব তাঁহার কাব্য রচনার অসীম চাতুর্য্য সন্দর্শনে কবিকর্ণপূর নাম প্রদান করেন। কবিকর্ণপূর কৃত কাব্য ও নাটক সমুদায় ভক্তি-রস-প্রধান এবং তাহা বিবিধ শব্দালঙ্কারে ভূষিত। ইনি প্রথমে অলঙ্কার কৌস্তুভ তৎপরে চৈতন্য চরিত নামক কাব্য রচনা করেন কিন্তু আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ রচনা করাতেই তাঁহার খ্যাতি বিস্তার হইল। ইহার রচনা প্রণালী অতীব প্রগাঢ় এবং মনোহর। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে তমালের তলে,
রাধিকা-রমণে ঘেরি গোপীকা সকলে,
বাজান মধুর বীণা, রবাব মোচঙ্গ
কেহবা সঙ্গীতে মগ্না, কেহ করে রঙ্গ
পেয়ে শ্যামগুণমণি গোকুল-রতন,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কিবা মূর্ত্তি সুমোহন।
শ্যাম বামে শ্রীরাধিকা (ব্রজের রূপসী)।
ভূতলে পতিত যেন পূর্ণিমার শশী॥
পাইয়া নয়ন দিব্য হরির কৃপায়।
মানসের পটে তুমি এই সমুদায়॥
হেরিয়া ব্রজের লীলা হইয়া মোহিত,
"আনন্দ শ্রীবৃন্দাবন" করিলা রচিত।
গদ্য পদ্য ময় তব চম্পূ মনোহর।
শ্রবণে শ্রবণ তৃপ্ত হয় নিরন্তর॥

কবিকর্ণপূর কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা ও গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা এবং চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক রচনা করেন। শেষোক্ত নাটকখানি প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ এবং ইহার বিষয় রূপগোস্বামীর "করচা" হইতে গৃহীত।

কবিকর্ণপূর কর্ত্তৃক কাঞ্চনপল্লীতে কৃষ্ণরায়জীর মূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়। এই মূর্ত্তি দেখিতে অদ্যাপি বহুব্যক্তি তথায় গমন করিয়া থাকেন।

অলঙ্কার কৌস্তভ। অলঙ্কার গ্রন্থ। শ্রীকবিকর্ণপূর কর্ত্তৃক বিরচিত। বিষয় ধ্বনিস্বরূপ ও কাব্যস্বরূপ প্রভৃতি কাব্যগত সাধারণ তত্ত্ব নির্ণয়, গুণীভূত ব্যঙ্গাদি নির্ণয়, রসভাবাদি নির্ণয় প্রভৃতি।

চারি পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সমাপ্তি। গ্রন্থ সংখ্যা অন্যূন ২০০০ শ্লোক। টীকার নাম কিরণ, টীকা কর্ত্তা গ্রন্থকার স্বয়ং।

চৈতন্য চন্দ্রোদয়। নাটক গ্রন্থ। কবিকর্ণপূর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বিষয়—শ্রীচৈতন্যদেব এবং তৎসহচরগণের লীলা ও মাহাত্ম্যাদি বর্ণন। ১০ দশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থ পূর্ণ। ১ম পরিচ্ছেদে—কল্যধর্ম্মাভিনয়, ২য় পরিচ্ছেদে—ভক্তিবৈরাগ্যাভিনয়, ৩য় পরিচ্ছেদে—প্রেমমৈত্রী অভিনয়, ৪র্থ পরিচ্ছেদে—শচীদেব্যাভিনয়, ৫ম পরিচ্ছেদে—ভগবন্নিত্যাদির অভিনয়, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে—মুকুন্দাদ্যভিনয়, ৭ম পরিচ্ছেদে—সার্ব্বভৌম রাজাদ্যভিনয়, ৮ম পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সার্ব্বভৌমাদ্যভিনয়, ৯ম পরিচ্ছেদে কিন্নরাদ্যভিনয়, ১০ম পরিচ্ছেদে—রাজা রাজমহিষী ঘটিত অভিনয়। পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক বা অভিনয়। গ্রন্থ সংখ্যা—অন্যূন ৩০০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

"নিধিবু কুমুদ পদ্ম শঙ্খ মুখোজ্জ্বরুচিকরো নবভক্তি
চন্দ্রকান্তৈর্বিরচিত কলিকোক শোক শঙ্কু বিষয়—
তমাংসি হিনস্তু গৌর চন্দ্রঃ॥"
"নান্দ্যন্তে সূত্রধার ইত্যাদি"।

সমাপ্তি বাক্য।—

আকল্পং কবয়স্ত নাম কবয়ো যুষ্মদ্বিলাসাবলীং,
তামেবাভিনয়স্ত নর্ত্তকগণা শৃণ্বন্ত পশ্যন্তুতাঃ।
সন্তোমৎসরতাং ত্যজন্ত কুজনাঃ সন্তোষবন্তঃ সদা
সন্ত ক্ষৌণিভুজো ভবচ্চরণয়োর্ভক্ত্যাপ্রজাঃ পান্ত চ।"
"ইতি মহা মহোৎসবো নাম দশমোঽঙ্কঃ।
সমাপ্ত মিদং
চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাম নাটকং।"

শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকা। (খণ্ডকাব্য) কবিকর্ণপূর ইহার প্রণেতা। মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি দীর্ঘচ্ছন্দে গ্রথিত। বিষয়—শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ও তাঁহার পারিষদবর্গের মহিমা বর্ণন। গ্রন্থ সংখ্যা ২২৪। প্রারম্ভ বাক্য—"যঃ শ্রীবৃন্দাবন ভুবিপুরা সচ্চিদানন্দ সান্দ্র" ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য।

"শাকে * * গ্রহমিতে মনুনৈব যুক্তে। গ্রন্থোয় মাবিরভবৎ কথমস্য* *।"
"ইতি শ্রীকবি কর্ণপূর বিরচিতা শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা সমাপ্তা।"

{ "শ্রীমদ্গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা রচিতা ময়া।
দীপ্যতাং পরমানন্দ সন্দোহো ভক্ত বেশ্মনি।"

বৃহৎ গণোদ্দেশ দীপিকা। সংগ্রহ গ্রন্থ। গ্রন্থ কর্ত্তা শ্রীকবিকর্ণপূর। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের পরিবারাদি বর্ণন। সংখ্যা—অনধিক ৫০০, আরম্ভ—"যে বিশ্রুতাঃ পরীবারাঃ রাধা মাধবয়োচিহ্।
তদ্বিয়োগশ্চ লীলাশ্চ তথা পরিকরা দয়ং।"
ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য—

"কলাবতী রসবতী শ্রীমতী চ শুধামুখী।
বিশখা কৌমুদী মাধ্বী শরদাশ্চাষ্টমী স্মৃতা।"
"ইতি বৃহৎ গণোদ্দেশ দীপিকা সমাপ্তা।"

আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ। গদ্য পদ্যময় কাব্য গ্রন্থ। রচয়িতা—কবিকর্ণপূর। শার্দ্দূল বিক্রীড়িত, মন্দাক্রান্তা ও শিখরিণী প্রভৃতি দীর্ঘচ্ছন্দে গ্রথিত। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণলীলারস বর্ণন। গ্রন্থ সংখ্যা ৪৫০০ শ্লোক, তদ্ভিন্ন গদ্য—প্রায় ১০০ হইবেক। ইহার পরিচ্ছেদের নাম স্তবক। দ্বাবিংশ স্তবকে গ্রন্থ সমাপ্তি। টীকার

নাম সুখ বর্দ্ধনী। টীকাকারের নাম শ্রীবৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী। টীকার সংখ্যাও প্রায় গ্রন্থ সংখ্যার তুল্য।

আরম্ভ বাক্য।

"বন্দে শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ যুগলং যস্মিন কুরঙ্গীদৃশাং
বক্ষোজ প্রণয়ীকৃতে বিলসতি স্নিগ্ধোঽঙ্গ রাগে স্বতঃ।
কাশ্মীরং তল শোণি মোপরিতনঃ কস্তূরিকা নীলিমা
শ্রীখণ্ডং নখচন্দ্র কান্তি লহরী নির্ব্ব্যাজ মাস্তম্বতে॥"

সমাপ্তি বাক্য—

"শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ করুণোদিত বাক্ বিভূতিস্তস্মাত্র জীবন ধনস্য পুত্রঃ।
শ্রীনাথ পাদ কমল স্মৃতি শুদ্ধ বুদ্ধিশ্চম্পূমিমাং রচিতবান্ কবিকর্ণপূরঃ॥"

বিবেক শতক। শ্রীগোপাল ভট্টের গুরু শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কর্তৃক বিরচিত। মন্দাক্রান্তা এবং শিখরিণীচ্ছন্দে গ্রথিত।—বিষয়।—বৈরাগ্যোদ্দীপক শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি বর্ণন। শ্লোক সংখ্যা ১০০।

প্রারম্ভ বাক্য।—

"দেহঃ প্রাপ্তোবি রস সরসং ক্ষীণ মায়ুর্ম্মমাভূৎ।
স্বল্পা শক্তির্বিষম বিষয় গ্রাহিণী যেন্দ্রিয়াণাম।
দূরে বৃন্দাবন তটভুবং স্বেদ ভেদ প্রদায়াঃ
কিং কুর্ব্বেঽহং * * * * *"

সমাপ্তি বাক্য।

"বংশীনাদ বিমোহিতা হিতা খিল জগজ্জন্তৌ কিশোরাকৃতৌ শ্রীকৃষ্ণে রতি রস্তু * * * * * *"

"ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিতং বিবেক শতকং সমাপ্তং"

শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থঃ। প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত। শচীনন্দন গৌরাঙ্গের স্তব গ্রন্থ। শ্লোক সংখ্যা ১৪৩ এবং দ্বাদশ বিভাগে সম্পূর্ণ।

প্রথম শ্লোক। স্বমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতি বিমর্য্যাদ পরমদ্ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতি কুমারং রসয়িতুম। বিশুদ্ধ স্বপ্রেমোন্মদ মধুর পীযূষলহরীং প্রদাতুং চান্যেভঃ পরপদ নবদ্বীপ প্রকটম্॥

টীকার নাম—রসিকাস্বাদিনী।

শ্রীরা।

মাসিক প্রকাশিকা। মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীরাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা। ৭৯ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

লেখকেরা বোধ হয় অল্প বয়স্ক। এজন্য বিশেষ সমালোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়। মধ্যে মধ্যে রচনা মন্দ নহে।

Plays and Poems of William Shakespeare, with the corrections and Illustrations of various commentators comprehending a life of the poet, and an enlarged History of the Stage, by the late Edmond Malone with a new glossarial index.

Vol. II. Comedies Republished with a life of Malone by Bany Madhub Ghosh.

Calcutta, Berigny & Co.

ছাপা উত্তম হইতেছে। ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু। মীর মসাঃরফ হুসেন প্রণীত। শ্রীমুন্সী আজিজন্দীন মহম্মদ দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

গ্রন্থখানি পদ্য। পদ্য মন্দ নহে। এই গ্রন্থকার আরও বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচনার ন্যায়, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না।

ইহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়। বাঙ্গালা, হিন্দু মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান এক্ষণে পৃথক—পরস্পরের সহিত সহৃদয়তা শূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব্ব থাকিবে, যে তাঁহারা

ভিন্ন দেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দ্দু, ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেন না জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা। অতএব মীর মসাঃরফ হুসেন সাহেবের বাঙ্গালা ভাষানুরাগিতা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় প্রীতিকর। ভরসা করি, অন্যান্য সুশিক্ষিত মুসলমান তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইবেন।

হিন্দু ধর্ম্ম মর্ম্ম। ৺লোকনাথ বসু প্রণীত। কলিকাতা। কাব্য প্রকাশ যন্ত্র। ১২৮০। ২য় সংস্করণ।

গোঁড়া হিন্দুর মত রক্ষা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকর্ত্তার সংগ্রহ প্রশংসনীয়। বিচার শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। লোকনাথ বাবু প্রসিদ্ধ সুবিচারক ছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ান্তরে। গোঁড়া হিন্দু এই গ্রন্থেও সেই সুবিচার শক্তির পরিচয় দেখিতে পাইবেন। আমরা গোঁড়া নই, আমরা তাহা দেখিতে পাই নাই।

পূর্ণশশী। মাসিকপত্র। সারস্বত যন্ত্র। ১২৮০।

এখানি নূতন সাময়িকপত্র। প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় আছে; ১। বাসগৃহ; ২। কল্কিপুরাণ; ৩। লাইকারগাস; ৪। মদালসা; ৫। পূর্ণশশী; ৬। বভ্রুবাহনের প্রতি উলূপী; ৭। রাস; ৮। চুম্বক ধর্ম্ম।

প্রথম প্রস্তাবটি আমাদিগের বাসগৃহ রচনা প্রণালীর সমালোচনা। দ্বিতীয়, তৃতীয়ের পরিচয় শিরোনামেই পাওয়া যাইতেছে। চতুর্থ ও পঞ্চম প্রস্তাব উপন্যাস; ষষ্ঠ ও সপ্তম পদ্য। অষ্টম প্রস্তাব বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব।

সকল প্রস্তাবগুলিই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। আমরা এই পত্রের উন্নতি দেখিলেই বড় প্রীত হইব। ইহার সম্পাদক একজন সুলেখক।

লক্ষ্মণ বিবাসন। বালকগণের ভাষা ও নীতি শিক্ষার্থ। শ্রীশ্যামাচরণ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা সুচারুযন্ত্র।

সীতার বনবাসের অনুকরণে সরল ভাষায় এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন বক্তব্য নাই।

ভারতমাতা। নেশ্যনেল থিয়েটারে অভিনীত। ব্যথিত শ্রীকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা রায়যন্ত্রে বাবুরাম সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

এখানি "মাস্ক", বা রূপক। ভারতলক্ষ্মী, ভারতমাতা, তাঁহার সন্তানগণ এবং দুইজন সাহেব ধৈর্য্য, সাহস "ঐক্যতা"—ইত্যাদি ইহার নায়ক নায়িকা। ঐক্যতার পরিবর্ত্তে ঐক্য আসিলে ভাল হইত। রূপকটী মন্দ হয় নাই।

সমুদয় বিশ্বব্যাপারই কার্য্যকারণ সূত্রে গ্রথিত। সূর্য্য তাপ দিতেছে; মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে; অগ্নি দহিতেছে; মারুতহিল্লোলে লতাপল্লব সঞ্চালিত হইতেছে; ইত্যাদি যাহা কিছু জগন্মণ্ডলে ঘটিতেছে, সে সকলই কার্য্যকারণের দৃষ্টান্তস্থল। তাপ, বৃষ্টি, দাহন, লতাপল্লব-সঞ্চালন প্রভৃতিকে কার্য্য, এবং সূর্য্য, মেঘ, অগ্নি, মারুতহিল্লোল প্রভৃতিকে যথাক্রমে তাহাদিগের কারণ বলিলে কি বুঝায়, এই প্রবন্ধে তাহাই বিবেচ্য।

যাহার উৎপত্তি আছে, তাহাকেই কার্য্য বলা যায়। অনেক পদার্থ রাত্রিকালে শীতল থাকিয়া দিবসে সূর্য্য কিরণ সংযোগে তাপযুক্ত হয়। বৃষ্টি এক সময়ে নাই, অপর সময়ে হইতেছে। কোন বস্তুতে অগ্নিসংস্পর্শ না হইলে, তাহা দগ্ধ হয় না। লতাপল্লব এক সময়ে স্থির হইয়া আছে, অপর সময়ে মারুতহিল্লোলে দুলিতেছে। অতএব তাপ, বৃষ্টি, দাহন, লতাপল্লব সঞ্চালন, ইহাদিগের উৎপত্তি আছে; এজন্যই ইহারা কার্য্যপদবাচ্য। এইরূপ দিবারাত্রি, জীবোদ্ভিদ্, সুখদুঃখ, ইহাদিগের উদয় আছে বলিয়া, ইহারাও কার্য্য। অনন্ত আকাশ ও অনন্ত কাল কখন ছিল না, ইহা কেহ কল্পনা করিতেও পারে না; সুতরাং ইহাদিগকে কার্য্য জ্ঞান করিতে বুদ্ধিমান্ মনুষ্য মাত্রেই অশক্ত। যাহা অনাদি, অথবা যাহার আদি আছে এরূপ প্রমাণ নাই, তাহাকে কার্য্য বিবেচনা করিতে আমাদিগের অধিকার নাই; যাঁহারা জগৎস্রষ্টার স্রষ্টা অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা যেন এই কথাটী মনে করিয়া রাখেন।

যাহা ব্যতিরেকে যে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, তাহাকে সেই কার্য্যের কারণ বলে। সূর্য্য ব্যতিরেকে দিবাভাগের তাপ জন্মে না। বিনা মেঘে বৃষ্টি হয় না। অগ্নি বিনা দাহন ঘটে না। মারুতহিল্লোল ব্যতিরেকে লতাপল্লব সঞ্চালিত হয় না। এই নিমিত্তই সূর্য্যকে তাপের কারণ, মেঘকে বৃষ্টির কারণ, অগ্নিকে দাহনের কারণ, এবং মারুতহিল্লোলকে লতাপল্লব সঞ্চালনের কারণ, বলা যায়।

যে সমুদায় ঘটনা, অবস্থা বা বস্তু সমবেত না হইলে কার্য্যবিশেষের উৎপত্তি

হয় না, কারণ বলিলে বিজ্ঞানানুসারে সে সমুদায়ের সমষ্টিকে বুঝায় ; কিন্তু চলিত কথায় তন্মধ্যস্থ যে কোন একটিকে কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যায়। যখন আমরা মেঘকে বৃষ্টির কারণ বলি, তখন যে আমরা কারণাংশ মাত্রের প্রতি লক্ষ্য করি, কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই অনুভূত হইবে। যে বাষ্পরাশি মেঘরূপে গগনমণ্ডলে ভাসমান হয়, তাহা শীতলবায়ুসংস্পৃষ্ট বা কিয়ৎ পরিমাণে তাড়িতভ্রষ্ট না হইলে জলরূপে পরিণত হয় না। সুতরাং মেঘের শীতল সমীরণসংস্পর্শ বা তাড়িতত্যাগ বৃষ্টির অন্যতর কারণ। আবার ভাবিয়া দেখ, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে, জলদ রূপান্তরিত হইয়া যে বারি জন্মে, তাহা ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে পারিত না। সুতরাং ভূমণ্ডলের মাধ্যাকর্ষণ বৃষ্টির আর একটি কারণ। অতএব প্রকৃতরূপে বৃষ্টির কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, মেঘ, তৎসঙ্গে শীতল বায়ুর সংস্পর্শ বা তৎকর্ত্তৃক তাড়িত-ত্যাগ, এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, এই কয়েকটির উল্লেখ করিতে হয়।

কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি। সুতরাং কারণ কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। অগ্রে মেঘ হইবে, পরে বৃষ্টি হইবে। অগ্রে সূর্য্যোদয় হইবে, পরে পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ পদার্থচয় উত্তপ্ত হইবে। কিন্তু যাহা কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষিত হয়, তাহাই কারণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। যে সময়ে কুম্ভকার ঘট গড়িতেছে, তৎপূর্ব্বক্ষণে কত জীবের জন্ম বা মৃত্যু, কত বৃক্ষের অঙ্কুরোদগম বা বিনাশ সাধন, কত রাজ্যের উদয় বা বিলয়, কত লোকের সম্পদ্ বা বিপদ্, কত গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতুর আবির্ভাব বা তিরোভাব হইতেছে। কিন্তু এসকল পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার সহিত ঘটের কোন সম্বন্ধ নাই। এ সমুদায় বিদ্যমান থাকিলেও মৃত্তিকা, চক্র, দণ্ড ও কুম্ভকারের অভাবে ঘটের উৎপত্তি হইবে না ; এবং এ সমুদায়ের অবিদ্যমানতাসত্ত্বেও মৃত্তিকা, চক্র, দণ্ড, ও কুম্ভকার থাকিলে, ঘটোৎপত্তি হইতে পারিবে।

অসম্বদ্ধ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার কারণত্ব কল্পনাই, বোধ হয়, অনেক কুসংস্কারের মূল। এতদ্দেশীয় পুরাতন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক লোক দেখা যায়, যাঁহারা বৃক্ষরোপণ, কূপখনন, গৃহনির্ম্মাণ, প্রভৃতি সামান্য ঘটনাকেও তৎপরবর্ত্তী বিপদের কারণ জ্ঞান করিয়া থাকেন : বার বা তিথি বিশেষে যাত্রা করিয়া অথবা দ্রব্য বিশেষ ভক্ষণ করিয়া কোনরূপ অমঙ্গল বা বিঘ্ন ঘটিলে পূর্ব্বকালীয় ঋষিগণ যে সমুদয় দোষ বার বা তিথির স্কন্ধেই চাপাইবেন, বিচিত্র কি ? অমুক দিন পীড়া হইলে, বিষম শঙ্কট ; অমুক মাসে বিবাহ হইলে, অমুক দোষ ঘটে ; অমুক সময়ে অমুক কার্য্য নিষিদ্ধ ; ইত্যাকার এতদ্দেশে যে অসংখ্য ফলজ্যোতিষিক বচন প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে অনেক গুলিই অমূলক কার্য্য কারণাশঙ্কাসম্ভূত বলিয়া প্রতীতি হয়। যে সকল কার্য্যের কারণ নির্ণয় বহুদর্শনসাপেক্ষ, তদ্বিষয়েই অবৈধ সংস্কারের প্রবলতা দৃষ্ট হয়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির কারণ নিরূপণ সহজ নহে ; যদি এরূপ

দুর্ঘটনার পূর্ব্বে কোন দেশে অপরিজ্ঞাত শক্তি ধূমকেতুর উদয় হইয়া থাকে, সে দেশবাসীরা অজ্ঞানতা নিবন্ধন যে তাহাকেই পূর্ব্ববর্ত্তী দেখিয়া কারণ বলিয়া স্থির করিবে, আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু ইউরোপ খণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিয়া বিশ্বাস হয়, যে, বিজ্ঞানের উন্নতিসহকারে ঈদৃশ কুসংস্কার সকল সভ্য সমাজ হইতে ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।

অসম্বন্ধ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনানিচয় হইতে কারণের প্রভেদ প্রদর্শনার্থে দর্শনবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে কারণ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। কুম্ভকার, চক্র, দণ্ড, ও মৃত্তিকা সর্ব্বদাই ঘটোৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী; কখনই তাহাদিগের অভাবে ঘটোৎপত্তি হয় না, এবং যখনই তাহাদিগের সমাবেশ হয়, তখনই ঘটোৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তীকে কারণ বলিলে, তৎসম্বন্ধে দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথমতঃ একটী কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন কারণ লক্ষিত হয়। সূর্য্যালোকে, অগ্নিসংযোগে, গতিনিরোধে, তাড়িতসঞ্চালনে, বা রাসায়নিকযোগে, তাপ উৎপন্ন হয়; এইরূপ বার্দ্ধক্যে, বিষপানে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রোগে, শারীরিক আঘাতে লোকের মৃত্যু হয়। সুতরাং এতাদৃশ স্থলে কোন একটি ঘটনা নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী না থাকিলেও কারণ হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাইতেছি, যাহা নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাও স্থলবিশেষে কারণ পদবাচ্য নহে। দিবা রাত্রির নিয়ত পূর্ব্ব-বর্ত্তী, এবং রাত্রিও দিবার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। তথাপি একটি অপরটির কারণ নহে।

প্রথম আপত্তির খণ্ডনার্থে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী কথা বলা যাইতে পারে :—

১। কোন ঘটনার কারণ, বহুবিধ হইলেও, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক, এবং তন্মধ্যে একটা না একটা নিয়তই পূর্ব্ববর্ত্তী থাকে। সুতরাং কারণের বহুত্ব নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী-ত্বের বাধক নহে।

২। যে যে স্থলে কারণের বহুত্ব প্রতীয়মান হয়, সেই সেই স্থলে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে প্রায়ই একত্ব লক্ষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তাপ উৎপন্ন হইলে ও একমাত্র আণবিক গতিই যে তাহার অব্যবহিত কারণ, ইহা সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ টিণ্ডাল সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মৃত্যু সংঘটিত হইলেও মাস্তকের অংশবিশেষের বিকার যে তাহার অব্যবহিত কারণ, শারীর তত্ত্ব পর্য্যা-লোচনা করিলে এরূপ প্রতীতি জন্মে।

৩। একটী কার্য্যের যত প্রকার কারণ থাকুক না কেন, তন্মধ্যে যে কোন প্রকার কারণের সমাগম হইলেই নিয়ত প্রাগুক্ত কার্য্যের উৎপত্তি হয়।

দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধেও বিবেচনা করিয়া দেখ, যদিও এক্ষণে দিবা রাত্রির নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী, রাত্রিও দিবার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী, তথাপি সূর্য্যের তেজ বিলুপ্ত হইলে

অথবা পৃথিবীর আহ্নিক গতি রুদ্ধ হইলে, দিবা রাত্রির পরস্পর নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সুতরাং এরূপ পূর্ব্ববর্ত্তিতা নিয়ত পদ বাচ্য নহে। অন্য নিরপেক্ষ হইয়া যাহা সর্ব্বাবস্থায় পূর্ব্ববর্ত্তী থাকে, তাহাই প্রকৃত নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত যে প্রকার বিচার করা গেল, তাহাতে এক প্রকার প্রতিপন্ন হইল যে যাহা নিরপেক্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী থাকিয়া নিয়ত কার্য্যবিশেষ উৎপাদন করে, তাহাই উক্ত কার্য্যের কারণ।* এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগেরও এই মত। ভাষা পরিচ্ছেদে লিখিত আছে,

"অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বং।"

যাহার অভাবে কার্য্য সিদ্ধ হয় না, তাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতাই কারণত্ব।

বৈশেষিক সূত্রকার লিখিয়াছেন, "কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ।" ১।২ আহ্নিক। ১ অধ্যায়।

"কারণের অভাব হইলেই কার্য্যের অভাব হয়।"

কারণের যিনি যাহা লক্ষণ করুন, এই সূত্রটীই তাহার প্রতিগ্রন্থিতে থাকিবে এবং এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই উত্তর কালবর্ত্তী পণ্ডিতেরা কারণ নির্ণয়ার্থে অগ্রসর হন। নবদ্বীপের নৈয়ায়িকেরা দুইটী নিয়মের উল্লেখ করেন।

১। "যদ ভাবেন ইতরকারণসমুদয়—সত্বে যস্য উৎপত্তিং পশ্যতি তৎকার্য্যং প্রতি তস্য অকারণত্বং নিশ্চিনোতি।"

যাহার অভাবে ইতর কারণ সমুদয় সত্বে যাহার উৎপত্তি দেখিবে, তৎকার্য্য-সম্বন্ধে তাহার অকারণত্ব জানিবে।

২। "যদ্ব্যতিরেকেণ ইতরকারণসমুদয়সত্বে যস্য অভাবং পশ্যতি তৎকার্য্যং প্রতি তস্য কারণত্বং নিশ্চিনোতি"।

যদ্ব্যতিরেকে ইতর কারণ সমুদয় সত্বে যাহার অভাব দেখিবে, তৎকার্য্যসম্বন্ধে তাহার কারণত্ব জানিবে।

প্রথম নিয়মটী কারণাতিরিক্ত পদার্থ বর্জ্জনের অমোঘ অস্ত্র; দ্বিতীয় নিয়মটী কারণ নিরূপণের প্রধান সাধন।†

---

*We may define, therefore, the cause of a phenomenon, to be the antecedent, or the concurrence of antecedents, on which it is invariably and unconditionally consequent.

†Compare the 2nd rule with Mill's 2nd and 3rd canons of Induction, the simple and compound methods of difference, and on the application of the 1st rule in Lewes's Physiology of Common Life, where he lays down that the persistence of a function after the destruction of an organ shews its independence of that organ.

আমাদিগের দেশে যে সকল দর্শনশাস্ত্র প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত ও বৌদ্ধ, এই কয়েকটী প্রধান।* কার্য্যকারণ সম্বন্ধ লইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, সৎকারণ হইতে অসৎকার্য্যের উৎপত্তি হয়। সাংখ্য মতাবলম্বীরা কহেন যে, সৎ হইতেই সতের আবির্ভাব ঘটে। বৈদান্তিকদিগের মতে, সমুদায় কার্য্যই একমাত্র সতের বিবর্ত্ত। বৌদ্ধদিগের বোধে, অসৎ হইতে সৎ জন্মে। এই সকল মতের উল্লেখ করিয়াই বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—

"কেচিদাহু রসতঃ সজ্জায়ত ইতি একস্য সতোবিবর্ত্তঃ কার্য্যজাতং ন বস্তু সদিত্য পরে। অন্যেতু সতোঽসজ্জায়ত ইতি সতঃ সজ্জায়তে ইতি বৃদ্ধা।"

তত্ত্বকৌমুদী

কেহ কেহ বলেন, অসৎ হইতে সৎ জন্মে [বৌদ্ধ ;] অপরে বলেন, কার্য্যজাত একমাত্র সতের বিবর্ত্ত, কোন বস্তুই সৎ নহে [বৈদান্তিক ;] অন্যে কিন্তু কহেন, সৎ হইতে অসৎ জন্মে [নৈয়ায়িক ;] বৃদ্ধেরা বলেন সৎ হইতে সৎ জন্মে [সাংখ্য।]

আমরা দেখাইব যে এ সকল মতগুলিই সত্য ; ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকারেরা সত্যের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ দেখিয়া অপরকে ভ্রান্ত জ্ঞান করিয়াছেন। কথিত আছে যে কয়েক-জন অন্ধ, হস্তী প্রত্যক্ষ করিতে গিয়াছিল। কেহ পদ, কেহ শুণ্ড, কেহ কর্ণ, কেহ উদর, স্পর্শ করিল ; পরে যখন পরস্পরের অর্জ্জিত জ্ঞানের আলোচনা করিতে বসিল, তাহাদিগের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। যে পদ স্পর্শ করিয়াছিল, সে বলিল যে হাতি গাছের গুঁড়ির মত। যে শুণ্ড স্পর্শ করিয়াছিল, সে বলিল সাপের মত। যে কর্ণ স্পর্শ করিয়াছিল, সে বলিল কুলার মত। যে উদর স্পর্শ করিয়াছিল, সে বলিল ঢাকের মত। কেহ স্বীয় প্রত্যক্ষের অপলাপ করিয়া অন্যের কথায় বিশ্বাস করিতে চাহে না। সুতরাং বিবাদ ভঞ্জনও হয় না। পরিশেষে, একজন চক্ষুবিশিষ্ট পথিক কলহের কারণ শুনিয়া বলিল, তোমরা সকলেই সত্য কথা বলিতেছ; হাতির পা গাছের গুঁড়ির মত, হাতির শুড় সাপের মত, হাতির কাণ কুলার মত, ও তাহার উদর ঢাকের মত ; তোমরা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছ ; সমুদায় হস্তীটী প্রত্যক্ষ কর নাই বলিয়া অন্যকে ভ্রান্ত ভাবিতেছ। উক্ত পথিকের ন্যায় আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব যে সত্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ দর্শন করিয়াই দার্শনিকেরা কার্য্যকারণ বিষয়ে পরস্পরকে ভ্রান্ত ভাবিয়াছেন।

---

* ন্যায় বলিতে অক্ষপাদ ও বৈশেষিক, সাংখ্য বলিতে কাপিল ও পাতঞ্জল, বেদান্ত বলিতে উত্তর মীমাংসা, বুঝায়। মতভেদ সত্বেও ইহারা বেদ মানে বলিয়া হিন্দু সমাজে আদরণীয়। বৌদ্ধেরা বেদকে অভ্রান্ত বিবেচনা করে না, কিন্তু এক সময়ে তাহারাই এতদ্দেশে প্রবল ছিল।

নৈয়ায়িকেরা বলেন কারণ তিন প্রকার, সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ।* যাহা সমবেত হইয়া কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে সমবায়িকারণ বলে। ঘটের সমবায়িকারণ কপালদ্বয়; পটের সমবায়িকারণ তন্তুনিচয়। কার্য্যোৎপাদনার্থে সমবায়িকারণের যে সংযোগ ঘটে, তাহাকে অসমবায়িকারণ কহে। কপালদ্বয়ের সংযোগ ঘটের অসমবায়িকারণ; তন্তু নিচয়ের সংযোগ পটের অসমবায়িকারণ। সমবায়ি ও অসমবায়ি ব্যতিরিক্ত অন্য কারণের নাম নিমিত্ত কারণ।† কুম্ভকার, চক্র, ও দণ্ড ঘটের নিমিত্ত কারণ; তন্তুবায়, তন্ত্র ও তুরি¶ পটের নিমিত্ত কারণ। কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে, কার্য্য যে উপাদানে নির্ম্মিত তাহাই নৈয়ায়িকদিগের সমবায়িকারণ; কার্য্য যে শক্তি সাপেক্ষ তাহাই নিমিত্ত কারণ; এবং কার্য্যোৎপত্তি জন্য উক্ত উপাদান ও শক্তির যেরূপ সংযোগ আবশ্যক, তাহাই অসমবায়িকারণ। কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যটী থাকে না। কিন্তু যে শক্তি প্রভাবে ও যে উপাদান সংযোগে কার্য্যটী উৎপন্ন হয়, সে শক্তি ও সে উপাদান থাকে। এই নিমিত্তই নৈয়ায়িকেরা কহেন যে সৎকারণ হইতে অসৎ কার্য্যের উৎপত্তি হয়।‡

সাংখ্যমতাবলম্বীরা কার্য্যকে অসৎ বলিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন,

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

ভগবদ্গীতা

অসৎ সৎ হয় না, সৎ অসৎ হয় না। "নাবস্তুনা বস্তুসিদ্ধিঃ।" ১ অধ্যায়ে। ৭৯ সূত্র

কপিল সূত্র

অবস্তু কর্ত্তৃক বস্তুসিদ্ধি হয় না।

"নাসদুৎপাদোনৃশৃঙ্গবৎ।" কপিল সূত্র।

১ অ। ১১৫ সূ।

নৃশৃঙ্গবৎ অসতের উৎপত্তি হয় না।

"তবে সৎকারণ হইতে কি প্রকারে অসৎ কার্য্য হইবে?"

আমরা স্বীকার করিতেছি এবং বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে উৎপন্ন কার্য্যটী সত্তাযুক্ত অর্থাৎ অস্তিত্ববিশিষ্ট, নৃশৃঙ্গবৎ কল্পিত পদার্থ নহে; আর তদুৎপাদক উপাদান এবং শক্তিও পূর্ব্বে ছিল। এই অর্থেই সৎ হইতে সতের আবির্ভাব

---

* Compare with the Material, the Formal and the Effecient causes of Aristotle.

† ন্যায় পদার্থ তত্ত্ব নামক গ্রন্থ দেখ।

¶ মাকু।

‡ ঘটের পূর্ব্বে কুম্ভকার, দণ্ড, মৃত্তিকা প্রভৃতি থাকে; পটের পূর্ব্বে তন্তুবায়, তন্ত্র, তন্তু প্রভৃতি থাকে।

হয়, সাংখ্যবাদীদিগের এই মতটী অখণ্ডনীয়। কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে যখন কার্য্য বিশেষের অস্তিত্ব থাকে না, তখন তৎপ্রতি অসৎ শব্দ প্রয়োগের দোষ কি? কপিল শিষ্যেরা অসম্ভব ও অবাস্তব এইরূপ অর্থেই অসৎ শব্দ ব্যবহার করেন। নৈয়ায়িকেরা প্রাগস্তিত্বশূন্য পদার্থকে অসৎ বলেন।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে, পদার্থপুঞ্জ যে সকল পরমাণুর সমষ্টি ও বিশ্বব্যাপার নিচয় যে সকল বলের কার্য্য, তাহারা বর্দ্ধিত বা বিনষ্ট হয় না। একখানি কাষ্ঠ দগ্ধ কর; তদুৎপন্ন বাষ্প, অঙ্গার ও ভস্ম একত্রিত করিলে দেখিবে, তাহাদিগের ভার উক্ত কাষ্ঠ খণ্ডের তুল্য। একটী গতিশীল পদার্থ আহত হইয়া নিশ্চল হউক; সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে অবগত হইবে যে অন্তর্হিত গতি পরিমাণানুরূপ তাপরূপে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ বহুবিস্তীর্ণ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাদ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে জগন্মণ্ডলস্থ উপাদান বা শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি নাই, কেবল রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। সাংখ্য মতাবলম্বীরা এই তত্ত্বটী বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। দুগ্ধ ও তিন্তিড়ীরস একত্রিত করিলে; এবং উভয়ের পরিণামে দধি উৎপন্ন হইল। কপিলশিষ্যেরা বলিলেন যে দুগ্ধও সৎ, তিন্তিড়ীরসও সৎ, এবং তদুভয়োৎপন্ন দধিও সৎ, অর্থাৎ কল্পিত পদার্থ নহে, অস্তিত্ব বিশিষ্ট। বৌদ্ধেরা ভাবিলেন, যখন দধি উৎপন্ন হইল, তখন দুগ্ধ ও তিন্তিড়ীরস কোথায়? দধি বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু দুগ্ধ ও তিন্তিড়ীরস ত নাই। সুতরাং সৎস্বরূপ দধি অসৎ দুগ্ধ ও তিন্তিড়ীরস হইতে উৎপন্ন হইল।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অত্যল্পকাল হইল আবিষ্কার করিয়াছেন যে একমাত্র শক্তি বিশ্বমণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। গতি, তাপ, বিদ্যুৎ, আলোক, রাসায়নিক সম্বন্ধ, জীবন, চিন্তা, সকলই এক; সকলই জগৎ নিহিত অপরিজ্ঞেয় মূল শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সমুজ্জ্বল শিশিরবিন্দু বা তিমিরবিনাশী প্রভাকরপ্রভা; ভীষণ কল্লোলকোলাহলময়ী কল্লোলিনী বা সুমন্দ মারুতান্দোলিত বনস্পতি, রক্ত-সঞ্চালন সম্পন্ন সুন্দর জীবশরীর বা কল্পনারঞ্জিত বুদ্ধিবিভূষিত মানবমন, সকলই একমাত্র কুহকীর ভোজবাজি। সে কুহকীর প্রকৃতি জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় কাণ্ডই তাহার লীলা। তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে বৈদান্তিকেরা এই গভীর তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা সমুদায় কার্য্যকেই একমাত্র সতের বিবর্ত্ত জ্ঞান করিতেন। এই জন্যই তাঁহারা "একমেবাদ্বিতীয়ং" ধ্বনিত করিতেন। এই নিমিত্তই তাঁহারা প্রত্যক্ষ গোচর পদার্থ সকলে "ব্যবহারিক" সত্তা মাত্র আরোপ করিতেন, এবং কেবল জগৎ কর্ত্তার "পারমার্থিক" সত্তা স্বীকার করিতেন।

মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত আছে,

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতেচ
যথাপৃথিব্যামোষধয়ঃ সংভবন্তি।
যথাসতঃ পুরুষাৎকেশ লোমানি
তথাক্ষরাৎ সংভবতীহ বিশ্বং॥"
৭। ১ খণ্ড। ১ মুণ্ডক।

"তদেতৎ সত্বং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্-
বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিয়ন্তি॥"
১। ১ খণ্ড। ২ মুণ্ডক।

যেমন ঊর্ণনাভ আপনা হইতে সূত্রের সৃষ্টি করে ও পুনরায় গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি জন্মে, যেমন জীবশরীর হইতে কেশ লোমাদির উৎপত্তি হয়, তেমনই সমুদায় বিশ্ব অবিনাশী ব্রহ্ম হইতে জন্মে।

যেমন প্রজ্জলিত অগ্নি হইতে অগ্নির সমান রূপ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনই সেই অবিনাশী ব্রহ্ম হইতে নানা প্রকার জীব সকল উৎপন্ন হয় এবং পরে তাঁহাতেই লীন হয়।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে উক্ত হইয়াছে।

"সচ্চত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চা নিরুক্তঞ্চ।
নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ।
সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ।
তৎসত্যমিত্যাচক্ষতে।"

তিনি মূর্ত্ত অমূর্ত্ত, নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট,
মূর্ত্তাশ্রয় অমূর্ত্তাশ্রয়, চেতন অচেতন,
সত্য অনৃত, ও সৎ প্রভৃতি যাহা কিছু সমুদায় হইয়াছেন।
অতএব তাঁহাকে সত্য কহে।*

এপর্য্যন্ত যাহা যাহা লিখিত হইল তাহাতে এক প্রকার প্রদর্শিত হইল, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ কি প্রকার এবং তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ দার্শনিকদিগের মত কতদূর সত্য। এক্ষণে আমরা একটী প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

---

*তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। কার্ত্তিক ১৭৭৫ শক।

আমরা বলিয়াছি যে সমুদায় বিশ্ব ব্যাপারই কার্য্যকারণসূত্রে গ্রথিত, অর্থাৎ জগন্মণ্ডলস্থ প্রত্যেক ঘটনারই এক একটী কারণ আছে। ইহার প্রমাণ কি?

ইহার প্রথম প্রমাণ এই যে অনুসন্ধান দ্বারা অদ্যাপি কোথায়ও কার্য্যকারণ নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় নাই। পদতলস্থ ধূলীকণা হইতে গগনচর দুর্লক্ষ্য নক্ষত্রমালা পর্য্যন্ত যতদূর অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষিত বা পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে, এবং জড়জগৎ, জীবাত্মা ও মনুষ্যসমাজ সম্বন্ধে একাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু জানা গিয়াছে; তাহাতে সর্ব্বত্রই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান লক্ষিত হইয়াছে। কোন পরিজ্ঞাত স্থলেই বিনা কারণে কোন একটী ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় নাই।

এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে কারণ বিনা কোন ঘটনা ঘটিতে পারে, ইহা আমরা ভাবিতেও পারি না। আমরা ভাবিতে পারি যে সূর্য্য আর উদিত হইবে না; চন্দ্র চূর্ণ হইয়া যাইবে; নক্ষত্রচয় নিষ্প্রভ হইবে; হস্তত্যক্ত প্রস্তরখণ্ড পৃথিবীতলে পতিত না হইয়া ঊর্দ্ধমুখে ধাবিত হইবে; কিন্তু বিনা কারণে যে এরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনানিচয় ঘটিবে, ইহা আমরা ভাবিতে পারি না। আমরা এরূপ ভাবিতে পারি না, ইহাতে দেখাইতেছে যে আমাদিগের প্রকৃতিগত একটী সংস্কার রহিয়াছে যে বিনা কারণে কোন ঘটনা ঘটিতে পারে না। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে ঈদৃশ সংস্কারের মূল এই, যে আমরা পুরুষানুক্রমে কখন এ নিয়মের ব্যভিচার প্রত্যক্ষ করি নাই। সুতরাং ইহার অনুকূল প্রমাণাপেক্ষা প্রবলতর আর কিছু আমরা চাহিতে পারি না।
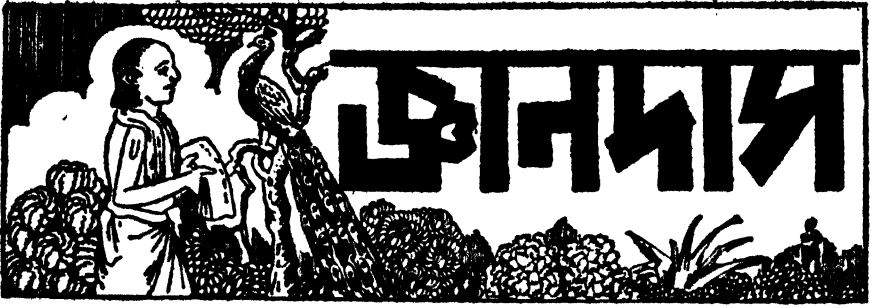
সাহিত্য সম্বন্ধে ইংলণ্ডের গৌরবের কাল এলিজাবেথ্ ও জেম্‌সের সময়। অনেকে বলেন, লূথর কৃত ধর্ম্মবিপ্লবের ফলে তৎকালীন সাহিত্যের এত উৎকর্ষ জন্মিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগকে ইউরোপীয় সাহিত্যের একটা উৎকৃষ্ট সময় বলা যাইতে পারে। অনেকে তৎকালীন সাহিত্যের উন্নতিকে ফরাশী রাজবিপ্লবের ফল বিবেচনা করেন। ফরাশী রাজবিপ্লব, কেবল রাজকীয় বিপ্লব নহে—ধর্ম্মবিপ্লবও বটে। তবে কি ধর্ম্মবিপ্লবে সাহিত্য সৃষ্ট হয়? ধর্ম্মের সঙ্গে সাহিত্যের সেরূপ নিকট সম্বন্ধ নহে। কিন্তু মানব হৃদয়ের বন্ধনমুক্ত হইলে, তাহার গতি বেগবতী হয়। ধর্ম্মের উৎসাহে হৃদয় চঞ্চল হইলে হৃদয়ের গতি বেগবতী হয়। সামাজিক হৃদয়ের গতি বেগবতী হইলে, উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। অতএব ধর্ম্মবিপ্লবের ফলে কখন কখন উৎকৃষ্ট সাহিত্যের উদয় হইয়া থাকে।

চৈতন্যদেবের ধর্ম্মবিপ্লবের ঐরূপ ফল ফলিয়াছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্ত্তৃক যে বহু গ্রন্থযুক্ত সাহিত্য শাস্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা অনেকে অবগত নহেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকার সম্প্রদায়, বহুসংখ্যক—তন্মধ্যে অনেকে সুপণ্ডিত, এবং সুলেখক। নদীয়ার ন্যায়শাস্ত্র, বৈষ্ণবদিগের সাহিত্য, বাঙ্গালার ব্যবস্থাশাস্ত্র, এবং আধুনিকী সুশিক্ষা, এই চারিটী বাঙ্গালির গৌরব।

বৈষ্ণব সাহিত্য বলিতে কেবল চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী গ্রন্থ বুঝায়, এমত নহে। গীতগোবিন্দাদি বৈষ্ণব গ্রন্থ বটে, কিন্তু চৈতন্যদেবের বহুপূর্ব্বে লিখিত। চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বৈষ্ণব কাব্য সকলের বাহুল্য দেখিয়া বোধ হয়, কৃষ্ণ ভক্তি চৈতন্যদেবের পূর্ব্বেই বাঙ্গালায় বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু অধিকাংশ বৈষ্ণব-গ্রন্থ চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি কবি সংস্কৃতে, কতকগুলি ভাষায় লিখিয়াছেন। যাঁহারা সংস্কৃতে লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থাবলীর বৃত্তান্ত, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন, বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করিতেছেন। যাঁহারা

ভাষায় লিখিয়াছেন, তাঁহারা সংস্কৃত লেখকদিগের অপেক্ষায়, পাণ্ডিত্যে লঘু হইতে পারেন, কিন্তু কবিত্বে নহেন।

কয়েকজন বৈষ্ণব কবি কেবল ভাষায় গীত প্রণয়ন করিয়াছেন। বৈষ্ণবেরা সেই গীতগুলিকে "মহাজনি পদ" বলেন। বঙ্গদেশে কীর্ত্তন বলিয়া তাহা অদ্যাপি গীত হইয়া থাকে—কিন্তু কদর্য্য "ঢপের" প্রভাবে, সে সকলের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই। কদাচিৎ যাত্রাকরেরা ঐ সকল পদ গীত করে, তজ্জন্য উহার প্রতি অনেকের অভক্তি।

যাহার প্রতি আমাদের ঘৃণা আছে, সে যাহা করে, সে কার্য্য উত্তম হইলেও তাহার প্রতি আমাদের ঘৃণা হয়। কুপথগামিনী স্ত্রীলোকে গীতবাদ্য করে বলিয়া এদেশে কোন ভদ্রলোকের কন্যা গীতবাদ্য শিক্ষা করিতে চাহেন না। অতি অল্পকাল হইল, সচরাচর সামান্য লোকে বাঙ্গালা লিখিত বলিয়া, বিশিষ্ট লোকে বাঙ্গালা লিখিতে ঘৃণা করিতেন। বাঙ্গালা গ্রন্থপড়া সম্বন্ধে ঐরূপ ঘৃণা অনেকের আজিও আছে। ধনী এবং বিশিষ্ট লোকে পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কোন নূতন প্রথা অবলম্বন করিলে, ইতর লোকে তাহার অনুকরণ করে; ইতর লোকে তাহার অনুকরণ আরম্ভ করিলেই বিশিষ্ট লোকে সে প্রথা পরিত্যাগ করেন। যে ঘৃণার্হ, তাহার সংস্পৃষ্ট বস্তু নির্দ্দোষ হইলেও আমরা তৎপ্রতি ঘৃণা করি। মহাজনি পদ, এক্ষণে নেড়া বৈরাগীর সামগ্রী, তাহারা ঐ সকল পদ গাইয়া দুই চারি পয়সা ভিক্ষা করে। সুতরাং উহা মালা, কণ্ঠী, ঝুলি, বৈষ্ণবী এবং কৌপীনের সঙ্গদোষে ঘৃণার্হ হইয়া পড়িয়াছে।

বাস্তবিক কি উহা ঘৃণার যোগ্য? বলিতে পারি না। বাঙ্গালি বাবুর প্রকৃতি আমরা বুঝিনা,—যাহা ঘৃণ্য তাহাতেই তাঁহার আদর, যাহা আদরণীয়, তাহাতেই তাঁহার ঘৃণা। সুতরাং বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতিও তাঁহার ঘৃণার যোগ্য। তবে, বাঙ্গালিকুলে এমন দুই একজন কুলাঙ্গার জন্মিয়াছেন, যে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির কবিতা তাঁহাদিগের ভাল লাগে। তাঁহাদিগের জন্য আমরা বৈষ্ণবদিগের দুই একটা গীত উদ্ধৃত করিব।

বৈষ্ণবকবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, ও গোবিন্দ দাস সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবি বলিয়া খ্যাত, এজন্য তাঁহারা কতক পরিচিত। সুপরিচিতের পরিচয় দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আরও কয় জন কবি আছেন, তাঁহাদিগের রচনা সচরাচর তত উৎকৃষ্ট নহে; তাঁহারা তত বিখ্যাতও নহেন। অথচ তাঁহারা অনেকেই সুকবি বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। তাঁহাদিগেরই দুই চারিটি কবিতা উদ্ধৃত করিব।

এই প্রবন্ধে, জ্ঞানদাসের কবিতা উদ্ধৃত হইতেছে। জ্ঞানদাস কে, তাঁহার

কোথায় নিবাস, তিনি কোন্ শ্রেণীর লোক ছিলেন, কোন্ সময়ে লিখিয়াছেন, তাহা আমরা জানিনা। অন্যে জানিতে পারেন—আমাদিগের তত অনুসন্ধান নাই। আমরা তাঁহার কয়েকটি গীত পদকল্পতরু হইতে উদ্ধৃত করিলাম। পদকল্পতরু মধ্যে কোন কবির উৎকৃষ্ট কবিতার সন্ধান করা আর সমুদ্র মধ্যে রত্ন বিশেষের সন্ধান করা তুল্যকথা। অনেক কর্দ্দম, শম্বুকাদি বাছিয়া একটি রত্ন পাইতে হয়। বৈষ্ণব কবিদিগের সকল রচনা উত্তম নহে। পদকল্পতরু সঙ্কলনের কোন নিয়ম নাই—কোথায় কোন্ বিষয়ক গীত পাওয়া যাইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই। আবার অনেক গীতের পাঠভ্রষ্ট হইয়াছে দেখা যায়। কোন্ কবির কোন্ গীত, তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য "ভনিত" ভিন্ন অন্য উপায় নাই—কিন্তু সকল গীতে "ভনিত" নাই—সকল গীতের প্রকৃত ভনিত পদকল্পতরুতে লিখিত হয় নাই। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। নিম্নলিখিত গীতটি বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রাচীন পদ্যাবলী নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা

জনম অবধি হম, রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনমু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥
কত মধু যামিনী, রভসে গোয়াইনু
না বুঝনু কৈছন না কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।
কত কত রসিক জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না দেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক ॥

এক্ষণে পদকল্পতরু হইতে উদ্ধৃত পাঠ দেখুন।

জনম অবধি হৈতে, ও রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেলা।
লাখ লাখ যুগ হম, হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে,
হৃদয় জুড়ান না গেলা।
বচন অমিয় রস অনুক্ষণ শুনমু
শ্রুতপথে পরশ না ভেলি।
যত মধু যামিনী রভসে গোঙায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
কত বিদগধ জন রস অনুমোদই
অনুভব কাহু না দেখি।
কহ কবি বল্লভ, হৃদয় জুড়াইতে,
মিলয়ে কোটিয়ে একি ॥

পদকল্পতরুতে পাঠের বিলক্ষণ বিকৃতি ঘটিয়াছে—উৎকৃষ্ট কবিতার উৎকর্ষ রক্ষিত হয় নাই। তাহা যাউক—বিদ্যাপতির গীত, বল্লভ কবির ভনিত বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। অতএব পদকল্পতরুর উপর নির্ভর করা সন্তোষজনক নহে।

যাহা হউক—পদকল্পতরু ভিন্ন অধিক গীত সংগ্রহ আর কিছুতে নাই। আমরা পদকল্পতরু হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি।

জ্ঞানদাস প্রথম শ্রেণীর কবি নহেন। তথাপি আদরণীয়। কিন্তু তাঁহার

কবিতা মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। সেই দোষের জন্য নিম্নলিখিত কবিতাটির শেষাংশ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না—

মনের মরম কথা, তোমারে কহি যে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে, শ্যামল বরণ দে,
তাহা বিনা আর কার নই॥
রজনী শাঙন* ঘন, ঘন দেয়া গরজন,
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিদ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল,
কোকিল কুহরে কুতুহলে।
ঝিঁঝাঝি ঝিনিকি বাজে, ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেন কালে॥

মরমে পৈঠল স্নেহ হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত
ধিক রহুঁ কুলের কামিনী॥
রূপ গুণে রস সিন্ধু মুখছটা যেন ইন্দু,
মালতির মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে, গায়ে হাত দেই ছলে,
আমা কিনা বিকাইনু বোলে॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ, ভূষণ ভূষিত অঙ্গ
কাম মোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়,
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥

উৎকৃষ্ট বলিয়াই, এ কবিতাটি উদ্ধৃত হইল না। ইহার গুণ আছে, কিন্তু গুরুতর দোষও আছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের রচনায়, অপ্রাকৃত বর্ণনা দোষ তাদৃশ দেখা যায় না—ভারতচন্দ্রাদি আধুনিক কবিদিগের রচনায় সে দোষ লক্ষিত হয়। "নিদ যাই মনের হরিষে" শ্রাবণ রজনীতে, বৃষ্টির সময়ে "কোকিল কুহরে কুতুহলে" "ডাহুকী সে গরজে" এগুলি আধুনিক কবির লক্ষণ। আবার

"মরমে পৈঠল স্নেহ হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।"

এগুলি প্রাচীন কবির উক্তির ন্যায় শুনায়। নিম্নলিখিত গীতে অপ্রাকৃত বর্ণন নাই—

ও চাঁদ মুখের মধুর হাসনি
সদাই মরমে জাগে।
মুখ তুলি যদি ফিরিয়া না চাহ
আমার শপথি লাগে॥
তোমার অঙ্গের পরশে আমার
চিরজীবী হোক তনু।
জপ তপ তুঁহু সকলি আমার
করের মোহন বেণু॥
দেহ গেহ সার সকলই আমার
তুমি সে নয়ন তারা।

আধ তিল তোমা না দেখিলে সব
বাসি আমি আঁধিয়ারা॥
এত পরিহারে, করিয়ে তোমারে
মনে না ভাবিহ আন॥
করজ লিখিয়ে, লেহ যে আমায়,
দাস করি অভিমান॥
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরী
এ কোন ভাব যুবতী।
কানু সে কাতর সদয় হইয়া
কেননা করহ প্রীতি॥

* শ্রাবণ

বৈষ্ণবদিগের কবিতা, সকলই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক, অন্য বিষয়ক কবিতা পাওয়া যায় না। ইহা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে, তাঁহাদিগের গুণ এই যে তাঁহারা রাধাকৃষ্ণোপলক্ষে সাধারণ মানব হৃদয় চিত্রিত করিয়াছেন। মনুষ্য হৃদয়ের সঙ্গে মনুষ্য হৃদয়ের যে নিত্য সম্বন্ধ তাহারই অভিব্যক্তি কবিতার বিষয়—যাঁহারা রাধাকৃষ্ণ নামে বিরক্ত, তাঁহারা উক্ত নামদ্বয়ের স্থলে ক ও খ আদেশ করিয়া পাঠ করুন, কোন ক্ষতি হইবে না। আর যখন রাধাকৃষ্ণ বাঙ্গালি জাতির অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, তখন তৎপ্রতি বিরক্ত হইয়া, জাতীয় কবিতায় জাতীয় চরিত্র নিরীক্ষণে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না—দেহ কাটিয়া শরীর তত্ত্ব না জানিলে চিকিৎসক হওয়া যায় না। এ কথা স্মরণ রাখিয়া, পাঠকেরা নিম্নলিখিত গীত কয়টি পাঠ করুন।

নিজ পরসঙ্গ* স্বপনে না করে
আনে না পাতয়ে কান।
দিঠে দিঠে বহে, নিমিখ না বহে,
নিরখে মঝু বয়ান॥
সই—কিনা সে বঁধুর পিরীতি কি রীতি
কহিতে কহিব কি।
সো সব চরিতে, কত উঠে চিতে,
পরাণ নিছনি দি।
ক্ষণে ক্ষণে তনু পুলকে আকুল,
তিলেক না ছাড়ে সঙ্গ।
হাসির মিশালে, রসের আলাপ
অমিয়া সিনায় অঙ্গ॥
এত করি মোরে আগরোয় কোরে
রঙ্গয়ে বেশ বিশেষ।
জ্ঞানদাস কহে ধনি ধনী সেই,
যাহে এ পীরিতি লেশ॥

পুনশ্চ,

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীত বাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া, বাউল হইয়া,
তখন সে দিগে ধায়॥
লাখ কামিনী, ভাবে রাতি দিনি,
সে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে, আহীর নাগরী
পীরিতে বান্ধল তায়॥

পুনশ্চ,

যবে দেখাদেখি হয়, হেন তার মনে লয়,
নয়নে নয়নে মোরে পিয়ে।
পীরিতি আরতি দেখি, হেন মনে লয় সখি,
আমি তারে চাহিলে সে জিয়ে॥
আহা মরি মরি মুহি কি করব আরতি।
কি দিয়ে শোধিব শ্যাম বন্ধুর পীরিতি॥
রসিয়া নাগর যে, নিতুই দুয়ারে সে
বিনা কাজে কত আসে যায়।
জ্ঞানদাস তবে কয়, তোমার চরিত লয়,
তাহা তুমি কহিবে কি কায়॥

পুনশ্চ,

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়ে,
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়॥
আলো সই সে জন মানুষ নয়।

* প্রসঙ্গ

তাহার সঙ্গে যে পীরিতি করয়ে
কি জানি কি তার হয় ॥
সহজে রসের আকার সে যে
ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে বসন উড়িতে আপন
অঙ্গে ঠেকাইয়া যায় ॥
চমক চলনী ওগিম দোলনী
রমণী মানস চোর।
জ্ঞানদাস কহে, সোপিয়া পীরিতি
মরমে পশিল মোর ॥

ভাবান্তরে—

সুখের লাগিয়ে, এ ঘর বাঁধিনু,
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল ॥
সখি হে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
রবির কিরণ দেখি ॥
নিচল ছাড়িয়া উঠল উঠিতে
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দরিদ্র বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে ॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে, কানুর পীরিতি
মরণ অধিক শেল ॥

ছন্দঃ পরিপাট্য হেতু নিম্ন লিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত করা গেল।

দেখবি সখী শ্যামচন্দ
ইন্দুবদনী, রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র যুবতী বৃন্দ
গাওয়ে রাগ মালিকা ॥
মন্দ পবন কুঞ্জ ভবন
কুসুম গন্ধ মাধুরী।
মদন রাজ নব সমাজ
ভ্রমর ভ্রমণ চাতুরী ॥
তরল তাল গতি দুলাল
নাচে নটিনী নটন সুর।
প্রাণনাথ করত হাত
রাই তাহে অধিক পুর ॥
অঙ্গে অঙ্গে পরশে ভোর,
কেহু রহত কাহুক কোর
জ্ঞান দাস কহত রাস
যৈছন জলদে বিজুরি জোর ॥

আরও একটি গীত উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইব।

মন্দির মাঝে বৈঠল বর সুন্দরী
দিনকর দুপর ঠানে।
যব হাম পুছনু, পীরিতি সম্ভাষণ,
প্রেমজল ভরল নয়ানে ॥
মাধব তুয়া অনুরাগিণী রাধা।
তুয়া পর সঙ্গে অঙ্গ সব পুলকিত
না মানয়ে গুরুজন বাধা ॥
ভাবে ভরল তনু, পুন পুন কম্পিত
পুন পুন শ্যামরি গোরি।
পুন পুছত পুন দিগ নেহারত
ভূমে সুতয়ে পুন বেরি ॥
কুন্তল কবরী, উরহি লোটায়ত
কোরে করত তুয়া ভানে।
জ্ঞানদাস কহে, তুঁহু ভালে সমুঝত
কেনে করব চিত আনে ॥

একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। বিদ্যাপতি যে ভাষায় গীত রচনা করিয়াছেন, তাহা আধুনিক বাঙ্গালা হইতে বিভিন্ন—হিন্দীর সদৃশ। অনেকে বলেন ইহাই প্রাচীন বাঙ্গালা। কেহ কেহ বলেন তাহা নহে, মাধুর্য্য হেতু

বিদ্যাপতি প্রভৃতি বাঙ্গালায় হিন্দী মিশাইয়াছেন। কোন কোন আধুনিক লেখকও কদাচিৎ ঐ ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন, ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন বিদ্যাপতিও সেইরূপ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রেরও দুই একটি গীতে ঐ হিন্দী মিশান ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন কবি, কবিকঙ্কণের ভাষায় হিন্দী নাই বলিলেই হয়। দেখা যাইতেছে জ্ঞানদাসের কতকগুলি গীত প্রচলিত ভাষায় লিখিত। আবার কতকগুলি গীতে বিদ্যাপতির ভাষা অনুকৃত হইয়াছে। অতএব কোন কোন কবি যে ইচ্ছাপূর্ব্বক বাঙ্গালায় হিন্দী মিশাইতেন, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এমন সিদ্ধান্তও করা যায় নাই যে বিদ্যাপতির ভাষা কৃত্রিম। ভারতচন্দ্র বা জ্ঞানদাসের হিন্দী বা ব্রজভাষা, ছদ্মবেশী বাঙ্গালা, ইহা স্পষ্ট দেখা যায়—কোনস্থলে বুঝিবার কষ্ট নাই। বিদ্যাপতির ভাষা অনেকস্থানে একেবারে বুঝা যায় না। বোধ হয় বিদ্যাপতির ভাষা প্রকৃত—তিনি মাধুর্য্যের বাসনায় হিন্দীর অনুকরণ করেন নাই। তবে ভারতচন্দ্র, জ্ঞানদাস প্রভৃতি মাধুর্য্য হেতু, তাঁহার ভাষার অনুকরণ করিয়াছেন।

প্রথম প্রস্তাব—ভূবৃত্তান্ত

বিশেষ রাজবংশ বা ঘটনাবলীর নামমালা ইতিহাস বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না। মানবজীবন বা তৎসমষ্টির আবির্ভাব, উন্নতি ও অবনতি এবং তাহার পুনরুদয় ও তদানুষঙ্গিক বৃত্তি সমুদয়ের যথার্থ প্রতিকৃতি যদ্দারা প্রদর্শিত হয়, তাহাই ইতিহাস পদে বাচ্য হইতে পারে। যথায় এরূপ কোন ইতিহাসের অভাব, তথায় যত কিছু সেই অভাব বিমোচক বলিয়া পরিচিত হয়, তাহার মধ্যে স্বভাব-তত্ত্ববিদ্ সুচতুর লেখকের লেখনীনিঃসৃত কাব্য এবং উপন্যাস আদরণীয়।

রামায়ণ প্রণেতা বাল্মীকি কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা আপাততঃ উদ্দেশ্য নহে। তিনি যে সময়েই জন্মিয়া থাকুন, ইহা বোধ হয় নিশ্চিত, যে সেই সময়ের ইতিহাস ধারাবাহিকরূপে সংগ্রহ হইয়া আমাদের হস্তে পৌঁছে নাই। এস্থলে তাঁহার প্রণীত রামায়ণ অনেক অভাব বিমোচনে সমর্থ। এই বিবেচনায় রামায়ণের প্রথম দুই কাণ্ড অবলম্বন করিয়া, প্রথমতঃ তৎসময়ে ভারতের কোন কোন ভূভাগ আর্য্যগণের পরিচিত ছিল, কাল পরিবর্ত্তে তাহাদের কিরূপ অবস্থান ও নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং অতি পুরাতন সময়ে উহারা কোন্ বিশেষ নামধারী ও কিরূপ ছিল, ইহাই যথাকথঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। অতএব এই রেলওয়ে টেলিগ্রাফময়ী, পরিষ্কার ভূভাগ বিশিষ্টা ইংরাজি ভারতকে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিস্মৃত হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে সেই অনার্য্য নিপীড়িত তপোবনময়ী ভারতমাতার পূর্ব্বমূর্ত্তি মনোমধ্যে অঙ্কিত করা যাউক। এখন দেখা যাউক দশরথ তনয় রামচন্দ্র কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া বিশ্বামিত্র সহ মিথিলাবাসী জনকরাজ ভবনে গমন করিতেছেন।

"অযোধ্যা হইতে নির্গত হইয়া, অর্দ্ধাধিক যোজনেরও (১) অধিক পথ

(১) অর্দ্ধাধিক যোজনং ষট্‌ক্রোশমিতি। রামানুজঃ।

অতিক্রম করিয়া, সরযূর (২) দক্ষিণ তীরে বিশ্রাম করিলেন। তথা হইতে ক্রমাগত আসিয়া গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। ইহা অঙ্গদেশ। এরূপ প্রবাদ প্রচলিত যে অনঙ্গ হর কোপানলে এখানে অঙ্গ বিহীন হওয়ায় এ প্রদেশের নাম অঙ্গদেশ হইয়াছে। এই সঙ্গমে গঙ্গা পার হইয়া কতকদূর যাইয়া দক্ষিণতীরে জনশূন্য ভীষণ বনদেশ অতিক্রম করিতে হয়।" সেই বন সম্বন্ধে

"—বনমিদং দুর্গং ঝিল্লিকাগণ সংযুতং।
ভৈরবৈঃ শ্বাপদৈঃ কীর্ণং শকুন্তৈ দারুণারবৈঃ।
নানা প্রকারৈঃ শকুনৈর্বাশ্যদ্ভির্ভৈরবস্বনৈঃ।
সিংহব্যাঘ্রবরাহৈশ্চ বারণৈশ্চাপি শোভিতম্।"

১ কাণ্ড—২৪ সর্গ।

পূর্ব্বে এই স্থানে মলদ ও করূষ (৩) নামে দুই জনপদ ছিল। তাড়কা এবং তাহার পূর্ব্বাগত বংশাবলী দ্বারা উহা জনশূন্য হইয়া অরণ্যময় হইয়াছে। তথা হইতে শোনা অথবা মাগধী (৪) এতন্নামধারিণী নদী পার হইয়া, যথায় এই নদী পঞ্চপর্ব্বতমধ্যে মালিকার ন্যায় শোভমানা, সেই গিরিব্রজ (৫) নগরে উপনীত হইলেন। তথা হইতে গঙ্গার ধারে ধারে ঋষিগণের আশ্রম অতিক্রম করিয়া গঙ্গা পার হওনানন্তর বিশালা (৬) প্রাপ্ত হইয়া, তথায় অবস্থান পূর্ব্বক, জনকের রাজ্য মিথিলায় (৭) উপস্থিত হইলেন।"

---

(২) অযোধ্যায়াঃ পশ্চিমভাগমারভ্য উত্তরদিগ্ভাগেন পূর্ব্বভাগমাগত্যাঙ্গদেশে গঙ্গায়াং সঙ্গচ্ছতে।
রামানুজঃ।

বৈদিক উল্লেখ—"সরস্বতী সরযূঃ সিন্ধুরূর্ম্মিভির্মহো মহীরবসা যন্তু বক্ষণীঃ।" ঋঃ বেদ ১০ মঃ।
Barabos of the Greeks.

(৩) চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ানও এই স্থলে মহারণ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। হিউয়েন সাং এখানে মহাসরঃ (Mo. ho. so. lo.) নামক প্রদেশ দেখিয়াছেন। অতএব ফাহিয়ানের পরেই উহা পুনরধিবেশিত হইয়াছে। মহাসরঃ প্রদেশের রাজধানী ঐ নামধারী একটি নগর। "আরার ৩ ক্রোশ পশ্চিমে মাসার গ্রামে প্রাচীন মহাসরঃ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।" —Cunningham. এক্ষণে প্রতীত হইতেছে যে মলদ ও করূষ নামক এই দুই জনপদ এবং তৎপরবর্ত্তী তাড়কার জঙ্গল যথায় ছিল, তথায় বর্ত্তমান আরা জেলা হইয়াছে।

(৪) শোণনদস্যৈব শোণা ইত্যপি নামেত্যাহুঃ॥ রামানুজঃ।

(৫) গিরিব্রজের স্থান রামায়ণে যেরূপ কথিত হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান দানাপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নিরূপিত হইতে পারে।

(৬) গঙ্গার উত্তর এবং গণ্ডকী নদীর পূর্ব্বদিকস্থ ভূভাগের নাম বিশালা। "প্রাচীন বিশালা নগরের বর্ত্তমান নাম বিসার।"—Cunningham.

(৭) রামায়ণ অনুসারে বিশালার পরেই মিথিলারাজ্য। হিউয়েন সাঙের সময়, গঙ্গার উত্তর হইতে সমুদয় প্রদেশ ব্রিজি (Fo. li. shi.) নামে খ্যাত হইয়াছিল। বিশালা তখন ইহার একটি উপবিভাগ মাত্র। ব্রিজি, তখন তিন প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছিল, যথা—১। বৈশালি অর্থাৎ বিশালা, ২। তীরভুক্তি, ৩। ব্রিজি অথবা বিধারি। অধিবাসিগণের সাধারণ নাম ব্রিজি হইয়াছে। সম্বব্রিজিও বলিত

প্রথমতঃ এই পথ বর্ণনে দেখা যাইতেছে যে যাহাকে মগধ দেশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহার মধ্য দিয়া আসিয়াও, মগধ এই নামধারী কোন দেশের নাম উল্লেখ করা হইল না।

দ্বিতীয়তঃ আর একটি বিষয় জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। পথবর্ণনে বলা হইয়াছে যে শোননদ পার হইয়া, ঋষিগণের আশ্রম অতিক্রম করিতে করিতে তারপর গঙ্গা পার হইয়া, উহার উত্তরে বিশালা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতৎ সম্বন্ধে গণ্ডকী নদী পার হওয়া বা তাহার নাম মাত্র উল্লেখ নাই। গঙ্গা পার হওনানন্তর যদি গণ্ডকী পার না হইয়া বিশালা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই পাটনায় না হউক পাটনার অতি অল্প দূরেই গঙ্গা পার হইতে হয়। বুদ্ধের সমকালিক অজাতশত্রু যৎকালে কুসুমপুর নগর স্থাপন করেন, যাহার নাম ক্রমে পাটলিপুত্র এবং পরে পাটনা হইয়াছে, তৎকালে উহার চতুর্দ্দিকে সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। এই পথবর্ণনে বাল্মীকি যখন বরাবর অভ্রান্ত ভাবে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছেন, তখন এখানেও যে ভ্রম হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন ইহা গ্রাহ্য করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তিনি প্রথমতঃ গণ্ডকীর নাম মাত্র করেন নাই, দ্বিতীয়তঃ গঙ্গার দক্ষিণ তীরে তপোবন ভিন্ন, কুসুমপুর বা কোন জনপদের

(San. fa. shi. of Hwen Thsang। আবার এই সাধারণ নামধারী জাতি অনেক উপবিভাগে বিভক্ত ছিল, তৎসম্বন্ধে কনিংহাম বলেন "I infer that the Vrijis were a large tribe, which was divided into several branches namely, the Lichhavis of Vaisalis, The Vaidehis of Mithila, the Tiravuctus of Trihoot. &c. Either of these divisions separately might therefore be called Vrijis, as well as Sam-Vrijis or the United Vrijis." রামায়ণে লিখিত বিবরণ হইতে এই পরিবর্ত্তন কতদিনের, এবং রামায়ণের সঙ্গে ইহার কি সম্বন্ধ আছে তাহা দেখা যাউক। কনিংহাম স্থানান্তরে বলিতেছেন "Ajatasatru of Magadha, wishing to subdue the great and powerful people of Wajji, sent his minister to consult Buddha as to the best means of accomplishing his object." এই Wajji কাহারা, তৎসম্বন্ধে "Vrijis which has already been identified as the territory of the powerful tribe of Wajji or Vrijis." এই ব্রিজিদিগের অষ্টকুল ছিল, তৎসম্বন্ধে কনিংহাম "Eight clans, who as Buddha remarked, were accustomed to hold frequent meetings" &c. তাহার পর এই অষ্টকুলের বাসস্থান সম্বন্ধে উক্ত পণ্ডিত যাহা বলেন ("There are several ancient cities, some of which may possibly have been the Capitals of eight different clans of the Vrijis, of these—Vaisali, Kesariya, and Janakapore have already been noticed; the others are Navandgarh, Simrun, Durbhunga, Puraniya and Mithari. The last three are still inhabited. And well known.") তাহাতে জানা যায় যে পরে, রামায়ণে যেরূপ বর্ণিত, এরূপ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। রামায়ণে পূর্ব্বকথিত বৃত্তান্ত সমূহের বিন্দু বিসর্গ মাত্র নাই। আবার যদি কনিংহামের বৃত্তান্ত অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে হিউয়েন সাং যাহা দেখিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব স্বয়ংই তাহা দেখিয়াছেন। ইহাতে এরূপ অনুমান হয় যে উক্ত পরিবর্ত্তন, রামায়ণ প্রণেতার পরে এবং বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে।

কথা কিছু মাত্র বলেন নাই। অধিকন্তু তাড়কার দৌরাত্ম্য প্রসঙ্গে, সেই সকল তপোবন অনার্য্য পীড়িত বলিয়া অনুমিত হয়। তবে কি এই পথ নির্দ্দেশ যৎকালে রচিত হয়, কুসুমপুর তাহার পরে স্থাপিত হইয়াছে?

পিতৃসত্য পালনার্থে রামের বনগমন প্রসঙ্গে অযোধ্যা হইতে চিত্রকূট (৮) পর্ব্বত পর্য্যন্ত বাল্মীকি এইরূপ পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"অযোধ্যা হইতে নির্গত হইয়া, দক্ষিণ মুখে আসিয়া তমসা (৯) নদী পার হইয়া, কোশল দেশের (১০) সীমা সন্নিকট করিয়া, বেদশ্রুতি নদী (১১) পার হওনানন্তর দক্ষিণ মুখে গিয়া, গোমতী নদী (১২) পার হইলেন। তথা হইতে স্যন্দিকা নদী (১৩) পার হইয়া কোশলদেশ অতিক্রম করিলেন। তথা হইতে গমন করিয়া নিষাদরাজ গুহ কর্ত্তৃক শাসিত শৃঙ্গবপুর (১৪) প্রাপ্ত হইলেন। তথায় গঙ্গা পার হইয়া বৎস দেশ (১৫) তথা হইতে প্রয়াগাভিমুখে গমন করিলেন। সেখান হইতে পশ্চিম মুখে যমুনার (১৬) তীর বাহিয়া কতকদূরে গিয়া, নদী পার হইয়া দশ ক্রোশ অন্তরে চিত্রকূট পর্ব্বত প্রাপ্ত হইলেন।"

---

(৮)। বুন্দেলখণ্ডের কামতা পাহাড় বিন্ধ্যাচলের শাখা। এখানে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিনদী আছে, তাহার একটির নাম মন্দাকিনী, যথায় রাম পিতৃপিণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন।

(৯) সরযূ ও গোমতীর মধ্যবর্ত্তী যে গণনীয় নদী। River Tons.

(১০) দক্ষিণ কোশলের দক্ষিণ সীমা।

(১১) তমসা ও গোমতীর মধ্যবর্ত্তী একটি সামান্য স্রোতস্বতী।

(১২) ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে এক গোমতীর কথা আছে। "এষো অপশ্রিতো বলো গোমতীমব তিষ্ঠতি।" এ এই গোমতী কি না? মুরসাহেব কর্ত্তৃক উদ্ধৃত Professor Roth সাহেবের সিদ্ধান্তে জানা যায় যে এই শ্লোকেতে কথিত গোমতী সিন্ধু নদের একটি শাখা। আবার মুরসাহেব স্বয়ং বলেন "There is a stream called Gomati in Kumaon, which must be distinct from the River in Oudh, as the latter rises in the plains."

—Sanskrit Texts. Vol II.

(১৩) "কোশলদেশস্য দক্ষিণ সীমায়াং"। রামানুজঃ

সুতরাং হিউয়েনসাঙ্গের সাময়িক সাই (Sai) নদী।

(১৪) "এতদ্বিনাশনম্ নাম সরস্বত্যা বিনাশস্থিতিঃ দ্বারম্ নিষাদরাষ্ট্রস্য।"—মন্ত্রব্রাহ্মণ।

Quoted by Muir.

স্যন্দিকা ও গঙ্গার মধ্যে প্রয়াগের বাম পর্য্যন্ত শৃঙ্গবের পুর। এই স্থানে সরস্বতী গঙ্গা, যমুনা এই তিনের সঙ্গমে প্রয়াগ হইয়াছে। সরস্বতী পূর্ব্বো মন্ত্রব্রাহ্মণোক্ত শ্লোক দ্বারা স্থান নির্দ্দেশ নিশ্চয়রূপে হইতেছে। সরস্বতী কি এপর্য্যন্ত কখন প্রবহমানা ছিলেন?

(১৫) প্রয়াগের পশ্চিম হইতে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূমি; এইস্থানে রত্নাবলী নাটকের নায়ক বৎস-রাজার স্থান। এখানকার রাজারা পুরুষানুক্রমে বৎসরাজা নামে আখ্যাত হইতেন।

(১৬) "আবদিন্দ্রং যমুনা"—ঋঃ বেদ।

Jomanes of Pliny.

এই পথের অধিকাংশ বনভূমি। শৃঙ্গবের পুরে গঙ্গাপার হইয়া, রাম আশঙ্কা প্রযুক্ত লক্ষ্মণকে কহিতেছেন।

"নহি তাবদতিক্রান্তাঽসুকয়া কাচনক্রিয়া।
অদ্য দুঃখন্তু বৈদেহী বনবাসস্য বেৎস্যতি ॥
প্রণষ্টজনসম্বাধং ক্ষেত্রারামবিবর্জ্জিতং।
বিষমঞ্চ প্রপাতঞ্চ বনমদ্য প্রবেক্ষ্যতি ॥"

২য় কাণ্ড—৫২ সর্গ।

বাল্মীকি চিত্রকুট পর্য্যন্ত সুন্দররূপে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তথা হইতে রামের দক্ষিণে গমনের পথ সেরূপ করেন নাই। কোন জনপদের উল্লেখ মাত্র নাই। কেবল রাক্ষস ও ভয়ঙ্কর জন্তুবর্গ সঙ্কুল ভীষণ বনদেশের মধ্য দিয়া রামকে লইয়া গিয়াছেন। বৃক্ষাবলীর ছায়ায় চতুর্দ্দিক নিবিড় অন্ধকার, শ্বাপদকুল সুখে বিচরণ করিতেছে, তদপেক্ষাও ভয়ঙ্কর স্বভাবযুক্ত মনুষ্যমূর্ত্তি তাহাদের মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে কেবল দুই একটি সৌম্যমূর্ত্তি ঋষির আশ্রম দেখা যাইতেছে। এ ঘোরবনে, যথায় আর্য্যগণের বাসস্থান ক্ষণমাত্রও হইবার যোগ্য নহে, ইহারা কে? এই সকলে এইরূপ অনুমান হয়, যে বাল্মীকির সময়েতেও আর্য্যগণ বিন্ধ্যাচল লঙ্ঘন করিয়া দাক্ষিণাত্য করতলগত করিতে সম্যক্‌রূপে অগ্রসর হয়েন নাই। বিন্ধ্যাচল তখন কেবল তাঁহাদের যাতায়াতের নিমিত্ত অগস্ত্য সমীপে প্রণত হইয়া উন্নত দেহ সঙ্কোচ করিতেছেন। সেই বনস্থল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ প্রচারকগণ কেবল তখন প্রেরিত হইয়াছেন। পশুবৎ অসভ্য আদিম অধিবাসিগণ তাহাদের অধিকারে ভিন্ন প্রকৃতির লোক দর্শন করিয়া, ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাহাদের উচ্ছেদ সাধনে ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে।

এই সকল বনভূমি ভেদ করিয়া যাওয়া কিরূপ ভয়ঙ্কর ও কষ্টসাধ্য, তাহা আর্য্যজনপদের বহু নিকটবর্ত্তী, এমন কি দ্বারস্থ, চিত্রকুট পর্ব্বতে, প্রয়াগ হইতে রামের গমনকালে, ভরদ্বাজ ঋষি পথের যে অবস্থা বর্ণন করিয়া রামের আশঙ্কা দূর করিতেছেন, তাহাই তুলনা করিয়া দেখিলে অনুভব করা যাইবে। প্রথমে যমুনা পার হইতে হইবে কিরূপে তাহা কহিতেছেন—

"তত্র যূয়ং প্লবং কৃত্বা তরতাংশুমতীং নদীং।"

২ কাণ্ড—৫৫ সর্গ

তৎপরে যমুনা হইতে চিত্রকূট পর্য্যন্ত পথের অবস্থা কিরূপ, তাহা কহিতেছেন
"রম্যোমার্দবযুক্তশ্চ দাবৈশ্চৈব বিবর্জ্জিতঃ।"
২ কাণ্ড—৫৫ সর্গ।

রাম বিরহে দশরথের মৃত্যু হইলে, ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনয়নার্থে অযোধ্যা হইতে যে দূত প্রেরিত হয়, তাহার গমন প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মত পথ বর্ণন আছে। রামায়ণের টীকাকার কহেন যে এই পথ লোক গতায়াতের সাধারণ পথ নহে। ভরতকে শীঘ্র সংবাদ দেওয়ার অনুরোধে, দূত জল জঙ্গল ভাঙ্গিয়া সোজা পথে গিয়াছিলেন। "দূতাস্তু শীঘ্রং তন্নগর প্রাপ্তুয়ে কান্তার মার্গেণ গতাঃ।"

"অযোধ্যা হইতে পশ্চিম মুখে গমন করিয়া অপরতাল এবং প্রলম্ব দেশের (১৭) মধ্যে মালিনী (১৮) নদী পার হইয়া গমনানন্তর, পঞ্চাল দেশ (১৯) উত্তীর্ণ হইয়া, হস্তিনাপুরের নিকট গঙ্গা পার হইয়া, কুরুজাঙ্গলের (২০) মধ্যদিয়া শরদণ্ডা (২১) নামক নদী পার হইয়া, পশ্চিমে কুলিঙ্গ নগরে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে অভিকাল ও তেজোভিভবন নামক দুই নগর অতিক্রম করিয়া ইক্ষুমতী (২২) নাম্নী নদী পার হইলেন। তথা হইতে বাহ্লিক (২৩) দেশের মধ্য দিয়া, সুদামন

---

(১৭) হিউয়েন সাংয়ের সামরিক গোবিসনা ও মাদাবর কি? "গোবিসনা—কাশীপুরের দক্ষিণ ও বরেলির উত্তর। এবং মাদাবর—বিজনোরের নিকট পশ্চিম রোহিলাখণ্ডের অংশ।"

—Cunningham's Map.

(১৮) Erineses of Megasthenes—Wentifed by Cunningham. এই নদী তটে কণ্বঋষির আশ্রমে শকুন্তলা সহ দুষ্মন্তের প্রথম মিলন হয়। এবং ইহারই তট বাহিয়া শকুন্তলা হস্তিনাপুরে গমন করেন।

(১৯) পঞ্চাল দুইভাগে বিভক্ত। উত্তর পঞ্চাল, বর্ত্তমান রোহিলাখণ্ড, প্রাচীন রাজধানী অহিচ্ছত্র। দক্ষিণ পঞ্চাল গঙ্গার দোয়াব, প্রাচীন রাজধানী কাম্পিল্য নগর। কিন্তু রামায়ণের সময় দক্ষিণ পঞ্চাল ছিল কি না? দ্বিতীয় প্রস্তাবে দেখ।

(২০) থানেশ্বর প্রদেশের মধ্যে।

(২১) বর্ত্তমান গোয়া নদী কি?

(২২) এ আবার কোন ইক্ষুমতী? অন্য ইক্ষুমতীর বৃত্তান্ত স্থানান্তরে দেখ। (দ্বিতীয় প্রস্তাবে।)

(২৩) এ কোন বাহ্লিক। কনিংহাম যে অনার্য্য বাহ্লিকজাতির কথা লিখিয়াছেন, এ তাহাই হইতে পারে। কারণ তাহা হইলে বাল্মীকিবর্ণিত পথের মধ্যে যথাস্থানে তাহাদিগকে পাওয়া যায়। জলন্ধরের দক্ষিণ পশ্চিম এবং লাহোরের প্রায় দক্ষিণ। এতৎ সম্বন্ধে কনিংহাম "Arian neighbours, who were very liberal in their abuse of the Taranian population of the Punjab. Thus the Kathaei of sangala are stigmatized in the Mohabharat as theiving Bahicas, as well as wine bibbers and beef-eaters.—" Ancient Geography Part I. "হ তে 'ল' যোগ রামায়ণের পুস্তক অনুলিপিকারগণের ভ্রম প্রমাদের ফল নহে ত? বাহ্লিক নামক স্বতন্ত্র দেশের বৃত্তান্ত দ্বিতীয় প্রস্তাবে দেখ।

নামক পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক বিপাশা (২৪) ও শাল্মলী নামক নদীদ্বয় দর্শন করিয়া গিরিব্রজ (২৫) নগরে উপনীত হইলেন।"

দূত প্রথমে শতদ্রু লঙ্ঘন না করিয়া কিরূপে বিপাশা প্রাপ্ত হইলেন? দূতের গমন হস্তিনাপুর হইতে কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া হওয়ায়, দেখা যাইতেছে যে দূত উত্তরমুখ গামী। ফিরোজপুরের উত্তর পশ্চিম কোণে শতদ্রু নদীর পূর্ব্বমুখ গামী একটি লুপ্ত পথ আছে। শতদ্রু রামায়ণের সময় কেবল সেই পথে প্রবহমানা ছিলেন, ধরিয়া লইলে, দূত যদি আরও খানিক উত্তরমুখে গিয়া কেকয় রাজ ভবনাভিমুখে যাত্রা করেন, তাহা হইলে শতদ্রু পার না হইয়া বিপাশা প্রাপ্ত হইতে পারেন।

দূতমুখে সম্বাদ পাইয়া ভরত নিম্ন লিখিত পথে অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। এই পথ প্রসঙ্গে রামানুজ বলেন,

"ইদং মার্গান্তরং চতুরঙ্গ বল গমনোচিতং।"

"ভরত রাজগৃহ হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বমুখে গমন পূর্ব্বক সুদামা নামে নদী পার হইলেন। তৎপরে পশ্চিম বাহিনী হ্রাদিনী নদী পার হইয়া ঐলধান (২৬) গ্রামে শতদ্রু লঙ্ঘন করিলেন। অপর পর্ব্বত নামক দেশ ছাড়াইয়া, শিলা ও

---

(২৪) বিপাশার বৈদিক নাম আর্জীকিয়া। আর্জীকিয়া বিপাড়িত্যাহুঃ।"—Part of Yask's note quoted by Muir. তৎপরে উরুঞ্জিরা, যথা নিরুক্তে "পূর্ব্বমাসীদুরুঞ্জিরা।" বিপাশা নাম কিরূপে হইল, তৎসম্বন্ধে এরূপ কথিত যে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে পাশবদ্ধ করিয়া উক্ত নদীতে নিক্ষেপ করেন। তাহাতে এই নদী বশিষ্ঠের পাশ মোচন করিয়া দেওয়ায় বিপাশা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাভারতে

"উত্তরার ততঃ পাশাদ্বিমুক্তঃ স মহানৃষিঃ।

বিপাশেতি চ নামাস্যাশ্চক্রে মহানৃষিঃ।" আদিপর্ব্ব—১৭৬ সর্গ।

পুনশ্চ নিরুক্তে—"পাশা অস্যাং ব্যাপাশয়ন্ত বশিষ্ঠস্য মুমূর্ষতস্তস্মাদ্ বিপাশ উচ্যতে।"

বিপাশা ও এই প্রস্তাবে লিখিত বহু নদীর নাম বেদে এইরূপ উল্লেখ আছে।

"ইমংমে গঙ্গে যমুনে সরস্বতী শতুদ্রি স্তোমংসচতা পুরুষ্ণ্যা। অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া।" ঋঃ বেঃ ১০ মঃ।

বিপাশা—Hyphasis of the Greeks.

(২৫)। "গিরিব্রজং কেকয়রাজ গৃহাপর নামকং।" রামানুজঃ।

ভরতকে আনয়নার্থে যে দূত গিয়াছিলেন, তিনি বিপাশা পার হইয়া পশ্চিম মুখে যায়েন নাই। ভরত আসিবার সময়েতেও পূর্ব্বমুখে আসিতে বিপাশা পার হয়েন নাই, কেবল প্রশস্ত পথে আসার অনুরোধে শতদ্রু মাত্র লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে কেকয় রাজগৃহ শতদ্রু ও বিপাশা এই নদীদ্বয়ের মধ্যে এবং পূর্ব্বকথিত বাহ্লিক নামক অনার্য্য জনপদের দক্ষিণ। এতৎসম্বন্ধে "Kykaya is supposed by the translator, Dr. Carey, to be a King of Persia, the Ky-Vonsa preceding Darius.—Ky was the epithet of one of the Persian dynasties. &c.—Tod's Rajasthan Vol. I. এ অনুমানের প্রধান সহায় কৈ শব্দ, কিন্তু কৈকেয় এ পদ কিরূপে সাধিত হইয়া উহাতে কৈ এই বর্ণের যোগ হইয়াছে?

(২৬) শতদ্রুর লুপ্তপথোপরি আজুধান এবং বর্ত্তমান পাকপট্টন কি?

আকুর্ব্বতী নামে দুই নদী পার হইয়া, অগ্নিকোণে শল্যকর্ষণ নামক দেশে উপস্থিত হইলেন। ঐস্থানে শিলাবহা নামে নদী দর্শন করিয়া, অনেক পর্ব্বতাদি লঙ্ঘন করিয়া চৈত্ররথ কানন (২৭) প্রাপ্ত হইলেন। তথা হইতে গঙ্গা ও সরস্বতী সঙ্গমে (২৮) উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে বীরমৎস্য (২৯) নামক দেশের উত্তর দিয়া, ভারুণ্ডবন অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বত মধ্যে আবদ্ধা কুলিঙ্গা নদী পার হইয়া সম্মুখে যমুনা প্রাপ্ত হইলেন। তাহা উত্তীর্ণ হইয়া, অংশুধান গ্রামে গঙ্গা পার হওয়া কঠিন দেখিয়া, প্রাগ্বটপুরে গঙ্গা পার হইলেন। তথা হইতে কোটিকোষ্টিকা নদী পার

---

(২৭) রামায়ণের চতুর্থকাণ্ডে উত্তর কুরুবর্ষ প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে

"সপ্তর্ষীণাং স্থিতির্যত্র যত্র মন্দাকিনী নদী।
দেবর্ষিচরিতং রম্যং যত্র চৈত্ররথং বনং॥"

মন্দাকিনী নদী হিমালয়শৃঙ্গে কেদারনাথ পর্ব্বতের নিকট (Muir's Sanscrit Texts Vol. I.) কিন্তু উত্তর কুরুবর্ষ সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে।

"তস্মাদেতস্যামুদীচ্যাং দিশি যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদা উত্তরকুরব উত্তর মদ্রা ইতি বৈরাজ্যায় তেঽভিষিচ্যন্তে।" Quoted by Prof. Weber.

পুনশ্চ রাজতরঙ্গিণীতে রাজা ললিতাদিত্যের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে।

"ভূধারা শিখরশ্রেণিঃ যান্ত্য সত্যজ্যবাজিনঃ।
উত্তরকুরবোবীক্ষ্য তত্রাজন্মপাদপান্॥" রাজতরঙ্গিণী।

এই প্রমাণে অনুমান হইতেছে যে বর্ত্তমান বোখারার নিকট ও কাসগর প্রভৃতি স্থান উত্তরকুরুবর্ষ পদে বাচ্য। বাল্মীকির মত কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র বোধ হইতেছে। হিন্দুরা উত্তরকুরুবর্ষকে অতি পবিত্র স্থান বলিয়া থাকেন। সেই পবিত্রতা হিমালয় হইতে আরম্ভ। চৈত্ররথ বন যেখানেই পূর্ব্বে থাকুক, তথায় এবং তাহার আবাসস্থান উত্তর কুরুবর্ষ একবার পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যেরা প্রায় আর সেদিকে গমন করেন নাই। কেবল স্মৃতিপথে তাহা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কালক্রমে সেই স্মৃতি বিকৃত হইয়া, তাহাদের যথার্থ অবস্থান ভুলিয়া, 'উত্তর প্রদেশে তাহাদের অবস্থান' এই সাধারণ ভাব মনোমধ্যে বদ্ধমূল হওয়া অসম্ভব নহে। বৈদিক সময়ের পরবর্ত্তী বাল্মীকির কথায় তাহাই প্রকাশিত হইতেছে। এসময়ে এরূপ ভাব জন্মিয়াছে যে তাৎকালিক আর্য্যভূমির যথায় উত্তর, তথায় "উত্তর কুরুবর্ষ" তথায়ই চৈত্ররথ কানন। অতএব বাল্মীকি বর্ণিত উত্তরকুরুবর্ষ এবং চৈত্ররথবন হিমাদ্রিশৃঙ্গ হইতে আরম্ভ বলিয়া কি ধরিয়া লওয়া যায় না? ভরতকে চৈত্ররথ বনের নিকট দিয়া লইয়া যাওয়ায় বোধ হইতেছে যে ভরত হিমাদ্রির নিকট দিয়া এখানে গমন করিতেছেন। রাজা ললিতাদিত্যের পথ অনার্য্য দেশের ভিতর দিয়া হওয়ায় রাজতরঙ্গিণীতে ওরূপ স্থান নির্দ্দেশ হইয়াছে।

(২৮) সরস্বতীং ইয়মত্র পশ্চিম প্রবাহা। গঙ্গাপদেনাত্রহ্লাদিনীপাবনীনলিনীভ্যাং পশ্চিম প্রবাহা গ্রাহ্যাঃ। এতাস্তিস্রো গঙ্গাপ্রবাহা এতেতি পুরাণ প্রসিদ্ধম্।" রামানুজ।

এই শাখা সম্বন্ধে রামায়ণে

"হ্লাদিনী পাবনী চৈব নলিনীচ তথৈবচ।
তিস্রঃ প্রাচীং দিশং জগ্মুর্গঙ্গাঃশিবজলাঃ শুভাঃ॥
সুচক্ষুশ্চৈব সীতাচ সিন্ধুশ্চৈব মহানদী।
তিস্রস্ত্বেতা দিশং জগ্মুঃ প্রতীচীং তু দিশং শুভাঃ॥" ১ কাণ্ড—৪৩সর্গ।

(২৯) "কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষোব্রহ্মর্ষি দেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরং মনু॥"

হইয়া ধর্ম্মবর্দ্ধন গ্রামে গমন করিলেন। তাহার পর তোরণ গ্রামের দক্ষিণ ভাগ দিয়া জম্বুপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে বরূথ নামক জনপদ, তাহার পর উজ্জিহানা (৩০) গ্রাম। এখান হইতে সর্ব্বতীর্থ গ্রাম দিয়া উত্তরগা ও অন্যান্য নদী পার হইয়া, লৌহিত্য গ্রামে কপিবতী নদী, একশাল গ্রামে স্থাণুমতী নদী, এবং বিনত গ্রামে গোমতী নদী পার হওনানন্তর, কুলিঙ্গ নগরের শালবন অতিক্রম করিয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন।"

এই পথ এমন গোলযোগের সহিত বর্ণিত যে এতৎ সম্বন্ধে সহসা সম্পূর্ণরূপে নিরাকরণ করা যায় না। আপাততঃ তাহাতে বিরত থাকা গেল। ভরত হস্তিনাপুরের উত্তর দিয়া যাইতেছেন কি দক্ষিণ দিয়া যাইতেছেন, তাহা যদিও এস্থলে ভালরূপ প্রকাশ পাইল না বটে কিন্তু এইগুলিদ্বারা তাহা কথঞ্চিত প্রমাণিত হইতেছে। প্রথমতঃ চৈত্ররথ বনের কথা উল্লেখ আছে; তাহার পর গঙ্গা ও সরস্বতী সঙ্গমে পার হওয়া; দক্ষিণ পথে আসিতে, দূতের গমন প্রসঙ্গে এবং রামায়ণের অন্যত্রে উল্লিখিত কোন একটি দেশের নামের উল্লেখ না থাকা। আবার উজ্জিহানা নগর বলিয়া যে স্থান কথিত হইয়াছে, যদি দক্ষিণ পথে আসা যায় তবে উহা একটি লুপ্তস্থান বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। অথবা যদি বিখ্যাত উজ্জয়িনী নগর বলা যায়, এবং মৎস্যদেশকে বীরমৎস্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে উজ্জয়িনী মৎস্যদেশের এত দক্ষিণে পড়ে যে, বাল্মীকিকে আধুনিক ধরিলেও তাঁহাকে এত অজ্ঞ বলিয়া ধরিতে পারা যায় না যে তথা দিয়া ভরতের পথ নির্দ্দেশ করিবেন। পরন্তু অযোধ্যা হইতে উহা এত অন্তরে যে তথায় সৈন্য পশ্চাৎ রাখিয়া ভরত নির্ভয়ে একাকী যাইতে পারেন না। কিন্তু পূর্ব্বে কথিত কাশীপুরের নিকট প্রাচীন উজ্‌নি নগর ধরিলে, উত্তর পথে আসিতে উহা পথের উপরে পড়ে। উহা কোশল রাজ্যের অনেক নিকট, এবং তথায় সৈন্যাদি পশ্চাৎ রাখিয়া, ভরতের একাকী গমন করা সম্ভব।

ইতি প্রথম প্রস্তাব

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই শ্লোকে যে মৎস্যদেশের কথা লিখিত হইল, তাহা বীর মৎস্যদেশ নহে, ইহা সহজেই প্রতীত হইতেছে। এই মৎস্যদেশ হস্তিনাপুরের বহু দক্ষিণ, কিন্তু ভরতের পথ হস্তিনাপুরের বহু উত্তর। ভরতের পথ যেরূপ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে সেই অনুসারে হিসাব করিয়া লইলে, এই বীর মৎস্য হিউয়েন সাঙের সাময়িক শ্রুঘ্ন প্রদেশ (Su. Lu. Kiu. Na.) বলিয়া বোধ হয়। এই শ্রুঘ্ন প্রদেশ বর্ত্তমান অম্বালা ও তাহার পূর্ব্বোত্তর প্রদেশ।

(৩০) এ গ্রাম বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী নহে। ইহা কি হিউয়েন সাঙের সাময়িক গোবিসনা প্রদেশের বর্ত্তমান কাশীপুর নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী পুরাতন উজ্‌নি গ্রাম। ইহা অযোধ্যার অপেক্ষাকৃত অনেক নিকট। উজ্জিহানায় ভরত নির্ভয়ে স্বকীয় সৈন্য পশ্চাতে রাখিয়া একাকী অযোধ্যায় গিয়াছিলেন।

এই কবিতাটি এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকের রচিত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কোন কোন স্থানে, অল্পমাত্র সংশোধন করিয়াছি। এবং কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি।

বং সম্পাদক।

[১]

কতদিন দিবাকর উদেছে গগনে ;
রক্তিম বরণ ধরি, বিহারিয়া শূন্যোপরি,
রঞ্জন করেছে যত ভারত সন্তানে।
এবে কেন সেই সূর্য্য নাহি লাগে মনে ?

[২]

সুনীল অম্বরে ঐ ভাসে শশধর।
লইয়া তারকা মালা, গগনে করিছে খেলা,
অমরবেষ্টিত যথা দেব পুরন্দর।
নৈশ নীল অন্তরীক্ষে শোভে ক্ষপাকর।

[৩]

বিধৌত ধরণীতল স্নিগ্ধ চন্দ্র করে।
স্বচ্ছ শ্বেতবাস পরি, অবনী সাজিল মরি,
কিবা শোভা মনোলোভা ভূতলে, অম্বরে।
এ সকলে দুঃখ কেন হতেছে অন্তরে ?

[৪]

কেন নাহি ভাল লাগে বসন্ত শ্বসন ?
যবে দুই ফুলবালা গলে ধরি করে খেলা
দোলাইয়া যায় যদি মলয় পবন ;
কেন বা সবার সুখে দুঃখী এত মন ?

[৫]

কেনইবা কোপানলে দহয়ে অন্তর ?
শুনে পর বীর দাপ, হৃদে হয় মহাতাপ,
মনে করি উপাড়িব হিমাদ্রি শিখর।
রসাতলে পাঠাইব পৃথ্বী সসাগর।

[৬]

সুপুচ্ছ বিস্তৃত করি যত শিখিগণ
দেখি নব জলধর, আহ্লাদিত পরস্পর,
তালে তালে করে যবে নৃত্য আরম্ভন,
বিষাদ সাগর কেন উথলে তখন ?

[৭]

এই যে বিটপী শ্রেণী আছে সারি সারি
ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে ; হাসে চন্দ্রকর পেয়ে ;
জলিছে চন্দ্রের ছায়া নদীর উপরি।
এ দেখে উথলে কেন দুখসিন্ধু বারি ?

[৮]

এই প্রবাহিনী তটে হাসে কুমুদিনী ;
দোলায়ে নীহার হার, গরবেতে বারেবার
মলয় হিল্লোলে স্বয় দুলে গরবিণী।
তা দেখিয়া কেন আমি হই অভিমানী ?

[৯]
মনে করি একদিন আমাদের তরে
স্থজিয়াছিলেন ধাতা, ভুবনে ভারত মাতা
প্রাণভয়ে দিনু তাঁরে, যবনের করে।
ডুবিল হিন্দুর নাম কলঙ্ক সাগরে ॥

[১০]
পড়িলেক ইরম্মদ কালমেঘ হতে।
ভাঙ্গিয়া ভারত মুণ্ড, জ্বালি এ অনল কুণ্ড,
দহিল মায়ের দেহ, অতুল্য জগতে।
অস্থি ভস্ম ভিন্ন আছে কি আর ভারতে ॥

[১১]
সেইদিন উদিলেক ম্লান শশধর।
সেইদিন নিশিথিনী, জ্যোৎস্নাসম্বেতমম্বিনী,
সেইদিন হতে দুখে ভাসয়ে অম্বর।
সেইদিন ছারখার ভারত সুন্দর ॥

[১২]
কত দিবা অস্তে যায় কত রাত্র আসে,
এ রাত্র কি না পোহাবে, এমনি রহিয়া যাবে,
হবে না কি সূর্য্যোদয় ভারত আকাশে ?
অন্ধকার রহিবে কি ভারত আবাসে ?

[১৩]
কি লাগিয়ে রত্ন ভূমি দুখের আগার ?
জাগো ভারতস্বজন, মিথ্যা ঘুমে অচেতন,
আলস্য মূর্খতা দোষে দিবসে আঁধার।
জ্ঞানেতে করিয়া বল সত্য কর সার।

[১৪]
সম্মুখেতে দেখ সবে অত্যুচ্চ ভূধর,
যাহার শিখর দেশ, চক্ষে নাহি পড়ে লেশ,
উহাতে উঠিতে যত্ন করে যত নর।
বহু যত্ন সাধ্য হয় ঐ গিরিবর।

[১৫]
উঠে তার মধ্য দেশে কত শত জন।
হইয়া অশক্ত কায়, আর না উঠিতে পায়,
তলদেশে কত লোক করিছে ভ্রমণ।
নাহি পারে, তবু করে উঠিতে যতন ॥

[১৬]
কত শত জন উঠি শৃঙ্গের উপরে
ভুঞ্জিছে অতুল সুখ, নাহি ভবে কিছু দুখ,
সুবর্ণ নির্ম্মিত ছত্র শিরে শোভা করে।
দেখ কত শত জন গিরির শিখরে।

[১৭]
কেহ বা উঠিয়ে শৃঙ্গে হতেছে পতন।
তুঙ্গ শৃঙ্গ পানে চায়, আবার উঠিতে ধায়,
আবার শিখর দেশে, করে আরোহণ।
ভারতবাসীরা কেন না করে তেমন ॥

[১৮]
একবার উঠেছিলে এ শিখর শিরে।
আজি কেন বসি তলে ? হুঙ্কারি উঠহ বলে,
গাইয়ে ভারত জয়, আরোহ গিরিরে।
বাখানিবে এ ভুবনে নব হিন্দু বীরে ॥

[১৯]
যদি বা পড়িয়া যাও গিরি আরোহণে
হানি কিবা তায় তবে ? উদ্ধারিয়া পাপ ভবে
চলি যাবে আনন্দেতে দেব নিকেতনে
কেন বা করিবে ভয় এ তিন ভুবনে ?

[২০]
ঐ শুন মৃদু মন্দ হয় বংশীধ্বনি।
পর্ব্বত শিখরোপর, বলে "হে ভারত নর
গিরির উপরে সবে আইস এখনি।"
ঐ শুন পর্ব্বতেতে হয় বংশীধ্বনি ॥

[২১]
শুন বংশী প্রতিধ্বনি গভীর কন্দরে ;
শুন প্রস্রবণ ঝরে, কল কল নাদ করে,
"চক্ষু মেল" বলি ডাকে ভারতের নরে।
ঐ শুন কল্লোলিয়া প্রস্রবণ ঝরে ॥

[২২]
তথাপি ভারতবাসী ঘুমে অচেতন ?
কাদম্বিনী ডাকে ঘন, ঘন ডাকে গিরিগণ,
ঘন ঘন ঘন ডাকে বংশীর নিস্বন।
জন্মমত ভারত কি ঘুমাবে এমন ?
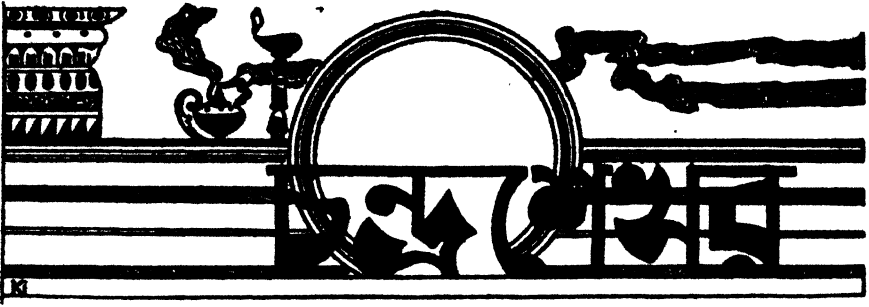
ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব কথা

ভাগীরথী তীরে, আম্র কাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিত। তাহার পদতলে, নবদূর্ব্বাশয্যায় শয়ন করিয়া, একটি ক্ষুদ্র বালিকা, নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিত—চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, আকাশ, নদী, বৃক্ষ দেখিয়া, আবার সেই মুখপানে চাহিয়া দেখিত। সেই বালক প্রতাপ—সেই বালিকা, শৈবলিনী। শৈবলিনী তখন সাত আটবৎসরের বালিকা—প্রতাপ কিশোর বয়স্ক।

মাথার উপরে, শব্দ তরঙ্গে আকাশ মণ্ডল ভাসাইয়া, পাপিয়া ডাকিয়া যাইত। শৈবলিনী, তাহার অনুকরণ করিয়া, গঙ্গাকূল বিরাজী আম্র কানন কম্পিত করিত। গঙ্গার তর তর রব সে ব্যঙ্গ সঙ্গীত সঙ্গে মিলাইয়া যাইত।

কখন বা বালিকা, ক্ষুদ্র করপল্লবে, তদ্বৎ সুকুমার বন্য কুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া, বালকের গলায় পরাইত। আবার খুলিয়া লইয়া আপন কবরীতে পরাইত, আবার খুলিয়া বালকের গলায় পরাইত। একদিন স্থির হইল না—কে মালা পরিবে; নিকটে হৃষ্টা পুষ্টা একটি গাই চরিতেছে দেখিয়া শৈবলিনী বিবাদের মালা তাহার শৃঙ্গে পরাইয়া আসিল; তখন বিবাদ মিটিল। কখন বা মালার বিনিময়ে বালক, নীড় হইতে পক্ষিশাবক পাড়িয়া দিত, আম্রের সময়ে সুপক্ক আম্র পাড়িয়া দিত।

সন্ধ্যার কোমলাকাশে তারা উঠিলে, উভয়ে তারা গণিতে বসিত। কে আগে দেখিয়াছে? কোনটি আগে উঠিয়াছে? তুমি কয়টা দেখিতে পাইতেছ? চারিটা? আমি পাঁচটা দেখিতেছি। ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা। মিথ্যা কথা। শৈবলিনী তিনটা বৈ দেখিতেছে না।

নৌকা গণ। কয়খানা নৌকা যাইতেছে বল দেখি? ষোল খানা? বাজি রাখ, আঠার খানা। শৈবলিনী গণিতে জানিত না—একবার গণিয়া নয় খানা

হইল—আর একবার গণিয়া একুশ খানা হইল। তারপর হয়ত গণনা ছাড়িয়া উভয়ে একাগ্র চিত্তে কোন একখানি নৌকার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিত। নৌকায় কে আছে—কোথা যাইবে—কোথা হইতে আসিল? দাঁড়ের জলে কেমন সোনা জ্বলিতেছে!

এইরূপে ভালবাসা জন্মিল। প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয় না বল। ষোলবৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা! হাসিতে হয় হাস—তোমরা হাসিও—আপত্তি নাই। আমি জানি, অঙ্কুরেও বৃক্ষের গুণ আছে। জন্মাবধি মানব হৃদয়ের ধর্ম্ম স্নেহশালিতা। বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না।

বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে। যাহাদের বাল্যকালে ভালবাসিয়াছ—তাহাদের কয় জনের সঙ্গে যৌবনে দেখা সাক্ষাৎ হয়? কয়জন বাঁচিয়া থাকে? কয়জন ভালবাসার যোগ্য থাকে? বার্দ্ধক্যে বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতি মাত্র থাকে—আর সকল বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সেই স্মৃতি কত মধুর।

বালক মাত্রেই কোন সময়ে না কোন সময়ে অনুভূত করিয়াছে, যে ঐ বালিকার মুখমণ্ডল অতি মধুর—উহার চক্ষে কোন বোধাতীত গুণ আছে। খেলা ছাড়িয়া কতবার তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়াছে—তাহার পথের ধারে, অন্তরালে দাঁড়াইয়া কতবার তাহাকে দেখিয়াছে। কখন বুঝিতে পারে নাই, অথচ ভাল বাসিয়াছে। তাহার পর সেই মধুর মুখ—সেই বিলোল কটাক্ষ—কোথায় কাল প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য পৃথিবী খুঁজিয়া দেখি—কেবল স্মৃতি মাত্র আছে। বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।

শৈবলিনী মনে মনে জানিত, প্রতাপের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। প্রতাপ জানিত, বিবাহ হইবে না। শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা। সম্বন্ধ দূর বটে, কিন্তু জ্ঞাতি। শৈবলিনীর এই প্রথম হিসাবে ভুল।

শৈবলিনী দরিদ্রের কন্যা। কেহ ছিল না—কেবল মাতা। তাহাদিগের কিছু ছিল না, কেবল একখানি কুটীর—আর শৈবলিনীর রূপরাশি। প্রতাপও দরিদ্র।

শৈবলিনী বাড়িতে লাগিল—সৌন্দর্য্যের ষোল কলা পূরিতে লাগিল—কিন্তু বিবাহ হয় না। বিবাহে ব্যয় আছে—কে ব্যয় করে? সে অরণ্য মধ্যে সন্ধান করিয়া কে সে রূপরাশি অমূল্য বলিয়া তুলিয়া লইয়া আসিবে?

শৈবলিনীর জ্ঞান জন্মিতে লাগিল। বুঝিল যে প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই। বুঝিল, এ জন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভবনা নাই।

দুই জনে পরামর্শ করিতে লাগিল। অনেকদিন ধরিয়া পরামর্শ করিল। গোপনে গোপনে পরামর্শ করে, কেহ জানিতে পারে না। পরামর্শ ঠিক হইলে, দুই জনে গঙ্গাস্নানে গেল। গঙ্গায় অনেকে সাঁতার দিতেছিল। প্রতাপ বলিল,

আয় শৈবলিনি ! সাঁতার দিই। দুইজনে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। সন্তরণে দুই জনেই পটু—তেমন সাঁতার দিতে গ্রামের কোন ছেলে পারিত না। বর্ষাকাল—কূলে কূলে গঙ্গার জল—জল দুলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। দুই জনে সেই জলরাশি ভিন্ন করিয়া, মথিত করিয়া, উৎক্ষিপ্ত করিয়া, সাঁতার দিয়া চলিল ; ফেণ চক্রমধ্যে, সুন্দর নবীন বপুদ্বয়, রজতাঙ্গুরীয় মধ্যে রত্নযুগলের ন্যায় শোভিতে লাগিল।

সাঁতার দিতে দিতে ইহারা অনেক দূর গেল দেখিয়া ঘাটে যাহারা ছিল, তাহারা ডাকিয়া ফিরিতে বলিল। বালক বালিকা শুনিলনা—চলিল। আবার সকলে ডাকিল—তিরস্কার করিল—গালি দিল—দুই জনে কেহ শুনিলনা, চলিল। অনেক দূরে গিয়া প্রতাপ বলিল, "শৈবলিনি, এই আমাদের বিয়ে।"

শৈবলিনী বলিল, "আর কেন—এইখানেই।"

প্রতাপ ডুবিল। শৈবলিনী ডুবিল না। সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল। মনে ভাবিল—কেন মরিব ? প্রতাপ আমার কে ? আমার ভয় করে, আমি মরিতে পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না—ফিরিল। সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।

যেখানে প্রতাপ ডুবিয়াছিল, তাহার অনতিদূরে একখানি পানসী বাহিয়া যাইতেছিল। নৌকারোহী একজন দেখিল, প্রতাপ ডুবিল। সে লাফ দিয়া জলে পড়িল। নৌকারোহী, চন্দ্রশেখর।

চন্দ্রশেখর সন্তরণ করিয়া প্রতাপকে ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। তাহার বিহিত করিয়া তীরে নৌকা লাগাইলেন। সঙ্গে করিয়া প্রতাপকে তাহার গৃহে রাখিতে গেলেন।

প্রতাপের মাতা ছাড়িল না। চন্দ্রশেখরের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া সে দিন তাঁহাকে আতিথ্য স্বীকার করাইল। চন্দ্রশেখর ভিতরের কথা কিছু জানিলেন না।

শৈবলিনী আর প্রতাপকে মুখ দেখাইল না। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাহাকে দেখিলেন। দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া, আপনার ব্রত ভঙ্গ করিয়া, আপনি ঘটক হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গেলেন।

চন্দ্রশেখর প্রতাপের দুইটি উপকার করিলেন। প্রথম, ঘটকালী করিয়া রূপসীর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। দ্বিতীয়, মুর্শিদাবাদে চাকরি করিয়া দিলেন।

চাকরি আরম্ভ করিয়া প্রতাপ দুই চারি বৎসরে প্রাধান্য লাভ করিলেন। সে সকল কালে দুই এক বৎসর চাকরি করিয়া লোকে জমীদার হইত। প্রতাপের দ্বারা পূর্ব্বতন নবাব একদিন বিশেষ উপকৃত হইলেন। প্রত্যুপকার স্বরূপ, তাঁহাকে একখানি জমীদারী দিলেন। প্রতাপ চাকরি ত্যাগ করিয়া জমীদারীতে বসিলেন।

শৈবলিনী প্রতাপকে না দেখিয়া তাহাকে ভুলিয়া গেলেন। রূপসীর সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ না হইলে কোন গোল ছিল না। জমীদারীতে বসিয়া, প্রতাপ মধ্যে মধ্যে শ্বশুর শাশুড়ীকে দেখিতে আসিতেন। শৈবলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। শৈবলিনী দেখিল, তাহার সেই বাল্য সখা প্রতাপ, মহেন্দ্রনিন্দিত বীরকান্তি ধারণ করিয়াছে। শৈবলিনী সৌন্দর্য্য তৃষ্ণায় পুড়িতে লাগিল।

প্রতাপ, চন্দ্রশেখরকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। শৈবলিনীর গতিক দেখিয়া, বেদগ্রামে আসা বন্ধ করিলেন।

চতুর্ব্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

কাঁদে

জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। গঙ্গার দুই পার্শ্বে বহুদূর বিস্তৃত বালুকাময় চর। চন্দ্রকরে, সিকতা-শ্রেণী অধিকতর ধবল-শ্রী ধরিয়াছে; গঙ্গার জল, চন্দ্রকরে প্রগাঢ়তর নীলিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার জল ঘন নীল—তটারূঢ় বনরাজী ঘনশ্যাম, উপরে আকাশ রত্নখচিত নীল। এরূপ সময়ে বিস্তৃতি জ্ঞানে কখন কখন মন চঞ্চল হইয়া উঠে। নদী অনন্ত; যতদূর দেখিতেছি নদীর অন্ত দেখিতেছি না, মানবাদৃষ্টের ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্ট ভবিষ্যতে মিশাইয়াছে। নীচে নদী অনন্ত; পার্শ্বে বালুকাভূমি অনন্ত; তীরে বৃক্ষশ্রেণী অনন্ত, উপরে আকাশ অনন্ত; তন্মধ্যে তারকামালা অনন্ত সংখ্যক। এমন সময়ে কোন্ মনুষ্য আপনাকে গণনা করে? এই যে নদীর উপকূলে যে বালুকাভূমে তরণীর শ্রেণী বাঁধা রহিয়াছে তাহার বালুকা কণার অপেক্ষা মনুষ্যের গৌরব কি?

এই তরণীশ্রেণীর মধ্যে একখানি বড় বজরা আছে—তাহার উপরে শিপাহীর পাহারা। শিপাহীদ্বয়, গঠিত মূর্ত্তির ন্যায়, বন্দুক স্কন্ধে করিয়া, স্থির দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভিতরে, স্নিগ্ধ স্ফাটিকদীপের আলোকে নানাবিধ মহার্ঘ আসন, শয্যা, চিত্র, পুত্তল, প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। ভিতরে কয়জন সাহেব। দুইজনে সতরঞ্চ খেলিতেছেন। একজন সুরাপান করিতেছেন, ও পড়িতেছেন। একজন বাদ্য বাদন করিতেছেন।

অকস্মাৎ সকলে চমকিয়া উঠিলেন। সেই নৈশ নীরব বিদীর্ণ করিয়া, সহসা বিকট ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইল।

আমিয়ট সাহেব জন্‌সন্‌কে কিস্তি দিতে দিতে বলিলেন, "ও কি ও?"

জন্‌সন্ বলিলেন, "কার কিস্তিমাত হইয়াছে।"

ক্রন্দন বিকটতর হইল। ধ্বনি বিকট নহে; কিন্তু সেই জল ভূমির নীরব প্রান্তরমধ্যে এই নিশীথ ক্রন্দন বিকট শুনাইতে লাগিল।

আমিয়ট খেলা ফেলিয়া উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া চারিদিক দেখিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন নিকটে কোথাও শ্মশান নাই। সৈকত ভূমের মধ্যভাগ হইতে শব্দ আসিতেছে।

আমিয়ট নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। ধ্বনির অনুসরণ করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, সেই বালুকা প্রান্তর মধ্যে একাকী কেহ বসিয়া আছে।

আমিয়ট নিকটে গেলেন। দেখিলেন একটি স্ত্রীলোক;—উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে।

আমিয়ট হিন্দি ভাল জানিতেন না। স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? কেন কাঁদিতেছ?" স্ত্রীলোকটি তাঁহার হিন্দি কিছুই বুঝিতে পারিল না কেবল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আমিয়ট পুনঃ পুনঃ তাঁহার কথার কোন উত্তর না পাইয়া হস্তেঙ্গিতের দ্বারা তাহাকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন। রমণী উঠিল। আমিয়ট অগ্রসর হইলেন। রমণী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল। এ আর কেহ নহে—পাপিষ্ঠা শৈবলিনী।

পঞ্চবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

হাসে

বজরার ভিতরে আসিয়া আমিয়ট গলষ্টনকে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোক একাকিনী চরে বসিয়া কাঁদিতেছিল। ও আমার কথা বুঝে না, আমি উহার কথা বুঝি না। তুমি উহাকে জিজ্ঞাসা কর।"

গলষ্টন, প্রায় আমিয়টের মত পণ্ডিত; কিন্তু ইংরেজ মহলে হিন্দিতে তাঁহার বড় পশার। গলষ্টন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কে তুমি?"

শৈবলিনী কথা কহিল না, কাঁদিতে লাগিল।

গ। "কেন কাঁদিতেছ?"

শৈবলিনী তথাপি কথা কহিল না—কাঁদিতে লাগিল।

গ। "তোমার বাড়ী কোথায়?"

শৈবলিনী পূর্ব্ববৎ।

গ। "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?"

শৈবলিনী তদ্রূপ। গলষ্টন হারি মানিল। কোন কথার উত্তর দিল না, দেখিয়া ইংরেজেরা শৈবলিনীকে বিদায় দিলেন। শৈবলিনী সে কথাও বুঝিল

না—নড়িল না—দাঁড়াইয়া রহিল। আমিয়ট বলিলেন, "এ আমাদিগের কথা বুঝে না—আমরা উহার কথা বুঝি না। পোষাক্ দেখিয়া বোধ হইতেছে ও বাঙ্গালির মেয়ে। একজন বাঙ্গালিকে ডাকিয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বল।"

সাহেবের খানসামারা প্রায় সকলেই বাঙ্গালি মুসলমান। আমিয়ট তাহাদিগের একজনকে ডাকিয়া কথা কহিতে বলিলেন।

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদিতেছ কেন?"

শৈবলিনী পাগলের হাসি হাসিল। খানসামা সাহেবদিগকে বলিল, "এ পাগল।"

সাহেবেরা বলিলেন, উহাকে জিজ্ঞাসা কর, "কি চায়?"

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল। শৈবলিনী বলিল, "ক্ষিধে পেয়েছে।"

খানসামা সাহেবদিগকে বুঝাইয়া দিল। আমিয়ট বলিলেন, "উহাকে কিছু খাইতে দাও।"

খানসামা অতি হৃষ্টচিত্তে শৈবলিনীকে বাবর্চিখানার নৌকায় লইয়া গেল। হৃষ্টচিত্তে, কেন না শৈবলিনী পরমা সুন্দরী। শৈবলিনী কিছু খাইল না। খানসামা বলিল, "খাও না।" শৈবলিনী বলিল, "ব্রাহ্মণের মেয়ে; তোমাদের ছোঁওয়া খাব কেন?"

খানসামা গিয়া সাহেবদিগকে একথা বলিল। আমিয়ট সাহেব বলিলেন, "কোন নৌকায় কোন ব্রাহ্মণ নাই?"

খানসামা বলিল, "একজন শিপাহী ব্রাহ্মণ আছে। আর কয়েদী একজন ব্রাহ্মণ আছে।"

সাহেব বলিলেন, "যদি কাহার ভাত থাকে, দিতে বল।"

খানসামা শৈবলিনীকে লইয়া প্রথমে শিপাহীদের কাছে গেল। শিপাহীদের নিকট কিছু ছিল না। তখন খানসামা যে নৌকায় সেই ব্রাহ্মণ কয়েদী ছিল, শৈবলিনীকে সেই নৌকায় লইয়া গেল।

ব্রাহ্মণ কয়েদী, প্রতাপ রায়। একখানি ক্ষুদ্র পান্‌সীতে, একা প্রতাপ। বাহিরে, আগে পিছে সান্ত্রীর পাহারা। নৌকার মধ্যে অন্ধকার।

খানসামা বলিল, "ওগো ঠাকুর?" প্রতাপ বলিল "কেন?"

খা। "তোমার হাঁড়িতে ভাত আছে?"

প্র। "আছে"।

খা। "একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে উপবাসী আছে। দুটি দিতে পার?"

প্র। "পারি। আমার হাতের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বল।"

খানসামা সান্ত্রীকে প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বলিল। সান্ত্রী বলিল, "হুকুম দেওয়াও।"

খানসামা হুকুম করাইতে গেল। পরের জন্য এত জল বেড়াবেড়ি কে করে? বিশেষ পীরবক্স সাহেবের খানসামা; কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক পরের উপকার করেনা। পৃথিবীতে যতপ্রকার মনুষ্য আছে, ইংরেজদিগের মুসলমান খানসামা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু এখানে পীরবক্সের একটু স্বার্থ ছিল। সে মনে করিয়াছিল, এ স্ত্রীলোকটার খাওয়া দাওয়া হইলে ইহাকে একবার খানসামা মহলে লইয়া গিয়া বসাইব। পীরবক্স শৈবলিনীকে আহার করাইয়া বাধ্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। প্রতাপের নৌকায় শৈবলিনী বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল—খানসামা হুকুম করাইতে আমিয়ট সাহেবের নিকট গেল। শৈবলিনী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। বিশেষ সুন্দর মুখের অধিকারী যদি যুবতী স্ত্রী হয়, তবে সে মুখ আমোঘ অস্ত্র। আমিয়ট্ দেখিয়াছিলেন, যে এই "জেণ্টু" স্ত্রীলোকটি নিরূপমা রূপবতী—তাহাতে আবার পাগল শুনিয়া একটু দয়াও হইয়াছিল। আমিয়ট জমাদ্দার দ্বারা প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিবার, এবং শৈবলিনীকে প্রতাপের নৌকার ভিতর প্রবেশ করিতে দিবার অনুমতি পাঠাইলেন।

খানসামা আলো আনিয়া দিল। সান্ত্রী প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিল। খানসামাকে সে নৌকার উপর আসিতে নিষেধ করিয়া প্রতাপ আলো লইয়া ভাত বাড়িতে বসিলেন।

শৈবলিনী নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। সান্ত্রীরা দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল—নৌকার ভিতর দেখিতে পাইতেছিল না। শৈবলিনী ভিতরে প্রবেশ করিয়া, প্রতাপের সম্মুখে গিয়া, অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বসিলেন।

প্রতাপের বিস্ময় অপনীত হইলে, দেখিলেন, শৈবলিনী অধর দংশন করিতেছে, মুখ ঈষৎ হর্ষপ্রফুল্ল,—মুখমণ্ডল স্থিরপ্রতিজ্ঞার চিহ্নযুক্ত। প্রতাপ মানিল, এ বাঘের যোগ্য বাঘিনী বটে।

শৈবলিনী অতি লঘুস্বরে, কানে কানে বলিল, "হাত ধোও—আমি কি ভাতের কাঙ্গাল?"

প্রতাপ হাত ধুইল। সেই সময়ে শৈবলিনী কানে কানে বলিল, "এখন পলাও। বাঁক ফিরিয়া যে ছিপ আছে, সে তোমার জন্য।"

প্রতাপ সেইরূপ স্বরে বলিল "আগে তুমি যাও। নচেৎ তুমি বিপদে পড়িবে।"

শৈ। "এইবেলা পলাও। হাতকড়ি দিলে আর পলাইতে পারিবে না।

এইবেলা জলে ঝাঁপ দাও। বিলম্ব করিও না। একদিন আমার বুদ্ধিতে চল। আমি পাগল—জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িব। তুমি আমাকে বাঁচাইবার জন্য জলে ঝাঁপ দাও।"

এই বলিয়া শৈবলিনী উচ্চৈর্হাস্য করিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি ভাত খাইব না।" তখনি আবার ক্রন্দন করিতে করিতে বাহির হইয়া বলিল, "আমাকে মুসলমানের ভাত খাওয়াইয়াছে—আমার জাত গেল—মা গঙ্গা ধরিও।" এই বলিয়া শৈবলিনী গঙ্গার স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

"কি হইল ? কি হইল ?" বলিয়া প্রতাপ চীৎকার করিতে করিতে নৌকা হইতে বাহির হইল। সান্ত্রী সম্মুখে দাঁড়াইয়া—নিষেধ করিতে যাইতেছিল। "হারামজাদা ! স্ত্রীলোক ডুবিয়া মরে, তুমি দাঁড়াইয়া দেখিতেছ ?" এই বলিয়া প্রতাপ শিপাহীকে এক পদাঘাত করিলেন। সেই এক পদাঘাতে শিপাহী পান্সী হইতে পড়িয়া গেল। তীরের দিগে শিপাহী পড়িল। "স্ত্রীলোককে রক্ষা কর" বলিয়া প্রতাপ অপর দিগে জলে ঝাঁপ দিলেন। সন্তরণপটু শৈবলিনী আগে আগে সাঁতার দিয়া চলিল। প্রতাপ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সন্তরণ করিয়া চলিলেন।

"কয়েদী ভাগিল" বলিয়া পশ্চাতের সান্ত্রী ডাকিল। এবং প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। তখন প্রতাপ সাঁতার দিতেছেন।

প্রতাপ ডাকিয়া বলিলেন, "ভয় নাই—পলাই নাই। এই স্ত্রীলোকটাকে উঠাইব—সম্মুখে স্ত্রীহত্যা কি প্রকারে দেখিব ? তুই বাপু হিন্দু—বুঝিয়া ব্রহ্মহত্যা করিস।"

শিপাহী বন্দুক নত করিল।

এই সময়ে শৈবলিনী সর্ব্বশেষের নৌকার নিকট দিয়া সন্তরণ করিয়া যাইতেছিল। সেখানি দেখিয়া শৈবলিনী অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল। দেখিল, যে, যে নৌকায় শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের সঙ্গে বাস করিয়াছিল, এ সেই নৌকা।

শৈবলিনী কম্পিতা হইয়া ক্ষণকাল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল তাহার ছাদে, জ্যোৎস্নার আলোকে, ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর একটি সাহেব অর্দ্ধশয়না-বস্থায় রহিয়াছে। উজ্জ্বল চন্দ্ররশ্মি তাহার মুখমণ্ডলে পড়িয়াছে। শৈবলিনী চীৎকার শব্দ করিল—দেখিল পালঙ্কে, লরেন্স ফষ্টর !

লরেন্স ফষ্টরও সন্তরণকারিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে চিনিল—শৈবলিনী। লরেন্স ফষ্টরও চীৎকার করিয়া বলিল, "পাকড়ো ! পাকড়ো ! হামারা বিবি !" ফষ্টর, শীর্ণ, রুগ্ন, দুর্ব্বল, শয্যাগত, উত্থানশক্তি রহিত।

ফষ্টরের শব্দ শুনিয়া চারি পাঁচ জন শৈবলিনীকে ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। প্রতাপ তখন তাহাদিগের অনেক আগে। তাহারা প্রতাপকে

ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "পাকড়ো! পাকড়ো! ফষ্টর সাহাব ইনাম দেগা।" প্রতাপ মনে মনে বলিল, "ফষ্টর সাহেবকে আমিও একবার ইনাম দিয়াছি—ইচ্ছা আছে আর একবার দিব।" প্রকাশ্যে ডাকিয়া বলিল, "আমি ধরিতেছি—তোমরা উঠ!"

এই কথায় বিশ্বাস করিয়া সকলে ফিরিল। ফষ্টর বুঝে নাই যে অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি প্রতাপ। ফষ্টরের আহত মস্তিষ্ক তখনও নীরোগ হয় নাই।

ষড়্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

অগাধজলে সাঁতার

দুইজনে সাঁতারিয়া, অনেক দূর গেল। কি মনোহর দৃশ্য! কি সুখের সাগরে সাঁতার! এই অনন্ত দেশ ব্যাপিনী, বিশালহৃদয়া, ক্ষুদ্রবীচিমালিনী, নীলিমাময়ী তটিনীর বক্ষে, চন্দ্রকরসাগর মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে, সেই ঊর্দ্ধস্থ অনন্ত নীলসাগরে দৃষ্টি পড়িল! তখন প্রতাপ মনে করিল, কেনই বা মনুষ্য-অদৃষ্টে ঐ সমুদ্রে সাঁতার নাই? কেনই বা মানুষে ঐ মেঘের তরঙ্গ ভাঙ্গিতে পারে না? কি পুণ্য করিলে ঐ সমুদ্রে সন্তরণকারী জীব হইতে পারি? সাঁতার? কি ছার ক্ষুদ্র পার্থিব নদীতে সাঁতার? জন্মিয়া অবধি এই দুরন্ত কাল সমুদ্রে সাঁতার দিতেছি, তরঙ্গে ঠেলিয়া তরঙ্গের উপর ফেলিতেছে,—তৃণবৎ তরঙ্গে তরঙ্গে বেড়াইতেছি—আবার সাঁতার কি? শৈবলিনী ভাবিল, এ জলের ত তল আছে,—আমি যে অতল জলে ভাসিতেছি।

তুমি গ্রাহ্য কর না কর, তাই বলিয়া ত জড়প্রকৃতি ছাড়ে না—সৌন্দর্য্য ত লুকাইয়া রয় না। তুমি যে সমুদ্রে সাঁতার দাও না কেন, জল নীলিমার মাধুর্য্য বিকৃত হয় না—ক্ষুদ্র বীচির মালা ছিঁড়ে না—তারা তেমনি জ্বলে—তীরে বৃক্ষ তেমনি দোলে, জলে চাঁদের আলো তেমনি খেলে। জড় প্রকৃতির দৌরাত্ম্য! স্নেহময়ী মাতার ন্যায়, সকল সময়েই আদর করিতে চায়!

এসকল কেবল প্রতাপের চক্ষে। শৈবলিনীর চক্ষে নহে। শৈবলিনী নৌকার উপরে যে রুগ্ন, শীর্ণ, শ্বেত মুখমণ্ডল দেখিয়াছিল, তাহার মনে কেবল তাহাই জাগিতেছিল। শৈবলিনী কলের পুত্তলীর ন্যায় সাঁতার দিতেছিল। কিন্তু শ্রান্তি নাই। উভয়ে সন্তরণপটু। সন্তরণে প্রতাপের আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিতেছিল।

প্রতাপ ডাকিল, "শৈবলিনী—শৈ!"

শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল—হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাহাকে "শৈ" বা "সই" বলিয়া ডাকিত। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিল।

কতকাল পরে! বৎসরে কি কালের মাপ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ। শৈবলিনী যতবৎসর "সই" শব্দ শুনে নাই, শৈবলিনীর সেই এক মন্বন্তর। এখন শুনিয়া শৈবলিনী সেই অনন্ত জলরাশি মধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্র তারাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল, "প্রতাপ! আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো চকমক করে কেন?"

প্রতাপ বলিল, "চাঁদের? না। সূর্য্য উঠিয়াছে। শৈ! আর ভয় নাই। কেহ তাড়াইয়া আসিতেছে না।"

শৈ। তবে চল তীরে উঠি।

প্র। শৈ!

শৈ। কি?

প্র। মনে পড়ে?

শৈ। কি?

প্র। আর একদিন এমনি সাঁতার দিয়াছিলাম।

শৈবলিনী উত্তর দিল না। একখণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠ ভাসিয়া যাইতেছিল; শৈবলিনী তাহা ধরিল। প্রতাপকে বলিল, "ধর, ভর সহিবে। বিশ্রাম কর।"

প্রতাপ কাষ্ঠ ধরিল। বলিল, "মনে পড়ে? তুমি ডুবিতে পারিলে না—আমি ডুবিলাম?"

শৈবলিনী বলিল, "মনে পড়ে। তুমি যদি আবার সেই নাম ধরিয়া আজ না ডাকিতে, তবে আজ তার শোধ দিতাম। কেন ডাকিলে?"

প্র। তবে মনে আছে, যে আমি মনে করিলে ডুবিতে পারি?

শৈবলিনী শঙ্কিতা হইয়া বলিল "কেন প্রতাপ? চল তীরে উঠি।"

প্র। আমি উঠিব না। আজি মরিব।

প্রতাপ কাষ্ঠ ছাড়িল।

শৈ। কেন প্রতাপ?

প্র। তামাসা নয়—নিশ্চিত ডুবিব— তোমার হাত।

শৈ। কি চাও প্রতাপ? যা বল, তাই করিব।

প্র। একটি শপথ কর, তবে আমি উঠিব।

শৈ। কি শপথ প্রতাপ?

শৈবলিনী কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল। তাহার চক্ষে, তারা সব নিবিয়া গেল। চন্দ্র কপিশ বর্ণ ধারণ করিল। নীল জল নীল অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল। ফষ্টর আসিয়া যেন সম্মুখে তরবারি হস্তে দাঁড়াইল। শৈবলিনী রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, "কি শপথ প্রতাপ?"

উভয়ে পাশাপাশি কাষ্ঠ ছাড়িয়া সাঁতার দিতেছিল। গঙ্গার কলকল চলচল জলভঙ্গরব মধ্যে এই ভয়ঙ্কর কথা হইতেছিল। চারিপাশে প্রক্ষিপ্ত বারিকণা মধ্যে চন্দ্র হাসিতেছিল। জড় প্রকৃতির দৌরাত্ম্য!

"কি শপথ প্রতাপ?"

প্র। এই গঙ্গার জলে—

শৈ। আমার গঙ্গা কি?

প্র। তবে ধর্ম্ম সাক্ষ করিয়া বল—

শৈ। আমার ধর্ম্মই বা কোথায়?

প্র। তবে আমার শপথ?

শৈ। কাছে আইস—হাত দাও।

প্রতাপ নিকটে গিয়া, বহুকাল পরে শৈবলিনীর হাত ধরিল। দুই জনের সাঁতার দেওয়া ভার হইল। আবার উভয়ে কাঠ ধরিল।

শৈবলিনী বলিল, "এখন যে কথা বল শপথ করিয়া বলিতে পারি—কত কাল পরে, প্রতাপ?"

প্র। আমার শপথ কর, নইলে ডুবিব। কিসের জন্য প্রাণ? কে সাধ করিয়া এপাপ জীবনের ভার সহিতে চায়? চাঁদের আলোয় এই স্থির গঙ্গার মাঝে যদি এ বোঝা নামাইতে পারি, তবে তার চেয়ে আর সুখ কি?

উপরে চন্দ্র হাসিতেছিল।

শৈবলিনী বলিল—"তোমার শপথ—কি বলিব?"

প্র। শপথ কর,—আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর—আমার মরণ বাঁচন—আমার শুভাশুভের তুমি দায়ী—

শৈ। তোমার শপথ—তুমি যা বলিবে, ইহজন্মে তাহাই আমার স্থির—

প্র। শপথ কর, যে এজন্মে আমি তোমার ভ্রাতা—তুমি আমার ভগিনী। তুমি আমার কন্যাতুল্যা—আমি তোমার পিতৃতুল্য—তোমার সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধ নাই। এজন্মে তুমি আমাকে অন্য চক্ষে দেখিবে না—অন্য চক্ষে ভাবিবে না। শপথ কর!

শৈ। এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে প্রতাপ?

প্র। আমি।

শৈ। তোমার ঐশ্বর্য্য আছে—বল আছে—কীর্ত্তি আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে—রূপসী আছে—আমার কি আছে প্রতাপ?

প্র। কিছু না—আইস তবে দুই জনে ডুবি।

শৈবলিনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। চিন্তার ফলে, তাহার জীবন নদীতে প্রথম

বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল। "আমি মরি, তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন?" প্রকাশ্যে বলিল, "তীরে চল।"

প্রতাপ অবলম্বন ত্যাগ করিয়া ডুবিল। তখনও প্রতাপের হাতে শৈবলিনীর হাত ছিল। শৈবলিনী টানিল। প্রতাপ উঠিল।

শৈ। আমি শপথ করিব। কিন্তু তুমি একবার ভাবিয়া দেখ। আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেছ। আমি তোমাকে চাহি না। তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব?

প্রতাপ হাত ছাড়াইল। শৈবলিনী আবার ধরিল। তখন অতি গম্ভীর, স্পষ্ট শ্রুত, অথচ বাষ্পবিকৃত স্বরে শৈবলিনী কথা কহিতে লাগিল—বলিল, "প্রতাপ, হাত চাপিয়া ধর। প্রতাপ, শুন, তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি—তোমার মরণ বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শুন, তোমার শপথ! আজি হইতে তুমি ভ্রাতা, আমি ভগিনী, তুমি পিতৃতুল্য—আমি কন্যাতুল্যা। আজি হইতে আমার সর্ব্ব সুখে জলাঞ্জলি! আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

শৈবলিনী প্রতাপের হাত ছাড়িয়া দিল। কাঠ ছাড়িয়া দিল।

প্রতাপ গদগদ কণ্ঠে বলিল "চল তীরে উঠি।"

উভয়ে গিয়া তীরে উঠিল। পদব্রজে গিয়া বাঁক ফিরিল। ছিপ নিকটে ছিল। উভয়ে অহাতে উঠিয়া ছিপ খুলিয়া দিল।

এদিকে ইংরেজের লোক তখন মনে করিল, কয়েদী পলাইল। তাহারা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। কিন্তু ছিপ শীঘ্র অদৃশ্য হইল।

রূপসীর সঙ্গে মোকদ্দমায়, আরজি পেষ না হইতেই শৈবলিনীর হার হইল।

১

রে বিধাত ! নির্দ্দয়হৃদয়—
বাঙ্গালির এত দুঃখে—এত যন্ত্রণায়,
পূরিল না তথাপি কি উদর তোমার ?
তোমার ভাণ্ডারে আর, আছে কত তীক্ষ্ণ-ধার
অস্ত্র রাশি, নাহি জানি ; নাহি জানি হায় !
দুঃখিনী বঙ্গের ভাগ্যে কত আছে আর !

২

মানব শোণিতে আহা ! সহনীয় যাহা
সহিয়াছি ;—আজি ওই কালের নিশ্বাস
চক্রবাত্যা* ভয়ঙ্কর, বিলোড়িয়া চরাচর
বহিল ; সোনার বঙ্গ বিনাশিয়া আহা !
পশ্চাতে রাখিয়া গেল সমূর্ত্তি বিনাশ ।

৩

কালি পুনঃ মারিভয় সংক্রামক জ্বর,
দাবানল রূপে পশি অঞ্চলে অঞ্চলে,
ভাস্মাঙ্গারে পরিণত, করিল প্রদেশ শত,
আবার শুনিয়া অঙ্গ কাঁপে থর থর,
পড়িবে দুঃখিনী বঙ্গ দুর্ভিক্ষ কবলে ।

৪

মধ্যে মধ্যে বঙ্গ-রাজ-নৈতিক-সাগরে
উঠিল, ছুটিল যেই লহরী নিচয় ;
ভীষণ প্রহরী তার, ভাবী আশা বাঙ্গালার,
কোথায় উড়িয়া গেল ; জলধি অন্তরে
পড়েছে বাঙ্গালি কুল—আর নাহি সয় ।

৫

যথা কাঙ্গালিনী মাতা স্নেহেতে গলিয়া,
দুঃখী সন্তানের মুখ করি দরশন,
শুনিয়া কোমল কথা, কণ্ঠ-স্বর-মধুরতা,
পাসরে সকল দুঃখ—হৃদয়ে লইয়া
দরিদ্রের ধন আহা ! জুড়ায় জীবন ।

৬

অভাগিনী বঙ্গমাতা হায় রে ! তেমন,
অনন্ত-দাসত্বে ক্ষীণ দীন-পুত্র সনে,
লইয়া শ্যামল বুকে, কাটাইত দিন দুঃখে,
ক্রোড় শূন্য করি বিধি, নিদারুণ মনে
দুঃখিনীর পুত্র রত্ন করিছে হরণ ।

৭

মধুসূদনের শোকে বিবশা দুঃখিনী
না হতে চেতন, নেত্র মুদিল কিশোরী ;
তার শোক অশ্রুজল, না ছুঁইতে বক্ষঃস্থল,
মাতৃকোল দীনবন্ধু গেল শূন্য করি ;
ঈশ্বর তোমারি ইচ্ছা !—বঙ্গ অভাগিনী !

৮

হায় ! যথা নির্ঝরিণী-প্রণালী হইতে
এক ধারা ধরাতলে না হতে পতন,
অন্য ধারা প্রণালীতে আসে চক্ষু পালটিতে ;
এক শোক অশ্রুধারা, বঙ্গের তেমন
না ছুঁইতে বক্ষঃস্থল, হায় ! আচম্বিতে

---

* Cyclone.

৯

আসিছে দ্বিতীয় ধারা নেত্রে দুঃখিনীর,
দ্বিগুণ উছলি বেগে ;—শোকের সাগরে
উঠিছে লহরীচয়,　　একটী না হতে লয়,
ছুটিছে দ্বিতীয় উর্ম্মি ভীম বেগ ধরে,
মায়ের কোমল প্রাণ করিয়া অধীর।

১০

দীনবন্ধু নাই !—নীলকর-প্রপীড়িত
কৃষকের কানে কহ এই সমাচার,
বিদীর্ণ আতপ তাপে,　　শস্য ক্ষেত্র, মনস্তাপে
নিসিক্ত করিবে অশ্রুজলে অভাগার !
শুষ্ক শস্য রাশি শোকে করিবে আর্দ্রিত।

১১

দীনবন্ধু নাই—এই শোক সমাচারে
কাঁদিছে সমস্ত বঙ্গ—আসাম উৎকল ;
কাছাড়ে কাঁদিছে কুকি,　　বঙ্গদেশে বিধুমুখী,
শারদাসুন্দরী স্মরি মুছে চক্ষুজল।
কাঁদিছে ছিন্দিতে খোট্টা মগধে বেহারে।

১২

দীনবন্ধু নাই ! বসি ভাগিরথী তীরে,
গোপাল কাঁদিছে কেহ আপনার মনে।
একবৃন্তে ফুল ছুটি,　　বরষ বরষ ফুটি,
আজি ছিন্নবৃন্ত এক অন্যের পতনে।
ভাঙ্গিলে হৃদয় ঘট, জোড়া লাগে ফিরে ?

১৩

দীনবন্ধু নাই—আহা ! কি শুনিতে পাই !
যুবক হৃদয় বন্ধু—আমোদ ভাণ্ডার ;—
বালকের শ্রদ্ধাধার,　　প্রীতিরাগ পারাবার ;
প্রাচীনের স্নেহাস্পদ—প্রিয় সখাকার ;
বঙ্গপুত্র রত্নোত্তম,—দীনবন্ধু নাই ;

১৪

সুকোমল বঙ্গভাষা—দরিদ্রা সদাই—
লভিল যাহার করে দুর্লভ ভূষণ,
কৌতুকী লেখনী যার,　　হাসাইল বাঙ্গালার
পুত্রগণে—শেষ তানে *কবিতা কানন
প্রতিধ্বনিময়—সেই দীনবন্ধু নাই।

১৫

গেছে চলি দীনবন্ধু ত্যজি জীব ধাম,
কবি কুঞ্জবনে স্বর্গে করিছে বিহার ;
কিন্তু এ কি শুনি হায় !　　রেখে গেছে এধরায়
যে 'নবীন তপস্বিনী'—দীনা পরিবার—
পরাধীন জীবনের শেষ পরিণাম।

১৬

হতভাগ্য দীনবন্ধু যদি দেশান্তরে—
পুণ্যখণ্ড উরুপায় †— লভিত জনম।
আজি এই সমাচার,　　বিষাদে তাড়িত তার,
দিগ্ দিগন্তরে স্কন্ধে করিত ভ্রমণ,
হুলুস্থুলু পড়ে যেত পৃথিবী ভিতরে।

১৭

ঘোষিত সহস্র দেশ, সহস্র ভাষায়,
কীর্ত্তি রাশি—সুমধুর কবিত্ব তাহার ;
যে মহৎ শক্তিচয়,　　অন্ধকারে হলো লয়
বঙ্গ কুজ্‌ঝটিকা বলে,—প্রভায় তাহার,
হায় ! আজি আলোকিত করিত ধরায়।

১৮

যেই পরিশ্রমে এই দুর্লভ জীবন,
দুর্লভ মানব দেহ করিল পতন,
রাজ্যান্তরে অর্দ্ধশ্রমে,　　আজি অবলীলাক্রমে,
স্বাধীন রাজ্যের কোষ—দরিদ্রের ধন—
দুঃখী পরিবার হেতু হতো উন্মোচন।

'* কমলে কামিনী'　　† Europe.

১৯

রে বিধাত! অন্ধকার খনির ভিতরে,
কেন হেন রত্ন রাশি করহ সৃজন?
এমন হিমানী দেশে, কেন পদ্ম পরকাশে,
হইবে না যথা পূর্ণ বিকাশ কখন;
কি সুখ ফুটিয়া ফুল অরণ্য অন্তরে?

২০

গেলে সুখে!—নাহি দুঃখ—ফুরাইল হায়!
বাঙ্গালি-জীবন-দুঃখ চিরদিন তরে;
যেই রাজ্যে প্রবেশিলে, সব জ্বালা জুড়াইলে;
কেবল পরাণ কাঁদে স্মরিয়া অন্তরে
অনাথ সন্তানগণে, অনাথিনী মায়।

২১

দীনবন্ধু! গেলে বন্ধু-চিত্ত শূন্য করি;
কিন্তু যত দিন চিত থাকিবে জাগ্রত,
তব প্রীতিপূর্ণ বাণী, তব প্রেম মুখখানি,
জাগ্রতে স্মরণ পথে ভাসিবে সতত;
স্বপনে শুনিব তব রসের লহরী।

২২

এক অনুরোধ সখে!—তুমি চিরদিন
দুঃখিনী বঙ্গের দুঃখে করেছ রোদন,
এখনো সে অশ্রুজল, করে যেন ছল ছল
নেত্রে তব; কাঁদাইয়া সে দীন নয়ন
জিজ্ঞাসিও বিধাতারে—"আর কত দিন—

২৩

আর কত দিন এই দুঃখের অনল
রবে প্রজ্বলিত বঙ্গে? শুনিয়াছি ভবে
সকলের শেষ আছে, সকলেই মরে বাঁচে,
ধরাতলে কিছু নাহি চিরদিন রবে,
বঙ্গের কি দুঃখ আহা! অনন্ত কেবল?"

শ্রীনঃ

পঞ্চম সংখ্যা

আমার মন

আমার মন কোথায় গেল? কে লইল? কই, যেখানে আমার মন ছিল সেখানে ত নাই। যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানে নাই। কে চুরি করিল? কই, সাত পৃথিবী খুঁজিয়া ত আমার "মনচোর" কাহাকে পাইলাম না? তবে কে চুরি করিল?

একজন বন্ধু বলিলেন, দেখ, পাকশালা খুঁজিয়া দেখ, সেখানে তোমার মন পড়িয়া থাকিতে পারে। মানি, পাকের ঘরে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে পোলাও, কাবাব, কোফ্‌তার সুগন্ধ, যেখানে ডেকচী সমারূঢ়া অন্নপূর্ণার মৃদু মৃদু ফুটফুটবুটবুটটকবকো ধ্বনি, সেইখানে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে ইলিস মৎস্য, সঘৃত অভিষেকের পর, ঝোলগঙ্গায় স্নান করিয়া, মৃণ্ময়, কাংস্যময়, কাচময়, বা রজতময় সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেইখানেই আমার মন প্রণত হইয়া পড়িয়া থাকে, ভক্তি রসে অভিভূত হইয়া, সেই তীর্থস্থান আর ছাড়িতে চায় না। যেখানে ছাগনন্দন, দ্বিতীয় দধীচির ন্যায়, পরোপকারার্থ আপনার অস্থি সমর্পণ করেন, যেখানে মাংস সংযুক্ত সেই অস্থিতে কোরমা রূপ বজ্র নির্ম্মিত হইয়া, ক্ষুধারূপ বৃত্রাসুর বধের জন্য প্রস্তুত থাকে, আমার মন সেইখানেই, ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য বসিয়া থাকে। যেখানে, পাচকরূপী বিষ্ণু কর্ত্তৃক, লুচিরূপ সুদর্শন চক্র পরিত্যক্ত হয়, আমার মন সেইখানেই গিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া দাঁড়ায়। অথবা যে আকাশে লুচি-চন্দ্রের উদয় হয়, সেইখানেই আমার মনরাহু গিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চায়। অন্যে যাহাকে বলে বলুক, আমি লুচিকেই অখণ্ড মণ্ডলাকার বলিয়া থাকি। যেখানে সন্দেশরূপী শালগ্রামের বিরাজ, আমার মন সেইখানেই পূজক। হালদারদিগের বাড়ীর রামমণি দেখিতে অতি কুৎসিতা, এবং তাহার বয়ঃক্রম ষাট্‌ বৎসর, কিন্তু রাঁধে ভাল, এবং পরিবেশনে মুক্তহস্তা বলিয়া, আমার

মন তাহার সঙ্গে প্রসক্তি করিতে চাহিয়াছিল। কেবল রামমণির সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হওয়ায় এটি ঘটে নাই।

সুহৃদের প্রবর্ত্তনায়, পাকশালায় মনের সন্ধান করিলাম, সেখানে পাইলাম না। পলান্ন, কোফ্‌তা প্রভৃতি অধিষ্ঠাতৃদেবগণ জিজ্ঞাসায় বলিলেন, তাঁহারা কেহ আমার মন চুরি করেন নাই। দেখিলাম, সূপকার, মাথায় গামছা বাঁধিয়া পাক করিতেছেন—তাঁহাকে যুক্ত করে বলিলাম, "হে প্রভো! এই যে আকা, উনান, বা চুলার শ্রেণী, ইহাই তোমার যমুনা, এতন্মধ্যস্থ তরঙ্গোৎক্ষেপী অগ্নি, সেই যমুনার গদ্গদনাদী বারি রাশি; তুমিই কলিকালে শ্রীনন্দনন্দন; এই হাঁড়ির শোঁ শোঁ শব্দ তোমার বংশীরব; আর তোমার যে মাথায় গামছা বাঁধা, উহা চূড়ার টাননি; তোমার হাতে যে ভাতের কাটি, ঐ পাচন বাড়ি; তুমি অনেক গোরু রক্ষা কর; অতএব হে রাখালরাজ! ভক্তকে সদয় হইয়া বল, আমার মন কোথা? তুমি কি চুরি করিয়াছ?" রাখালরাজ বলিলেন, আমি তোমার মনোহরণ করি নাই, দেখ আমার খিচুড়ির হাঁড়ি আঁকিয়া গিয়াছে।

বন্ধু বলিলেন, একবার প্রসন্ন গোয়ালিনীর নিকট সন্ধান জান। প্রসন্ন সম্বন্ধে আমার একটু নিন্দা ছিল বটে, কিন্তু সত্য বলিতেছি যে তাহার সঙ্গে আমার কোন দূষ্য প্রণয় ছিল না। তবে প্রসন্ন দেখিতে শুনিতে মোটাসোটা গোলগাল, বয়সে চল্লিশের নীচে, দাঁতে মিসি হাসিভরা মুখ, কপালের একটি ছোট উলকী টিপের মত দেখাইত; সে, রসের হাসি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যাইত, আমি তাহা কুড়াইয়া লইতাম, এই জন্য লোকে আমার নিন্দা করিত। পূজারি বামণের জ্বালায় বাগানে ফুল ফুটিতে পায় না—আর নিন্দকের জ্বালায় প্রসন্নের কাছে আমার মুখ ফুটিতে পায় না—নচেৎ গব্যরসে ও কাব্যরসে বিলক্ষণ বিনিময় চলিত। ইহাতে আমার নিজের জন্য আমি যত দুঃখিত হই না হই, প্রসন্নের জন্য আমি একটু দুঃখিত। কেন না প্রসন্ন সতী, সাধ্বী পতিব্রতা। একথাও আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পাই না। বলিয়াছিলাম বলিয়া, পাড়ার একটি ত্রিপণ্ড ছেলে ইহার বিপরীত অর্থ করিয়াছিল। সে বলিল, যে প্রসন্ন আছেন, এজন্য সৎ বা সতী বটে; তিনি সাধু ঘোষের স্ত্রী, এজন্য সাধ্বী; এবং বিধবাবস্থাতেও পতিছাড়া নহেন, এজন্য ঘোরতর পতিব্রতা। বলা বাহুল্য যে, যে অশিষ্ট বালক এই ঘৃণিত অর্থ মুখে আনিয়াছিল, তাহার শিক্ষার্থ, তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার কলঙ্ক গেল না।

যখন লিখিতে বসিয়াছি, তখন স্পষ্ট কথা বলা ভাল—আমি প্রসন্নের একটু অনুরাগী বটে। তাহার অনেক কারণ আছে—প্রথমতঃ প্রসন্ন যে দুগ্ধ দেয় তাহা নির্জ্জল, এবং দামে সস্তা; দ্বিতীয়, সে কখন কখন ক্ষীর সর নবনীত আমাকে

বিনামূল্যে দিয়া যায়; তৃতীয় সে একদিন আমাকে কহিয়াছিল, "দাদাঠাকুর, তোমার দপ্তরে ও কিসের কাগজ ?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুনবি ?" সে বলিল "শুনিব।" আমি তাহাকে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলাম—সে বসিয়া শুনিল। এত গুণে কোন্ লিপিব্যবসায়ী ব্যক্তি বশীভূত না হয় ? প্রসন্নের গুণের কথা আর অধিক কি বলিব—সে আমার অনুরোধে আফিম্ ধরিয়াছিল।

এইসকল গুণে, আমার মন কখন কখন প্রসন্নের ঘরের জানেলার নীচে ঘুরিয়া বেড়াইত, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কেবল তাহার ঘরের জানেলার নীচে নয়, তাহার গোহালঘরের আগড়ের পাশেও উঁকি মারিত। প্রসন্নের প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ, তাহার মঙ্গলা নামে গাইয়ের প্রতিও তদ্রূপ। একজন ক্ষীর সর নবনীতের আকর; দ্বিতীয়, তাহার দানকর্ত্রী। গঙ্গা বিষ্ণুপদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভগীরথ তাঁহাকে আনিয়াছেন; মঙ্গলা আমার বিষ্ণুপদ; প্রসন্ন আমার ভগীরথ; আমি দুই জনকেই সমান ভালবাসি। প্রসন্ন এবং তাহার গাই, উভয়েই সুন্দরী; উভয়েই স্থূলাঙ্গী, লাবণ্যময়ী, এবং ঘটোধ্নী। একজন গব্যরস সৃজন করেন, আর একজন হাস্যরস সৃজন করেন। আমি উভয়েরই নিকট বিনামূল্যে বিক্রীত।

কিন্তু আজি কালি সন্ধান করিয়া দেখিলাম, প্রসন্নের গবাক্ষতলে, অথবা তাহার গোহালঘরে আমার মন নাই। আমার মন কোথা গেল ?

কাঁদিতে কাঁদিতে পথে বাহির হইলাম। দেখিলাম, এক যুবতী জলের কলসী কক্ষে লইয়া যাইতেছে; তাহার মুখের উপর গভীরকৃষ্ণ দোদুল্যমান কুঞ্চিতালকরাজি, গভীর কৃষ্ণ ভ্রূযুগ, এবং গভীর কৃষ্ণ চঞ্চল নয়নতারা দেখিয়া, বোধ হইল যেন পদ্মবনে কতকগুলা ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—বসিতেছে না, উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহার গমনে যেরূপ অঙ্গ দুলিতেছিল, বোধ হইল যেন লাবণ্যের নদীতে ছোট ছোট ঢেউ উঠিতেছে; তাহার প্রতি পদক্ষেপে বোধ হইল যেন পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল, নিঃসন্দেহ এই আমার মন চুরি করিয়াছে। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সে ফিরিয়া দেখিয়া, ঈষৎ রুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি ও ? সঙ্গ নিয়েছ কেন ?"

আমি বলিলাম, "তুমি আমার মন চুরি করিয়াছ।"

যুবতী কটূক্তি করিয়া গালি দিল। বলিল, "চুরি করি নাই। তোমার ভগিনী আমাকে যাচাই করিতে দিয়াছিল। দর কষিয়া আমি ফিরাইয়া দিয়াছি।"

সেই অবধি শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, মনের সন্ধানে আর রসিকতা করিতে প্রয়াস পাই না কিন্তু মনে মনে বুঝিয়াছি যে এ সংসারে আমার মন কোথাও নাই। রহস্য

ছাড়িয়া সত্য কথা বলিতেছি, কিছুতে আমার আর মন নাই। শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতায় মন নাই ; যে রহস্যালাপের আমি প্রিয় ছিলাম সে রহস্যালাপে আমার মন নাই। আমার কতকগুলি ছেঁড়া পুথি ছিল—তাহাতে আমার মন থাকিত, তাহাতে আমার মন নাই। অর্থসংগ্রহে কখন ছিল না—এখনও নাই। কিছুতে আমার মন নাই—আমার মন কোথা গেল ?

বুঝিয়াছি। লঘুচেতাদিগের মনের বন্ধন চাই ; নহিলে মন উড়িয়া যায়। আমি কখন কিছুতে মন বাঁধি নাই—এজন্য কিছুতেই মন নাই। এ সংসারে আমরা কি করিতে আসি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয় কেবল মন বাঁধা দিতেই আসি। আমি চিরকাল আপনার রহিলাম—পরের হইলাম না, এই জন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই। যাহারা স্বভাবতঃ নিতান্ত আত্মপ্রিয়, তাহারাও বিবাহ করিয়া, সংসারী হইয়া, স্ত্রী পুত্রের নিকট আত্ম সমর্পণ করে, এজন্য তাহারা সুখী। নচেৎ তাহারা কিছুতেই সুখী হইত না। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল্য নাই। ধন, যশঃ, ইন্দ্রিয়াদি লব্ধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। এ সকল প্রথম বারে যে পরিমাণে সুখদায়ক হয়, দ্বিতীয়বারে সে পরিমাণে হয় না, তৃতীয় বারে আরও অল্প সুখদায়ক হয়, ক্রমে অভ্যাসে তাহায় কিছুই সুখ থাকে না। সুখ থাকে না, কিন্তু দুইটি অসুখের কারণ জন্মে ; প্রথম, অভ্যস্ত বস্তুর ভাবে সুখ না হউক, অভাবে গুরুতর অসুখ হয় ; এবং অপরিতোষণীয়া আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিতে যন্ত্রণা হয়। অতএব পৃথিবীতে যে সকল বিষয় কাম্য বস্তু বলিয়া চির-পরিচিত, তাহা সকলই অতৃপ্তিকর, এবং দুঃখের মূল। সকল স্থানেই যশের অনুগামিনী নিন্দা ; ইন্দ্রিয়সুখের অনুগামী রোগ ; ধনের সঙ্গে ক্ষতি ও মনস্তাপ ; কান্তবপু জরাগ্রস্ত বা ব্যাধিদুষ্ট হয় ; সুনামেও মিথ্যা কলঙ্ক রটে ; ধন, পত্নীজারে ও ভোগ করে ; মান সম্ভ্রম, মেঘমালার ন্যায় শরতের পর আর থাকে না। বিদ্যা, তৃপ্তিদায়িনী নহে ; কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায় ; এ সংসারের তত্ব জিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে না ; স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে বিদ্যা কখন সক্ষম হয় না। কখন শুনিয়াছ কেহ বলিয়াছে, আমি ধনোপার্জ্জন করিয়া সুখী হইয়াছি, বা আমি যশস্বী হইয়া সুখী হইয়াছি ? যেই এই কয় ছত্র পড়িবে, সেই বেশ করিয়া স্মরণ করিয়া দেখুক, কখন এমন শুনিয়াছে কি না। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কেহ এমত কথা কখন শুনে নাই। ইহার অপেক্ষা ধন মানাদির অকার্য্যকারিতার গুরুতর প্রমাণ আর কি পাওয়া যাইতে পারে ? বিস্ময়ের বিষয় এই, যে এমন অকাট্য প্রমাণ থাকিতেও মনুষ্য মাত্রেই তাহার জন্য প্রাণপাত করে। এ কেবল কুশিক্ষার গুণ। মাতৃস্তন্য দুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ধন মানাদির সর্ব্বসারবত্তায়

বিশ্বাস শিশুর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে থাকে—শিশু দেখে রাত্রিদিন, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, গুরু, ভৃত্য, প্রতিবেশী, শত্রুমিত্র সকলেই প্রাণপণে হা অর্থ, হা যশ, হা মান, হা অন্ন, হা রূপ করিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং শিশু অস্ফুটবাক্যাবস্থাতেই সেই পথে গমন করিতে শিখে। কবে মনুষ্য নিত্য সুখের একমাত্র মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে ? যত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, দার্শনিক, সংসার তত্ত্ববিৎ, যে কেহ আস্ফালন কর, সকলে মিলিয়া দেখ, পরসুখবর্দ্ধন ভিন্ন মনুষ্যের অন্য সুখের মূল আছে কি না ? নাই। আমি মরিয়া ছাই হইব, আমার নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি একদিন মনুষ্য মাত্রে আমার এই কথা বুঝিবে, যে মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই !!! এখন যেমন লোকে, উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, একদিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা একদিন ফলিবে ! ফলিবে, কিন্তু কত দিনে ! হায়, কে বলিবে, কত দিনে !

কথাটি প্রাচীন। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে, শাক্য সিংহ এই কথা কত প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর, শত সহস্র লোক-শিক্ষক শত সহস্রবার এই শিক্ষা শিখাইয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই লোকে শিখে না—কিছুতেই আত্মাদরের ইন্দ্রজাল কাটাইয়া উঠিতে পারে না। আবার আমাদের দেশ ইংরেজি মুলুক হইয়া এ বিষয়ে বড় গণ্ডগোল বাঁধিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা, ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে "মেটিরিয়েল্ প্রস্পেরিটির" *উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজ জাতি বাহ্য সম্পদ বড় ভাল বাসেন—ইংরেজি সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন—তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্য সম্পদ সাধনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভাল বাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্ত্তি সকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে—সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কেবল বাহ্য সম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। দেখ কত বাণিজ্য বাড়িতেছে---দেখ কেমন রেইলওয়েতে হিন্দুভূমি জালনিবদ্ধ হইয়া উঠিল---দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু ! দেখিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে, তোমার রেইলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে ? আমার এই হারাণ মন খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে ? কাহারও মনের আগুন নিবাইতে পারিবে ? ঐ যে কৃপণ ধনতৃষায় মরিতেছে, উহার তৃষা নিবারণ করিবে ? অপমানিতের অপমান ফিরাইতে পারিবে ? রূপোন্মত্তের ক্রোড়ে রূপসীকে তুলিয়া বসাইতে পারিবে ? না পারে, তবে তোমার রেইলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি উপাড়িয়া জলে ফেলিয়া দাও---কমলাকান্ত শর্ম্মা তাতে ক্ষতি বিবেচনা করিবেন না।

* বাহ্য সম্পদ

কি ইংরেজি কি বাঙ্গালা যে সম্বাদ পত্র, সাময়িক পত্র, স্পীচ, ডিবেট, লেক্‌চর, যাহা কিছু পড়ি বা শুনি, তাহাতে এই বাহ্য সম্পদ ভিন্ন আর কোন বিষয়ের কোন কথা দেখিতে পাই না। হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা কর! হর হর বম্ বম্! টাকার রাশির উপর টাকা ঢাল! টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা নতি, টাকা গতি! টাকা ধর্ম্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ! ও পথে যাইও না, দেশের টাকা কমিবে, ও পথে যাও, দেশের টাকা বাড়িবে! বম্ বম্ হর হর! টাকা বাড়াও, টাকা বাড়াও! রেইলওয়ে টেলিগ্রাফ অর্থপ্রসূতী ও মন্দিরে প্রণাম কর! যাতে টাকা বাড়ে এমন কর! শূণ্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক! টাকার ঝনঝনিতে ভারতবর্ষ পূরিয়া যাউক! মন? মন, আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই; টাঁকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে। টাকাই বাহ্য সম্পদ। হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা কর। এ পূজার তাম্র শ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত; এডাম স্মিথপুরাণ এবং মিল তন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়; এ উৎসবে ইংরেজি সম্বাদপত্র সকল ঢাক ঢোল, বাঙ্গালা সম্বাদপত্র কাঁশীদার; শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য, এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি। এ পূজার ফল, ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক। তবে, আইস সবে মিলিয়া বাহ্য সম্পদের পূজা করি। আইস, যশোগঙ্গার জলে ধৌত করিয়া, বঞ্চনা বিল্বদলে মিষ্টকথা চন্দন মাখাইয়া, এই মহাদেবের পূজা করি। বল, হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা করি। বাজা ভাই ঢাক ঢোল;— ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্, ছ্যাড়্ ছ্যাড়া ছ্যাড় ছ্যাড়! বাজা ভাই কাঁশিদার, ট্যাং ট্যাং ট্যাং নাট্যাং নাট্যাং! আসুন পুরোহিত মহাশয়! মন্ত্র বলুন! আমাদের এই বহুকালের পুরাতন ঘৃত টুকু লইয়া স্বধা স্বাহা বলিয়া আগুনে ঢালুন্। কোথা ভাই ইউটিলিটেরিয়েন কামার! পাঁটা হাড়িকাটে ফেলিয়াছি; একবার বাবা পঞ্চানন্দের* নাম করিয়া, এক কোপে পাচার কর! হর হর বম্ বম্! কমলাকান্ত দাঁড়াইয়া আছে, মুড়িটি দিও তোমরা স্বচ্ছন্দে পূজা কর!

পূজা কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাকে গোটাকত কথা বুঝাইয়া দাও। তোমার বাহ্য সম্পদে কয়জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে? কয়জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে? কয়জন অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক হইয়াছে? কয়জন অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে? একজনও না? যদি না হইয়া থাকে, তবে তোমার এ ছাই আমরা চাহি না— আমি হুকুম দিতেছি, এ ছাই ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দাও।

---

*পঞ্চানন নাম প্রসিদ্ধ নহে—পঞ্চানন্দই প্রসিদ্ধ। মদ, মাংস, গাড়িঘুড়ি, পোষাক, এবং বেশ্যা—এই পাঁচটি আনন্দে এই নূতন পঞ্চানন্দ।

তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদর নামে বৃহৎ গহ্বর, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই; নহিলে নয়। তোমরা বল যে এই গর্ত্ত, যাহাতে সকলেরই ভাল করিয়া বুজে আমরা সেই চেষ্টায় আছি। আমি বলি সে মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু উহার অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই। গর্ত্ত বুজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছ, যে আর সকল কথা ভুলিয়া গেলে। বরং গর্ত্তের এক কোণ খালি থাকে, সেও ভাল, তবু আর আর দিগে একটু মন দেওয়া উচিত। গর্ত্ত বুজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী; তাহার বৃদ্ধির কি কোন উপায় হইতে পারে না? তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না? একটু বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেকল হইয়া যাইবে।

আমি কেবল চিরকাল গর্ত্ত বুজাইয়া আসিয়াছি—কখন পরের জন্য ভাবি নাই। এইজন্য সকল হারাইয়া বসিয়াছি—সংসারে আমার সুখ নাই; পৃথিবীতে আমার থাকিবার আর প্রয়োজন দেখিনা। পরের বোঝা কেন ঘাড়ে করিব, এই ভাবিয়া সংসারী হই নাই। তাহার ফল এই যে কিছুতেই আমার মন নাই। আমি সুখী নহি। কেন হইবে? আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি?

সুখে আমার অধিকার নাই কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে তোমরা বিবাহ করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে যদি বিবাহ নিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মার্জ্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্ম পরিবারকে ভাল বাসিয়া তাবৎ মনুষ্য জাতিকে ভাল বাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল তবে বিবাহে প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ, অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক তথাপি যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয় সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে কমলাকান্ত যুক্ত করে সকলের নিকট নিবেদন করিতেছে, তোমরা কেহ কমলাকান্তের একটি বিবাহ দিতে পার।

হেমলতা নাটক। শ্রীহরলাল রায় প্রণীত। কলিকাতা, বহুবাজার স্মিথ এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮০।

আধুনিক প্রকৃত নাটক সমালোচন করা আমাদের অদৃষ্টে ঘটিল না; বোধ হয় শীঘ্র ঘটিবে না। অন্তঃপ্রকৃতির ঘাত প্রতিঘাত চিত্র করাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। ধারাবাহিক কথোপকথন দ্বারা সুন্দর গল্প রচনা নাটকের অবয়ব হইতে পারে, কিন্তু তাহা নাটকের জীবন নহে। অন্তঃপ্রকৃতি দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতি কিরূপ চালিত হয়, ও কিরূপে চালিত হয়, তাহা প্রদর্শনই নাটককারের প্রধান কার্য্য। সেইরূপ বহিঃপ্রকৃতি দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতি কিরূপ চালিত হয় তাহা প্রদর্শন করাই নবেল রচয়িতার প্রধান কার্য্য।

উত্তর চরিতের তৃতীয়াঙ্কে এই দুই বিভিন্ন ভাবের আমরা সুন্দর উদাহরণ পাইতে পারি। ছায়া রূপিণী সীতা জনস্থানে প্রবেশ করিয়াছেন; পূর্ব্ব সুখানুস্মৃতি ক্রমে অন্তর্বিচলিতা হইয়াছেন; কিন্তু এরূপ মানস চালন নাটক নহে; ইহা নবেল। যখন মত্তহস্তী আসিয়া সীতার পঞ্চবটী বাস সময় পালিত করিশাবকের প্রতি আক্রমণ করিল, বাসন্তী দেখিতে পাইয়া, "সর্ব্বনাশ হইল, সীতার পালিত করি করভকে মারিয়া ফেলিল।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, সীতা মোহ বশতঃ যখন "আর্য্য পুত্র, আমার পুত্রকে রক্ষা কর" বলিয়া রামকে সম্বোধন করিলেন, তখনও উত্তর চরিত নবেল, নাটক নহে। বাসন্তী মুখনির্গত শব্দ শ্রবণে সীতা মানস চালিতা হইয়াছিলেন, বাসন্তীর বাক্য ঘাতে নহে। ঘাত প্রতিঘাত না হইলে নাটক হয় না। আবার যখন রাম বিমান রাখিতে বলিলে, সীতা তাঁহার গম্ভীর স্বর শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "একি! কেএ জলভরা মেঘের মত স্তনিত গম্ভীর শব্দ করিল? আমার শ্রবণ বিবর ভরিয়া গেল! আজি এ মন্দভাগিনীকে কে সহসা আহ্লাদিত করিল?" তখনও সীতা নবেলের নায়িকা। এদিকে পঞ্চবটী দর্শনে রামের শোকপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে; রাম "সীতে, সীতে"

বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন ; এ শোক নবেলের শোক, এ উচ্ছ্বাস নবেলের উচ্ছ্বাস। কিন্তু বাসন্তী যখন রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন ত ?" তখনই প্রকৃত নাটক আরম্ভ হইল। দুই অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল। প্রশ্ন শুনিয়া রাম ভাবিতে লাগিলেন "বাসন্তী 'মহারাজ' বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন ? আর প্রথমেই কুমার লক্ষ্মণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন কেন ?" এইরূপ অন্তঃচালন নাটকের জীবন।

বাসন্তী আঘাত করিতেছেন ;—"আপনি কেমন করিয়া এ কাজ করিলেন ? আঘাতের ফল : "লোকে বুঝে না বলিয়া।" পুনরায় আঘাত : "কেন বুঝে না ?" আঘাতে অবসন্ন অন্তঃ প্রকৃতি উত্তর দিল "তাহারাই জানে।" পুনর্ব্বার কঠোর আঘাত : "নিষ্ঠুর! দেখিতেছি কেবল যশঃ তোমার অত্যন্ত প্রিয়!" রাম প্রকৃতি ছিন্ন হইয়া গেল। ইহার কিছু পরেই আবার বাসন্তী হৃদয়ে প্রতিঘাত হইল। রাম-শোক প্রবাহের উল্টাবান বাসন্তী হৃদয়ে আঘাত করিল ; বাসন্তী রামকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলিলেন ; কিয়ৎক্ষণ পরে, রামকে অন্যত্র উঠাইয়া লইয়া গেলেন।

এইরূপ ঘাত প্রতিঘাতই নাটকের জীবন ; দুরদৃষ্ট ক্রমে বাঙ্গালা ভাষার কোন নাটকেই এরূপ চাঞ্চল্যের চিত্র দেখিতে পাই না। হেমলতা নাটকেও নাই। এক ব্যক্তির কথা ক্রমে অন্য ব্যক্তির অল্প পরিমাণে মানস পরিবর্ত্তন হইলেই যদি যথেষ্ট হইত তাহা হইলে হেমলতা উত্তম নাটক হইত। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। প্রধান প্রধান নাটকে একটি অথবা একাধিক প্রকৃতি অন্য প্রকৃতিকে ক্রমে ক্রমে চালিত করিয়া একদিকে লইয়া যায়। ভূত যোনীর নৈশ উপদেশে, ওফিলিয়ার পিতৃ পরামর্শ মত উত্ত্যাগ বাক্যে, ও নিজ অন্তঃপরীক্ষায় হামলেটকে কোথায় লইয়া গিয়াছিল, পাঠক স্মরণ করুন। ডাকিনীগণের ভাবিষ্যদ্বচনে, লেডি মাকবেথের উত্তেজনে, মাকবেথকে কোথায় লইয়া গিয়াছিল ; পাঠক স্মরণ করুন। এরূপ কিছুই হেমলতা নাটকে নাই। তথাপি হেমলতা নাটক, প্রকৃত নাটক না হউক পাঠ্য পুস্তক বটে ; পাঠ্য কাব্যও বটে। রসপূর্ণ উপন্যাস রচনা নিতান্ত সামান্য ক্ষমতার কর্ম্ম নহে। হেমলতা নাটক রসপূর্ণ উপন্যাস বটে, ইহাতে বীররস, করুণ রস উভয় মিশ্রিত হইয়া আছে।

উপন্যাস রসপূর্ণ বটে কিন্তু লেখায় তেমন রস নাই। এটি এই গ্রন্থের প্রধান দোষ। গ্রন্থের কতকগুলি গুণ আছে। ইহার ভাষা সুন্দর সরল। উপন্যাসটি সুন্দর গ্রথিত। অশ্লীলতাদি কোন দোষ ইহাতে নাই।

উপন্যাস ভাগে একটি মাত্র দোষ আছে। দোষ ;—কমলাদেবীকে উপন্যাস মধ্যে স্থান দান করা। মাতৃস্নেহ করুণ রসের আদর্শ বটে, কিন্তু এ মাতৃস্নেহ গ্রন্থের

ঘটনাবলীর সহিত কিমিয় সংযোগ লাভ করিতে পারে নাই। জলের উপর তৈলের ন্যায় কমলাদেবী ঘটনাপুঞ্জমধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন।

যাহা হউক সকল দিক বিবেচনা করিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে হেমলতা নাটক এখনকার প্রচলিত অনেক নাটক অপেক্ষা অনেকাংশে উত্তম। ইহার পাঠকালে মনোমধ্যে নানা রসের উদয় হয়; এবং বোধ হয় অভিনীত হইলে, সম্পূর্ণ মনোরঞ্জক হইবে। ইহা নাটক না হইয়াও অভিনয় যোগ্য। ভরসা করি ন্যাশনাল থিয়েটার, মোহান্ত নাটক, নবীন নাটক, নাপিতেশ্বর নাটক পরিত্যাগ করিয়া হেমলতা নাটকের ন্যায় বিশুদ্ধ সরল রসপূর্ণ উপন্যাসের অভিনয় করিয়া কৃতবিদ্যের মনোরঞ্জন ও সাধারণের উপকার সাধনের চেষ্টা করিবেন।

অবকাশ-তোষিণী। মাসিকপত্র ও সমালোচন। কলিকাতা। নিউ স্কুল বুক প্রেস।

পত্রখানির আকার ক্ষুদ্র, কিন্তু ভবিষ্যতে বৃদ্ধির ভরসা আছে। লেখা যতদূর পড়িয়াছি, ততদূর সন্তোষজনক বোধ হইয়াছে।

অমরনাথ নাটক। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র। কলিকাতা।

আমরা এই গ্রন্থ সমালোচনায় অক্ষম। গ্রন্থকারের কোন দোষ নাই—দোষ আমাদের। আমরা ইহা পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। পড়িব, এই ভরসায় কয় মাস এই গ্রন্থ ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। নাটকখানি ২৯৪ পৃষ্ঠা। মনুষ্য জীবন নশ্বর—চিরজীবী কেহ নহে। এ ক্ষণিক জীবনের কিয়দংশ তিনশত পৃষ্ঠা নাটক পাঠ করিয়া অতিবাহিত করায় কোন পাপ আছে কি না, এই মীমাংসায় আমাদের কয়মাস কাটিয়া গিয়াছে। এখনও আমরা কোন সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই। যদি ভবিষ্যতে, আমরা এরূপ মীমাংসা করি, যে তিনশত পৃষ্ঠা নাটক পাঠ করিয়া ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্য জীবনের কিয়দংশ অতিবাহিত করায় পাপ নাই, তবে আমরা ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে, ভরসা করি যে আমরা গ্রন্থ না পড়িয়া প্রশংসা করিলাম না, পাঠকগণ ইহার জন্য আমাদের কাছে বাধিত হইবেন। এবং না পড়িয়া যে নিন্দা করিলাম না, এজন্য গ্রন্থকার বাধিত হইবেন। যদি গ্রন্থকার ক্ষুণ্ণ হন, তবে আমরা তাহাতেও প্রস্তুত আছি।

দ্বিতীয় বর্ষ : একাদশ সংখ্যা
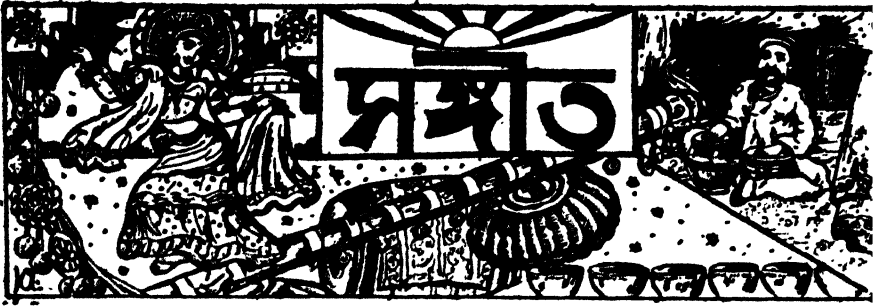
ভারতবর্ষের সঙ্গীত-শাস্ত্র

শশধরের বিমল রশ্মিজালে বিভূষিত, চতুর্দ্দিক শুভ্রময়। উদ্যানে নানাবিধ প্রসূন প্রস্ফুটিত, চতুর্দ্দিক সৌগন্ধে আমোদিত, স্বভাব যেন রজনীদেবীর সহিত কৌতুক করিতেছেন। উদ্যানে মাধবীলতার বিটপী সম্মুখে ভরতমুনি বীণা বাদন করিয়া সমস্ত স্বভাবের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছেন ; শুনিয়া বনদেবীও বিমোহিতা। এতাদৃশ দৃশ্য কাহার না প্রীতিকর! এমত সময়ে সঙ্গীতের প্রধান অধ্যাপকের নিকট বীণাধ্বনি শুনিয়া কাহার না হৃদয় অপূর্ব্ব রসে গলিয়া যায়। অরফিউসের সঙ্গীতে কাননের পশু পক্ষীও মোহিত হইত, সুতরাং মানব-হৃদয় যদি সঙ্গীতে দ্রব না হয়, তবে সে ব্যক্তিকে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলিতে হয় ; কাজেই শাস্ত্রকারেরা কহেন—

"জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণং লয়ঃ।
লয়কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি ॥"

প্রাচীনকালে কবি ও গায়ক একব্যক্তি ছিলেন, যিনি কবিতা প্রস্তুত করিতেন তিনিই উহা নানাবিধ স্বরে গান করিতেন, পরে লিখিবার প্রণালী সৃষ্টি হইলে ঐ সকল কবিতা লিপিবদ্ধ হইল। প্রাচীন ঋষিগণ বৈদিক সূক্ত প্রণয়নানন্তর গান করিতেন, তাহার মধ্যে সামবেদ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎস্বর দ্বারা গেয়। সামগান দ্বিবিধ, গ্রাম্য ও আরণ্যগান। এই সকল গানাদির বিধি ও স্বরাদি নিরূপক প্রাচীন গ্রন্থের নাম নারদীয়-শিক্ষা। সামবেদের গান্ধর্ব্ববেদ উপবেদ। উহা ভরতমুনি কৃত তথাহি প্রস্থান ভেদ :—

গান্ধর্ব্ববেদ শাস্ত্রং ভগবতা ভরতেন প্রণীতং। তত্রগীতবাদ্য নৃত্য ভেদেন বহুবিধোঽর্থঃ। নানা মুনিভিঃ প্রণীতং তৎসর্ব্বমস্য চ সর্ব্বস্য লৌকিকবৎ প্রয়োজন-ভেদোদ্রষ্টব্যঃ।

ভরতের গান্ধর্ব্ববেদ এক্ষণে অতীব দুষ্প্রাপ্য ; কিন্তু এই গ্রন্থের মতাদি অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। আর্য্যদিগের সঙ্গীতশাস্ত্র বেদ-মূলক। ঋষিগণ, দেবতাগণ সকলেই এই সঙ্গীত গান করিতেন।

অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় হিন্দুদিগের সঙ্গীতশাস্ত্র পৃথিবীর সমস্ত জনপদের সঙ্গীত বিদ্যা অপেক্ষা প্রাচীন। সামবেদীয় আরণ্য সংহিতার ন্যায় সদ্ভাবব্যঞ্জক মনোহর প্রাচীন সঙ্গীত আর কোন্ জাতির আছে? এক্ষণে সঙ্গীত বিদ্যার যেরূপ হতাদর হইয়া উঠিয়াছে, আর্যকালে সেরূপ ছিল না। ঋষিগণ সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার স্বশিষ্যবর্গকে অতীব যত্ন সহকারে শিক্ষা দিতেন। মহামুনি ভরত সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, তিনি স্বর্গে নাট্য ও সঙ্গীত শাস্ত্রের শিক্ষা দিতেন। তৎকৃত নাট্য শাস্ত্র অতি প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আলঙ্কারিকেরা সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ সকল রচনা করিয়াছেন। ভরতের পরে সোমেশ্বর, কল্লিনাথ এবং হনুমন্ত সঙ্গীতশাস্ত্রের অনুশীলন করেন। ইঁহাদিগের পরস্পরের মত বিভিন্ন। সোমেশ্বর, ব্রহ্মার মত, ভরত মত, হনুমন্ত মত এবং কল্লিনাথ মত, এই চারি মত, স্বকৃত রাগবিবোধ গ্রন্থে সংকলন করিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত আছে অধুনা হনুমন্ত মত প্রচলিত। হনুমন্ত কৃত গ্রন্থ সপ্ত অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রথম স্বরাধ্যায়, দ্বিতীয় রাগাধ্যায়, তৃতীয় তানাধ্যায়, চতুর্থ নৃত্যাধ্যায়, পঞ্চম ভাবাধ্যায়, ষষ্ঠ কোকাধ্যায়, সপ্তম হস্তাধ্যায়। এই গ্রন্থ এক্ষণে লোপ হইয়াছে। পূর্ব্বে অসংখ্য সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, এক্ষণে শুভঙ্কর কৃত সঙ্গীত দামোদর, বীরনারায়ণ কৃত সঙ্গীত নির্ণয়, হরি ভট্ট কৃত সঙ্গীতসার, সঙ্গীতার্ণব, সঙ্গীত রত্নাবলী, পুরোষোত্তম কৃত সঙ্গীত নারায়ণ, নারদ পঞ্চমসারসংহিতা, সঙ্গীত শিল্লন কৃত রাগ সর্ব্বস্বসার, শার্ঙ্গদেব কৃত সঙ্গীত রত্নাকর, সিংহভূপালকৃত সঙ্গীত সুধাকর, হরি ভট্ট কৃত সঙ্গীত দর্পণ, রাগমালিকা, হরিনারায়ণ কৃত সঙ্গীতসার, নারদ সংবাদ, নাদপুরাণ, রত্নমালা, সঙ্গীত কৌস্তুভ, অন্ধক ভট্ট কৃত তাণ্ডবতরঙ্গেশ্বর, গীতসিদ্ধান্ত ভাস্কর, বিশ্ববসুকৃত ধ্বনি মঞ্জরী, রাগার্ণব, প্রভৃতি বহু অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহার মধ্যে কোন খানি সম্পূর্ণ এবং কোন খানি বা খণ্ডিত। ইহার অধিকাংশ টীকাবিহীন এবং কোন কোন গ্রন্থ মূর্খ লিপিকরদিগের দোষে এতাদৃশ কদর্য্য ভাবে লিখিত হইয়াছে, যে তাহার মধ্যে দন্তস্ফুট হওয়াও কঠিন। সুতরাং সে গুলি এক প্রকার লোপ হইয়াছে বলিতে হইবেক। কোন কোন গ্রন্থ রাগ রাগিণীর রূপ বর্ণনায় পরিপূর্ণ, অন্য সার কথা কিছুই নাই এবং কোন খানি বা অলঙ্কার গ্রন্থের ছায়া মাত্র। আমরা বহু অনুসন্ধানের পর সঙ্গীত দামোদর সংগ্রহ করিয়াছি। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম যে ইহার মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় যাবতীয় গুহ্য কথা প্রাপ্ত হইব কিন্তু গ্রন্থ পাঠে এক কালে হতাশ হইলাম। এখানি এক প্রকার অলঙ্কার গ্রন্থ মাত্র, ইহার মধ্যে রাগাদির ভেদ কিছুই সঙ্কলিত হয় নাই। শুভঙ্কর ইহার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

ভাবো হাবানুভাবৌ গতিসময় দশা স্থান দূতী বিভাবাঃ।
স্ত্রী পুংসৌ নাদগীত স্বরগমকগণা মূর্চ্ছনাবর্গতালাঃ।
গ্রামো রাগাঙ্ ত্রিতাল শ্রুতি সচিবকলা বাদ্য মাত্রাঙ্গহাবা
নৃত্যান্ নির্দ্দোষ গানানভিনয়ন রসাঃ কৃষ্ণ লীলা বহন্তু॥

এদিকে আড়ম্বর অনেক কিন্তু কাজে কিছুই করেন নাই।

মহর্ষি বাল্মীকির সমকালজন্মা ভরত মুনির পূর্ব্বে সংগীত ছিল বলিয়া অনুভূত হয়, কিন্তু গ্রন্থ প্রণয়ন প্রথা বা উপদেশ কৌশল ছিল না—ইহাও প্রমাণ করা যায়। ভরতের সময় হইতেই সংগীতের গ্রন্থাদি প্রচার ও উপদেশ কৌশল আরম্ভ হয়। ক্রমে সংগীতাচার্য্য অনেক হইলেন, তন্নিবন্ধন অনেক মতভেদও উপস্থিত হইল। ফল, মতভেদের সূত্রপাত ঐ ভরতের সময়েই হইয়াছিল। আর্ষকাল অতীত হইলে, আচার্য্যকালেও অনেক গ্রন্থ, অনেক মত, অনেক রীতি প্রকাশ পাইয়াছিল। অতঃপরেই অবর্বাগ্ আচার্য্য—এইকালেও অনেক গ্রন্থ অনেক মত জন্মে। এই অবর্বাগাচার্য্য কালের অবসান সময়েই সংগীত দর্পণের জন্ম।

পূর্ব্বের লিখিত সংগীত গ্রন্থের মধ্যে সংগীত দর্পণ অতি প্রাঞ্জল এবং এখানি সঙ্গীতাচার্য্যদিগের গ্রন্থ হইতে অতি যত্ন সহকারে সঙ্কলিত হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা অন্যান্য সঙ্গীত গ্রন্থ বর্ত্তমান সত্বেও ইহা হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম।

"প্রণম্য শিরসা দেবৌ পিতামহ মহেশ্বরৌ।
সংগীত শাস্ত্র সংক্ষেপঃ সারতোঽয়ং ময়োচ্যতে॥
ভরতাদি মতং সর্ব্ব মালোড্যাতিপ্রযত্নতঃ।
শ্রীমদ্দামোদরাখ্যেণ সজ্জনানন্দ হেতুনা।
প্রচরদ্রূপ সংগীত সারোদ্ধারোঽভিধীয়তে।
গীতং——————"

সংগীত দর্পণের এই প্রতিজ্ঞাংশপাঠে জানা যায়—ইহার প্রণয়নকর্ত্তা দামোদর, দামোদরের দ্বারা কোন অভিনব সংগীতের উদয় হয় নাই, গ্রন্থ প্রণয়ণের উদ্দেশ্য কেবল সাধারণের অগোচর সংগীতের সাধারণতঃ শিক্ষা দেওয়া মাত্র।

গীত শব্দে যেমন 'গান' বুঝায় সংগীত শব্দে আবার অন্য প্রকার বুঝায়। নৃত্য, গীত, বাদ্য—এই ত্রিতয়কে লক্ষ্য করিয়া সংগীত শব্দটি প্রযুক্ত হয়। যথা—

"গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়ঃ সংগীত মুচ্যতে"।

এই সংগীত আবার দুই প্রকার। মার্গ সঙ্গীত ও দেশী সংগীত। যথা—

"মার্গদেশী বিভাগেন সংগীতং দ্বিবিধং মতম।"

এই স্থলের মর্ম্ম কি? বুঝি না। কোন রীতিতে ঐ দুই প্রকার ভাগ নিষ্পত্তি

হইল, তাহাও বুঝি না। বর্ত্তমান যে কিছু সঙ্গীত ব্যবহার প্রচার আছে, তাহা সব দেশী, তবে আবার "মার্গ সঙ্গীত" কোথায় পাইব? কি দিয়াই বা বুঝিব?

বর্ত্তমান সঙ্গীতাচার্য্য গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন "দেবলোকে যাহা গীত হইত, তাহাই মার্গ সঙ্গীত"—এ উপদেশে আমাদের মনস্তুষ্টি হয় না। অনুসন্ধান করিয়া স্বরূপ বিজ্ঞান লাভেও সমর্থ হই না। তবে, "—দ্রুহিণেন যদন্বিষ্টং প্রযুক্তং ভরতেনচ (৪) মহাদেবস্য পুরতস্তন্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদং।

ততোদেশস্থয়া রীত্যা যৎস্যাল্লোকানুরঞ্জকং।
দেশে দেশেতু সংগীতং তদ্দেশীত্যভি ধীয়তে।"

দর্পণকারের এই মার্গ দেশীয় লক্ষণব্যঞ্জক শ্লোক এবং "মার্গ" এই নাম—এতদুভয় অনুসারে এই প্রতীতি হয় যে, প্রথম প্রচারিত গীতি অর্থাৎ যৎকালে গীত সকল কোন রীতির অনুগত হয় নাই, কেবল ৭টী স্বর মাত্র অবলম্বন করিয়া গান হইত, আর তাল (কাল পরিচ্ছেদক আঘাত) মাত্র প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাই মার্গ সঙ্গীত বলিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে। "মার্গ" এই শব্দের সাধারণ অর্থ পথ। যে সঙ্গীত প্রাথমিক—প্রথম স্বরূপ অর্থাৎ যাহা অবলম্বন করিয়া অনন্তর জাত লোকেরা নানা দেশে নানা রীতিতে নানা প্রকারে বিস্তৃত করিয়া সঙ্গীতকে উন্নত করিয়াছে—ঐ অবলম্বিত বস্তুই মার্গ। ফল, মার্গসঙ্গীত যাহাই হউক, তাঁহা লইয়া অধিক প্রয়াস প্রকাশ করা অনর্থক। যাহা দেশী—তাহারই সাঙ্গোপাঙ্গ বস্তু আমাদের জ্ঞাতব্য ও শ্রোতব্য।

উপরোক্ত শ্লোকের অক্ষরার্থ এই যে—"দ্রুহিণ মুনি মহাদেবের নিকট যাহা অন্বেষণ করিয়াছিলেন, ভরতমুনি যাহা প্রয়োগ অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গে বিস্তৃত ও বিভূষিত করিয়াছেন, সেই মুক্তিপ্রদ সঙ্গীত মার্গ নামে অভিহিত হইল, অনন্তর, দেশ বিশেষের রীত্যনুযায়ী পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া লোকের চিত্তরঞ্জক হইয়া দেশেদেশে গীত হইয়াছে—এই নিমিত্ত ইহাকে দেশী নামে উল্লেখ করা হয়।" অপিচ, গীত সিদ্ধান্ত ভাস্কর নামক গ্রন্থেও অবিকল এইরূপ আভাস পাওয়া যায় যথা—

"অযুতানিচ ষট্ ত্রিংশৎ সহস্রাণি শতানিচ।
স্বরাণাং তাল যোগেন জ্ঞাতবান্ মুনি সত্তমঃ।
কোটয়ঃ পঞ্চ লক্ষাণি পঞ্চ তদ্বৎ সহস্রকং।
রাগিণ্যশ্চাথ রাগাশ্চ শিবকণ্ঠে বসন্ত্যমী।
প্রথমং মার্গরূপেণ প্রাপ্তবন্তো মহর্ষয়ঃ।
দ্রুহিণাদ্যাশ্চ তান্তেব————————"

সঙ্গীতের সাধারণ শক্তি অনুরক্তি। যাহাতে অনুরক্তি জন্মে না, তাহা সঙ্গীত বলিয়া গণ্য হয় না যথা———

"গীত বাদিত্র নৃত্যানাং রক্তিঃ সাধারণো গুণঃ"

সঙ্গীত শাস্ত্রে, অনুরক্তি জন্মিবার ৭টী হেতু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে প্রথমতঃ শারীর ব্যাপার (১) অনন্তর—নাদোৎপত্তি (২) তালাদি স্থান (৩) শ্রুতি (৪) শুদ্ধ (অবিকৃত) সপ্তস্বর (৫) বিকৃত দ্বাদশ স্বর (৬) বাদ্যাদি প্রভেদ চতুষ্টয় (৭) যথা—

"শারীরং নাদ সম্ভূতিঃ স্থানাদি শ্রুতয় স্তথা।
ততঃ শুদ্ধাঃ স্বরাঃ সপ্ত বিকৃতা দ্বাদশাপ্যমী (৭)
বাদ্যাদি ভেদাশ্চত্বারো রাগোৎপাদন হেতবঃ।

এই সকল সঙ্গীত শাস্ত্রানুসারে অবশ্য জ্ঞাতব্য সাঙ্গীতিক বস্তু।

ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, এই সপ্ত স্বরে পশু ও পক্ষীর অনুকরণ করিতে হইবেক। ষড়্জে ময়ূরের ন্যায়, ঋষভে বৃষের ন্যায়, গান্ধারে অজের ন্যায়, মধ্যমে ক্রৌঞ্চ সদৃশ, পঞ্চমে বাসন্তীয় কোকিলের ন্যায়, ধৈবতে কুঞ্জর, এবং নিষাদে অশ্বের ন্যায়, স্বর অনুকরণ করা বিধেয়। যথা—

"ষড়্জ রৌতি ময়ূরস্তু গাবোনদন্তি চর্ষভং
অজো রৌতিতু গান্ধারং ক্রৌঞ্চঃ কণতি মধ্যমং ॥
পুষ্প সাধারণে কালে কোকিলা রৌতি পঞ্চমং।
ধৈবতং কুঞ্জরো রৌতি নিষাদং হ্রেষতে হয়ঃ ॥"

এই সপ্তস্বর। এই স্বর শ্রুতি মূলক এবং ইহা হইতে সপ্ত স্বরের আদ্যাক্ষর স, রি, গ, ম, প, ধ, নি, ইহাতে স্বরালাপ হইয়া থাকে। যথা——

শ্রুতিভ্যঃ স্যুঃ স্বরা ষড়্জর্ষভ গান্ধার মধ্যমাঃ।
পঞ্চমো ধৈবতশ্চাপি নিষাদ ইতি সপ্ততে।
তেষাং সংসরিগমপধনিত্য পরামতা।

নাদ হইতে শ্রুতি, এবং শ্রুতি হইতে ষড়্জাদি সপ্ত স্বরের সৃষ্টি। যদ্দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করা যায় তাহাকেই রাগ বলে যথা—

"যস্ত শ্রবণ মাত্রেণ রঞ্জন্তে সকলাঃ প্রজাঃ
সর্ব্বানু রঞ্জনাদ্ধেতোস্তেন রাগ ইতি স্মৃতঃ।"

ঋষিগণ স্বর সাধন করিয়া নিরবয়বের নানা রূপ প্রদান করিলেন, সেগুলি একটি একটি রাগ রাগিণী হইল। ইহাতে তাঁহাদিগের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে; দার্শনিক ঋষিগণ পদার্থ স্থির করিয়া তাহার নানাবিধ তর্ক বিতর্ক

করিয়া সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন কিন্তু সঙ্গীতাচার্য্য ঋষিগণ কেবল চিন্তার কৌশলে অবয়ব বিহীন স্বর লইয়া নানা রাগের মূর্ত্তি স্থির করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের দার্শনিক আচার্য্যগণাপেক্ষাও ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে। ভরত এবং হনুমন্ত মতে ছয় রাগ যথা ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ, মেঘ। ইহার অন্তর্গত পাঁচটী করিয়া রাগিণী প্রত্যেকের প্রণয়িনী। কল্লিনাথ এবং সোমেশ্বর মতে এই ছয় রাগ যথা——

শ্রীরাগো বসন্তস্য পঞ্চমো ভৈরবস্তথা।
মেঘ রাগস্তু বিজ্ঞেয়ো ষষ্ঠো নটনারায়ণঃ।

এই ছয় রাগের অন্তর্গত রাগিণ্যাদি যথা——

——গৌরী কোলাহলংধারী দ্রাবিড়ী মালব কোশিকা।
ষষ্ঠোস্যাদ্দেব গান্ধারী শ্রীরাগাচ বিনির্ম্মিতা।
আদোলী কৌশিকী চৈব তথাচ পট্টমঞ্জরী।
গুণকরী চৈব দেশাখ্যা রামকরীচ বসন্তজা॥
ত্রিগুণাস্তং ভতীর্থীচ আভেরী কুকুভা তথা।
বিয়রাড়ী তথা চেরী ষড়েতে পঞ্চমে মতাঃ।
ভৈরবী গুজ্জরী চৈব ভাষা বেলায়লী তথা।
কর্ণাটী রক্ত হংসাচ ষড়েতে ভৈরবে মতাঃ॥
বঙ্গুলা মধুরা চৈব কামোদা চোষ সাটিকা।
দেবগিরি চ দেবালা ষড়েতে মেঘ রাগজাঃ।
ত্রোটকী মোটকী চৈব ঢুবিনট্ট বিরাটিকা।
মল্লারী সৈন্ধবী চৈব এতা নটনারায়ণে।

এই সকল রাগ, রাগিণী; ইহা হইতে নানাবিধ উপরাগ সৃষ্ট হইয়াছে। আদিমকাল কবিতার সময়, বেদে বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্যের রূপ কল্পিত হইয়া স্তোত্র রচিত হইল—সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে হৃদয় আকর্ষিত হইল, সঙ্গীতাচার্য্য ঋষিগণের আনন্দের সীমা রহিল না—কবিত্বের বিমল তরঙ্গে হৃদয় ভাবে গদ্‌গদ, তখন নানা রাগ রাগিণীর রূপ কল্পিত হইতে লাগিল, কোন রাগ বা বীর বেশধারী কোন রাগিণী বা মনোহর লাবণ্যবতী। সঙ্গীত তরঙ্গে মেঘের রূপ বর্ণন——

মেঘ রাগ অতি বীর্য্যবন্ত শ্যাম অঙ্গ।
ব্রহ্মার মস্তকে জন্ম রূপেতে অনঙ্গ॥
জটা জুট জড়াইয়া উষ্ণীষ বন্ধন।
খরতর করবাল করেতে ধারণ॥

তথাহি পটমঞ্জরীর ধ্যান————

————সখীকলাপৈঃ পরিহাস্য মানা
বিয়োগিনী কান্ত বিয়োগ দেহা।
পীনস্তনী চৈব ধরা প্রসুপ্তা
শ্যামা সুকেশী পটমঞ্জরীয়ং।

এই সকল রাগিণ্যাদি গান করিবার সময় নিরূপিত আছে এবং কোন রাগ আনন্দোৎসবে বা কোন রাগ শোক সময়ে কোন রাগ বা বীরোৎসবে গান করা বিধেয়। এসকল বিষয় কল্পনা সম্ভূত। রাগ ত্রিবিধ ওড়ব, খাড়ব, সম্পূর্ণ, অর্থাৎ ওড়ব রাগ ৫, খাড়বে ৬, এবং সম্পূর্ণরাগে সপ্ত সুর লাগে। হিন্দোল, মালকোষ প্রভৃতি ওড়ব, মেঘ, পুরিয়া, প্রভৃতি খাড়ব, ভৈরব, শ্রী, পঞ্চম, প্রভৃতি সম্পূর্ণ রাগ। এই রাগ পুনরায় শুদ্ধ, সালঙ্ক, এবং সঙ্কীর্ণ এই তিন শ্রেণীভুক্ত। শুদ্ধ অর্থাৎ যাহাতে কোন রাগের ছায়া লাগে না; যথা কানাড়া, মল্লারী প্রভৃতি, সালঙ্ক যাহাতে কোন রাগের আভা লাগে যথা ললিত, ধনাশ্রী প্রভৃতি, সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ দুই, তিন বা তাহা হইতেও অধিক রাগে নির্ম্মিত, ইহাকে মিশ্র রাগ কহে। যথা—মঙ্গল, বিহঙ্গ বিহাগ, প্রভৃতি—। রাগ, রাগিণী অসংখ্য। তাহা একজন গায়কের জানিবার সম্ভাবনা নাই। কথিত আছে—শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় পূর্ণিমায় রাস লীলার সময় ষোড়শ সহস্র রাগের উৎপত্তি হয়। আর্যকালেও অনেক সঙ্কীর্ণ রাগের সৃষ্টি হয়। ভরত মুনি রাজহংস, হনুমন্ত মঙ্গলাষ্টক নামক সংকীর্ণ রাগ সৃষ্টি করেন, এমন কি স্বয়ং মহাদেব, শঙ্কর বিজয় এবং মহাবীর কর্ণ, মধু মিথুন নামক সঙ্কীর্ণ রাগ সৃষ্টি করিয়াছেন; এতদভিন্ন কলহংস, গান্ধারী, গোপীকামোদী, জয়াবতী, মনোহর, প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে অনেক সংকীর্ণ রাগের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাগ রাগিণীর সৃষ্টির পরে ঋষিগণ তাল ও লয় যুক্ত সঙ্গীতের সৃষ্টি করিলেন। পূর্ব্ব কালের রাষক, বীর শৃঙ্গার, চতুরঙ্গ, সরভ লীল, সূর্য্য প্রকাশ, তৌর্য্য ত্রিকাদি, চন্দ্রক প্রকাশ, রণরঙ্গ, নন্দন, নবরত্ন প্রবন্ধ প্রভৃতি কয়েকবিধ সঙ্গীত প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন কতিপয় তাল যথা—

অতোপি কথিতাঃসন্তি দেশীতালা বিশেষতঃ
প্রসিদ্ধ লক্ষমার্গেষু কথ্যন্তে তেন বিস্তরাৎ।

চিত্র তাল (১) কন্দুকশ্চ (২) ইড়বান্ (৩) সন্নিপাতকঃ (৪)। ব্রহ্মতাল (৫) শ্চতুস্তালঃ (৬) কুম্ভতাল (৭) স্তথৈবচ। লক্ষ্মীতাল (৮) শ্চার্জুনশ্চ (৯) কুম্ভ নাভি (১০) রতঃপরং। সন্নিশ্চাপি (১১) মহাসন্নি (১২) র্বতিশেখর (১৩) সংজ্ঞকং।

কল্যাণ (১৪) পঞ্চঘাতোচ (১৫) চন্দ্র তালো (১৬) ক্রতালিকা (১৭)। জগতো (১৮) মল্লকশ্চৈব (১৯) কতালী (২০) পরিকীর্ত্তিতা ইত্যাদি। তাললয় স্বর সংযোগে সঙ্গীত শুনিতে অতীব মধুর, সুতরাং ইহা ক্রমেই উন্নতির সোপানে আরূঢ় হইল। এই সঙ্গেই নানা প্রকার বাদ্য যন্ত্রের সৃষ্টি।

সচরাচর বাদ্য (৪) চারিজাতি। তত (১) সুষির, (২) অবনদ্ধ (৩) ঘন (৪)। তন্মধ্যে—তন্ত্রী অর্থাৎ তার ঘঠিত বাদ্য প্রথম জাতি (বীণা প্রভৃতি)। বংশ বা তৎসদৃশ কোন অন্তশ্ছিদ্র কাষ্ঠ নির্ম্মিত যন্ত্র বাদ্য দ্বিতীয় জাতি। চর্ম্মাবনদ্ধ যন্ত্র বাদ্য (ঢাক, ঢোল, পাকওয়াজ প্রভৃতি) তৃতীয়। চতুর্থ—কাংস্য বা অন্য কোন লোহময় যন্ত্র বাদ্য। যথা—ঘণ্টা, নূপুর, মন্দিরা, করতাল ইত্যাদি।*

তত জাতীয় বাদ্যের মধ্যে বীণা অতি উৎকৃষ্ট এবং পুরাকালের অতি প্রসিদ্ধ। বীণাও আবার দুই প্রকার (স্বর্ বীণা) ও শ্রুতি বীণা। †

এক তন্ত্রী (একতারা) স্বর মণ্ডল (সারঙ্গ) আলাপিনী (আঘাটী নামে পশ্চিমে প্রসিদ্ধ) কিন্নরী ইহা দুই প্রকার—লঘ্বী ও বৃহতী। বৃহৎ কিন্নরী তিন তুম্বী দ্বারা নির্ম্মিত হয়। পিনাক [ইহাও এক তুম্ব ঘটিত—অশ্বপুচ্ছ লোমের ধনুকাকার যষ্টি দ্বারা বাদিত হয়] ইত্যাদি নানাপ্রকার বীণা জাতীয় বাদ্য আছে। তন্মধ্যে এক তন্ত্রী, ত্রিতন্ত্রী, পঞ্চ তন্ত্রী, সপ্ত তন্ত্রী পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। ‡

যজুর্ব্বেদে লিখিত আছে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শত তন্ত্র সংযুক্ত বীণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে এই বীণার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বীণার নির্ম্মাণ বিষয়ে, অঙ্গুলি, অঙ্গুলি স্থান প্রমাণ, দণ্ড, তন্ত্র, তুম্বী পরিমাণ, তুম্বীর অভ্যন্তরাবকাশ ধারণ, হস্ত ব্যাপার প্রভৃতি সকলই বিশেষ বিশেষ গ্রন্থে লিখিত আছে, কিন্তু তত্তাবৎ কার্য্য কুশলী ব্যক্তির নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিক্ষা করিতে হয় বলিয়া তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক।*

---

* চতুর্বিধং তৎকথিতং ততং শুষির মেবচ। অবনদ্ধং ঘনঞ্চেতি ততং তন্ত্রী গতং ভবেৎ। বীণাদি শুষীরং বংশ কাহলাদি প্রকীর্ত্তিতং। চর্ম্মাবনদ্ধ বদনং বাদ্যতে পটহাদিকম্। অবনদ্ধং তৎ প্রোক্তং কাংস্য তালাদিকং ঘনম্—"(সঙ্গীত দর্পণ)

† "বীণাতু দ্বিবিধা প্রোক্তা শ্রুতিস্বর বিশেষণাৎ শ্রুতি বীণা পুরা প্রোক্তা—" ঐ।

‡ "এক তন্ত্রী ত্রিতন্ত্র্যাস্তা—" আলাপনী কিন্নরীচ পিনাকী সংজ্ঞকাপরা। তন্ত্রীভিঃ সপ্তভিঃ কাপি দৃশ্যতে পরিবাদিনী।"—"এবৈব কীর্ত্ত্যতে লোকে স্বরমণ্ডল সংজ্ঞয়া"—"আলাপিন্যোক তুম্বীত্বাৎ"—"আঘাটী সংজ্ঞয়া লোকে আলাপিন্যেব কীর্ত্ত্যতে—" "কিন্নরী দ্বিবিধা প্রোক্তা লঘ্বীচ বৃহতীচ সা—।"

*"অঙ্গুল্যাদি প্রমাণঞ্চ বীণা দণ্ডাদি বাদনং [নির্ম্মিতং] তন্ত্রী ককুভ তুম্ব্যাদি লক্ষণং ধারণং তথা। তদন্তক্ষেত্র ব্যাপারা বাম দক্ষিণ হস্তয়োঃ—ইত্যাদি।" [সঙ্গীত দর্পণ]

বীণা মাত্রেই দুইটী তুম্ব দ্বারা নির্ম্মিত হয়। কেবল কিন্নরী বীণায় তিন তুম্বী। ঐ তুম্বী ত্রয় তীর্য্যক্ ভাবে যোজিত হয়। †

লৌহ অথবা কাংস্য দ্বারা নির্ম্মিত সারিকা (পর্দা) সকল কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত করিয়া বীণা দণ্ডের পৃষ্ঠভাগে যোজিত হইয়া থাকে। সারিকা যোজনা সাধারণতঃ ১৪ চতুর্দ্দশ স্বর অনুসারে ১৪ চতুর্দ্দশ সংখ্যক, ক্রমে স্বর স্থানে হইয়া থাকে, পরন্তু স্বর গ্রামের আধিক্য ইচ্ছা থাকিলে ২১ সংখ্যা করিতে হয়, ততোধিক অনাবশ্যক।‡

বীণা দণ্ড, রক্ত চন্দন কাষ্ঠে উত্তম হয়, নচেৎ লঘু—কঠিন এমন কোনও কাষ্ঠে নির্ব্বাহ হইতে পারে।¶

সুষীর জাতীয় বাদ্যের মধ্যে বংশীই উত্তম। বংশী নির্ম্মাণের উপাদান নানাবিধ। বেণু (বাঁস) খদির কাষ্ঠ, চন্দন কাষ্ঠ, লৌহ, কাংস্য, রৌপ্য, কাঞ্চন প্রভৃতি উত্তম উপাদান।*

বংশী যে কোনও উপাদানে নির্ম্মিত হউক না কেন—সকল বংশী বর্ত্তুল (গোল) সরল (সোজা) গ্রন্থিভেদ (গাঁট্ না ঘাটে) এবং ছিদ্র হীন হওয়া আবশ্যক।†

তাদৃশ বংশ দণ্ডের শিরঃ স্থানে ৩ বা ৪ অঙ্গুলি স্থান ত্যাগ করিয়া একটি রন্ধ্র করিতে হয়—[একটি ফুৎকার রন্ধ্র—ইহা এক অঙ্গুলি অগ্রভাগ পরিমিত] অনন্তর অঙ্গুলির দ্বারা চাপা যাইতে পারে এরূপ করিয়া অর্দ্ধ অঙ্গুলি অন্তর অন্তর অন্য ৭ সপ্ত রন্ধ্র করিতে হয়। তদ্দ্বারা স্বর সকলের রূপ প্রকাশ পায়। [স্বর বিন্যাস প্রকার শিক্ষকের নিকট শিখিতে হয়।]‡

বংশী, সাধারণতঃ ১৮ অষ্টাদশ অঙ্গুলি পরিমিত। পরন্তু ১৮, পর, ১৪ অঙ্গুল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। তাম্রাদি ধাতুতে কাহল নামক বংশী উত্তম হয়। কাহলের অবয়ব ধুস্তুর কুসুমের ন্যায়—বোধ হয় ইহাই শানাই বা টৌটা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।॥

---

† "তুম্বানাং ত্রিতয়ঞ্চাত্র তীর্য্যক্ যোজ্যং।"—[ঐ]

‡ "লৌহ কাংস্য ময়ী বা কর্ত্তব্যা সারিকাখ্যয়া।—দণ্ড পৃষ্ঠে চতুর্দ্দশ। চতুর্দ্দশ স্বর স্থানে সারিকাস্তা নিবেশয়েৎ—"[ঐ]।

¶ "রক্ত চন্দনজাদ্ সর্ব্বান্ বীণা দণ্ডান্ পরে জগুঃ"—"লঘু কাঠিন্য যুক্তেন—"[ঐ]

* "—বৈণবো দণ্ডঃ খাদিরশ্চন্দনোঽথবা। আয়াসঃ কাংস্যজো রৌপ্যঃ কাঞ্চনোপ্যথবা ভবেৎ—"[ঐ]

† "বর্ত্তুলঃ সরলঃ শ্লক্ষ্ণো গ্রন্থিভেদ ব্রণাজ্ঝিতঃ।"—[ঐ]

‡ "ত্যক্ত্বা ত্রিচতুরঙ্গুলানি শিরঃস্থলাৎ। ত্যক্ত্বা ফুৎকার রন্ধ্রন্তু কাষ্ঠাঙ্গুল সম্মিতং। অর্দ্ধাঙ্গুলান্তর রাণিস্যা রন্ধ্রাণ্যন্যানি সপ্ত চ—" "তেষুত স্বর বিন্যাস প্রকারো বাদনস্তুচ। জ্ঞেয়াশ্চ সর্ব্বমেবৈতৎ বিজ্ঞেয়ং গুরু লোকতঃ—"(সঙ্গীত দর্পণ)

॥ "অষ্টাদশাঙ্গুলো।…একৈকাঙ্গুলি বর্দ্ধিতঃ। বংশীশ্চতুর্দ্দশান্তক—"(ঐ)

বংশীর আকার প্রকার গঠন প্রণালী নানা প্রকার। পরন্তু আকার প্রকার গঠন ও শব্দাদির তারতম্য নিবন্ধন নামেরও তারতম্য অর্থাৎ নানাবিধ নাম।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সঙ্গীতের সমূহ উন্নতি হইয়াছিল। সোমেশ্বর কৃত রাগবিবোধ মধ্যে স্বর লিপির প্রণালী পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে। আর্ষকালে এবং অর্ব্বাগাচার্য্যদিগের সময়ে সংগীতশাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে সমালোচিত হইল। এ প্রবন্ধে নৃত্য সম্বন্ধে কিছু বলা হইল না ; তৎসম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিবার ইচ্ছা আছে।

মুসলমানেরা হিন্দুদিগের যেরূপ অন্যান্য কীর্ত্তি কলাপ ধ্বংস করিয়াছিলেন সঙ্গীত সম্বন্ধে সেমত দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই ; এমন কি ইহাঁরা যদি সংগীতের চর্চ্চা না রাখিতেন তাহা হইলে একালের মধ্যে সংগীতবিদ্যা একবারে লোপ হইত। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানেরা যে সংগীতের আলোচনা করেন তাহা এক প্রকার সাধারণ সংগীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষের মুসলমানেরা আর্য্যদিগের সংগীত শিক্ষা করিয়াই বিখ্যাত হইয়াছেন। মৃর্জাজান "তোফতুলহেন্দ" নামক একখানি বিবিধ বিষয়ক বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, ইহার মধ্যে এক পরিচ্ছেদে হনুমন্ত সঙ্গীতের জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত আছে ; তাহার সুরাধ্যায়ে সুর, শ্রুতি, মূর্চ্ছনার বিষয়, রাগাধ্যায়ে রাগ রাগিণী বর্ণন, তালাধ্যায়ে তাল, লয়ের প্রকরণাদি। এই গ্রন্থ যবন গায়কেরা অত্যন্ত মান্য করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাঠান নৃপতি গায়েশউদ্দীন বালবীনের রাজ্যকালে পারস্যদেশীয় কবি আমীরখসরু সঙ্গীতবিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি করিয়াছিলেন। আমীরখসরুর সহিত গোপাল নায়কের সঙ্গীত বিষয়ের বিতণ্ডা হয়, ইহাতে বাদসাহের বিচারে উভয়েই সমতুল্য স্থির হইয়াছিল। আমীরখসরু কচ্ছপবীণা বা সেতারের সৃষ্টি করেন। ইহা ভিন্ন ইহাদ্বারা কতিপয় রাগের সৃষ্টি হয়। ইনি পারস্য রাগের সহিত সংস্কৃত রাগ মিশ্রিত করিয়া ইমন কল্যাণ, পারস্য এরাক রাগের সহ তোড়ী মিশ্রিত করিয়া মোহিয়র, ইহা ভিন্ন সাজগিরি, সেফর্দ্দা প্রভৃতি, পারস্যরাগযোগে সৃষ্টি করেন। এ সময় গোপাল নায়ক কর্তৃকও কতিপয় রাগ সৃষ্টি হয়। আকবর বাদসাহের সময় সঙ্গীত বিদ্যার যাহার পর নাই উন্নতি হইয়াছিল।

আবুল ফজল কৃত "আইন আকবরীতে" লিখিত আছে তিনি গায়কগণকে গোয়ালিয়র, মসাড, টব্রিশ, কাশ্মীর, এবং ট্রানসক্ সিয়ানা হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের গায়কগণ তথাকার শাসনকর্ত্তা জৈনলউদ্দীন ইরাণী এবং তুরাণী যে সকল গায়ক স্ব অধীনে রাখিয়াছিলেন, তাহাদিগের দ্বারা শিক্ষিত হইয়াছিল। গোয়ালিয়র বহুকাল হইতে সঙ্গীতের আকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজা মান

তুনায়র তথাকার সঙ্গীত বিত্তার উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার রাজসভায় বিখ্যাত নায়ক বক্সু উপস্থিত ছিলেন। আমরা ব্লকমান সাহেব দ্বারা অনুবাদিত আইন আক্‌বরী হইতে, আক্‌বরের সভাষদ প্রসিদ্ধ গায়কগণের বিবরণ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

গোয়ালিয়র নিবাসী মিঞা তানসেন গায়ক মণ্ডলীর শিরোরত্ন স্বরূপ। ইনি হরিদাস স্বামীর ছাত্র। তানসেনের ন্যায় অদ্বিতীয় গায়ক ভারতবর্ষে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল না। রামচাঁদ ইঁহার সঙ্গীতে মোহিত হইয়া এককোটি মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম সুর বহু অর্থ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াও তাঁহাকে আগ্রায় লইয়া যাইতে পারেন নাই। তানসেনের এক পুত্রের নাম তানতরঙ্গ। "পাদসা নামাতে" তাঁহার বিলাস নামক অপর পুত্রের উল্লেখ আছে। ইঁহারা উভয়েই সঙ্গীতবিত্তায় পারদর্শী ছিলেন।

বাবা রামদাস গোয়ালিয়র নিবাসী প্রসিদ্ধ গায়ক। ইনি প্রায় তানসেনের সমকক্ষ। বাদাওনি কহেন ইনি ইস্‌লামসার রাজসভা হইতে লক্ষ্ণৌতে বৈরাম খাঁর নিকট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৈরাম খাঁর কোষাগার অর্থশূন্য সত্ত্বেও, তিনি তাঁহাকে একবার লক্ষমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করেন। সুবিখ্যাত পদকর্ত্তা সুরদাস ইঁহার পুত্র, তাঁহারা উভয়েই আক্‌বরের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

সোভন খাঁ, স্বগ্‌গন খাঁ মিয়ান চাঁদ, বিকিত্তর খাঁ, মহম্মদ খাঁ, রাজ বাহাদুর, বীর মণ্ডল খাঁ, চাঁদ খাঁ, প্রভৃতি আক্‌বরের প্রসিদ্ধ পার্ষদ। ইঁহারা সকলেই সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী।

"তোজুক," এবং "ইক্‌বান নামায়" লিখিত আছে জাহাঙ্গীর বাদসাহের ছত্তর খাঁ, পার উইজদাদ, খরামদাদ, মক্ষু এবং হামজা নামক কতিপয় সুকণ্ঠ গায়ক ছিল। সাজাহানের রাজসভায় জগন্নাথ নামক হিন্দু গায়ক "কব্‌রাই" খ্যাত হয়েন এবং দিরাং খাঁ ও লাল খাঁ "গুণ সমুদ্র" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা বাদসাহ জগন্নাথ ও দিরাং খাঁকে তুলাদণ্ডে রজত মুদ্রাসহ পরিমাণ করিয়া উভয়কেই পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

মুসলমানেরা ধ্রুপদ, প্রবন্ধ, যুগলবন্ধ, চতুরঙ্গ, খেয়াল, টপ্‌পা গান করিতেন এবং সে সময় চৌতাল, ধামার, তেওরা, ঝাঁপতাল, রূপক সুরফাক্তা, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, ব্রহ্মযোগ, লক্ষ্মীতাল, দোবাহার, সাত্তিতাল, রাসতাল, খামসাতাল, বীরপঞ্চ, মোহনতাল, ঢিমাতেতালা, পটতাল, মধ্যমান, একতালা, আড়া, তেহট, সওয়ারী, প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। সংগীত সকল গওরহার, নওহার, খাণ্ডার, ডাগর এই চারি বাণীতে গেয়। মুসলমানেরা কতিপয় সুমধুর যন্ত্রেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাঁরা রুদ্র বীণার পরিবর্ত্তে রবাব, সরস্বতী বীণার

পরিবর্ত্তে শরদ, ইহা ভিন্ন সুর বাহার, সারঙ্গ, সপ্তস্বরা, কানুন প্রভৃতি সুমধুর যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। মুসলমানেরা সংগীতে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও তৌর্য্যত্রিক আমোদ পৃথিবীর সার স্থির করিলেন। নৃপতিগণের রাজকার্য্য বিরক্তিজনক বোধ হইতে লাগিল এবং ক্রমেই বিদেশীয় শত্রুগণ নগর তোরণ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল, কিছুতেই তানভঙ্গ হইল না এবং বিনা যুদ্ধে রাজ্য পরহস্তগত হইল। হিন্দু নৃপতিগণ যবনদিগের বহুদিবসাবধি নির্য্যাতন সহ্য করিয়া, স্বাধীন হইবার মানসে সকল বিদ্যা পরিত্যাগ করত যুদ্ধ-বিদ্যা সর্ব্বাদরণীয় বোধ করিলেন। এ সময় সঙ্গীত, সাহিত্য কিছুরই আদর রহিল না। সকলেই বীররসে উন্মত্ত, কে সঙ্গীত শুনিবে এবং কেই বা কাব্য পড়িবে। যাঁহারা সে সময় কাব্য ও সংগীতের আদর করিতেন, তাঁহারা কাপুরুষের মধ্যে পরিগণিত; সুতরাং সংগীতের আদর ক্রমেই হ্রাস হইতে লাগিল। যাঁহারা সংগীত ব্যবসায়ী তাঁহারা অল্প শিক্ষা করিয়াই "ওস্তাদ" হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ইহার পরে ইংরাজদিগের রাজ্য—বঙ্গদেশে সমাজের বিপ্লব উপস্থিত। এ সময় কবি, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি নানা প্রকার গান প্রচলিত হওয়াতে বিশুদ্ধ সংগীত প্রণালী ক্রমেই হীন পরিচ্ছদ পরিধান করিল। অধিকাংশ লোক অর্দ্ধ শিক্ষিত, সমাজ নানা কুসংস্কারে আবৃত, কাজেই কুরীতি সুরীতি হইয়া উঠিল; কালাবাতি গান লোকের ভাল লাগিল না, কবির আদর বৃদ্ধি হইল। ইহার পরে ইংরাজীবিদ্যা উত্তমরূপ অধ্যয়ন আরম্ভ হওয়াতে বাঙ্গালিগণ সুসভ্য হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু দেশীয় বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ তাঁহাদিগের নিতান্ত ঘৃণাকর বোধ হইল। এখন সংগীত নিতান্ত প্রভাহীন এবং অসহায়। যাঁহারা সংগীত অলোচনায় প্রবৃত্ত তাঁহারা বিদ্যাহীন মূর্খ, এবং অহরহ মাদক সেবনে অনুরক্ত, ইহাঁরা কিঞ্চিত শিক্ষা করিয়াই "ওস্তাদ!" এ সকল লোককে সাধারণে "আতাই" কহে, এই শ্রেণী সংগীতের পরম শত্রু, বঙ্গদেশেই "আতাই" অধিক, এজন্য এখানকার সঙ্গীত ক্রমেই বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে। নায়কদিগের সংগীতে পশুপক্ষীও বিমোহিত হইত, ইহাঁদিগের গানে বানরেও হাস্য করে! একালে সংগীতের অবস্থা অতীব শোচনীয়, চিন্তা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ "নেটিভ মিউসিক" বলিয়া সংগীতের আদর করিলেন না কিন্তু দুঃখের বিষয় ইংরাজগণ যাঁহারা আর্য্যদিগের শাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষিত, তাঁহারা আমাদিগের সংগীতের নিন্দা করা দূরে থাকুক ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তবে ক্লার্ক সাহেবের কথা স্বতন্ত্র, তিনি ভারতবর্ষের কিছুই জানেন না। নাবিকদিগের শারিগান শুনিয়া প্রকৃত সংগীত মনে করেন, তাঁহার নিকট বিশুদ্ধ সংগীতের প্রশংসা প্রত্যাশা করা বৃথা। ইহাতে আমাদিগের ইউরোপীয় সংগীতের নিন্দা করা উদ্দেশ্য নয়। ইউরোপীয় সংগীতের

সুস্বরানুক্রমতা এবং স্বরৈকতা প্রশংসনীয়, তথাপি তাহার আমাদিগের মূর্চ্ছনা, কৃন্তনাদিযুক্ত সংগীতের সহিত তুলনা হয় না। ইউরোপীয়গণ—Harmony অর্থাৎ স্বরৈকতার ঔৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত, তাঁহাদিগের সংগীতে ইহা ভিন্ন আর কিছুই মধুর নহে। আমাদিগের উদারা, মুদারা, তারা, সপ্তকের ন্যায় ইউরোপীয়গণের Bass, Tenor, Soprano তিন সপ্তক এবং আমাদিগের সা, ঋ, গা, মা, পা, ধা, নি, ন্যায় তাঁহাদিগেরও ডো, রি, মি, ফা, সল, লা, সি, সপ্তস্বর আছে। কিন্তু সুর সাধন প্রণালী আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। আমরা "ইতালীয় অপেরায়" বিবিধযন্ত্র সহযোগে মধুরকণ্ঠ সিগনোরা বোসেসিও এবং রিবলভীর সংগীত, তথা প্রোফেশর হেলর এবং জনসনের পিয়নোবাদন শুনিয়াছি, তাহা শ্রবন করিয়া কিয়ৎকালের জন্য পুলকিত হইয়াছিলাম কিন্তু কিয়ৎ কালের জন্য মাত্র, অবশেষে তাহাতে অভিনবত্ব কিছুই না থাকায় বরং বিরক্তি বোধ হইয়াছিল। আমাদিগের সংগীত সেরূপ নহে, একটি রাগিণী অনেকক্ষণ শুনা হইল তাহার পরেই আর একটি সময়োচিত নূতন নূতন রাগ গান হওয়াতে শ্রোতার ক্রমে হর্ষ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এ কথায় যদি কেহ বলেন আমাদিগেরও অধিকাংশ রাগ রাগিণী প্রায় একপ্রকার কানাড়া পরে বাগিশ্রী, মূলতানের পরে ভীমপলাশ সোহিনীর পর পরজ, ভৈরবের পর রামকেলী ইত্যাদি প্রায় এক প্রকার বোধ হয়; এমন কি কোন কোন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নই বোধ হয় না। যাঁহারা সংগীত শাস্ত্রে অজ্ঞ, তাঁহারা একথা বলিতে পারেন বটে কিন্তু যাঁহারা হিন্দু সংগীত কিছু বুঝেন তাঁহারাও উল্লিখিত রাগিণী নিচয়ের পরস্পরের প্রভেদ বুঝিতে পারেন। আমাদিগের সংগীতবিদ্যা বড় কঠিন। না বুঝিয়া নিন্দা করিলে তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিব না। এই সংগীতে সপ্তস্বর, তিন গ্রাম, একবিংশতি মূর্চ্ছনা, দ্বাবিংশতি শ্রুতি তাহাতে নানাবিধ রাগ রাগিণী সহ, তাললয়স্বরসংযোগে গান করিলে মনোমধ্যে অপূর্ব্ব রসের সঞ্চার হয়।

আর্য্যজাতীয় সংগীতবিদ্যা ক্রমে বঙ্গদেশে শ্রীহীন হইয়া আসিতেছিল, দেখিয়া সহৃদয় মাত্রেই দুঃখিত ছিলেন। এক্ষণে কৃতবিদ্যগণ পুনরায় সংগীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াতে আমরা যারপরনাই আনন্দিত হইতেছি। ইহার আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে, প্রকাশ্য সম্বাদপত্রে সংগীত সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, একখানি মাসিকপত্র কেবল সংগীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত, এতদ্ব্যতীত সংগীত শিক্ষোপযোগী কয়েকখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত সংগীতসার প্রথম গ্রন্থ, ইহার পূর্ব্বে বহুকাল হইল পদ্যে মৃত কবি রাধামোহন সেন "সংগীত তরঙ্গ" প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সংস্কৃত ও পারস্য গ্রন্থ হইতে সংগীত সম্বন্ধীয় অনেক বিবরণ সঙ্কলিত হই-

য়াছে। গ্রন্থখানির কবিতাগুলিও সুমধুর এবং অনেকগুলি সদ্ভাব পূর্ণ গীতও আছে কিন্তু উহা সংগীত শিক্ষার উপযোগী হয় নাই। সংগীতসার অভিনব প্রণালীতে সঙ্কলিত, প্রথমে সংগীত সম্বন্ধীয় নানা জ্ঞাতব্য বিবরণ, তৎপরে নানা রাগ রাগিণীর স্বরলিপি তাহাতে তিন সপ্তকের মধ্যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়া এক একটী রাগিণীর সারিগম লিখিত আছে। ইহাতে সহজে কণ্ঠে ও যন্ত্রে রাগাদি শিক্ষা করা যাইতে পারে। প্রথম শিক্ষার জন্য গ্রন্থখানি ভাল হইয়াছে বলিতে হইবেক। আমরা গোস্বামী মহাশয়কে রাগালাপের একখানি বিস্তারিত গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করি, তাহা প্রকাশ হইলে সকলেই সাদরে এক এক খণ্ড গ্রহণ করিবেন। শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় যন্ত্র ক্ষেত্র দীপিকা নামক সেতার শিক্ষার একখানি বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, ইহাতে সেতার শিক্ষার বহুবিধ প্রণালীর স্বর লিপি আছে। সংগীত প্রিয় শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার শিক্ষা একখানি অভিনব গ্রন্থ। এখানি ইউরোপীয় প্রণালীতে সঙ্কলিত। স্বর লিপির "গৎ" সমূহ, হার্ম্মোনিয়ম ও "পিয়ানো" যন্ত্রে অতি সহজে বাজাইতে পারা যায়। কৃষ্ণধন বাবু ইউরোপীয় সংগীত যে উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থ দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে। এই গ্রন্থের তালাধ্যায় অতি বিশদ হইয়াছে, তদ্দ্বারা সহজে প্রচলিত তালগুলি শিক্ষা করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত কৃত সংগীত রত্নাকর নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এখানিও সংগীত শিক্ষোপযোগী গ্রন্থ।

আজি কালি কলিকাতায় ঐকতান বাদনের অনেকে প্রশংসা করিয়া থাকেন কিন্তু ইহাতে বিশুদ্ধ সংগীতবিদ্যার কোন উন্নতি হইতেছে না, তবে অল্পক্ষণ সিন্ধু, কাফী, খাম্বাজ ও মিশ্র সামান্য রাগিনীর "গান ভাঙ্গা গৎ" অর্থাৎ কোন প্রচলিত গানের সুরে "গৎ" নানা যন্ত্র সহযোগে ভাল লাগে মাত্র।

প্রথমে পাথুরিয়াঘাটার নাট্যামোদী মহোদয়গণ কর্ত্তৃক সংগীত পাঠশালা সংস্থাপিত হয়, তৎপরে কিয়ৎকালের মধ্যে কয়েকটী তাহার শাখা পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে শুনিয়া অতীব সুখী হইলাম। এই সংবাদে সংগীত প্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই আমাদিগের ন্যায় সুখী হইবেন। এ সময় সংগীতের উন্নতি করিতে যিনি চেষ্টা করিবেন তিনিই আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র, কিন্তু কেহ কেহ সাময়িক পত্রে সংগীত শাস্ত্রের তর্ক করিবার ভান করিয়া কোন সম্প্রদায় বা কোন মান্য ব্যক্তিকে গালি বর্ষণ করিতেছেন দেখিয়া অত্যন্ত পরিতাপিত হইতেছি। এতাদৃশ ব্যবহার কখনই প্রশংসনীয় নহে, এ উদ্যমের সময়— প্রকৃত বিষয়ের উন্নতি চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শ্রীরামদাস সেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

ভূবৃত্তান্ত

রাম যৎকালে বিশ্বামিত্র সহ জনকরাজ ভবনে গমন করেন, তখন তাঁহার মনোরঞ্জন নিমিত্ত বিশ্বামিত্র পুরাবৃত্ত কথন সময়ে বহুতর দেশের উল্লেখ করিয়াছিলেন। মহারাজ কুশের ইতিহাস কহিতে, কহিয়াছিলেন যে, উক্ত নৃপতির চারি পুত্র হয়। তাহাদের নাম কুশম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজঃ এবং বসু। ইহারা চারিজনে চারি পৃথক্ রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন। কুশম্ব হইতে কৌশাম্বি, (১) কুশনাভ হইতে মহোদয়, (২) অমূর্ত্তরজঃ হইতে ধর্ম্মারণ্য, (৩) এবং বসু হইতে গিরিব্রজ, (৪) স্থাপিত হয়।

---

(১) এলাহাবাদ হইতে ১৪ ক্রোশ পশ্চিমে বর্ত্তমান কোশম্ গ্রাম। ইহা বৎস দেশের অন্তর্গত। এখানকার অধীশ্বর উদয়ন বৎসের কথা লইয়া কালিদাস উজ্জয়িনীর গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন।

"প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথা কোবিদগ্রাম বৃদ্ধাং।
পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাং।"

মেঘদূত।

এইস্থানের সবিস্তার বর্ণনা—See Cunningham's Ancient Geography, Buddhist Period.

(২) নৃপতি কুশনাভের শতকন্যা হয়। তাহারা পবন দেবের মতানুবর্ত্তিনী না হওয়ায়, তাঁহার শাপে কুব্জ ভাবাপন্ন হয়। প্রবাদমতে কন্যাগণ যথায় কুব্জ হইয়াছিল, তাহাকে কান্যকুব্জ এবং সংক্ষেপে কনোজ বলে। কান্যকুব্জ দেশের নাম রামায়ণে নাই। অতএব বর্ত্তমান কনোজ রামায়ণের সময়ে মহোদয় নামে খ্যাত ছিল। Cushanabha founded the City of Mohodya on the Ganges, afterwards changed to Kanya-Cubja, or Conoj.—Tod's Rajasthan Vol. I.

(৩) "তথাহমূর্ত্তরজাধীরশ্চক্রে প্রাগ্জ্যোতিষং পুরং। ধর্ম্মারণ্য সমীপতঃ।

রামায়ণের পাঠান্তর।

প্রাগ্জ্যোতিষপুর—বর্ত্তমান কামরূপ এবং আসামের কিয়দংশ—P. C. Sircar's Geography of India. ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে ধর্ম্মারণ্য এবং প্রাগ্জ্যোতিষপুর পরস্পর নিকট ছিল। অতএব ধর্ম্মারণ্য বর্ত্তমান কামরূপ প্রদেশের ভিতর ছিল।

(৪) শোন নদীর তটে। মূল।

রাজর্ষি কুশনাভ তাঁহার কুব্জ ভাবাপন্ন শতকন্যাকে ব্রহ্মদত্ত নামে একজন রাজকুমারকে প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্ত কাম্পিল্য (৫) নগর স্থাপন করিয়া তথায় শত স্ত্রী সহ রাজত্ব করেন।

জনকরাজ স্থানান্তরে কহিতেছেন যে তিনি ইক্ষুমতী নদীর তীরস্থ সাঙ্কাশ্যা (৬) নগরের অধীশ্বর সুধন্বাকে পরাজয় করিয়া আপন ভ্রাতা কুশধ্বজকে ঐ স্থান প্রদান করেন।

রাজা দশরথ যৎকালে পুত্র কামনায় যজ্ঞে ব্রতী হয়েন, তখন রাজগণের নিমন্ত্রণ প্রসঙ্গে মিথিলা, কাশী, (৭) কেকয়, অঙ্গ, (৮) কোশল,

---

(৫) কাম্পিল্য নগর মহাভারতে দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী বলিয়া কথিত হইয়াছে। রামায়ণের মতে ইহা স্বতন্ত্র এক পৃথক্ প্রদেশ। আবার ইহার পরেই সাঙ্কাশ্যা প্রদেশের অবস্থান। অতএব রামায়ণের সময়ে দক্ষিণ পঞ্চাল বলিয়া পঞ্চালের কোন বিভাগ ছিল কি না সন্দেহ। রামায়ণে দক্ষিণ পঞ্চাল বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। কাম্পিল্যের অবস্থান "On the old Ganges between Budaon and Furruckabod"—Cunningham.

(৬) Seng. Kia. Si. of Hwen Thsang সাঙ্কাশ্যা নগর উক্ত নামের প্রদেশের রাজধানী। বর্ত্তমান কালী (প্রাচীন কলিন্দ্রী) নদীর উপর স্থাপিত। সুতরাং এই নদীর নামই রামায়ণের ইক্ষুমতী। "কনোজ হইতে সাঙ্কাশ্যা ৫০ মাইল উত্তর পশ্চিমে।" Cunningham's Geography. Part I.

(৭) Po. lo. ni. si of Hwen Thsang.

(৮) রামায়ণে অঙ্গ দেশের অবস্থান এবং আরম্ভ (পূর্ব্বমুখে) গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমস্থল হইতে, এরূপ কথিত হইয়াছে, এবং কেন অঙ্গদেশ নাম হইল তৎপ্রসঙ্গে "তত্র গাত্রং হতং তস্য (কামস্য) নির্দ্দগ্ধস্য মহাত্মনা।

অশরীরঃ কৃতঃ কামঃ ক্রোধাৎ দেবেশ্বরেণহ।
অনঙ্গ ইতি বিখ্যাত স্তদা প্রভৃতি রাঘব।
সচাঙ্গবিষয়ঃ শ্রীমান্ যত্রাঙ্গং স মুমোচহ।' ১ কাণ্ড—২৩সর্গ।

Col. Tod সাহেবের মতে অঙ্গদেশ তিব্বত কিম্বা আবা। অঙ্গদেশের একটি প্রধান স্থান চম্পামালিনী, উহা Col. Franklin's Essay on Palibothra নামক প্রস্তাব বাঙ্গালার এক প্রান্তসীমায় নির্দ্দিষ্ট হওয়াসত্বেও, তিনি বিবেচনা করেন যে তথাপি অঙ্গদেশ বঙ্গের সন্নিবেশ হইতে পারে না, কারণ দশরথ অঙ্গদেশে গমন কালিন অনেক বড় নদী, বিস্তীর্ণ বনভূমি ও পর্ব্বতাদি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। এই বিবেচনা করার সময় তাহাতে তৎকালীন যুক্তিটিও বিবেচনা করিলে কিরূপ ফল দাঁড়াইত বলিতে পারি না। মক্ষমূলরের মতে অঙ্গ বঙ্গের সন্নিবেশ (Ancient Sanscrit Literature, Introduction to) হণ্টর সাহেবও তাহা একরূপ গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছেন (Orissa Vol. I. Chap. V.) আবার "Anga,comprising what is now called Bhagulpore with parts of other districts adjoining"—P. C. Sircar's Geography of India. কিন্তু রামায়ণের মতে আপাততঃ অনেক অন্তরে বোধ হইতেছে, এমন কি পাটনারও পশ্চিম। এখন দেখা যাউক ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে রামায়ণের পূর্ব্বগত মলদ ও করূষ অর্থাৎ বর্দ্ধমান আরা প্রদেশ, রামায়ণের সময় অন্তর্হিত হইয়া জঙ্গলময় হইয়াছে। যথায় পাটনা এবং যাহাকে মগধ বলে তথায় দেখান হইয়াছে যে কোন জনপদ ছিল না এবং মগধ নামের উল্লেখ হয় নাই। আবার অঙ্গ গঙ্গাসরযূ সঙ্গমে আরম্ভ হইয়া পূর্ব্বমুখগামী। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে রামায়ণের সময়ে গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গম হইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বর্দ্ধমান বঙ্গের সীমা পর্য্যন্ত পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত সমস্ত ভূভাগকে অঙ্গদেশ বলিত।

(৯) মগধ, (১০) সিন্ধু, সৌবিরদেশ (১১) সৌরাষ্ট্র (১২) এবং দাক্ষিণাত্য (১৩) এইদেশগুলির উল্লেখ হইয়াছে।

রামায়ণের স্থানান্তরে, নিম্নলিখিত দেশগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে।

"দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবিরাঃ সৌরাষ্ট্রাঃ দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গমাগধামৎস্যাঃ সমৃদ্ধা কাশি কোশলাঃ॥

২ কাণ্ড—১০ সর্গ।

রামায়ণের স্থানান্তরে (১ কাণ্ড—৬ সর্গ) দশরথের অশ্ব সংগ্রহ প্রসঙ্গে কাম্বোজ (১৪) বাহ্লিক (১৫) এবং বনায়ু (১৬) নামক দেশের উল্লেখ আছে।

অথর্ব্ববেদোক্তে (বাহ্লিক দেশের বৃত্তান্ত দেখ) ইহা নিতান্ত অনার্য্য প্রদেশ। রামায়ণের সময় উহার অংশমাত্র অর্থাৎ সরযু ও গঙ্গার সঙ্গম স্থল এবং আর কিয়দংশমাত্র আর্য্য কর্ত্তৃক অধিবেশিত হইয়াছিল, কারণ তাহার পর হইতেই বনভূমি। তাহার পর আর্য্যগণ ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলে উহা সমগ্র অধিবেশিত হইয়াছিল।

(৯) উত্তর কোশল।

(১০) "কিংতে কৃণ্বন্তি কিকটেষু গাবো।" ঋগ্বেদ ৮ মণ্ডল।

কিকটা মগধ দেশ। 'মগধ' এই নাম অথর্ব্ব বেদে আছে। (বাহ্লিক দেশের বৃত্তান্তে দেখ।) অথর্ব্ব-বেদের সময় মগধ আর্য্যভূমি ছিল। উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পাটনা ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থান রামায়ণের সময় মগধের অন্তর্গত ছিল না। আরা এবং পাটনা জেলার দক্ষিণস্থ ভূভাগ মগধ নামে পরিচিত হইত। পলাস পুষ্পবনের আধিক্যে ইহার আর এক নাম পলাস দেশ ছিল। Prasii of the Greeks.

(১১) বর্ত্তমান রাজপুতানার দক্ষিণাংশ। সৌবীর এই নামের পরবর্ত্তি হিন্দু নাম বদরি। O. cha. li. of Hwen Thsang, Sofir of Egyptians, Ophir of the Bible,—partly identified by Cunningham. (See Art. Vadari or Eder, Ancient Geography of India Part I. Buddhist Period.) "Ophir" এই নাম সম্বন্ধে Max Muller, Science of Language Vol I. Page 708 দেখ।

(১২) Surastrene of Ptolemy, kiu. che. lo. of Hwen Thsang.

বর্ত্তমান গুজরাট উপদ্বীপের কিয়দংশ।—Cunningham.

(১৩) "The words 'southern kings' may, Lassen says, be employed here in a restricted sense, for from other parts of the poem it appears that the country to the south of the Vindhya was still unoccupied by the Aryas.—Even the banks of the Ganges are represented as occupied by a savage race, the Nishadas"—Muir. এই বাক্যের সত্যতা এই প্রস্তাবের পূর্ব্বাপর পাঠ করিলেই প্রতীত হইবে।

(১৪) কাম্বোজ দেশ খাম্বাজ উপসাগরের (Gulf of Cambay) নিকট কোন স্থান হইতে পারে। ইহার অবস্থান সম্বন্ধে কনিংহাম কর্ত্তৃক উল্লিখিত

"নৈঋত্যাম্দিশি দেশাঃ—
পহ্লবাঃ কাম্বোজাঃ সিন্ধুসৌবিরাঃ—"

বৃহৎসংহিতা—১৭ অধ্যায়।

ইহা দ্বারা কাম্বোজের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে।

(১৫) বর্ত্তমান বাখ কি?

(১৬) বনায়ুদেশ রামায়ণের আধুনিক অনুবাদক পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পারস্যদেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন [রামায়ণের বাঙ্গালা অনুবাদ ৬ সর্গ ১ কাণ্ড]। কিন্তু উহা ভ্রম বলিয়া বোধ হয়, কারণ অমর কোষে পারস্য একটি স্বতন্ত্র স্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে

"বানায়ুজাঃ পারসীকাঃ কাম্বোজা বাহ্লিকাহয়াঃ।"
অমর কোষ—ক্ষত্রিয়বর্গ।

আরব কি?

অথর্ব্ববেদ যৎকালে রচিত হয়, তখন বাহ্লিক, মগধ, অঙ্গ প্রভৃতি দেশ অসভ্য ভূমি বলিয়া গণ্য হইত এবং তাহাদের প্রতি আর্য্যেরা যৎপরোনাস্তি ঘৃণা বর্ষণ করিতেন (১৭)। বাহ্লিক রামায়ণের সময়েও অনার্য্যদেশ, উহা কেবল ঘোড়ার জন্য বিখ্যাত ছিল (১কাণ্ড—৬সর্গ)। কিন্তু মগধ ও অঙ্গদেশের কতক অংশ রামায়ণের সময় আর্য্যভূমি হইয়াছে। দশরথের পুত্রার্থে যজ্ঞকালে রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে আজ্ঞা দিয়া, যে কয়জন রাজাকে স্বয়ং যাইয়া সমাদরে আনিতে কহিতেছেন, তাহার মধ্যে অঙ্গ এবং মগধের অধীশ্বর গণ্য হইয়াছেন। ইহা দ্বারা অনুমান হইতেছে যে বাল্মীকির সময়ে ঐ দুই দেশ আর্য্যগণ কর্ত্তৃক যেখানে অধিবেশিত হইয়াছিল, তাহা তৎকালোচিত বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ও ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত আর্য্যেরা বঙ্গের উত্তর প্রান্ত দিয়া আরও পূর্ব্বে গিয়াছিলেন, কারণ আর্য্যবংশোদ্ভব অমূর্ত্তরজঃ দ্বারা স্থাপিত ধর্ম্মারণ্য নগরের অবস্থান কামরূপের নিকট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আবার মগধের পূর্ব্বেও দক্ষিণ সীমা হইতেই রাক্ষসেরা নির্ভয়ে ভ্রমণ করিত এবং তৎসমীপস্থ ঋষিগণ সর্ব্বদা তাহাদের ভয়ে ভীত হইতেন। বিষ্ণু পুরাণেও এই ভূভাগের নাম পৌণ্ড্র এবং উহা অনার্য্য ভূমি বলিয়া কথিত হইয়াছে। উভয় মতেই বর্ত্তমান বঙ্গের দক্ষিণ ভাগ জঙ্গলময় ছিল। রামায়ণের সময়ে বঙ্গ এই নামের অস্তিত্ব ছিল কি না সন্দেহ। উল্লিখিত শ্লোকে যে বঙ্গভূমির কথা লিখিত হইয়াছে, রামায়ণের পরবর্ত্তী গ্রন্থে তাহা পাওয়া যায় না। পুনশ্চ ঐ শ্লোকে দ্রাবিড় দেশের কথা লিখিত হইয়াছে। বাল্মীকি

---

(১৭) "ওকো অস্য মূজবন্ত ওকো অস্য মহাবৃষাঃ।
যাবজ্জাতস্তক্মং স্তাবদসি বাহ্লিকেষু ন্যোচরঃ।
তক্মন্ মূজবতো গচ্ছ বাহ্লিকান্ বা পরস্তরাম্।
শূদ্রামিচ্ছ প্রফর্ব্যং তাং তক্মন্ বীব ধূনুহি।
মহাবৃষান্ মূজবতো বন্ধদ্ধি পরেত্য।
প্রৈতানি তক্মনে ব্রূমো অন্যক্ষেত্রাণি বা ইমাঃ
তক্মন্ ভ্রাত্রা বলাসেন স্বস্রা কাশিকয়া সহ।
পাপ্মা ভ্রাতৃব্যেণ সহ গচ্ছামুমরণং জনম্।
গন্ধারিভ্যোমূজবদ্ভ্যোঽঙ্গেভ্যো—মগধেভ্যঃ।
প্রৈষ্যং জনমিব শেবধিং তক্মানং পরিদদ্মসি।"

অথর্ব্ববেদ।

Quoted by Muir.

ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে অনার্য্যেরা কতদূর ঘৃণার পাত্র ছিল। অন্বেষণ করিলে ঘৃণাসূচক বাক্য প্রয়োগ যথেষ্ট পাওয়া যায়। পুনশ্চ মহাভারতে

"বাহ্লিকা নাম তে দেশাঃ ন তত্র দিবসং বসেৎ।"

কর্ণপর্ব্ব।

আর সর্ব্বত্রে দ্রাবিড়ের অবস্থান যথায় তথায় নিবিড় বনভূমি ও রাক্ষস নিবাস বলিয়া গিয়াছেন। কোথাও আর্য্যজনপদ স্থাপিত হয় নাই, কেবল স্থানে স্থানে দুই একটি ঋষি মাত্র পাওয়া যায়। আবার ১৩ সংখ্যক টীকায় অধ্যাপক লাসেনের মত ইহা সমর্থন করিতেছে। এই সকল কারণে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে ঐ শ্লোকটি কৃত্রিম এবং অনেক পরে রচিত। ইহা ব্যতীত রামায়ণের আরও বহুস্থানে ঐ রূপ দোষ ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। পণ্ডিতবর মক্ষ-মূলারও এইকথা প্রকারান্তরে অনুমোদন করেন। (১৮)

কাম্বোজ বৈদিক সময়ে আর্য্য দেশ মধ্যে পরিগণিত ছিল বলিয়া কাহারও গ্রাহ্য (১৯)। কিন্তু মনু (২০) ও বাল্মীকি উভয়েরই সময়ে উহা অনার্য্য দেশ মধ্যে গণ্য হইয়াছিল।

পূর্ব্বগত বৃত্তান্ত দ্বারা ভারতের অবস্থা কিরূপ অনুমিত হয়? আর্য্যাবর্ত্ত ব্যতীত সর্ব্বত্রই অনার্য্যগণ বিচরিত ঘোর অরণ্যময় ছিল আর্য্যাবর্ত্তও বহু স্থানে বনভূমিসঙ্কুল। কিন্তু

"গ্রামান্ বিকৃষ্টসীমান্তান্ পুষ্পিতানি বনানিচ।" (২১)

পুনশ্চ

"উদ্যানাম্রবনোপেতান্ সম্পন্ন সলিলাশয়ান্।
তুষ্টপুষ্টজনাকীর্ণান্ গোকুলাকুলসেবিতান্॥" (২২)

এতদ্রূপ গ্রাম সমূহের অভাব ছিল না। বসুমতী তখন নবীনা, মনোহারিণী অলঙ্কার বিভূষণা, নিয়ত হারিতশোভায় মণ্ডিত। গ্রামান্তভাগে সুরভিপুষ্পখচিত এবং বিহঙ্গমকুলকূজিত পরিসর উদ্যানাম্রবন সমূহ দুর্গের ন্যায় বেষ্টন করিয়া, আশ্রিত জনপদকে নিরন্তর শত্রুনয়ন হইতে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে মনুষ্য পদ চিহ্ন মাত্র গ্রাম প্রবেশের পথ বিজ্ঞাপন করিতেছে। তৎপরে আলবাল মধ্যে লহরীলীলাবৎ পরিপক্ক শস্যচূড় সমুদয় মারুতহিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে। মধ্যস্থলে গ্রাম, গৃহস্থেরা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, দিনান্তে বিশ্রাম লাভ করত সাংসারিক সুখে পুলকিত হইতেছে। কখন বা সদয়া প্রকৃতির চারু-

---

(১৮) Ancient Sanscrit Literature P. 49.

(১৯) "If the testimony of Yaak in regard to the language used by the Kambojas is to be trusted, it is clear that they spoke a Sanscrit dialect. It is thus irrefragably proved that the Kambojas were originally not only an Indian people, but also a people possessed of Indian culture"—Muir's Sanscrit Texts. Vol. II.

(২০) "শনকৈস্তু ক্রিয়া লোপাদ্ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেনচ॥" মনু।

(২১) ২ কাণ্ড—৪৯ সর্গ।

(২২) ২ কাণ্ড—৫০ সর্গ।

শোভা সন্দর্শনে বিমোহিত হইতেছে, কখন বা তদ্দারা উত্তেজিত চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া অচিন্ত্য দেবের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হওয়ায় উদ্দেশে প্রণিপাত করিতেছে। প্রকৃতি সরলা, লোকও সরল, সরল কথোপকথনে আনন্দিত হইতেছে। নিকটে "গোযুতাং, ময়ূরহংসাভিরুতাং" তটিনী কল কল স্বরে অভীপ্সিত পথে প্রধাবিত হইতেছে। স্মিতাননা সরলা কুমারীগণ কুম্ভকক্ষে হস্তান্দোলন করিতে করিতে স্বালয়ে গমন করিতেছে। বনাগ্রভাগ রঞ্জিত করিয়া দিনদেব অস্তশিখরে গমন করিলেন। খদ্যোতমালা আশ্রয়ের অনভাবে গ্রামকে মণিমালাবিশিষ্ট করিয়া তুলিল। অদূরে তপোবনস্থ হোমাগ্নির ধূম গগনস্পর্শ করিতে অগ্রসর হইল। সকলেই সন্ধ্যাবন্দনায় বিব্রত। স্তোত্র সমাপনান্তে প্রজাবৎসল রাজাকে পিতৃবৎ স্থানে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া গাত্রোত্থান করিল। আহা! এবেশে না হউক, ভারত মাতার এই দিন কি আর ফিরিবে! চাতকের ন্যায় চাহিতেই দিন গেল। রামচন্দ্র বনগমন করিলে পুত্রশোকার্ত্ত দশরথ রামকে না দেখিয়া, তাঁহার রথ বাহক অশ্বের পদচিহ্ন দেখিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যেন আমাদেরই মুখে সাজিবে বলিয়া বলিয়াছিলেন—

"বাহনানাঞ্চ মুখ্যানাং বহতাস্তং মমাত্মজং।
পদানি পথি দৃশ্যন্তে স মহাত্মা ন দৃশ্যতে॥"

এই সময়ে রাজপথের বড় বাহুল্য ছিল না। কারণ, অযোধ্যা হইতে তমসা নদী পর্য্যন্তই "মহামার্গমভয়ং ভয়দর্শিনাম্", তাহার পর হইতেই আর পথ নাই।

বাল্মীকির সময়ে নগরাদির কি অবস্থা ছিল তাহা তৎকর্ত্তৃক অযোধ্যা বর্ণনে অনেক বিদিত হইবে।

"নগর সর্ব্বপ্রকার যন্ত্র ও আয়ুধগণ যুক্ত, প্রাকার ও পরিখা পরিবৃত এবং তোরণ ও কবাট সংযুক্ত। বাহির্ভাগের সহিত যোজিত বহিঃপথ, এবং নগরাভ্যন্তরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমনাগমনের নিমিত্ত রাজপথ ছিল। তাহা বিকসিত পুষ্পময় বৃক্ষ শ্রেণিতে আবৃত এবং নিত্য নিয়মিত রূপে জলসিক্ত হইত। শিল্পী এবং নানা দেশ হইতে আগত বণিক্‌দল সুবিভক্ত শ্রেণিতে বাস করিত। কোন স্থানে বধূগণের নাট্যশালা, কোথাও ক্রীড়ার্থ পুষ্পবাটিকা ও আম্রবন, কোথাও ধ্বজবিশিষ্ট অট্টালিকার উচ্চাংশ, এইসকল দৃষ্ট হইত। প্রাকার সংরক্ষণার্থে তদুপরি শতঘ্নী অস্ত্র (২৩) স্থাপিত থাকিত। সুবর্ণের ন্যায় চিত্রিত বর্ণ বিশিষ্ট সপ্ততল গৃহ এবং স্ত্রীগণের

---

(২৩) যদ্দ্বারা শতজনকে এককালে হনন করা যায় তাহা শতঘ্নী। এই শতঘ্নী অস্ত্র কি? এই অস্ত্র শব্দার্থ অনুরূপ সার্থক না হউক কিন্তু একেবারে নিরর্থক বলিয়াও বোধ হয় না। গঙ্গার খাল কাটিবার সময় বিহাটের নিকট যে একটি গ্রামের ভগ্নাবশেষ উদ্ধার হয়, ঐ গ্রাম অতি পুরাতন এবং বুদ্ধের অনেক পূর্ব্বের বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তৎসম্বন্ধে ঐ গ্রামে প্রাপ্ত মুদ্রার সময় নির্ণয়ে Prinsep's Indian Antiquities Vol. I. Plate.

কেলি গৃহ ছিল। নগরের ভূমি সর্ব্বত্র সমতল। স্তুতিপাঠক ও বংশাবলী কথক-গণ নিয়ত এই নগরে বাস করিত। সাগ্নিক ও বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। দুন্দুভী, মৃদঙ্গ, বীণা, পণব প্রভৃতির বাদ্য হইত। নগর সহস্র শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ দ্বারা রক্ষিত হইত।" (২৪)

XIX বৃত্তান্ত দেখ। ঐ পুস্তকের উক্তগ্রামের মুদ্রা বিষয়ক Plate VII হইতে প্রথম সংখ্যক মুদ্রার অক্ষর সমূহ এবং Plate XXXVII (Vol II of the Book) যে বর্ণমালা দেওয়া আছে, তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে খৃষ্টীয় শতাব্দীর পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে যে অক্ষর ছিল, ইহা সেই অক্ষর। অতএব কেবল অক্ষর দেখিয়া ধরিলে এই মুদ্রা সেই সময়ের বা অল্প এদিক ওদিক হইতে পারে। এই মুদ্রা যেখানে পাওয়া গিয়াছে, সেইখানেই আর এক বস্তু পাওয়া যায়; তৎপ্রসঙ্গে "There are some other things, one bearing in some respects a resemblance to a small cannon, another to a button book" &—Col. Cautley's report quoted by Prinsep. আবার বারুদের প্রসঙ্গে "I am more than ever inclined to accede to the opinion of those, who believe that gun-powder was invented in India" পুনশ্চ "The use of it in war was forbidden in their sacred books, the Veidam or Vede"—Beckmann in his History of Inventions Vol II. তবে কি, বর্ত্তমান ভাবে না হউক, অতি সামান্য ভাবে, যাহাকে অতিকষ্টে এবং কোনরূপে কামান বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, এরূপ কোন আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার রামায়ণ প্রণেতার সময়ে ছিল?

(২৪) ১ কাণ্ড—৫ সর্গ।

উপক্রমণিকা

আর্য্যজাতির আদিম অবস্থার বিষয় বলিতে হইলে আর্য্যজাতি শব্দে কাহাকে বুঝায় তাহাই প্রথমে নির্ণয় করা আবশ্যক। ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি আর্য্যজাতির মধ্যে গণ্য। শূদ্রজাতি অনার্য্য বলিয়া খ্যাত। আর্য্যজাতি যে যে স্থলে বাস করিতেন সেই সেই স্থল পুণ্যময় ভূমি। তাঁহারা কুল ক্রমাগত যে আচার অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন তাহাই সদাচার। উহা শাস্ত্রাপেক্ষা পরম মান্য। ইঁহারা যাহা অস্পৃশ্য ও অশুচি কহিয়াছেন উহা আবহমানকাল ঐরূপই চলিয়া আসিতেছে। ইঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়মানুসারে চলিয়া থাকেন। আর্য্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল বেদ। বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়।

বেদ চতুর্ব্বিধ। ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব! বেদকে শ্রুতিও কহিয়া থাকে। যে শ্রুতি যে ঋষি কীর্ত্তন করিয়াছেন সেই শ্রুতি সেই ঋষির নামে পরিগণিত। ঋষিগণ লোকযাত্রা মানসে যে সকল নিয়ম প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন তৎসমুদয় স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র। ঋষিদিগের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলিয়া মান্য (১) তাঁহাদিগের সকলের মত এককালে আদরণীয় নহে; যুগে যুগে ঋষি বিশেষের মত বিশেষ বিশেষ কার্য্যে মাননীয় (২)। তাঁহারা যে সকল ইতিহাস অথবা কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তৎসমস্তও শ্রুতি স্মৃতির অনুরূপ চলিতেছে। সেগুলির নাম পুরাণ বা উপপুরাণ। অধুনা, দেব দেবী প্রণীত বলিয়া কতকগুলি শাস্ত্র

---

(১) মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥৪
পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিতা দক্ষ গৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ ॥৫
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রথম অধ্যায়।

(২) কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ ॥
পরাশরসংহিতা প্রথম অধ্যায়।

বহির্গত হইয়াছে, তাহাদিগকে তন্ত্র বলা যায়। সেগুলি বঙ্গবাসী ধার্ম্মিকাভিমানি-দিগের বিশেষ আদরের স্থানে অধিষ্ঠিত দেখা যায়।

উপরি কথিত শাস্ত্রগুলি ঋষি প্রণীত বলিয়া সকলেই শ্রদ্ধা সহকারে মান্য করেন তদ্বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। যে বিধান গুলি ঋষ্যাদি প্রণীত নয় তাহাতেই লোকের দলাদলি দেখা যায়। সুতরাং ভিন্ন মতাবলম্বীরা ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক ও তদীয় অবলম্বিত ধর্ম্ম শাস্ত্রের দোষোদ্‌ঘোষণ পূর্ব্বক ঐ দলকে অপাঙ্‌ক্তেয় করিতে পরাঙ্মুখ হন না। এই সূত্রে আর্য্য সমাজে দ্বেষ, হিংসা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইল।

আর্য্য জাতিরা ধর্ম্ম শাস্ত্রের নিতান্ত বশবর্ত্তী, সুতরাং কেহ কাহারও অবলম্বিত ধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষ করিলে তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার করা দূরে থাকুক বাক্যা-লাপ পর্য্যন্তও করেন না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের আহার ব্যবহার রহিত হয়। ইহাই একতা ভঙ্গের কারণ। অনৈক্য ভাবই আর্য্যজাতির পতনের মূল।

আর্য্যজাতি কোথায় প্রথম বাসস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন, কতকালই বা একত্র ছিলেন, তৎপরেই বা কোথায় গেলেন, তাহাই নির্দ্ধারণ হইলে ইঁহাদিগের আদিম অবস্থার বিষয়ে অনেক সংবাদ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। অতএব প্রথমে তাঁহাদিগের বাসস্থলের সীমাদি নির্দ্দেশ করা উচিত।

ইঁহারা প্রথমে উত্তর দিগে আবাস গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ক্রমশঃ দক্ষিণা-ভিমুখী হন। যখন যে স্থলে অধিবাস করিতে লাগিলেন অমনি তত্তৎ স্থলের প্রশংসা পূর্ব্বক সেই সেই দেশ আর্য্য কুলের আবাস যোগ্য বলিয়া বিধান করিয়া রাখিতে লাগিলেন। মূল বাসস্থল যে উত্তর প্রান্তে ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সকল ব্যক্তিই উত্তর দিগে ভাষা শিক্ষা করিতে যাইতেন। ঐ দিগ্ বাক্যের প্রসূতি। (৩)

আর্য্যজাতি প্রথমে কোন্ প্রদেশে আসিয়াছিলেন তাহার প্রমাণে এইমাত্র জানা যায় যে, ইঁহারা উত্তর হইতে প্রথম পাদ বিক্ষেপে ব্রহ্মাবর্ত্তে বাসস্থল মনো-নীত করিয়াছিলেন। যে দেশ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী, এই দুই দেবনদীর মধ্যবর্ত্তী তাহারই নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। ব্রহ্মাবর্ত্তে যে আচার কুলক্রমাগত চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই সর্ব্ববর্ণের সদাচার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। (৪)

---

(৩) কৌষীতকী ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ধৃত পথ্যাস্বস্তিরুদীচীংদিশং প্রাজানাদ্ বাগ্‌বৈ পথ্যাস্বস্তিস্তস্মাদ্ উদীচ্যাংদিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ উএব যান্তি বাচং শিক্ষিতুং। যোবা তত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্ত ইতি স্মাহ। এষা হি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা।

(৪) সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে। ১৭
তস্মিন্‌দেশে য আচারঃ পারংপর্য্য ক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে। ১৮

ইঁহাদিগের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সীমা নির্দ্দিষ্ট স্থল অতিক্রম করা আবশ্যক জ্ঞান হইলে, অধস্তন বংশেরা ক্রমে দক্ষিণাভিমুখী হইতে লাগিলেন। তাঁহারা যেস্থলে আসিলেন, তাহার নাম ব্রহ্মর্ষিদেশ। ইহাই দ্বিতীয় প্রস্থানের সীমা। ব্রহ্মর্ষিদেশ চারি ভাগে বিভক্ত। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও শূরসেনক। ব্রহ্মাবর্ত্ত অপেক্ষা, ব্রহ্মর্ষিদেশ গৌরবে কিঞ্চিৎ হীন। তথাচ এতদ্দেশপ্রসূত বিপ্রজাতির নিকট হইতে, আপন আপন জাতি ধর্ম্মানুসারে, সদাচার ও সচ্চরিত্রতা শিক্ষার আদেশ সকল ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, ব্রহ্মর্ষিগণ এই স্থলেই বসতি করিয়াছিলেন ; নতুবা প্রাচীনদেশস্থ ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করিয়া, কেন অপেক্ষাকৃত আধুনিকদেশ সম্ভব ব্রাহ্মণগণের নিকট শিষ্টাচার শিক্ষার আদেশ হইল ?

যৎকালে আর্য্য গোষ্ঠির সন্তান পরম্পরা উক্ত দেশ সমস্তে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন এবং স্থান সমাবেশ হয় না দেখিলেন, তৎকালে তৃতীয় প্রস্থানের সুসময় উপস্থিত হইল। এইবারে মধ্যদেশ গ্রহণ করিলেন। হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী, কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী, প্রয়াগের পশ্চিমবর্ত্তী ভূভাগকে মধ্যদেশ কহা যায়। (৫)

যৎকালে আর্য্যকুলের অধিক বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল, মধ্যদেশ পর্য্যন্ত ইঁহাদিগের দ্বারা সম্যক্ অধ্যুষিত হইল, তথায় আর স্থান সঙ্কুলন হয় না প্রত্যুতঃ স্বচ্ছন্দে বাস করা অতি কষ্টকর হইল, তৎকালে চতুর্থ প্রস্থানের আবাস ভূমির প্রয়োজন। মনে করিলেন এই প্রস্থানে আর্য্যজাতি যতদূর অধিকার করিবেন ততদূরই তাঁহাদিগের পক্ষে নিবসতির পর্য্যাপ্ত স্থান হইতে পারিবে। তদনুসারে আর্য্যাবর্ত্তকে চতুর্থ প্রস্থানের আবাস স্থির করিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব সীমা পূর্ব্বসাগর পশ্চিম সীমা পশ্চিমসাগর উত্তরসীমা হিমালয় দক্ষিণ সীমা বিন্ধ্যগিরি। (৬)

এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডও যখন আর্য্যকুলের পক্ষে অল্পমাত্র স্থান বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল অর্থাৎ পূর্ব্বদিগে ব্রহ্ম রাজ্য পশ্চিমে পারস্য রাজ্য উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরির মধ্যবর্ত্তী স্থান আর্য্যগণের পক্ষে সঙ্কীর্ণ স্থান বলিয়া বোধ হইল, ইঁহাদিগের প্রভুতা সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইল, শৌর্য্য বীর্য্য ও পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ হইলেন

---

(৫) কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেন—কাঃ
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ ॥১৯
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ ॥ ২০
হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্ বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২১। মনু। ২। অ।
(৬) আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ ॥২২

এবং অন্যের নিকট দুর্দ্দান্ত হইলেন, তখন বিবেচনা করিলেন এক্ষণে এরূপে আর নিবসতির সীমা নির্দ্দেশ করা উচিত নয়, বাসের যোগ্য স্থান দেখিলে তথায় বাসের বিধান দেওয়া কর্ত্তব্য। এমন নিয়ম করা উচিত, যাহাতে সকলে একেবারে যথেচ্ছাচারী না হয় অথচ নিয়মটিতেও কিছু নৈপুণ্য থাকে; এরূপ কোন বিধান করাই শ্রেয়স্কর। তদনুসারে পরম সুকৌশলপূর্ণ নিয়ম স্থিরীকৃত হইল। সে নিয়মটি এই। কৃষ্ণসারমৃগ স্বভাবতঃ যে দেশে বিচরণ করে সে দেশ যজ্ঞীয়দেশ। তথায় দ্বিজগণ অনায়াসে বাস করিতে পারেন। যেখানে কৃষ্ণসার স্বভাবতঃ বিচরণ না করে তাহার নাম ম্লেচ্ছদেশ। (৭)

আর্য্য সন্ততিগণ আপনাদিগের অধিকার ভূমি সীমা নিবদ্ধ ও অসীম এই উভয়-বিধ স্থির করিয়া শূদ্রগণের পক্ষে কিঞ্চিৎ সদয় হইলেন সে দয়াটী এই। শূদ্রগণ আপন আপন জীবিকা জন্য সর্ব্বত্র বাস করিতে পারিবে। দ্বিজগণ পবিত্র দেশে পবিত্র আচার অবলম্বন করিয়া চলিবেন। তাহার অন্যথা করিলে দ্বিজগণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন। উচ্চ জাতি হইতে নিকৃষ্ট জাতি মধ্যে গণনীয় না হইতে হয় এই-ভয়ে সর্ব্বদা সকলে সদাচার ও সীমা অতিক্রম করিতেন না। ইহাতেই শূদ্রগণের জীবন রক্ষার উপায় হয়।

কলিযুগের ধর্ম্ম বক্তা পরাশর ঋষি মনে করিলেন কলিকালে লোক সংখ্যা অধিক হইবে তৎকালে এতাদৃশ স্বল্প পরিমিত স্থলে অধিবাস পূর্ব্বক দ্বিজগণের জীবিকা নির্ব্বাহ করা অতিশয় কঠিনকর; অতএব ইহাদিগের জীবন রক্ষার উপায় করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। দ্বিজকুলের পরম হিতজনক সে উপায় ও আদেশটী এই; দ্বিজাতিরা যেখানেই কেন বাস করুন না, তাঁহারা স্বজাতি সমুচিত সদাচার কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না। দ্বিজাতি সমুচিত সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠানে রত থাকিবেন। ইহাই ধর্ম্ম মীমাংসা।

মনুর নিয়মানুসারে দ্বিজগণ নিসেবিত স্থল ব্যতীত অন্যত্র বাসে দ্বিজাতির ক্রিয়া কলাপে অধিকার থাকে না। কিন্তু কলি ধর্ম্মবিৎ ঋষির নিয়মানুসারে দ্বিজাতিগণ সদাচার ও সৎক্রিয়া সম্পন্ন থাকিলেই যত্র তত্র বাস করিতে নিষিদ্ধ নন। এই বচনটী আর্য্যজাতির উন্নতির একতম কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। (৮)

(৭) কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞীয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃপর ॥২৩
এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্বৃত্তি কর্ষিতঃ ॥ মনু—২—অ

(৮) পরাশর সংহিতা—
উষিত্বা যত্র তত্রাপিস্বাচারং নবিবর্জ্জয়েৎ।
সৎকর্ম্মাপি প্রকুর্ব্বীরন্নিতি ধর্ম্মস্য নিশ্চয়ঃ ॥ ৩০

আর্য্যগণ যেমন ভারতবর্ষের সমুদায় উত্তম স্থলগুলি অধিকৃত করিলেন, তৎসঙ্গে সঙ্গেই শাসন প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন। ইঁহারা আপনাদিগের শাসন-ভার রাজার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়কে রাজপদ প্রদান করিতেন। সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের হস্তে মন্ত্রণার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। বৈশ্যগণের প্রতি বাণিজ্য, কৃষি ও পশুপালন ভার নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের দাস্যবৃত্তি নির্ব্বাহ জন্য কেবল শূদ্রজাতিকেই বশীভূত করিয়াছিলেন।—

আর্য্যজাতি রাজশাসনের বশীভূত। ইঁহারা রাজাকে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণের অংশে অবতীর্ণ জ্ঞান করেন। এমন কি সুরাজাকে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ জ্ঞান করিয়া চলেন। বিচারক ও নৃপতিকে কদাচ অভিন্ন মনে করেন না। বিচারাসন ও ধর্ম্মাসন আর্য্যগণের পক্ষে সমান। বিচারগৃহ ও ধর্ম্মমন্দির ইঁহাদিগের নিকট তুল্য মান্য। নৃপতি ও দেবতা ইঁহাদিগের নিকট অভিন্ন। দেবগণ নৃপদেহে অবস্থান পূর্ব্বক লোক পালন করেন। সুতরাং নৃপতি বালক হইলেও তাঁহাকে অবজ্ঞা করা অনুচিত, ইহাই ইঁহাদিগের একান্ত বিশ্বাস। সত্যই ইঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। একমাত্র ধর্ম্ম-ব্যতীত আর্য্যগণের অন্য শ্রেষ্ঠ সুহৃদ্ নাই। পরকালেও ধর্ম্মবন্ধু সঙ্গী হন। (৯)

ভূপতিকে এতাদৃশ প্রধান মনে করেন বটে তথাপি তাঁহার ঐচ্ছিকনিয়ম কদাচ মান্য করেন না। রাজাকে প্রজাপালন নিমিত্ত বিধান সংহিতা মানিতে হয়।

---

(৯) ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতী ॥ ৪
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা ॥ ৫
সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ ॥ ৭
বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥ ৮—৭ অ মনু।
একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥ ১৭—মনু—৮ অ।
নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
নহি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে ॥ ১০৫
রাজন্ সত্যং পরংব্রহ্ম সত্যঞ্চ সময়ঃ পরঃ।
মাত্যাক্ষীঃ সময়ং রাজন্ সত্যংসঙ্গতমস্তুতে ॥১০৬
মহাভারত আদি পং সম্ভব—শাকুন্তলে।

তিনি বিধি-নিষিদ্ধ কোন কর্ম্ম করিতে সক্ষম নন। প্রজাপালন জন্য তাঁহাকে প্রাচীন ঋষিদিগের অনুষ্ঠিত আচার ব্যবহার অনুসারে চলিতে হয়।

তাঁহারা রাজ্যশাসনের যে সমুদায় ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন সেই পদ্ধতি-গুলিকে শিরোধার্য্য জ্ঞান করিয়া যে নৃপতি প্রজাপালন করেন তিনিই প্রকৃতি পুঞ্জের প্রিয় হন।

রাজা সদগুণশালী না হইলে রাজসিংহাসনে স্থায়ী হইতে পারিতেন না। প্রজাবর্গ ষড়যন্ত্র করিয়া অন্য রাজার সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটাইয়া দিত। ভূপতিগণ তাহাতেই সুশাসিত হইয়া আসিতেন। ভূপালবর্গ শাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক অন্যায় আচরণ করিতে পারিতেন না। পৃথিবীপতি বলিয়াই যে তিনি সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিবেন তাঁহার সে সুযোগ ছিল না। তিনি কুক্রিয়া ও অন্যায়াচরণ জন্য সমাজের নিকট বিশেষ দায়ী ও দণ্ডনীয় ছিলেন। পাপকারী নরপতিকে সিংহাসনচ্যুত এবং তাঁহার বিশেষ শাস্তি প্রদান পুরঃসর অন্য রাজাকে রাজ্যের অধিনায়ক করিয়া তদীয় শাসন মান্য করিতেন তথাপি অরাজক রাজ্যে কদাচ বাস অথবা পাপাত্মার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেন না। (১০)

রাজা রাজ্যের অধিকারী ছিলেন বটে কিন্তু কোন বিষয়েই তিনি সর্ব্বংকষ ক্ষমতাশালী হইতে পারিতেন না। তাঁহাকে মন্ত্রিপরিবেষ্টিত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত। রাজ্য রক্ষার কথা দূরে থাকুক শাসন কার্য্যও কেহ একাকী নির্ব্বাহ করিতে অধিকারী ছিলেন না। বিভিন্ন কার্য্যে বিভিন্ন মন্ত্রিবর্গের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইত।

রাজা স্বচক্ষে সমুদায় প্রত্যক্ষ পূর্ব্বক রাজ্যশাসনে অপারগ বলিয়া স্থানে স্থানে ও কার্য্য বিশেষে পৃথক্ পৃথক্ প্রতিনিধি নিযুক্ত রাখিতেন। তাঁহাদিগের কার্য্য কলাপ পরিদর্শন নিমিত্ত তত্ত্বাবধায়ক, দূত, গুপ্তচর ও ছদ্মবেশধারী পুরুষ নিযুক্ত করিতেন। সময়ে সময়ে সসৈন্যে নিজেই অধীনবর্গের কার্য্যকুশলতা সন্দর্শন করিতেন।

আর্য্যজাতির শাসনকালে ক্ষুদ্র গ্রামেও রাজার প্রতিনিধি থাকিত। কোন

---

(১০) বহবোঽবিনয়ান্নষ্টা রাজানঃসপরিচ্ছদাঃ।
বনস্থা অপিরাজ্যানি বিনয়াৎপ্রতি পেদিরে॥ ৪০
বেণো বিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাসো যাবনিশ্চৈব সুমুখো নিমিরেব চ॥ ৪১
পৃথুস্তু বিনয়াদ্রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ।
কুবেরশ্চ ধনৈশ্বর্য্যং ব্রাহ্মণ্যঞ্চৈব গাধিজঃ॥ ৪২
মনু—৭—অ।

ব্যক্তিই অন্যায় আচরণ করিয়া পরিত্রাণ পাইতেন না। ক্ষুদ্র বা গণ্ডগ্রামের সংখ্যানুসারে স্থানে স্থানে গুল্ম সংস্থাপন করিতেন। তথায় সসৈন্য অমাত্য থাকিতেন। তাঁহার অধীনে কারাগার থাকিত। গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনকার্য্য গ্রামীণ মণ্ডল দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। তিনি আপন ক্ষমতার অসাধ্য কার্য্য দশ গ্রামীণের নিকট বিজ্ঞাপন করিতেন। দশ গ্রামাধ্যক্ষ বিংশতীশের অধীনতায় আবদ্ধ ছিলেন।—বিংশতীশ আবার শত গ্রাম শাস্তার নিয়ম বশীভূত থাকিতেন। শতগ্রাম নিয়ন্তা সহস্র গ্রামাধিপতির সকাশে স্বকীয় শাসন কার্য্যের দোষ গুণ বিজ্ঞাপন করিয়া তদীয় অসাধ্য কার্য্যের সুনিয়ম করাইয়া লইতেন। এরূপ ক্রমশঃ নিম্ন পদস্থ ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত নিম্নতরের প্রতি আধিপত্য করিতেন। এবং ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ পদবীর লোকের অধীন হইতেন। সহস্র গ্রামাধিপতি নগরাধ্যক্ষের অধীন হইয়া কার্য্য করিতেন। তাঁহার প্রতি রাজ্যশাসনের অনেক ভার সমর্পিত হইত। (১১)

ইঁহারা কেহই রাজকোষ হইতে বেতন পাইতেন না। ইঁহাদিগের জীবিকা জন্য রাজা নিষ্কর ভূমি দিতেন।

আর্য্যকুলের প্রজাগণ প্রতিদিন রাজার উদ্দেশে অন্ন, পানীয় ও ইন্ধনাদি রাজপ্রতিনিধি সমীপে আনয়ন করিতেন। তৎসমস্ত দ্রব্য গ্রাম মণ্ডল আপন জীবিকা জন্য গ্রহণ করিতেন। ইহাই তাঁহার ধর্ম্মানুসারিবৃত্তি।

দশ গ্রামীণ আপন জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় স্বরূপ দুই হলকর্ষণ যোগ্য ভূমি নিষ্কর উপভোগ করিতে নিষিদ্ধ নন। ইহা তাঁহার যথার্থ বৃত্তি। চারি বৃষভে এক হলকর্ষণ হয়। আট বৃষভের কর্ষণ সাধ্য ভূমিই দুই হলের যোগ্য বলা যায়। উহার নাম কুলভূমি।

বিংশতীশ আপন ভরণপোষণ জন্য কুলভূমি পঞ্চক গ্রহণ করিতে পারিতেন। অর্থাৎ চত্বারিংশৎ বৃষভের কর্ষণ সাধ্য ভূমি নিষ্কর ভোগ করিতে পারিতেন। ইহা তাঁহার পক্ষে নিষ্পাপবৃত্তি।

---

(১১) দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতং।
তথাগ্রামশতানাঞ্চ কুর্য্যাদ্রাষ্ট্রস্য সংগ্রহং॥ ১১৪
গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশ গ্রামপতিন্তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ॥ ১১৫
গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়ং।
শংসেদ্গ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনং॥ ১১৬
বিংশতীশস্তু তৎ সর্ব্বং শতেশায় নিবেদয়েৎ।
শংসেদ্গ্রামশতেশস্তু সহস্রপতয়ে স্বয়ং॥ ১১৭ মনু—৭—অ

গ্রামশতাধ্যক্ষ একখানি গ্রাম নিষ্কর উপভোগ করিতেন। তাহাই তাঁহার জীবিকার জন্যে ধর্ম্ম্যবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল।

সহস্র গ্রামাধ্যক্ষ স্বকীয় জীবিকা জন্য একখানি নগর নিষ্কর ভোগ করিতেন। ইহা তদীয় ধর্ম্মজনকবৃত্তি।

ইঁহাদিগের কার্য্য পরিদর্শন জন্য নগরে নগরে এক একজন সর্ব্বার্থ চিন্তক থাকিতেন, তিনি ইঁহাদিগের অসাধ্য কার্য্যের মীমাংসা করিতেন। যদি তিনি কোন অন্যায় করিতেন উহা রাজার কর্ণগোচর হইত; অবশেষে তিনি অবিচার জন্য নৃপতি হইতে শাস্তি প্রাপ্ত হইতেন।

আর্য্য ভূপালগণ অসঙ্গত অথবা অত্যধিক কর বা শুল্ক গ্রহণ করিতেন না। ইঁহারা বাণিজ্যের নিয়ম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক শুল্ক লইতেন। ব্যক্তি বিশেষকে করভার হইতে নিষ্কৃতি দিতেন। (১২)

কার্য্যকর্ত্তার আয়, ব্যয়, ক্ষয় ও বৃদ্ধি বিবেচনায় পণ্যদ্রব্যের আগম ও নিগমের দূরতা এবং দ্রব্যের প্রয়োজন অনুসারে মূল্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক পরিমিত শুল্ক লইতেন। যাহা গৃহীত হইত উহা দ্বারা বাণিজ্যের আসার প্রসারের কোন ব্যাঘাত সম্ভাবনা থাকিত না। এবং প্রজাপালনে ব্যয়িত হইত।

আর্য্যজাতি ত্রিবর্ষের সঙ্কুলান যোগ্য ধান্য সঞ্চয় রাখিতেন। অন্যান্য শস্যের স্থায়িত্ব জ্ঞানে সংবৎসর, দ্বিবর্ষ বা ত্রিবর্ষের ব্যয় যোগ্য সংস্থান রাখিতেন। কি মধ্যবিত্ত কি সঙ্গতিপন্ন সকলেই সঞ্চয়ের গুণ অবগত ছিলেন।

পঞ্চরাত্রি অতিক্রান্ত হইলেই রাজাজ্ঞায় অস্থির মূল্যবান্ বস্তুর মূল্য হট্টাদির মধ্যে সর্ব্বসমক্ষে নির্দ্ধারিত হইত। যে বস্তুর মূল্য অপেক্ষাকৃত স্থিরতর তাহার মূল্য পক্ষান্তে নির্ণীত হইত।

বাজারের মানদণ্ড এবং পরিমাপক পাত্র প্রতিষাণ্মাসিকে পরীক্ষিত হইয়া

---

(১২) যানি রাজপ্রদেয়ানি প্রত্যহং গ্রামবাসিভিঃ।
অন্নপানেন্ধনাদীনি গ্রামিকস্তান বাপ্নুয়াৎ ।।১১৮
দশীকুলন্তু ভুঞ্জীত বিংশী পঞ্চ কুলানিচ।
গ্রামং গ্রাম শতাধ্যক্ষঃ সহস্রাধিপতিঃ পুরং ।।১১৯
তেষাং গ্রাম্যাণি কার্য্যাণি পৃথক্ কার্য্যাণিচৈবহি।
রাজ্ঞোঽন্যঃ সচিবঃ স্নিগ্ধস্তানি পশ্যেদতন্দ্রিতঃ ।।১২০
নগরে নগরে চৈক্যং কুর্য্যাৎ সর্ব্বার্থ চিন্তকং।
উচ্চৈঃ স্থান ঘোর রূপং নক্ষত্রাণামিব গ্রহং ।।১২১
সতানমুপরিক্রামেৎ সর্ব্বানেব সদাস্বয়ং।
তেষাং বৃত্তং পরিণয়েৎ সম্যগ্রাষ্ট্রেষু তচ্চরৈঃ ।।১২২—৭ অ মনু।

দ্বিতীয় যাণ্মাসিক পর্য্যন্ত অবধারিত থাকিত। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের কোন বিষয়ই রাজা অশ্রুতপূর্ব্ব থাকিতেন না।

রাজকোষ ও আয় ব্যয় প্রত্যহ পরীক্ষা করিতেন। দূতগণের নিকট হইতে প্রত্যহ বার্ত্তাগ্রহণ করিতেন। চরের কথা গোপন রাখিয়া রাজ্যের সমস্ত বিষয়ে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান লইতেন। আর্য্যজাতি কিরূপ ব্যক্তির হস্তে কেমন ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা দেখিলে তদীয় শাসন প্রণালী জানা যায়। (১৩)

---

(১৩) ক্রয় বিক্রয় মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ং।
যোগ ক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজো দাপয়েৎ করান্॥১২৭
যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তা চ কর্ম্মণাং
তথাবেক্ষ্য নৃপো রাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্॥১২৮
অ—৭—মনু।

আগমং নির্গমং স্থানং তথা বৃদ্ধি ক্ষয়া বুভৌ।
বিচার্য্য সর্ব্ব পণ্যানাং কারয়েৎ ক্রয়-বিক্রয়ৌ ॥৪০১
পঞ্চরাত্রে পঞ্চরাত্রে পক্ষে পক্ষেঽথবা গতে।
কুর্ব্বীতচৈষাং প্রত্যক্ষমর্ঘসংস্থাপনং নৃপঃ॥৪০২
তুলামানং প্রতীমানং সর্ব্বঞ্চ স্যাৎ সুলক্ষিতং।
ষট্‌সু ষট্‌সু চমাসেষু পুনরেব পরীক্ষয়েৎ॥৪০৩
মনু—৮—অ
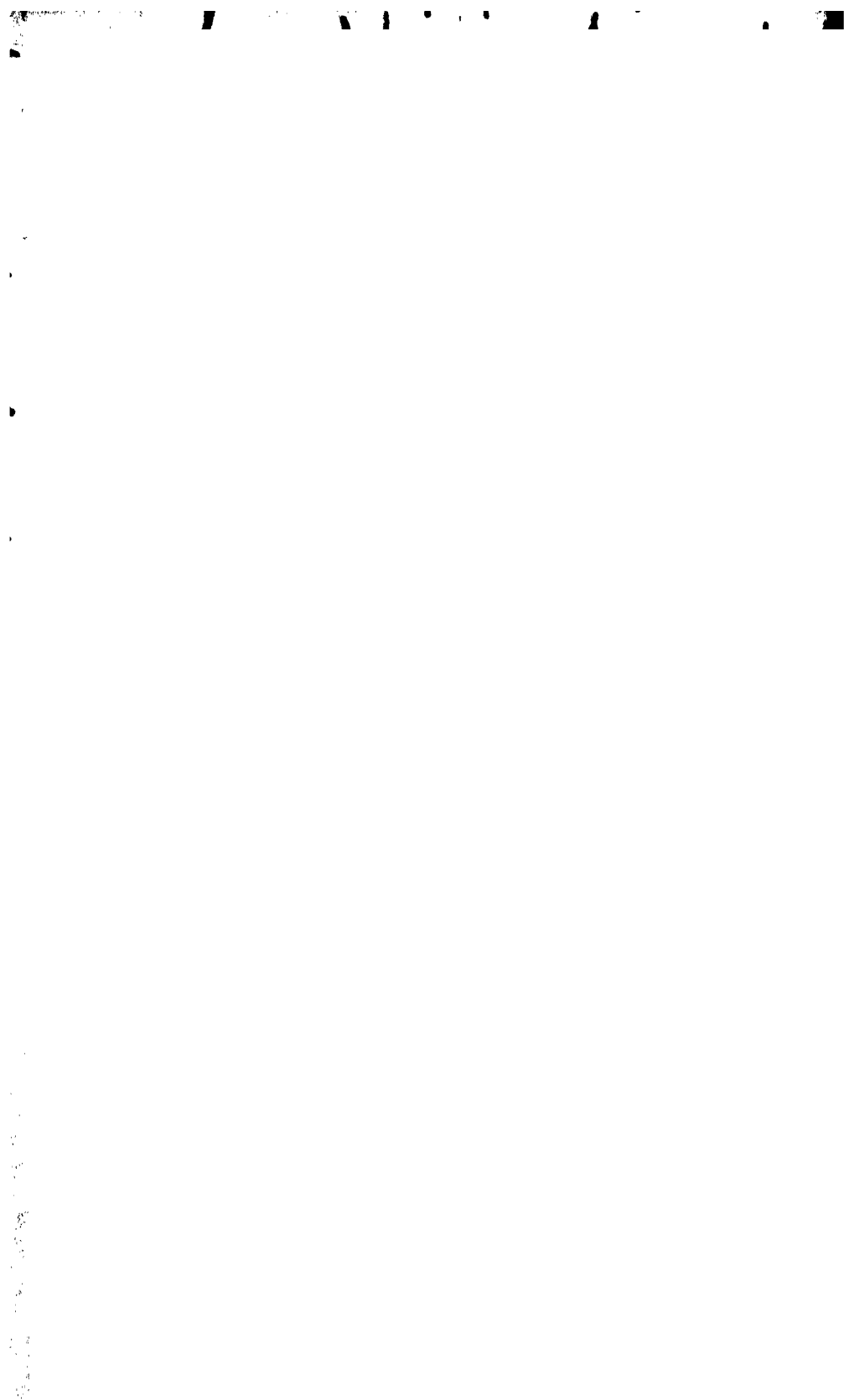
শাস্ত্রানুসারে কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে, অথবা অনন্ত কাল পূর্ব্বে জগতের সৃষ্টি। আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানেরও সেই মত।

তবে জগতের আদি আছে কি না, কেহ কেহ এই তর্ক তুলিয়া থাকেন। সৃষ্টি অনাদি, এ জগৎ নিত্য ও সকল কথায় বুঝায় যে সৃষ্টির আরম্ভ নাই। কিন্তু সৃষ্টি একটি ক্রিয়া—ক্রিয়া মাত্র, কোন বিশেষ সময়ে তাহা কৃত হইয়াছে অতএব সৃষ্টি কোন কাল বিশেষে হইয়া থাকিবে। অতএব সৃষ্টি অনাদি বলিলে, অর্থ হয় না। যাঁহারা বলেন সৃষ্টি হইতেছে, যাইতেছে, আবার হইতেছে, এইরূপ অনাদি কাল হইতে হইতেছে, তাঁহারা প্রমাণ শূন্য বিষয়ে বিশ্বাস করেন। এ কথার নৈসর্গিক প্রমাণ নাই।

"অসৃজচ্চ জগৎসর্ব্বং সহ পুত্রৈঃ কৃতাত্মভিঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সূচিত হয়, যে জগৎ সৃষ্টি এবং মনুষ্য বা মনুষ্য জনক দিগের সৃষ্টি এক কালেই হইয়াছিল। এরূপ বাক্য হিন্দু গ্রন্থে অতি সচরাচর দেখা যায়। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তাহা হইলে, যতকাল চন্দ্র সূর্য্য, ততকাল মনুষ্য। বৈজ্ঞানিকেরা এতদ্বে কি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই সমালোচিত করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞানের অদ্যাপি এমত শক্তি হয় নাই যে জগৎ অনাদি কি সাদি তাহার মীমাংসা করেন। কোন কালে সে মীমাংসা হইবে কি না, তাহাও সন্দেহের স্থল। তবে এক কালে, জগতের যে এ রূপ ছিল না, বিজ্ঞান ইহা বলিতে সক্ষম। ইহা বলিতে পারে, যে এই পৃথিবী এইরূপ তৃণ শস্য বৃক্ষময়ী, সাগর পর্ব্বতাদি পরিপূর্ণা, জীবসঙ্কুলা, জীব বাসোপযোগিনী ছিল না, গগন এককালে এরূপ সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি বিশিষ্ট ছিল না। একদিন—তখন দিন, হয় নাই—এক কালে জল ছিল না, ভূমি ছিল না—বায়ু ছিল না। কিন্তু যাহাতে এই চন্দ্র সূর্য্য তারা হইয়াছে, যাহাতে জল বায়ু ভূমি হইয়াছে—যাহাতে নদ নদী সিন্ধু—বন বিটপী বৃক্ষ—তৃণ লতা পুষ্প—পশু পক্ষী মানব হইয়াছে তাহা ছিল। জগতের রূপান্তর ঘটিয়াছে, ইহা বিজ্ঞান বলিতে পারে। কবে ঘটিল, কি প্রকারে ঘটিল তাহা বিজ্ঞান বলিতে পারে না। তবে ইহাই বলিতে পারে যে সকলই নিয়মের বলে ঘটিয়াছে—ক্ষণিক ইচ্ছাধীন নহে। যে সকল নিয়মে অদ্যাপি জড় প্রকৃতি শাসিতা হইতেছে, সেই সকল নিয়মের ফলেই এই ঘোর-রূপান্তর ঘটিয়াছে। সেই সকল নিয়মে? তবে আর সেরূপ রূপান্তর দেখি না কেন? দেখিতেছি। তিল তিল করিয়া, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জগতের রূপান্তর ঘটিতেছে। কোটি কোটি বৎসর পরে, পৃথিবী কি ঠিক এই রূপ থাকিবে? তাহা নহে।

কিরূপে এই ঘোর রূপান্তর ঘটিল, এ প্রশ্নের একটি উত্তর অতি বিখ্যাত। আমরা লাপ্লাসের মতের কথা বলিতেছি। লাপ্লাসের মত সূত্র

বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও জানেন—সংক্ষেপে বর্ণিত করিলেই হইবে। লাপ্লাস সৌরজগতের উৎপত্তি বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, মনে কর, আদৌ সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহাদি নাই, কিন্তু সৌরজগতের প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমভাবে, সৌরজগতের পরমাণু সকল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। জড় পরমাণু মাত্রেরই, পরস্পরাকর্ষণ তাপক্ষয়, সঙ্কোচন প্রভৃতি যে সকল গুণ আছে, ঐ জগদ্ব্যাপী পরমাণুরও থাকিবে। তাহার ফলে, ঐ পরমাণুরাশি, পরমাণুরাশির কেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া ঘূর্ণিত হইতে থাকিবে। এবং তাপক্ষতির ফলে ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। সঙ্কোচনকালে, পরমাণু জগতের বহিঃপ্রদেশ সকল মধ্যভাগ হইতে বিযুক্ত হইতে থাকিবে। বিযুক্ত ভগ্নাংশ পূর্ব্ব সঞ্চিত বেগের গুণে মধ্য প্রদেশকে বেড়িয়া ঘুরিতে থাকিবে। যে সকল কারণে বৃষ্টিবিন্দু গোলত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সকল কারণে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই ঘূর্ণিত বিযুক্ত ভগ্নাংশ, গোলাকার প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে এক একটি গ্রহের উৎপত্তি। এবং তাহা হইতে উপগ্রহগণেরও ঐ রূপে উৎপত্তি। অবশিষ্ট মধ্যভাগ, সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান সূর্য্যে পরিণত হইয়াছে।

যদি স্বীকার করা যায়, যে আদৌ পরমাণু মাত্র, আকার শূন্য হইয়া জগৎ ব্যাপিয়া ছিল—জগতে আর কিছুই ছিল না—তাহা হইলে ইহা সিদ্ধ হয় যে প্রচলিত নৈসর্গিক নিয়মের বলে জগৎ সূর্য্য* চন্দ্রগ্রহ উপগ্রহ, ধূমকেতুবিশিষ্ট হইবে—ঠিক্ এখন যেরূপ, সেইরূপ হইবে। প্রচলিত নিয়ম ভিন্ন অন্য প্রকার ঐশিক আজ্ঞার সাপেক্ষ নহে। এই গুরুতর তত্ত্ব, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বুঝাইবার সম্ভাবনা নহে—এবং ইহা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হইতেও পারে না। আমাদের সে উদ্দেশ্যও নহে। যাঁহারা বিজ্ঞানালোচনায় সক্ষম তাঁহারা এই নৈহারিক উপপাদ্য সম্বন্ধে হর্বট স্পেন্সরের বিচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। দেখিবেন, যে স্পেন্সর কেবল আকার শূন্য পরমাণু সমষ্টির অস্তিত্ব মাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহা হইতে জাগতিক ব্যাপারের সমুদায়ই সিদ্ধ করিয়াছেন। স্পেন্সরের সকল কথাগুলি প্রামাণিক না হইলে হইতে পারে; কিন্তু বুদ্ধির কৌশল আশ্চর্য্য।

এইরূপে যে বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, এমত কোন নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। অন্য কোন প্রকারে, যে সৃষ্টি হয় নাই, তাহার কোন নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। তবে লাপ্লাসের মতে প্রমাণ বিরুদ্ধও কিছু নাই।† অসম্ভব কিছু নাই। এ মত সম্ভব, সঙ্গত,—অতএব ইহা প্রমাণের অতীত হইলেও গ্রাহ্য।

---

*গতিশূন্য নক্ষত্র মাত্রেই সূর্য্য-জগতে কোটি কোটি সূর্য্য।

†কোমৎ, মিল, স্পেন্সর প্রভৃতি এই মত অনুমোদন করেন। সর জন হর্শেল বলেন, এ মত প্রমাণ বিরুদ্ধ।

এই মত প্রকৃত হইলে, স্বীকার করিতে হয় যে আদৌ পৃথিবী ছিল না। সূর্য্যাঙ্গ হইতে পৃথিবী বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পৃথিবী যখন বিক্ষিপ্ত হয়, তখন ইহা বাষ্পরাশি মাত্র—নহিলে বিক্ষিপ্ত হইবে না? অতএব পৃথিবীর প্রথমাবস্থা, উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক।

একটি উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক—আকাশ পথে বহুকাল বিচরণ করিলে কি হইবে? প্রথমে তাহার তাপহানি হইবে। যেখানে তাপের আধার মাত্র নাই—সেখানে তাপ লেশ নাই; আহা অচিন্তনীয় শৈত্য বিশিষ্ট। আকাশে তাপাধার কিছু নাই—অতএব আকাশমার্গ অচিন্তনীয় শৈত্য বিশিষ্ট। এই শৈত্য বিশিষ্ট আকাশে বিচরণ করিতে করিতে তপ্ত বাষ্পীয় গোলকের অবশ্য তাপক্ষয় হইবে। তাপক্ষয় হইলে কি হইবে?

জলের উত্তপ্ত বাষ্প সকলেই দেখিয়াছেন। সকলেই দেখিয়াছেন যে ঐ বাষ্প শীতল হইলে জল হয়। আরও শীতল হইলে, জল বরফ হয়। সকল পদার্থের এই নিয়ম। যাহা উত্তপ্ত অবস্থায় বাষ্পাকৃত, তাপক্ষয়ে তাহা গাঢ়তা এবং কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বাষ্পীয় গোলকাকৃতা পৃথিবীর তাপক্ষয় হইলে, কালে তাহা এক্ষণকার গাঢ়তা এবং কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

পৃথিবী কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াও কিছুকাল অগ্নিতপ্ত ছিল বিবেচনা হয়। অপেক্ষাকৃত শীতলতা ঘটিলেই কঠিনতা জন্মিবে, কিন্তু কঠিনতা জন্মিলেই তাহার সঙ্গে জীবাবাসযোগ্য শীতলতা ছিল বিবেচনা করা যায় না। সেও কালে ঘটিয়াছিল। তাপক্ষতি হেতু যে শীতলতা, তাহা উপরিভাগেরই প্রথমে ঘটে; উপরি ভাগ শীতল হইলেও, ভিতর তপ্ত থাকে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে অদ্যাপি বিষম তাপ আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা ইহা পুনঃ পুনঃ প্রমাণীকৃত করিয়াছেন।

সেই উত্তপ্ত আদিমাবস্থায়, পৃথিবীতলে কোন জীব বা উদ্ভিদের বাসের সম্ভাবনা ছিল না। উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক জীবাবাসোপযোগী শীতলতা এবং কঠিনতা প্রাপ্ত হইতে লক্ষ লক্ষ যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই—কেননা আমাদের দুধের বাটী জুড়াইতে যে কালবিলম্ব হয়, তাহাতেই আমাদের ধৈর্য্য-চ্যুতি জন্মে। অতএব পৃথিবীর উৎপত্তির লক্ষ লক্ষ যুগ পরেও জীব বা উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় নাই।

যাঁহারা ভূতত্ত্বের কিছুমাত্র জানেন, তাঁহারাও অবগত আছেন, যে পৃথিবীর উপরে নানাবিধ মৃত্তিকা এবং প্রস্তর স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত আছে। এইরূপ স্তর সন্নিবেশ কিয়দ্দূরমাত্র পাওয়া যায়, তাহার পরে যে সকল প্রস্তর পাওয়া যায়, তাহা স্তরত্ব শূন্য।

নীচে স্তরত্বশূন্য প্রস্তর, তদুপরি স্তরে স্তরে নানাবিধ প্রস্তর, গৈরিক বা

মৃত্তিকা। এই সকল স্তরনিবদ্ধ প্রস্তর, গৈরিক বা মৃত্তিকাভ্যন্তরে এমত অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যে তাহা এককালে সমুদ্রতলে ছিল। এমন কি অনেকগুলি স্তর কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্রচর জীবের শরীরের সমষ্টি মাত্র। চা-খড়ি নামে যে গৈরিক বা প্রস্তর প্রচলিত, তাহা ইয়ুরোপ খণ্ডের অধিকাংশের এবং আসিয়ার কিয়দংশের নিম্নে স্তরনিবদ্ধ আছে। এক্ষণে বর্ত্তমান অনেকগুলি পর্ব্বত কেবল চা-খড়ি। এই চা-খড়ি কেবল এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্রতলচর জীবের (Globigerinae) মৃতদেহের সমষ্টিমাত্র।

অতএব এই সকল গৈরিকস্তর এককালে সমুদ্রতলস্থ ছিল। ভূভাগের কোন স্থান কখন সমুদ্রতলস্থ হইতেছে; আবার কালসহকারে সমুদ্র সেস্থান হইতে সরিয়া যাইতেছে; সমুদ্রতল শুষ্ক ভূমিখণ্ড হইতেছে। ভূগর্ভস্থ রুদ্ধবায়ু, বা অন্য কারণে কোথাও ভূমি কালসহকারে উন্নত, কালসহকারে অবনত হইতেছে। যেখানে ভূমি উন্নত হইল, সেখান হইতে সমুদ্র সরিয়া গেল, যেখানে অবনত হইল, তাহার উপরে সাগরজলরাশি আসিয়া পড়িল। তাহার উপরে সমুদ্রবাহিত মৃত্তিকা, জীবদেহাদি পতিত হইয়া একটী নূতন স্তর সৃষ্ট হইল। মনে কর, আবার কালে, সমুদ্র সরিয়া গেল—সমুদ্রের তল শুষ্ক ভূমি হইল—তাহার উপর বৃক্ষাদি জন্মিয়া—জীবসকল জন্মগ্রহণ করিয়া বিচরণ করিল। আবার যদি কখন উহা সমুদ্র গর্ভস্থ হয়, তবে তদুপরি নূতন স্তর সংস্থাপিত হইবে এবং তথায় যে সকল জীব বিচরণ করিত, তাহাদিগের দেহাবশেষ সেই স্তরে প্রোথিত হইবে। জীবের অস্থি ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না—কিন্তু অতি দীর্ঘকাল প্রোথিত থাকিলে একরূপ প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অস্থ্যাদিকে "ফসিল" বলা যায়। পাতুরিয়া কয়লা, ফসিল কাষ্ঠ।

যে কয়টি কথা উপরে বলিলাম তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে

১। সর্ব্বনিম্নে স্তরত্বশূন্য প্রস্তর। তদুপরি অন্যান্য গৈরিকাদি স্তরে স্তরে সন্নিবিষ্ট।

২। স্তর-পরম্পরা, সাময়িক সম্বন্ধ বিশিষ্ট। যে স্তরটি নিম্নে, সেটি আগে, যেটি তাহার উপরে, সেটি তাহার পরে হইয়াছে।

৩। যে স্তরে যে জীবের ফসিল অস্থি পাওয়া যায়, সেই স্তর যখন শুষ্ক ভূমি বা জলতল ছিল, তখন সেই জীব বর্ত্তমান ছিল। যদি কোন স্তরে কোন জীব বিশেষের ফসিল একেবারে পাওয়া না যায়, তবে সেই স্তর সৃজন কালে সেই জীব ছিল না।

৪। যদি কোন স্তরে ক নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায়, খ নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায় না; তাহার উপরিস্থ কোন স্তরে যদি ঐ খ নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায়, তবে সিদ্ধ হইতেছে খ নামক জন্তু ক নামক জন্তুর পরে সৃষ্ট।

সর্ব্ব নিম্নস্থ স্তরস্তশূন্য প্রস্তরে কোন ফসিল ছিল না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে, যে পৃথিবীর প্রথম ভূমিতে কোন জীব বিচরণ করে নাই। তখন পৃথিবী জীবশূন্য ছিল।

যখন প্রথম স্তরমধ্যে জীবদেহের ফসিল দেখা যায়, তখন মনুষ্যের অবস্থানের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। মনুষ্য দূরে থাকুক, কোন বৃহৎ বা ক্ষুদ্র চতুষ্পদ জন্তুর ফসিল পাওয়া যায় না। মৎস্য বা সরীসৃপের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। যে সকল ক্ষুদ্র কীটাদিবৎ জীবের দেহাবশেষ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শম্বুকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব আদিম জীবলোকে শম্বুকেরা প্রভু ছিল।

তৎপরে মৎস্য দেখা দিল। ক্রমে উপরে উঠিতে সরীসৃপ জাতীয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালীয় সরীসৃপ, অতি ভয়ঙ্কর, তাদৃশ বিচিত্র, বৃহৎ এবং ভয়ঙ্কর সরীসৃপ এক্ষণে পৃথিবীতে নাই। সরীসৃপের রাজ্যের পরে, স্তন্যপায়ী জীবের দেখা পাওয়া যায়। ক্রমে নানাবিধ, হস্তী, ঋক্ষ, গণ্ডার, সিংহ, হরিণ জাতীয় প্রভৃতি দেখা যায়, তথাপি মনুষ্য দেখা যায় না। মনুষ্যের চিহ্ন কেবল সর্ব্বোর্দ্ধ স্তরে, অর্থাৎ আধুনিক মৃত্তিকায়। তন্নিম্নস্থ অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরেও কদাচিৎ মনুষ্যের চিহ্ন পাওয়া যায়। অতএব মনুষ্যের সৃষ্টি সর্ব্বশেষে; মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক জীব।*

"আধুনিক" শব্দে এ স্থলে কি বুঝায় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। যে সকল স্তরের কথা বলিলাম, সে গুলির সমবায়, পৃথিবীর ত্বগের স্বরূপ। একটি স্তরের উৎপত্তি ও সমাপ্তিতে কত লক্ষ বৎসর, কত কোটি বৎসর লাগিয়াছে, তাহা কে বলিবে? তাহা গণনা করিবার উপায় নাই। তবে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে, যে সে কাল অপরিমিত—বুদ্ধির ধারণার অতিত। সর্ব্বোর্দ্ধ স্তরেই মনুষ্য চিহ্ন, এই কথা বলিলে, এমত বুঝায় না, যে বহু সহস্র বৎসর মনুষ্য পৃথিবী-বাসী নহে। তবে পৃথিবীর বয়ঃক্রমের সঙ্গে তুলনা করিলে বোধ হয়, মনুষ্যের উৎপত্তি এই মুহূর্ত্তে হইয়াছে। এই জন্য মনুষ্যকে আধুনিক জীব বলা যাইতেছে।

যাঁহারা বিজ্ঞান আলোচনায় রত নহেন, তাঁহাদিগের বুঝিবার জন্য, এই কয়েকটী কথা উপক্রমণিকাস্বরূপ বলা গেল। মনুষ্যের উৎপত্তিকাল নিরূপণ জন্য যে প্রমাণ সংগ্রহ হইতে পারে এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মিসরদেশের রাজাবলীর যে সকল তালিকা প্রচলিত আছে, তাহাতে যদি বিশ্বাস করা যায়, তবে মিসরদেশে দশ সহস্র বৎসরাবধি রাজশাসন প্রচলিত আছে। হোমর, খ্রীষ্টের নয়শত বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী বিদিত মহাকাব্যদ্বয় রচনা করেন; ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। হোমরের গ্রন্থে মিসরের রাজধানী শতদ্বার বিশিষ্টা থিবস্ নগরীর

* এ কথায় এমত বুঝায় না, যে মনুষ্যের পর কোন জীবের উৎপত্তি হয় নাই। বোধ হয়, বিড়াল মনুষ্যের কনিষ্ঠ।

মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। মনুষ্যজাতি সভ্যাবস্থায় একবার উন্নতির পথে পদার্পণ করিলে, উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র লাভ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু অসভ্যদিগের স্বতঃ সম্পন্ন যে উন্নতি তাহা অচিন্তনীয় কাল বিলম্বে ঘটিয়া থাকে। ভারতীয় বন্যজাতিগণ চারি সহস্র বৎসর সভ্যজাতির প্রতিবেশী হইয়াও বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। অতত্রব সহজে বুঝিতে পারা যায় যে মিসরদেশে সভ্যতা স্বতঃ জন্মিয়া যে কালে, শতদ্বার বিশিষ্টা নগরী সংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ বহু সহস্র বৎসর। মিসরতত্ত্বজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন, যে মেম্ফিজ প্রভৃতি নগরী থিবস্ হইতে প্রাচীনা। এই সকল নগরীতে যে দেবালয়াদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহাতে যুদ্ধজয়াদির উৎসবের প্রতিকৃতি আছে। সর জর্জ কর্ণওয়াল লুইস বলেন ঐতিহাসিক সময়ে মিসরদেশীয়দিগকে কখন যুদ্ধপরায়ণ দেখা যায় না। অথচ কোন কালে তাহারা যুদ্ধপরায়ণ না থাকিলে, তন্নির্ম্মিত মন্দিরাদিতে যুদ্ধ জয়োৎসবের প্রতিকৃতি থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব বিবেচনা করিতে হইবে যে ঐতিহাসিক কালের পূর্ব্বেই মিসরদেশীয়েরা এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, যে প্রকাণ্ড মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া জাতীয় কীর্ত্তি সকল তাহাতে চিত্রিত করিত। অসভ্যজাতি কেবল আপন প্রতিভাকে সহায় করিয়া যে এত দূর উন্নতি লাভ করে অনেক সহস্র বৎসরের কাজ। তাহার পর ঐতিহাসিক কাল অনেক সহস্র বৎসর। অতএব বহু সহস্র বৎসর হইতে মিসরদেশে মনুষ্যজাতি সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। সে দশ সহস্র বৎসর, কি ততোধিক, কি তাহার কিছু ন্যূন তাহা বলা যায় না।

মিসরদেশ নীলনদী নির্ম্মিত। বৎসর বৎসর নীলনদীর জলে আনীত কর্দ্দমরাশিতে এই দেশ গঠিত হইয়াছে। থীবস্ মেম্ফিজ প্রভৃতি নগরী নীলনদী পলির উপর স্থাপিত হইয়াছিল। এই নদী কর্দ্দম নির্ম্মিত প্রদেশ, ১৮৫১ ও ১৮৫৪ সালে রাজব্যয়ে সুযোগ্য তত্ত্বাবধারকের তত্ত্বাবধারণায় নিখাত হইয়াছিল। নানা স্থানে খনন করা যায়। যেখানে খনন করা হইয়া গিয়াছিল, সেইখান হইতেই ভগ্ন মৃৎপাত্র, ইষ্টকাদি উঠিয়াছিল। এমন কি ষাট ফিট নীচে হইতে ইষ্টক উঠিয়াছিল। সকল স্থানে এইরূপ ইষ্টকাদি পাওয়া গিয়াছিল, অতএব ঐ সকল ইষ্টক পূর্ব্বতন কূপাদি নিহিত বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। এই সকল খনন কার্য্য হেকেকিয়ান বে নামক একজন সুশিক্ষিত আরমাণি জাতীয় কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধারণায় হইয়াছিল। লিনাণ্ট বে নামক অপর এক জন কর্ম্মচারী ৭২ ফিট নিম্নে ইষ্টক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মসুর গিরার্ড অনুমান করেন যে নীলের কর্দ্দম, শত বৎসরে পাঁচ ইঞ্চি মাত্র নিক্ষিপ্ত হয়। যদি শত বৎসরে ছয় ইঞ্চিও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে হেকেকিয়ান ৬০ ফিট নীচে যে ইট পাইয়াছিলেন, তাহার বয়ঃক্রম অন্যূন দ্বাদশ

সহস্র বৎসর। মস্যূর রজীর হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, যে নীলের কাদা শত বৎসরে ২।০ ইঞ্চি মাত্র জমে। যদি এ কথা সত্য হয় তবে লিনাণ্ট বে'র ইষ্টকের বয়স ত্রিশ হাজার বৎসর।

অতএব যদি কেহ বলেন, যে ত্রিশ হাজার বৎসরেরও অধিক কাল মিসরে মনুষ্যের বাস, তবে তাঁহার কথা নিতান্ত প্রমাণ শূন্য বলা যায় না।

মিসরে যেখানে, যত দূর খনন করা গিয়াছে, সেইখানেই, পৃথিবীস্থ বর্ত্তমান জন্তুর অস্থ্যাদি ভিন্ন লুপ্ত জাতির অস্থ্যাদি কোথাও পাওয়া যায় নাই। অতএব যে সকল স্তর মধ্যে লুপ্ত জাতির অস্থ্যাদি পাওয়া যায়, তদপেক্ষা এই নীল কর্দ্দমস্তর অত্যন্ত আধুনিক। আর যদি সেই সকল লুপ্ত জন্তুর দেহাবশেষ বিশিষ্ট স্তর মধ্যে মনুষ্যের তৎসহ সমসাময়িকতার চিহ্ন পাওয়া যায়, তবে কত সহস্র বৎসর পৃথিবীতল মনুষ্যের আবাস ভূমি কে তাহার পরিমাণ করিবে?

এরূপ সমসাময়িকতার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। তদ্বিবরণ পশ্চাৎ লিখিব।
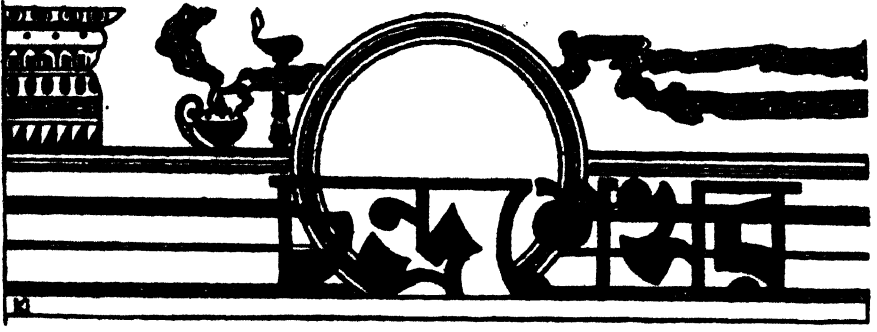
সপ্তবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

রামচরণের মুক্তি

প্রতাপ যদি পলাইল, তবে রামচরণের মুক্তি সহজেই ঘটিল। রামচরণ ইংরেজের নৌকায় বন্দীভাবে ছিল না। তাহারই গুলিতে যে ফষ্টরের আঘাত ও শাস্ত্রির নিপাত ঘটিয়াছিল তাহা কেহ জানিত না। তাহাকে সামান্য ভৃত্য বিবেচনা করিয়া আমিয়ট, মুঙ্গের হইতে যাত্রাকালে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বলিলেন, "তোমার মুনিব বড় বদ্‌জাত, উহাকে আমরা সাজা দিব, কিন্তু তোমাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।" শুনিয়া রামচরণ সেলাম করিয়া যুক্তকরে বলিল, "আমি চাসা গোয়ালা—কথা জানি না—রাগ করিবেন না—আমার সঙ্গে আপনাদের কি কোন সম্পর্ক আছে?"

আমিয়টকে কেহ কথা বুঝাইয়া দিলে, আমিয়ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রা। "নহিলে আমার সঙ্গে তামাসা করিবেন কেন?"

আমিয়ট। "কি তামাসা?"

রা। "আমার পা ভাঙ্গিয়া দিয়া, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে বলায়, বুঝায় যে আমি আপনাদের বাড়ী বিবাহ করিয়াছি। আমি গোয়ালার ছেলে, ইংরেজের ভগিনী বিবাহ করিলে আমার জাত যাবে।"

দ্বিভাষী আমিয়টকে কথা বুঝাইয়া দিলেও তিনি কিছু বুঝিতে পারিলেন না। মনে ভাবিলেন, এ বুঝি একপ্রকার এদেশী খোষামোদ। মনে করিলেন, যেমন নেটিবেরা খোষামোদ করিয়া "মা বাপ" "ভাই" এইরূপ সম্বন্ধসূচক শব্দ ব্যবহার করে, রামচরণ সেইরূপ খোষামোদ করিয়া তাঁহাকে সম্বন্ধী বলিতেছে। আমিয়ট নিতান্ত অপ্রসন্ন হইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চাও কি?"

রামচরণ বলিল, "আমার পা জোড়া দিয়া দিতে হুকুম হউক।"

আমিয়ট হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তুমি কিছুদিন আমাদিগের সঙ্গে থাক, ঔষধ দিব।"

রামচরণ তাহাই চায়। প্রতাপ বন্দী হইয়া চলিলেন, রামচরণ তাঁহার সঙ্গে থাকিতে চায়। সুতরাং রামচরণ ইচ্ছাপূর্ব্বক আমিয়টের সঙ্গে চলিল। সে কয়েদ রহিল না।

যে রাত্রে প্রতাপ পলায়ন করিল, সেই রাত্রে রামচরণ কাহাকে কিছু না বলিয়া নৌকা হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। গমন কালে, রামচরণ অস্ফুট স্বরে ইণ্ডিলমিণ্ডিলের পিতৃ মাতৃ ভগিনী সম্বন্ধে অনেক নিন্দাসূচক কথা বলিতে বলিতে গেল।

অষ্টবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

পর্ব্বতোপরে

আজি রাত্রে আকাশে চাঁদ উঠিল না। মেঘ আসিয়া, চন্দ্র, নক্ষত্র, নীহারিকা, নীলিমা সকল ঢাকিল। মেঘ, ছিদ্রশূন্য, অনন্ত বিস্তারী, জলপূর্ণতার জন্য ধূমবর্ণ;—তাহার তলে অনন্ত অন্ধকার; গাঢ়, অনন্ত, সর্ব্বাবরণকারী অন্ধকার; তাহাতে নদী সৈকত, উপকূল, উপকূলস্থ গিরিশ্রেণী সকল ঢাকিয়াছে। সেই অন্ধকারে, শৈবলিনী গিরির উপত্যকায় একাকিনী।

শেষ রাত্রে ছিপ, পশ্চাদ্ধাবিত ইংরেজদিগের অনুচরদিগকে দূরে রাখিয়া, তীরে লাগিয়াছিল—বড় বড় নদীর তীরে নিভৃত স্থানের অভাব নাই—সেইরূপ একটি নিভৃত স্থানে ছিপ লাগিয়াছিল। সেই সময়ে, শৈবলিনী, অলক্ষ্যে ছিপ হইতে পলাইয়াছিল। এবার শৈবলিনী অসদভিপ্রায়ে পলায়ন করে নাই। যে ভয়ে দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। প্রাণভয়ে শৈবলিনী, সুখ সৌন্দর্য্য প্রণয়াদি পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল। সুখ, সৌন্দর্য্য, প্রণয়, প্রতাপ, এ সকলে শৈবলিনীর আর অধিকার নাই—আশা নাই—আকাঙ্ক্ষাও পরিহার্য্য—নিকটে থাকিলে কে আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পারে? মরুভূমে থাকিলে কোন্ তৃষিত পথিক, সুশীতল স্বচ্ছ সুবাসিত বারি দেখিয়া পান না করিয়া থাকিতে পারে? বিক্টর হুগো যে সমুদ্রতলবাসী রাক্ষস স্বভাব ভয়ঙ্কর পুরুভুজের বর্ণনা করিয়াছেন, লোভ বা আকাঙ্ক্ষাকে সেই জীবের স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। ইহা অতি স্বচ্ছ স্ফাটিকনিন্দিত, জলমধ্যে বাস করে, ইহার বাস গৃহতলে মৃদুল জ্যোতিঃপ্রফুল্ল চারুগৈরিকাদি ঈষৎ জ্বলিতে থাকে; ইহার গৃহে কত মহামূল্য মুক্তা প্রবালাদি কিরণ প্রচার করে; কিন্তু ইহা মনুষ্যের শোণিত পান করে; যে ইহার

গৃহসৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তথায় গমন করে, এই শতবাহু রাক্ষস, ক্রমে এক একটি হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে ধরে; ধরিলে আর কেহ ছাড়াইতে পারে না। শতহস্তে সহস্রগ্রন্থিতে জড়াইয়া ধরে; তখন রাক্ষস শোণিত-শোষক সহস্রমুখ হতভাগ্য মনুষ্যের অঙ্গে স্থাপন করিয়া তাহার শোণিত শোষণ করিতে থাকে।

শৈবলিনী যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। মনে তাহার ভয় ছিল, প্রতাপ তাহার পলায়ন বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেই, তাহার সন্ধান করিবে। এজন্য নিকটে কোথাও অবস্থিতি না করিয়া যতদূর পারিল ততদূর চলিল। ভারতবর্ষের কটিবন্ধ স্বরূপ যে গিরিশ্রেণী, অদূরে তাহা দেখিতে পাইল। গিরি আরোহণ করিলে পাছে, অনুসন্ধানপ্রবৃত্ত কেহ তাহাকে পায়, এজন্য দিবাভাগে গিরি আরোহণে প্রবৃত্ত হইল না। নিকটে এক বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল। সমস্ত দিন অনাহারে গেল। সায়াহ্নকাল অতীত হইলে, প্রথম অন্ধকার, পরে জ্যোৎস্না উঠিবে। শৈবলিনী অন্ধকারে গিরি আরোহণ আরম্ভ করিল। অন্ধকারে, শিলাখণ্ড সকলের আঘাতে পদদ্বয় ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল; ক্ষুদ্র লতা গুল্ম মধ্যে পথ পাওয়া যায় না; তাহার কণ্টকে ভগ্নশাখাগ্রভাগে, বা মূলাবশেষের অগ্রভাগে, হস্তপদাদি সকল ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।. শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

তাহাতে শৈবলিনীর দুঃখ হইল না। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী এ প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী সুখময় সংসার ত্যাগ করিয়া, এ ভীষণ কণ্টকময়, হিংস্র জন্তু পরিবৃত, পার্ব্বতারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এতকাল ঘোরতর পাপে নিমগ্ন হইয়াছিল—এখন দুঃখভোগ করিলে কি সে পাপের কোন উপশম হইবে?

অতএব ক্ষতবিক্ষতচরণে, শোণিতাক্ত কলেবরে, ক্ষুধার্ত্ত, পিপাসাপীড়িত হইয়া শৈবলিনী গিরি আরোহণ করিতে লাগিল। পথ নাই—লতা গুল্ম এবং শিলারাশির মধ্যে দিনেও পথ পাওয়া যায় না—এক্ষণে অন্ধকার। অতএব শৈবলিনী বহুকষ্টে অল্পদূর মাত্র আরোহণ করিতেছিল।

এমত সময়ে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর করিয়া আসিল। রন্ধ্রশূন্য, ছেদশূন্য, অনন্ত বিস্তৃত, কৃষ্ণাবরণে আকাশের মুখ আঁটিয়া দিল। অন্ধকারের উপর অন্ধকার নামিয়া, গিরিশ্রেণী, তলস্থ বনরাজি, দূরস্থ নদী, সকল ঢাকিয়া ফেলিল। জগৎ অন্ধকার মাত্রাত্মক—শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল জগতে, প্রস্তর, কণ্টক এবং অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু নাই। আর পর্ব্বতারোহণ চেষ্টা বৃথা—শৈবলিনী হতাশ হইয়া সেই কণ্টক বনে উপবেশন করিল।

আকাশের মধ্যস্থল হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত, সীমান্ত হইতে মধ্যস্থল পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। অতি ভয়ঙ্কর। সঙ্গে সঙ্গে অতি গম্ভীর মেঘ গর্জ্জন আরম্ভ হইল। শৈবলিনী বুঝিল বিষম নৈদাঘ বাত্যা, সেই অদ্রিসানুদেশে প্রধাবিত হইবে। ক্ষতি কি? এই পর্ব্বতাঙ্গ হইতে অনেক বৃক্ষ, শাখা, পত্র, পুষ্পাদি স্থানচ্যুত হইয়া বিনষ্ট হইবে—শৈবলিনীর কপালে কি সে সুখ ঘটিবে না?

অঙ্গে কিসের শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল? একবিন্দু বৃষ্টি। ফোঁটা, ফোঁটা, ফোঁটা! তার পর দিগন্তব্যাপী গর্জ্জন। সে গর্জ্জন, বৃষ্টির, বায়ুর এবং মেঘের। তৎসঙ্গে কোথাও, বৃক্ষশাখা ভঙ্গের শব্দ, কোথাও ভীত পশুর চীৎকার, কোথাও স্থানচ্যুত উপলখণ্ডের অবতরণ শব্দ। দূরে গঙ্গার ক্ষিপ্ত তরঙ্গমালার কোলাহল। অবনত মস্তকে পার্ব্বতীয় প্রস্তরাসনে, শৈবলিনী বসিয়া—মাথার উপরে শীতল জলরাশি বর্ষণ হইতেছে। অঙ্গের উপর বৃক্ষ লতা গুল্মাদির শাখা সকল বায়ুতাড়িত হইয়া, প্রহৃত হইতেছে; আবার উঠিতেছে, আবার প্রহৃত হইতেছে; শিখরাভিমুখ হইতে জলপ্রবাহ বিষমবেগে আসিয়া শৈবলিনীর কঙ্কাল পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ছুটিতেছে।

তুমি, জড় প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি কোটি প্রণাম! তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই,—জীবের প্রাণ নাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্ব্ব সুখের আকর, সর্ব্ব মঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থ সাধিকা, সর্ব্ব কামনা পূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী! তোমাকে নমস্কার, হে মহাভয়ঙ্করি নানা রূপ রঙ্গিনি! কালি তুমি ললাটে চাঁদের টিপ পরিয়া, মস্তকে নক্ষত্র কীরিটি ধরিয়া, ভুবন মোহন হাসি হাসিয়া, ভুবন মোহিয়াছ; গঙ্গার ক্ষুদ্রোর্ম্মিতে পুষ্পমালা গাঁথিয়া পুষ্পে পুষ্পে চন্দ্র ঝুলাইয়াছ; সৈকত বালুকায়, কত কোটি কোটি হীরক জ্বালিয়াছ, গঙ্গার হৃদয়ে মধুর নীলিমা ঢালিয়া দিয়া তাতে কত সুখে যুবক যুবতীকে ভাসাইয়াছিলে? যেন কত আদর জান—কত আদর করিয়াছিলে। আজি একি! তুমি অবিশ্বাসযোগ্যা সর্ব্বনাশিণী! কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর তাহা জানিনা—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই—কিন্তু তুমি সর্ব্বময়ী, সর্ব্ব কর্ত্রী, সর্ব্বনাশিনী এবং সর্ব্বশক্তি। তুমি জগৎ, তুমি ঈশ্বর—তোমা ভিন্ন অন্য ঈশ্বর কেবল কথা মাত্র। তুমি স্রষ্টা, তুমি সৃষ্ট, তুমি নষ্ট, তুমিই নাশক, তুমিই অজেয়! তোমাকে কোটি কোটি কোটি প্রণাম।

অনেক পরে বৃষ্টি থামিল—ঝড় থামিল না—কেবল মন্দীভূত হইল মাত্র। অন্ধকার যেন গাঢ়তর হইল। শৈবলিনী বুঝিল যে জলসিক্ত পিচ্ছিল পর্ব্বতে আরোহণ অবতরণ উভয়ই অসাধ্য। শৈবলিনী সেইখানে বসিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিল। তখন তাঁহার গার্হস্থ সুখপূর্ণ বেদগ্রামে পতিগৃহ স্মরণ হইতেছিল। মনে হইতেছিল যে যদি আর একবার সে সুখাগার দেখিয়া মরিতে পারি, তবুও

সুখে মরিব। কিন্তু তাহা দূরে থাকুক—বুঝি আর সূর্য্যোদয়ও দেখিতে পাইব না। পুনঃ পুনঃ যে মৃত্যুকে ডাকিয়াছে অদ্য সে নিকট। এমত সময়ে সেই মনুষ্য-শূন্য পর্ব্বতে, সেই অগম্য বনমধ্যে, সেই মহাঘোর অন্ধকারে, কোন মনুষ্য শৈবলিনীর গায়ে হাত দিল।

শৈবলিনী প্রথমে মনে করিল কোন বন্য পশু। শৈবলিনী সরিয়া বসিল। কিন্তু আবার সেই হস্তস্পর্শ—স্পষ্ট মনুষ্য হস্তের স্পর্শ—অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। শৈবলিনী ভয় বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "তুমি কে? দেবতা না মনুষ্য?" মনুষ্য হইতে শৈবলিনীর ভয় নাই—কিন্তু দেবতা হইতে ভয় আছে, কেননা দেবতা দণ্ড বিধাতা।

কেহ কোন উত্তর দিল না। কিন্তু শৈবলিনী বুঝিল, যে মনুষ্য হইক, দেবতা হউক, তাহাকে দুই হাত দিয়া ধরিতেছে। শৈবলিনী উষ্ণ নিশ্বাস স্পর্শ স্কন্ধদেশে অনুভূত করিল। দেখিল, এক ভুজ শৈবলিনীর পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত হইল—আর এক হস্তে শৈবলিনীর দুই পদ একত্রিত করিয়া বেড়িয়া ধরিল। শৈবলিনী দেখিল—তাহাকে উঠাইতেছে। শৈবলিনী একটু চীৎকার করিল—বুঝিল যে মনুষ্য হউক দেবতা হউক—তাহাকে ভুজোপরি উত্থিত করিয়া কোথায় লইয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে অনুভূত হইল যে, সে শৈবলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া সাবধানে পর্ব্বতারোহণ করিতেছে। শৈবলিনী ভাবিল যে এ যেই হউক, লরেন্স্ ফষ্টর নহে।

ষষ্ঠ সংখ্যা

চন্দ্রালোকে

এই তৃণ শষ্প শোভিত হরিৎক্ষেত্রে, এই কলবাহিনী ভাগীরথী তীরে, এই স্ফুটচন্দ্রালোকে, আজি দপ্তরের শ্রীবৃদ্ধি, কলেবর বৃদ্ধি করিব। এইরূপ চন্দ্রালোকেই না, ট্রৈলস শর্ম্মা ট্রয়ের উচ্চ প্রাচীরে আরোহণ করিয়া, ক্রিসীদাকে স্মরণ করিয়া উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতেন! এইরূপ চন্দ্রালোকেই না থিসবী সুন্দরী এইরূপ মৃদু শিশিরপাতসিক্ত শষ্প মৃদু পদে দলিত করিয়া পিরামসের সঙ্কেত স্থানাভিমুখে অভিসারিণী হইতেন? অভিসারিণী শব্দটিতে, অভি একটি উপসর্গ আছে, সৃ একটি ধাতু আছে এবং স্ত্রীত্যবাচক একটি 'ইনী' আছে; এই জীবনে কমলাকান্ত শর্ম্মা কত উপসর্গ দেখিলেন, কত লোকের ধাতু ছাড়িল গঠিল দেখিলেন, কত ইনীও এলেন গেলেন, কিন্তু সোপসর্গ ধাতু বিশিষ্ট একটি ইনীও কখন দেখিলাম না। কমলাকান্ত উপসর্গে কোন ইনীর ধাতু বিগড়াইল না। কমলা-ভিসারিণী, এরূপ নায়িকা কখন হইল না। যাহারা দধি দুগ্ধ বিক্রয়ার্থ আগমন করে তাহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতে "পসারিণী" বলিয়াছে, কখন অভিসারিণী বলিয়াছে, এরূপ স্মরণ হয় না, তাহা যদি বলিত তাহা হইলে অনেক অভিসারিণী দেখিয়াছি বলিতে পারিতাম।

চন্দ্র তুমি হাস্য করিতেছ? হেসে হেসে ভেসে উঠিতেছ? তোমরা সাতাইশ ইনী শুদ্ধ আমাকে দেখিয়া, চন্দ্রের প্রতি চক্ষু টিপিয়া উপহাস করিতেছ? দক্ষ রাজার যেমন কর্ম্ম—একেবারে সাতাইশটিকে এক চন্দ্রে সমর্পণ করিলেন, আর এখন কমলাকান্ত শর্ম্মা বিবাহের জন্য লালায়িত! অমল-ধবল কিরণরাশি সুধাংশো! আর সকল তোমার থাক্, তুমি অন্ততঃ অশ্লেষা মঘাকে ছাড়িয়া দেও, আমি ওই দুইটাকে বড় ভালবাসি। আমার মত নিষ্কর্ম্মা লোক উহাদের কল্যাণে অন্ততঃ দুইদিন গৃহবাস সুখ উপলব্ধি করিতে পারে। আমি ঐ ভগিনীদ্বয়কে আমার ভবনে চিরকাল জন্য স্থানদান করিয়া, সুখে কাল কর্ত্তন করিব। ইহাদিগের

আরও অনেক গুণ আছে—লোকে নিজে অক্ষমতা নিবন্ধন কোন কর্ম্ম করিতে না পারিয়া স্বচ্ছন্দে ইহাদিগের দোহাই দিয়া লোকের কাছে আস্ফালন করিতে পারে। আমিও নশীবাবুর কাপড় কিনিতে যদি নির্বুদ্ধিতাবশতঃ প্রতারিত হইয়া আসি তবে আমার সহধর্ম্মিণী দ্বয়ের স্কন্ধে সমস্ত দোষ অর্পণ করিয়া সাফাই করিতে পারিব।

চন্দ্রদেব! তুমি আমার কথায় কর্ণপাত করিলে না? এখনও মন্দাকিনীর মন্দান্দোলিত বক্ষ বসন করস্পর্শে প্রতিভাসিত করিতেছ? এখনও মন্দসমীরণের সহ পরামর্শ করিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে পলকে পলকে ঝলক বর্ষণ করিবে? এখনও তৃণক্ষেত্রে মণি মুক্তা মরকত অকাতরে ছড়াইয়া দিবে? উলুবনে মুক্তা, আর কেহ ছড়াক না ছড়াক, দেখিতেছি তুমি ছড়াইয়া থাক। আর আজ আমি ছড়াইব।

এই সংসারের লোক, এই বল্লালসেনের প্র-পরা-অপ-পৌত্রেরা এবং তাঁহার নির্‌দু-র্‌-বি-অধি-দৌহিত্রেরা আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। আমার বক্ষের উপরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বি, এ, না হলে বিয়ে হয় না। এইবার সংসার ডুবিল! উচ্চ শিক্ষায় ফল কি? ছাপর খাট—রূপার কলসী, গরদের কাচা এবং স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা, পট্ট বসনাবৃতা, একটি বংশ খণ্ডিকা! হরি হরি বল ভাই! তৃণ গ্রাহী পাণ্ডিত্যাভিমানী বি, এ, উপাধিধারী উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত নববঙ্গবাসীর, কলসী বস্ত্র বংশ খট্টাসমেত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হইল!!!* প্রথমে উপাধি পাইয়াছিলেন, এবার সমাধি পাইলেন। তিনি বিলাতী ব্রহ্মে লীন হইলেন। বঙ্গীয় যুবক সংসারী হইলেন। তাঁহার উচ্চশিক্ষা তাঁহাকে তাঁহার চরমধামে পৌঁছিয়া দিয়াছে। তিনি সহস্র তোলক পরিমিত রজতপাত্র, শত তোলক পরিমিত স্বর্ণালঙ্কার এবং সংসার কুটীরের এক মাত্র দণ্ডিকা, একটি বংশ খণ্ডিকা পাইয়াছেন, তিনি তাঁহার চিরবাঞ্ছিত হেমকূট পর্ব্বত নিকটস্থ কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর সরকারি ওকালতী পাইয়াছেন; হরি হরি বল ভাই! তাঁহার এতদিনে সমাধি হইল!!! তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ বহু যত্নে কামস্কাট্‌কা দেশের নদী সকলের নাম কণ্ঠাগ্রে করিয়াছিলেন। এই উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি নিশীথ প্রদীপে অনন্যমনে শাহারা মরুভূমির বালুকাপুঞ্জের সংখ্যা ধারণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চ শিক্ষার জন্যই শালিমানের ঊর্দ্ধ বায়ান্ন পুরুষ নিম্নে সাড়ে তিপান্ন পুরুষের কুলচি মুখস্থ করিয়াছেন। এই উচ্চ শিক্ষা বলে তিনি শিখিয়াছেন, যে টাউনহলে বক্তৃতা করিতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ; ইংরেজের নিন্দা যে কোন প্রকারে করিতে পারিলেই রাজ নীতির একশেষ হইল। এবং বংশ দণ্ডিকার স্থাপন করিয়া উমেদার

* বোধ হয় এই রাত্রি হইতেই কমলাকান্তের বাতিকের বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল।—শ্রীভীষ্মদেব খোস নবীশ।

গোষ্ঠির বৃদ্ধি করিয়া দেশ জঙ্গলময় করিতে পারিলেই কলির জীব ধর্ম্মের চরিতার্থতা হইল।

এরূপ বংশদণ্ডিকা প্রয়াসী আমি নহি। আমি উইল করিয়া যাইব সাত পুরুষ বিবাহ করিতে না হয় তাও কর্ত্তব্য তথাপি এরূপ বংশদণ্ডিকা আশ্রয়ে স্বর্গ প্রাপ্তির বাঞ্ছাও কেহ না করে। যদি জীব প্রবাহ বৃদ্ধি করাই, বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি মৎস্যাদি বিবাহ করিব; যদি টাকার জন্য বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি টাঁকশালের অধ্যক্ষকে বিবাহ করিব; আর যদি সৌন্দর্য্যার্থে বিবাহ করিতে হয়, তবে—ঘোম্‌টা টানা চাঁদবদনীদের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, ঐ আকাশের চাঁদকে বিবাহ করিব।

ভাগীরথি! যদি তুমি শান্তনু বক্ষে, অথবা তদপেক্ষা উচ্চতর হিমালয় ভবনে, অথবা আরো উচ্চতর ধূর্জ্জটীর জটা কলাপে বিরাজ করিতে, তাহা হইলে কে আজ তোমার উপাসনা করিত? তুমি নীচগা হইয়া, মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়া সহস্রধা হইয়া সাগরোদ্দেশে গমন করিয়াছিলে বলিয়াই সগর বংশের উদ্ধার হইয়াছে; সমীরণ! তুমি যদি অঞ্জনার অঞ্চল লইয়া চিরক্রীড়াসক্ত থাকিতে, অথবা মলয়াচলে স্বীয় প্রমোদভবনে চন্দন শাখা নমিত করিয়া বা এলা লতা কম্পিত করিয়া পরিভ্রমণ করিতে তাহা হইলে কে তোমাকে ত্বমেব জগজ্জীবনং পালনং বলিয়া আর তোমার স্তব স্তুতি করিত? এই বাল বসন্ত বিহারী বিহঙ্গমকুলের কাকলি যদি কেবল নন্দন কাননেই প্রতিধ্বনিত হইত তাহা হইলে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তাহাদের নাম করিয়া এই রাত্রিকালে স্বীয় মসী লেখনীর অনর্থক ক্ষয় করিবে কেন? সুধাংশো! তুমি তোমার ক্ষীরোদ সাগর তলে, অমৃত ভাণ্ডারে, প্রবাল পালঙ্কে মৌক্তিক-শয্যায় শয়িত থাকিতে তাহা হইলে কে তোমার সহিত রমণী মুখ মণ্ডলের তুলনা করিত? অথবা তোমার ঐ সাতাশটি ক্রমান্বয় ভর্ত্তৃকা লইয়া খলু সার শ্বশুর মন্দির দক্ষালয়ে বাস করিতে; তাহা হইলে আজি কমল শর্ম্মা কি তোমার দর্শনাভিলাষী—হইয়া এই শ্মশান নিকট বটতলায় তীরস্থ হইয়া বাস করে?

শশী—যদি তোমার ব্যাকরণ পড়া থাকে, তবে আমাকে মাপ করিও, আমি প্রাণান্তেও শশিন্‌ বলিতে পারিব না—আমি এতক্ষণ তোমার গুণের অনুধ্যান করিতেছিলাম, শশী, তুমি অনাথের কুটীর দ্বারে প্রহরীরূপে অনিমেষ নয়নে বসিয়া থাক, আধভাষী শিশু যখন নাচিতে নাচিতে তোমায় ধরিতে যায়, তুমি তাহার সঙ্গে নাচিতে নাচিতে খেলা কর, বালিকা যখন স্বচ্ছ সরোবর হৃদয়ে তোমায় এক বার দেখিতে পাইয়া, এক বার না পাইয়া তোমার সন্দর্শন লাভার্থ—ইতস্ততঃ সরোবর কূলে দৌড়িতে থাকে তখন তুমি এক এক বার ঈষৎ দেখা দিয়া তাহার সহিত কেবল লুকোচুরি খেলিতে থাক, নব বধূ যখন মন্দবাত সহিত প্রাসাদোপরি একা-

কিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকে তখন তুমি নারিকেল কুঞ্জান্তরাল হইতে অতি ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় ভরিয়া অমৃত বর্ষণ করিয়া তাহাকে ক্রমে শীতল কর ; যখন তরঙ্গিণী আশা তরঙ্গিত হৃদয়ে ধীর প্রবাহে মন্দগতিতে সিন্ধু অভিগামিনী হয় তখন তুমিই তাহাকে স্বর্ণ ভূষণে ভূষিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়া থাক ; গোলাপ যখন বসন্ত রাগে এক বৃন্তে চারিদিক দেখিয়া হেলিতে দুলিতে থাকে তখন তুমিই তাহাকে মালতী লতাকে চুম্বন করিতে কাণে কাণে পরামর্শ দেও। আবার সেই তুমিই, অসদভিসন্ধিৎসু নর যখন কুলকামিনীর ধর্ম্মনাশে প্রবৃত্ত হয়, তখন তোমার কোমল মুখমণ্ডলে এমনি ভ্রূকুটি করিতে থাক যে সে তোমার মুখপানে আর দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় না ; তুমিই নরহত্যাকারীর তরবারিফলকে বিদ্যুৎ চমকাইয়া দেও, তাহার পাপ শোণিত বিন্দুতে চৌষট্টি রৌরব, প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়া দেও।

তুমি ক্রীড়াশীল শিশুর চলৎ স্বর্ণ স্থালী, তরুণের আশা প্রদীপ ; যুবক যুবতীর যামিনী যাপনের প্রধান সম্ভোগপদার্থ ; এবং স্থবিরের স্মৃতি-দর্পণ। তুমি অন্ধকার প্রহরী, স্থির দীপধারী ; তুমি পথিকের পথ প্রদর্শক ; গৃহীর নৈশসূর্য্য ; তুমি পাপীর পাপের সাক্ষী ; পুণ্যাত্মার চক্ষে তাহার যশঃ পতাকা। তুমি গগনের উজ্জ্বলমণি ; জগতের শোভা। আর এই শ্মশান বিহারী শ্রীকমলাকান্তের একমাত্র সম্বল ; তুমি ভালর ভাল, মন্দের মন্দ ; রসে রস, বিরসে বিষ। তুমি কমলাকান্তের সহধর্ম্মিণী ; শশী, আমি তোমায় বড় ভালবাসি, আমি তোমাকেই বিবাহ করিব। সকলে হরি হরি বল ভাই ! আজ এইখানে বাসর যাপন—সকলে একবার হরি বল ভাই।

বম্ ভোলানাথ ! চন্দ্র যে পুরুষ ? তবে ডবল মাত্রা চড়াইতে হইল।

চন্দ্র আমাদিগের আর্য্য মতে পুরুষ বটে, কিন্তু বিলাতীয় শর্ম্মাদিগের মতে ইনি কোমলাঙ্গী। আমাদিগের মতে চন্দ্র হি,* ইংরাজি মতে চন্দ্র শী, এখন উপায় ? হি কি শী তাহা স্থির হইবে কিপ্রকারে ?

বাস্তবিক এই বিষয়ে সংসারের লোকের সঙ্গে আমার কখন মতের ঐক্য হইল না। আমার এ বিষয়ে নানা সন্দেহ হয়। যে ওয়াজিদালিশাহা লক্ষ্ণৌনগরী হইতে স্বচ্ছন্দে চতুর্দ্দোলারোহণে মুচি খোলায় আগমন করিয়া, হংস হংসী, কপোত কপতী লইয়া ক্রীড়া করেন, গোলাপ সহিত বারি হ্রদে নিত্য স্নান করিয়া, স্বীয়ানুরূপী পিঞ্জরস্থ বুলবুলিকে সমূতপলায় প্রদান করেন, তিনি হি না শী ? এবং যে মহিষী দেশবাৎসল্যে ঐহিক সুখ সম্পত্তি বিসর্জ্জন করিয়া—রাজপুরুষগণের

---

*হি শী কাহাকে বলে ? শুনিয়াছি দুইটি ইংরাজি সর্ব্বনাম—হি পুংলিঙ্গ—শী স্ত্রীলিঙ্গ—শ্রীভীষদেব।

শরণাপন্ন হওয়াপেক্ষা ভিক্ষান্ন শ্রেয়ঃ বোধে, নেপালের পার্ব্বতীয় প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি শী না হি ? তবেত সাহসকে হি-শীর প্রভেদক করা যায় না। তবে যুদ্ধ নৈপুণ্যে হি-শীর প্রভেদ হইবে ? যে জোয়ান ওর্লিয়ান্স দুর্গ আক্রমণ কালে সর্ব্ব প্রথমে পদার্পণ করিয়াছিল, যে ফ্রান্সের পুনরুদ্ধার করিয়াছিল, তাহাকে শী বলিব না হি বলিব ? আর যে বেডফোর্ড—তাহাকে পাকচক্রে ফেলিবার জন্য সেই জোয়ানের কারাগারে পুরুষের বস্ত্র সংরক্ষণ করিয়াছিল, তাহাকেই বা হি বলিব না শী বলিব ? না—যুদ্ধ কৌশলে বুঝিতে পারিলাম না। তবে শুনা যায়, যে বলীয়ান্ সেই পুরুষ আর যে জাতি দুর্ব্বল তাহারাই স্ত্রীলোক। ভাল—কোমৎ আপনাকে নীতি রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা স্থির করিয়া, ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট কর যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই অতুল প্রতাপশালীকে যে মাদম ক্লোতিলড দেবো স্বীয় প্রতাপের আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাঁহাকে শী বলিব না হি বলিব ? রোমক পত্তনের কৈসরগণ এক একজন পৃথিবীর রাজা, যে মৈসরী রাজ্ঞী ক্লিওপেটরা এরূপ তিন জন কৈসরের উপর রাজত্ব করিয়াছেন ; তাঁহাকে শি বলিব না হি বলিব ? বাস্তবিক জগতে কে হি কে শী তাহা স্থির করা যায় না। সেদিন কীর্ত্তন হইতেছিল, যখন কীর্ত্তন গায়িকা বলিল—"সিংহিনী হইয়া শিবাপদ সেবিব ?" এবং বঙ্গ নব্য সম্প্রদায়েরা মন্ত্রস্তব্ধবৎ, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, আমার বাস্তবিক সেই কীর্ত্তন গায়িকাকে সিংহবৎ বোধ হইয়াছিল এবং সেই সমস্ত বাঙ্গালি যুবককেই আমি শিবা স্বরূপ মনে করিয়াছিলাম। তখন যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত এর কোন্‌গুলি হি কোন্‌গুলি বা শী ; তাহাহইলে আমি অবশ্য বলিতাম যে সেই কীর্ত্তনকারিণীই হি এবং তাহার জড়বৎ শ্রোতৃবর্গই শী। বাস্তবিক বঙ্গীয় যুবকেরা কোথাও হি, কোথাও শী, এবং সর্ব্বত্র বিকল্পে ইট্ হন। তাহার নিত্য বিধিও আছে। যথা ইয়ারকিতে হি, শয্যাগৃহে শী, এবং বিষয় কর্ম্মে ইট্। তাঁহারা বক্তৃতার সময়ে হন হি, নট্যশালায় সাজেন শী, মদ খাইলে হন ইট্। ফলে ইট্ যাহাই হউক, হি, শীর বিষয়ে আমার আপনা আপনি অনেক সন্দেহ হয়। মধু চাটুয্যে আমার নাম সংযোগ করিয়া কি বিদ্রূপ করিয়াছিল বলিয়া, যে প্রসন্ন স্বচ্ছন্দে পূর্ণদুগ্ধ কুম্ভ তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া, চাটুয্যের বক্ষ কবাটের বল পরীক্ষা করণার্থ কোনরূপ বিশেষ আয়ুধ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, সে প্রসন্ন সংসারের মতে হইল শী—আর আমি —নশী বাবু কি না একদিন বলিয়াছিলেন—"যে চক্রবর্ত্তী ঝিমুতে ঝিমুতে আজ বিছানাটা পোড়ালে, একদিন একটা লঙ্কাকাণ্ড করিবে দেখ্‌ছি"—সেই ভয়ে আফিঙ্গের মাত্রা কমাইয়া দিলাম, সেই আমি হইলাম হি ? এইরূপ বিচারের জন্তই সংসারের সঙ্গে আমার বিবাদ বিসম্বাদ। ফল কথা যখন আমি নিজে হি

কি শী তাহা যখন নিশ্চয় করা দুষ্কর, তখন চন্দ্র হি কিম্বা শী তাহার স্থিরতা কি প্রকারে হইবে? যদি চন্দ্র হি হয়েন ত আমি শী—কেননা আমার সহিত চন্দ্রের ভালবাসা জন্মিয়াছে। এবং আমাকে চন্দ্রকে বিবাহ করিতেই হইবে। আর আমি যদি প্রকৃত একজন কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীই হই তাহা হইলে চন্দ্র শী। চন্দ্র বিলাতীয় মতে শী। আমি তাহা হইলে চন্দ্রকে বিলাতীয় মতে পাণি গ্রহণ করিব।

এখন নানা মতে নানা কার্য্য হইতেছে; আমি বিলাতীয় মতে বিবাহ করিব। এখন দশাবতার দশকর্ম্মান্বিত হইয়াছেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ টেবিলের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছেন। নৃসিংহরাম কমলাকান্ত রূপ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ-গণের আশ্রয়ীভূত হইয়াছেন। বামনাবতারে বঙ্গীয় যুবকগণ, আমার সোণারচাঁদ শশীকে স্পর্শ করিতে স্পর্দ্ধা করে। প্রথম রামের স্থানে ইঁহারা মাতৃসেবা, দ্বিতীয় রামের স্থানে পত্নী সেবা এবং শেষ রামের নিকটে বারুণী সেবা শিক্ষা করিয়াছেন। ইঁহারা বৌদ্ধমতে সংসারের অনিত্যতা স্থির করিয়া, কল্কীমতে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এখনকার কালে শাক্তমতে ভোজ্য প্রস্তুত হইয়া, তাহা শৈব ত্রিশূলে বিদ্ধ করিয়া গলাধঃকরণ করিতে হয়; তাহার পর সৌর পান সেবনীয়। আবার জিরুশালমের প্রথম গৌরাঙ্গের উপদেশ মত ভজন শালা করিতে হয়। মেজো গৌরাঙ্গে নবদ্বীপবাসীর মত হরিসংকীর্ত্তন করিতে হয়, রাধানগরের ছোট গৌরাঙ্গের মত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিতে হয়।

সুতরাং শশী, পূর্ণশশী, আজি আমি তোমাকে ইংরাজি মতে, শী স্থির করিয়া হোস বাহালে সুস্থ শরীরে, খোস তবিয়তে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করিলাম। আমি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে অন্যের বিনা সরিকতে তোমাতে ভোগ দখল করিতে থাকিব। ইহাতে তুমি কিম্বা স্থলাভিষিক্ত কেহ কখন কোন আপত্তি কর বা করে, তাহা না মঞ্জুর হইবে। তোমার সাতাইশটিতে আজ হইতে আমার সম্পূর্ণ স্বত্বাধি-কার হইল।

আর অমন করিয়া পা টিপিয়া পা টিপিয়া ঢলে পড়িয়া রোহিণীর সঙ্গে কথা কহিলে কি হইবে? আর অমন করে মুচকে হেসে পাতলা মেঘের ঘোমটা টেনে, ভর্ ভর্ করিয়া কতদূর চলিয়া যাইবে? ইতি কোর্টশিপ সমাপ্ত :—

এক্ষণে গান্ধর্ব্ব বিবাহ। আমি বরমাল্য প্রদান করিলাম, তুমি করমাল্য প্রদান কর।

কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর।
নিজ মন পুরোহিত, শ্মশানে বাসর॥

একবার হরি বল ভাই। হরি হরি বোল।

আজ অবধি আর চন্দ্রকে দেখিয়া কমল মুদিত হইবে না। কমল ফুল্ল হইতে দেখিলে আর চন্দ্র ম্লান হইবে না। এইবার ভারতবর্ষীয় কবিগণের কবিত্ব লোপ হইল—পূর্ব্বে

কমল মুদিত আঁখি চন্দ্রেরে হেরিলে,

এখন

চন্দ্রেরে দেখিতে দেখ কমল আঁখি মিলে।

চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল

কিন্তু—

কমল হৃদয়ে চন্দ্র কেবল উজ্জ্বল।

আহা! আমি আমার চন্দ্রকে হারাইয়া দিয়াছি। বর বড় না, কন্যা বড়, এই দেখ বর বড়—

চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়
চক্রবর্ত্তী পরিপূর্ণ এককাঁদি কলায়
সেই কলা কভু লুপ্ত কভু বর্ত্তমান।
কমলের বাগানের সব মর্ত্তমান !!

দেখ শশী এখন নির্জ্জন হইল। তোমাকে গোটাকত কথা বলিতে ইচ্ছা করি। তুমি তোমার রূপ গৌরবে, গর্ব্বিতা হইয়া যেখানে সেখানে ও রূপের ছড়াছড়ি করিও না। যখন পুত্র শোকাতুরা মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া তোমার দিকে লক্ষ্য করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন তুমি তাহার কাছে রূপ দেখাইয়া কি করিবে? তখন কলঙ্কিনি! তোমার রূপরাশি গাঢ় মেঘান্তরালে লুকায়িত করিয়া রাখিও। যখন সংসার জ্বালাজালে লোক দগ্ধ হইয়া, তোমার দরবারে আসিয়া অভিযোগ করিবে, তখন তোমার সৌন্দর্য্য বিকাশ তাহার কাছে করিও না; যে সংসারদগ্ধ তাহার পক্ষে সে সৌন্দর্য্য তীব্র বিষক্ষেপ রূপ হইবে। বরং রক্ত রাগে তাহার সহিত আলাপ করিও। যে সকলকে ঘৃণা করিয়াছে, কাহারও প্রীতি সে সহ্য করিতে পারে না।

আর যে ঐহিক চরম সুখের সীমা উপলব্ধি করিয়া আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাকে আর বৃথা আশা দিয়া সান্ত্বনা করিও না। তুমি এক্ষণে আমার এক ভোগ্যা, তুমি আর কি দেখাইয়া অপরকে সান্ত্বনা করিবে? কিন্তু কমলাকান্তের সময় অসময় নাই। ঘটন বিঘটন নাই, সুখ দুঃখ নাই। তুমি সর্ব্বদাই আমার নিকট আসিবে; তোমার নিজকথা আমাকে বলিবে, আমার কথা শুনিয়া যাইয়া,

আপনার অন্তরে আপনার অস্থিমজ্জার সহিত সেই কথা মিশাইয়া, রাখিয়া দিবে। তুমি জ্যোৎস্না রাত্রিতে আমার সহিত দেখা করিতে আসিও, ও কোমল কান্তি লইয়া অন্ধকারে বিচরণ করিও না। অদ্য আমাদের যে সুখের দিন, তাহা তুমি আমি ব্যতীত কে বুঝিতে পারিবে? অদ্য হইতে মাস গণনা করিয়া প্রতি মাসের শেষে আমরা এই গঙ্গাতীরে শস্প বাসর সমাপন করিব। সকল পূর্ণ মাসেই তুমি হঠাৎ আমার কাছে আগমন করিও না; পঞ্জিকাকারগণের সহিত দিন ক্ষণের পরামর্শ করিয়া কমলাভিসারিণী হইও নচেৎ একদিন রাহু তোমাকে পথিমধ্যে হঠাৎ মসীময়ী করিয়া ক্লিষ্ট করিবে। আর এই বিবাহ রাত্রিতে নব বধূকে অধিক উপদেশ প্রদান করিতে গেলে ধর্ম্মযাজকতার ভাণ হয়। সুতরাং অলমতি বিস্তরেণ।

এখন একবার কমল-শশীর বাসর ঘরে, ডাকরে কোকিল পঞ্চমস্বরে! এখন শশী একবার এই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া তরঙ্গের উপর অপ্সরা ছাঁদে নৃত্য কর দেখি। একবার কাল মেঘের ভিতর বেগে দৌড়াইয়া গিয়া একবার অনন্ত গগনের অনন্ত পথে উল্টাইয়া পড় দেখি। একবার গভীর মেঘে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রন্ধ্র পথে এক চক্ষু দিয়া আমার দিকে মধুর দৃষ্টিপাত কর দেখি! একবার নক্ষত্রে নক্ষত্রে কলহ বাধাইয়া দিয়া, তাহারা যেমন পরস্পর সংগ্রাম করিতে আসিবে অমনি তাহাদের উভয় দলের ব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া বেগে ধাবিত হও দেখি! একবার দ্রুত সঞ্চালনে শ্রান্তি বোধ করিয়া মুক্তাবিনিন্দিত স্বেদবিন্দু সিক্ত কপালে, ঘোমটা তুলিয়া দিয়া গগন গবাক্ষে স্থির দৃষ্টিতে বসিয়া বায়ু সেবন কর দেখি! একবার অজস্র সুধাবর্ষণ করিয়া চকোর চক্রের অপরিতৃপ্ত রসনার তৃপ্তি সাধন কর দেখি; একবার শুভক্ষণে কমলাকান্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হও, কমলাকান্ত শয়ন করিল।

শশী তুমি ক্ষীরোদ সাগরজা, ত্রিভুবন বিহারিণী,—হইয়াও বালিকা স্বভাব-সুলভ অভিমানের ভজনা করিলে? কমলাকান্ত কোন্ দোষে দোষী বলিতে পারি-না—কখন একবার স্ত্রী পুরুষ ভেদ জটিলতা জালচ্ছেদনার্থ উদাহরণচ্ছলে প্রসন্নর নাম করিয়াছিলাম বলিয়া এত অভিমান আজিকার রজনীতে ভাল দেখায় না। দেখ, তুমি কলঙ্কিনী, তবু আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম। তোমাকে বিবাহ করি-য়াছি বলিয়া অদ্যাবধি Lunatic* নাম ধরিলাম। জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া থাকেন তুমি পাষাণী—তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তাঁহারা বলেন তোমাতে মনুষ্যত্ব নাই, তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তবু রাগ?—তবে এই সংসার গরল খণ্ডন, এই গিরিতরু শিরসিমণ্ডন, ঐ কর লেখা আমার মাথায় তুলিয়া দাও। পার যদি, ঐ অনন্তনীল বৃন্দাবনে, মেঘের ঘোম্‌টা টানিয়া, একবার রাই মানিনী

* পাগল।

হইয়া বসো! আমি একবার স্ত্রীলোকের পায়ে ধরিয়া এ জড়জীবন স্বার্থক করিয়া লই।† আজি আমি শত দোষে দোষী হইলেও তোমা হইতেই আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তুমি আমার চান্দ্রায়ণের চন্দ্র ফলক! আমার বৈতরণীর নবীন বৎস।

অমন করিলে আমি শত সহস্র বিবাহ করিব। এখন কমলাকান্ত নূতন বিবাহের রীতি পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছে। কমল এখন স্বয়ং বর, কর্ত্তা, পুরোহিত, ঘটক হইতে শিখিয়াছে। কমল এখন যেখানে সেখানে বিবাহ করিতে পারে। যখন দেখিব নব পল্লবিকা শাখা স্কন্ধ হইতে মুখ বাড়াইয়া করপত্র সঞ্চালনে আহ্বান করিতেছে তখনই আমি তাহাকে বিবাহ করিব। যখন দেখিব পদ্মমুখী স্বচ্ছ সরসী দর্পণে আপনার মুখ বঙ্কিম গ্রীবায় নিরীক্ষণ করিয়া হাসিতেছে তখনই আমি স্থল-কমলে, জলকমলে মিশাইয়া দিব। যখন দেখিব নির্ঝরিণী রামধনুক ধরিয়া আনিয়া তাহাই লোফালুফি করিয়া খেলা করিতেছে তখনই তাহাকে সেই ধনুঃ স্পর্শ করাইয়া শপথ দিয়া আমার সঙ্গিনী করিয়া লইব। যখন দেখিব অনন্ত শয্যায় স্বর্ণদী মণিভূষায় শ্বেতাম্বরে ভূষিত হইয়া উত্তর দক্ষিণ শয়নে নিদ্রা যাইতেছে, তখনই তাহাকে পাণিগ্রহণে ধীরে ধীরে জাগরিত করিয়া অর্দ্ধাঙ্গের ভাগিনী করিব। যখন দেখিব কুন্তলতা কাণে ঝুমকা দোলাইয়া শ্যাম চিকুররাশি চারিদিকে ছড়াইয়া নিস্তব্ধভাবে মৃদু সৌর কিরণে ঈষত্তপ্ত হইতেছে, তখনই তাহার কেশগুচ্ছ মধ্যে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া তাহার ঝুমকা সরাইয়া দিয়া তাহার বরকে চিনাইয়া দিব। কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী এখন বিবাহ করিতে শিখিল, ঘটকালী শিখিল, আর কাহারও উপাসনা করিবে না। যদি তোমরা আমার পরামর্শে শ্রদ্ধা কর, ত আমার মত বিবাহ কর—আমি বেশ ঘটকালী জানি, তোমাদের মনের মত সামগ্রী মিলাইয়া দিব।

† আমি জানি কমলাকান্ত একদিন প্রসন্ন গোয়ালার পায়ে ধরিয়াছেন। কিন্তু সে দুধের জন্য।—
শ্রীভীষ্মদেব।

চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। প্রহসন। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা। সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র।

প্রথম অঙ্কে, দেখিলাম যে কলিকাতার কোন বিখ্যাত ভদ্র বংশের গ্লানি আছে। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখিলাম, বেশ্যালয়ে মদ্যপানের বর্ণনা। আর আমরা পড়িলাম না। বোধ করি কেহই অতদূরও পড়িবেন না। কতদিনে এই সকল ঘৃণিত পুস্তক প্রণয়ণ রহিত হইবে? এই সকল পুস্তক প্রণেতৃগণ অবশ্য মনে মনে বিবেচনা করেন, আমাদিগের গ্রন্থে বড় রস আছে এবং আমরা উত্তম নীতি শিক্ষা দিতেছি, কেননা এরূপ কোন বিশ্বাস না থাকিলে, গ্রন্থ প্রচারিত করিবেন কেন? এই বিশ্বাস ভূমণ্ডলে অতি আশ্চর্য্য বিষয় সন্দেহ নাই।

বঙ্গভাষার ইতিহাস। প্রথমভাগ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। গুপ্ত যন্ত্র। ইহা বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বিশেষ অনুসন্ধান বা বিচার দক্ষতার পরিচয় ইহাতে কিছুই নাই। শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থের পর ইহা না লিখিলে চলিত।

দ্বিতীয় বর্ষ : দ্বাদশ সংখ্যা

তৃতীয় প্রস্তাব—জ্ঞানোন্নতি

ভারত যাহার লীলাভূমি, ভারতী যাহার জননী, সংস্কৃত যাহার বাক্যালাপ, মনু যাহার পিতৃপুরুষ, বেদবিদ্যা যাহার চিত্ত-প্রসূত ; সেই জগদ্গুরু আর্য্যজাতির জীবনী আজি কিনা, কীর্ত্তিবিলোপী কালকবলে নিহিত! যে ভারত তোমার মানস কন্যা, আজি সেই ভারত পথের ভিখারিণী!

আর্য্য বংশের আদি বৃত্তান্ত ঘটিত কোন বিশেষ মীমাংসা বা বিষয়ের দোহাই দিতে হইলে, ভারতে এমন কেহ নাই যে, তাহার আশ্রয় অবলম্বন করিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং যে পণ্ডিতাভিমানিগণ সহস্র যোজন দূরে সাগর সরিৎ গিরি গহ্বরাদি ব্যবধানে বাস করিতেছেন, ভারতের মোহিনী মূর্ত্তি যাঁহারা স্বপ্নেও কখন দর্শন করিয়াছেন কি না সন্দেহ, সে মূর্ত্তির মাধুরী সূর্য্যকরের ন্যায় বেগবতী হইলেও, যাঁহাদিগের নিকট বিলম্বে উপনীত হয়, আর্য্য সন্তানদিগের সকল বৃত্তান্তই যাঁহাদিগের পক্ষে নূতন, তাঁহাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যেখানে অগাধ জল, সেখানে কোন্ আশ্রয় অবলম্বনীয়? আমাদের কালামুখ!

যে সংস্কৃত এখন মৃত, যাহা এমন সুকৌশল সম্পন্ন এবং সুন্দর, যাহা স্বর্গে দেবতাদিগের ভাষা বলিয়া সকলের বিশ্বাস, এককালে তাহা মনুষ্যেরও ভাষা ছিল। এতদ্বিষয়ের সপ্রমাণকারী বহু পণ্ডিত আছেন, তন্মধ্যে পরিচিতনামা ম্যুর, মূলর, লাসেন এবং বেনফির নাম মাত্র উল্লেখ করিলাম। সংস্কৃত বাক্যালাপের ভাষা হইয়া কতকাল চলিতেছিল এবং কোন্ সময়ে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা উক্ত পণ্ডিতেরা যথাসাধ্য নির্ণয় করিয়াছেন। এতদ্বিষয় প্রস্তাবের শেষভাগে আলোচ্য, আপাততঃ আবশ্যক নাই। বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ যৎকালে রচিত, বা যে আকারে আমাদের হস্তে আগত হইয়াছে, ইহা যখন সেই আকারে পরিণত হয়, তখন সংস্কৃত তদ্রূপ কথনীয় ভাষা ছিল, কি, কেবল শিক্ষণীয় ভাষায় পরিণত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করা যাউক।

আরণ্যকাণ্ডে বাতাপি এবং ইল্বল নামক দৈত্যদ্বয়ের উপাখ্যানস্থলে, কথিত হইতেছে যে,

"ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপমিল্বলঃ সংস্কৃতংবদন্।
ন্যমন্ত্রয়ত বিপ্রান্,———॥" ৫৬। ১১ সর্গ।

—ইল্বল ব্রাহ্মণরূপ গ্রহণ করিয়া, সংস্কৃত কথন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিত।—পুনশ্চ সুন্দরকাণ্ডে হনুমান্ অশোকবনে উত্তীর্ণ হইয়া, কিরূপে সীতা সম্ভাষণ করিবেন তাহা চিন্তা করিতেছেন এবং মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতেছেন—"যদি বাচং বদিষ্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতং।" ১৭। ২৯ সর্গ।

—যদি দ্বিজাতিগণের ন্যায় সংস্কৃত বাক্য কহি।—আবার আশঙ্কা করিতেছেন যে, বানরজাতিতে তদ্রূপ কথার অসম্ভবতা হেতু সীতা তাঁহাকে মায়ারূপধারী রাবণ ভাবিয়া ভীত হইতে পারেন। অনেক বিবেচনার পর স্থির করিলেন "তস্মাদ্ বক্ষ্যাম্যহং বাক্যং মনুষ্যইব সংস্কৃতং।" ৩৩। ২৯ সর্গ।

—অতএব সাধারণ প্রচলিত সংস্কৃত বাক্যে কথা কহি।—

আবার অযোধ্যাকাণ্ডে রামের বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে "শ্রৈষ্ঠ্যং শাস্ত্র সমূহেষু প্রাপ্তোব্যামিশ্রকেষু চ।" ২৭। ১ সর্গ।

—ব্যামিশ্রকেষু—প্রাকৃতাদি ভাষামিশ্রিত নাটকাদিষু।—রামানুজঃ। শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র সমূহ তথা প্রাকৃতাদি ভাষামিশ্রিত নাটক সমূহে পারদর্শী ছিলেন।—

ইহা দ্বারা কি প্রমাণিত হইতেছে? উদ্ধৃত প্রথম তিন বাক্য অনার্য্য লোকের মুখ হইতে নির্গত, সংস্কৃত তাহাদের পক্ষে ভিন্ন ভাষা বলিয়া ওরূপ উক্তি সম্ভব হইতে পারে। অনার্য্য জাতির ভাষা আর্য্যভাষা হইতে স্বতন্ত্র তাহা বাল্মীকি বহু স্থানে বলিয়াছেন এবং মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোক তাহার প্রতিপোষক। অতএব ইল্বল এবং হনুমানের মুখ হইতে নির্গত বাক্য, সংস্কৃত তৎকালিক কথনীয় কি শিক্ষণীয় ভাষা, এতৎসম্বন্ধে প্রমাণরূপে গৃহীত না হইতে পারিত; এবং ইহাও বিবেচনা করা যাইতে পারিত যে, বাল্মীকি ইচ্ছাপূর্ব্বকই উক্ত বাক্য উহাদের মুখে যোজনা করিয়াছেন; পুনশ্চ "বাচং দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতং" এতদ্বাক্য কেবল ব্রাহ্মণজাতিতে আরোপিত না হইয়া, শূদ্র ব্যতীত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বিভাগত্রয়ের দ্বিজাতিত্ব হেতু, উহা কিছুই ভিন্ন ভাব বোধক নহে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত; কিন্তু তাহারই পার্শ্বে "মনুষ্য ইব সংস্কৃতং" এই বাক্যের অবস্থান হেতু উক্ত সন্দেহ খণ্ডন হইতেছে এবং উহা দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্যের অসারত্ব প্রমাণস্থলে প্রতিপাদিত না হইয়া বরং সারবত্তা দ্বিগুণতর দৃঢ়ীভূত হইতেছে। অতএব 'মনুষ্য ইব সংস্কৃতং' ইহার পূর্ব্ব বাক্যের সহিত সম্বন্ধে, এই প্রতীত হয় যে সংস্কৃত তখন সবৎসা, স্বয়ং শিক্ষণীয় ভাষা এবং দ্বিজাতিগণের বরণীয়া এবং ইহার দুহিতা সাধা-

রণের সম্পত্তি। এই দুহিতা বা দুহিতৃগণই কালে পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি নামে খ্যাত হইয়াছে। এই সময়ে যে ইহারা সদ্যোজাতা এমতও নহে; যদি রামানুজের ব্যাখ্যা অভ্রান্ত হয়, তবে গ্রন্থাবলীতেও জননীসহ একত্রে আসন গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে। ফলতঃ যখন অস্তাচল শিখরোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় কথিত সংস্কৃতের শেষ দশা। দুহিতৃগণ ক্রমেই বলবতী হইয়া উঠিতেছে, জননী ততই নিমগ্ন হইতেছেন।(১)

ভারতের যে প্রাচীন বিদ্যা লইয়া আমরা এত গৌরব করিয়া থাকি, সে প্রাচীন বিদ্যা তাহার উন্নতির শেষ সীমায় এই সময়ে অধিরোহণ করিয়াছিল। ধর্ম্ম ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের, বিশেষ ধর্ম্মগ্রন্থের এই প্লাবন কাল। বেদচতুষ্টয় শিরোরত্নরূপে সর্ব্বোপরি পরিশোভিত, আর সকল ভিন্ন স্বভাবের হইলেও তৎপথানুসারী, আবার যে সকল শাস্ত্র ভিন্ন পথাবলম্বী, তাহারাও সম্ভ্রম রক্ষার্থে বেদ বিহিত পথে ভক্তিযুক্ত। ১।১৪।৪০—ব্রাহ্মণ (২) এবং কল্পসূত্র (৩) ক্রিয়াকলাপের বিধি প্রদায়ক ও পবিত্র ইতিহাসাদির কথক, ১।৬।১৫—ষড়্ বেদাঙ্গ (৪) অধ্যয়নের প্রধান অঙ্গ।

---

(১) বাল্মীকির পূর্ব্বগত ভগবান যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থে "অথাপি ভাষিকেভ্যো ধাতুভ্যো নৈগমাঃ কৃত ভাষ্যন্তে দমূনাঃ ক্ষেত্রসাধা ইতি।" ২। ২—নৈগম অর্থাৎ বৈদিক অনেক শব্দ, যথা 'দমূনাঃ' 'ক্ষেত্রসাধা' প্রভৃতি, ভাষায় ব্যবহৃত ধাতু হইতে সাধিত ইহারা দৃষ্ট হয়।—এখানে বৈদিক সংস্কৃত হইতে যাস্কের সংস্কৃতের প্রভেদ দৃষ্ট হইল বটে কিন্তু ঐ সংস্কৃত ভাষা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আবার রামায়ণের অর্বাচীন আকৃতি ধারণের কিছু পরে রচিত মৃচ্ছকটিক নাটকে দৃষ্ট হয়, "মম দাব দুবেহিং জ্জেব হস্সং জাঅদি ইত্থিআএ সক্কং পঢন্তীএ" ইত্যাদি—এই দুই বিষয়ে আমার অত্যন্ত হাসি পায়, এক স্ত্রীলোকের মুখে সংস্কৃত পাঠ শ্রবণ, আবার—এখানে সংস্কৃত একেবারে অপহৃত। এই প্রমাণাবলী বিনানুসন্ধানে উদ্ধৃত হইল, সামান্য অনুসন্ধানে অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়।

(২) ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহ অষ্টাদশ পুরাণ সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরাণ বলিয়াও আখ্যাত হইত। উহা সমুহ বিশেষ বলিলে হয়। এত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক প্রস্তাবে পরিপূর্ণ যে সংক্ষেপে ব্রাহ্মণ কি? ইহা বলিতে গেলে কোন্ বিষয়ের প্রাধান্য ধরিতে হইবে, তাহা লইয়াই কত মত ভেদ আছে। সে বিচারে কাজ নাই, এখানে ইহাই বলা যথেষ্ট যে সাধারণের পক্ষে যেন দুরধিগম্য হইলেও তাহার অর্থবাদ এবং সাধারণে প্রচলিত প্রবাদ ও রীত্যাদি অবলম্বন করিয়া কর্ম্মকাণ্ড প্রকৃতির আকৃতি গঠন এবং ঐতিহাসিক মীমাংসা ইহাই প্রধানতঃ ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহের উদ্দেশ্য।

(৩) যে গ্রন্থাবলী দ্বারা বেদ এবং ব্রাহ্মণোক্ত ক্রিয়া পদ্ধতি মীমাংসা ও জ্ঞাপিত হয় এবং গার্হস্থ্য ও সামাজিক কর্ম্মের বিধি প্রদত্ত হয় তাহাদের সাধারণ নাম কল্পসূত্র। ইহা ষড়্ বেদাঙ্গের এক অঙ্গ।

(৪) "শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষং।"

শিক্ষা। বেদবিদ্যার বর্ণ (Letters), বল (Organs of Pronounciation), মাত্রা (Quantity), স্বর (Accent), সাম (Delivery), সন্তান (Euphonic Laws) সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদত্ত হয়।

কল্প। ৩ টীকা দেখ।

ব্যাকরণ। বেদবিদ্যা এবং তাহার ব্যুৎপত্তি সাধন ব্যাকরণ। পাণিনির প্রণীত ব্যাকরণ সচরাচর ব্যাকরণ বেদাঙ্গের পুস্তক বিশেষ বলিয়া খ্যাত।

বেদাঙ্গ ব্যতীত বেদ বিদ্যা অধ্যয়ন সম্যক্ প্রকারে সম্পন্ন হইত না। ভরতের আতিথ্য করিবার সময়ে ভরদ্বাজ ঋষি, দ্রব্যাদি আয়োজন এবং সঙ্কুলানের নিমিত্ত, ২।৯১।২২—'শিক্ষাস্বর সমাযুক্ত সূক্ত পাঠ দ্বারা বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই সময়ে উক্ত সমস্ত বিদ্যার বহুল চর্চ্চা লক্ষিত হয়।'

অতি পূর্ব্বকালে ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখা (৫) অধ্যয়নের এবং অধ্যাপনের নিমিত্ত বহু সংখ্যক ব্যক্তি একত্র সমবেত হইয়া দল বিশেষ থাকিতেন। ঐ দলকে চরণ (৬) বলিত এবং চরণস্থ ব্যক্তিগণকে চারণ বলিত। বাল্মীকির সময়ে চরণ আর সেই চরণ নহে, চারণগণ দেব গন্ধর্ব্ব ইত্যাদি নামের সহ তাঁহাদের নাম যোজন মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহারা এখন লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া হিমাদ্রিশিখরে আশ্রয় লইয়াছেন। বোধ হয় মহাপ্রস্থান পথে অগ্রসর হইবার জন্য। অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ সর্গে রাম বনগমনের পূর্ব্বাহ্নে তৈত্তিরীয় এবং কঠ শাখার অধ্যাপকদিগকে ধনদান করিতেছেন। উক্ত সর্গ পাঠে যতদূর অনুভব করিতে পারা যায়, তাহাতে ঐ অধ্যাপকদিগের বৃত্তি বর্ত্তমান টোলের গুরুদিগের বৃত্তি হইতে ভিন্ন নহে। সেই প্রাচীন কালে বাল্মীকির সময়ে, দেখা যায় যে আধুনিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ন্যায়, তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও বিশিষ্ট স্থানে অর্থলালসায় পরস্পরের প্রতি জিগীষা পরবশ হইয়া সভায় বাদানুবাদ করিতেন—

নিরুক্ত। বেদ বিদ্যায় ধাতু ও শব্দ জ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া থাকে। যাস্ক প্রণীত নিরুক্তই উক্ত নামধেয় বেদাঙ্গের পুস্তক বিশেষ বলিয়া খ্যাত। নিরুক্ত অর্থে,

"বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণ বিকারনাশৌ।
ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তং॥ শব্দকল্পদ্রুমঃ।

ছন্দঃ। যাহা দ্বারা বেদ ব্যবহৃত ছন্দঃ সমূহের বিষয় শিক্ষা প্রদত্ত হয়।

জ্যোতিষ। নক্ষত্র বিদ্যা। মূল প্রস্তাবে দেখ। ঋগ্বেদের সময়েও আর্য্যজাতিরা মলমাসতত্ত্ব এবং গ্রহ নক্ষত্রের গতি সুন্দররূপে নিরূপণ করিয়াছিলেন।

(৫) অতি কৌতুকের বিষয়। চিরবিশ্বাস যে রাম ত্রেতাযুগের এবং বাল্মীকি তাঁহার ষাইট হাজার বৎসর পূর্ব্বে আনাগত রামচরিত রচনা করেন। বেদবিভাগকর্ত্তা সত্যবতীসুত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস দ্বাপরে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কথিত। বেদ বিভাগ সম্বন্ধে নিরুক্তের ব্যাখ্যাকার দুর্গাচার্য্য বলিতেছেন, "বেদং তাবদেকং সন্তমতি মহত্বাদ্ দুরধ্যেয়মনেক শাখা ভেদেন সমাম্নাসিষুঃ। সুখগ্রহণায় ব্যাসেন সমাম্নাতবন্তঃ।"—ব্যাসের পূর্ব্বে বেদ অবিভক্ত থাকায় অধ্যয়নের পক্ষে অতি কষ্টকর হওয়ায়, তাহা সাধারণের নিকট সুগম করিবার নিমিত্ত ব্যাস কর্ত্তৃক বেদ ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়। রামায়ণে (যেমন প্রদর্শিত হইতেছে) এই বেদশাখা সমূহের বহুল উল্লেখ আছে।

(৬) "চরণশব্দঃ শাখা বিশেষাধ্যয়ন পরৈকতাপন্নজনসঙ্ঘ বাচী।" জগদ্ধরবাক্য।

চারণগণ চরণস্থ সকলের সম্মতি অনুসারে কোন বিশেষ বিধি বদ্ধ করিয়া তদনুসারে চলিতেন। তদ্ভিন্ন এক চরণ হইতে অন্য চরণের ভিন্নতাবহ প্রতিপাদক বহুতর বিষয় ছিল।

"—তদা বিপ্রান্ হেত্ত্ববাদান্ বহূনপি।

প্রাহুঃ সুবাগ্মিনো ধীরাঃ পরস্পর জিগীষয়া॥ ১৯।১।১৪

১।৬।৬ এবং আরও বহুস্থানে সূত অর্থাৎ পৌরাণিক মাগধ অর্থাৎ বংশাবলী কথক এবং বন্দিগণের রাজসভা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট স্থানে অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদ প্রতিপাদ্য এবং বেদ বিরোধী তর্ক ও দর্শনের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। ২।১।১৭ রামের বহুগুণ মধ্যে ইহাও একটি প্রধান গুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থিত হইলে তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় উত্তরোত্তর যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারিতেন। ইহাদ্বারা তৎকালে দর্শনাদির অধ্যয়নবহুলতা সূচিত হইতেছে। বৈষয়িক বিদ্যায়অর্থশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতের উল্লেখ বহু স্থানে দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহারা কিপ্রকার অর্থশাস্ত্রবিদ্ ছিলেন এবং বৈষয়িক বিদ্যার কতদূর উন্নতি হইয়াছিল তাহা সমাজের গঠন ও ক্রিয়া কলাপ দৃষ্টে পরে পরিচিত হইবে। সাহিত্যাদির সম্বন্ধে নাটক (২।৬৯।৪) প্রভৃতির প্রচার ছিল এবং রামায়ণ যে সময়ের কাব্য তখন তৎসম্বন্ধে অধিক ব্যক্তব্য আর কি আছে?

২।৩—দশরথ, রবি মঙ্গল ও রাহু তাঁহার জন্ম নক্ষত্র আক্রমণ করিয়াছে দেখিয়া আসন্ন বিপদ জ্ঞানে ভীত হইতেছেন।—২।৪১ কথিত হইয়াছে মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ সোমে সংক্রান্ত হইয়া অতি অমঙ্গলসূচক হইয়া উঠিল। পুনশ্চ রামের জন্ম নক্ষত্র—

"ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ॥৮॥

নক্ষত্রেঽদিতিদৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চষু।

গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্‌পতাবিন্দুনা সহ॥৯॥" ১।১৮

ব্যাখ্যা—"অদিতি দৈবত্যে পুনর্ব্বসৌ পঞ্চষু রবি ভৌম শনি গুরু শুক্রেষু উচ্চসংস্থেষু (৭) মেষ মকর তুলা কর্কট মীনস্থেষু সচন্দ্র গুরৌ কর্কটে লগ্নে স্থিতে সতি"—রামানুজঃ। ভরতাদির জন্ম নক্ষত্র সম্বন্ধে—"পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ। সার্পে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতে রবৌ॥১৫॥ ১।১৮

সার্প—অশ্লেষা, কুলীর—কর্কট।

ইহা দ্বারা (৮) এক দৃষ্টান্তেই প্রদর্শিত হইতেছে যে আর্য্যেরা বাল্মীকির সময়ে জ্যোতিষ তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনাদের দর্শন কতদূর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন.

---

(৭) এই গণনা সম্বন্ধে যিনি কৌতূহলাবিষ্ট তিনি বেণ্টলি সাহেবের হিন্দু জ্যোতিষ তত্ত্ব অবলোকন করিবেন।

(৮) এই গ্রহনক্ষত্রাদির গতি সম্বন্ধে পরবর্ত্তী হিন্দুজ্যোতিষের কতদূর সম্বন্ধ ইহা যাঁহার দেখিতে ইচ্ছা হইবে এবং সঙ্কেত সহ ঘনিষ্টতা পরীক্ষা করিতে কৌতূহল জন্মিবে, তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্তের স্ফুটগতি নামক দ্বিতীয় অধ্যায় দেখিবেন।

এবং তাহা আপনাদের শুভাশুভে কিরূপ ভাবে নিয়োজন করিয়াছিলেন। স্থানান্তরে যুদ্ধকালীন ঘোর অমঙ্গলের চিহ্ন স্বরূপ কথিত হইয়াছে যে,

"শ্যামং রুধিরপর্য্যন্তং বভূব পরিবেষণম্।
অলাতচক্রপ্রতিমং প্রতিগৃহ্য দিবাকরং ॥৩। ৩।২৩॥

"রুধিরবর্ণ উপান্তভাগ বিশিষ্ট অলাতচক্র প্রতিম একটি শ্যামবর্ণ মণ্ডল সূর্য্যকে আবরিত করিল।" সম্ভবতঃ এরূপ অদ্ভুত দৃশ্য বাল্মীকির সময়ে বা পূর্ব্বে কখন দৃষ্ট হইয়াছিল। উহার অদ্ভুততাই উহাকে অমঙ্গল চিহ্নপদে আরোপিত করিবার হেতু। উহা কি জ্যোতিষজ্ঞ পাঠকেরা মীমাংসা করিয়া লইবেন? (৯) ২।২৫।১৪—"বায়ুশ্চ সচরাচরঃ" স্থির এবং অস্থির বায়ুর তত্ত্বও ইহা দ্বারা বোধ হয় তৎকালে নিরূপিত হইয়াছিল।

দেহস্পন্দন স্বপ্নদর্শনে কুমঙ্গল বা সুমঙ্গলের চিহ্ন এবং তাহাতে ভীত বা আশাযুক্ত হওয়া এবং দৈবে বিশ্বাস অতি প্রবল।

ভারতের দেবতারা এখনও বেদোক্ত দেবতা নিচয়, কিন্তু বড় ছলগ্রাহী, কথায় কথায় রাগ করেন কথায় কথায় খুসী হয়েন; ঋষিরাও তদ্রূপ,—দেবতা সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু সে ঋগ্বেদের সহ তুলনায়, প্রধানতঃ নির্ভর তেত্রিশটির (১০) উপরেই, ২।১১।১৩—"ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা ইত্যাদি।" রাম জননী কৌশল্যা পুত্রের বনগমনের পূর্ব্বাহ্নে তাঁহার মঙ্গল কামনায় দেবতাগণের (এবং শুধু তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া) খেচর ভূচর প্রভৃতিরও নাম গ্রহণ করিয়াছেন। এমন স্থলেই যখন প্রোক্ত দেবতাগণ সকলেই বৈদিক, কেহ নূতন সৃষ্ট নহে, তখন সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে বৈদিক দেবতাদিগের অদ্যাপি তেজোহানি হয় নাই। তবে স্থানান্তর আলোচনায় দেখা যায় কেবল তেজোহানি হইতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র এবং যাঁহারা নূতন তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু অতি সামান্য সংখ্যক এবং সমৃদ্ধি

---

(৯) গ্রীসীয় পুরাবৃত্তে কথিত আছে যে খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দী পূর্ব্বে প্রায় সমগ্র সূর্য্যগ্রহণ হওয়ায় উহা অমঙ্গলসূচক জ্ঞানে লিডীয় এবং মীড জাতির মধ্যে প্রস্তাবিত যুদ্ধ হয় নাই। ইহাও আকৃতিতে বাল্মীকির বর্ণনার প্রায় অনুরূপ। এরূপ গ্রহণ অতি অদ্ভুত ও কদাচিত্ত সম্ভব। পরে গণনা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে এই গ্রহণ খৃষ্টের ৬১০ বৎসর পূর্ব্বে ৩০শে সেপ্টেম্বর দিবসে হইয়াছিল। এই গ্রহণের ঘটনা বিষয়ে Herodotus Book I Chap. 108. দেখ।

(১০) ঋগ্বেদ ১-১৩৯-১১, ৮-৩০-২, ৮-২৮-১ ইত্যাদি। আবার ঋগ্বেদের স্থানান্তরে (৩-৯-৯) দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি দেখা যায়, যথা "ত্রীণিশতা ত্রীসহস্রাণি অগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবাঃ নব চাসপর্য্যন্।" তিনশত তিন সহস্র একোণ চত্বারিংশ দেবতা অগ্নির পূজা করিয়াছিলেন। এই ৩৩ জন দেবতা কাহাকে কাহাকে লইয়া, তদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন রূপ কথিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে ৪।৫।৭ "অষ্টৌ বসবঃ একাদশরুদ্রাঃ দ্বাদশ-আদিত্যা ইমে এব দ্যাবা পৃথিবী ত্রয়স্ত্রিংশৌ।"

সংস্থাপন কেবল আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতে আধুনিক পুরাণ ও তন্ত্র প্রভাবে পতঙ্গপালের ন্যায় যে দেবতামালা নিয়ত একাধিপত্য করিতেছেন, বাল্মীকির সময়ে তাঁহাদের অনেককে কেহ চিনিত না।

দেবতাগণ বৈদিক হইলেও এসময়ে অনেকের অনেক মূর্ত্তির ভাবান্তর হইয়াছে। ঋগ্বেদ রুদ্র বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মরুদ্‌গণ তাঁহার পুত্র এবং পৃশ্নি তাঁহার ভার্য্যা; অথবা ঋগ্বেদের ৫-৫৬-৮ সায়নাচার্য্যের ভাষ্য অনুসারে "রোদসী রুদ্রস্য পত্নী মরুতাং মাতা। যদ্বা রুদ্রো বায়ুঃ তৎপত্নী মাধ্যমিকা দেবী।" বাল্মীকির সময়ে ইহার মরুদ্গণের সহ সম্বন্ধ সূচিত আছে বটে—

"——স্থাণুং——

কৃতোদ্বাহস্তু দেবেশং গচ্ছন্তু সমরুদ্গণম্"।

কিন্তু এক্ষণে ইনি ভিন্ন মূর্ত্তিধর, ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভার্য্যা হিমবদ্দুহিতা গৌরী, পুত্র স্কন্দ। সম্প্রদায় বিশেষের একমাত্র মুখ্য উপাস্য দেবতা। এবং প্রভাব এত প্রবল যে সেই সেই সম্প্রদায় ইহার নামানুসারে শৈব বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

বিষ্ণু বেদে সাধারণ পদবীর দেবতা, ইন্দ্র সহ সখ্যতায় পূজিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও নিম্ন পদবীস্থ,—"অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরেণ সর্ব্বা অন্যা দেবতাঃ।"—অগ্নি দেবতাদিমধ্যে প্রধান, বিষ্ণু সর্ব্ব কনিষ্ঠ। আর সমস্ত দেবতা এতদুভয়ের মধ্যস্থানাধিকারী। —ইনিও রামায়ণের সময়ে রুদ্রের ন্যায় ভিন্ন মূর্ত্তিধর এবং সম্প্রদায় বিশেষের উপাস্য দেবতা। রামায়ণের প্রথম কাণ্ডে ৭৫ সর্গে ভৃগুরাম পুরাকালীয় বিষ্ণু ও রুদ্রে সংগ্রাম বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে বিষ্ণু পক্ষে জয়সূচিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা কাল প্রভাবে ক্রমান্বয়ে ভারতে বরুণ, তৎপরে ইন্দ্রদেবের যেমন প্রাধান্য লাভ হইয়াছিল, সেইরূপ তাহার পরে রুদ্র; আবার তাঁহাকে অতীত করিয়া, এক্ষণে বিষ্ণুর প্রাধান্য অনুমিত হইতেছে। ঐ কাণ্ডে ২৯ সর্গে বামনাশ্রম বর্ণনে বিষ্ণুর প্রাধান্যবর্ণিত হইয়াছে। শ্লোকদ্বয় মাত্র জ্ঞাপনার্থে আপাততঃ উঠান গেল।

"তপোময়ং তপোরাশিং তপোমূর্ত্তিং তপাত্মকং।
তপসা ত্বাং সুতপ্তেন পশ্যামি পুরুষোত্তমং ॥১২॥
শরীরে তব পশ্যামি জগত্ সর্ব্বমিদং প্রভো।
ত্বমনাদিরনির্দ্দেশ্য ত্বমহং শরণং গতঃ ॥১৩॥"

—তুমি তপোময়, তপোরাশি, তপোমূর্ত্তি এবং তপঃস্বরূপ। হে পুরুষোত্তম! তপের দ্বারাই তোমার দর্শন পাইয়াছি। হে প্রভো! সমস্ত জগৎ তোমার শরীরে

দর্শন করিতেছি। তুমি অনাদি এবং নির্দ্দেশ রহিত, আমি তোমার শরণাগত হইলাম।—

যদি আর সর্ব্বত্রে কার্য্য দ্বারা এই প্রাধান্য প্রদর্শিত না হইত, তবে এ গুলি ভক্তির আধিক্যজনিত অত্যুক্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারিত।

বাল্মীকিও রামকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাম নামে কোন নৃপতির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলে, বাল্মীকির সময়েতেই যে নরদেবতার উপাসনার সূত্রপাত হইয়াছে তাহা প্রতীত হয়। কিন্তু নরদেব সম্বন্ধে মনুষ্য প্রকৃতির মহত্বে তখনও এতদূর বিশ্বাস ছিল, যে বাল্মীকি সেই নরদেবের নিকট মনুষ্য প্রকৃতির হেয়ত্ব এবং নীচত্ব প্রতিপাদন করিতে সাহস পায়েন নাই অথবা তাঁহার মনে সে ভাব উদয়ই হয় নাই। এই বিষয় পরবর্ত্তী শাস্ত্র গ্রন্থের সহ তুলনা করিয়া দেখা যাউক; কত প্রভেদ দেখা যাইবে। অহল্যা ইন্দ্র সংশ্রবে পতিত হইলে ঋষি গৌতম তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিতেছেন—

"বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
যদৈতচ্চ বনং ঘোরং রামো দশরথাত্মজঃ।
আগমিষ্যতি দুর্দ্ধর্ষস্তদা পূতা ভবিষ্যসি॥
তস্যাতিথ্যেন দুর্ব্বৃত্তে!"—

নির্জ্জনবাসিনী অনুতপ্তা অহল্যা রামের তপোবনে আগমন জ্ঞাত হওন মাত্রেই—

"শাপস্যান্তমুপাগম্য তেষাং দর্শনমাগতা।
রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্মুদা॥" ১।৪৯

পুরাণানুসারে পাষাণময়ী অহল্যা পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইলেন—

"গচ্ছতস্তস্য রামস্য পাদস্পর্শান্মহাশিলা।"

পদ্মপুরাণ।

রাম এই অদ্ভুত দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, ব্যাপারটা কি, তাহা বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে, বিশ্বামিত্র কহিতেছেন

"ত্বদঙ্ঘ্রিস্পর্শনাৎ তস্যৈ শাপান্তং প্রাহ গৌতমঃ।
তস্মাদিয়ং তে পাদাব্জস্পর্শাৎ শুদ্ধা ভবৎ প্রভো॥

পদ্মপুরাণ।

রামায়ণে গৌতম শাপ দিলেন যে অহল্যা বাত ভক্ষ্যা, নিরাহার এবং ভস্মশায়িনী হইয়া রামের সেই বনে আগমন পর্য্যন্ত অনুতাপ করিবেন। এখানে রামের আগমন যেন অনুতাপ করণের কাল নির্ণায়ক স্বরূপ। তৎপরে রামকে

বনে আগত জানিয়া অনুতাপের কালপূর্ণ বিবেচনা করিলেন এবং রামের আতিথ্য করিবার নিমিত্ত 'দর্শনমাগতা।' রাম অহল্যাকে দর্শনমাত্রে পূজনীয় জ্ঞানে তাঁহার পাদগ্রহণ করিলেন। পদ্মপুরাণে গৌতম অহল্যাকে পাষাণময়ী করিলেন এবং মুক্তির যে উপায় কহিয়াছিলেন তদনুসারে রামের পদস্পর্শে পাষাণময়ী অহল্যা পূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করিলেন! এই প্রভেদ যে পূর্ব্বে যিনি ভক্তিতে যাহার পদগ্রহণ করিতেন, এক্ষণে তিনিই আপন উচ্চতানুসারে তাহাকে শুধু পদ দেন না, আবার পদ দিয়া মানুষ করেন!

একের বিলয়ে অপরের আবির্ভাবে যেরূপ হইয়া থাকে,—একজন ক্রমে চিত্ত অধিকার করিতেছেন, চ্যুতাধিকার আর একজন মায়াবশতঃ ক্ষণে তথায় দেখা দিতেছেন; বাল্মীকির সময়ে কথিত নূতনত্ব প্রচলন সত্ত্বেও সেইরূপ। এখনও বৈদিক ইন্দ্রের প্রাধান্য "সহস্রাক্ষে সর্ব্বদেবেন সংকৃতে"—২।২৫, স্মৃতিপথে উদয় হয়। যাগ যজ্ঞাদি কল্পসূত্র এবং ব্রাহ্মণোক্ত বিধান অনুসারে হইয়া থাকে। উন্নতির মধ্যে শুধু পশু নহে, পক্ষী পর্য্যন্ত বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে এবং তাহা অতি অধিক সংখ্যক (১।১৪)। যজ্ঞকর্ত্তা মুখ্য পুরোহিত চারি প্রকার, হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু এবং ব্রহ্মা। ১—১৪—৩৮—ইহাদের সহকারী লইয়া ষোড়শ জন। (১১) অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম, অতিরাত্র প্রভৃতি বহুবিধ বৈদিক ক্রিয়া কলাপের উল্লেখ আছে। সমগ্র আলোচনা করিলে বৈদিক হিন্দু ধর্ম্মরূপ প্রবলা নদীর বেগ ক্রমে মন্দ হইয়া আসিতেছে এবং আধুনিক হিন্দুধর্ম্মরূপ শাখা, যাহা এখন জননী অপেক্ষা পুষ্ট, তখন জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় বেগ চালিবার নিমিত্ত পয়ঃপ্রণালী অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে মাত্র।

ধর্ম্মোপার্জ্জিত লব্ধফল লইয়া গৃহে আগত ব্যক্তির সহ কৌতুকাবহ সম্ভাষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ৩।৫—রাম শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, শরভঙ্গ কহিতেছেন যে আমি তপোবলে যত লোক অধিকার করিয়াছি, তাহা তুমি প্রতিগ্রহ করিয়া সেই সমস্তলোক স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। রাম তদুত্তরে প্রতিগ্রহ না করিয়া কহিলেন, আমি স্বয়ং ঐ সকল লোক আহরণ করিব। পুনশ্চ ৩।৭—মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ

---

(১১) হোতা এবং সহকারী মৈত্রাবরুণ অচ্ছাবাক, গ্রাবস্তুৎ। উদ্গাতা এবং সহকারী প্রস্তোতা, আগ্নীধ্র, পোতা। অধ্বর্য্যু এবং সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা উন্নেতা। ব্রহ্মা এবং সহকারী ব্রাহ্মণাচ্ছংসি, প্রতিহর্ত্তা, সুব্রহ্মণ্য। ইহাদের দক্ষিণা ভাগ সম্বন্ধে মনু ৮।২১০ ব্যাখ্যায় কুল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন যে মুখ্য ঋত্বিক অর্থাৎ হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু এবং ব্রহ্মা ইহারা সমান ভাগ পাইয়া থাকেন। মৈত্রাবরুণ, প্রতিহোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসি এবং প্রস্তোতা ইহারা মুখ্য ঋত্বিকের অর্দ্ধেক। অচ্ছাবাক, নেষ্টা, পোপ সাধন এবং যাগ যজ্ঞ তপ প্রভৃতি আগ্নীধ্র এবং প্রতিহর্ত্তা মুখ্য ঋত্বিকের তৃতীয়াংশ। গ্রাবস্তুৎ, উন্নেতা, পোতা এবং সুব্রহ্মণ্য মুখ্য ঋত্বিকের চতুর্থাংশ পাইয়া থাকেন।

কর্ত্তৃক তথাবিধ সম্ভাষণে রাম তদ্রূপ উত্তর প্রদান করিলেন। এইরূপ সম্ভাষণ প্রথা মহাভারতেও দেখিতে পাওয়া যায়। (১২)

পরলোক সম্বন্ধে পুরস্কার এবং তিরস্কার অর্থাৎ স্বর্গ এবং নরক এতদুভয়েতেই দৃঢ় বিশ্বাস। পুরস্কার অর্থাৎ স্বর্গবাস পুণ্যকর্ম্মের তারতম্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ, তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক সকল প্রতিষ্ঠিত। লোক বিশেষে মানুষিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ায়ত্ত এবং অমানুষিক অর্থাৎ চিন্তায়ত্ত সুখ। যাগ যজ্ঞাদি কেবল কর্ম্মদ্বারা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট লোক অধিকৃত হয়, তথায় পার্থিব সুখের প্রাচুর্য্য মাত্র; কর্ম্মফল শেষ হইলেই পুনর্ব্বার ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যোগ তপঃ প্রভৃতি সাধনে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। স্বর্গের ভাব ভারতে কোন সময়ে কতদূর চিন্তায়ত্ত হইয়াছিল, নিম্নলিখিত বাক্যাবলী হইতে তৎসাময়িক তদ্বিষয়ক অপর বাক্যাবলীর সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিয়া, তাহার আলোচনা করা যাউক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে "সহস্রাশ্বিনে বৈ ইতঃ স্বর্গলোকঃ" সহজ কথায় পৃথিবী হইতে স্বর্গ এক হাজার ঘোড়ার ডাক। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে "দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি। য এবং বেদ গৃহী ভবতি"—নক্ষত্র নিচয় দেবতার নিবাস, যে ইহা জ্ঞাত সে গৃহ যুক্ত হয়।—বাল্মীকির সময়ের সারাংশ উপরে কথিত হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণে—

"মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গোনরকস্তদ্ বিপর্য্যয়ঃ।
নরক স্বর্গ সংজ্ঞেবৈ পাপ পুণ্যে দ্বিজোত্তম॥"২-৬-৪০।

—হে দ্বিজোত্তম! যাহা মনের প্রীতিকর তাহাই স্বর্গ এবং তদ্বিপর্য্যয় নরক। অতএব নরক স্বর্গ পাপ পুণ্যের নামান্তর মাত্র।—

যম (১৩) পাপের দণ্ডদাতা। পিতৃলোকের অধিপতি। পুণ্যবন্তদিগের সহিত সম্পর্ক নাই। এই দুই কথাই পরস্পর বিরোধী। রামায়ণ মতে পিতৃ-লোক, মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মা, আবার তাঁহারা পুণ্যবান্ এবং বহু সুখে সুখী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ মতে পিতৃলোক পৃথক্ সৃষ্ট। এক গ্রন্থেই এরূপ উক্তিভেদ এবং ভিন্ন গ্রন্থের সহিত মত বিরোধ, ভারত বর্ষীয় সাধারণ মতের চিরানৈক্যের প্রমাণ স্বরূপ এবং কালে যে কল্প মন্বন্তর প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছে, ঐ সকল বিরোধী মতের সামঞ্জস্য সম্পাদন করা তাহার এক প্রধান উদ্দেশ্য। যমেরপুরে পাপানুসারে নরক

(১২) আদি পর্ব্ব যযাতি উপাখ্যানে ৯৩ অধ্যায়।

(১৩) ঋগ্বেদ মতে যম ত্বষ্টৃ দুহিতা সরণ্যু এবং বিবস্বতের পুত্র, যমীর সহ যমজ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এবং পরলোকের পথ মনুষ্যদিগকে প্রথম প্রদর্শন করান। তাঁহার পুর প্রহরী শ্যামা ও শবলা নামে চতুশ্চক্ষু বিশিষ্টা কুক্কুরীদ্বয়। দূত দুইজন অসুতৃপ ও উদুম্বল। অধ্যাপক মক্ষমূলরের মতে বিবস্বত অর্থে আকাশ। সরণ্যু অর্থে প্রাতঃকাল। যম অর্থে দিবা। যমী অর্থে রাত্রি।—Science of Language Vol. II page 481 & 506..

ভোগ হয়, তাহার দণ্ড বিধান কায়িক ক্লেশ দান। আবার বিষয় বিরোধ! পরলোকে এতদ্রূপ কায়িক এবং মানসিক সুখ দুঃখ বিধানের একত্র অবস্থান অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। অবিনাশী ব্রহ্মলোকের পার্শ্বেই আবার গন্ধর্ব্বাপ্সরঃ শোভিত স্বর্গ, তৎপার্শ্বে মল পরিপূরিত নরককুণ্ড। একদিকে আত্মা অশরীরী, অন্যদিকে শরীরময়। যে চিত্তে পরলোক বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ ভাবের আবিষ্কার, সেই চিত্তেই আবার ঐ বিষয়ক হেয় ভাবের অবস্থান! এ দোষ কেবল রামায়ণের নহে। তৈত্তরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে কথিত হইয়াছে যে আত্মা সাধারণ পুণ্যকর্ম্মাদিতে লোক বিশেষে (যথাকার সুখ পার্থিব সুখের আধিক্য ব্যতীত আর কিছু নহে) সুখ ভোগ করে, কর্ম্মফল শেষ হইলেই পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্ম লয়, পরে উচ্চতম কর্ম্ম দ্বারা—ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া থাকে। এই উপনিষদের সৃষ্টি কালে ভারতের চিন্তাশক্তি এই উচ্চতম সোপানে উঠিয়াছিল, উপনিষদ্ পাঠেই এমন বোধ হয় কিন্তু, তখনও পূর্ব্ববর্ণিত ভাবের প্রাচুর্য্য। ইহার কারণ নানারূপ হইতে পারে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলস্থ ১২৯ সূক্তের আলোচনায়, তাৎকালিক চিন্তা-শক্তি বহু দূর গামিনী বলিয়া যদিও গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু স্বর্গ সম্বন্ধে পার্থিব সুখের আধিক্য ব্যতীত উচ্চতর ভাবের সর্ব্বত্রে অভাব। তদ্রূপ অন্য বেদ। যেমন শুনিতে পাই, বেদ আর্য্যগণের সমস্ত ধর্ম্ম তত্ত্বের শিরোভূষণ। সুতরাং মানব মনে পরে যে কিছু চিন্তা তরঙ্গ উঠিত তাহা হয় বেদানুসারী হইত, নতুবা ভিন্ন পথগামী হইলেও বেদবিহিত তত্ত্বের বশ্যতা অস্বীকারে নানা কারণে সমর্থ হইত না।

মৃত ব্যক্তির অগ্নিদাহ দ্বারা—অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া তর্পণ করা বিধি। ২।৭৭—ভরত পিতৃবিয়োগ হইলে দশাহ (১৪) অন্তে কৃতশৌচ হইয়া, দ্বাদশাহে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সমাপন করত, ত্রয়োদশ দিবসে চিতা উত্তোলন পূর্ব্বক স্থল শুদ্ধি করিলেন। ইহাদ্বারা তৎকালে হিন্দু প্রেতকার্য্য কিরূপে সাধিত হইত তাহা অনুমিত হইতেছে। কিন্তু রাক্ষস অর্থাৎ অনার্য্যগণের স্বতন্ত্র প্রথা লক্ষিত হয়। ৩।৪।২২—বিরাধ নামে রাক্ষস রাম শরে আহত হইয়া, আসন্ন মরণ দেখিয়া, রাম কর্ত্তৃক তাহার দেহ যাহাতে ভূগর্ভে নিহিত হয়, তদ্বিষয়ে প্রার্থনা করিয়া কহিতেছে যে ভূগর্ভে নিহিত হওয়াই রাক্ষসদিগের সনাতন ধর্ম্ম এবং স্বর্গলাভের উপায়।

২।১০৮—মহর্ষি জাবালি রামের প্রবোধার্থে যে সমস্ত মত কহিয়াছিলেন তাহা আর্য্য ধর্ম্ম বিরোধী। এতদ্দারা ইহা প্রতিপন্ন যে তৎকালে ঐরূপ মত উদ্ভাবিত এবং প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যরূপে ঘোষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আবার সুযোগ মতে

(১৪) মনু ৫।৮৩ ক্ষত্রিয়েরা দ্বাদশ দিবসে কৃতাশৌচ হয়।

রাজারাও প্রচারকদিগকে দণ্ড দিতে পারিলে ছাড়িতেন না। রাম জাবালীর কথায় রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিতেছেন

"যথাহি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধ
স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।"

এই সময়ে সামাজিক শাসন অতি কঠিন এবং ধর্ম্ম তত্ত্বের প্লাবন, এরূপ মত প্রবর্ত্তিত হওয়ার আবশ্যক।—

ইতি তৃতীয় প্রস্তাব।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
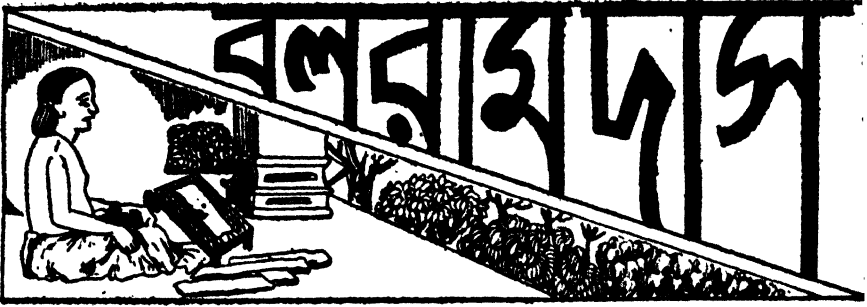
পূর্ব্বে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে জ্ঞানদাসের পরিচয় দিয়াছি। বলরাম দাস আর এক জন অপরিচিত বৈষ্ণব কবি। অপরিচিত, কিন্তু যথার্থ কবিত্ব সম্পন্ন। দুঃখের বিষয় তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কোন কথাই আমরা জানি না। আরও দুঃখের বিষয়, অন্যান্য প্রাচীন বাঙ্গালা কবির ন্যায়, বলরাম অশ্লীলতা দোষশূন্য নহেন। অশ্লীলতা দোষ শূন্য নহেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়পরতা শূন্য বটে। যে অশ্লীলতা লালসার পুষ্টিকর, বলরামে তাহা নাই। তথাপি যাহা আছে, তাহা বলরামের সময় ও শিক্ষা, বিবেচনা করিয়া মার্জ্জনা করিতে পারিলেও, তাঁহার কবিত্ব গৌরবানুরোধে মার্জ্জনা করিতে পারিলেও, আধুনিক কবির রচনায় তাহার মার্জ্জনা করিতে পারি না। কোন আধুনিক লেখক এই প্রাচীন কবিদিগের দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী না হয়েন।

পূর্ব্বরাগ বর্ণনার গীতে বাঙ্গালা ভাষা—প্রায় সকল ভাষাই, পরিপূর্ণ। তথাপি বলরাম দাসের নিম্নলিখিত গীতটি, অনেকের নিকট আদরণীয় হইবে।

শুনইতে আনহি আনহি শুনত
বুঝাইতে বুঝাই আন।
পুছইতে গদ গদ, উতর নাহিক সোই,
কহইতে সজল নয়ান॥

সখি হে—কি ভেল এ বর নারী।
কবহুঁ কপোল থকিত রহু ঝাঝরি,
জনু ধন হারি জুয়ারি॥ ধ্রু।
বিছুরল হাস রভস রস চাতুরী
বাউরি জন ভেল গোরি।

ক্ষণে ক্ষণে দীঘ নিশসিত তনু
মোড়াই সঘন রভস ভোরি॥
কাতর কাতর নয়নে নেহারই
কাতর কাতর বাণী।
না জানি যে কোন দুঃখ দারুণ বেদন
ঝর ঝর এ দুই নয়ানি॥
ঘন ঘন নয়ানে নীর ভরি আওত
ঘন ঘন অধরহি কাঁপ।
বলরাম দাস কহে জানহু জগমাহ
প্রেমক বিষম সন্তাপ॥

নিম্নলিখিত গীতটি সখী বাক্য—

সুন্দরী বুঝিলে তোমরা ভাব?
প্রেম রতন গোপনে পাইয়া
ভাঁড়িলে কি হবে লাভ?
আন ছলে কহ আনের কথা
বেকত পিরীতি রঙ্গ।
রসের বিলাসে অঙ্গ ঢর ঢর,
রঞ্জিত প্রেম তরঙ্গ॥
ভাবের ভরেতে চলিতে না পারে
চরণ হইল হারা।
কানুর সনে নিকুঞ্জ বনে
রঙ্গেতে হয়েছে ভোরা॥
পুছিলে না কহ মনের মরম
এবে ভেল বিপরীত।
বলরাম কহে কি আর বলিবে
ভাবেতে মজিল চিত॥

ইহা বাহ্য দৃশ্য—ইহার অন্তর্দৃশ্য নিম্নলিখিত গীতে। যাহা সখী, বাহিরে অব্যক্ত দেখিতেছে, নিম্নলিখিত গীতে, তাহার হৃদয়স্থ প্রস্ফুটাবস্থা ব্যক্ত হইয়াছে। "পুছিলে না কহ, মনের মরম" ইহার টীকা, নীচের লিখিত অপূর্ব্ব বাক্যে আছে:—

মরম কহিনু, মো পুন ঠেকিনু
সে জনার পিরীতি ফাঁদে।
রাত দিন চিতে ভাবিতে ভাবিতে
তারে সে পরাণ কাঁদে॥
বুকে বুকে মুখে, চোখে লাগি থাকে,
তবু সে মোরে সতত হারায়।
ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে
আমারে রাখিতে চায়॥
হার নহে পিয়া গলায় পরয়ে
চন্দন নহে মাখে গায়।
অনেক যতনে রতন পাইয়া
থুইতে সোয়াত নাহিক পায়॥
কর্পূর তাম্বুল আপনি সাজিয়ে
মোর মুখ ভরি দেয়।
হাসিয়া হাসিয়া চিবুক ধরিয়া
বদন লখিতে চায়।
সাজায়ে কাচায়ে বসন পরায়ে,
আদরে লইয়া কোরে।
দীপ লয়ে হাতে মুখ নিরখিতে
তিতিল নয়ন লোরে॥
চরণে ধরিয়া যাবক রচই
আলায়ে বাঁধয়ে কেশ।
বলরাম চিতে ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর হইল শেষ॥

পুনশ্চ, সেই ভাবে—

রাতি দিন চোখে চোখে, বসিয়া সদাই দেখে,
ঘন ঘন মুখখানি মাজে।
উলটি পালটি চায় সোয়াত নাহিক পায়,
কত বা আরতি হিয়ার মাঝে॥
সই ও দুখ লাগিয়াছে মনে।
যারে বিদগধ রায়, বলিয়া জগতে গায়,
মোর আগে কিছুই না জানে॥
জালিয়া উজল বাতি জাগি পোহাইল রাতি
নিদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে।

* * *

ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে
হিয়া হতে শেজে না শোয়ায়।
দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায়॥
ধরিয়া দুখানি হাতে কখন ধরয়ে মাথে
ক্ষণে ধরে হিয়ার উপরে।
ক্ষণে পুলকিত হয় ক্ষণে আঁখি মুদি রয়
বলরাম কি কহিতে পারে॥

পুনশ্চ—

কিবা সে কহিব বঁধুর পিরীতি
তুলনা দিব যে কিসে।
সমুখে রাখিয়া, মুখ নিরখিয়া
পরাণ অধিক বাসে।
* * *
মরি মরি সই বঁধুর বালাই লইয়া।
না জানি কেমনে, আছয়ে এখনে
মোরে কাছে না দেখিয়া ॥ ধ্রু
করতলে ঘন বদন মাজই
অলকে করয়ে দূর।
পরশিতে অঙ্গ সকল সোঁপিনু
ধৈরজ হইল চুর ॥
মরম বাঁধিল নানা সুখ দিয়া
বচন ঠেলিতে নারি।
যখন যেমতি করে অনুমতি
তখন তেমতি করি ॥
তোর সনে সখি কথাটি কহিতে
সোয়াত না পায় হিয়া।
বলরাম কহে, মরি যাই হেন
পিরীতি বালাই নিয়া ॥

পুনশ্চ—

নানা বেশ করি, পরায়ে পাটেরসাড়ি
সাধে সাধ সমুখে হাটায়।
দেখিয়া হাটন মোর, হইয়া আনন্দে ভোর
দুই বাহু পসারিয়া ধায় ॥
সই তেঁই সে হিয়ার মাঝে জাগে।
কত বরনারী যারে হেরিয়া ঝুরিয়া মরে,
সেই যোড়হাত মোর আগে ॥ ধ্রু ॥
* * *
চন্দন মাখায় গায়, দেয় বসনের বায়
নিজ করে তাম্বুল খাওয়ায়।
বিনি কাজে কত পুছে, কত না মুখানি মুছে,
হেন বাসে দেখিতে হারায় ॥
তুমি মোর প্রাণ ধন, তোমা বিনা নাহি আন
কহে প্রিয় গদ গদ ভাষে।
যতেক পীরিতি তার, জগতে কি আছে আর
কি বলিবে বলরাম দাসে ॥

নিম্নোদ্ধৃত রূপানুরাগ বর্ণনার স্থানে স্থানে মাত্র ভাল—

যো মুখ দেখিতে হিয়া বিদরয়ে
কে তাহে পরাণ ধরে।
তালে সে কামিনী, দিবস রজনী
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে।
সই, কি জানি কদম্ব মূলে।
ওরূপ দেখিয়া কুলে তিলাঞ্জলি
দিনু যমুনার জলে ॥
বঙ্কিম নয়নে ভঙ্গিম চাহনি
তিল পাসরিতে নারি।
এত দিনে সখি নিশ্চয় বুঝিনু
মজিল কুলের নারী ॥
চাচর চঞ্চল কুলের কাচনি
সাজনি ময়ূর পাখে।
বলরাম বলে কোন্ বা দারুণী
নয়ন ফিরায়ে রাখে ॥

রসের ভরে, অঙ্গ না ধরে,
হেলিয়া পড়িছে বায়।
অঙ্গ মোড়া দিয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া
ফিরিয়া ফিরিয়া চায় ॥
* * *

হিয়া জর জর　　পরাণ ফাপর
　　দারুণ মুরলী স্বরে।
কুটিল হরিণী　　লোটায় ধরণী
　　কাঁদিয়ে মরয়ে ঘরে ॥
মধুর বোলে,　　পরাণ দোলে,
　　তাহে পরমাদ হাস।
বলরাম কহে,　　এবে সে নিশ্চয়
　　ছাড়িল ঘরের আশ ॥

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি কালা রূপ খানি ॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে ॥*

চন্দন তিলক　　আধ কাঁপিয়া
　　বিনোদ চূড়াটি বাঁধে।
হিয়ার ভিতরে,　　লোটায়ে লোটায়ে
　　কাতরে পরাণ কাঁদে ॥
আধ চরণে　　আধ চলনি
　　আধ মধুর হাস।
এইসে লাগিয়ে,　　ভাল সে ঝুরিয়ে
　　মরে সে বলরাম দাস ॥

নিম্নোদ্ধৃত গীত, কোন কোন বিষয়ে বিশেষ দোষযুক্ত, তথাপি মধুর—

কিবা সে মোহন বেশ,　ভুলাইল সবদেশ
　　*　　*　　*
ভরমে দেখিলে তারে, জনম ভরিয়া গো
　　ঝরিয়ে মরয়ে কত জনা ॥
সোই হাম কি করিনু কেন বা সে বাঢ়াইনু
　　কি শেল হানিল যেন বুকে।
জাতি কুল শীলে সই　বজর পড়িল গো
　　কালা রূপ দেখি চোখে চোখে ॥
কিবা সে নয়ন বান　হিয়ায় হানিল গো
　　গরল ভরিয়া রৈল বুকে।
কোন বা পামরী নারী আপনা রাখয়ে গো
　　আগুন জ্বালিয়া দি তার মুখে ॥†
খাইতে সোয়াত নাই　নিদ দূরে গেল গো
　　হিয়া দহ দহ মন ঝুরে।
উড় পুড় আন ছান, ধক ধক করে প্রাণ,
　　কি হৈল রহিতে নারি ঘরে ॥

নিম্নলিখিত গীত—বাঙ্গালি কুলবধূর গীত—গুরুজন পীড়িতা, ব্রীড়া-কুণ্ঠিতা—স্বামিমাত্র সহায়া নবকুলবধূর উক্তি। একটি ছত্র উৎকৃষ্ট—

আপন শপতি করি হাত দিয়া মাথে।
শুধুই শরীর মোর প্রাণ তোমার হাতে ॥
　　বঁধু হে তোমায় বুঝাই।
সবাই বলে আমি তোমার ভেঁই জিতে চাই ॥ধ্রু
নিরবধি তোমা লাগি দগধে পরাণ।
তিলেক দাঁড়াও কাছে জুড়াক নয়ান ॥
কি লাগি দারুণ চিত কাঁদে দিন রাতি।
কহে বলরাম বড় বিষম পীরিতি ॥

---

* রাঙ্গা নয়ন কি সুন্দর ? ভিন্ন রুচিহি লোকঃ।

† কবির মুখে নয় ?

পুনশ্চ,

যত যত পীরিতি করিয়াছে মোরে।
আঁখরে আঁখরে লেখা হিয়ার ভিতরে ॥
হাসিয়া পাঁজর কাটা কহেছে কথাখানি।
সোঙরিতে চিতে উঠে আগুনের খনি ॥
নিরবধি বুকে রেখে, চাইলে চোখে চোখে।
এ বড় দারুণ শেল ফুটে রৈল বুকে ॥
হিয়ায় ধরিয়া, নয়ন ভরিয়া,
কবে সে দেখিব, বদন খানি।
বলরাম দাসে বলে, হিয়ার ভিতরে জ্বলে,
দারুণ শেল আগুনি ॥

নিম্নলিখিত গীত ইহার বিপরীত—যাহাদের দেহের রক্তের পরিবর্ত্তে, অগ্নি বহে, তাহাদিগের উক্তি—

সমুখে রাখিয়া, নয়নে দেখিব,
লইয়া থাকিব চোখে চোখে।
হার করিয়া গলায় গাঁথিয়া
লইয়া থাকিব বুকে ॥
চিতে উঠে যত, বেশ করিব তত,
অঙ্গে অঙ্গে দিয়া হাত।
অনেক দিনের সাধ পুরাইব,
কোলে করি প্রাণনাথ ॥
দেখিয়া দেখিয়া মুখানি মাজিব,
তাম্বুল দিব চাঁদমুখে ॥
বলরামের কথা, বঁধু লৈয়া যাব যথা
রাধা বলি কেহ নাকি ডাকে ॥

কেবল পদবিন্যাসানুরোধে আর একটি গীত উদ্ধৃত করিয়া বলরাম দাসের পরিচয় সমাপ্ত করিব—

জয়তি জয় বৃষভানু নন্দিনী
শ্যাম মোহিনী রাধিকে।
বেণী লম্বিত যৈছে ফণি মণি
বেড়ল মালতী মালিকে ॥
শরদ বিধুবর ও মুখমণ্ডল,
ভালে সিন্দুর বিন্দু যে।
ভাঙ গঞ্জিত জিনিয়া কামধনু
চিবুকে মৃগমদ বিন্দু যে।
গরুড় চঞ্চু বিনি নাসিকা সুবলনী
তাহে শোহে গজমতি যে।
রাতা উতপল, অধর যুগল,
দশন মোতিক পাঁতি যে ॥
কণ্ঠে শোভিত হার মণিময়
ঝলকে দামিনী বিজই।
কনক দণ্ড জিনি বাহু সুবলনী
কতহুঁ আভরণ সাজই ॥
ক্ষীণ কটিতটে নীল সাটি শোহে
কনক কিঙ্কিনী বোলই।
চরণে নূপুর শবদ সুন্দর
যৈছে চটকিনী বোলই ॥
যাবক রঞ্জিত ও নখ চন্দ্রিক
চাঁদ রোওত তাহারে।
দীন বলরাম, করত পরিহার
দেহ পদযুগ ছায়ারে ॥

• • •
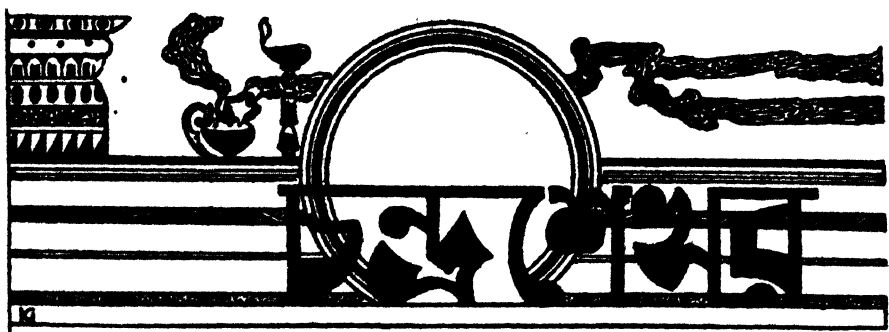
ঊনত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

ফষ্টরের পরিনাম

মুরশিদাবাদে আসিয়া, ইংরেজের নৌকা সকল পৌঁছিল। মীরকাসেমের নায়েব, মহম্মদ তকি খাঁর নিকট সম্বাদ আসিল, যে আমিয়ট পৌঁছিয়াছে।

মহাসমারোহের সহিত আসিয়া মহম্মদ তকি আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। আমিয়ট আপ্যায়িত হইলেন। মহম্মদ তকি খাঁ পরিশেষে আমিয়টকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। আমিয়ট অগত্যা স্বীকার করিলেন, কিন্তু প্রফুল্ল মনে নহে। এদিগে মহম্মদ তকি, দূরে অলক্ষিতরূপে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন—ইংরেজের নৌকা খুলিয়া না যায়।

মহম্মদ তকি চলিয়া গেলে, ইংরেজেরা পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে নিমন্ত্রণে যাওয়া কর্ত্তব্য কি না। গলষ্টন্ ও জন্‌সন এই মত ব্যক্ত করিলেন, যে ভয় কাহাকে বলে তাহা ইংরেজ জানে না, জানাও কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে। আমিয়ট বলিলেন, যেখানে ইহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি এবং অসদ্ভাব যত দূর হইতে হয় হইয়াছে, তখন আবার তাহাদিগের সঙ্গে আহার ব্যবহার কি? আমিয়ট স্থির করিলেন, নিমন্ত্রণে যাইবেন না।

এদিকে যে নৌকায় দলনী ও কুলসম্ বন্দীস্বরূপে সংরক্ষিতা ছিলেন, সে নৌকাতেও নিমন্ত্রণের সম্বাদ পৌঁছিল। দলনী ও কুলসম্ কাণে কাণে কথা কহিতে লাগিল। দলনী বলিল, "কুলসম্—শুনিতেছ? বুঝি মুক্তি নিকট।"

কু। "কেন?"

দ। "তুই যেন কিছুই বুঝিস না। যাহারা নবাবের বেগমকে কয়েদ করিয়া আনিয়াছে—তাহাদের যে নবাবের পক্ষ হইতে সাদর নিমন্ত্রণ হইয়াছে, ইহার ভিতর কিছু গূঢ় অর্থ আছে। বুঝি আজি ইংরেজ মরিবে।"

কু। "তাতে কি তোমার আহ্লাদ হইতেছে?"

দ। "নহে কেন? একটা রক্তারক্তি না হইলেই ভাল হয়। কিন্তু যাহারা আমাকে অনর্থক কয়েদ করিয়া আনিয়াছে, তাহারা মরিলে যদি আমরা মুক্তি পাই, তাহাতে আমার আহ্লাদ বৈ নাই।"

কু। "কিন্তু মুক্তির জন্য এত ব্যস্ত কেন? আমাদের আটক রাখা ভিন্ন ইহাদের আর কোন অভিসন্ধি দেখা যায় না। আমাদের উপর আর কোন দৌরাত্ম্য করিতেছে না। কেবল আটক। আমরা স্ত্রীজাতি, যেখানে যাইব, সেইখানেই আটক।"

দলনী বড় রাগ করিল, বলিল, "আপন ঘরে আটক থাকিলেও, আমি দলনীবেগম—ইংরেজের নৌকায় আমি বাঁদী। তোর সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। আমাদের কেন আটক করিয়া রাখিয়াছে বলিতে পারিস?"

কু। "ভাত বলিয়াই রাখিয়াছে। মুঙ্গেরে যেমন হে সাহেব ইংরেজের জামিন হইয়া আটক আছে, আমরাও তেমনি নবাবের জামিন হইয়া ইংরেজের কাছে আটক আছি, হে সাহেবকে ছাড়িয়া দিলেই আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। হে সাহেবের কোন অনিষ্ট ঘটিলেই আমাদেরও অনিষ্ট ঘটিবে; নহিলে ভয় কি?"

দলনী আরও রাগিল, বলিল, "আমি তোর হে সাহেবকে চিনি না, তোর ইংরেজের গোঁড়ামি শুনিতে চাহি না। ছাড়িয়া দিলেও তুই বুঝি যাইবি না?"

কুলসম রাগ না করিয়া হাসিয়া বলিল, "যদি আমি না যাই, তবে তুমি কি আমাকে ছাড়িয়া যাও।"

দলনীর রাগ বাড়িতে লাগিল, বলিল, "তাও কি সাধ না কি?"

কুলসম গম্ভীরভাবে বলিল, "কপালের লিখন কি বলিতে পারি?"

দলনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, বড় জোরে একটা ছোট কিল উঠাইল, কিন্তু কিলটি আপাততঃ পুঁজি করিয়া রাখিল—ছাড়িল না। এইরূপ ছোট খাট কিলগুলিন, মন্মথের বজ্র—বাঁদী কুলসম তাহার মর্ম্ম কি বুঝিবে? দলনী আপন কর্ণের নিকট সেই কিলটি উত্থিত করিয়া—কৃষ্ণকেশগুচ্ছ সংস্পর্শে যে কর্ণ, সভ্রমর প্রস্ফুট কুসুমবৎ শোভা পাইতেছিল, তাহার নিকট কমল কোরক তুল্য বদ্ধ মুষ্টি স্থির করিয়া, বলিল, "তোকে আমিয়ট দুই দিন কেন ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল, সত্য কথা বল তো?"

কু। "সত্য কথা ত বলিয়াছি, তোমার কোন কষ্ট হইতেছে কি না—তাহাই জানিবার জন্য। সাহেবদিগের ইচ্ছা, যত দিন, আমরা ইংরেজের নৌকায় থাকি, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি। জগদীশ্বর করুন ইংরেজ আমাদের না ছাড়ে।"

দলনী কিল আরও উচ্চ করিয়া তুলিয়া বলিল, "জগদীশ্বর করুন তুমি শীঘ্র মর।"

কু। “ইংরেজ ছাড়িলে, আমরা ফের নবাবের হাতে পড়িব। নবাব তোমাকে ক্ষমা করিলে করিতে পারেন কিন্তু আমায় ক্ষমা করিবেন না, ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারি। আমার এমন মন হয় যে যদি কোথায় আশ্রয় পাই তবে আর নবাবের হুজুরে হাজির হইব না।”

দলনী রাগ ত্যাগ করিয়া গদ্ গদ্ কণ্ঠে বলিল, “আমি অনন্য গতি। মরিতে হয়, তাঁহারই চরণে পতিত হইয়া মরিব।”

এদিগে আমিয়ট আপনার আজ্ঞাধীন শিপাহীগণকে সজ্জিত হইতে বলিলেন। জন্সন্ বলিলেন,—“এখানে আমরা তত বলবান্ নহি—রেসিডেন্সির নিকট নৌকা লইয়া গেলে হয় না?”

আমিয়ট বলিলেন, “যে দিন, একজন ইংরেজ দেশীলোকের ভয়ে পলাইবে, সেই দিন ভারতবর্ষে ইংরেজি সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা বিলুপ্ত হইবে। এখান হইতে নৌকা খুলিলেই, মুসলমান বুঝিবে যে আমরা ভয়ে পলাইলাম। দাঁড়াইয়া মরিব সেও ভাল, তথাপি ভয় পাইয়া পলাইব না। কিন্তু ফষ্টর পীড়িত। শস্ত্র হস্তে মরিতে অক্ষম—অতএব তাহাকে রেসিডেন্সীতে যাইতে অনুমতি কর। তাহার নৌকায় বেগম ও দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটিকে উঠাইয়া দাও। এবং দুই জন শিপাই সঙ্গে দাও। বিবাদের স্থানে উহাদের থাকা অনাবশ্যক।”

শিপাহীগণ সজ্জিত হইলে, আমিয়টের আজ্ঞানুসারে নৌকার মধ্যে সকলে প্রচ্ছন্ন হইয়া বসিল। ঝাঁপের বেড়ার নৌকায় সহজেই ছিদ্র পাওয়া যায়, প্রত্যেক শিপাহী এক এক ছিদ্রের নিকটে বন্দুক লইয়া বসিল। আমিয়টের আজ্ঞানুসারে দলনী ও কুলসম ফষ্টরের নৌকায় উঠিল। দুই জন শিপাহী সঙ্গে ফষ্টর নৌকা খুলিয়া গেল। দেখিয়া মহম্মদ তকির প্রহরীরা তাঁহাকে সম্বাদ দিতে গেল।

এ সম্বাদ শুনিয়া এবং ইংরেজদিগের আসিবার সময় অতীত হইল দেখিয়া, মহম্মদ তকি, ইংরেজদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। আমিয়ট উত্তর করিলেন যে কারণ বশতঃ তাঁহারা নৌকা হইতে উঠিতে অনিচ্ছুক।

দূত নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া কিছু দূরে আসিয়া, একটা ফাকা আওয়াজ করিল। সেই শব্দের সঙ্গে, তীর হইতে দশ বারটা বন্দুকের শব্দ হইল। আমিয়ট দেখিলেন নৌকার উপর গুলি বর্ষণ হইতেছে। এবং স্থানে স্থানে নৌকার ভিতরে গুলি প্রবেশ করিতেছে।

তখন ইংরেজ সিপাহীরাও উত্তর দিল। উভয় পক্ষে, উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছাড়িতে শব্দে বড় হুলস্থুল পড়িল। কিন্তু উভয় পক্ষই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। মুসলমানেরা তীরস্থগৃহাদির অন্তরালে লুকায়িত; ইংরেজ এবং

তাহাদিগের শিপাহীগণ নৌকা মধ্যে লুকায়িত, এরূপ যুদ্ধে বারুদ খরচ ভিন্ন অন্য ফলের আশু কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন, মুসলমানেরা আশ্রয়ত্যাগ করিয়া, তরবারি ও বর্ষা হস্তে চীৎকার করিয়া আমিয়টের নৌকাভিমুখে ধাবিত হইল। দেখিয়া স্থির প্রতিজ্ঞ ইংরেজেরা ভীত হইল না।

স্থির চিত্তে, নৌকা মধ্য হইতে, দ্রুতাবতরণ প্রবৃত্ত মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমিয়ট, গলষ্টন ও জন্‌সন্, স্বহস্তে বন্দুক লইয়া অব্যর্থ সন্ধানে প্রতিবারে, এক এক জনে এক এক জন যবনকে বালুকাশায়ী করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যেরূপ তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ যবন শ্রেণীর উপর যবন শ্রেণী নামিতে লাগিল। তখন আমিয়ট বলিলেন, "আর আমাদিগের রক্ষার কোন উপায় নাই। আইস আমরা বিধর্ম্মী নিপাত করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করি।"

ততক্ষণে মুসলমানেরা গিয়া আমিয়টের নৌকায় উঠিল। তিনজন ইংরেজ এক হইয়া এক কালীন, আওয়াজ করিলেন। ত্রিশূল বিভিন্নের ন্যায় নৌকারূঢ় যবন শ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নৌকা হইতে জলে পড়িল।

আরও মুসলমান নৌকার উপর উঠিল। আরও কতকগুলা মুসলমান মুদ্গরাদি লইয়া নৌকার তলে আঘাত করিতে লাগিল। নৌকার তলদেশ ভগ্ন হইয়া যাওয়ায়, কল কল শব্দে তরণী জলপূর্ণ হইতে লাগিল।

আমিয়ট সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "গোমেষাদির ন্যায় জলে ডুবিয়া মরিব কেন? বাহিরে আইস, বীরের ন্যায় অস্ত্রহস্তে মরি।"

তখন তরবারি হস্তে তিনজন ইংরেজ অকুতোভয়ে, সেই অগণিত যবন-গণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন যবন, আমিয়টকে সেলাম করিয়া বলিল, "কেন মরিবেন? আমাদিগের সঙ্গে আসুন।"

আমিয়ট বলিলেন, "মরিব। আমরা আজি এখানে মরিলে, ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিবে, তাহাতে মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইবে। আমাদের রক্তে ভূমি ভিজিলে তৃতীয় জর্জ্জের রাজপতাকা তাহাতে সহজে রোপিত হইবে।"

"তবে মর।" এই বলিয়া পাঠান তরবারির আঘাতে আমিয়টের মুণ্ড চিরিয়া ফেলিল। দেখিয়া ক্ষিপ্র হস্তে গলষ্টন্ সেই পাঠানের মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত করিলেন।

তখন দশ বার জন যবনে গলষ্টন্‌কে ঘেরিয়া প্রহার করিতে লাগিল। এবং অচিরাৎ, বহু লোকের প্রহারে আহত হইয়া, গলষ্টন ও জন্‌সন্ উভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়া নৌকার উপর শুইলেন।

তৎপূর্ব্বেই ফষ্টর নৌকা খুলিয়া গিয়াছিল।

ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

নৃত্য গীত

মুঙ্গেরে, যে প্রশস্ত অট্টালিকা মধ্যে জগৎশেঠেরা বাস করিতেছিলেন, তথায় নিশীথে সহস্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তথায় শ্বেতমর্ম্মরবিন্যাস শীতল মণ্ডপ মধ্যে, নর্ত্তকীর রত্নাভরণ হইতে সেই অসংখ্য দীপমালার রশ্মি প্রতিফলিত হইতেছিল। জলে জল বাধে—আর উজ্জ্বলে উজ্জ্বল বাধে। দীপরশ্মি, উজ্জ্বল প্রস্তর স্তম্ভে—উজ্জ্বল স্বর্ণ মুক্তা খচিত মসনদে, উজ্জ্বল হীরকাদি খচিত গন্ধ পাত্রে, শেঠদিগের কণ্ঠবিলম্বিত স্থূলোজ্জ্বল মুক্তা হারে,—আর নর্ত্তকীর প্রকোষ্ঠে, কণ্ঠ এবং কর্ণের আভরণে জ্বলিতেছিল। তাহার সঙ্গে মধুর গীতি শব্দ উঠিয়া উজ্জ্বল মধুরে মিশাইতেছিল। উজ্জ্বলে মধুরে মিশিতেছিল! কেহ কখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশিতে দেখিয়াছ? যখন নৈশ নীলাকাশে চন্দ্রোদয় হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; যখন সুন্দরীর সজল নীলোন্দীবর লোচনে বিদ্যুচ্চকিত কটাক্ষবিক্ষিপ্ত হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন স্বচ্ছনীল সরোবরশায়িনী উন্মেষোন্মুখী নলিনীর দলরাজি, বালসূর্য্যের হেমোজ্জ্বল কিরণে বিভিন্ন হইতে থাকে, নীল জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মিমালার উপরে দীর্ঘ রশ্মি সকল নিপতিত হইয়া, পদ্ম পত্রস্থ জলবিন্দুকে জ্বালিয়া দিয়া, জলচর বিহঙ্গ কুলের কলকণ্ঠ বাজাইয়া দিয়া, জলপদ্মের ওষ্ঠাধর খুলিয়া দেখিতে যায়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; আর যখন তোমার গৃহিণীর পাদপদ্মে, ডায়মন কাটা মল ভাম্নু লুটাইতে থাকে তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন সন্ধ্যাকালে, গগন মণ্ডলে, সূর্য্যতেজ ডুবিয়া যাইতেছে দেখিয়া, নীলিমা তাহাকে ধরিতে ধরিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ায়—তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে,—আর যখন, তোমার গৃহিণী কর্ণাভরণ দোলাইয়া, তিরস্কার করিতে করিতে তোমার পশ্চাদ্ধাবিত হয়েন তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন চন্দ্র কিরণ প্রদীপ্ত গঙ্গাজলে বায়ু প্রপীড়নে সফেণ তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়া, চাঁদের আলোতে জ্বলিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—আর যখন স্পার্ক্লিং শ্যাম্পেন তরঙ্গ তুলিয়া স্ফাটিক পাত্রে জ্বলিতে থাকে তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে দক্ষিণ বায়ু মিলে তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—আর যখন সন্দেশময় ফলাহারের পাতে, রজত মুদ্রা দক্ষিণা মিলে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন প্রাতঃসূর্য্য কিরণে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বসন্তের কোকিল ডাকিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে,—আর যখন প্রদীপমালার আলোক রত্নাভরণে ভূষিত হইয়া, রমণী সঙ্গীত করে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে।

উজ্জ্বলে মধুরে মিশিল—কিন্তু শেঠদিগের অন্তঃকরণে তাহার কিছুই মিশিল না। তাঁহাদের অন্তঃকরণে মিশিল, গুরগণ খাঁ।

বাঙ্গালা রাজ্যে সমরাগ্নি এক্ষণে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার অনুমতি পাইবার পূর্ব্বেই পাটনার এলিস সাহেব পাটনার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু মুঙ্গের হইতে মুসলমান সৈন্য প্রেরিত হইয়া—পাটনাস্থিত মুসলমান সৈন্যের সহিত একত্রিত হইয়া পাটনা পুনর্ব্বার মীর কাসেমের অধিকারে লইয়া আইসে। এলিস প্রভৃতি পাটনাস্থিত ইংরেজেরা মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হইয়া মুঙ্গেরে বন্দী ভাবে আনীত হয়েন। এক্ষণে উভয় পক্ষে প্রকৃত ভাবে রণসজ্জা করিতেছিলেন। শেঠদিগের সহিত গুরগণ খাঁ সেই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। নৃত্য গীত উপলক্ষ মাত্র—জগৎশেঠেরা বা গুরগণ খাঁ কেহই তাহা শুনিতে ছিলেন না। সকলে যাহা করে, তাঁহারাও তাহাই করিতেছিলেন। শুনিবার জন্য কে কবে সঙ্গীতের অবতরণা করায়?

গুরগণ খাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল—তিনি মনে করিলেন যে উভয় পক্ষ বিবাদ করিয়া ক্ষীণ বল হইলে, তিনি উভয় পক্ষকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং বাঙ্গালার অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু সে অভিলায সিদ্ধির পক্ষে প্রথম আবশ্যক, যে সেনাগণ তাঁহারই বাধ্য থাকে। সেনাগণ অর্থ ভিন্ন বশীভূত হইবে না—শেঠ-কুবেরগণ সহায় না হইলে অর্থ সংগ্রহ হয় না। অতএব শেঠদিগের সঙ্গে পরামর্শ গুরগণ খাঁর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এদিগে, কাসেম আলি খাঁও বিলক্ষণ জানিতেন যে যে পক্ষকে এই কুবের যুগল অনুগ্রহ করিবেন, সেই পক্ষ জয়ী হইবে। জগৎশেঠেরা যে মনে মনে তাঁহার অহিতাকাঙ্ক্ষী তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন, কেন না তিনি তাহাদিগের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন নাই। তাহারা সুযোগ পাইলেই তাহার বিপক্ষের সঙ্গে মিলিত হইবে, ইহা স্থির করিয়া তিনি শেঠদিগকে দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। শেঠেরা তাহা জানিতে পারিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত তাহারা ভয় প্রযুক্ত মীরকাসেমের প্রতিকূলে কোন আচরণ করে নাই কিন্তু এক্ষণে, অন্যথা রক্ষার উপায় না দেখিয়া, গুরগণ খাঁর সঙ্গে মিলিল। মীরকাসেমের নিপাত উভয়ের উদ্দেশ্য।

কিন্তু বিনাকারণে, জগৎশেঠদিগের সঙ্গে গুরগণ খাঁ দেখা সাক্ষাৎ করিলে, নবাব সন্দেহ যুক্ত হইতে পারেন বিবেচনায়, জগৎশেঠেরা এই উৎসবের সৃজন করিয়া, গুরগণ এবং অন্যান্য রাজামাত্যবর্গকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন।

গুরগণ খাঁ নবাবের অনুমতি লইয়া আসিয়াছিলেন। এবং অন্যান্য অমাত্যগণ হইতে পৃথক্ বসিয়াছিলেন। জগৎশেঠেরা যেমন সকলের নিকট আসিয়া এক একবার আলাপ করিতেছিলেন—গুরগণ খাঁর সঙ্গেও সেইরূপ মাত্র—অধিকক্ষণ

অবস্থিতি করিতেছিলেন না। কিন্তু কথা বার্ত্তা অন্যের অশ্রাব্য স্বরে হইতেছিল। কথোপকথন এইরূপ—

গুরগণ খাঁ বলিতেছেন—"আপনাদের সঙ্গে আমি একটি কুটি খুলিব—আপনারা বখরাদার হইতে স্বীকার আছেন ?"

মহাতাপ চন্দ।—কি মতলব ?

গুর। মুঙ্গেরের বড় কুঠি বন্ধ করিবার জন্য।

মহাতাপ চন্দ। স্বীকৃত আছি—এরূপ একটা নূতন কারবার না আরম্ভ করিলে আমাদের আর কোন উপায় দেখি না।

গুরগণ খাঁ বলিলেন "যদি আপনারা স্বীকৃত হয়েন, তবে টাকার আঞ্জামটা আপনাদিগের করিতে হইবে—আমি শারীরিকি পরিশ্রম করিব।"

সেই সময়ে মনিয়া বাই নিকটে আসিয়া সনদী খেয়াল গাইল—"শিখে হো ছলা ভালা" ইত্যাদি। শুনিয়া মহাতাপ চন্দ হাসিয়া বলিলেন, "কাকে বলে ? যাক্—তাহা আমরা রাজি আছি—আমাদের মূলধন সুদে আসলে বজায় থাকিলেই হইল—কোন দায়ে না ঠেকি।"

এইরূপে একদিগে, বাইজি কেদার, হাম্বির, ছায়ানট ইত্যাদি ঝাড়িতে লাগিল, আর একদিগে গুরগণ খাঁ ও জগৎশেঠ রূপেয়া, নোক্‌সান, দর্শণী, প্রভৃতি ছেঁদো কথায় আপনাদিগের পরামর্শ স্থির করিতে লাগিলেন। কথাবার্ত্তা স্থির হইলে গুরগণ খাঁ বলিতে লাগিলেন, "একজন নূতন বণিক্ কুঠি খুলিতেছে, কিছু শুনিয়াছেন ?"

মহাতাপ চন্দ। না—দেশী না বিলাতী ?

গুর। দেশী।

মহা। কোথায় ?

গুর। মুঙ্গের হইতে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত সকল স্থানে। যেখানে পাহাড় যেখানে জঙ্গল, যেখানে মাঠ, সেইখানে তাহার কুঠি বসিতেছে ?

মহা। ধনী কেমন ?

গুর। এখনও বড় ভারী ধনী নয়—কিন্তু কি হয় বলা যায় না।

মহা। কার সঙ্গে তাহার লেনদেন ?

গু। মুঙ্গেরের বড় কুঠির সঙ্গে।

মহা। হিন্দু না মুসলমান ?

গু। হিন্দু।

মহা। নাম কি ?

গু। প্রতাপ রায়।

মহা। বাড়ী কোথায়?

গু। মুর্শিদাবাদের নিকট।

মহা। নাম শুনিয়াছি—সে সামান্য লোক।

গু। অতি ভয়ানক লোক।

মহা। কেন সে হঠাৎ এপ্রকার করিতেছে?

গু। কলিকাতার বড় কুঠির উপর রাগ।

মহা। তাহাকে হস্তগত করিতে হইবে—সে কিসের বশ?

গু। কেন সে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত তাহা না জানিলে বলা যায় না। যদি অর্থলোভে বেতনভোগী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে তবে তাহাকে কিনিতে কতক্ষণ? জমীজমা তালুক মলুকও দিতে পারি। কিন্তু যদি ভিতরে আর কিছু থাকে?

মহা। আর কি থাকিতে পারে? কিসে প্রতাপ রায় এত মাতিল?

বাইজি সেই সময়ে গায়িতেছিল, "গোরে গোরে মুখ পরা বেশর শোহে—আর শোহে নয়ন নি কজরা রে।"

মহাতাপ চন্দ বলিলেন, "তাই কি? কার গোরা মুখ?"

একত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

আবার সেই

যখন রামচরণের গুলি খাইয়া লরেন্স ফষ্টর গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তখন প্রতাপ বজরা খুলিয়া গেলে পর, হাতিয়ারের নৌকার মাঝিরা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া, ফষ্টরের দেহের সন্ধান করিয়া তখনই উঠাইয়াছিল। সেই নৌকার পাশ দিয়াই ফষ্টরের দেহ ভাসিয়া যাইতেছিল। তাহারা ফষ্টরকে উঠাইয়া নৌকায় রাখিয়া আমিয়টকে সম্বাদ দিয়াছিল।

আমিয়ট সেই নৌকার উপর আসিলেন। দেখিলেন, ফষ্টর অচেতন, কিন্তু প্রাণ নির্গত হয় নাই। মস্তিষ্ক ক্ষত হইয়াছিল বলিয়া চেতন বিনষ্ট হইয়াছিল। ফষ্টরের মরিবারই অধিক সম্ভাবনা, কিন্তু বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। আমিয়ট চিকিৎসা জানিতেন, রীতিমত তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। বকাউল্লার প্রদত্ত সন্ধান মতে, ফষ্টরের নৌকা খুঁজিয়া ঘাটে আনিলেন। যখন আমিয়ট মুঙ্গের হইতে যাত্রা করেন, তখন মৃতবৎ ফষ্টরকে সেই নৌকায় তুলিয়া আনিলেন।

ফষ্টরের পরমায়ু ছিল—সে চিকিৎসায় বাঁচিল। আবার পরমায়ু ছিল, মুরশিদাবাদে মুসলমান হস্তে বাঁচিল। কিন্তু এখন সে রুগ্ন—বলহীন—তেজোহীন

—আর সে সাহস—সে দম্ভ নাই। এক্ষণে সে প্রাণভয়ে ভীত, প্রাণভয়ে পলাইতেছিল। মস্তিষ্কের আঘাত জন্য, বুদ্ধি ও কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াছিল।

ফষ্টর দ্রুত নৌকা চালাইতেছিল—তথাপি ভয় পাছে মুসলমান পশ্চাদ্ধাবিত হয়। প্রথমে সে কাশিমবাজারের রেসিডেন্সিতে আশ্রয় লইবে মনে করিয়াছিল—তাহাতে ভয় হইল, পাছে মুসলমান গিয়া রেসিডেন্সী আক্রমণ করে। সুতরাং সে অভিপ্রায় ত্যাগ করিল। এ স্থলে ফষ্টর যথার্থ অনুমান করিয়াছিল। মুসলমানেরা অচিরাৎ কাশিমবাজারে গিয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়া তাহা লুঠ করিল।

ফষ্টর দ্রুত বেগে কাশিমবাজার ফরাশডাঙ্গা, সৈদাবাদ, রাঙ্গামাটি ছাড়াইয়া গেল। তথাপি ভয় যায় না। যে কোন নৌকা পশ্চাতে আইসে মনে করে যবনের নৌকা আসিতেছে। দেখিল এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা কোন মতেই সঙ্গ ছাড়িল না।

ফষ্টর তখন রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। ভ্রান্ত বুদ্ধিতে নানা কথা মনে আসিতে লাগিল। একবার মনে করিল, যে নৌকা ছাড়িয়া তীরে উঠিয়া পলাই। আবার ভাবিল, পলাইতে পারিব না—আমার সে বল নাই। আবার ভাবিল জলে ডুবি—আবার ভাবিল জলে ডুবিলে বাঁচিলাম কই। আবার ভাবিল যে এই দুইটা স্ত্রীলোককে জলে ফেলিয়া নৌকা হালকা করি—নৌকা আরও শীঘ্র যাইবে।

অকস্মাৎ তাহার এক কুবুদ্ধি উপস্থিত হইল। এই স্ত্রীলোকদিগের জন্য যবনেরা তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে, ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। দলনী যে নবাবের বেগম তাহা সে শুনিয়াছিল—মনে ভাবিল বেগমের জন্যই মুসলমানেরা ইংরেজের নৌকা আক্রমণ করিয়াছে। অতএব বেগমকে ছাড়িয়া দিলে আর কোন গোল থাকিবে না। সে স্থির করিল যে দলনীকে নামাইয়া দিবে।

দলনীকে বলিল, "ঐ একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আমাদের পাছু পাছু আসিতেছে দেখিতেছ?"

দলনী বলিল "দেখিতেছি।"

ফ। উহা তোমাদের লোকের নৌকা,—তোমাকে কাড়িয়া লইবার জন্য আসিতেছে।

এরূপ মনে করিবার কোন কারণ ছিল? কিছুই না। কেবল ফষ্টরের বিকৃত বুদ্ধিই ইহার কারণ,—সে রজ্জুতে সর্প দেখিল। দলনী যদি বিবেচনা করিয়া দেখিত, তাহা হইলে এ কথায় সন্দেহ করিত। কিন্তু যে যাহার জন্য ব্যাকুল হয়, সে তাহার নামেই মুগ্ধ হয়; আশায় অন্ধ হইয়া বিচারে পরাঙ্মুখ হয়।

দলনী আশায় মুগ্ধ হইয়া সে কথায় বিশ্বাস করিল,—বলিল, "তবে কেন ঐ নৌকায় আমাদের উঠাইয়া দাও না। তোমাকে অনেক টাকা দিব।"

ফ। আমি তাহা পারিব না। উহারা আমার নৌকা ধরিতে পারিলে আমাকে মারিয়া ফেলিবে।

দ। আমি বারণ করিব।

ফ। তোমার কথা শুনিবে না। তোমাদের দেশের লোক স্ত্রীলোকের কথা গ্রাহ্য করে না।

দলনী তখন ব্যাকুলতা বশতঃ জ্ঞান হারাইল—ভাল মন্দ ভাবিয়া দেখিল না। যদি ইহা নিজামতের নৌকা না হয় তবে কি হইবে, তাহা ভাবিল না; এ নৌকা যে নিজামতের নহে, সে কথা তাহার মনে আসিল না। ব্যাকুলতা বশতঃ আপনাকে বিপদে নিক্ষেপ করিল—বলিল, "তবে আমাদের তীরে নামাইয়া দিয়া তুমি চলিয়া যাও।"

ফষ্টর সানন্দে সম্মত হইল। নৌকা তীরে লাগাইতে হুকুম দিল।

কুলসম বলিল, "আমি নামিব না। আমি নবাবের হাতে পড়িলে, আমার কপালে কি আছে বলিতে পারি না। আমি সাহেবের সঙ্গে কলিকাতায় যাইব—সেখানে আমার জানা শুনা লোক আছে।"

দলনী বলিল, "তোর কোন চিন্তা নাই। যদি আমি বাঁচি, তবে তোকেও বাঁচাইব।"

কুল্‌সম্‌, "তুমি বাঁচিলে ত?"

কুলসম কিছুতেই নামিতে রাজি হইল না। দলনী তাহাকে অনেক বিনয় করিল—সে কিছুতেই শুনিল না। তাহার অন্য কোন বিশেষ অভিপ্রায় ছিল—কেননা সে মুঙ্গেরে প্রতাপ রায়ের বাসায় দলনীকে ত্যাগ করিবার কথা কিছু বলে নাই।

ফষ্টর কুল্‌সমকে বলিল যে কি জানি যদি তোমার জন্য নৌকা পিছু পিছু আইসে। তুমিও নাম।

কুল্‌সম বলিল, যে যদি আমাকে না ছাড়, তবে আমি ঐ নৌকায় উঠিয়া, যাহাতে নৌকাওয়ালারা তোমার সঙ্গ না ছাড়ে তাহাই করিব।

ফষ্টর ভয় পাইয়া আর কিছু বলিল না—দলনী কুলসমের জন্য চক্ষের জল ফেলিয়া নৌকা হইতে উঠিল। ফষ্টর নৌকা খুলিয়া চলিয়া গেল। তখন সূর্য্যাস্তের অল্প মাত্র বিলম্ব আছে।

ফষ্টরের নৌকা ক্রমে দৃষ্টির বাহির হইল। যে ক্ষুদ্র তরণীকে নিজামতের নৌকা ভাবিয়া ফষ্টর দলনীকে নামাইয়া দিয়াছিল, সে নৌকাও নিকটে আসিল।

প্রতিক্ষণে দলনী মনে করিতে লাগিল যে নৌকা এইবার তাঁহাকে তুলিয়া লইবার জন্য ভিড়িবে; কিন্তু নৌকা ভিড়িল না। তখন তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে কি না এই সন্দেহে দলনী অঞ্চল ঊর্দ্ধোত্থিত করিয়া আন্দোলিত করিতে লাগিল। তথাপি নৌকা ফিরিল না। বাহিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন, বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় দলনীর চমক হইল—এ নৌকা নিজামতের কিসে সিদ্ধান্ত করিলাম! অপরের নৌকা হইতেও পারে! দলনী তখন ক্ষিপ্তার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে সেই নৌকার নাবিকদিগকে ডাকিতে লাগিল। "এ নৌকায় হইবে না" বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

দলনীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। ফষ্টরের নৌকা তখন দৃষ্টির অতীত হইয়াছিল—তথাপি সে কূলে কূলে দৌড়িল, তাহা ধরিতে পারিবে বলিয়া দলনী কূলে কূলে দৌড়িল। কিন্তু বহুদূর দৌড়াইয়া নৌকা ধরিতে পারিল না। পূর্ব্বেই সন্ধ্যা হইয়াছিল—এক্ষণে অন্ধকার হইল। গঙ্গার উপরে আর কিছু দেখা যায় না—অন্ধকারে কেবল বর্ষার নববারি প্রবাহের কলকল ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। তখন হতাশ হইয়া দলনী, উন্মূলিত ক্ষুদ্র বৃক্ষের ন্যায়, বসিয়া পড়িল।

ক্ষণকাল পরে দলনী, আর গঙ্গাগর্ভ মধ্যে বসিয়া কোন ফল নাই বিবেচনা করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া, ধীরে ধীরে উপরে উঠিল। অন্ধকারে, উঠিবার পথ দেখা যায় না। দুই একবার পড়িয়া উঠিল। উঠিয়া ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে, চারিদিক্ চাহিয়া দেখিল। দেখিল, কোনদিগে কোন গ্রামের কোন চিহ্ন নাই—কেবল অনন্ত প্রান্তর, আর সেই কলনাদিনী নদী; মনুষ্যের ত কথাই নাই—কোনদিগে আলো দেখা যায় না—গ্রাম দেখা যায় না—বৃক্ষ দেখা যায় না—পথ দেখা যায় না—শৃগালকুক্কুর ভিন্ন কোন জন্তুও দেখা যায় না—কলনাদিনী নদী প্রবাহে নক্ষত্র নাচিতেছে দেখা যায়। দলনী মৃত্যু নিশ্চিত করিল।

সেইখানে, প্রান্তর মধ্যে, নদীর অনতিদূরে দলনী বসিল। নিকটে ঝিল্লী রব করিতে লাগিল—নিকটেই শৃগাল ডাকিতে লাগিল। রাত্রি ক্রমে গভীরা হইল—অন্ধকার ক্রমে ভীমতর হইল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে, দলনী মহা ভয় পাইয়া দেখিল, সেই প্রান্তর মধ্যে, এক দীর্ঘাকার পুরুষ একা বিচরণ করিতেছে। দীর্ঘাকৃত পুরুষ, বিনা বাক্যে দলনীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

আবার সেই। এই দীর্ঘাকৃত পুরুষ শৈবলিনীকে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে অন্ধকারে পর্ব্বতারোহণ করিয়াছিল।

কৈলাস শিখরে, নবমুকুলশোভিত দেবদারুতলায় শার্দ্দূল চর্ম্মাসনে বসিয়া হরপার্ব্বতী পাশা খেলিতেছিলেন। বাজি একটি স্বর্ণ গোলক। মহাদেবের খেলায় দোষ এই—আড়ি মারিতে পারেন না—তাহা পারিলে সমুদ্র মন্থনের সময়ে বিষের ভাগটা তাঁহার ঘাড়ে পড়িত না। গৌরী আড়ি মারিতে পটু,—প্রমাণ পৃথিবীতে তাঁহার তিন দিন পূজা। আর খেলায় যত হউক না হউক, কান্নাইয়ে অদ্বিতীয়া, কেননা তিনিই আদ্যাশক্তি। মহাদেবের ভাল দান পড়িলে কাঁদিয়া হাট বাধান—আপনার যদি পড়ে পাঁচ দুই সাত, তবে হাঁকেন পোহা বারো। হাঁকিয়া তিন চক্ষে মহাদেবের প্রতি কটাক্ষ করেন—যে কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হয়, তাহার গুণে মহাদেব দান দেখিয়াও দেখিতে পায়েন না। বলা বাহুল্য যে দেবাদিদেবের হার হইল। ইহাই রীতি।

তখন মহাদেব পার্ব্বতীকে স্বীকৃত কাঞ্চন গোলক প্রদান করিলেন। উমা তাহা গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। দেখিয়া, পঞ্চানন ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "আমার প্রদত্ত গোলক ত্যাগ করিলে কেন?"

উমা কহিলেন, "প্রভো! আপনার প্রদত্ত গোলক অবশ্য কোন অপূর্ব্ব শক্তিবিশিষ্ট এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে। মনুষ্যের হিতার্থে তাহা প্রেরণ করিয়াছি।"

গিরিশ বলিলেন, "ভদ্রে! প্রজাপতি, বিষ্ণু এবং আমি, এই তিন জনে যে সকল নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া সৃষ্টিস্থিতিলয় করিতেছি তাহার ব্যতিক্রমে কখন মঙ্গল হয় না। যে মঙ্গল হইবার, তাহা সেই সকল নিয়মাবলীর বলেই ঘটিবে। কাঞ্চন গোলকের কোন প্রয়োজন নাই। যদি ইহার কোন মঙ্গলপ্রদ গুণ হয়, তবে নিয়ম ভঙ্গ দোষে লোকের অনিষ্ট হইবে। তবে তোমার অনুরোধে উহাকে একটি বিশেষ গুণযুক্ত করিলাম। বসিয়া উহার কার্য্য দর্শন কর।

কালীকান্ত বসু বড় বাবু। বয়স বৎসর পঁইত্রিশ, দেখিতে সুন্দর পুরুষ, কয় বৎসর হইল পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী কামসুন্দরীর বয়ঃ-

ক্রম আঠার বৎসর। তাঁহার পত্নী তাহার পিতৃভবনে ছিল। কালীকান্ত বাবু স্ত্রীর সম্ভাষণে শ্বশুর বাড়ী যাইতেছিলেন। শ্বশুর বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তি—গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্রামে বাস। কালীকান্ত, ঘাটে নৌকা লাগাইয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন, সঙ্গে রামা চাকর একটা পোর্টমাণ্টো বহিয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে কালীকান্ত বাবু দেখিলেন একটি স্বর্ণ গোলক পড়িয়া আছে। বিস্মিত হইয়া তাহা উঠাইয়া লইলেন। দেখিলেন, সুবর্ণ বটে। প্রীত হইয়া তাহা ভৃত্য রামাকে রাখিতে দিলেন; বলিলেন, "এটা সোনার দেখিতেছি। কেহ হারাইয়া থাকিবে। যদি কেহ খোঁজ করে, বাহির করিয়া দিব। নহিলে বাড়ী লইয়া যাইব। এখন রাখ্।"

রামা বস্ত্রমধ্যে গোলকটি লুকাইয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে, পথে পোর্টমাণ্টো নামাইল। পরে কালীকান্ত বাবুর হস্ত হইতে গোলকটি গ্রহণ করিয়া বস্ত্রমধ্যে লুকাইল।

কিন্তু রামা আর পোর্টমাণ্টো মাথায় তুলিল না। কালীকান্ত বাবু স্বয়ং তাহা উঠাইয়া মাথায় করিলেন। রামা অগ্রসর হইয়া চলিল, বাবু মোট মাথায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তখন রামা বলিল, "ওরে, রামা।"

বাবু বলিলেন, "আজ্ঞা?" রামা বলিল, "তুই বড় বে-আদব, দেখিস্ যেন আমার শ্বশুর বাড়ী গিয়া বে-আদবি করিস্ না। তারা ভদ্রলোক।"

বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে তা কি পারি? আপনি হচ্ছেন মুনিব—আপনার কাছে কি বে-আদবি করিতে পারি।"

কৈলাসে গৌরী বলিলেন, "প্রভো, আমিত কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। আপনার স্বর্ণ গোলকের কি গুণ এ?"

মহাদেব বলিলেন, "গোলকের গুণ চিত্ত বিনিময়। আমি যদি নন্দীর হাতে এই গোলক দিই, তবে নন্দী ভাবিবে,আমি মহাদেব, আমাকে ভাবিবে নন্দী; আমি ভাবিব আমি নন্দী, নন্দীকে ভাবিব মহাদেব। রামা ভাবিতেছে, আমি কালীকান্ত বসু; কালীকান্তকে ভাবিতেছে, এ রামা চাকর। কালীকান্ত ভাবিতেছে, আমি রামা খানসামা, রামাকে ভাবিতেছে কালীকান্ত বাবু।"

কালীকান্ত বাবু যখন শ্বশুর বাড়ী পৌছিলেন, তখন তাঁহার শ্বশুর অন্তঃপুরে কিন্তু বাহিরে একটা গণ্ডগোল উঠিল। দ্বারবান্ রামদীন পাঁড়ে বলিতেছে, "আরে ও খানসামাজি, তোম্ হুঁয়া মৎ বইঠিও—তোম্ হামরা পাশ আও।" শুনিয়া রামা গরম হইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিতেছে, "যা বেটা মেড়ুয়াবাদী যা—তোর আপনার কাজ করগে।"

দ্বারবান পোর্টমাণ্টো নামাইয়া দিল। কালীকান্ত বলিল, "দরওয়ান জি, বাবুকে অমন করিয়া অপমান করিও না। উনি রাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।"

দ্বারবান্ জামাইবাবুকে চিনিত, খানসামাকে চিনিত না। কালীকান্তের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া, মনে করিল, যেখানে জামাই বাবুই ইহাকে বাবু বলিতেছেন, সেখানে ইনি কোন ছদ্মবেশী বড় লোক হইবেন। দ্বারবান্ তখন ভক্তি ভাবে রামাকে যুক্তকরে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, "গোলাম কি কসুর মাফ কি জিয়ে!" রামা কহিল, "আচ্ছা তামাকু ভেজ দেও!"

শ্বশুরবাড়ীর খানসামা উদ্ধব, অতি প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য। সেই বাঁধা হুঁকায় তামাকু সাজিয়া আনিল। রামা, তাকিয়ায় হেলান দিয়া, তামাকু খাইতে লাগিল। কালীকান্ত চাকরদের ঘরে গিয়া, কলিকায় তামাকু খাইতে লাগিল। উদ্ধব বিস্মিত হইয়া কহিল "দাদাঠাকুর এ কি এ?" কালিকান্ত কহিল, "ওঁর সাক্ষাতে কি তামাকু খাইতে পারি?"

উদ্ধব গিয়া অন্তঃপুরে কর্ত্তাকে সম্বাদ দিল, "জামাইবাবু আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে একজন কে ছদ্মবেশী মহাশয় এসেছেন—জামাইবাবু তাঁকে বড় মানেন, তাঁর সাক্ষাতে তামাকু পর্য্যন্ত খান না।"

কর্ত্তা নীলরতন বাবু শীঘ্র বহির্ব্বাটিতে আসিলেন। কালীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া দূর হইতে একটি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সরিয়া গেল। রামা আসিয়া নীল-রতনের পায়ের ধূলা লইয়া কোলাকুলি করিল। নীলরতন ভাবিল, "সঙ্গের লোকটা সভ্যভব্য বটে—তবে জামাই বাবাজিকে কেমন কেমন দেখিতেছি।"

নীলরতন বাবু রামাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতে বসিলেন, কিন্তু কথা বার্ত্তা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এদিগে অন্তঃপুর হইতে জলযোগের স্থান হইয়াছে বলিয়া পরিচারিকা কালীকান্তকে ডাকিতে আসিল। কালীকান্ত বলিল, "বাপরে আমি কি বাবুর আগে জল খেতে পারি। আগে বাবুকে জল খাওয়াও। তারপর আমার হবে এখন। আমি, মা ঠাকরুণ, আপনাদের খাচ্চিহত।"

"মাঠাকুরুণ" শুনিয়া পরিচারিকা মনে করিল, "জামাইবাবু আমাকে একজন শাশুড়ী টাশুড়ী মনে করিয়াছেন—না করবেন কেন, আমাকে ভাল মানুষের মেয়ে বইত আর ছোট লোকের মেয়ের মত দেখায় না। ওঁরা দশটা দেখেছেন—মানুষ চিনতে পারেন—কেবল এই বাড়ীর পোড়া লোকেই মানুষ চেনে না।" অতএব বিন্দী চাকরাণী জামাইবাবুর উপর বড় খুসি হইয়া গিয়া অন্তঃপুরে গিয়া বলিল, যে "জামাইবাবুর বিবেচনা ভাল—সঙ্গের মানুষটি না খেলে কি তিনি খেতে পারেন—তা আগে তাঁকে জল খাওয়াও তবে জামাই খাবেন।"

বাড়ীর গৃহিণী মনে ভাবিলেন, "সে উপরি লোক, তাহাকে বাড়ীর ভিতর

আনিয়া জল খাওয়ান হইতে পারে না। জামাইকেও বাহিরে খাওয়ান হইতে পারে না।• তা, তার জায়গা হউক, বাহিরে; আর জামাইয়ের জায়গা হউক, ভিতরে। গৃহিণী সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন।" রামা বাহিরে জলযোগের উদ্যোগ দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইল, ভাবিল "একি অলৌকিকতা!" এদিকে দাসী কালীকান্তকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল। ঘরের ভিতর স্থান হইয়াছে, কিন্তু কালীকান্ত উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমাকে ঘরের ভিতর কেন? আমাকে এইখানে হাতে দুটো ছোলা গুড় দাও, খেয়ে একটু জল খাই।" শুনিয়া শ্যালীরা বলিল, "বোসজা মশাই যে এবার অনেক রকম রসিকতা শিখে এয়েছ দেখ্‌তে পাই।" কালীকান্ত কাতর হইয়া বলিল, "আজ্ঞে আমাকে ঠাট্টা করেন কেন, আমি কি আপনাদের তামাসার যোগ্য?" একজন প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি বলিল, "আমাদের তামাসার যোগ্য কেন?—যার তামাসার যোগ্য তার কাছে চল।" এই বলিয়া কালীকান্তের হাত ধরিয়া হড়হড় করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া আসিল।

সেখানে কালীকান্তের ভার্য্যা কামসুন্দরী দাঁড়াইয়া ছিল; কালীকান্ত তাহাকে দেখিয়া প্রভুপত্নী মনে করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

কামসুন্দরী দেখিয়া, চন্দ্রবদনে মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "ওকি ও রঙ্গ—এ আবার কোন ঠাট্ শিখিয়া আসিয়াছ?" শুনিয়া কালীকান্ত কাতর হইয়া কহিল, "আজ্ঞে আমার সঙ্গে অমন সব কথা কেন—আমি আপনার চাকর—আপনি মুনিব।"

রসিকা কামসুন্দরী বলিল, "তুমি চাকর, আমি মুনিব, সে আজ না কাল? যতদিন আমার বয়স আছে ততদিন এই সম্পর্কই থাকিবে। এখন জল খাও।"

কালীকান্ত মনে করিল, "বাবা, এর কথার ভাব যে কেমন কেমন। আমাদের বাবু যে একটা গেছো মেয়ের হাতে পড়েছেন দেখ্‌তে পাই! তা, আমার সবাই ভাল।" এই ভাবিয়া কালীকান্ত পুনর্ব্বার ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, দেখিয়া কামসুন্দরী আসিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্র ধরিল, বলিল, "ওরে আমার সোণার চাঁদ! আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক! আমার কাছে থেকে আর পলাতে হয় না।" এই বলিয়া কামসুন্দরী স্বামীকে আসনের দিগে টানিতে লাগিল।

কালীকান্ত আন্তরিক কাতরতার সহিত হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "দোহাই বৌঠাকুরাণী, আপনার সাত দোহাই—আমাকে ছাড়িয়া দিন—আপনি আমার স্বভাব জানেন না—আমি সে চরিত্রের লোক নই।" কামসুন্দরী হাসিয়া বলিল, "তুমি যে চরিত্রের লোক আমি বেশ জানি—এখন জল খাও।"

কালীকান্ত বলিল, "যদি আপনার কাছে কেহ আমার এমন নিন্দা করিয়া

থাকে, তবে সে ঠক—ঠকাম করিয়াছে। আপনার কাছে হাতযোড় করিতেছি, আপনি আমার গুরুজন—আমায় ছাড়িয়া দিন।”

কামসুন্দরী রসিকতাপ্রিয়, মনে করিল, যে এ একতর নূতন রসিকতা বটে। বলিল, “প্রাণাধিক, তুমি কত রসিকতা শিখিয়া আসিয়াছ, তাঁহা বুঝা যাইবে।” এই বলিয়া স্বামীর দুই হস্ত ধারণ করিয়া আসনে বসাইবার জন্য টানিতে লাগিল।

হস্তধারণ মাত্র, কালীকান্ত সর্ব্বনাশ হইল মনে করিয়া “বাবারে, গেলামরে, এগোরে, আমায় মেরে ফেল্লেরে” বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। চীৎকার শুনিয়া গৃহস্থ সকলে ভীত হইয়া দৌড়াইয়া আইল। মা, ভগিনী, পিসী প্রভৃতিকে দেখিয়া, কামসুন্দরী স্বামীর হস্ত ছাড়িয়া দিল। কালীকান্ত অবসর পাইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

গৃহিণী কামসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি লা কামী—জামাই অমন করে উঠলো কেন? তুই কি মেরেছিস্?”

বিস্মিতা কামসুন্দরী মর্ম্মপীড়িতা হইয়া কহিল, “মারিব কেন। আমি মারিব কেন—আমার যেমন পোড়া কপাল!” ক্রমে ক্রমে সুর কাঁদনিতে চড়িতে লাগিল—“আমার যেমন পোড়া কপাল—কোন্ আবাগী আমার সর্ব্বনাশ করেছে—কে ওষুধ করিয়াছে—” বলিতে বলিতে কামসুন্দরী কাঁদিয়া হাট লাগাইল।

সকলেই বলিল, “হাঁ তুই মেরেছিস্ নহিলে অমন কোরে কাতরাবে কেন?” এই বলিয়া সকলে, কামকে “পাপিষ্ঠা” “ডাইনী” “রাক্ষসী”! ইত্যাদি কথায় ভৎর্সনা করিতে লাগিল। কামসুন্দরী বিনাপরাধে নিন্দিতা ও ভৎর্সিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গিয়া দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িল।

এদিগে কালীকান্ত বাহিরে আসিয়া দেখিল, যে বড় একটা গোলযোগ বাঁধিয়া উঠিয়াছে। নীলরতন বাবু স্বয়ং এবং দ্বারবান্ ও উদ্ধব সকলে পড়িয়া যে যেখানে পাইতেছে, সে সেইখানে রামাকে প্রহার করিতেছে; কিল, লাতি, চড়, চাপড়ের বৃষ্টির মধ্যে রামা চাকর কেবল বলিতেছে, “ছেড়েদেরে” বাবারে, জামাই মারে, এমন কখন শুনি নাই। আমার কি—তোদেরই মেয়েকে একাদশী কর্তে হবে।” নিকটে দাঁড়াইয়া তরঙ্গ চাকরাণী হাসিতেছে, সে সর্ব্বদা কালীকান্ত বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করিত, সে রামাচাকরকে চিনিত, সেই বলিয়া দিয়াছে। কালীকান্ত বাবু মারপিট দেখিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠানময় বেড়াইতে লাগিল, বলিতে লাগিল, “কি সর্ব্বনাশ হইল! বাবুকে মারিয়া ফেলিল।” ইহা দেখিয়া নীলরতন বাবু আরও কোপাবিষ্ট হইয়া রামাকে বলিতে লাগিলেন, “তুই বেটাই জামাইকে কি খাওয়াইয়া পাগল করিয়া দিয়াছিস্—মার বেটাকে জুতো” এই কথা বলায়, যেমন শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির উপর বৃষ্টি চাপিয়া আইসে, তেমনি নির্দ্দোষী রামার উপর

প্রহার বৃষ্টি চাপিয়া আসিল। মারপিটের চোটে বস্ত্রমধ্য হইতে লুকান স্বর্ণ গোলকটি পড়িয়া গেল। দেখিয়া তরঙ্গ চাকরাণী তাহা কুড়াইয়া লইয়া নীলরতন বাবুর হস্তে দিল। বলিল, "ওমিন্সে চোর! দেখুন ও একটা সোণার তাল চুরি করিয়া রাখিয়াছে।" "দেখি" বলিয়া নীলরতন বাবু স্বর্ণ গোলক হস্তে লইলেন,—অমনি তিনি রামাকে ছাড়িয়া দিয়া, সরিয়া দাঁড়াইয়া, কোঁচার কাপড় খুলিয়া মাথায় দিলেন; তরঙ্গ ও মাথার কাপড় খুলিয়া, কোঁচা করিয়া পরিয়া, পাদুকা হস্তে রামাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল।

উদ্ধব তরঙ্গকে বলিল, "তুই মাগি আবার এর ভিতর এলি কেন?"

তরঙ্গ বলিল, "কাকে মাগী বলিতেছিস্?" উদ্ধব বলিল, "তোকে।"

"আমাকে ঠাট্টা?" এই বলিয়া তরঙ্গ মহাক্রোধে হস্তের পাদুকার দ্বারা উদ্ধবকে প্রহার করিল। উদ্ধবও ক্রুদ্ধ হইয়া, স্ত্রীলোককে মারিতে না পারিয়া, নীলরতন বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখুন্ দেখি কর্ত্তা মহাশয়, মাগির কত বড় স্পর্দ্ধা, আমাকে জুতা মারে!" কর্ত্তা তখন, একটুখানি ঘোমটা টানিয়া একটু রসের হাসি হাসিয়া, মৃদুস্বরে কহিলেন, "তা মেরেছেন, মেরেছেন্, তুমি রাগ করিও না। মুনিব—মারতে পারেন।"

শুনিয়া উদ্ধব আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ও আবার কিসের মুনিব—ও ও চাকর, আমিও চাকর! আপনি এমনি আজ্ঞা করেন! আমি আপনারই চাকর, ওর চাকর কেন হব? আমি এমন চাকরি করি না।"

শুনিয়া কর্ত্তা আবার একটু মধুর হাসি হাসিয়া, বলিলেন, "মরণ আর কি, বুড়ো বয়সে মিন্সের রস দেখ? আমার চাকর—আবার তুমি কিসে হতে গেলে?"

উদ্ধব অবাক্ হইল, মনে করিল "আজ কি পাগলের পাড়া পড়িয়াছে নাকি?" উদ্ধব বিস্মিত হইয়া রামাকে ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

এমত সময়ে বাড়ীর গোরক্ষক গোবর্দ্ধন ঘোষ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তরঙ্গের স্বামী। সে তরঙ্গের অবস্থা ও কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইল—তরঙ্গ তাহাকে গ্রাহ্যও করিল না। এদিগে কর্ত্তামহাশয় গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া এক পাশে দাঁড়াইলেন। গোবর্দ্ধনকে আড়ে আড়ে দেখিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "তুমি উহার ভিতর যাইও না।" গোবর্দ্ধন তরঙ্গের আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল—সে কথা তাহার কাণে গেল না; সে তরঙ্গের চুল ধরিতে গেল। "নচ্ছার মাগি, তোর হায়া নেই" এই বলিয়া গোবর্দ্ধন অগ্রসর হইতেছিল, দেখিয়া, তরঙ্গ বলিল, "গোবরা তুইও কি পাগল হইয়াছিস্ না কি? যা গোরুর জাব দিগে যা।" শুনিয়া গোবর্দ্ধন, তরঙ্গের কেশাকর্ষণ করিয়া উত্তম মধ্যম আরম্ভ করিল। দেখিয়া নীলরতন বাবু বলিলেন, "যা! পোড়া কপালে মিন্সে কর্ত্তাকে

ঠেঙ্গিয়া খুন কর্‌লে।" এদিগে তরঙ্গও ক্রুদ্ধ হইয়া, "আমার গায়ে হাত তুলিস" বলিয়া গোবর্দ্ধনকে মারিতে আরম্ভ করিল। তখন একটা বড় গোলযোগ হইয়া উঠিল।

শুনিয়া পাড়ার প্রতিবাসী রাম মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাম মুখোপাধ্যায় একটা সুবর্ণ গোলক পড়িয়া আছে দেখিয়া গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি মহাশয় এটা কি?"

কৈলাসে পার্ব্বতী বলিলেন, "প্রভো! আপনার গোলক সম্বরণ করুন—ঐ দেখুন! গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রামের বৃদ্ধা ভার্য্যাকে পত্নী সম্বোধনে কৌতুক করিতেছে। আর রাম মুখোপাধ্যায়ের পরিচারিকা, তাহার আচরণ দেখিয়া তাহাকে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিতেছে। এদিগে বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়, আপনাকে যুবা গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মনে করিয়া, তাহার অন্তঃপুরে গিয়া তাহার ভার্য্যাকে টপ্পা শুনাইতেছে। এ গোলক আর মুহূর্ত্তকাল পৃথিবীতে থাকিলে গৃহে গৃহে বিশৃঙ্খলা হইবে। অতএব আপনি ইহা সম্বরণ করুন।"

মহাদেব বলিলেন, "হে শৈলসুতে! আমার গোলকের অপরাধ কি? এ কাণ্ড কি আজ নূতন পৃথিবীতে হইল? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে; প্রভু ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভু হইয়া বসিতেছে। কবে না দেখিতেছ যে পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে? এ সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা যে কি প্রকার হাস্যজনক, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। আমি তাহা একবার সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম। এক্ষণে গোলক সম্বৃত করিলাম। আমার ইচ্ছায় সকলেই পুনর্ব্বার স্ব স্ব প্রকৃতিস্থ হইবে এবং যাহা যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা কাহারও স্মরণ থাকিবে না। তবে, লোক হিতার্থে আমার বরে বঙ্গদর্শন এই কথা পৃথিবী মধ্যে প্রচারিত করিবে।
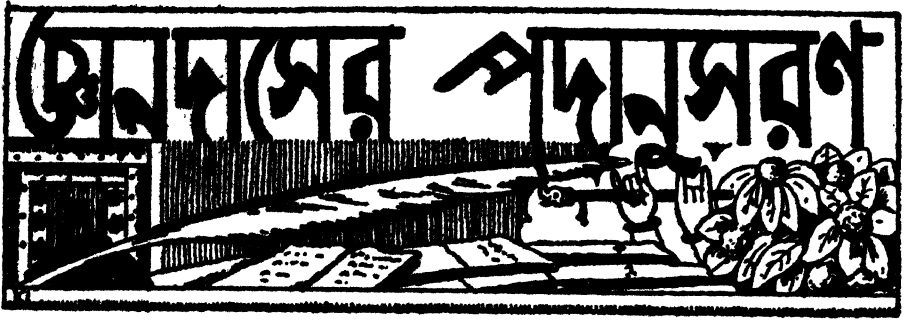
তমালের তলে, করেতে মুরলী,
রসিয়া নাগর বসিয়া কে।
মধুর অধরে, মধুর হাসনি,
নবীন নীরদ জিনিয়া দে ॥১

মুখ সে চাঁদনি, দিক পরকাশে,
নয়নের কোণে বিজুলি খেলে।
চাহনি কুটিল, মরম ভেদিল,
মন প্রাণ মোর হরিল হেলে ॥২

ময়ূরের পাখা, কুটিল কুন্তলে,
পীতবাস পরা ত্রিভঙ্গ কায়।
গলে দোলে তার, বনফুল হার,
সৌরভ সমীর বহিয়া ধায় ॥৩

পরিমল আশে, আকুল হইয়ে,
ভ্রমর ভ্রমরী গুণ-গুণায়।
মধুমাস ব্রজে, বঞ্জুল মঞ্জুলে,
মধুসখা তাহে দিতেছে সায় ॥৪

সে রস হেরিয়ে, যে রস সাগর,
উথলিল সই হৃদয়ে মোর।
কুলমান ভয়, সকলি ভাসিল,
তাহারি তরঙ্গ তুফানে জোর ॥৫

সেরূপ সাগরে, নয়ন ডুবিল,
ফাঁফর হইনু পীরিতি ফাঁদে।
যত হেরি তায়, ততই বাড়িল,
বাসনা হেরিতে সে মুখ চাঁদে ॥৬

কিবা অপরূপ, হেরিনু সেরূপ
রয়েছে লো সই মরমে আঁকা।
নয়ন মুদিলে, এখন নেহারি
বনমালা বাঁশী ময়ূর পাখা ॥৭

তাহার অঙ্গের, বাতাস যখন,
অঙ্গেতে আমার লাগিল সই।
কত যে কি সাধ, উঠিল হিয়ায়
কত যে কি সাধ কেমনে কই ॥৮

তারে মনে মনে, ঋতুরাজ স্বজি,
এ দেহ কানন সপিনু তায়।
আনন্দ সলিলে, ভাসিনু সজনি,
পীরিতি পুলকে পুরিল কায় ॥৯

রঞ্জ।

সপ্তম সংখ্যা

বসন্তের কোকিল

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক, চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কোলো নন্দছুলালি ধরণের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও।

রাগ করিও না—তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেকে আছেন—বুঝি পনের আনা উনিশ গণ্ডা। যখন নশী বাবুর তালুকের খাজানা আসে, তখন মানুষ কোকিলে তাঁহার গৃহ কুঞ্জ পূরিয়া যায়—কত টিকি, ফোঁটা, তেড়ি চসমার হাট লাগিয়া যায়,—কত কবিতা, শ্লোক, গীত, হেটো ইংরেজি, মেটো ইংরেজি, চোরা ইংরেজি, ছেঁড়া ইংরেজিতে, নশী বাবুর বৈঠকখানা পারাবত কাকলিসঙ্কুল গৃহ-সৌধবৎ বিকৃত হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বাড়ীতে নাচ, গান, যাত্রা, পর্ব্ব উপস্থিত হয়, তখন দলে দলে মানুষ কোকিল আসিয়া, তাঁহার ঘর বাড়ী আঁধার করিয়া তুলে—কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাশে; কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়। যখন নশী বাবু বাগানে যান, তখন মানুষ কোকিল, তাঁহার সঙ্গে পিপীড়ার সারি দেয়। আর যে রাত্রে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নশী বাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও "অসুখ" এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও বড় সুখ—একটি নাতি হইয়াছে, এজন্য আসিতে পারিলেন না, কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কেহ

সমস্ত রাত্রি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, এজন্য আসিতে পারিলেন না। আসল কথা, সে দিন বর্ষা, বসন্ত নহে—বসন্তের কোকিল সেদিন আসিবে কেন?

তা ভাই, বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাক। ঐ অশোকের ডালে বসিয়া, রাঙ্গা ফুলের রাশির মধ্যে কাল শরীর, জ্বলন্ত আগুণের মধ্যগত কালো বেগুনের মত, লুকাইয়া রাখিয়া, একবার তোমার ঐ পঞ্চম স্বরে, কু—উ বলিয়া ডাক। তোমার ঐ কু—উ রবটি আমি বড় ভালবাসি। তুমি নিজে কালো—পরান্ন প্রতিপালিত, তোমার চক্ষে সকলই "কু"—তবে যতপার, ঐ পঞ্চম স্বরে ডাকিয়া বল "কু—উ!" যখন এ পৃথিবীতলে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে, যে তাহাতে তোমার—দ্বেষ, হিংসা ঈর্ষ্যার উদয় হয়, তখনই সম্বাদ পত্রের ন্যায় উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও, "কু—উঃ"—কেননা তুমি সৌন্দর্য্য শূন্য, পরান্ন প্রতিপালিত। যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া, উপর্য্যপরি বিন্যস্ত পুষ্প স্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল—তখনই ডাকিয়া বলিও "কু—উঃ।" যখনই দেখিবে, অসংখ্য গন্ধরাজ এককালে ফুটিয়া আপনাদিগের গন্ধে আপনারা বিভোর হইয়া, এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, তখনই তোমার সেই ডাল হইতে ডাকিয়া বলিও, "কু—উঃ।" যখন দেখিবে বকুলের অতি ঘন বিন্যস্ত মধুরশ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পত্র রাশির শোভা আর গাছে ধরে না—পূর্ণযৌবন সুন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, ভাঙ্গিয়া গলিয়া, উছলিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে—তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ শীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুলকুঞ্জ হইতে ডাকিও, এ "কু—উঃ।" যখন দেখিবে শুভ্রমুখী, শুদ্ধ শরীরা, সুন্দরী নবমল্লিকা সন্ধ্যা শিশিরে সিক্ত হইয়া, আলোক প্রাখর্য্যের হ্রাস দেখিয়া, ধীরে ধীরে মুখ খানি খুলিতে সাহস করিতেছে—স্তরে স্তরে অসংখ্য অকলঙ্ক দলরাজি বিকশিত করিবার উপক্রম করিতেছে—যখন দেখিবে যে ভ্রমর সে রূপ দেখিয়া—"আদরেতে আগুসারি"—কণ্ঠভরা গুণগুণ মধু ঢালিয়া দিতেছে—তখন, হে কালামুখ! আবার "কু-উঃ" বলিয়া ডাকিয়া মনের জ্বালা মারিও। আর যখনই গৃহস্থের গৃহ প্রাঙ্গনস্থ দাড়িম্ব শাখায় বসিয়া, দেখিবে সেই গৃহ পুষ্পরূপিনী কন্যাগণে, সেই লতার দোলনি, সে গন্ধরাজের প্রস্ফুটতা, সেই বকুলের রূপোচ্ছাস, সেই মল্লিকার অমলতা, একাধারে মিলিত করিয়াছে, তখনই তাহাদের মুখের উপর, ঐ পঞ্চমস্বরে, গৃহ প্রাচীর প্রতিধ্বনিত করিয়া, সবাইকে ডাকিয়া বলিও, এতরূপ, এত সুখ, এত পবিত্রতা—এ "কুউঃ!" ঐটি তোমার জিত—ঐ পঞ্চম স্বর—নহিলে তোমার ও কুউ কেহ শুনিত না। এ পৃথিবীতে গ্লাডষ্টোন, ডিস্রেলি প্রভৃতির ন্যায়,—তুমি কেবল গলা বাজিতে জিতিয়া গেলে—

নহিলে অত কালো চলিত না ; তোমার চেয়ে হাঁড়িচাঁচা ভাল। গলাবাজির এত গুণ না থাকিলে, যিনি "Juventus mundi" লিখিয়া লোক হাসাইয়েন, তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন ? আর জন ষ্টুয়ার্ট মিল পার্লিমেণ্টে স্থান পাইলেন না কেন ?

তবে, কোকিল, তুমি প্রকৃতির মহাপার্লিমেণ্টে দাঁড়াইয়া; নক্ষত্রময় নীলচন্দ্রাতপমণ্ডিত, গিরিনদী নগর কুঞ্জাদি বেঞ্চে সুসজ্জিত, ঐ মহাসভা গৃহে, তোমার এ মধুর পঞ্চম স্বরে কু-উঃ বলিয়া ডাক—সিংহাসন হইতে হষ্টিংস পর্য্যন্ত সকলেই কাঁপিয়া উঠুক। "কু—উঃ !" ভাল, তাই ; ও কলকণ্ঠে কু বলিলে কু মানিব, সু বলিলে সু মানিব। কু বৈকি ? সব কু। লতায় কণ্টক আছে, কুসুমে কীট আছে, গন্ধে বিষ আছে, পত্র শুষ্ক হয়, রূপ বিকৃত হয়, স্ত্রী জাতি বঞ্চনা জানে। কু উঃ বটে—তুমি গাও। কিন্তু তুমি ঐ পঞ্চম স্বরে কু বলিলেই কু মানিব—নচেৎ কু-কুড়ো বাবাজি "কু কু কু কু" বলিয়া আমার সুখের প্রভাত নিদ্রাকে কু বলিলে আমি মানিব না। তার গলা নাই। গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চেঁচাইলে হয় না ; যদি শব্দ মন্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে—যে পরদা বা কড়ি মধ্যমের কাজ নয়। সর জেম্‌স মাকিণ্টশ, তাঁহার বক্তৃতায় ফিলজফির * কড়িমধ্যম মিশাইয়া হারিয়া গেলেন—আর মেকলে রেটরিকের † পঞ্চম লাগাইয়া জিতিয়া গেলেন। ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন—কবিকঙ্কনের ষড্‌জ ধ্বনি কে শুনে ? দেখ তোমার বৃদ্ধ পিতা মাতার বেসুরো বকাবকিতে কোন ফল দর্শে ? আর যখন তোমার গৃহিণী তোমার সুর বাঁধিয়া দিবার জন্য তোমার কাণ টিপিয়া ধরিয়া পঞ্চমে গলার আওয়াজ দেন, তখন তুমি, পিড়িং পিড়িং বল, কি না ?

তবে তোমার স্বরকে পঞ্চম স্বর কেন বলে, তাহা বুঝি না। যাহা মিষ্ট, তাহাই পঞ্চম ? দুইটি পঞ্চম মিষ্ট বটে,—সুরের পঞ্চম, আর আল্‌তাপরা ছোট পায়ের গুজ্‌রী পঞ্চম। তবে, সুর, পঞ্চমে উঠিলেই মিষ্ট ; পায়ের পঞ্চম, পা হইতে নামাইলেই মিষ্ট। তবে যদি কেহ কষ্টে বউয়ের লাতি খাইয়া থাকেন, তিনি বলিলে বলিতে পারেন, পায়ের পঞ্চম ভর্ত্তার মাথা পর্য্যন্ত উঠিলেও মিষ্ট।

কোন্ স্বর পঞ্চম, কোন্ স্বর সপ্তম, কে মধ্যম, কে গান্ধার, আমাকে কে বুঝাইয়া দিবে ? এটি হাতীর ডাক, ওটি ঘোড়ার ডাক, সেটি ময়ূরের কেকা, ওটি বানরের কিচিমিচি, এ বলিলে ত কিছু বুঝিতে পারি না। আমি আফিংখোর—বেসুরো শুনি, বেসুরো বুঝি, বেসুরো লিখি—ধৈবত গান্ধার নিষাদ, পঞ্চমের কি ধার ধারি ? যদি কেহ পাখোয়াজ তানপুরা দাড়ী দাঁত লইয়া, আমাকে সপ্ত সুর

* দর্শন।

† অলঙ্কার।

বুঝাইতে আসে, তবে তাহার গর্জ্জন শুনিয়া, মঙ্গলা গাইয়ের সদ্যপ্রসূত বৎসের ধ্বনি আমার মনে পড়ে—তাহার পীতাবশিষ্ট নির্জ্জল দুগ্ধের অনুধ্যান মন ব্যস্ত হয়—সুর বুঝা হয় না। আমি গায়কের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, যেন তিনি জন্মান্তরে মঙ্গলার বৎস হন।

আমারও এক প্রকার সুর বোধ আছে—কিন্তু আমার সারিগম তোমাদের সঙ্গে মিলে না। আমিও পৃথিবীতে সাতখানা সুর শুনি,—কিন্তু ধৈবত, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি নাম ব্যবহার করি না এবং হস্তী, বৃষ, পশু, পক্ষীগণ আমার সারিগমে স্থান পায় না। আমার সারিগমের প্রথম সুর, ব্যাঘ্র গর্জ্জনবৎ—তাহার নাম হুঙ্কার—বলবানেই তাহা গাইয়া থাকে। নাপোলেয়ন বোনাপার্টি নামে প্রসিদ্ধ গায়ক, এই সুরে সিদ্ধ ছিলেন। কুক্কুরের ধ্বনির ন্যায় যে স্বর, সেই আমার ঋষভ স্বর; তাহার নাম তেরি মেরি ঘেউ ঘেউ, বিবাদ প্রিয় পরদ্বেষী লোকেরাই এই সুর গাইয়া থাকেন; এই সুর গালিগালাজ নামক আধুনিক টপ্পার জান। পেচকের ন্যায় মৃদুগম্ভীর যে স্বর, সেই আমার গান্ধার; তাহার নাম শুধু "হুঁ।" পাণ্ডিত্যাভিমানী বিজ্ঞতাপ্রিয় লোকেরাই এ সুরে গাইয়া থাকেন। বড় লোকের সঙ্গে এই সুরে গান জমাইতে পারিলে, বিশেষ ইষ্টসিদ্ধি আছে। বানরের সুমধুর স্বরের ন্যায় যে সুস্বর, তাহাই আমার মধ্যম, তাহার নাম কিচিমিচি। দুই চারি জন বঙ্গীয়লেখক বেসুরো আছেন; তদ্ভিন্ন আমরা আর সকলেই এই সুরে অতি সুনিপুণ। তুমি, বিহঙ্গরাজ কোকিল! তুমিও আমার সারিগমে বাদ নাই; তোমার পঞ্চম ছাড়া যে সারিগম, সে সারিগমই নয়; অতএব তুমি আমার পঞ্চমেই থাক। যতদিন এ সংসারে কামিনী কলকণ্ঠে প্রণয় সম্ভাষণ থাকিবে, ততদিন সে সুরের উপমা, তোমার কণ্ঠে ভিন্ন আর কিছুতে পাইব না। আমার ধৈবতের নাম "দেহি দেহি"—ভোক্তার পাতের কাছে, অল্পদূরে যে ধীর স্বভাব বিড়াল শান্তভাবে বসিয়া থাকে, এই ধৈবত তাহারি "মেও মেও" শব্দের ন্যায়। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীরা অনবরত এই সুর সাধিতেছেন—প্রায় সিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ছাগরবের ন্যায় যে স্বর, সে আমার নিষাদ; ইহার নাম রোদন। স্ত্রীলোকের ইহাতে বিশেষ অধিকার। গর্দ্দভী দেখিলে গর্দ্দভ সে স্বরে প্রচার করেন, সেই আমার সপ্তম; এই সুরের নাম আদিরস।

এখন আয় পাখি! তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই। তুইও যে আমিও সে—সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী। তুই এই পুষ্পকাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে আপনার আনন্দে গাইয়া বেড়াস্—আমিও এই সংসারকাননে, গৃহে গৃহে, আপনার আনন্দে এই দপ্তর লিখিয়া বেড়াই—আয় ভাই, তোতে আমাতে মিলে মিশে পঞ্চম

গাই। তোরও কেহ নাই—আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই—আনন্দ আছে; তোর পুঁজিপাটা, ঐ গলা; আমার পুঁজিপাটা, এই আফিঙ্গের ডেলা; তুই এ সংসারে পঞ্চমস্বর ভাল বাসিস্—আমিও তাই; তুই পঞ্চমস্বরে কারে ডাকিস্? আমিই বা কারে? বল্‌দেখি পাখি কারে?

যে সুন্দর, তাকেই ডাকি; যে ভাল, তাকেই ডাকি; যে আমার ডাক শুনে, তারেই ডাকি। এই যে আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। যদি এই অনন্ত সুন্দর জগৎ শরীরে কেহ আত্মা থাকেন, তবে তাঁহাকে ডাকি। আমিও ডাকি, তুইও ডাকিস্। জানিয়া ডাকি না জানিয়া ডাকি, সমান কথা; তুইও কিছু জানিস্ না, আমিও জানি না; তোরও ডাক পৌছিবে, আমারও ডাক পৌঁছিবে। যদি সর্ব্বশব্দগ্রাহী কোন কর্ণ থাকে, তবে তোর আমার ডাক পৌঁছিবে না কেন? আয় ভাই, একবার মিলে মিশে দুইজনে পঞ্চমস্বরে ডাকি।

তবে, কুহুরবে সাধা গলায়, কোকিল, একবার ডাক্ দেখিরে! কণ্ঠ নাই বলিয়া, আমার মনের কথা কখন বলিতে পাইলাম না। যদি তোর ও ভুবন ভুলাম স্বর পাইতাম, ত বলিতাম। তুই আমার সেই মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া এই পুষ্পময় কুঞ্জবনে একবার ডাক্ দেখিরে! কি কথাটি বলিব বলিব মনে করি, বলিতে জানি না, সেই কথাটি, বল্‌দেখিরে! কমলাকান্তের মনের কথা, এজন্মে বলা হইল না—যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই—অমানুষী ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি। ঐ নীলাম্বর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঐ নক্ষত্রমণ্ডলী মধ্যে উড়িয়া, কখন কি কুহু বলিয়া ডাকিতে পাইব না? আমি না পাই, তুই কোকিল, আমার হয়ে একবার ডাক দেখিরে!

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।
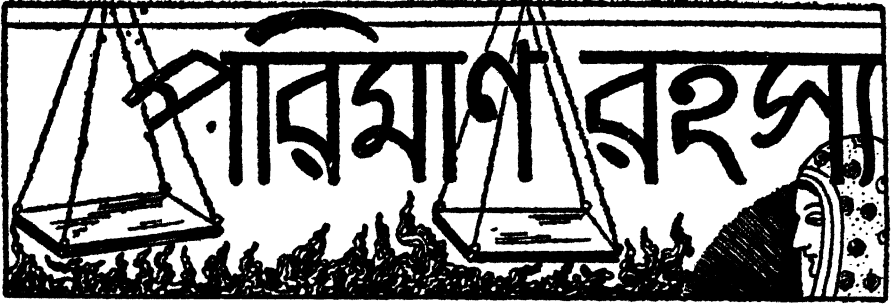
আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা চক্ষুর উপর বিশ্বাস অধিক। কিছুতে যাহা বিশ্বাস না করি, চক্ষে দেখিলেই তাহাতে বিশ্বাস হয়। অথচ চক্ষের ন্যায় প্রবঞ্চক কেহ নহে। যে সূর্য্যের পরিমাণ লক্ষ লক্ষ যোজনে হয় না, তাহাকে একখানি স্বর্ণ থালির মত দেখি। প্রকাণ্ড বিশ্বকে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখি। যে চন্দ্রের দূরতা সূর্য্যের দূরতার চারি শত ভাগের এক ভাগ ও নহে, তাহা সূর্য্যের সমদূর-বর্ত্তী দেখায়। যে পরমাণুতে এই জগৎ নির্ম্মিত তাহার একটিও দেখিতে পাই না। আনুবীক্ষণিক জীব জৈবনিকাদি কিছুই দেখিতে পাই না। এই অবিশ্বাসযোগ্য চক্ষুকেই আমাদের বিশ্বাস—তবে যে চাণক্য পণ্ডিতের উপদেশ সত্ত্বেও লোকে নারীগণকে বিশ্বাস করিবে, আশ্চর্য্য কি ?

দর্শনেন্দ্রিয়ের 'এইরূপ শক্তিহীনতার গতিকে আমরা জগতের পরিমাণ বৈচিত্র কিছুই বুঝিতে পারিনা। জ্যোতিষ্কাদি অতি বৃহৎ পদার্থকে ক্ষুদ্র দেখি এবং অতি ক্ষুদ্র পদার্থ সকলকে একেবারে দেখিতে পাই না। ভাগ্যক্রমে, মন বাহেন্দ্রিয়পেক্ষা দূরদর্শী ; বিজ্ঞানে অদর্শনীয় ও তদ্দারা পরিমাণও মিত হইয়াছে। সে পরিমাণ অতি বিস্ময়কর। দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

"সকলে জানেন যে পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল। যদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ এক মাইল প্রস্থ, এমত খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে উনিশ কোটি ছয়ষট্টি লক্ষ ছাব্বিশ হাজার এইরূপ বর্গ মাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রস্থে এবং এক মাইল উর্দ্ধে এরূপ ২৫৯,৮০০,০০০,০০০ ঘন মাইল পাওয়া যায়। ওজনে পৃথিবী যতটন হইয়াছে, তাহা নিম্নে অঙ্কের দ্বারা লিখিলাম ৬,০৬৯,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০। এক টন সাতাইশ মনের অধিক।" *

* বঙ্গদর্শন ১খণ্ড ১০০ পৃ।

এই আকার কি ভয়ানক, তাহা মনে কল্পনা করা যায় না। সমগ্র হিমালয় পর্ব্বত ইহার নিকট বালুকা কণার অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। কিন্তু এই প্রকাণ্ড পৃথিবী সূর্য্যের আকারের সহিত তুলনায়, বালুকা মাত্র। চন্দ্র একটি প্রকাণ্ড উপগ্রহ, উহা পৃথিবী হইতে ২৪০,০০০ দূরে অবস্থিত। সূর্য্য এ প্রকার প্রকাণ্ড পদার্থ, যে তাহা অন্তঃ শূন্য করিয়া পৃথিবীকে চন্দ্র সমেত তাহার মধ্যস্থলে স্থাপিত করিলে, চন্দ্র এখন যেরূপ দূরে থাকিয়া পৃথিবীর পার্শ্বে বর্ত্তন করে, সূর্য্যগর্ভেও সেইরূপ করিতে পারে এবং চন্দ্রের বর্ত্তন পথ ছাড়াও এক লক্ষ ষাট হাজার মাইল বেশী থাকে।

সূর্য্যর দূরতা কত মাইল, তাহা বালকেও জানে, কিন্তু সেই দূরতা অনুভূত করিবার জন্য, নিম্ন লিখিত গণনা উদ্ধৃত করিলাম।

"অস্মদাদির দেশে রেইলওয়ে ট্রেন ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যদি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত রেইলওয়ে হইত তবে কত কালে সূর্য্যলোকে যাইতে পারিতাম? উত্তর—যদি দিন রাত্রি, ট্রেন অবিরত ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, তবে ৫২০ বৎসর ৬ মাস ১৬ দিনে সূর্য্যালোকে পৌঁছান যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ট্রেনে চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ ঐ ট্রেনেই গত হইবে।"+

আর বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহ সকলের দূরতার সহিত তুলনায় এ দূরতাও সামান্য। বুবীর গণনা করিয়া বলিয়াছেন, যে রেইল যদি ঘণ্টায় ৩৩ মাইল চলে, তবে সূর্য্যলোক হইতে কেহ রেইলে যাত্রা করিলে, দিন রাত্র চলিয়া বৃহস্পতি গ্রহে ১৭১২ বৎসরে, শনিগ্রহে ৩১১৩ বৎসরে, উরেনসে ৬২২৬ বৎসরে, নেপ্‌চ্যুনে ৯৬৮৫ বৎসরে পেঁছিবে।

আবার এ দূরতা নক্ষত্রসূর্য্যগণের দূরতার তুলনায় কেশের পরিমাণ মাত্র। সকল নক্ষত্রের অপেক্ষা আল্‌ফা সেন্টরাই আমাদিগের নিকটবর্ত্তী; তাহার দূরতা ৬১ সিগনাই নামক নক্ষত্রের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ। এই দ্বিতীয় নক্ষত্রের দূরতা ৬৩,৬৫০,০০০,০০০,০০০ মাইল। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৯২,০০০ মাইল। সেই আলোক ঐ নক্ষত্র হইতে আসিতে দশ বৎসরের অধিক কাল লাগে। বেগা নামক নক্ষত্রের দূরতা ১৩০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০ মাইল; আলোক সেখান হইতে ২১ বৎসরে পৃথিবীতে পৌঁছে। ২১ বৎসর পূর্ব্বে ঐ নক্ষত্রের যে অবস্থা ছিল তাহা আমরা দেখিতেছি— উহার অদ্যকার অবস্থা আমাদিগের জানিবার সাধ্য নাই।

আবার নীহারিকাগণের দূরতার সঙ্গে তুলনায়, এ সকল নক্ষত্রের দূরতা সূত্র পরিমিত বোধ হয়। বীনা (Lyra) নামক নক্ষত্র সমষ্টির বিটা ও গামা নক্ষত্রের

+ ঐ ১০১ পৃ।

মধ্যবর্ত্তী অঙ্গুরীয়বৎ নীহারিকার দূরতা, সর উইলিয়ম হর্শেলের গণনানুসারে সিরিয়সের দূরতার ৯৫০ গুণ। ঐ বিটা নক্ষত্রের দক্ষিণ পূর্ব্বস্থিত গোলাকৃত নীহারিকা, ঐ মহাত্মার গননানুসারে সৌরজগৎ হইতে ১, ৩০০, ০০০,০০০, ০০০, ০০০ মাইল। ত্রিকোণ নামক নক্ষত্র সমষ্টি স্থিত এক নীহারিকা, সিরিয়সের দূরতার ৩৪৪ গুণ দূরে অবস্থিত; এবং সুবৈস্কির ঢাল নামক নক্ষত্র সমষ্টিতে ঘোড়ার নালের আকার যে এক নীহারিকা আছে, তাহার দূরতা উক্ত ভীষণ মানদণ্ডের নয়শত গুণ অর্থাৎ ৫০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০ মাইলের কিছু ন্যূন।

পাদরি ডাক্তার স্কোরেস্‌বি বলেন যে যদি আমাদিগের সূর্য্যকে এত দূরে লইয়া যাওয়া যায়, যে তথা হইতে পঁচিশ হাজার বৎসরে উহার আলোক আমাদিগের চক্ষে আসিবে, উহা তথাপি লর্ড রসের বৃহৎ দূরবীক্ষণে দৃশ্য হইতে পারে। যদি তাহা সত্য হয় তবে, যে সকল নীহারিকা হইতে সহস্র সহস্র প্রচণ্ড সূর্য্যের রশ্মি একত্রিত হইয়া আসিলেও, নীহারিকাকে ঐ দূরবীক্ষণে ধূমরেখা মাত্রবৎ দেখা যায়, না জানি যে কত কোটি বৎসরে আলোক তথা হইতে আসিয়া আমাদিগের নয়নে লাগে। অথচ আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৯২০০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধির অষ্টগুণ, যায়।

পণ্টন সাহেব জানিয়াছেন, যে রৌদ্রের আলোক, মডরেটর দীপের অপেক্ষা ৪৪৪ গুণ তীব্র। যদি কোন সামগ্রীর দুই ইঞ্চি দূরে ১৬০টা মমবাতী রাখা যায়, তবে তাহাতে যে আলো পড়ে সে রৌদ্রের মত উজ্জ্বল হয়। গণিত হইয়াছে যে, যদি সূর্য্য রশ্মি বিশিষ্টপদার্থ না হইত, তবে তাহাকে মমবাতীর সাতকোটি বিশলক্ষ স্তরে আবৃত করিলে, অর্থাৎ নয় মাইল উচ্চ করিয়া বাতীতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া, সকল বাতী জ্বালিয়া দিলে রৌদ্রের ন্যায় আলো পৃথিবীতে পাওয়া যাইত। কি ভয়ঙ্কর তাপাধার! সিনসিনেটির ডাক্তার ভন স্থির করিয়াছেন, যে এক ফুট দূরে ১৪০০০ বাতী রাখিলে যে তাপ পাওয়া যায় রৌদ্রের সেই তাপ। আর সূর্য্য আমাদিগের নিকট হইতে যতদূর আছে, ততদূরে থাকিলে ৩৫০০, ০০০০০০, ০০০০০০, ০০০০০০, ০০০০০০, সংখ্যক বাতী এক কালীন না পোড়াইলে রৌদ্রের ন্যায় তাপ হয় না। এ কথার অর্থ এই হইতেছে যে, প্রত্যহ পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ দুইশত বাতীর গোলক পোড়াইলে যে তাপ সম্ভূত হয়, সূর্য্যদেব একদিনে তত তাপ খরচ করেন। তাঁহার তাপ যেরূপ খরচ হয়, সেইরূপ নিত্য নিত্য উৎপন্ন হইয়া জমা হইয়া থাকে। তাহা না হইলে এই মহা তাপক্ষয়ে সূর্য্যও অল্পকালে অবশ্য তাপ শূন্য হইত। কথিত হইয়াছে যে সূর্য্য দহ্যমান হইলে এই তাপ ব্যয় করিতে দশ বৎসরে আপনি দগ্ধ হইয়া যাইত।

মস্যুর পুইলা গণনা করিয়াছেন, যে সতের মাইল উচ্চ কয়লার খনি

পোড়াইলে যে তাপ জন্মে, এক বৎসরে সূর্য্য তত তাপ ব্যয় করেন'। যদি সূর্য্যের তাপবাহীতা জলের ন্যায় হয়, তবে বৎসরে ২'৬ ডিগ্রী সূর্য্যের তাপ কমিবে। কুঞ্চন ক্রিয়াতে তাপ সৃষ্টি হয়। সূর্য্যের ব্যাস তাহার দশ সহস্রাংশের একাংশ কমিলেই, দুই সহস্র বৎসরে ব্যয়িত তাপ সূর্য্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।

সূর্য্যের তাপশালিতার যে ভয়ানক পরিমাণ লিখিত হইল, স্থিরনক্ষত্রমধ্যে অনেক গুলিন তদপেক্ষা তাপশালী বোধ হয়। সে সকলের তাপ পরিমিত হইবার উপায় নাই, কেননা তাহার রৌদ্র পৃথিবীতে আসে না, কিন্তু তাহার আলোক পরিমিত হইতে পারে। কোন কোন নক্ষত্রের প্রভাশালিতা পরিমিত হইয়াছে। আলফা সেণ্টরাই নামক নক্ষত্রের প্রভাশালিতা সূর্য্যের ২'৩২ গুণ। বেগা নক্ষত্র ষোড়শ সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট এবং নক্ষত্ররাজ সিরিয়স দুইশত পঞ্চবিংশতি সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট। এই নক্ষত্র আমাদিগের সৌরজগতের মধ্যবর্ত্তী হইলে পৃথিব্যাদি গ্রহ সকল অল্পকাল মধ্যে বাষ্প হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইত।

এই সকল নক্ষত্রের সংখ্যা অতি ভয়ানক। সর উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে কেবল ছায়াপথে ১৮, ০০০, ০০০ নক্ষত্র আছে। স্ত্রুব বলেন আকাশে দুইকোটি নক্ষত্র আছে। মস্যূর শাকর্নাক বলেন, নক্ষত্র সংখ্যা সাত কোটী সত্তর লক্ষ। এ সকল সংখ্যার মধ্যে নীহারিকাভ্যন্তরবর্ত্তী নক্ষত্র সকল গণিত হয় নাই। যেমন সমুদ্র তীরে বালুকা, নীহারিকা সেইরূপ নক্ষত্র। এখানে অঙ্ক হারি মানে।

যদি অতি প্রকাণ্ড জগৎ সকলের সংখ্যা এইরূপ অনমুমেয়, তবে ক্ষুদ্র পদার্থের কথা কি বলিব? ইহ্রেণবর্গ বলেন যে এক ঘন ইঞ্চি বিলিন্ স্লেট প্রস্তরে চল্লিশ হাজার Gallionella নামক আনুবীক্ষণিক শম্বুক আছে—তবে এই প্রস্তরের একটি পর্ব্বতশ্রেণীতে কত আছে কে মনে ধারণা করিতে পারে? ডাক্তার টমাস টম্‌সন্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে সীসা, এক ঘন ইঞ্চির ৮৮৮,৪৯২০০০০০০০০ ভাগের একভাগ পরিমিত হইয়া বিভক্ত হইতে পারে। উহাই সীসার পরমাণুর পরিমাণ। তিনিই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে গন্ধকের পরমাণু ওজনে এক গ্রেনের ২০০০০০০০০০০০০ ভাগের এক ভাগ।

---

(১)

ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার !—
অই শুন ঘোর ঘন ভীমনাদ তার।
ছুটিছে তুমুল রঙ্গে আকুল অধীর বঙ্গে ;
উঠিছে পূরিয়া দিক্ প্রাণী হাহাকার !—
বাজিল অকাল ভেরী বাজিল আবার ॥

(২)

চলেছে প্রাণীরকুল হের চারিধার ;
চলে যেন পঙ্গপাল করিয়া আঁধার—
স্থবির বালক নারী হা অন্ন, হা অন্ন বারি
বলিতে বলিতে ধায় চক্ষে নীরধার ;
ধরাতলে চলে ধীরে কালীর আকার।

(৩)

দেখ রে চলেছে আহা শিশু কতজন,
শীর্ণদেহ চাহি আছে জননী বদন ;
আকুল জননী তার মুখ চাহি বারবার
অনিবার বারিধারা করে বরিষণ—
ভ্রমে যেন উন্মাদিনী অন্নের কারণ।

(৪)

—হের দেখ পথিধারে বসিয়া ওখানে
পতির চরণে লুটি আকুল পরাণে
বলিছে কামিনী কেহ কই নাথ অন্ন দেহ
কালি আর চাহিব না রাখ আজি প্রাণে—
বলিয়া ত্যজিল প্রাণ চাহি পতিপানে।

(৫)

ছুটিছে যুবতী কন্যা ফেলিয়া পিতায় ;
মা বলি ডাকিছে বৃদ্ধ সকলি বৃথায় !—
কেবা কন্যা কেবা পিতা কে জননী কেবা মিতা
অন্নদাতা পিতা মাতা আজি বঙ্গালয়—
হের হেন কতজন আজি এ দশায়।

(৬)

হের কতজন আহা উদর জ্বালায়
জননী ফেলিয়া শিশু ছুটিয়া পলায়—
তুলিয়া যুগল পাণি শিশু ডাকে মা মা বাণী
ক্ষুধায় জননী তার ফিরিয়া না চায়—
একাকী পড়িয়া শিশু পরাণে শুকায়।

(৭)

চলেছে প্রাণীরকুল এরূপে আকুল ;
নৃত্য করে অনশন মুক্ত করি চুল—
নৃত্য করে ভেরী নাদে কঙ্কাল তুলিয়া কাঁদে
খর্পর ধরিয়া করে করিছে ভ্রমণ—
দেখ, বঙ্গবাসী, দেখ মূর্ত্তি কি ভীষণ !

(৮)

ছুটিছে নয়নে বহ্নি স্ফুলিঙ্গ সমান ;
ফিরিছে উন্মত্তভাব উল্কার প্রমাণ ;
দন্ত ঘরষণে শব্দ ভারত ভুবন স্তব্ধ
করাল বিকট গ্রাস মুখের ব্যাদান—
আকাশে উঠিছে সঙ্গে কালের নিশান।

(৯)

কতই উৎসবপূর্ণ গৃহস্থ আলয়,
নন্দিনী নন্দন রূপ, সুখ পুষ্পময়,
আজি পূর্ণ কলরবে অচিরে নীরব হ'বে
শকুনী বায়স কিম্বা পেচক আশ্রয়—
ধরিবে শ্মশান বেশ মৃত অস্থিময়।

(১০)

কত সে জনতাপূর্ণ পণ্যবীথি, হায়,
এ রাক্ষস অনাচারে হ'বে মরু প্রায়—
ভীষণ গহন সাজ ধরিবে পুরির মাঝ
পূরিবে বনের গুল্ম পাদপ লতায়,
ভ্রমিবে শার্দ্দূল শিবা আনন্দে সেথায়।

(১১)

আজি হাসি ভরা মুখ প্রফুল্ল যে সব,
আজি সুখপূর্ণ বুক আশার পল্লব,
কালি আর নাহি রবে শবদেহ হ'বে সবে
শৃগাল কুক্কুরে মেলি করিবে উৎসব—
কর্ণমূলে গৃধ্র বসি শুনাইবে রব!

(১২)

কেমনে হে, বঙ্গবাসি নিদ্রা যাও সুখে!
ভাবিয়া এভাব চিত্ত ভরে না কি দুখে?
নিজ সুত পরিবার না জানিবে অনাহার
ভাবিয়ে না চাহ কি হে অভুক্তের মুখে—
স্বজাতি শোকের শেল বিন্ধে না কি বুকে?

(১৩)

প্রিয়ে বলি গৃহে আসি ধর যবে কর,
হয় না উদয় কিয়ে হৃদয় ভিতর—
কত সতী অনাথিনী পথে পথে কাঙ্গালিনী
ভ্রমিবে হতাশ হৈয়ে ত্যাজি শূন্যঘর—
নাহি লজ্জা কুলমান, ক্ষুধায় কাতর!

(১৪)

ক্রোড়ে ধরি হের যবে কন্যা পুত্রগণ,
ভাবিয়া জগৎ মাত্রে অমূল্য রতন—
কভু কি পড়ে না মনে সেই সব শিশুগণে
অন্ন বিনে মরে যারা করিয়া রোদন;—
তাহারাও অইরূপ নয়ন রঞ্জন!

(১৫)

হে বঙ্গ-কুল কামিনী আর্য্যা যতজন,
জান যারা পতি পুত্র পিতা সে কেমন—
ভাব দেখি একবার বদন সে সবাকার
ঘরে যারা প্রাতঃসন্ধ্যা করে দরশন
নিরন্ন বিষণ্ণ পতি, জনক, নন্দন!

(১৬)

একদিন অনশনে দিন যদি যায়,
জান না কি বঙ্গবাসী কি যাতনা তায়!
আজি সেই অনশনে দারুণ হতাশ মনে
লক্ষ নরনারী শিশু করে হায়, হায়—
তবুও চেতনা কি হে নাহি হয় তায়!

(১৭)

ভাব, অহে বঙ্গবাসী, ভাব একবার
কি কাল রাক্ষস আসি ঘেরিয়াছে দ্বার—
নাশিতে সে দুরাচার বৃটনের হুহুঙ্কার
বৃটিশ কেশরীনাদ শুন একবার—
ঘুমাইও না, বঙ্গবাসী ঘুমাইও না আর;
জাগতে কালের ভেরী বাজিল আবার।

গত মাসের বঙ্গদর্শনে শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রণীত বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা ভ্রমাত্মক। ঐ প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। অতএব গ্রন্থকারকে যে তাহার পরিশ্রমের জন্য প্রশংসা করি নাই, ইহাতে আমাদের ক্রটি হইয়াছে। পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

ব্যায়াম শিক্ষা। প্রথমভাগ। শ্রীহরিশচন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত। কলিকাতা সন ১২৮০ সাল।

ব্যায়াম শিক্ষার এই প্রথম গ্রন্থ। এরূপ গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বোধ হয়, ব্যায়াম কার্য্যে বিশেষ সুনিপুণ এবং চিকিৎসা বিদ্যায় সুদক্ষ ব্যক্তির দ্বারা ইহা লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ হরিশ বাবু যেরূপ প্রতিষ্ঠালব্ধ এবং কৃতবিদ্য চিকিৎসক, এ গ্রন্থখানি তাহারই উপযুক্ত হইয়াছে। ইহা অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে এবং ব্যায়াম কৌশল এবং তদনুষঙ্গিক শারীরিক বিধান সকল অতি পরিষ্কৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদিগের এমন বোধ হয় যে ইহার সাহায্যে, বিনা শিক্ষকেও ব্যায়াম কৌশল সকল অভ্যাস করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থখানি ছাত্রদিগের শিক্ষার বিশেষ উপযোগী এবং শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিদ্যালয় সমূহে ইহার পাঠের নিয়ম করেন, ইহা আমাদিগের বিশেষ অভিলাষ। ইহার মূল্যও অতি অল্প, চারি আনা মাত্র। এই সুমূল্যতাও এরূপ গ্রন্থের বিশেষ একটী গুণ।

বাঙ্গালির পক্ষে ব্যায়াম শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালীর বিদ্যা বুদ্ধির অভাব নাই, বল ও সাহস হইলেই আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে গণ্য হইতে পারি। বল হইলেই সাহস হইবে। বলের পক্ষে ব্যায়াম বিশেষ প্রয়োজনীয়। ব্যায়াম শিক্ষার পক্ষে সকলেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য। সেই জন্যই হরিশ বাবুর গ্রন্থের এত প্রয়োজন এবং সেই জন্যই উহা সকল বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। আমাদের দেশের বালকেরা শারীরিক পরিশ্রম করে না, মানসিক

পরিশ্রম করে—ইহাতে তাহারা রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই অনিষ্ট নিবারণের একমাত্র উপায় ব্যায়াম শিক্ষা।

এই গ্রন্থখানি দুই অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে উপক্রমণিকায় ব্যায়ামের প্রয়োজন। তৎপরে ব্যায়ামের ফল, পরিচ্ছদ, আহার ইত্যাদি, ব্যায়ামের বিধান, দুর্ঘটনার চিকিৎসা, এই সকল অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, প্রথমে যে সকল ব্যায়ামে কোন প্রকার যন্ত্রের প্রয়োজন নাই তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পরে যে সকল ব্যায়ামে যন্ত্রের আবশ্যক, কিন্তু সহজে বা অনিষ্টপাতের কোন সম্ভাবনা ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যায়াম সকলের বিধান লিখিত হইয়াছে। এইরূপ সুপ্রণালীতে গ্রন্থ লিখিত হওয়ায় শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েরই ব্যায়াম শিক্ষা বিশেষ সুসাধ্য বোধ হইবে। এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য আমরা হরিশ বাবুকে বিশেষ ধন্যবাদ করি।

হরবোলা ভাঁড়। প্রথম ভাগ। প্রথম সংখ্যা জি, পি, রায় এণ্ড কোং ১৮৭৪।

এখানি বোধ হয় মাসিকপত্র। রহস্য ইহার উদ্দেশ্য। অনেকগুলি চিত্র ইহাতে আছে। "পঞ্চ" নামক ইংরেজি পত্রের চিত্রের অনুকরণে এই সকল চিত্র প্রণীত হইয়াছে। চিত্রগুলি উত্তম হইয়াছে।

ভাঁড়ের কয়েকটি কবিতা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহাতে পাঠকেরা তাঁহার চরিত্র ও প্রতিজ্ঞা বুঝিতে পারিবেন।

> বোকা চতুর, আমীর ফতুর, ধাড়ী বকনা ছানা
> নিক্তি কোরে, কোরবো ওজন, ওজন থাকবে জানা॥
> রাজা রুজড়ো পাজি পুজড়ো, যে যেখানে আছে
> কেউ এসোনা কেউ এসোনা, এ মূষলের কাছে।
> বাবা! এ মূষলের কাছে॥
> ঘোরে বন বনা বন ঠন ঠনা ঠন ধর্ম্ম মূষল ঘাড়ে।
> যদি মুণ্ডু ঘুরাও, ঘুরবে মুণ্ডু, আটকা পোড়বে ভাঁড়ে।
> রেখো জোয়ার মুখে ধর্ম্মতরী সামলে ফেলো দাঁড়।
> মাভৈ মাভৈ ভয় কোরোনা অভয় দিচ্ছে ভাঁড়॥

আমরা শুনিয়াছি, এ মূষল, কোন যোগ্য ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। অতএব আমরা যে দুই একটা পরামর্শ দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহা প্রয়োজনীয় না হইলেও হইতে পারে। তবে একটা স্থূল কথা বলিয়া রাখিলে ক্ষতি নাই।

গালি এবং ব্যঙ্গ দুইটি পৃথক্ বস্তু, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। গালি ভদ্রের পরিহার্য্য, তদ্দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। ব্যঙ্গ সকলের আনন্দদায়ক; এবং সুলেখকের হস্তে তাহা মহাস্ত্র। অনেক লেখক গালিকেই ব্যঙ্গ মনে করেন; পক্ষান্তরে অনেক পাঠক ব্যঙ্গকে গালি মনে করেন। আবার অনেকে নিরর্থক ছেবলামিকে ব্যঙ্গ মনে করেন। আমরা ভরসা করি, ভাঁড়ের এ সকল দোষ ঘটিবে না।

ইয়ুরোপে তিন বৎসর। অর্থাৎ ইউরোপবাসীদিগের আচার—ব্যবহার-সম্বন্ধীয় ও নানা দেশ বর্ণনা বিষয়ক কতকগুলি পত্রের সারাংশ। ইংরাজি হইতে অনুবাদিত। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং। ১২৮০।

এই গ্রন্থখানি প্রথমে ইংরেজি লিখিত হয়। বঙ্গদর্শনে ইংরেজির সমালোচনা হইয়াছিল। সমালোচন কালে আমরা লেখককে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রচার করুন। সেই অনুরোধ সফল হইয়াছে দেখিয়া আমরা বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছি।

বঙ্গদর্শনে "ইউরোপে তিন বৎসরের" প্রথম ইংরেজি সংস্করণের সমালোচনা করিয়াছিলাম। তাহার পরে দ্বিতীয় ইংরেজি সংস্করণ প্রচারিত হইয়াছে। এই বাঙ্গালা অনুবাদ দ্বিতীয় সংস্করণেরই। প্রথমাপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক বেশী কথা আছে। সেগুলি নিতান্ত জ্ঞাতব্য এবং শিক্ষাদায়ক।

অনুবাদ অতি উত্তম হইয়াছে। ইহা যে ইংরেজির অনুবাদ, বাঙ্গালা পড়িয়া তাহা কিছুই বুঝা যায় না। পড়িলে বোধ হয় গ্রন্থখানি আদৌ বাঙ্গালায় প্রণীত। বাঙ্গালা ভাষায় যত পাঠ্য গ্রন্থ আছে, এখানি তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ মধ্যে গণনীয়। যাঁহারা ইংরেজি জানেন না তাঁহারা বাঙ্গালির পাঠ্য ঈদৃশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠে বঞ্চিত থাকিবেন, এই দুঃখেই আমরা ইহার বাঙ্গালা অনুবাদের জন্য গ্রন্থকারকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। বাঙ্গালি স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এ গ্রন্থ বিশেষ আদরণীয়। যিনিই বাঙ্গালির মেয়ে, বাঙ্গালা পড়িতে জানেন, ইংরাজি পড়িতে জানেন না, তাঁহারই এ গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের চক্ষু ফুটিবে। হিন্দু দেশ ভিন্ন অন্য দেশ যে আছে, তাহা যে আমাদের দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকৃতি, এ সকল কথা তাঁহারা কর্ণে শুনিয়া থাকেন মাত্র, কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। এ গ্রন্থে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। এরূপ একটি নূতন কথা স্ত্রী বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হইলে, অনেক সুফল ফলে। আমরা ইহা বলিতে পারি, যে সুন্দরীগণ ইহা পাঠ করিয়া সুখলাভ করিবেন— কেন না লেখকের লিপিপ্রণালী মনোহর। মূল্য অতি সামান্য—আট আনা মাত্র।

তীর্থমহিমা। নাটক। শ্রীনিমাই চাঁদ শীল প্রণীত। কলিকাতা। নূতন সংস্কৃত যন্ত্র। সন ১২৮০।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। গ্রন্থকারের নিবাস চুঁচুড়া। চুঁচুড়া হইতে "সাধারণী" প্রকাশিত হয়। বোধ হয়, সমালোচনার জন্য একখণ্ড "তীর্থমহিমা" সাধারণীকে প্রদত্ত হয়। সাধারণী লেখক, গ্রন্থকার তাঁহার একজন সম্ভ্রান্ত বন্ধু ও প্রতিবেশী বলিয়া গ্রন্থ সমালোচনা করেন না। কিন্তু উৎসর্গ পত্রের সমালোচনা করেন। খড়দহের একজন গোস্বামীকে ঐ গ্রন্থ উপহার প্রদত্ত হইয়াছে। সোজা বুঝিলে, উৎসর্গ পত্রে কতকগুলি অত্যুক্তি আছে। সাধারণী লেখক সোজা লোক নহেন, কিন্তু এবার সোজা বুঝিলেন। তিনি অত্যুক্তি দোষগুলি দেখাইয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ নানা দিগ হইতে নানা পত্রে নানা ভঙ্গীর পত্র প্রেরিত হইতে লাগিল। সাধারণীতে কয় খানি প্রতিবাদাত্মক পত্র প্রকাশিত হইল। একখানিতে সাধারণী কিছু টীকা লিখিলেন। টীকায় অসন্তোষের কথা কিছু আমারা দেখিনাই—কিন্তু নিমাইবাবু অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি সাধারণীতে এক খানি পত্র লিখিলেন। তাহার সমুদয়াংশ আমরা উদ্ধৃত করিতে পারিনা। তাহার সার মর্ম্ম আমরা এই বুঝিলাম, যে নিমাই বাবু বড় রুষ্ট হইয়াছেন, এক্ষণে আর সাধারণী লেখককে বন্ধু বা প্রতিবেশী বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

এইরূপে সমালোচনার দায়ে সাধারণী অমূল্য রত্ন স্বরূপ নিমাই বাবুর বন্ধুত্ব গৌরব হারাইলেন,—"like the base Judan, threw away" ইত্যাদি। এক্ষণে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য, সাধারণী যদি এ গ্রন্থের উৎসর্গ পত্র মাত্র সমালোচনা করিয়া, এত ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছেন, তবে আমরা সমগ্র গ্রন্থ সমালোচনা করিলে, না জানি কি বিপদে পড়িব? কেননা নিমাই বাবু বলিতে দিন বা না দিন, আমরাও মনে মনে স্পর্দ্ধা করি, যে আমরা নিমাই বাবুর বন্ধু মধ্যে গণ্য; আর বঙ্গদর্শনের কার্য্যালয় চুঁচুড়ার অপর পারে, এজন্য কখন কখন আপনাদিগকে তাঁহার প্রতিবেশী বলিয়াও শ্লাঘা করিতে পারি। আমাদের এ সকল অহঙ্কার লোপ পায় আমাদের এমন ইচ্ছা নহে—এজন্য তীর্থমহিমার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না। ভরসা করি, এক্ষণে আমরা নির্ব্বিঘ্নে নিমাই বাবুর বন্ধু ও প্রতিবেশী বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে পারিব।

বঙ্গভূষণ। বঙ্গ দেশোদ্ভূত মৃত মহাত্মাগণের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী চতুর্দ্দশ-পদী কবিতানুসারে। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত। (সটীক) নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে। কলিকাতা।

এক এক জন মৃত ব্যক্তি লক্ষ্য করিয়া এক একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা

লিখিত হইয়াছে। টীকায় সেই ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত লেখা আছে। মূলে ও টীকায় এক এক পৃষ্ঠা। এইরূপ ৬৭ পৃষ্ঠা গ্রন্থ। এই ৬৭ জনই যে "মহাত্মা" বলিয়া স্মরণীয় হইবার যোগ্য, আমরা এমত বিবেচনা করি না। ইহার মধ্যে অনেককে আমরা চিনি না।

কবিতাগুলিতে বিশেষ কবিত্ব নাই কিন্তু পদ্যবিন্যাসে কতকটা ইংরেজি সনেটের মত হইয়াছে। সনেটের অনুকরণে চতুর্দ্দশপদী কবিতার সৃষ্টি, কিন্তু উভয়ে চৌদ্দ ছত্র থাকা ভিন্ন সনেটে ও চতুর্দ্দশ পদীতে অন্য সাদৃশ্য বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গভূষণে কিঞ্চিৎ আছে। আমাদের বিবেচনায় কবিতা অপেক্ষা টীকাগুলির দর বেশী।

সাহিত্য মঞ্জরী। শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কলিকাতা, সুচারু প্রেস। ১৮৭৩।

"বঙ্গবিদ্যালয়ে উচ্চশ্রেণীস্থ বালকগণের সাহিত্য পাঠোপযোগী গ্রন্থ অতি বিরল।" এই দেখিয়া গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে কতকগুলি গদ্য কতকগুলি পদ্যপাঠ সন্নিবেশিত হইয়াছে। গদ্যগুলির অধিকাংশ গ্রন্থকারের নিজের লিখিত। কোন কোন প্রবন্ধ কোন কোন সাময়িক পত্র হইতে সঙ্কলিত। পদ্যগুলি সকলই সংগৃহীত।

গদ্য পাঠগুলি অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব বিষয়ক। এটা বিশেষ প্রশংসার কথা। অন্যান্য বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ আছে—আমরা তাহার প্রশংসা করিতে পারি না। যথা, "বিদ্যা অতি রমণীয় পদার্থ। নানা পুষ্প সুশোভিত পরম উদ্যান ও শারদ পূর্ণিমার মনোমোহন চন্দ্রও কান্তিতে ইহার নিকট পরাজিত হয়।" আমাদের বিবেচনায়, এরূপ কথা পড়িয়া বালকেরা বিশেষ উপকৃত হইবে না।

বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব বিষয়ে যে কয়েকটা পাঠ দেখিলাম, তাহাতে অনেকগুলিন ভ্রম আছে। অনেকগুলি অনিশ্চিত তত্ত্ব নিশ্চিত বলিয়া লিখিত আছে। যথা

"গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি যে সমুদায় লোক সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করে, তাহারা স্বয়ং জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট নহে, সূর্য্যের আলোক পাত দ্বারা ঐরূপ প্রতীয়মান হয়।"— ১৮৪ পৃষ্ঠা।

প্রক্টর সাহেব যে সকল প্রমাণ প্রযুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ কিয়দংশে স্বয়ং জ্যোতিষ্মান। সকল গ্রহ নহে।

"গ্রহগণ যেমন সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করে, সূর্য্যও সেইরূপ সমুদয় গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতু সমভিব্যাহারে করিয়া, অন্য এক নক্ষত্রকে পরিভ্রমণ করে।" ঐ পৃষ্ঠা।

কথাটী ঠিক সত্য নহে। সৌরজগৎ গতি বিশিষ্ট বটে, কিন্তু যে মণ্ডলে সূর্য্য সৌরজগৎ সহিত বর্ত্তন করে, তাহার কেন্দ্র কোথায়, কোন নক্ষত্র বিশেষ সেই কেন্দ্র কি না, তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। একজন জর্ম্মাণ জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন "সপ্ত ভাই চম্পা" (Pleiades) নামক নক্ষত্রাবলীর মধ্যে Alcyon নামক নক্ষত্র জাগতিক কেন্দ্র। কিন্তু এ মত যে ভ্রান্ত তাহা অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদেরা প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। সেই মত কেহ গ্রাহ্য করেন নাই।

এক পৃষ্ঠায় দুইটি ভুল। এরূপ আরও ভুল আছে। ইহা কোন সুযোগ্য বৈজ্ঞানিক দ্বারা সংশোধিত করাইয়া, সাহিত্য বিষয়ক গদ্য পাঠগুলি বাদ দিয়া, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচার করিলে একখানি উৎকৃষ্ট পাঠ্য পুস্তক হইতে পারে।

শিক্ষামঞ্জরী। প্রথম ভাগ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা বি, পি, এম যন্ত্রে।

এই গ্রন্থে কেবল শিশুদিগের পাঠোপযোগী কতকগুলি পদ্য আছে। এইসকল পদ্যে, শিশুদিগেরও কোন উপকার আছে কি না বলিতে পারি না। এ গ্রন্থের আর কোন গুণ নাই।